তত্ত্ব কৌমুদী ১

১৩শ কল্প ২

১৮১২ শক ৩

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ। ১ম সংখ্যা।

১লা বৈশাখ রবিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

নব উপহার।

বরষ নূতন বেশে, প্রভুহে, তোমার
দাঁড়াইয়া চরণের পাশে;
সেই তো জগৎ আছে, নূতনতা তার
বর্ষে বর্ষে কোথা হতে আসে?

যে বসন্ত গিয়াছিল, আসিয়াছে ফিরে
লয়ে ফুল কিশলয় ভার;
অতীতে যে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিয়াছে ধীরে,
নিবেদন করেনাকো আর।

আঁচল ভরিয়া ধরা নব উপহার
শ্রীচরণে করিছে অর্পণ;
আমি খুঁজে খুঁজে এনু সর্ব্বস্ব আমার,
সকলি—সকলি পুরাতন!

সেই পুরাতন কথা, সেই অশ্রুজল,
সেই মোর সকরুণ গান;
সেই তো সংকল্প শত, প্রতিজ্ঞা দুর্ব্বল,
সেই ক্ষত বিক্ষত পরাণ।

একটি প্রার্থনা মোর আছেগো নূতন,
সে প্রার্থনা আপনি পূরাও;
দুঃখ আছে, দুঃখ সাথী হোক আজীবন,
নব বর্ষে নব দুঃখ দাও।

মিছাই যুঝিব কেন? লভিয়া বিজয়
নব রণে অবতীর্ণ হব;
ব্যথা পাই, ক্ষতি নাই; মরণে কি ভয়?
পরাজয়-লাজ নাহি স'ব।

এক শত্রু বিনাশিতে আয়ুঃ কেন যায়?
যুঝি যুঝি হব অগ্রসর;
রুধিরাক্ত তনুখানি রাজা, তব পায়
আমি দিব প্রত্যেক বছর।

নব অস্ত্র-লেখা বুকে দেখিবে অঙ্কিত,
নব আনন্দের ভরে নব অশ্রুধার,
নব বর্ষে ক্ষীণ কণ্ঠে গাব নব গীত,
জীবন তোমারে দিব নব উপহার।

নব-বর্ষের প্রার্থনা।

হে বিধাতা! তোমার হাতে যে আছে সে চির সুন্দর, চির নূতন। শীতের প্রারম্ভে পক্ষিগুলিকে নূতন সুকোমল পক্ষে তুমি আচ্ছাদন কর; তাহাদের পুরাতন শ্রী ফিরিয়া আসে; হংসদিগকে শুক্লবর্ণ পরিচ্ছদে তুমিই সুশোভিত কর; ময়ূরদিগকে বিচিত্র ভূষণে তুমিই সুসজ্জিত কর। এই যে বৃক্ষলতা, হতশ্রী, বিশীর্ণ, পত্রহীন ও শোভাহীন হইয়াছিল, বসন্তের বাতাস লাগিবা মাত্র কোথা হইতে নবরস সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগের পুরাতন শ্রী আনিয়া দিয়াছে! তাহারা নব পল্লবের মুকুট পরিয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া উৎসবের বেশ পরিধান করিয়াছে। তোমার রাজ্যে সকলেই এইরূপ নূতন পরিচ্ছদ পাইবে, আর মানবই কি কেবল বিশীর্ণ, নিরাশ, নিরুদ্যম ও পত্রহীন হইয়া থাকিবে? নবীনতা সকলেরই মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, মানবই কি কেবল প্রাচীনের নিস্পন্দ জড়তার মধ্যে পড়িয়া থাকিবে? এরূপ কেন হইবে? তুমি আমাদের এই ক্ষুদ্র মানব জীবনের মধ্যেই কতবার কত স্থানে দেখাইতেছ যে, যেখানেই প্রেম সেই খানেই নবীনতা, যে খানেই তোমার হস্তে আত্ম-সমর্পণ সেই খানেই নিত্য নব-শোভা। তবে আমাদিগকে এই নব-বর্ষের প্রারম্ভে সেই প্রেমরসে সঞ্জীবিত কর, যদ্দ্বারা নবীনতা লাভ করিয়া তোমার কার্য্যে উৎসাহের সহিত অবতরণ করিতে পারি।"

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নব-পরীক্ষা—কয়েক বৎসর গত হইল একজন ব্রাহ্ম চিকিৎসক, চিকিৎসা ব্যবসায় করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। অন্যান্য আশার মধ্যে তাঁহার এই এক আশা ছিল যে তাঁহার ব্রাহ্মবন্ধুগণের পরিবারে পীড়াদি হইলে

তাঁহার দ্বারা সকলে চিকিৎসা করাইবেন। এই কথা শুনিয়া সুবিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক পরলোকগত রাজেন্দ্র লাল দত্ত মহাশয় ঐ ব্রাহ্মচিকিৎসককে বলিয়াছিলেন "তুমিত বড় বোকা; ব্রাহ্মদের রোগ শোক নাই, ওদের পীড়াও হয় না, ওরা মরেও না।" কথাটা অত্যুক্তি দোষ মিশ্রিত হইলেও ইহার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কয়েক বৎসর হইল ব্রাহ্মদিগকে রোগ শোকের যন্ত্রণা বড় অধিক সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু এ বৎসর কলিকাতাবাসী ক্ষুদ্র ব্রাহ্মমণ্ডলীর উপর দিয়া রোগ শোকের ঝড় বহিয়া যাইতেছে। অতি অল্পদিনের মধ্যে কয়েকটী পরিবারকে শোক-মগ্ন হইতে হইয়াছে। আবার এই মৃত্যুগুলি অতি আকস্মিক ও অতর্কিত ভাবে ঘটিয়াছে। যাঁহারা আমাদের মধ্যে সবল সুস্থদেহ ও অতিশয় কর্ম্মক্ষম ছিলেন এরূপ কতিপয় পুরুষ ও মহিলা মৃত্যুর নিদারুণ আঘাতে হঠাৎ ধরাশায়ী হইয়াছেন। রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার অবসর পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। হঠাৎ যে গুরুতর আঘাত আসিয়া পড়ে তাহাতে মানুষকে হতবুদ্ধি করিয়া দেয়; এই সকল মৃত্যুতেও আমরা বিস্মিত ও স্তব্ধ হইয়া গিয়াছি। এবং মৌনী হইয়া এই সকল পরীক্ষার মধ্যে বিধাতার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ লক্ষ্য করিবার প্রয়াস পাইতেছি। আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস বিপদ তাঁহার প্রেমের প্রচ্ছন্ন লীলা মাত্র; সুতরাং হৃদয়ের সহিত প্রত্যাশা করি যে এতদ্দ্বারা আমাদের কোন সুমহৎ কল্যাণসাধন করিবে। আমাদের দেশে প্রথা আছে যে,দেশমধ্যে মহামারী উপস্থিত হইলে লোকে রক্ষাকালীর পূজা আরম্ভ করে ও জপ তপ স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতিতে মনোযোগী হয়; আমরা যে ভয়ভীত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইব তাহা নহে; কিন্তু এস বিশ্বাস সহকারে তাঁহার ইচ্ছা অবধারণের নিমিত্ত ব্রত-পরায়ণ, প্রার্থনাশীল, ও তদ্গত-চিত্ত হই। নববর্ষে নব দুঃখের ভিতর হইতে আমাদের জন্য আশার বাণী উত্থিত হউক।

নব বর্ষ ও নব শক্তি—এই নব বর্ষের সময় দেশীয় ব্যবসায়ী ও বাণিজ্য-জীবী ব্যক্তিদের পক্ষে একটী বিশেষ সময়। সম্বৎসর কাল তাহারা পরিশ্রম করিয়াছে; আনিয়াছে রাখিয়াছে, কিনিয়াছে বেচিয়াছে, মূল ধনে হয়ত দশটাকা ফেলিয়াছে, আবার বিপদে আপদে হয়ত দশ টাকা ব্যয় করিয়াছে; সম্বৎসরের মধ্যে হিসাব মিলাইবার ও ক্ষতি লাভ গণনা করিবার অবসর হয় নাই। বর্ষশেষ হইবার প্রারম্ভেই কাগজ পত্র মিলাইয়া সকলে দেখিয়াছে লাভ হইল কি ক্ষতি হইল। যাহারা আজ আপনাদিগকে লাভবান দেখিতেছে তাহাদের কি আনন্দ! তাহারা মনে মনে কত উল্লাস করিতেছে, এবং নব উদ্যমের সহিত নূতন প্রকার আয়ের দ্বার খুলিবার পরামর্শ করিতেছে। কিন্তু যাহারা ক্ষতিগ্রস্ত তাহারা কি একেবারে ভগ্নোদ্যম হইতেছে? তাহা নহে, তাহারাও নূতন পন্থা আবিষ্কার করিবার সংকল্প করিতেছে। ব্যবসায়ে যাহারা প্রবৃত্ত তাহারা হঠাৎ ভগ্নোদ্যম হয় না; তাহারা জানে এক আঘাতেই আশা ভরসা ভাঙ্গে না; আজ যেখানে ক্ষতি কল্য সেখানে হয়ত লাভ হইতে পারে; কেবল মাত্র, ধৈর্য্য, শ্রম, মিতব্যয়িতা ও সতর্কতা থাকার প্রয়োজন। এই সকল সদ্গুণ যে কেবল বিষয় বাণিজ্যেই উৎকৃষ্ট ফল উৎপন্ন করে তাহা নহে, অধ্যাত্ম-রাজ্যেও এই সকল গুণের বিশেষ প্রয়োজন, এবং ইহাদের উৎকৃষ্ট ফল ফলিয়া থাকে।

হিসাব নিকাষ—এসময়ে বণিকেরা যাহা করে তাহা হইতে আর একটী উপদেশ লাভ করিতে পারি। যদি এমন বণিক কেহ থাকে, যে মূল ধন নিয়োগ করিয়াছে, যথেচ্ছ ব্যয় করিতেছে, কেনা বেচা চলিতেছে, কিন্তু আলস্য বশতঃ একবার খাতা পত্র উল্টাইয়া দেখে না, সে লাভবান কি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে; বৎসরের পর বৎসর যাইতেছে,কত টাকা লাগিল, কত লাভ হইল তাহারও নির্ণয় নাই; তবে সে ব্যক্তির কাজ অচিরাৎ হয়ত বন্ধ হইয়া যায়। বাহিরে বিলাত পড়িয়া ও বাজারে দেনা দাঁড়াইয়া তাহার বাণিজ্য অচল হইয়া পড়ে। এজন্য বণিক মাত্রেরই খাতা পরিষ্কার রাখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ভাল বণিকেরা খাতা পরিষ্কার না করিয়া রাত্রে নিদ্রা যাইতে পারে না। আমাদের আধ্যাত্মিক খাতা কিরূপে পরিষ্কার রাখি? সেখানকার আয় ব্যয় কিরূপে গণনা করি? এই জন্য প্রতিবর্ষে বণিকদের যেমন হিসাব নিকাষের সময় উপস্থিত হয়, ধর্ম্ম জীবনের যাত্রীদিগেরও নির্জ্জন বাস ও আত্ম চিন্তার জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দ্ধারিত সময় রাখা কর্ত্তব্য। সচরাচর আমাদিগকে যেরূপ দৈনিক শ্রম ও ব্যস্ততার মধ্যে বাস করিতে হয়, তাহাতে প্রতিদিন নির্জ্জন বাস ও আত্মচিন্তার জন্য নির্দ্ধারিত সময় রাখা অনেকের পক্ষে সহজ নয়। কিন্তু তাঁহারা যদি মাসের মধ্যে বিশেষ বিশেষ দিন, অথবা বৎসরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সময় এতদর্থে নির্দ্ধারিত করিয়া রাখেন তাহা হইলে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাহারা সেই সময়টা বিশেষ ভাবে আত্ম-পরীক্ষা পাঠ ও নির্জ্জন চিন্তাতে যাপন করিতে পারেন। যে চরিত্রে নির্জ্জন-বাস ও আত্ম-চিন্তা নাই কেবল কোলাহল ও ব্যস্ততা আছে; তাহা ত্বরায় অন্তঃসার-বিহীন হইয়া পড়ে।

প্রাচীন শিক্ষা ও নূতন শিক্ষা—প্রাচীন কালে এ দেশে যে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত ছিল, তাহার একটা গুণ এই ছিল, যে তাহাতে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে অতি ঘনিষ্ট ও সুমিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। ছাত্রগণ গুরু গৃহে সন্তানের ন্যায় বাস করিত; গুরু পত্নীকে মাতার ন্যায়, গুরু কন্যাদিগকে ভগিনীর ন্যায় ও গুরু পুত্রদিগকে ভ্রাতার ন্যায় দর্শন করিত। আচার্য্য প্রত্যেক শিষ্যের নাম, ধাম, স্বভাব, চরিত্র, শক্তি, সাধ্য, মনের চিন্তা ও ভাব জানিতেন; কাহার দ্বারা কি হইতে পারে বা না পারে তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন; সুতরাং তিনি তদনুরূপ শিক্ষাও দিতে পারিতেন; প্রত্যেক শিষ্যকে বিশেষ ভাবে ও বিশেষ সময়ে সাহায্য করিতে পারিতেন; শিষ্যের প্রশংসায় আপনাকে প্রশংশিত বলিয়া জ্ঞান করিতেন; রাজা ও ধনিদিগের সভাতে মধ্যে মধ্যে যে শাস্ত্র বিচার হইত তাহাতে

আচার্য্যগণ সশিষ্যে আগমন করিতেন এবং বিচার কার্য্যে শিষ্যদিগকে নিয়োগ করিতেন; যাঁহার শিষ্যগণ বিচারে জয় লাভ করিতেন, তিনি চির দিনের মত লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যাইতেন। কেবল তাহা নহে, সন্তানে পিতার যেরূপ সেবা করে, শিষ্যগণ সেইরূপ আচার্য্যের সেবা করিতেন। এই রূপ প্রণালী শিক্ষার অতিশয় অনুকূল ছিল। যেখানে প্রেম ও শ্রদ্ধার যোগ আছে, সেই খানেই জ্ঞানেচ্ছা এক হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে যায়। বর্ত্তমান শিক্ষার প্রণালী ইহার বিপরীত। ছাত্রগণ আর গুরু গৃহে বাস করে না, দশ দিক হইতে দশ জন বালক আসে; এক শ্রেণীতে শতাধিক বালক এক সঙ্গে পাঠ করে; সম্বৎসরের মধ্যে অনেক ছাত্রের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে শিক্ষকের আলাপ পরিচয় হয় না; শ্রেণীর মধ্যে কোন গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক তাহা শিক্ষকের জ্ঞান থাকে না; বিশেষ ভাবে দৃষ্টি করিবার সময় ও সুবিধাও হয় না; দুর্ব্বলদিগের জন্য সবলেরা গতি মন্দ করিতে চায় না, সুতরাং দুর্ব্বলগুলিকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইতে হয়। এইরূপে গুরু শিষ্যে বিচ্ছেদ ঘটনা হওয়াতে বিশেষ অকল্যাণ হইতেছে। কলিকাতা সহরে এই অনিষ্টটী বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে। এখানে শিক্ষার অবস্থা ও যুবক দলের নীতি দিন দিন শোচনীয় হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর সংশোধন না করিলে উপায় নাই। প্রাচীন হিন্দু প্রথা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে ভাল হয়, অভাবপক্ষে ইংলণ্ডের ন্যায় বোর্ডিং প্রথাও ভাল। দেশের সমগ্র শিক্ষাপ্রণালীকে সংশোধন করিতে পারা যাউক না যাউক, ব্রাহ্ম বালক বালিকাদের শিক্ষার বিষয় চিন্তিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। ব্রাহ্ম গৃহস্থগণ নিজ নিজ সন্তানদিগের মনে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের ভাব দৃঢ় রূপে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিতেছেন না; অথচ নানা শ্রেণীর বিভিন্ন-প্রকৃতি-সম্পন্ন বালক বালিকার সহিত মিশিয়া তাহারা তদ্বিরুদ্ধ ভাব সকল প্রাপ্ত হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর চাকায় আমাদের সন্তানগণকে ছাড়িয়া দেওয়ার অনিষ্ট ফল আমরা ইতি মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। ব্রাহ্মেরা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে কি অন্ততঃ তাঁহাদের পুত্র কন্যাদিগকে এই অনিষ্টকর শিক্ষা প্রণালীর হস্ত হইতে বাঁচাইতে পারেন না? তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যার শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহা সমবেত করিয়া কি তাঁহারা আপনাদের মধ্যে উৎকৃষ্টতর শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন না? এই সকল প্রশ্ন ত্বরায় ব্রাহ্মমণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ ভাবে আলোচিত হওয়া কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ঈশ্বর হৃদয়-পুরে পুর-স্বামী।

ধর্ম্ম-জগতের সাধকদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম শ্রেণীর দৃষ্টি ভূত কালের দিকে; দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে। ভূতকালের দিকে যাঁহাদের দৃষ্টি, তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে ভূতকালেই ভগবান মানবের সহিত লীলা করিয়াছিলেন; ভূত কালেই ভূভার হরণ করিবার জন্য মানবের জীবন-রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; ভক্তবৎসল ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য ভক্তের সমীপে আত্ম-স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে যদি পরমেশ্বরের অপূর্ব্ব লীলার কথা শুনিতে চাও তাহা হইলে পুরাণের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর, পুরাণে ও শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ কর। বিধাতার কি করুণা তিনি ভূভার ধারণের জন্য বরাহ মূর্ত্তি ধরিয়াছিলেন; বলিকে ছলিবার জন্য বামনাকৃতি হইয়াছিলেন; দুর্দান্ত দৈত্যেরে বিনাশ সাধনের জন্য নর-সিংহ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন; ব্রজবাসিদিগকে রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোবর্দ্ধন গিরিকে ধারণ করিয়াছিলেন; সূত্রধর ভবনে জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পাপভার হরণ উদ্দেশে ক্রুশ কাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়াছিলেন;—এ সমুদায় অতীতের কথা, পুরাণের কথা, একই কথা। খ্রীষ্টীয়ানগণ বিশ্বাস করেন যে পরমেশ্বর বাস্তবিক মেঘমালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া মূষাকে পর্ব্বতোপরি দর্শন দিয়াছিলেন এবং মূষার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াছিলেন; মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন এক বিশেষ দিনে হজরত মহম্মদ দেবদূতগণের সহিত পরমেশ্বরের সন্দর্শনার্থ সপ্তম স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন এবং সেখানে খোদাতালার সহিত তাঁহার সম্ভাষণ হইয়াছিল। এ সকলই এক কথা। ভগবানের লীলা অতীতে! —ভগবানের লীলা অতীতে। ইহাতে পিপাসুর প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। মূষার সহিত ঈশ্বর কথা কহিয়াছিলেন ইহা শুনিয়া যদি ধর্ম্ম-তৃষ্ণার চরিতার্থতা সম্ভব হয় তবে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৎসরে দশ লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এই কথা শুনিয়াও দরিদ্রের দারিদ্র্য ঘুচিতে পারে। তিনি মূষাকে দেখা দিয়াছিলেন, তাহাতে মূষার উপকার হইয়াছিল, গোবর্দ্ধন ধরিয়াছিলেন তাহাতে ব্রজের গোপকুলের কল্যাণ হইয়া থাকিবে, তাহাতে আমার কি? আমি তাঁহার দেখা কিরূপে পাইব?

ইহার উত্তরে ভবিষ্যৎদর্শী সাধকগণ বলিলেন,—ধর্ম্মের আচরণ কর, যাগ হোম তপস্যাদি কর, পাপ ক্ষয় হউক, পুণ্য সঞ্চয় হউক, তবে বৈকুণ্ঠ ধামে গিয়া ভগবানের সাক্ষাৎ কার লাভ করিতে পারিবে। যে সকল সাধকের দৃষ্টি ভবিষ্যতের প্রতি তাঁহাদের ধর্ম্ম ক্রিয়া-বহুল ধর্ম্ম। অনেকের কথাবার্ত্তা শুনিলে এরূপ বোধ হয়, যেন তাঁহারা মনে করেন যে, মৃত্যুর এমন একটা কিছু আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, মৃত্যু হইবামাত্র আমরা ঈশ্বরের সন্নিধানে উপস্থিত হইব; যেন এই রক্ত মাংসময় দেহই যবনিকাস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বর দর্শন করিতে দিতেছে না, এই রক্ত মাংসের যবনিকা অন্তর্হিত হইলেই তাঁহাকে উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে পারা যাইবে।

এই ভবিষ্যদ্দর্শী সাধকদিগের মধ্যে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, জন্ম জন্মান্তরে পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা পাপ ক্ষয় হইলে, তবে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া যাইবে। এ সকলই পাপ তাপে তাপিত মানব হৃদয় হইতে ঈশ্বরকে দূরে ফেলিবার কথা। ঈশ্বরকে যুগ যুগান্তর পরে দেখিতে পাইব, এই আশ্বাসেতে মানব-হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয় না। ভূতবাদ ও ভবিষ্যদ্বাদ এই

উভয় স্থলেই অপরের উক্তির উপরে নির্ভর করিতে হয়। কিরূপে জানিলে ঈশ্বর মূষাকে দর্শন দিয়াছিলেন? উত্তর—এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কিরূপে জানিলে যুগ যুগান্তরে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কার লাভ করিব?—সাধুগণ বলিয়াছেন। জীবনের প্রবল পরীক্ষা সকলের মধ্যে মানব হৃদয় শোনা-কথার উপরে সুস্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে না। পাপ প্রলোভনে মানুষ যখন ভীত হয়, বিপদের অন্ধকারে তাহার চারিদিক যখন আচ্ছন্ন করে, পরীক্ষার প্রবল অগ্নিতে তাঁহাকে যখন দগ্ধ করে, তখন যদি তাহাকে বল "তুমি আশ্বস্ত হও, মূষা ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন,"—তাহাতে কি তাহার কিছু প্রকৃত সান্ত্বনা লাভ হইতে পারে? এ কিরূপ আশ্বাস? রোগ-শয্যায় শয়ান সন্তানের পার্শ্বে বসিয়া জননী অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন, তাঁহাকে যদি বলা যায়, "মা তুমি কাঁদিওনা, আমার প্রপিতামহের জ্যেষ্ঠা ভগিনীর দৌহিত্রের এই প্রকার পীড়া হইয়াছিল, তখন সে দেশে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তিনি কি একটা ঔষধ দিয়া তাহাকে রোগ-মুক্ত করিয়াছিলেন।" জননী অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় সেই সন্ন্যাসী? কোথায় সেই ঔষধ? তাহার উত্তরে বলা হইল,—সেই সন্ন্যাসী মৃত ও সেই ঔষধ সে কালে ছিল, এখন নাই। ইহাতে যদি সেই শোকার্ত্ত মাতার কিছু সান্ত্বনা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে মূষার ঈশ্বর দর্শনের কথা শুনিয়াও তোমার আমার আধ্যাত্মিক সাহায্য হইতে পারে। মানব হৃদয় কি চায়? মূষাকে যে ঈশ্বর দেখা দিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরকে আনিয়া দেও, আমিও তাঁহাকে দেখি, তবেই প্রাণে শান্তি লাভ করিতে পারি, মানবহৃদয় এই কথা বলে।

এই কারণে ভক্তি-পথাবলম্বীরা ভূত ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া বর্ত্তমানের প্রতি মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন তাঁহাকে অতীতের অন্ধকারে অন্বেষণ করিতে হইবে না, ভবিষ্যতের জন্যও অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে না, তাঁহাকে হৃদয়-পুরে প্রাণমন্দিরে এখনি দর্শন কর। যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ ও জীবন্তরূপে বর্ত্তমানে বর্ত্তমান বলিয়া প্রতীতি করেন, তাঁহারাই অমরত্ব লাভ করেন। ভক্তি শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্তস্বরূপকে আত্মা-রথের সারথিরূপে চিরজাগ্রত দেখিয়া কৃতার্থ হয়। এই নববর্ষের প্রারম্ভে ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা তাঁহাকে হৃদয়-পুরের পুর-স্বামীরূপে দর্শন করিতে পারি।

শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্।

(তত্ত্ববিদ্যা সভার উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতার স্থূল মর্ম্ম)

সভাপতি মহাশয়, শিক্ষার্থী ছাত্রগণ, ব্রাহ্ম যুবকগণও ভদ্র-লোকগণ! ভগবদ্গীতাতে একটী বচন আছে :—

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ। জ্ঞানংলব্ধা পরাংশান্তি মচিরেণাধিগচ্ছতি।

অর্থাৎ—শ্রদ্ধাবান এবং সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।

কিছুদিন হইল ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট একটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে তাঁহারা দুঃখ করিয়াছেন যে, ভারত-বর্ষীয় ছাত্রদিগের মধ্যে Reverence এর বড় অভাব। ইংরাজি Reverence শব্দের ঠিক অনুরূপ বাঙ্গালা শব্দ নাই—তবে অভাব পক্ষে "শ্রদ্ধা" শব্দ ইহার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছাত্রদিগের মধ্যে দিন দিন এই "শ্রদ্ধার" অভাব বাড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইতেছেন। ছাত্র-দিগের মধ্যে যাহাতে এই "শ্রদ্ধার" ভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে;—এবং এই জন্য যাহাতে স্কুল সমূহে নীতি শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হইতে পারে, গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যে তদ্বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রদ্ধা ভিন্ন কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। মানব চরিত্র বিকাশের জন্য যাথার্থ জ্ঞান লাভের জন্য কি পরিমাণে শ্রদ্ধা থাকা আবশ্যক তাহা দেখা যাক।

প্রাচীন কালের আচার্য্য এবং উপদেষ্টারা শ্রদ্ধার আবশ্যকতা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছেন, প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধা, পরে ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক।

সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানেচ্ছুর পক্ষে ইন্দ্রিয় সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিব। তত্ত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি পরা বিদ্যা লাভ করিতে যে ইন্দ্রিয়-সংযমের প্রয়োজন, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। এমন কি বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান—জড়জগতের জ্ঞান—সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলেও ইন্দ্রিয় সংযমের প্রয়োজন। নিগূঢ় দর্শন, সূক্ষ্ম বিচারের ক্ষমতা প্রভৃতি না থাকিলে জড়-জগতের তত্ত্ব সকলের জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় না। মনে করুন যখন কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতেছেন, তখন একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র ধরিয়া থাকিতে হস্ত এরূপ সুশাসিত হওয়া আবশ্যক যেন স্পন্দন-রহিত হয়। ফ্যারাডে, টিণ্ডেল প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা কতদূর চিত্তের একাগ্রতা লাভ করিয়াছেন, তবে বৈজ্ঞানিক সত্য সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। একাগ্রতা লাভের জন্য চিত্তের নিরুদ্বেগ সুস্থতা থাকা চাই। চিত্তের মধ্যে কোন প্রকার উদ্বেগ থাকিলে কোন তত্ত্ব আলোচনা করিতে পারা যায় না। শুধু কেবল তাহাই নহে,—দৈহিক ধাতু পুঞ্জের নিরুদ্বেগতাও চাই। এই প্রকার শুনা যায় যে মহামুভব সার আইজাক নিউটন কোন গভীর বিষয় চর্চ্চা করিবার পূর্ব্বে কিছু দিন মাছ মাংস পরিত্যাগ করিয়া সংযত হইয়া থাকিতেন;—দেহ মন যাহাতে সেই সাধনের উপযোগী হয়, সেই জন্য সংযমী হইয়া দেহ মনকে শুদ্ধ অবস্থায় রাখিতেন। সামান্য লৌকিক-জ্ঞান লাভের জন্য যখন এরূপ দেহ ও মনের সংযম আবশ্যক, তখন আধ্যাত্ম-বিদ্যা, বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য কতদূর সংযত হওয়া আবশ্যক তাহা কে বলিতে পারে?

সকল দেশের সাধুদের একটা কথা শুনিতে পাওয়া যায় যে,

চিত্ত পবিত্র না করিলে মানুষ কখনও ঈশ্বরকে দেখিতে পায় না। সর্ব্বাগ্রে চরিত্রের পবিত্রতা তৎপর ঈশ্বর লাভ হইবে।

যেমন বাটীর নিকটে পচা পুষ্করণী বা নর্দ্দামা থাকিলে, —আকাশে সুবিমল সূর্য্য উদয় হইলেও, সেই দূষিত দুর্গন্ধময় বাষ্প উত্থিত হইয়া তোমাকে সুশীতল বায়ু ও সুবিমল কিরণ সম্ভোগ করিতে দিবে না—তেমনি মানুষের জীবন যদি অপবিত্র হয় তবে সেই অপবিত্র হৃদয় হইতে দুশ্চিন্তার বাষ্পসকল উত্থিত হইয়া সত্যের আলোক ও ঈশ্বরের পবিত্র মুখ দেখিতে দেয় না। জগৎ নিয়মে শাসিত হইতেছে; গগণ-বিহারী চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী যেমন নিয়মে আবদ্ধ তেমনি বিশ্বাস কর তুমি আমি সকলে এক অপরিহার্য্য নিয়মে আবদ্ধ রহিয়াছি। এই জগৎ শুধু জড় শক্তি ও পরমাণু পুঞ্জের সংযোগ বিয়োগের ফল মাত্র নহে। কিন্তু ইহার উপরে এক নৈতিক শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। আপনার আত্মার মধ্যে এই নৈতিক শক্তি উপলব্ধি কর। নিজ আত্মাতে যদি এই নৈতিক শাসন দেখিতে না পাও তবে জগতে কোথাও তাহা দেখিতে পাইবে না। প্রীতির স্বাভাবিক নিয়ম এই যে দুটী প্রাণে প্রীতি জন্মিলে কতকগুলি স্বাভাবিক কাজ হয়—যাহা প্রীতির অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু তোমার প্রাণে যদি প্রীতি না থাকে তবে তুমি সে সকল কার্য্যের মূল্য বুঝিতে পারিবে না। তোমার প্রাণে যদি প্রেম না থাকে তবে তুমি সে প্রেমের ব্যাপার বুঝিতে পারিবে না। কোন কৃপণ লোক যদি কাগজে পড়ে যে একজন লোক দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে দশ হাজার টাকা দান করিয়াছে তবে সে অবাক হইয়া বলে, "টাকা কি কামড়ায়?" সে বুঝিবে কি? দয়া যদি থাকিত তবে সে বুঝিত। যার চোখ আছে সেইত দেখিতে পাইবে। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ যে, অপবিত্র-হৃদয় যে, সে পবিত্রতার আধার ঈশ্বরকে দেখিবে কিরূপে? তার অসাধু চরিত্র হইতে দূষিত বাষ্পের ন্যায় দূষিত চিন্তাই উত্থিত হইয়া তার চক্ষুকে ঢাকিয়া রাখে। আর এক অনিষ্ট এই হয় যে তার চিন্তাকে বিপথে লইয়া যায় ইংরাজিতে যাহাকে bias বলে অর্থাৎ একদিকে ঝোঁক বাড়িয়া যায়। যেমন একটা কলিকাকে যদি সোজা দিকেই গড়াইয়া দেওয়া যায়—যত জোরেই সোজাদিকে গড়াইয়া দাও না কেন সে ঘুরিয়া যাইবেই যাইবে, তেমনি ইন্দ্রিয় পরায়ণ যে তার যত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকুক না কেন সে যদি সোজা পথে ছুটিয়া যাইতে চায় তবুও যেদিকে প্রকৃতির ঝোঁক সেই দিকে ঘুরিয়া যাইবেই। কত বড় বড় পণ্ডিত লোক এই স্থানে মারা পড়ে। আপনার যুক্তি চিন্তাকে নিংড়ে একটা ক্লোন মত খাড়া করিয়া দাঁড় করাইতে চায় কিন্তু তাহা থাকে না—যার যেখানে মরণ সেই দিকে গতি হইবেই।

তত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য যেমন ইন্দ্রিয়-সংযম আবশ্যক তেমনি শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধার অর্থ আস্তিক্যবুদ্ধি। পাঁচটী উপাদানে এই শ্রদ্ধা গঠিত। ১ম। সত্যনিষ্ঠা। কার্য্যে বচনে ও চিন্তাতে সত্যভাব। যে কাজকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস নাই, তা করেন না, তেমন কথা বলেন না তেমন চিন্তাও মনে আনেন না—ইহাই যথার্থ সত্যভাব। ইংরাজিতে একটি ভাব প্রকাশক, মিষ্ট শব্দ আছে:—"humbug" এই "হাম্‌বাগ্" শব্দ সত্যনিষ্ঠাবান কথার ঠিক উল্টো। যার ভাষায়, ব্যবহারে, কার্য্যে অসত্যভাব প্রকাশ পায়, যা আছে তা দেখায় না অথচ যা নাই তাই দেখাইতে চায় এরূপ প্রকৃতির লোককে "হাম্‌বাগ্" বলে। মানুষ সংসারে পরের সঙ্গে কথা বলিবার সময় পরের সঙ্গে ব্যবহার করিবার সময় মনের ভাব গোপন রাখিবার চেষ্টা করে—আপন চরিত্রের উপর একটা আবরণ দিয়া অন্য রকম ভাব দেখায়। কিন্তু শ্রদ্ধা সমন্বিত যিনি—তাঁর ব্যবহারে, কথাতে, কার্য্যে সকল বিষয়েই সত্য ভাব থাকে, কপটতা তাহার মধ্যে পাওয়া যায় না।

২য়। আধ্যাত্মিকতা। অর্থাৎ চরিত্রের মহৎ গুণ লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা। অপরের চরিত্রে যে সাধুতা, যে গুণ থাকে তাহা হৃদয়ে উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। জন ওয়েলেস্‌লি নিজে খুব মহৎ লোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার স্ত্রী সেই মহত্ত্ব বুঝিতে পরিতেন না,—তাঁর স্ত্রীর সেই মহৎ ভাব ধারণ করিবার ক্ষমতা ছিল না; সুতরাং জন ওয়েলেস্‌লিকে তিনি সাধ্যমতে লাঞ্ছনা দিতে ত্রুটি করেন নাই। শ্রদ্ধা সেই লোকের আছে; যার চিত্ত সর্ব্বদা অপরের মহত্ত্ব ধরিতে অপরের গুণ গ্রহণে সক্ষম।

৩য়। গুণরাশি ও গুণবানের প্রতি প্রেম।

৪র্থ। বিনয়। অপরের মহত্ত্ব দেখা ও আপনাকে হীন দেখা। জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট (John the Baptist) যিশুকে দেখিয়া বলিলেন, "আমি ইঁহার পায়ের জুতা খুলিবারও উপযুক্ত নহি"। কি আশ্চর্য্য বিনয়! কি শ্রদ্ধার ভাব! ডাক্তার বেরিনি নামে কলিকাতায় একজন ফ্রেঞ্চ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন; ইনি কলিকাতায় হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি যখন চলিয়া যান তখন অনেকে জাহাজে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান এবং তিনি চলিয়া যাওয়ার জন্য কেহ কেহ দুঃখ প্রকাশ করাতে তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "সূর্য্যের উদয় হইলে চন্দ্রের অস্ত যাওয়াই উচিত। মহেন্দ্রলাল উঠিয়াছেন এখন আমি অস্ত গেলেও ক্ষতি নাই।"—বিনয় না থাকিলে মানুষ অপরের গুণ ধরিতে পারে না; বিনয় না থাকিলে মানুষের হৃদয়ে শ্রদ্ধার ভাব দাঁড়াইতে পারে না।

৫ম। আত্ম সমর্পণের ভাব। সত্যের হাতে সাধুতার হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া। যে দিকে সত্যের গতি দেখিব— সে দিকে সাধুতার স্রোত দেখিব, সেই স্রোতে আপনাকে ছাড়িয়া দিব, সত্যের স্রোতে বাধা দিব না। সাধুতার স্রোতে আত্ম-সমর্পণ করিতে মন প্রস্তুত হওয়া চাই।

যাঁর হৃদয়ে সত্যনিষ্ঠা আছে, যাঁর হৃদয়ে আধ্যাত্মিকতা আছে, যিনি গুণবানের প্রতি প্রেম করিতে জানেন, যাঁর চরিত্রে বিনয় শোভা পাইতেছে, যিনি সাধুতার বিরুদ্ধে—সত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন না বরং তাহাতেই জীবন মন সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দেন, তিনিই যথার্থ শ্রদ্ধাবান পুরুষ—তিনিই যথার্থ শ্রদ্ধাবতী নারী। এই শ্রদ্ধা ঠিক তাড়িত পরিচালক দণ্ডের ন্যায়। ইহা থাকাতে এক আত্মার নৈতিক শক্তি আর এক আত্মাতে যাইতে পারে। এই শ্রদ্ধা না থাকিলে এক হৃদয় হইতে জ্ঞান অপর হৃদয়ে যাইতে

পারে না। জ্ঞান লাভ অপেক্ষা জ্ঞান লাভের স্পৃহা মূল্যবান। যার জ্ঞান লাভের স্পৃহা জন্মে নাই তার জ্ঞান লাভই বৃথা। জ্ঞানের স্পৃহা যার প্রাণে উদ্দীপ্ত হয় সে জ্ঞানের অন্ন চারিদিক হইতে সংগ্রহ করে। এই জ্ঞান স্পৃহা-অগ্নির ন্যায় এক হৃদয় হইতে অপরের হৃদয়ে ছুটিয়া যায়। অপর এক স্পৃহাবান্ হৃদয়ের সংসর্গে না আসিলে এই জ্ঞান-স্পৃহা বাড়ে না। শ্রদ্ধার গুণে এক হৃদয়ের জ্ঞানের প্রতি অনুরাগ দশ হৃদয়ে গিয়া দিন দিন তাহাকে বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। পৃথিবীর সাধু মহাত্মাদিগের প্রতি দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহাদের হৃদয়স্থ সদ্ভাব সকল কেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে; এক হৃদয় হইতে অন্য হৃদয়ে গিয়া জীবন্ত শক্তির ন্যায় কার্য্য করিতেছে।

সক্রেটিস ও প্লেটো, শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরি, জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট ও যিশু, যিশু ও তাঁহার শিষ্যবর্গ প্রভৃতির প্রতি দেখিলে ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সক্রেটিস হেমলক পান করিয়া মরিয়াছেন;—কিন্তু তাঁর হৃদয়ের জ্ঞান কি মরেছে? শুধু প্লেটো নহে—শত হৃদয়ে জীবন্ত অগ্নির ন্যায় সেই জ্ঞান স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। শঙ্করের আশ্চর্য্য জ্ঞান-স্পৃহা আনন্দগিরির প্রাণে এমন আগুন জ্বালিয়া দিয়াছে যে তাহাতে জগৎ লাভবান হইয়াছে; এরূপ কথিত আছে ফ্রান্সে সেণ্ট সাইমন নামে এক ব্যক্তির নিকট আগষ্ট কোমৎ তাঁহার প্রাণের ভাব সকল লাভ করিয়াছিলেন। জন দি ব্যাপটিষ্ট ও যিশুতেও এই ভাব দেখিতে পাই। তার পর যিশু ও তাঁর শিষ্যবর্গ। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই জেলের সন্তান ছিল—কিন্তু তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া এমন জিনিষ প্রাণে পাইয়াছিল যে তাঁহার এক একটি কথা তাহাদের প্রাণে আশ্চর্য্য ধর্ম্মের অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছে। এই শ্রদ্ধা যেথানে বিদ্যমান সেই খানেই মানব আশ্চর্য্য বল লাভ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই যে যাঁহারা জগতে নূতন আলো দিয়াছেন তাঁহারা কেহই কোন পুস্তক লিখেন নাই। বুদ্ধ, মহম্মদ, যিশু, সক্রেটিস, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি যাঁহারা জগতের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও চিন্তাকে আলোড়িত করিয়াছেন তাঁহারা কেহ কিছু লিখেন নাই। তাঁদের গুণে আগে লোক মুগ্ধ হইয়াছে তার পর তাঁদের কথার মূল্য হইয়াছে। মূলে শ্রদ্ধা থাকা চাই তবে উপদেশে কাজ হইবে।

Derozio (ডিরোজিও) নামক একজন ফিরিঙ্গি হিন্দু স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯ বৎসর বয়সে তিনি শিক্ষকতা প্রাপ্ত হন কিন্তু ২২ বৎসর বয়সেই পদচ্যুত হন। কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে ছাত্রদিগের মনে আশ্চর্য্য আধিপত্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিষ্যগণ অনেকেই খুব বড় বড় লোক হইয়াছেন; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ডিরোজিওর নাম তাঁহাদের মন হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। আজও তাঁহাদের নিকট বসিয়া ১৫ মিনিট কাল কথা কহিতে কহিতে ডিরোজিওর নাম কথা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়। ইহার মূল কারণ শ্রদ্ধা, আগে শ্রদ্ধা তার পর উপদেশের মূল্য।

জীবন্ত চরিত্রের সংস্পর্শে না আসিলে এই শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। শুধু উপদেশে ইহা জন্মে না। চরিত্রে চরিত্রে মিলনে শ্রদ্ধা জন্মে। যখন দুটী হৃদয় একত্র হয়, তখন তার মধ্যে একটি যদি জীবন্ত চরিত্রবান হয়, তবে এই শ্রদ্ধা অন্য হৃদয়েও প্রবাহিত হয়। বিধাতা এমন সুন্দর নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে গৃহ ও পরিবারই আত্ম-সংযম ও শ্রদ্ধা শিক্ষা করিবার প্রকৃষ্ট উপায়। গৃহমধ্যে শিশু দেখিতে পায় যে সে যথেচ্ছাচারী হইতে পারে না,—তার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পায় না। কিন্তু পিতা মাতার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইয়া থাকে,—এইরূপে আপনার ইচ্ছাকে বাধা দিতে হয়,—সংযম করিতে হয়, তাহা শিশু শিক্ষা করে। যে শিশু বাড়িতে যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারে,—যখন যাহা চায় তাহাই পায়,—তাহার ইচ্ছার কখন বাধা পড়িতে দেখে না, সে বড় হইয়া আত্মসংযম শিক্ষা করিতে পারে না,—আপনার ইচ্ছা আবশ্যক মত রোধ করিতে পারে না। বিধাতা পারিবারিক বন্ধনে আত্মসংযমের শিক্ষা দিয়া থাকেন। পরিবারেই শ্রদ্ধা শিক্ষা হইয়া থাকে—গৃহেই বিনয় বর্দ্ধিত হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান সভ্যতার সঙ্গে এই একটি অবস্থা দেখিতে পাই যে বাহিরের নানা প্রকার বিষয়ের কথা ও ভাব গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সংবাদ পত্রের ভিতর দিয়া প্রত্যেক গৃহে বাহিরের কত রকম ভাব, কত রকম চিন্তার স্রোত ঢুকিতেছে। আর এ দিকে দেখিতেছি জীবন যাত্রা যত কঠিন হইতেছে, ততই অভিভাবকদিগের কঠোর পরিশ্রম প্রযুক্ত শিশুদিগের শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দিবার সময় ও সুবিধা হইতেছে না। এই দুটি কারণে পারিবারিক শিক্ষার ব্যবস্থা সুসিদ্ধ হইতে পারিতেছে না।

বর্ত্তমানে বিদ্যালয় দ্বারাও আশানুরূপ শিক্ষা হইতেছে না। Day School system থাকাতে, গুরুর সঙ্গে প্রাণের যে যোগ আত্মার যে সম্বন্ধ তাহা স্থাপিত হইতে পারিতেছে না। আমার বোধ হয় যুবকদিগের মনে শ্রদ্ধার অভাবের এই কারণ। এক এক শ্রেণীতে তিন চারিজন করিয়া শিক্ষক পড়ান—দিনের মধ্যে হয়ত এক ঘণ্টা কাল তাঁহাদের সঙ্গে ছাত্রদের দেখা হয় সুতরাং তাহাদের সহিত হৃদয়ের যোগ হয় না। Boarding School এ অনেক ছাত্র একত্রে থাকে, ছাত্রেরা পরস্পর খুব মিশিতে পারে কিন্তু শিক্ষক দিগের সহিত তেমন মিশিবার সুবিধা নাই। বয়ঃজ্যেষ্ঠের সহিত না মিশিলে ভক্তিভাব বর্দ্ধিত হয় না। এই বোর্ডিং স্কুলের আর এক দোষ এই যে তাহাদিগকে জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক স্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া পালন করা হয়। দুদিন পরে যে জগতে মিশিতে হইবে, যে সংসারে ঢুকিতে হইবে তাহা হইতে এরূপ একেবারে বিচ্ছিন্ন থাকা ঠিক নহে। আমার মনে হয় আমাদের প্রাচীন কালের নিয়মই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। গুরুর বাড়িতে অল্প সংখ্যক ছাত্র বাড়ির ছেলের ন্যায় থাকিবে সেখানে থাকিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিবে। গুরুপত্নী গুরুপুত্র প্রভৃতির সহিত থাকাতে পারিবারিক শিক্ষাধীন থাকিবে, জগতের জ্ঞানলাভ হইবে। শুধু পুস্তক পড়িলেই জ্ঞান লাভ হইবে না। অতিথিকে সেবা করা, দুঃখীকে সাহায্য করা, রোগীর শুশ্রূষা করা প্রভৃতি গৃহীর কর্ত্তব্য; সুতরাং এ সকলও শিক্ষার বিষয়। বর্ত্তমানে শিক্ষা ভাল হইতেছে না। শিক্ষকও ছাত্রে প্রেমের যোগ, সাধুতার যোগ, শ্রদ্ধার যোগ হইতেছে না;

তাহাতেই জ্ঞানের স্পৃহা বাড়িতেছে না। শিক্ষকের সঙ্গে প্রেমের যোগ না থাকিলে জ্ঞান জীবন্ত শক্তিরূপে হৃদয়ে কার্য্য করে না।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের পক্ষে জীবনে শ্রদ্ধা বিশেষ প্রয়োজন। যে সকল সত্য এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতেছেন তাহা জীবনে লাভ করা চাই; যদি জীবনে লাভ না হইল যদি কার্য্যে না আসিল তবে সে জ্ঞান থাকায় লাভ কি? অনুতাপ কাহাকে বলে তাহা জানিতে চাই না, কিন্তু অনুতাপ করিতে চাই। ব্রহ্মের সত্তা ও স্বরূপ সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর সুযুক্তি পূর্ণ প্রমাণ সংগ্রহ করিতে সহজেই পারা যায়—তাহা চাহি না—কিন্তু ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া প্রাণে পাইতে চাই। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান যদি কেবল মুখে বা সুযুক্তি পূর্ণ বাক্যে থাকে তাহাতে কোন লাভ নাই। প্রাচীন ঋষিরা বলেছেনঃ—

অপরা ঋক্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ

* * * * * *

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে যদি এই সকল উপদেশ শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া অগ্নির ন্যায় জীবন্তভাবে তাঁহাদের অন্তরে কার্য্য করে তবেই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য সার্থক। শ্রদ্ধারূপ চাবি দ্বারা গুরুর জীবনে যে সাধুতা আছে তাহা খুলিয়া নিজস্ব করিয়া লইতে হবে। অতীতের সিন্দুকের তালা খুলিয়া প্রাচীন কালের সাধু মহাত্মাদিগের চরণতলে বসিয়া তাঁহাদের জীবনের সাধুতা প্রাণে লাভ করিতে হইবে। যখন আচার্য্য বা উপদেষ্টার জীবন্ত সাধুতা আপন আত্মাতে লাভ করিতে সমর্থ হইবে তখন বুঝিতে পারিবে যে ব্রহ্মজ্ঞান পুস্তকে নহে, উপদেশে নহে, জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় জীবন্ত শক্তির ন্যায় হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। এই ব্রহ্মজ্ঞান তোমরা লাভ কর—এই পরাবিদ্যাধনে তোমরা ধনী হও। কিন্তু মনে রাখিও সর্ব্বাগ্রে শ্রদ্ধা চাই।

দোষ কীর্ত্তনের বাতাসে মানুষের শ্রদ্ধা বিনষ্ট করিয়া দিতেছে। ঐ যুবা পুরুষের শ্রদ্ধা জন্মিবে কিরূপে!—ঐ বাড়ির অভিভাবক তাহাদের সম্মুখে এর ওর দোষ কীর্ত্তন করিতেছেন। পিতা মাতারা সাবধান হউন; বালক বালিকার নিকটে এমন সব লোকের দোষ কীর্ত্তন করিবেন না যাহাদের শ্রদ্ধা করা উচিত। ব্রাহ্ম সমাজে ব্রাহ্ম পরিবারে অনেক সময় দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়াছি, যে অপরের চরিত্র লইয়া এমন আলোচনা হইতেছে যে তাহাতে হৃদয়ের শ্রদ্ধার ভাব বর্দ্ধিত না হইয়া আরও ম্লান হইয়া যায়। শ্রদ্ধা মানব চরিত্র গঠনের প্রধান সহায়। তাড়িত পরিচালক দণ্ডের ন্যায় এই শ্রদ্ধা দ্বারাই এক হৃদয়ের সাধুতা প্রেম অন্য হৃদয়ে পরিচালিত হয়। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণ! **এই শ্রদ্ধাকে হারাইও না,—ইহা প্রাণে লাভ করিতে যত্নবান হও।**

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ। ১৮৯০।

বিগত ৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়, ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু মধুসূদন সেন, বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু হীরালাল হালদার, বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু নীলরতন সরকার, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু দুর্গামোহন দাস ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহোদয়গণ এই বৎসরের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৫ জন কর্ম্মচারীও কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার Ex-officio সভ্য আছেন। বার্ষিক অধিবেশনের পর নূতন কমিটি গঠন না হওয়া পর্য্যন্ত পুরাতন কমিটিই সমাজের কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পুরাতন কমিটির ২টী অধিবেশন হইলে পর নূতন কমিটী সংগঠিত হয়। এই কয় মাসের মধ্যে নূতন কমিটীর ৫টী সাধারণ ও একটী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

এবার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন সম্বন্ধে একটী নূতন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন হইতে প্রতি বুধবার এই কমিটির অধিবেশন হইয়া আসিতেছিল এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কতকগুলি বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য কয়েকটী সবকমিটির উপর সেই সকল কার্য্যের ভার দেওয়া হইত। কিন্তু দেখা যাইতেছে বর্ত্তমান নিয়মে সকল সবকমিটির কার্য্য তাদৃশ সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতেছে না। এবারে যাহাতে সবকমিটিগুলির কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত চলিতে পারে এই উদ্দেশ্যে স্থির হইয়াছে যে প্রতি মাসের প্রথম, তৃতীয় ও সম্ভব হইলে, পঞ্চম সপ্তাহে সবকমিটিসমূহের অধিবেশন হইবে এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হইবে এই নিয়মে নূতন কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কার্য্য করিতেছেন। এই জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা এইবার কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন সংখ্যা কম হইয়াছে।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গত ডিসেম্বর মাসে ষষ্টিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এক বিশেষ সবকমিটি সংগঠন করিয়া তাহার হস্তে উৎসব সুসম্পন্ন করিবার ভার দেন। এই সবকমিটি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সহিত পরামর্শ করিয়া এত কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। প্রথমে যেরূপ কার্য্য প্রণালী স্থির হইয়াছিল, পরে তাহার সামান্যরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় এবার উৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে এবার উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের বিশেষ কার্য্য বিবরণ মেসেঞ্জার ও তত্ত্ব-কৌমুদী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উৎসবের কার্য্য প্রণালী এই—

১লা মাঘ (১৩ই জানুয়ারি) সোমবার—ব্রাহ্মপরিবার এবং ছাত্রাবাস সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

২রা ,, ১৪ই ,, মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় উৎসবের উদ্বোধন।

৩রা ,, ১৫ই ,, বুধবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬½ ঘটিকার সময় "রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

৪ঠা ,, ১৬ই ,,	বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন, তৎপরে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।
৫ই ,, ১৭ই ,,	শুক্রবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন,তৎপরে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় "ভারতবর্ষকা ধর্ম্ম-বিষয়ক অভাব" বিষয়ে হিন্দি বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ।
৬ই ,, ১৮ই ,,	শনিবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা। সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় উপাসনা।
৭ই ,, ১৯এ ,,	রবিবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন। তৎপর উপাসনা। অপরাহ্ণে বাহিরে প্রচার। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় উপাসনা (শ্রমজীবীদিগের জন্য উপদেশ)
৮ই ,, ২০এ ,,	সোমবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন তৎপর হিন্দিতে উপাসনা। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ইংরাজিতে উপাসনা।
৯ই ,, ২১এ ,,	মঙ্গলবার—ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলাসমাজের উৎসব। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।
১০ই ,, ২২এ ,,	বুধবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় উপাসক মণ্ডলীর উৎসবোপলক্ষে সঙ্কীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় নগর সংকীর্ত্তন, তৎপর উপাসনা।
১১ই ,, ২৩এ ,,	বৃহস্পতিবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।
১২ই ,, ২৪এ ,,	শুক্রবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সঙ্কীর্ত্তন,তৎপর উপাসনা অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় আলোচনা। অপরাহ্ণ ৩॥ ঘটিকার সময় বালক বালিকা-সম্মিলন। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় ছাত্রসমাজের উৎসব।
১৩ই ,, ২৫এ ,,	শনিবার—প্রাতঃকালে সঙ্গত সভার উৎসব। অপরাহ্ণ ১ ঘটিকার সময় আলোচনা। সন্ধ্যা ৬॥ ঘটিকার সময় "সংস্কারের দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।
১৪ই ,, ২৬এ ,,	রবিবার উদ্যানসম্মিলন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে এবার ব্রাহ্ম বন্ধুগণ আসিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন—

খাসিয়া পাহাড়, ধুবড়ি, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, বাগআঁচড়া, মাগুরা, বড়বেলুন, নলহাটী, ধুলিয়ান, বগুড়া, মানিকদহ, নালী, বরাহনগর, খালোড়, বানিবন, উলুবেড়িয়া; বাগেরহাট, কুমারখালি, হিজলাবট, দেবিগঞ্জ, চন্দ্রভি, রংপুর, কোন্নগর, নেলফামারি, বর্দ্ধমান, জৌগ্রাম, বাঁশবেড়িয়া, জগন্নাথপুর, নওগাঁ, (রাজসাহী), বসিরহাট, জালালপুর, দোগাছিয়া, বিক্রমপুর কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, মাতাবঘর, জাঙ্গিপাড়া-কৃষ্ণনগর, মাধবপুর, বাদুরিয়া, সেনহাটী, নড়াল, শান্তিপুর, বহরমপুর, বালেশ্বর, রামপুরহাট, বিজগ্রাম, পার্ব্বতিপুর, খলিলপুর, ময়মনসিংহ, রসপুর, হরা, বাগনান, বাঁকুড়া, সাতক্ষিরা, মজিলপুর, সমসপুর, বরিশাল, জলপাইগুড়ি, গয়া, মুঙ্গের, আরা, লাহোর, ইন্দোর, ডেরাধুন, চান্দৌসি, কোয়েটা, দশঘরা এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান।

নূতন কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার যে দিন প্রথম অধিবেশন হয়, সেই দিন মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হয় এবং তৎপরে পুরাতন কমিটির হস্ত হইতে নূতন কমিটি কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা সমাজের বিভিন্ন বিভাগের কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও নিম্নলিখিত কয়েকটী সবকমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন;—Business ব্রহ্ম বিদ্যালয়, দাতব্য, প্রেস, পুস্তক প্রচার, লাইব্রেরী, আয়ব্যয় ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার। এবার শিক্ষা কমিটি নামে একটী নূতন সবকমিটি সংগঠিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের সুশিক্ষার জন্য ৩।৪ বৎসর হইতে মফস্বলস্থ বন্ধুদিগের সহিত মাঘোৎসবের সময় আলোচনা হইতেছে। যাহাতে এ বিষয়টী কার্য্যে পরিণত হয় তাহার জন্য এই সবকমিটি গঠিত হইয়াছে।

এবৎসরও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় প্রচারক মহাশয়দিগের কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে অনেক সময় লাগিয়াছে এবং সকল কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এইরূপ স্থির হইয়াছে—এই বৎসরের প্রথম কয়েক মাস পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতায় কার্য্য করিবেন, পরে তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কার্য্য করিবেন; বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পশ্চিম বাঙ্গালা ও ছোট নাগপুরে এই বৎসরের প্রথম কয়েক মাস কার্য্য করিবেন, পরে কলিকাতা ও ২৪-পরগণায় কাজ করিবেন; বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস উত্তর বাঙ্গালা ও পূর্ব্ব বাঙ্গালা; এবং বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মধ্য বাঙ্গালা।

প্রচার—গত বৎসর বাবু চণ্ডীকিশোর কুমারী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক হইবার জন্য আবেদন করেন। প্রচার কমিটি তাঁহাকে পরীক্ষাধীন না করিয়া প্রবেশার্থীরূপে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে প্রচারার্থীরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল;—চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, রামপুরহাট, বরিশাল, কোন্নগর, বরাহনগর, বাঁকুড়া, শিবপুর, হরিনাভি, দিনাজপুর, পিরোজপুর।

প্রচারক মহাশয়দিগের ১ম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ এইরূপ—

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—এই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ সময় কলিকাতায় অবস্থিতি করিয়াছেন। মাঘোৎসবের সময় এখানে "রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। ব্রাহ্মসম্মিলন সভায় সম্মিলনের আবশ্যকতা দেখাইয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। তৎপর ছাত্রসমাজের ১ম অধিবেশনে একটী বক্তৃতা করেন। ২ দিন শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজে গমন পূর্ব্বক আলোচনা ও উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন পূর্ব্বক ২ বেলা উপাসনা করেন এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। কলিকাতায় ৪ দিন চারিটী পরিবারে আলোচনা ও উপাসনা করেন, এবং এক দিন একটী পরিবারে শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনা করেন। বর্দ্ধমানে গমন পূর্ব্বক তথাকার সাম্বৎসরিক উৎসবে ২ বেলা উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। তথা হইতে রামপুরহাটে গমন পূর্ব্বক "বিশ্বজনীন অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম" এবং "ভক্তি ও নাম সাধন" বিষয়ে দুইটী বক্তৃতা করিয়াছেন, এবং ২২ এ ফাল্গুন সায়ংকালে ২৩ এ প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। তৎপর অসুস্থ শরীরে ৩ রা চৈত্র পর্য্যন্ত রামপুরহাটে অবস্থিতি করেন। তথা হইতে অসুস্থ শরীরেই কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। মাঘোৎসবের সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত পুনর্মুদ্রিত করিতে অনেক সময় দিতে হইয়াছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—বিগত তিন মাসের মধ্যে অধিকাংশ কাল কলিকাতাতেই ছিলেন। মাঘোৎসবের সময় "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্" এবং "সংস্কারের দায়িত্ব" বিষয়ে ২টী বক্তৃতা করেন। উৎসবের উদ্বোধন, ইংরেজিতে উপাসনা ১১ই মাঘ দুই বেলা, বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব এবং উদ্যান সম্মিলনের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন। কলিকাতায় অবস্থান কালে মন্দিরে নিয়মিতরূপে উপাসনা করিয়াছেন, ছাত্রসমাজে ৫টী বক্তৃতা করিয়াছেন, এখানকার ইংলিস থিষ্টিক চার্চ্চে উপাসনা করিয়াছেন। এবং কয়েকটী অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করিয়াছেন। মধ্যে একবার বাঁকুড়া সমাজের উৎসব ও মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বাঁকুড়াতে গিয়াছিলেন, তথায় উৎসবোপলক্ষে "নবযুগের নব আকাঙ্ক্ষা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। এবং ১৫ই ফাল্গুন সায়ংকালে ১৬ই ও ১৭ই প্রাতে ও সায়ংকালে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন।

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—মাঘোৎসব আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জানুয়ারী মাসের ১ম তারিখ হইতে বাঘআঁচড়ায় থাকিয়া তথাকার বালক বালিকাদিগের শিক্ষাদান ও ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা সমাজের উপাসনাদি করিয়াছেন। তৎপর মাঘোৎসবে যোগদান করিবার জন্য কলিকাতায় আগমন করেন ও মাঘোৎসবে একদিন উপাসনা করেন। মাঘোৎসবান্তে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিয়া সভা সমিতিতে যোগদান করেন, প্রচারকগণের সহিত আলাপ ও প্রচার কার্য্য প্রণালী এবং প্রচার ক্ষেত্র প্রভৃতি বিষয় লইয়া Conference করেন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সহিত প্রচার কার্য্য সম্বন্ধীয় নির্দ্ধারণে সহায়তা করেন এবং বাঘআঁচড়া প্রচার কার্য্যালয় ও প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে আমাদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে আলাপাদি করেন। এবং হাওড়া ব্যাটরা গ্রামস্থ একটি ব্রাহ্ম ভ্রাতার গৃহে একটী অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। বাঘআঁচড়ার কয়েকটি বালক বালিকার কলিকাতায় থাকিবার সুবিধার্থ চেষ্টা করিয়াছেন। ১লা মার্চ্চ হইতে এই সকল বিষয়ের কোন মীমাংসা করিতে না পারায় একবার বাঘআঁচড়া, বনগ্রাম ও মঙ্গলগঞ্জে বাঘআঁচড়ার বালক বালিকাদিগের শিক্ষাদির সুব্যবস্থা-উদ্দেশ্যে এই সকল স্থানে যাইয়া উপাসনা, সংকীর্ত্তন, ধর্ম্মালাপ করেন এবং বনগ্রামে বাঘআঁচড়ায় এবং অন্যান্য স্থানের বালিকা ও বিধবাদিগের কোন প্রকার আশ্রম ও শিক্ষালয় স্থাপন সম্ভব কি না সে সম্বন্ধে আলাপাদি করেন। উৎসবেরপর সম্প্রতি বাঘআঁচড়ার বালিকাগণ এবং ব্রাহ্মপাড়ার কয়েকটি বালিকাকে প্রত্যহ কিছু কিছু শিক্ষাদান করিতেছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—জানুয়ারীর প্রথমে কোচবেহার ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন। তথায় প্রায় ৮।১০ দিন গত হয়। তাহাতে উপাসনা, উপদেশ প্রদান, পাঠ এবং ব্যাখ্যা ইত্যাদি করিয়াছেন, সমাজে এবং ভদ্রলোকদিগের গৃহে এই সব কার্য্য সম্পন্ন হয়, একদিন একজন সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে সাধারণ লোকদিগকেও কিছু বলেন। তৎপর মাঘোৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় আগমন করেন। মাঘোৎসবে দুই দিন উপাসনা করেন। তৎপর যে সময় কলিকাতা ছিলেন, সেই সময় কোন কোন ব্রাহ্ম পরিবারে প্রায়শঃ উপাসনা করিয়াছেন, এক দিন বরাহ নগর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন তৎপর ভাগলপুরে গমন করেন। এখানে যে কয়েকদিন ছিলেন প্রায় প্রতিদিনই উপাসনা উপদেশ প্রদান ও আলোচনাদি করিতেন এখানে একটী অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। তথা হইতে মুঙ্গেরে গমন করেন এখানেও ৪।৫ দিন থাকিয়া সমাজে এবং পরিবারে ২ উপাসনা, উপদেশ প্রদান ও আলোচনাদি করেন। একদিন জামালপুর ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। তৎপর পুনরায় ভাগলপুরে আগমন করেন। ভাগলপুর হইতে নলহাটী আগমন করেন। এখানেও উপাসনা উপদেশ আলোচনাদি হয়। নলহাটী হইতে বর্দ্ধমান আগমন করেন। এখানেও উপাসনা ও উপদেশাদি হয়। বর্দ্ধমান হইতে পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতা থাকাকালীন পারিবারিক উপাসনাদি হয়, ইহা ব্যতীত শিবপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন বরাহ নগর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন এবং কার্য্য-ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইলে উত্তর বঙ্গে যাইবার সময় কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন, নাটোর ষ্টেশনে উপাসনা করেন এবং নেলফামারীতে উপাসনা করেন।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে পণ্ডিত রামকুমার

বিদ্যারত্ন ও বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয়ের এই তিন মাসের কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই। আমরা যতদূর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে অবগত হইয়াছি যে মাঘোৎসবের সময় এখানে থাকিয়া উপাসনাদি করিয়াছিলেন। পরে রামকুমার বাবু মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, কোন্নগর প্রভৃতি স্থানে গিয়া উৎসবের সময় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। শশি বাবু এই সময়ের মধ্যে অন্য কোথায় গিয়াছেন কি না তাহা জানা যায় নাই—বরাবর কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালী প্রসন্ন বসু মাঘোৎসবের সময় ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া তথাকার মাঘোৎসব সম্পন্ন হইবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছেন। প্রচারক নিবাসে মধ্যে মধ্যে আলোচনা এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে গমনপূর্ব্বক উপাসনা করিয়াছেন। বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া তথাকার সমাজে সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তথাকার মাঘোৎসব সম্পন্ন হইবার পক্ষে সাহায্য করিয়াছেন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে অবস্থিতিকালে ২ খানা খাসিয়া পুস্তক প্রকাশ করেন। পুনরায় খাসিয়া পাহাড়ে গমনপূর্ব্বক তথাকার কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি মৌথার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়া গিয়াছে। তিনি শীঘ্রই চেরাপুঞ্জি প্রভৃতি স্থানে গমন করিবেন। বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত ও কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ও নানাপ্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন।

শিক্ষা কমিটি—শিক্ষা কমিটি সংগঠিত হওয়ার পর উহার প্রথম অধিবেশনে বোর্ডিং স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। পঞ্চাশ জন ছাত্র লইয়া স্কুলের কার্য্য আরম্ভ করিলে কত ব্যয় হইবার সম্ভবনা প্রথমে সেই হিসাব ধরা হয়। এই হিসাবে দেখা যায় যে প্রতি ছাত্রের জন্য সমস্ত ব্যয় মাসে ১১৷৷০ সাড়ে এগার টাকা লাগিবার সম্ভাবনা। কিন্তু একশত ছাত্র হইলে ৯।০ সওয়া নয় টাকা লাগিবে। তবে স্কুল ও ছাত্রাবাসের বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পারিলে জনপ্রতি একটাকা ব্যয় কমিবার সম্ভাবনা। সমস্ত কার্য্যের সুশৃঙ্খলা সাধন করিতে পারিলে ব্যয়ভার আরও একটাকা কমান যাইতে পারে। কিন্তু তাহা করিতে হইলে কিছু মূল ধনের প্রয়োজন। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে এই বোর্ডিং স্কুল সংস্থাপন হইতে পারে, সম্পাদক একটী অতি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়া উহা পাঠ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে পূর্ব্ব বারের লিখিত হিসাব এই সভায় বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। এই অধিবেশনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, প্রতি ছাত্রের মাসিক ব্যয় গড়ে সাত টাকার অধিক হইলে এই বোর্ডিং স্কুল স্থাপন করা অতিশয় কঠিন হইবে। কেবলমাত্র ৫০ জন ছাত্র হইলে ন্যূনকল্পে দশটাকা ব্যয় হইবে। অন্যূন একশত ছাত্র হইলে এবং সমস্ত সুশৃঙ্খলা করিতে পারিলে, সাত টাকা ব্যয়ে কার্য্যনির্ব্বাহ করা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বালক বালিকাদের মিশ্র বিদ্যালয় সংস্থাপন করা প্রার্থনীয় কি না, এবং তাহাদের শিক্ষা একাকার হওয়া উচিত কি না, তাহা আলোচনা করিবার জন্য ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাদিগের অনেককে লইয়া একটী আলোচনা সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব হইয়া এই অধিবেশনের কার্য্য শেষ হয়।

তৃতীয় অধিবেশনে ইহা অবধারিত হয় যে, অন্য কোন প্রকারে অগ্রে কিছু আয়ের সংস্থান করিতে না পারিলে বোর্ডিং স্কুল সংস্থাপন করা আপাততঃ সম্ভবপর হইবে না। সম্পাদক পুস্তক প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিয়া কিছু আয়ের সংস্থান করিবার জন্য একটী পুস্তক প্রণয়ন কমিটী সংস্থাপন করিবার যে প্রস্তাব প্রথম অধিবেশনে তাঁহার পঠিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার কতদূর সম্ভাবনা আছে এবং অন্যোপায়েও অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে কি না, তাহা দেখিবার নিমিত্ত সম্পাদকের উপর ভার সমর্পণ করিয়া সভার কার্য্য শেষ করা হয়। পুস্তক প্রণয়ন কমিটী সংগঠন করা সম্ভবপর কি না, তাহা গুডফ্রাইডের ছুটির সময় অবধারণের চেষ্টা করা যাইবে। শিক্ষা কমিটী যথারীতি সংগঠিত হইবার পূর্ব্বে, যিনি এক্ষণ সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন, তিনি বোর্ডিং স্কুল সংস্থাপনের পক্ষে বিশেষ ব্যগ্র এমন কতিপয় ব্যক্তির নিকট হইতে এই অঙ্গীকার লাভ করিয়াছেন যে, এই বোর্ডিং স্কুলের জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকে নিজের এক মাসের আয় প্রদান করিবেন। যাহা এ পর্য্যন্ত স্বাক্ষরিত হইয়াছে তাহাতে ন্যূন পক্ষে ২২ শত টাকা পাইবার সম্ভাবনা। এই হারে সকল কিম্বা অধিকাংশ ব্রাহ্ম সহায়তা করিতে সম্মত হইলে বোর্ডিং স্কুলের আবশ্যক গৃহাদি নির্ম্মাণ ও অপরাপর বন্দোবস্তের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ অনায়াসেই করা যাইতে পারে।

সঙ্গত সভা—সঙ্গত সভার জানুয়ারি মাসে ১টী ফেব্রুয়ারিতে ৩টী ও মার্চ্চ মাসে ৩টী অধিবেশন হইয়াছিল। সকল অধিবেশনেই উপাসনা ও আলোচনা হইয়াছে। উৎসবের পর অধিক সভ্যের সমাগম হয় নাই। ৭।৮ জন সভ্য উপস্থিত থাকিয়া আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত তিন মাসে নিম্ন লিখিত বিষয় গুলির আলোচনা হইয়াছিল। জন্মগত পাপ—যাহাতে খৃষ্টানেরা বিশ্বাস করেন, তাহা ঠিক কিনা; অলসতা ও নিরাশা; শুষ্কতা ও সরস ভাব; ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি ও কিরূপে হয়।

দাতব্য বিভাগ—নূতন কমিটী গঠিত হইলে প্রথম যে দিন সভা ডাকা হয় সে দিন উপযুক্ত সংখ্যক সভ্য উপস্থিত না হওয়ায় সভার কার্য্য হয় নাই, তৎপরে একটী মাত্র অধিবেশন হইয়াছে। কিন্তু টাকা সংগ্রহের বিশেষ কোন সুব্যবস্থা এখনও হয় নাই।

দাতব্য তহবিল হইতে ৪টী ছাত্রকে এবং ৭টী নিরাশ্রয় পরিবারকে মাসিক সাহায্য করা হইতেছে। এবং একটী ছাত্রের বি,এ, পরীক্ষার ফিস দিবার জন্য ১০ টাকা দেওয়া হইয়াছে। জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ্চ এই তিন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ এই—

আয়		ব্যয়	
এককালীন দান আদায়	২৬।৵০	এক কালীন দান	১০৲
মাসিক চাঁদা আদায়	৪৲	মাসিক দান	৪৩৷৷০
বার্ষিক চাঁদা আদায়	২১৲		
			৫৩৷৷০
	৫১।৵০	স্থিত	১০৫/১০
পূর্ব্ব স্থিত	১০৭৶১০		
			১৫৮৷৷/১০
	১৫৮৷৷/১০		

আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় কমিটি—এই কমিটী গঠনের পর কমিটির দুইটী অধিবেশন হইয়াছে। প্রথম অধিবেশনে কয়েক বৎসরের আয় ব্যয়ের আলোচনা হয়। তৎপর সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের কলিকাতা এবং মফস্বলস্থ সভ্যগণের নিকট বর্ত্তমান বর্ষ পর্য্যন্ত প্রাপ্য এবং প্রচার ফণ্ডের জন্য প্রাপ্যের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটী হিসাব প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়। ২য় অধিবেশনে কলিকাতার হিসাব পঠিত হইয়া স্থির হইয়াছে কমিটীর সভ্যগণ আয় বৃদ্ধির জন্য চাঁদাদাতাগণের নিকট গমন করিবেন।

প্রচার কমিটি—প্রচার কমিটীর একটী অধিবেশনে বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয়কে পরীক্ষাধীন না করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রবেশার্থী প্রচারকরূপে গ্রহণ করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় অনুরোধ করিবার প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ব্রাহ্ম মিশন প্রেস—ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশে ব্রাহ্ম মিশন প্রেস এবং মেসেঞ্জারের কার্য্য সম্পন্ন সম্বন্ধে গত বৎসরের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণে যেরূপ ব্যবস্থা করিবার কথা ছিল, গত ফেব্রুয়ারি মাস হইতে তদনুসারে কার্য্য চলিতেছে। এই সময়ের মধ্যে প্রেসে ৮০২৲ টাকার কাজ হইয়াছে। ৪৬৮|৵০ আদায় হইয়াছে। নানাপ্রকারে ৬৫২|৵০ টাকা খরচ হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার ও তত্ত্ব-কৌমুদী—এই দুই পত্রিকা সম্পাদন সম্বন্ধে পূর্ব্ব বন্দোবস্তের কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। মেসেঞ্জারের আর্থিক অসচ্ছলতা দূর করিবার জন্য এ বৎসরও আর একটী কমিটী গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কিছুতেই ইহার অভাব ঘুচিতেছে না। তত্ত্ব-কৌমুদীর আর্থিক অবস্থা মন্দ না হইলেও বিশেষ উন্নতি লাভ করিতেছে না।

পুস্তক প্রচার কমিটি—এই কমিটি গঠনের পর দুইটী অধিবেশন হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস বিষয়ে ইংরেজি একখানি গ্রন্থ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পাকারে সদুপদেশ দানের জন্য ৪।৫ খানি গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত করিবার জন্য কয়েক জনের প্রতি ভার দেওয়া হইয়াছে। নব বর্ষোপলক্ষে ইহার দুই তিন খানি পুস্তক প্রকাশিত হইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রেসের কর্ম্মচারীগণের পীড়া নিবন্ধন সে চেষ্টা আপাততঃ পরিত্যাগ করা গিয়াছে। অনুষ্ঠান পদ্ধতি এবং নানা গ্রন্থ ও তত্ত্বকৌমুদী হইতে সঙ্কলনপূর্ব্বক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইবে।

ব্রহ্ম বিদ্যালয় এবং উপাসকমণ্ডলীর কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে, ছাত্রসমাজের কার্য্য কিছু দিন চলিয়া স্কুল, কলেজ প্রভৃতির পরীক্ষার জন্য বন্ধ আছে। রবিবাসরিক বিদ্যালয়ের কার্য্য মধ্যে ২ সপ্তাহ বন্ধ থাকিয়া আবার নিয়মিতরূপে কার্য্য চলিতেছে। লাইব্রেরির জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তাঁহারা বিশেষ আয়োজনের সহিত কার্য্যারম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল কমিটির কার্য্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়		ব্যয়	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের চাঁদা	৩০৭|/৫	প্রচার ব্যয়	৫৫৬৶১
বার্ষিক চাঁদা ২১৭৷৷৵০		কর্ম্মচারীর বেতন	৭৭৷৷০
মাসিক ৩৮৷৷৶৫		ডাকমাসুল	৩৲১০
এককালীন প্রাপ্ত ৩৩৲		পাথেয় হিঃ	৭৩৸১০
শুভকর্ম্মোপলক্ষে ১৮৲		মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	৫৲
	৩০৭|/৫	প্রচারক গৃহ হিঃ	১৩০৸/০
প্রচারফণ্ডের চাঁদা	২৭৮৲	কমিশন দান	৵০
বার্ষিক চাঁদা ২৯৲		সুদ হিঃ	১২৷৷৶১৫
মাসিক ঐ ২২০/০		পরলোক গতা সরলা মহলানবীশ ফণ্ড হইতে ধার দেওয়া হয়	১০০৲
এককালীনপ্রাপ্ত ২৮৸৶		গরীব ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দান	৮২৷৷০
	২৭৮৲	বিবিধ	৩০|৶০
পাথেয় হিঃ	১৬৲		১০৭২৵৫
প্রচারক গৃহ হিঃ (বাড়ীভাড়া)		হাওলাত শোধ	২৭৲
দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য সিটী স্কুল হইতে প্রাপ্ত	৮২৷৷০		১০৯৯৵৫
	৭৭৪৸/৫	স্থিত	১৮১|৫
হাওলাত হিঃ প্রচারক গৃহ ১৩৮ জেনারেল ২১২৶০	৩৫০৶০	মোট	১২৮০|৵১০
	১১২৫৲৫		
পূর্ব্ব স্থিত	১৫৫|৵৫		
মোট	১২৮০|৵১০		

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব

আয়		ব্যয়	
পুস্তকের বাকী মূল্য আদায়	৮০৲১০	পুস্তক বাঁধাই	৫৯৲
নগদ বিক্রয়	৬২৭৷৷১৫	কমিশন	১৩/১৫
সমাজের ৩৩৩৸৶১০		পুস্তকের ডাঃ মাঃ	১৩৸৶
অপরের ২৯৩৷৷/৫		ডাক মাশুল	৶১৫
৬২৭৷৷১৫		কর্ম্মচারীর বেতন	২১৲
পুস্তকের ডাঃ মাশুল	৯৸৶০	কাগজ	১৩৷৷০
কমিশন	৩৪৷৷/১০	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য	১৪৮|৵১৫
	৭৫২৵১৫	বিবিধ হিঃ	৩৩৲১৫
গচ্ছিত হিঃ	১৩৸/০		৩০২|০
	৭৬৫৸৶১৫	স্থিত	২৭৪৪৸৵০
পূর্ব্ব স্থিত	২২৮১৵৫	মোট	৩০৪৭৵০
মোট	৩০৪৭৵		

তত্ত্বকৌমুদী

আয়		ব্যয়	
মূল্যপ্রাপ্তি	২২৪।/১০	মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	৫৭৲
নগদ বিক্রয়	২।৵০	কাগজ	৩৭॥০
বিজ্ঞাপন হিঃ	১৲	ডাকমাসুল	৩৭৸৵১০
		কমিশন	৸৵০
	২২৭॥৶১০	কর্ম্মচারীর বেতন	৩০৲
গচ্ছিত	৩২৲	বিবিধ	৯॥৶০
পূর্ব্বস্থিত	১২৯৩৻৫		
মোট			১৭২৸৶১০
	১৫৫২॥৶১৫	স্থিত	১৩৭৯৸৫
		মোট	
			১৫৫২॥৶১৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্যপ্রাপ্তি	২৩৫৸/০	ডাকমাসুল	১০৬।/০
বিজ্ঞাপন	৭।০	কাগজ	৪৭॥০
নগদ বিক্রয়	৶০	কর্ম্মচারীর বেতন	৫১॥০
		মুদ্রাঙ্কণ	৩০৲
	২৪৩।০	কমিশন	১।৵০
পূর্ব্বস্থিত	২০৭৸৫	বিবিধ হিঃ	১০৻১০
মোট			২৪৬॥৶১০
	৪৫১৻৫	স্থিত	২০৪।১৫
		মোট	
			৪৫১৻৫

ষষ্টিতম মাঘোৎসবের আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব।

চাঁদা সংগ্রহ	৪০৩/১০	উদ্যান সম্মিলনের ব্যয়	১৮৩৶৫
১১ই মাঘের জন্য বিশেষ দানপ্রাপ্তি		বাটী ভাড়া	৫০৲
মাঃ অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায়	৬০৲	বিছানা খরিদ	৪৬॥৵০
দান সংগ্রহ	২৬৸৶৫	বিছানা ভাড়া	৯৲
উদ্যান সম্মিলনের জন্য বিশেষ দান প্রাপ্তি	১৮৩৲	পুলিশের ব্যয়	১০৲
উদ্বৃত্ত জিনিষ বিক্রয়	৪॥৵০	পাথেয়	৪৲
হাওলাত জমা	৫৭॥১০	ঘর প্রস্তুত	১৯॥৶১০
		বালকবালিকা সম্মিলনের ব্যয়	২৭॥০
		সংকীর্ত্তনের ব্যয়	১৩॥০
		মন্দির সাজান	৮৲
	৭৩৫৶৫	অতিথিগণের আহার ও বিবিধ ব্যয়	৩১৩॥৵১০
		আলো	৩০৲
		মুদ্রাঙ্কণ	২০৲
			৭৩৫৶৫

ব্রাহ্ম সমাজ।

শ্রাদ্ধ—বিগত ৬ই এপ্রিল রবিবার ১৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পালের পরলোকগতা পত্নীর শ্রাদ্ধক্রিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। পরলোকগতা মহিলা কলিকাতা ও ভারতবর্ষের অপরাপর স্থানের ব্রাহ্মমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিতা, এবং ইহার অকাল মৃত্যুতে অনেকে শোক সন্তপ্ত হইয়াছেন। ইনি একটী হিন্দু বালবিধবা ছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া ইনি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনিই ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া বোম্বাই নগরে বিপিন বাবুর সহিত বিবাহ দেন। বিপিন বাবু তখন মান্দ্রাজে কর্ম্ম করিতেন। বিবাহের সময় হইতে ইনি সর্ব্ববিষয়ে নিজ পতির সহায় ও উৎসাহদাতা ছিলেন। বিগত ১৭ই ফেব্রুয়ারি সোমবার সামান্য এক দিনের জ্বরে ইহার মৃত্যু হয়। ঈশ্বর শোকার্ত্ত পরিবারকে সান্ত্বনা করুন, পরলোকগতা আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন।

বিগত ১০ই এপ্রেল বৃহস্পতিবার প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু রজনী নাথ রায়ের ভবনে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা পরলোক গত নন্দকুমার রায়ের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। যে ভাবে নন্দকুমারের মৃত্যু ঘটনা হইয়াছে তাহা অতি শোচনীয়। ইনি ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতাতে স্বাধীন ভাবে বসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় চালাইবেন বলিয়া তদনুরূপ আয়োজন করিতেছিলেন, ইতি মধ্যে হঠাৎ এক দিন প্রাতে শোনা গেল যে, তিনি রাত্রিকালে হঠাৎ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাকে হাঁসপাতালে লওয়া হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে তাঁহার শরীর কিছু দিন হইতে অসুস্থ ছিল, রাত্রে নিদ্রা হইত না; সে জন্য কিছু দিন হইতে রাত্রিকালে আফিংয়ের আরক খাইতেছিলেন। সে দিন রাত্রে বোধ হয় ভ্রান্তিক্রমে অতিরিক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া থাকিবেন। তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারা গেল না। এক বিধবা বালিকা পত্নী ও দুইটী অপগণ্ড শিশু রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন। ঈশ্বর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন ও পরলোক গত আত্মাকে শান্তিতে রক্ষা করুন।

বিবাহ—বিগত ৮ই এপ্রেল মঙ্গলবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে একটী ব্রাহ্ম বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রটীর নাম শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বসু বি, এ, বয়ঃক্রম ২২ বৎসর; পাত্রীর নাম সুশীলা চট্টোপাধ্যায় বয়ঃক্রম ১৯ বৎসর। ইনি আমাদের ভূতপূর্ব্ব বগুড়াস্থ চিকিৎসক শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালি ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২রা বৈশাখ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
২য় সংখ্যা।

১৬ই বৈশাখ সোমবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য
মফস্বলে ৩.
প্রতি খণ্ডের মূল্য

ব্রহ্ম-শক্তি।

শুভ লগ্নে এ হৃদয়ে যে সংকল্প জাগে,
কেন তাহা তথা না দাঁড়ায়?
কি আছে আমাতে যাহে সে আশার সেতু
গোপনেতে ধুয়ে লয়ে যায়?

মনো-রাজ্যে বসি একা কত ভাঙ্গি গড়ি,
মনে বাঁধি কতই কোমর!
এবার উঠিনু স্বর্গে বলি—লাফ দিয়ে
দেখি আছি ধরারি উপর।

আকাঙ্ক্ষাটা ছুটে বড়, প্রাণটা উঠে না;
কি পাথর বাঁধা যে চরণে।
দোটানে জীবন গেল; শ্রান্ত দেহ মন,
হেরে যাই দুরন্ত সাধনে।

আছ কোথা ব্রহ্ম-শক্তি! উরগো হৃদয়ে,
প্রতিজ্ঞাতে কর অধিষ্ঠান!
আকাঙ্ক্ষা জীবন মিলে যাক্ এক হয়ে,
শান্তি পা'ক শ্রান্ত মন প্রাণ।

এসগো আত্মার রথে হওগো সারথি
প্রকৃতির মুখে রশ্মি দিয়ে;
ব্রহ্ম-কৃপা-পথে নিজে চালাও আমারে
এ বিবাদ যাক্‌গো ঘুচিয়ে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সাধনে দৃঢ়তা—এখনকার বাতাসটাই যেন ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল নয়। পুরাতন ভাঙ্গিয়া নূতন গড়িবার সময় সকল বিষয়েই সন্দেহ ও বিতর্কের ছায়া পড়ে; সকল বিষয়েই গুণ দোষ বিচারের প্রবৃত্তি দেখা যায়; সুতরাং এখন যদি একজন সাধন করিতে বসেন, সেরূপ করিবার ফল কি? দশজনে এইরূপ প্রশ্ন করিবে। পাঁচ জনে হয়ত উপহাস বিদ্রূপ করিবে; কেহ হয়ত বলিবে অমুক এবার ছালা বাঁধিয়া ধর্ম্ম সংগ্রহ করিয়া লইবে। বিশেষতঃ যাহারা সাধন বিষয়ে শিথিল তাহারা বিশেষভাবে কটাক্ষ করিবে। ব্রাহ্মদের নূতন সাধন পথে এই সকল বিঘ্ন। ইহার মধ্যে বিশেষ প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ভিন্ন কেহ সাধন করিতে পারিবেন না। উপাসনা ও আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থাতে যে সাধনের পথ দেখিতে পাইবে, চক্ষুকে অন্ধ ও কর্ণকে বধির করিয়া তাহাতে লগ্ন হও। কলিকাতাতে যখন প্রতি গৃহে কূপ ছিল তখন কূপ হইতে ঘটী তুলিবার জন্য এক শ্রেণীর ডুবুরি রাজপথে প্রায় দেখা যাইত। ঘটী কি অন্য কোন দ্রব্য কূপের মধ্যে পড়িয়া গেলে তুলিবার জন্য যখনই ডুবুরিদিগকে ডাকা হইত, তখন তাহারা কাণে তৈল দিয়া কূপের মধ্যে নিমগ্ন হইত, জিজ্ঞাসা করিলে বলিত কাণে তেল দিলে জল যাবে না।" ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধক ও জনকোলাহলের প্রতি কর্ণকে বধির করিয়া অবলম্বিত সাধন পথ অবলম্বন করিবেন। সাধনের দৃঢ়তা দেখিলেই তবে ক্রমে ক্রমে লোকের মন তাঁহার দিকে ফিরিবে।

ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষা—ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম সমাজের ভাব কিরূপে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদের মনে বদ্ধমূল হইতে পারে? যদি বদ্ধমূল না হয় তাহার ফল কি হইবে? বর্ত্তমান সময়ে নিত্য নিত্য নূতন এক একটা তরঙ্গ উঠিতেছে। নানা প্রকার চিন্তা ও ভাবের স্রোত যুবক যুবতীগণের বিকাশোন্মুখ হৃদয়ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে। সেই সকল স্রোতের মধ্যে ব্রাহ্ম বালকবালিকাগণ কোন্ বলে প্রতিকূল স্রোত সকলকে বাধা দিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মত বিশ্বাস ও ভাবসকলকে রক্ষা করিবে? এক মাত্র সুদৃঢ় বিশ্বাসের বলেই রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু সেই বিশ্বাসের দৃঢ়তা বিধানের কি উপায় করা হইতেছে? দেখিতেছি এই সকল স্রোত ও তরঙ্গের আঘাতে অতি প্রাচীন লোকও স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। যিনি বিশ বৎসর উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম হইয়া কত কষ্ট সহিয়াছেন, তিনি হয়ত পুনরুত্থানকারী হইয়া বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সাহায্যে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতেছেন; আজ যে গোঁড়া ব্রাহ্ম কল্য সে গোঁড়া হিন্দু; আজ যে জাতিভেদের উন্মূলন-প্রয়াসী কল্য সে জাতিভেদের পক্ষপাতী। এইরূপে দেখিতেছি নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মতির স্থিরতা নাই; মানুষগুলো যেন দাঁড়াইবার জমি পাইতেছে না; আন্দোলনের

তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে। ইহার মধ্যে ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণ যে ব্রাহ্মধর্ম্মে সুস্থির থাকিবে তাহার নিশ্চয়তা কি? ব্রাহ্মধর্ম্মকে তাহাদের মনে সুন্দররূপে প্রোথিত করিবার জন্য কি উপায় করা হইতেছে?

সদুপায়—একটা উপায় আছে। আমরা যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলি, যথাসাধ্য সন্তানদিগকে তাহা দিবার চেষ্টা করা। দেশমধ্যে এখন যে শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার স্রোতে আমাদের সন্তানদিগকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া না দিয়া রীতিমত নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা উচিত। ব্রাহ্মেরা অধিকাংশই দরিদ্র,ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা ব্যয়সাধ্য,সুতরাং তাঁহাদের সাধ্যের অতীত; তাহা আমরা জানি, কিন্তু আমাদের যেরূপ সঙ্গতি তদনুরূপ ভাবেই কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে,নতুবা উপায় নাই। রীতিমত নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার প্রকৃত উপায় বিধান না করিবার অনিষ্ট ফল আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। ব্রাহ্ম বালকদিগের ত কথাই নাই, তাহারা গৃহে বিশেষভাবে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা লাভ করিতেছে না,অথচ ওদিকে বাহিরে সাধারণ বালকমণ্ডলীর সহিত মিশিয়া বিপরীত শিক্ষা পাইতেছে। ইতিমধ্যেই দেখা যাইতেছে তাহাদের অনেকের ভাব ও আকাঙ্ক্ষা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে। ইহারা যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইবে, তখন ব্রাহ্মসমাজ আর ইহাদের সাহায্যের আশা করিতে পারিবেন না। কাহারও কাহারও নীতি এত শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, যে ব্রাহ্মের সন্তান বলিয়া লোকের উপহাসের পাত্র হইতেছে। কন্যাগুলি অনেক যত্নে প্রতিপালিত হইতেছে, বিকৃত সংসর্গে মিশিতে পারিতেছে না, সুতরাং তাহাদের স্বভাব চরিত্র ভাল থাকিতেছে, কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকাতে তাহাদের হৃদয়েও ধর্ম্মানুরাগ প্রজ্বলিত দেখা যাইতেছে না। এই সকল বালক বালিকা যখন সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে, সে সকল গৃহে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নাম যে থাকিবে তাহার আশা কি? এই জন্য স্বতন্ত্র নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিবার জন্য ত্বরায় প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্ম-পরিবার—এই সকল প্রশ্ন উপস্থিত হইলেই ব্রাহ্ম-পরিবারগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আমরা আজিও ব্রাহ্মধর্ম্মকে পরিবার মধ্যে ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি নাই। অনেক ব্রাহ্ম-পরিবারে পারিবারিক উপাসনার নিয়ম নাই, এমন কি অনেকে নিত্য উপাসনাও করেন না। যে কতিপয় লোক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন ও ইহাকে পরিত্রাণের সাধন বলিতেছেন, তাঁহাদেরই জীবনে যখন ইহা দৃঢ়ভাবে বসিল না, ঈশ্বরোপাসনা যখন তাঁহাদের গৃহেই স্থান পাইল না, তখন তাঁহারা কি প্রকারে আশা করিতে পারেন যে ইহা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া বসিবে? আমাদের পরিবারগুলি যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্র হইত, তাহা হইলে বালকবালিকাদের জন্য বিশেষ ভাবিতে হইত না। পরিবার মধ্যে তাহারা ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতেছে না বলিয়াই তাহাদের ভবিষ্যতের জন্য এত চিন্তা করিতে হইতেছে।

ঋণী ব্রাহ্ম—ব্রাহ্ম কি ভাবে ঋণ করিবেন ও কি ভাবে ঋণ শোধ দিবেন এ বিষয়ে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অনেক ব্রাহ্মের আচরণ বিষয়ে লোকের মুখে অভিযোগ শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। একজন ব্রাহ্মের যেরূপ আয়ের উপায় নাই, তদধিক ঋণ করিতে হয়ত তিনি কুণ্ঠিত নন; একজন ব্রাহ্মের পাওনাদার হাঁটাহাঁটি করিতেছে, আজ কাল পরশু করিয়া মাসের পর মাস যাইতেছে, অথচ তাহার নিজের ব্যয় সঙ্কোচের দিকে দৃষ্টি দেখা যাইতেছে না; যেরূপ আরামে ও বিলাসে চিরদিন ছিলেন, তাহার কিছুই ত্রুটী হইতেছে না; একজন ব্রাহ্ম নিজের দেনাদারদিগের নিকট নিজের প্রাপ্য আদায় করিতে বিলক্ষণ পটু, দিতে দুই দিন বিলম্ব হইলে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন,কিন্তু নিজের দেয়গুলি দিবার দিকে দৃষ্টি নাই। এইরূপ নানা প্রকার নিন্দা শ্রবণ করা যাইতেছে। আমরা জানি ব্রাহ্মদিগের অনেকের যেরূপ অল্প আয়, যেরূপ টানাটানি করিয়া তাঁহাদিগকে চালাইতে হয়, তাহাতে বিপদ আপদ কিছু উপস্থিত হইলেই ঋণ না করিলে চলে না। ঋণ অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য। কিন্তু ঋণ সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত নীতি কি তাহা একবার চিন্তা করা আবশ্যক। আপনার আয়ের মধ্যে আপনাকে সংযত করিতে বিশেষ মানসিক বলের প্রয়োজন; বিশেষ সতর্কতা ও মিতব্যয়িতার আবশ্যক; ব্রাহ্মদিগের নিকট সেই মানসিক বলের আশা যদি না করা যায়, তবে কোথায় করা যাইবে? ঋণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটী নীতি স্মরণ রাখিতে পারিলে আমাদের উপকার হইতে পারে।

১। যে ঋণ শোধ করিবার কোন উপস্থিত উপায় বা নিশ্চয়াত্মক আশা নাই—সে স্থলে ঋণ করা নীতিবিরুদ্ধ।

২। যে ব্যক্তি ঋণজালে এরূপ জড়িত যে কোন নূতন ঋণ শোধ করা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসাধ্য বলিলে হয়, তিনি যদি সে অবস্থা গোপন করিয়া ঋণ করেন তাহা নীতি বিরুদ্ধ। মনে কর "ক" ৫০৲ টাকা মাত্র বেতন পান, তাহার মাসিক ব্যয় বাদে ৫টী টাকাও উদ্বৃত্ত হয় না। অথচ তাঁহার আর দশ স্থানে ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা ঋণ আছে। তিনি নিশ্চয় জানেন আবার যে ২০৲ টাকা ঋণ করিতে যাইতেছেন, তাহা ৫ মাসে শুধিবার উপায় নাই, অথচ যদি ৫ মাসে শোধের আশা দিয়া ঋণ করেন তাহা নীতি বিরুদ্ধ।

৩। যে সকল আয়ের বিষয়ে কিছুই স্থিরতা নাই, তাহার আশা দেখাইয়া ঋণ করা নীতিবিরুদ্ধ।

৪। প্রকৃত অভাব লুকাইয়া রাখিয়া আর এক অভাব জানাইয়া ঋণ করা নীতি বিরুদ্ধ। একজন বালক রঙ্গভূমিতে যাইবে, হাতে অর্থ নাই, একজন বন্ধুকে বলিল আমাকে একখানা গ্রন্থ ক্রয় করিতে হইবে,দুইটা টাকা দেও। ইহা প্রতারণা, সে ব্যক্তি যদি জানিত রঙ্গভূমিতে যাইবে তাহা হইলে হয়ত ঋণ দিত না।

৫। যে ব্যক্তি ঋণ করে অথচ শোধ করিবার জন্য উদ্বিগ্ন

হয় না, নিজের ব্যয় সংকোচ করিবার প্রয়াস পায় না, সতর্কতা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বন করে না, সে লম্বা চৌড়া যতই কথা বলুক না কেন, তাহার বিবেক মলিন, ও তাহার চরিত্র হীন।

অদ্য এই পর্য্যন্ত, এ বিষয়ে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় ইহাই প্রার্থনীয়। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে আরও আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

সৌজন্য—সৌজন্যে মানুষের কিছুই ব্যয় হয় না পরন্তু লাভ অনেক হয়। অনেকের একটুকু বুদ্ধি না থাকাতে সমুচিত শাস্তি পাইতে হয়। এক ব্যক্তি তোমার নিকট অনেকগুলি টাকা পাইবে, সে জন্য পাঁচমাস হাঁটাহাঁটি করিতেছে; দরিদ্র লোক, টাকাগুলি তাহার প্রাপ্য, তুমি ইচ্ছা করিয়া দিবে না; সে গুলি না পাওয়াতে তাহার বিশেষ ক্লেশ হইতেছে; সে তোমার দ্বারে টাকাগুলির জন্য উপস্থিত; তুমি এমনি অশিক্ষিত ও বর্ব্বর যে তুমি তাহাকে অপমানসূচক ভাষা বলিলে, অপমান করিয়া দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিলে, তোমার দ্বারে দ্বারবান আছে বলিয়া অর্দ্ধচন্দ্র দিতে আদেশ করিলে, ফল এই হইল, যে সে ব্যক্তি যদিও অগ্রে আরও দুই মাস অপেক্ষা করিবার সংকল্প করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু তোমার দ্বার হইতে গিয়া পরদিনেই আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল, এবং তোমার কাণে পাক দিয়া সুদে আসলে, খরচা সমেত টাকা আদায় করিয়া লইল। তুমি যদি তাহাকে দুইটা মিষ্ট কথা বলিতে ও ভদ্রলোকের ন্যায় নিজ অবস্থা জানাইতে, অর্থ দিতে পারিতেছ না বলিয়া দুঃখ ও লজ্জা প্রকাশ করিতে, তাহাতে কি তোমার কিছু ব্যয় হইত? পদগৌরব কিছু নষ্ট হইত? সৌজন্যে যে কাহারও পদগৌরব নষ্ট হইয়াছে তাহা আজিও শুনি নাই। কিন্তু কোন কোন লোকের মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত যে এ সামান্য বুদ্ধি টুকুও তাঁহাদের যোটে না। সৌজন্য শিক্ষার ভূষণ স্বরূপ; যাহার সৌজন্য নাই সে মহাপণ্ডিত হইলেও অশিক্ষিত ও বর্ব্বর লোক।

পরনিন্দা—আত্মদোষের অনুসন্ধান ও তৎপ্রতিকার করিতে গেলেই, মানুষকে অনেক সুখপ্রদ আচরণ পরিত্যাগ করিতে হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত পূর্ব্বাগত অভ্যাস সকল পরিত্যাগ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে হয়, সেরূপ চেষ্টা বড় প্রীতিকর নহে, সুতরাং নিজ দোষ অনুসন্ধান অপেক্ষা পর দোষ অনুসন্ধানে লোকের স্বভাবতই অধিক প্রবৃত্তি দেখা যায়। যে সময় ও শক্তি সে আত্মদোষ দর্শনে প্রয়োগ করিত, সেই সময় ও চেষ্টা পরের দোষ দর্শনে প্রয়োগ করিয়া সে কেবলই পরদোষ দর্শন করিতে থাকে। নিজ সংশোধন জন্য তাহার যে কার্য্যকারিতা ছিল এবং সেজন্য তাহাকে যেরূপ ব্যস্ত থাকিতে হইত তাহার অভাবে মন অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়। নতুবা আপনার ঘায়ের যন্ত্রণায় যে অস্থির সে কি পরের সামান্য স্ফোটকের তত্ত্ব লইতে ব্যস্ত হইতে পারে? যদি কেহ এরূপে আত্মদৃষ্টিহীন ও আপনার প্রতি উদাসীন হয়, তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতে থাকে যে সে প্রকৃতরূপে আপনার কল্যাণ প্রার্থনা করে না। সে নিজে সুন্দর কি না সে দিকে দৃষ্টি নাই; কিন্তু অন্যকে সুন্দর দেখিতে ইচ্ছা করে। এই অবস্থায় দেখা যায় সে নিজে যে সকল ত্রুটী বা দোষযুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই ত্রুটী বা দোষ অন্য কর্ত্তৃক কৃত হইলে যাদৃশ তীব্র প্রতিবাদ করিতে অগ্রসর হয় নিজের বেলা সেরূপ ঘৃণা ও তেজের সহিত দোষের প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না। বাস্তবিক আত্ম-দৃষ্টি পরায়ণ ব্যক্তি কখনও অপরের শাসনের জন্য তত ব্যস্ত হন না। আত্মাদর যখন বিকৃত হইয়া নিজ ক্ষত প্রদেশ দর্শন করিতে বা সে ক্ষত প্রদেশে কঠোর অস্ত্রাঘাত করিতে অনিচ্ছুক হয়, তখনই লোকের পরছিদ্রানুসন্ধান প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া পর চর্চ্চার দিকে গতি হইতে থাকে। যখন সমাজে এরূপ অবস্থার প্রাবল্য হয়, তখন দেখা যায় দোষ সংশোধন যত হউক আর না হউক তাহার পরিকীর্ত্তন খুবই প্রাবল্য লাভ করে। তাহা দ্বারা দোষীর দোষ সংশোধিত হয় না কেবল দোষঘোষণাকারী পরদোষ ঘোষণা করিয়া জিহ্বাকে কলঙ্কিত করিতে থাকে; এবং তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎরূপে আত্মসন্তুষ্টি লাভ করিয়া মনকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে থাকে। আত্ম-দোষদর্শী সাধুগণ কখনই ঈদৃশ আচরণকে প্রার্থনীয় জ্ঞান করেন না। পরের অগোচরে দোষ কীর্ত্তনে বাস্তবিক দোষের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শিত হয় না এবং তাহার সংশোধন বাসনাও প্রকাশ পায় না; কেবলই ভীরুতা ও আত্মসন্তুষ্টি লাভের ইচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ আচরণে দোষী ও দোষ ঘোষণাকারী কাহারও কল্যাণ হয় না। এজন্য চিরদিন পরনিন্দুকদিগকে সাধুগণ ভৎর্সনা করিয়া আসিয়াছেন; এবং তাহাদিগকে সমাজের কণ্টকস্বরূপ জ্ঞানে বর্জন করিবার উপদেশ দিয়া আসিতেছেন। আমাদের মধ্যে এমন কু অভ্যাস যাহাতে প্রাবল্য লাভ না করে, প্রত্যেকের তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। প্রত্যেকেরই ভাবা উচিত নির্দ্দোষ কেহই নহে; সুতরাং নিজের সংশোধন প্রয়াসী হইয়া আত্মদৃষ্টি-পরায়ণ হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সমালোচনা ও পরস্পরের দোষ কীর্ত্তনের বাতাসে অনেক অপরিপক্ক ব্রাহ্মের ধর্ম্ম-জীবন বিনষ্ট হইতেছে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রহ্ম জীবন্ত।

ঈশ্বরে অবিশ্বাসী একজন ইংরাজ পণ্ডিত লিখিয়াছেন "ঈশ্বর শব্দের বাচ্য কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। মানুষ কল্পনা প্রসূত আদর্শেরই পূজা করিয়া থাকে। আপনার ভাবকে মহান্ করিয়া লইয়া তাহার পায়ে অঞ্জলি প্রদান করে।" উক্ত পণ্ডিত বহু গবেষণার পর ঈশ্বর-সত্তার জীবন্ত সাক্ষ্য না পাইয়া এই কথা বলিয়াছেন। তিনি যাহা উপলব্ধি করেন নাই, সে বিষয়ে তাঁহার নির্ব্বাক থাকাই সঙ্গত ছিল। আমি কোন এক সত্তা উপলব্ধি করিতে না পারিলে অপরেও তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, এই রূপ সিদ্ধান্ত করা বিজ্ঞের কার্য্য নহে। তবে, ঈশ্বর উপলব্ধি

যদি আমাদের মানবীয় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হইত তাহা হইলেও ওরূপ সিদ্ধান্ত ন্যায়-সঙ্গত বলা যাইতে পারিত। কিন্তু আমরা মানব প্রকৃতির এমন কোন স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য প্রত্যক্ষ করি না। উক্ত পণ্ডিত সর্ব্বতোভাবে মানব প্রকৃতির পরিমাণ করিয়াছেন, এমন কথা বলিতে পারেন না। তিনি মানবের শক্তির একটা সীমা নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না। মানব শক্তি কতদূর যাইতে পারে, দুই চার দশ হাজার লোকের এমন কি সমস্ত মানব জাতির মনের গতি পরীক্ষা করিয়াও কেহ তাহা অনুমান করিতে পারে না। মানব মন বালুকারাশি পরিপূর্ণ উষর মরুভূমি নহে। ইহা পরম রমণীয় উর্ব্বর ক্ষেত্র। এ রাজ্যে নিত্য নব নব কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে পারে। অনন্ত অতীতে যাহা হয় নাই, আজ তাহা নব ভাবে এ রাজ্যে উদিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে মানব মন পরম ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি বিকাশের উপযুক্ত উপাদান। সুতরাং ভূয়োদর্শন কিংবা অতীতের আলোচনার আলোকে এ রাজ্যের সমস্ত দর্শন করা অসম্ভব। অতীত যাহা দেখাইয়াছে বর্ত্তমান যাহা দেখাইতেছে, অনন্ত ভবিষ্যতে তাহাই ঘটিবে, ইহা বিশ্বাস করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। যদি মানব-মন ঈশ্বর শক্তির এই রূপ ক্রীড়া ভূমি হইল, তখন এক মনের ভাব দ্বারা অপর মনের ভাব অনুমান করিয়া লওয়া গভীর অন্ধতা। আমরা অহর্নিশি এই রূপে কত ভ্রমে পতিত হই। আপনার মানসিক ভাবের ছবি অপরের মনের উপর ফেলিয়া তাহাকে বিচার করি,এবং অন্যায়ের অন্ধকারময় গভীর কূপে পতিত হইয়া লজ্জিত হই। লেখক একদা কোন বন্ধুর নিকট কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে মানব সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ করিতে পারে। তিনি বলিলেন উহা মানবের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন উহা মানব প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তিনিও ঠিক উক্ত পণ্ডিতের মত আত্ম মন দিয়া জগৎকে বিচার করিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে বিচার করিতে গেলে মানবের অন্য গতি নাই। আপনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কেহ তদতিরিক্ত কোন সত্তার সাক্ষ্য দিলে আমি তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু যখন আমার শক্তির এত টুকু সীমা রহিয়াছে, তখন অনেক সময় নিস্তব্ধ থাকাই বিধেয়। তাহা না থাকিয়া অন্যে যাহা উপলব্ধি করিতেছে, উহা হাওয়া; উহা বিকৃত মস্তিষ্কের শর্ষেফুল দর্শন, উহা কল্পনার চিত্র বলিয়া উপহাস করা কিংবা উড়াইয়া দেওয়া,সত্যান্বেষী পণ্ডিতের উচিত কার্য্য নহে। নক্ষত্র বিদ্যা বিশারদ জ্যোতির্ব্বিদ দূরবীক্ষণ যন্ত্র সহকারে এক নব নক্ষত্র মণ্ডল আবিষ্কার করিলেন, আমি আমার চর্ম্ম-চক্ষু দুটী লইয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিলাম, উহা জ্যোতির্ব্বিদের কল্পনা। আমি কল্পনা বলিলাম জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের তাহাতে কোন ক্ষতি হইল না। তিনি সত্য উপলব্ধি করিয়া জীবনকে তদ্দ্বারা চালাইতে সমর্থ হইতেছেন। কিন্তু আমি সত্য আবিষ্কারের জন্য চক্ষু দুটীকে যে অবস্থায় লইয়া যাইতে হয় সে অবস্থায় লইয়া না যাইয়াই আবিষ্কৃত সত্যকে অগ্রাহ্য করিলাম এবং সত্যকে অগ্রাহ্য করিলে জীবন যেরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়, সেরূপই হইল। নক্ষত্র দর্শন সম্বন্ধে যেরূপ ঈশ্বর উপলব্ধি সম্বন্ধেও সেই রূপ। ঈশ্বর-বিশ্বাসী বিশ্বাসের দূরবীক্ষণ সহযোগে হৃদয়ের স্বচ্ছ দর্পণে ব্রহ্ম দর্শনলাভ করিয়া অপার আনন্দ এবং শান্তি ভোগ করিতেছেন। যে সকল নীচ প্রবৃত্তি মানবকে পশুত্বে পরিণত করে, যে সকল পাপেচ্ছা মানব হৃদয়ের প্রাকৃতিক শান্তি বিনষ্ট করিয়া, দুঃখের গভীর কূপে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করে, ব্রহ্ম সহবাসে বিশ্বাসীর সে সকল প্রবৃত্তি এবং ইচ্ছা তাহার হৃদয় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া থাকে। হে ঈশ্বরাবিশ্বাসী! তুমি দূরবীক্ষণ ব্যবহারে অসম্মত হইয়া ঈশ্বরভক্তের ব্রহ্ম উপলব্ধিকে কল্পনা মনে করিতেছ? এবং আত্ম অজ্ঞানতাকে জ্ঞান মনে করিয়া গর্ব্বিত এবং স্ফীত হইতেছ? কিন্তু যাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া জীবনকে চালনা করিতেছেন ক্ষতি তাঁহাদের নহে; ক্ষতি তোমারই। তুমি সত্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অসত্যের অন্ধকারে নিমগ্ন রহিলে, জীবনও তদ্রূপ গঠিত হইল। তুমি যতই কেন বল না,ঈশ্বর-ভক্ত কখনও আত্ম প্রবঞ্চনা করিতে পারে না। তাঁহার ব্রহ্ম জীবন্ত; তিনি তাঁহার জীবন ভূমিতে আত্ম শক্তির বিকাশ করিতেছেন, নিত্য নিত্য নব নব ভাবে তাঁহার জীবনে কার্য্য করিতেছেন। বিশ্বাসী দেখিয়া অবাক হইতেছেন, এবং কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি লইয়া এমন দয়াল ব্রহ্মের সকাশে উপনীত হইতেছেন। তুমিও একবার গর্ব্ব পরিহার করিয়া বিশ্বাসের দূরবীক্ষণ আত্মার চক্ষুতে সংযোগ করিয়া সেই অনন্ত আকাশ পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; দেখিবে যে জ্যোতির জ্যোতি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন তোমার জীবনেও প্রতিভাত হইবেন। আজি রোগ, শোক, দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নে যে যাতনা ভোগ করিতেছ, ব্রহ্মদর্শন লাভ হইলে আর সে যাতনা থাকিবে না। রোগ হইবে, বিচ্ছেদ ঘটিবে, দারিদ্র্য আসিবে, কিন্তু আত্মা এমন এক নির্ম্মল চিদাকাশে বেড়াইবে যে,পার্থিব এই সকল প্রতিকূল-অবস্থা তোমার নিকট পহুঁছিতে পারিবে না। তাই একবার সচেতন হইয়া নিরীক্ষণ কর; এবং ব্রহ্মানন্দ ভোগের অধিকারী হও।

ধর্ম্মজীবন ও আদর্শ-চরিত্র।

"উপদেশ অপেক্ষা সৎ দৃষ্টান্ত অধিকতর কার্য্যকারী" এ কথাটা জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই শুনিয়া আসিতেছি। জীবনের অভিজ্ঞতাতেও দেখিতে পাইতেছি যে, শত শত তেজস্বিনী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া, শত শত সৎগ্রন্থ পাঠ করিয়াও যাহার জীবন সৎ পথে আসিল না, যাহার হৃদয়ে ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল না, উচ্চ জীবন লাভ করিবার জন্য যাহার চিত্ত ব্যাকুল হইল না, সৌভাগ্য ক্রমে সজ্জনের সহবাস লাভ করিয়া—সাধু জীবনের সামান্য দুই একটী মহত্ত্ব দেখিয়া—মহাজনের মুখের হৃদয়স্পর্শী দুই একটী বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার জীবনে কি এক ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল। সৎ সঙ্গ লাভই মানবের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির এক মাত্র উপায় এ কথা বলা আমাদের অভিপ্রায় নয়। প্রত্যুত আমরা বিশ্বাস করি, গভীর জ্ঞানালোচনা, সুতীক্ষ্ণ আত্মদৃষ্টি ও একাগ্র আত্মচেষ্টা ভিন্ন মানুষ কখনই চরিত্রের উৎকর্ষ ও উচ্চ ধর্ম্মজীবনের উচ্চতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যে শক্তি মানবান্তরে ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করিয়া দেয়,আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা বল-

বর্ত্তী করিয়া দেয়, সে শক্তির অভাবে অশেষ জ্ঞান সম্পন্ন মানুষও মৃত, অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন ও উচ্চ জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত। অনেকে প্রশ্ন করেন, দর্শন শাস্ত্রের কি এমন কোন শক্তি নাই, বিজ্ঞানের কি এমন কোন বল নাই যে মানবান্তরে উচ্চ জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত করিয়া দিতে পারে? একথা সত্য যে, জ্ঞানালোচনা করিতে করিতে মানবের জ্ঞান-লালসা বৃদ্ধি পায় এবং জ্ঞানান্বেষণে প্রাণে গভীর শান্তি ও আনন্দ জন্মে। কিন্তু জীবন্ত আদর্শের শক্তিতে হৃদয় সঞ্জীবিত না হইলে মানব কখনই শুষ্ক-জ্ঞান বলে চরিত্রের বিশুদ্ধতা ও মহত্ত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয় না। দর্শন শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতে করিতে মানবের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও বিচার শক্তি বর্দ্ধিত হয় একথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু পবিত্রতা লাভের জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা, সৎ কার্য্যে জীবন্ত উৎসাহ, মানবের প্রতি গভীর প্রেম এ সকল হৃদয় বিকাশের ফল। জীবন্ত আদর্শ ভিন্ন মহত্তের সাধু দৃষ্টান্ত ভিন্ন হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আর কিছুতেই হইতে পারে না। জ্ঞানী চিরকালই মানবের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ সাধন পক্ষে সহায় হইবেন। কিন্তু ধর্ম্মের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সাধুতার জীবন্ত ছবি না দেখিলে মানব কখনও হৃদয়ের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে না। মহা জ্ঞানী সক্রেটিসের জীবনের সহিত মহাত্মা যীশুর জীবনের তুলনা করিলে দেখা যায় যে, যদিও তাঁহারা উভয়েই মহাশক্তিশালী লোক ছিলেন, উভয়েই মানব জাতির শিক্ষক রূপে গৃহীত হইয়াছিলেন, উভয়েই অসংখ্য অসংখ্য নর নারীর হৃদয়ে আপনাদের মহত্ত্বের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং যদিও উভয়েই মানব জাতির জন্য শত্রু হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, তথাপি অনুধাবন করিয়া দেখিলে এইরূপ সৌসাদৃশ্যের মধ্যেও অনেক বৈষম্য লক্ষিত হইবে। সুপ্রসিদ্ধ লেখক অধ্যাপক শিলী এই দুই মহাপুরুষের জীবনের স্বাতন্ত্র্য ভাব অতি সুন্দর রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন;—

"Christ had a totally different object and used totally different means from Socrates. The resemblance is, no doubt, at first sight striking. Both were teachers, both were prodigiously influential, both suffered martyrdom. But if we examine these points of resemblance we shall see that . . . their influence upon men has been of a totally different kind—that of Socrates being an intellectual influence upon thought, that of Christ a personal influence upon feeling. Both Socrates and Christ uttered remarkable thoughts and lived remarkable lives. But Socrates holds his place in history by his thoughts and not by his life, Christ by his life and not by his thoughts." *Ecce Homo*."

অনুবাদ—যীশুর উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী সক্রেটিশের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। ইহাতে সন্দেহ নাই যে উপরে উপরে দেখিলে উভয়ের সাম্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। উভয়েই নর-কুলের শিক্ষক ছিলেন; উভয়েরই মানব-মনের উপরে অসামান্য প্রভাব ছিল; উভয়েই সত্যের জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা যদি এই সকল বিষয় পরীক্ষা করি আমরা দেখিতে পাইব যে মানব-মনের উপরে তাঁহারা উভয়ে বিভিন্ন প্রকারে কার্য্য করিয়াছেন। সক্রেটিসের শক্তি মানসিক শক্তি—মানব চিন্তার উপর; যীশুর শক্তি ব্যক্তিগত জীবনের শক্তি—মানব হৃদয়ের উপর। সক্রেটিশ ও যীশু উভয়েই অমূল্য সত্যসকল উপদেশ দিয়াছিলেন এবং অতি উচ্চ জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। সক্রেটিশ ইতিবৃত্তে নিজ চিন্তার জন্যই প্রসিদ্ধ জীবনের জন্য তত প্রসিদ্ধ নহেন, যীশু জীবনের জন্য প্রসিদ্ধ চিন্তার জন্য নহে।"

মহাত্মা সক্রেটিস্ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক মানবের চিন্তার উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, যীশু অতুলনীয় আত্মোৎসর্গ দ্বারা মানব হৃদয় অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। মহাত্মা সক্রেটিস্ যদি শত্রু হস্তে নিহত না হইয়া আপন শয্যায় শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিতেন, তথাপি সংসারে তাঁহার মহত্ত্ব বিলুপ্ত হইত না—বিজ্ঞানের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জগৎবাসী চিরকাল তাঁহার যশোগান করিত। সুতরাং পাঠক যদি কেবল সক্রেটিসের বিষপান ও বীরের ন্যায় প্রাণ ত্যাগের অভিনয় দেখিয়াই মুগ্ধ হন, কিন্তু তিনি যে সকল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন তবে নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে তিনি সক্রেটিসের জীবনের সার তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে যীশুর জীবন অধ্যয়ন করিতে গিয়া যদি কেহ তাঁহার জীবন্ত বিশ্বাস, উদার প্রেম, ও অসাধারণ তেজস্বিতায় মুগ্ধ না হইয়া কেবল তাঁহার মুখ নিঃসৃত উপদেশ সকলের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তবে সেরূপ পাঠক যীশুর জীবন পাঠ করিয়া অতি অল্পই লাভবান হইবেন। সক্রেটিস্ এবং যীশু উভয়েই অসাধারণ চিন্তাশীল লোক ছিলেন; উভয়েই অসাধারণ মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সক্রেটিস্ মহৎ জীবন যাপন করিয়াও শুধু অসাধারণ চিন্তাশীলতার জন্যই জগতের ইতিহাসে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, যীশুর শিক্ষায় ও উপদেশে যে অসাধারণ চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় মানবজাতিই তজ্জন্য একমাত্র তাঁহাকে উচ্চ স্থান প্রদান করে নাই। তিনি মনুষ্য সাধারণের অনুকরণের জন্য আপন জীবনের যে মহোচ্চ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন তজ্জন্যই জগতের বহুসংখ্যক জাতি তাঁহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া পূজা করে। একথা অতি সত্য যে, গভীর চিন্তাশীলতা এবং জীবন্ত ধর্ম্মভাব মানবাত্মার উন্নতির পক্ষে এই উভয়েরই প্রয়োজন। জ্ঞানী মানবান্তরে কেবল নিত্যানিত্য, ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি বোধ জন্মাইয়া দিয়াই আপন কর্ত্তব্য শেষ করেন। কিন্তু জীবন্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তি মানব হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ প্রজ্বলিত করিয়া দিয়া মানবকে ন্যায় ও পুণ্যের পথে আকর্ষণ করেন, অন্যায় ও অপবিত্রতার প্রতি তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা জন্মাইয়া দেন।

দুইটী কারণ হইতে সাধারণতঃ পাপের উৎপত্তি হয়। যাঁহাদের প্রাণে স্বাভাবিক সদ্ভাব আছে, ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা আছে, তাঁহারাও সৎশিক্ষার অভাবে অনেক সময় পাপ পথে নীত হন। উচ্চ নৈতিক জীবন লাভ করিতে হইলে এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে সৎশিক্ষা ও জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বহু জ্ঞানলাভ করিয়াও আবার শুধু সাধু ইচ্ছার অভাবে কত লোকের

পতন ঘটিয়া থাকে। যাহাদের কুপ্রবৃত্তি এত প্রবল যে পাপের দিকেই মনের গতি, ভাল হইবার আকাঙ্ক্ষা যাহাদের প্রাণে সহজে জাগে না, শুধু জ্ঞানোপদেশে সে সকল লোকের পরিবর্তন ও জীবন গঠন হইতে পারে না। কুপ্রবৃত্তি হইতে যে বিষময় ফল উৎপন্ন হয় তাহা নিবারণ করিতে হইলে জ্ঞান ভিন্ন আরও কোন শক্তির প্রয়োজন। যেখানে অসদিচ্ছার প্রাবল্য সেখানে জ্ঞানশক্তির অগ্রে নৈতিক শক্তিই কার্য্যকারী হইয়া থাকে। সুতরাং এরূপ স্থলে এমন শক্তিশালী পুরুষ চাই যাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া মানবের অসদিচ্ছা তিরোহিত হয় এবং পুণ্যের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়া উঠে। এইরূপ সজ্জনের প্রতি অনুরাগ ও বিশ্বাস জন্মিলে মানুষ আপনার ক্ষুদ্রতা, নীচাশয়তা ও পাপাসক্তি ভুলিয়া গিয়া প্রেমের পূজায় রত হয়। সাধুতার জীবন্ত ছবি, মহত্ত্বের জীবন্ত আদর্শ অহর্নিশি চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া জীবনপথে চলিতে চলিতে লক্ষ্যহীন দুর্ব্বল প্রকৃতি মানবেরও জীবনের লক্ষ্য স্থির হয়, দিন দিন এক নূতন জগৎ তাহার সম্মুখে প্রকাশিত হইতে থাকে, অধিক কি, তাহার নবজীবনের সঞ্চার হয়।

বিগত ১লা বৈশাখ রবিবার নববর্ষোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

এদেশে যখন ডাকাতি প্রথা প্রবল ছিল, তখন বিশ্বনাথ নামে একজন প্রসিদ্ধ ডাকাত জন্মিয়াছিল। লোকে তাহাকে বিশে ডাকাত বলিত। সেই বিশে ডাকাতের বিষয়ে একটী গল্প প্রচলিত আছে। সেটী এই—একবার একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদান ব্রত লইয়া ভিক্ষার্থ বিদেশে গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া কয়েকশত টাকা সংগ্রহ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে গমন করিতেছেন। পথিমধ্যে মাঠের মধ্যে সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ লোক মুখে শুনিয়াছিলেন সেই জেলার কোন গ্রামে বিশে ডাকাতের বাস। সে গ্রামের নামও জানিতেন। কিন্তু কোন স্থানটীতে সেই গ্রাম তাহা জানিতেন না। সন্ধ্যা সমাগত হওয়াতে ব্রাহ্মণের মনে মনে ভয় হইতে লাগিল যদি সেই গ্রামের নিকটে আসিয়া পড়িয়া থাকি তাহা হইলেই ত সর্ব্বনাশ। ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এরূপ সময়ে দূরে দেখিতে পাইলেন যে এক জন ভদ্রবেশ ধারী ভদ্রলোক ছড়ি হস্তে বায়ু সেবন করিবার জন্য মাঠের দিকে আসিতেছেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে কিঞ্চিৎ আশ্বাস জন্মিল; ভাবিলেন এই ভদ্র লোকটীর গৃহে অদ্যকার রাত্রিকালের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিব। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে ভদ্র লোকটীর দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন,এবং তাঁহাকে গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ভদ্রলোকটী যেই গ্রামের নাম করিলেন, অমনি ব্রাহ্মণের প্রাণ উড়িয়া গেল। অমনি চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ভদ্রলোকটী কারণ জিজ্ঞাসা করাতে ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহাশয় আপনি ভদ্রলোক আপনাকে সমুদায় ভাঙ্গিয়া বলিতে দোষ নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া কয়েক শত টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছি, সে সমুদায় গেল, কারণ বিশে ডাকাতের গ্রামে যখন আসিয়া পড়িয়াছি তখন আর নিস্তার নাই।" ভদ্রলোকটী ব্রাহ্মণকে অভয় দান করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর আপনি আমার সঙ্গে আসুন, বিশে ডাকাতের গ্রাম হইলই বা আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না। আমি আপনাকে উত্তম স্থানে রাখিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া ভদ্রলোকটী ব্রাহ্মণকে লইয়া গিয়া এক নাপিত দোকানদারের ঘরে উপস্থিত করিয়া বলিলেন—"এই ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে সেবা কর, আহারের আয়োজন করিয়া দাও, ও ইহার টাকাগুলি তোমরা ভাল করিয়া নিজের কাছে রাখিয়া দেও। কাল প্রাতে যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া না যান।" ব্রাহ্মণ তখন মৌনী রহিলেন, ভদ্রলোকটী গেলে ভয়ে ভয়ে নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই কি বিশে ডাকাতের গ্রাম?" নাপিত বলিল—"সে কি মহাশয় ঐ যে বিশ্বনাথ বাবু আপনাকে এখানে দিয়া গেলেন।" ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তবেই গিয়াছি!" নাপিত ও তাহার গৃহিণী বার বার অভয় দান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের মন কোন ক্রমেই প্রবোধ মানিল না। তাহারা নানা প্রবোধ দিয়া নিদ্রিত হইল কিন্তু ব্রাহ্মণ বসিয়া ভাবিতে ও কাঁদিতে লাগিলেন। সেই ভাবেই তাঁহার রাত্রি কাটিয়া গেল। পরদিন প্রাতে বিশ্বনাথ ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া পাঠাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল—"ঠাকুর আপনার সর্ব্বসমেত কত টাকার প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ কহিল প্রায় ৬০০।৭০০ শত টাকা। ইহার মধ্যে কত সংগ্রহ করিয়াছেন? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন দুই শত টাকা। বিশ্বনাথ বলিল "অবশিষ্ট ৫০০ পাঁচ শত টাকা আমি দিতেছি, আপনি আর নানা স্থানে গমন করিবেন না।" ব্রাহ্মণ চমৎকৃত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। এই গল্পটী বলিবার একটী হেতু আছে। যে রাত্রে ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া রাত্রি যাপন করিলেন,সেই রাত্রে ব্রাহ্মণের ভাব ও সেই নাপিত দম্পতির ভাব এই উভয়ের পার্থক্য কি ছিল একবার চিন্তা করুন। কেন বা একজন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেল আর কেনই বা আর একজন কাঁদিয়া কাল কাটাইল? বিশ্বনাথের অভিসন্ধির মধ্যে ত কোন অনিষ্ট-চিন্তা ছিল না, বরং ইষ্ট-চিন্তাই ছিল। অথচ ব্রাহ্মণ কাঁদিয়া হা হতোস্মি করিয়া রাত্রি যাপন করিলেন। ইহার কারণ কি? সকলেই উত্তর করিবেন বিশ্বাসের অভাবেই ব্রাহ্মণের এত ক্লেশ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের বিশ্বাস থাকিলে বিশ্বনাথের ভাবের ইতর বিশেষ হইত না, সে যাহা ভাবিতেছিল তাহাই করিত, তবে এই লাভ হইত যে ব্রাহ্মণ অকাতরে ঘুমাইতে পারিতেন!

ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর সম্বন্ধেও এই কথা। আমরা বিশ্বাস করি বা না করি ঈশ্বর আমাদের রক্ষা ও কল্যাণের জন্য যাহা করিবার তাহা করিতেছেন। তবে বিশ্বাসী হইলে আমাদের আত্মাতে শক্তি লাভ হয়। অবিশ্বাসী হইলে কাঁদিয়া রাত্রি কাটাইতে হয়! মানুষের বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ আছে; নিরাশার কোন কারণ নাই; তথাপি বিশ্বাসের অভাব বশতঃ মানুষ অনেক সময় নিরাশাতে নিমগ্ন হয়। এই নববর্ষের প্রারম্ভে যদি তরুলতার প্রতি দৃষ্টিপাত করি তাহারা আমাদিগকে তিরস্কার করে। বৃক্ষদিগের যে নিঃশব্দ ভাষা আছে, সেই ভাষাতে আমাদিগকে

উপদেশ দেয়। কিছুদিন পূর্ব্বে যখন হেমন্তের বাতাস বহিতে-ছিল তখন বৃক্ষদিগের কি অবস্থা ছিল? পুরাতন পত্র ঝরিয়া গিয়া বৃক্ষগুলি শোভাহীন হইয়াছিল। অদূরদর্শী লোক হয়ত সে সময়ে দেখিয়া ভাবিয়াছিল বৃক্ষগুলি বুঝি মরিয়া গেল, আর হরিদ্বর্ণ পত্র তাহাতে দেখা দিবে না; আর পক্ষীগণ তাহার শাখাতে আসিয়া বসিবে না; আর পরিশ্রান্ত পথিক তাহার ছায়াতে বিশ্রাম লাভ করিবে না। কিন্তু এখন দেখ নববর্ষের প্রারম্ভে সেই সকল তরুর শ্রী ফিরিয়াছে; নূতন ফলে তাহাদের অঙ্গ পূর্ণ হইয়াছে; সেই সকল ফল পাকিতে আরম্ভ হইয়াছে। বৃক্ষের এই পরিবর্ত্তনে কি আমাদের জন্য কোন উপদেশ নাই। যিনি মৃতপ্রায় বৃক্ষসকলকে নবীনপত্রে ভূষিত করিলেন, তিনি কি আমাদিগের ম্রিয়মাণ আত্মাতে নবজীবন আনিয়া দিবেন না? বৃক্ষের পক্ষে যেমন হেমন্ত আছে, যেমন তাহাদের পুরাতন পত্র স্খলিত হয়, তাহাদের শ্রী চলিয়া যায়, সেইরূপ আমাদের আত্মার পক্ষেও এক একটা অবসাদের সময় আসে, যখন কিছুই ভাল লাগে না। প্রাণটা শুষ্ক ও নীরস হইয়া থাকে; কিছুই মিষ্ট বোধ হয় না। যে সকল বিষয় আগে তৃপ্তি দিয়াছে তাহা আর তখন তৃপ্তি দিতে পারে না, যে সকল গ্রন্থ এক সময়ে কত উপকার দিয়াছে, তাহা তখন আর পাঠ করিতেও ইচ্ছা করে না। এই ঘোর সময় অবসাদের সময়, বড় পরীক্ষার সময়। এই সময়ে ধৈর্য্য ও বিশ্বাস রক্ষা করা অতিশয় কঠিন। অনেকে এই সময়ে নিরাশ হইয়া পড়ে। মনে করে বোধ হয় আশা ভরসা সকল ফুরাইল; আমার জীবনতরুতে আর বুঝি নবপত্র গজাইবে না। মঙ্গল বিধাতা স্বয়ং রক্ষক ও সহায় থাকিতেও এ যন্ত্রণা কেন? কেবল অবিশ্বাসের জন্য। আজ নববর্ষের দিন যদি কেহ এরূপ শুষ্ক ও ম্লান থাক, তাহাকে আমি ঐ বৃক্ষদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি; বৃক্ষদিগকে দেখিয়া উৎসাহিত হও—'নিরাশাকে দূরে নিক্ষেপ কর। একজন আছেন যিনি তোমার আত্মাকেও নবজীবনে ভূষিত করিবেন। শান্তির পথ থাকিতে অবিশ্বাসের যন্ত্রণা সহ্য কর কেন? নিশ্চয় জানিও একটা বৃক্ষের মূল্য অপেক্ষা তোমার আত্মার মূল্য অধিক। যিনি তরুসকলকে নব পত্রে ভূষিত করিয়াছেন তিনি তোমার আত্মাকে বিস্মৃত হইবেন না।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম।

(ছাত্র সমাজে শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক বিবৃত বক্তৃতার সারাংশ।)

(প্রথমার্দ্ধ।)

আপনারা জানেন যে, আমাদের অদ্যকার বক্তৃতার বিষয়—বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম। কিন্তু ইংরাজিতে ইহার যে নামকরণ হইয়াছে, তাহার ভাব বাঙ্গালায় বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম শব্দদ্বারা বিশদরূপে প্রকাশিত হয় নাই। ইংরাজিতে Physics and Piety কথার দ্বারা যে ভাব ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি, বাঙ্গালায় বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে সে ভাব কিছুই প্রকাশিত হয় না। ইংরাজি ভাষায়, ওয়াল্টার বেজহট নামক একজন অতি চিন্তাশীল লেখকের Physics and Politics অথবা জড়বিজ্ঞান ও রাজনীতি নামে একখানি অতি সুন্দর গ্রন্থ আছে। বর্ত্তমান কালের জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আলোচনাতে সভ্য সমাজের চিন্তা ও ভাবে যে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে,—সেই পরিবর্ত্তনে রাজনৈতিক আদর্শ কি পরিমাণে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইতেছে; জড় বিজ্ঞান হইতে আমরা যে সকল মহামূল্য সত্যলাভ করিতেছি, সে সকল সত্য রাজনৈতিক জগতে কার্য্য করিয়া সভ্যসমাজের শাসন প্রণালীকে কিরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, ইহা প্রদর্শন করা ও এই বিষয়ের আলোচনা করাই—এই Physics and Politics গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ওয়াল্টার বেজহটের অনুকরণে, তিনি যে উদ্দেশে তাঁহার গ্রন্থের নাম Physics and Politics জড়বিজ্ঞান ও রাজনীতি রাখিয়াছিলেন, আমিও তদনুরূপ উদ্দেশ্যেই অদ্যকার এই সামান্য বক্তৃতার Physics and Piety অথবা জড়বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম এই নামকরণ করিয়াছি। বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক আলোচনাতে মানুষের চিন্তাস্রোত যে এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে,—বিজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের মানস-চক্ষু যে এক নূতন ভাবে জগতের যাবতীয় পদার্থ ও ঘটনাকে দর্শন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, বৈজ্ঞানিক ভাবের প্ররোচনায় বর্ত্তমান সময়ের সভ্যজগতের চিন্তাশীল নরনারী যে এক অভিনব অতি সূক্ষ্ম তুলাদণ্ডে জনসমাজের প্রাচীন সত্য সমূহকে পরিমাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—এই সকলের দ্বারা সভ্যজগতের ধর্ম্মভাবের কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, জড় বিজ্ঞানের গভীর আলোচনাপ্রসূত শক্তি সমূহ ধর্ম্ম-ভাবের উপর কার্য্য করিয়া তাহাতে কি পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে;—কোন্ দিকে ধর্ম্মের স্রোতকে পরিচালিত করিতেছে,—তাহার যৎসামান্য আলোচনা করা অদ্যকার বক্তৃতার উদ্দেশ্য। আমি আশা করি, আপনারা যখন দয়া করিয়া আমার এই সামান্য বক্তৃতা শুনিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছেন, তখন আরএকটু দয়া করিয়া, একটু ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আমার যাহা বলিবার আছে তাহা নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিবেন, এবং আপনাদিগের বিচারে তাহাতে কোনও সত্য আছে এরূপ যদি স্থির হয়, তবে সে সত্যকে প্রাণ দিয়া আলিঙ্গন করিতে ও জীবনে সাধন করিতে চেষ্টা পাইবেন।

বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক ভাবের দ্বারা—ইংরাজিতে যাহাকে বলে Scientific Spirit of the age, তাহাতে ধর্ম্মভাবের বা Religious Spirit যাহাকে আমি piety নামে অভিহিত করিয়াছি, তাহার কি পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, এই আমাদের বিবেচ্য বিষয় এবং এই বিষয়ের আলোচনায় সর্ব্বপ্রথমেই বৈজ্ঞানিক ভাব কাহাকে বলে, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক ভাব এবং জড় বিজ্ঞানের জ্ঞান দুই এক কথা নহে। দুই তিনটী দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা বিশদরূপে বুঝাইতে পারা যায়। এমন লোক তো আমরা সকলেই দেখিয়াছি, যাঁহারা ইংরাজি ভাবে পরিপূর্ণ; কিন্তু ইংরাজি বর্ণমালা সম্বন্ধে যাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এমন লোক তো অনেকে আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ অথচ ধর্ম্ম বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

অনভিজ্ঞ; যাহারা নৈতিক ভাবে পরিপূর্ণ অথচ নীতি বিজ্ঞান কখনও অধ্যয়ন করেন নাই। ইংরাজি ভাব কি? মোটামুটি ধরিতে গেলে তিনটী বিষয়ে ইংরাজি ভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে; —(১) যুক্তি তর্কের প্রতি একটু ঝোঁক; (২) প্রাচীন কালের সামাজিক রীতি নীতির প্রতি একটু তাচ্ছিল্য; (৩) দেশ কাল পাত্র নির্ব্বিশেষে জ্ঞান ও সত্য আহরণ করিবার একটু ইচ্ছা। এবং যুক্তি তর্কের প্রতি যাঁহাদের ঝোঁক আছে, প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি যাঁহাদের তেমন শ্রদ্ধা বা আস্থা নাই, এবং বিদেশীয় ও বিজাতীয় সুপ্রথা ও সুনিয়ম স্বদেশেও স্বজাতিতে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যাঁহারা অল্প বিস্তর প্রয়াসী, তাঁহারা ইংরাজি জানুন, আর নাই জানুন, ইরাজি ভাবে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মভাব কি? মোটামুটি শ্রদ্ধা ও প্রীতি দ্বারা ধর্ম্মভাব প্রকাশিত হয়। ঢাকার দস্যুবৃত্ত ডন্‌গিরেরা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে নাই; ধর্ম্ম শাস্ত্র কখনও পড়ে নাই। কিন্তু যখন সে দিন পূর্ব্ববঙ্গ ব্রহ্ম মন্দির হইতে একটী দীক্ষাপ্রার্থী যুবককে বল পূর্ব্বক স্থানান্তরিত করিবার আদেশ পাইয়া "খোদার ঘরে এমন কর্ম্ম করিতে পারি না" বলিয়া তাহা হইতে বিরত হইয়াছিল, তখন তাহাদের ধর্ম্মভাব একেবারে নাই একথা কে বলিবে? এইরূপ বিজ্ঞান আলোচনা না করিয়াও লোকে সহজেই বৈজ্ঞানিক ভাবের দ্বারা আপনার চিন্তাস্রোতকে পরিচালিত করিতে পারে। এই বৈজ্ঞানিক ভাব কি?—১ম বিচার স্পৃহা এবং বিশ্লেষণ শক্তি,—ইংরাজিতে—A critical and analytic spirit; ২য় সকল সত্যের সার্ব্বভৌমিকতা ও একতা প্রতিপাদনের জন্য আগ্রহ, অথবা ইংরাজিতে spirit of generalisation and unification; ৩য় সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের ভাব—অথবা spirit of doubt and scepticism. এই যে বৈজ্ঞানিক ভাব, যাহার প্রকাশ মোটামুটি এই তিন প্রকারে হইয়া থাকে, তদ্দারা ধর্ম্মের যে তিনটী প্রধান বিভাগ আছে, তাহার প্রত্যেকটীতে ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে। ধর্ম্মের এই তিনটী বিভাগ কি?—না (১) তত্ত্ববিদ্যা বা Theology; (২) ধর্ম্মনীতি বা Ethics; (৩) সমাজনীতি বা Sociology.

এখন দেখা যাক, ধর্ম্মের যে এই তিনটী অঙ্গ, যে তিনটী অঙ্গের পূর্ণতা দ্বারা ধর্ম্মভাব বা pietyর পূর্ণতা সম্পাদিত হয়, ধর্ম্মের এই তিনটী অঙ্গের উপরে বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক ভাব কার্য্য করিয়া তাহার কি কি পরিবর্ত্তন ঘটাইতেছে?

১ম—তত্ত্ব বিদ্যা। বিজ্ঞানালোচনা প্রসূত সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব তত্ত্ব বিদ্যার উপর কার্য্য করিয়া তত্ত্ব-বিদ্যা সম্বন্ধীয় অতি প্রাচীন ও সর্ব্বজন-গৃহীত সত্য সমূহকে নূতন ভাবে পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহার প্রথম ফল এই দাঁড়াইতেছে যে, যে সকল প্রাচীন ভিত্তির উপর এতকাল তত্ত্ব বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের নিদারুণ আঘাতে সে পুরাতন ভিত্তি ভূমি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে,এবং তত্ত্ব-বিদ্যাকে বিশুদ্ধ জ্ঞানানুমোদিত, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের অতীত, এক অভিনব সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। জড় বিজ্ঞানের আলোচনায় আমরা এই শিক্ষা লাভ করিয়াছি যে জড় জগতের সত্য সমূহ প্রত্যক্ষ সত্য; তাহাদিগকে বারম্বার তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিতে পারা যায়, এবং এই সমুদায় কঠিন পরীক্ষাতে যাহা অটল থাকিতে পারে না, জড় জগতে আমরা তাহাকে সত্য বলিয়াই গ্রহণ করি না। এই শিক্ষা লাভ করিয়া, এই আদর্শে যখন আমরা প্রাচীন তত্ত্ব বিদ্যা প্রচারিত সত্য সমূহের পরীক্ষা করিতে যাই, তখন কি দেখি? তখন দেখি যে, এই সকল সত্য হয় এই রূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে পারা যায় না, অথবা পরীক্ষা করিতে গেলে দেখা যায় যে স্থানে স্থানে প্রাচীন কালের অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহে এমন সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা জড় বিজ্ঞানের কঠোর পরীক্ষিত সত্য সমূহের সার্ব্বভৌমিকতা ও অভ্রান্ততা অপ্রমাণ করে। প্রত্যক্ষ সত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আসিয়া অপ্রত্যক্ষ ও অপরীক্ষিত কাল্পনিক ঘটনার বিবরণ সমূহ সহজেই পরাস্ত হইয়া যায়। অলৌকিক ঘটনায় (Miracle) লোকের বিশ্বাস তাহা ত ক্রমে চলিয়া যাইতেছে; এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল শাস্ত্র এই সকল miracle বা অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রচার করিতেছে এবং এই সকল ঘটনার সাহায্যে তত্ত্ব বিদ্যার অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা পাইতেছে, তাহাতেও লোকের অবিশ্বাস জন্মিতেছে; এবং এত কাল নাকি ধর্ম্ম পুস্তকের অভ্রান্ততার উপরেই তত্ত্ব বিদ্যার সুমহান্ অট্টালিকা দণ্ডায়মান ছিল, সুতরাং এই ভিত্তি ভূমি নষ্ট হইয়া যাওয়াতে প্রাচীন কালের তত্ত্ব-বিদ্যাও হীনবল ও হীনতেজ হইয়া ধুলিতে অবলুণ্ঠিত হইতেছে। আজি কালি আর তত্ত্ব বিদ্যা বিশুদ্ধ জ্ঞানের অগ্নি—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে, বিশ্বাসের সুরক্ষিত অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিতে পারিতেছে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনা প্রসূত সন্দেহ ও অবিশ্বাসের তাড়নায় তত্ত্ব বিদ্যা যে মানবের বিশ্বাস রাজ্য হইতে একেবারে পলায়ন করিতেছে তাহা নহে; কিন্তু অগ্নিও সোহাগা সংযোগে স্বর্ণ যেরূপ অপরাপর নিকৃষ্ট ধাতু হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশুদ্ধ ও উজ্জ্বল আকার ধারণ করিয়া থাকে, এই সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের সংযোগে ব্রহ্মজ্ঞানও প্রাচীন কালের অজ্ঞতা প্রসূত যে সমুদায় নিকৃষ্ট ভাব, যে সমুদায় কুসংস্কার, অসত্য এবং আবর্জ্জনার সঙ্গে মিশ্রিত ছিল, তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া উজ্জ্বলতর আভায় বর্ত্তমান কালের নরনারীর জ্ঞান চক্ষু সমীপে প্রকাশিত হইতেছে।

সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের কার্য্য বিনাশ করা, ভগ্ন করা, চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলা। প্রাচীন কালের ধর্ম্ম বিশ্বাসকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসে মিলিয়া যেই চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, অমনি অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, তাহাদের ধীর প্রকৃতি জ্যেষ্ঠা ভগিনী বিশ্লেষণ-স্পৃহা, বিচার শক্তির হস্ত ধারণ করিয়া, প্রাচীন বিশ্বাস ও তত্ত্ববিদ্যার ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্ধকার সমাচ্ছাদিত ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া,—তীক্ষ্ণ জ্ঞানের বর্ত্তিকার সাহায্যে যেখানে যে সত্য পাইতেছে, অমনি তাহা সযত্নে সংগ্রহ করিতেছে, জগতের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহ তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিয়া বিশ্লেষণ স্পৃহা ও বিচার শক্তি, এই সমুদায় শাস্ত্রের প্রাণ স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন সত্য ও ধর্ম্মভাবের আবিষ্কার করিতেছে। এবং অতঃপর সার্ব্বভৌমিকতা ও একীকরণেচ্ছা,—Spirit of generalisation and unification—বিশ্বকর্ম্মা রূপ ধারণ করিয়া, এই

সকল স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সত্য সমূহকে একত্রিত করিয়া এই নবযুগের নবধর্ম্মের জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানানুমোদিত, বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের অতীত, তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মবিদ্যার এক অটল, অবিনশ্বর, সুপ্রসস্ত, সার্ব্বভৌমিক এবং চির উন্নতিশীল ভিত্তিভূমি সংস্থাপন করিতেছে। এই ভিত্তি ভূমির উপর আসিয়া মানুষ যেই দাঁড়াইতেছে, অমনি তাহার ধর্ম্ম বিশ্বাসে এক অভিনব সৌন্দর্য্য ও অলৌকিক মাধুরী বিকশিত হইতেছে। এখানে আর ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ নাই; শাস্ত্রে শাস্ত্রে সংগ্রাম নাই; সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ঈর্ষা দ্বেষ নাই,। এখানে আর ম্লেচ্ছ ব্রাহ্মণে, কাফের মুসলমানে, খৃষ্টান হিদেনে, জেন্টাইল ইহুদিতে বিদ্বেষ ও শত্রুতা নাই। এই ভক্তি ভূমিতে দাঁড়াইয়া কি দেখিতে পাই?

এই দেখিতে পাই যে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড এক সূত্রে গ্রথিত, এক শাসনে শাসিত, এক নিয়মে নিবদ্ধ। জড়জগৎ যে নিয়মে শাসিত ঠিক সেই নিয়মে নহে, কিন্তু তাহার অনুরূপ নিয়মে প্রাণী জগৎ এবং অধ্যাত্ম জগৎ ও শাসিত। যে ক্রম বিকাশের নিয়মে জড়জগৎ রচিত হইয়াছে, প্রাণী জগৎ এবং ধর্ম্মজগতেও ঠিক সেই নিয়ম কার্য্য করিতেছে। বটবীজে যেমন বটবৃক্ষের পূর্ণ শক্তি নিহিত থাকে;—জগতের নিকৃষ্টতম ধর্ম্মেও সেইরূপ শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মবিদ্যার পূর্ণশক্তি বীজাবস্থায় নিহিত আছে। এই ব্রহ্মবিদ্যা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে পাই, তাহার মূলে ঠিক সেই ভাব রহিয়াছে,—বর্দ্ধিত আকারে, প্রবলতর প্রভায়,—তথাপি ঠিক সেই ভাব তাহার মূলে রহিয়াছে, যে ভাব জগতের নিকৃষ্টতম ও নীচতম ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করিলে পাওয়া গিয়া থাকে। অদৃশ্য কিন্তু অনুভূত, ইন্দ্রিয়াতীত কিন্তু অল্লাধিক পরিচিত,—অজ্ঞেয় অথচ জ্ঞানের দ্বারাই কেবল গ্রহণীয় যে শক্তি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উপাস্য,—এই মন্দিরে আমরা যাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি; স্ফূটতর ভাষায় আমরা যাহাকে মাতা এবং পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া রোগে, শোকে, দুঃখ, বিপদে, সুখে, সৌভাগ্যে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় পরম শান্তি ও নিরুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকি, অজ্ঞান জড়িত ভাবে সেই ব্রহ্ম শক্তিরই উপাসনা। গির্জ্জায় খৃষ্টান, মস্‌জিদে মুসলমান, দেবমন্দিরে হিন্দু, এবং নিবীড় অরণ্য প্রদেশে সতেজ, জীবন্ত বংশখণ্ড স্থাপন করিয়া অসভ্য অরণ্যবাসী নাগাকুকীরাও—সেই শক্তিরই পূজা করিয়া থাকে। শিশু অস্ফূট ভাষায়, আধ আধ স্বরে মা বলিয়া ডাকে; তুমি আমি স্ফূটতর ভাষায়, মুক্তকণ্ঠে, ভক্তি-প্রীতি শ্রদ্ধা পূর্ণ অন্তরে, মধুর মা কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি; কিন্তু শিশুর আধ আধ ভাষায় মা বলিয়া ডাকা এবং তোমার আমার স্ফূটতর কণ্ঠে মাতৃসম্বোধন উভয়েরই সার পদার্থ, মূলভাব যেমন এক, তেমনি অসভ্য বর্ব্বরের বংশ পূজা এবং সুসভ্য ব্রাহ্মের ব্রহ্মোপাসনা উভয়ের সার পদার্থ, মূল বস্তু, আদিভাব এক। শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণে, তাহার অস্ফূট বৃত্তিতে যেমন যৌবনের তেজ, প্রবীনাবস্থার গভীরতা, বার্দ্ধক্যের পরিপক্কতা অবিকশিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে; শিশুর কোমল দেহের পরিপুষ্টিতেই ক্রমে যেমন যৌবনের পেশীময়ী বলবতী দেহ শক্তির বিকাশ হয়;—যৌবনের দেহশক্তি বিকশিত হইয়া যেমন প্রৌঢ়াবস্থার দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়;—শিশুর ক্ষুদ্র হৃদয় মনে পূর্ণবয়স্ক মানবের প্রখর জ্ঞান ও উচ্ছ্বসিত প্রেম যেমন লুক্কায়িত থাকে, তাহার সুকুমার অঙ্গের অভ্যন্তরে—তাহার সেই প্রত্যঙ্গসকলের মধ্যে যেমন যৌবনের প্রবল পরাক্রম প্রচ্ছন্ন থাকে, তেমনি আমাদের অপেক্ষাকৃত পূর্ণায়বয়ব ব্রহ্মবিদ্যাও প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ, প্রাচীনতম, অজ্ঞানতম ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যা এত কাল ধর্ম্মপুস্তকে নিবদ্ধ ছিল। বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক ভাব অভ্রান্ত ধর্ম্মপুস্তকরূপ কারাগারের প্রস্তরময় প্রাচীর ভগ্ন করিয়া দিয়া ব্রহ্মবিদ্যাকে স্বাধীন করিয়া দিয়াছে। ঈশ্বর এতকাল সম্প্রদায় এবং জাতিতে নিবদ্ধ ছিলেন; বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক ভাব সাম্প্রদায়িকতার ভীষণ নিগড় হইতে ভগবানকে মুক্ত করিয়া সমগ্র মানব জাতির পিতামাতারূপে, মানবসমাজের হৃদয়ের উচ্চতম সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেছে। ঈশ্বর এতকাল কেবল সিনাই পর্ব্বতে, আরবের গিরি গহ্বরে, বা হিমালয় কন্দরে মহাপুরুষ এবং যোগীজনের সঙ্গে, বিশেষ কালে, বিশেষ ভাবে কথা কহিতেন; বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক ভাব অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত কোটী জিহ্বা খুলিয়া দিয়াছে। পরা এবং অপরা সমুদায় বিদ্যার ভিতর দিয়া, ভাগবত এবং লৌকিক (sacred and profane) সমুদায় ইতিহাসের মধ্য দিয়া, সভ্য এবং অসভ্য সমুদায় জাতির মুখ দিয়া, এই বৈজ্ঞানিক ভাব ঈশ্বরের কথা ফুটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিজ্ঞান যে কেবল বাহিরের টেলিফোঁ রচনা করিয়াছে তাহা নহে; কিন্তু বিজ্ঞানালোচনা প্রসূত বর্ত্তমান সভ্য জগতের এই অভিনব চিন্তাস্রোত, এমন এক আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক টেলিফোঁ আবিষ্কার করিয়া জগতের সাধু জ্ঞানীদিগের কর্ণে লাগাইয়া দিয়াছে, যে আজ তাঁহারা সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হইতে ব্রহ্মাণ্ডপতি পরমেশ্বরের সুমধুর ধ্বনি অহর্নিশ শুনিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছেন। বিজ্ঞান ঘৃণার বস্তু নহে; বৈজ্ঞানিক ভাব আসুরিক প্রকৃতি সম্পন্ন নহে; দেব অংশে তাহার জন্ম, নতুবা পরম দেবতার এমন সুন্দর, এমন সুমহান্‌, এমন পবিত্র, এমন উজ্জ্বল সিংহাসন আর কে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিত?

অতএব বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক ভাব সমূহ এক দিকে যেমন কঠোর আঘাতে প্রাচীন ধর্ম্ম বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি সকল চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, অপর দিকে তেমনি, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই, এই সকল প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রের ভগ্নাবশেষ এবং বর্ত্তমান কালের ধর্ম্মজ্ঞান ও অসভ্য জাতি সমূহের ধর্ম্মের ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া, এই সমুদায় ক্ষেত্র হইতে অতি কঠোর পরীক্ষায় পরীক্ষিত সত্য সমূহ সংগৃহীত করিয়া, ব্রহ্মবিদ্যা এবং তত্ত্ববিদ্যার এক সুবিস্তৃত, অটল, চিরউন্নতিশীল, স্বাধীন এবং সার্ব্বভৌমিক ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছে।

চিন্তা-মঞ্জরী।

প্রেমের অভিধানে "আমি আমার" এ সকল কথা নাই; কেবল "তুমি ও তোমার" বই আর কিছুই নাই। বৌদ্ধদের নির্ব্বাণ কোথায়? প্রেমে। প্রেমে আত্মার "অহং" নষ্ট হয়, আত্মা নিজেকে হারাইয়া শ্রেষ্ঠতররূপে আপনাকে খুজিয়া পায়।

প্রেম অহঙ্কার চূর্ণ করে, বিনয় আনিয়া দেয়, কপটতা নষ্ট করিয়া সরলতা আনিয়া দেয়; কারণ কোনও ব্যবধান রহিলে রাসায়নিক বস্তুদিগের যেমন সংমিশ্রণ হয় না, তেমনি কপটতা, দূর দূর ভাব রহিলেও দুইটী হৃদয়ের সংমিশ্রণ (fusion) হয় না।

প্রেম স্বর্গের সিঁড়ি। জ্ঞান স্বর্গের আলোক। জ্ঞান পথ দেখাইয়া দেয়। প্রেমই এ পথ। জ্ঞান অন্ন, প্রেম রস। জ্ঞান স্বামী, প্রীতি ধাত্রী। জ্ঞান বৃক্ষ, প্রেম পুষ্প। কল্পনা প্রীতির সখি, ভক্তি তাহার দুহিতা।

জড়ীয় আকর্ষণী শক্তি এক তারাকে অন্যের সহিত গাঁথিয়া শূন্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াছে। প্রেম এক হৃদয়কে অন্যের সহিত অদৃশ্য রজ্জুতে বাঁধিয়া আমাদিগকে সংসারে দাড়াইবার স্থান দিয়াছে। সংসার টিকিত না, যদি এই প্রেম না থাকিত; মনুষ্য পশু অপেক্ষাও হিংস্র জন্তু হইত, যদি প্রেমবারি মানবহৃদয়-রূপ মরুভূমির মধ্যে কতকটুকু স্থানকে বৃক্ষলতার শ্যামল স্নেহ দ্বারা সজ্জিত করিয়া নয়ন মনের তৃপ্তিসাধন না করিত।

প্রেমের অনুবিক্ষণ দিয়া যাহাই দেখ না, উহা বড়ই মনোহর দেখাইবে। প্রেমবিন্দুর মধ্যে প্রবেশ কর, অনন্তের ছায়া দেখিতে পাইবে। প্রেম অন্ধ। তুমি যাহাকে কদর্য্য বল, প্রেম তাহার রূপরাশিতে মুগ্ধ হয়। প্রেম ছোটকে বড় করে, লাল, কালো, সকলকেই একবর্ণ করে। প্রেম ভেদাভেদ নষ্ট করে, শ্বেত ও কৃষ্ণকায়কে এক করে। বড় ছোট, শ্বেত, কৃষ্ণ, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, ধনী, নির্ধন, অপ্রেমরই অভিধানে মিলে।

বৃত্তের কিয়দংশ দাও, অঙ্কবিশারদ সমগ্র বৃত্ত বাহির করিবেন, তেমনি প্রেমিককে অপূর্ণ বস্তু দাও, তাহাতে যাহা কিছু অভাব আছে, তাহা তিনি নিজ কল্পনা দ্বারা যোগাইবেন, অপূর্ণকে পূর্ণ করিবেন। তুমি জগৎকে যে চক্ষে দেখিতেছ প্রেমিক সে ভাবে দেখেন না। তাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ সুন্দর। তাঁহার হৃদয়ের শোভা চন্দ্রালোকের ন্যায় জগতের মুখে ছড়াইয়া পড়ে। প্রেমিক কুষ্ঠ রোগীরও মধ্যে কি দেখেন, তিনিই জানেন। তিনি তাঁহাকে "প্রিয়দর্শন" বলিয়া আলিঙ্গন করেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

জলপাইগুড়ি।

দয়াময় পিতার কৃপায় জলপাইগুড়ি ব্রাহ্ম সমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্ন লিখিত প্রণালীতে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবের কার্য্য বিবরণ এইরূপ;—

৩রা এপ্রিল বৃহস্পতিবার—অপরাহ্ন ৭টার সময় উৎসবের উদ্বোধন। অদ্য বিশেষ ভাবে দয়াময় পিতার নিকট বল প্রার্থনা হয়। ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা হয়, অপরাহ্ন ৫টার সময় সংকীর্ত্তন, ৭টার সময় উপাসনা, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা করেন এবং বৈরাগ্য সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ উপদেশ দেন। ৫ই এপ্রিল শনিবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা করেন, এবং সাংসারিকতা ও আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে একটী সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন, ১টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত গভীর ভাবে ধর্ম্মালাপ হয়, ৩টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। ৫টার সময় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় একটী অতি হৃদয় গ্রাহী বক্তৃতা করেন, এবার পিতার কৃপায় শ্রোতৃবর্গ দ্বারা মন্দিরটী পূর্ণ হইয়াছিল; এবং সকলেই আশাতিরিক্ত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় ১½ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা হইলে অল্প কাল বিশ্রামের পর, পুনরায় উপাসনা আরম্ভ হয়, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা করেন, এবং "প্রকৃত দীনতা না আসিলে জীবন আরম্ভ হয় না," এই বিষয়ে অতি সারবান উপদেশ প্রদান করেন। অদ্যকার উপদেশে সকলেরই প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল।

৬ই এপ্রিল রবিবার—প্রাতে ৮টার সময় বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে পারিবারিক উপাসনা হয়, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা করেন, ৪।৫ জন মাত্র উপাসক উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু পিতার কৃপায় এমন সরস ও জীবন্ত উপাসনা হইল যে তখন আমরা সাক্ষাৎ ব্রহ্ম-কৃপা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হইলাম। সেই মধুর জীবন্ত ভাব আজিও ভুলিতে পারি নাই; বৈকালে ৫টার সময় দরিদ্র, ভিক্ষুক, অন্ধ, আতুর, সকলকে বসাইয়া আমরা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম, কীর্ত্তনের পর বাবু হরি লাল গুপ্ত মহাশয় প্রার্থনা করিয়া উপস্থিত দীন দরিদ্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যে, যে নাম লইয়া ডাক, সেই সত্য সনাতন পরব্রহ্মকে ডাকা ভিন্ন জীবের আর কিছুতেই পরিত্রাণ নাই।" এই সম্বন্ধে অতি গভীর ভাবে উপদেশ দিতে লাগিলেন। চারি দিক হইতে কেহ আল্লা, কেহ হরি বলিয়া জয়ধ্বনি দিতে লাগিল, তখনকার দৃশ্য অতি মনোহর হইয়াছিল, তৎপরে দরিদ্র ভিক্ষুকদিগকে তণ্ডুল, পয়সা, ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়। পরিশেষে যে সকল মহাত্মা আমাদের এই শুভ অনুষ্ঠানের ব্যয় ও দরিদ্র ভিক্ষুকদের দানের জন্য অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করা হয়, দয়াময় পিতা তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করুন। অপরাহ্ন ৭টার পর সামাজিক উপাসনা হয়, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা করেন। "আত্মাতে ব্রহ্ম দর্শন" সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল, তৎপর কীর্ত্তন হইয়া উৎসব শেষ হইল।

ব্রাহ্ম সমাজ।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১২শ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইবে।

১লা জ্যৈষ্ঠ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে প্রাতঃকালে উপাসনা। এবং সায়ংকালে বক্তৃতা। বক্তা—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

২রা জ্যৈষ্ঠা প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্নে পাঠ ও সংকীর্ত্তন। সায়ংকালে উপাসনা।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ৩রা চৈত্র সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনালয়ে "ধর্ম্ম সাধন প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১লা বৈশাখ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

নামকরণ—বিগত ১৫ই বৈশাখ রবিবার বালিগঞ্জে বাবু প্রসন্নকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের চতুর্থ কন্যার অর্থাৎ ষষ্ঠ সন্তানের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী সুভাষিণী রাখা হইয়াছে। বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি প্রসন্ন বাবু এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার ফণ্ডে এক টাকা দান করিয়াছেন।

উপাসনা গৃহ নির্ম্মাণ—বিগত ২রা চৈত্র কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের গৃহটী পুড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই গৃহটী পাকা করিবার চেষ্টা হইতে ছিল। গৃহ পুড়িয়া যাওয়ায় এখন মন্দিরের জন্য পাকা বাড়ী করিতে বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে। কোচবিহারের মহারাজা তাঁহার উদারতা ও দানশীলতা গুণে সমাজ মন্দির নির্ম্মাণ জন্য এক সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। পূর্ব্বে তিনি এই গৃহের জন্য ২ বিঘা ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার এই দান লাভ করিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

বিবাহ—গত ১২ই বৈশাখ কলিকাতা নগরে একটী বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বরের নাম বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দে নিবাস ঢাকার অন্তর্গত বারদি। বয়স ২৬ বৎসর। কন্যা শ্রীমতী হেমলতা মল্লিক। নিবাস বাগআঁচড়া বয়স প্রায় ১৮ বৎসর। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৮৭২ সনের ৩ আইন অনুসারে বিবাহ রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

খাসিয়া পর্ব্বত হইতে শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী নিম্ন লিখিত পত্রখানি লিখিয়াছেন।

সম্প্রতি একটী নূতন কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছি। কয়েক দিন শিলংএর নিকটবর্ত্তী ২।৩টী পল্লিগ্রামে গমন করি। বাড়ী বাড়ী গিয়া আলাপ করি, ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করি। একটী গ্রামের কয়েকজন লোকের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। সেখানে কয়েক দিন প্রার্থনা, সঙ্গীত করি ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করি। একদিন অনেক লোক এক সাধারণ স্থানে একত্রিত হইয়াছিলেন। আর দুই দিন দুই বাড়ীর প্রাঙ্গনে সভা হয়। কয়েকজন স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম কথা শুনিতে একটু আগ্রহ আছে। কিন্তু সকলে আমার কথা ভাল বুঝিতে পারেন না, কারণ আমি গ্রাম্য ভাষায় উপদেশ দিই নাই। যাহারা একটু পড়িতে জানে, তাহারাই আমার কথা ভাল বুঝিতে পারে। অবশ্য আমি এখনও ভালরূপ খাসিয়া বলিতে পারি না। এজন্য কিছুদিন চেরাপুঞ্জিতে বাস করিব মনে করিতেছি। তথাকার ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যদি একটী ঘর পাই তবে চেরাপুঞ্জিতে থাকা হইবে। যে পল্লীগ্রামের কথা বলিলাম, খৃষ্টীয়ানেরা তথায় প্রচার করিতে গমন করিলে কোনও লোক তাঁহাদের কথা শুনে না। বলা বাহুল্য তাঁহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামে প্রায় প্রতি রবিবারই প্রচার করিতে যান।

এখানে খাসিয়া যুবক সমিতি (Khasia youngmen's association) নামে একটি সভা আছে। তাহা এখন মন্দ চলিতেছে না। প্রতি মঙ্গলবারে তাহার অধিবেশন হয়। খ্রীষ্টিয়ান যুবকও কেহ কেহ আসিয়া থাকেন। নৈতিক বিষয়েই আলোচনা হয়। ক্রমশঃ ধর্ম্মবিষয়ে আলোচনার জন্য চেষ্টা দেখিব। "শিক্ষাপ্রাপ্ত খাসিয়া যুবকদিগের কর্ত্তব্য" এই বিষয়ে ইংরাজীতে একদিন একটা বক্তৃতা করি। একটি নূতন যুবক মৌখার সমাজে যোগ দিয়া রীতিমত আসিতেছেন। একটী খ্রীষ্টিয়ান যুবক চেরাপুঞ্জি হইতে খ্রীষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার মাতা ও ভ্রাতাগণ খ্রীষ্টিয়ান এজন্য তাহাকে গৃহ হইতে তাড়িত হইতে হইয়াছে।

কলিকাতা যাইবার পথে নওপ নামক একস্থানে খাসিয়ারা একত্রিত আছে দেখিয়া আমি প্রার্থনা ও সঙ্গীত করি এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা বুঝাইয়া দিই। এই স্থানের খাসিয়ারা বড়ই অসভ্য। অনেকে একত্রিত হইয়া চেঁচামেঁচি করিতে লাগিল। আমি ১॥ ২ ঘণ্টা কাল বসিয়া রহিলাম। শেষে তাহাদের মত লইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। সব চেঁচামেচি থামিয়া গেল। আগ্রহের সঙ্গে শুনিতে লাগিল। এত অসভ্য লোকে যে একেশ্বরবাদ এমন সুন্দররূপে বুঝিতে পারে, ইহা আমি কখনও শুনি নাই। দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ইহারা পড়িতে শুনিতে জানে না। ইহাদের (longlob) বা priest-governor অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। স্ত্রী পুরুষ অনেকেই আমাকে পুনর্ব্বার যাইতে বলিল।

এ কয়েক দিনে যে কার্য্য হইয়াছে তাহা লিখিতেছি।

১লা এপ্রেল। ১৭ মাইল পথ চলিয়া মৌকাডকে আসি। রাত্রে পোষ্ট আফিসের হেড্ ওভারসিওর বাবু বীরসিংএর বাড়িতে ধর্ম্ম আলোচনা হয়। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রশংসা করেন এবং কয়েক দিন তথায় থাকিতে বলেন।

২রা। ১৬ মাইল পথ অন্তরে চেরাপুঞ্জি গমন করি। গ্রামের মধ্যে গৃহ না পাওয়াতে ২ মাইল অন্তরে ষ্টেশনে বাসা লইতে হয়। অদ্য দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা হয়।

৩রা। প্রাতে ষ্টেশনে কয়েকজন খাসিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করি। পরে মৌসমাই নামক গ্রামে যাই। ব্রাহ্মবন্ধুদের সহিত আলাপাদি হয়। পরিশ্রান্ত ছিলাম বলিয়া আর কিছু কাজ হয় নাই।

৪ঠা। চেরাপুঞ্জি গ্রামে যাই। কয়েক বাড়ীতে দেখা সাক্ষাৎ করি। গৃহের অভাবে সেখানে কিছু কাজ করিবার সুবিধা হইল না। তাঁহারা যাহাতে তথায় একটি সমাজ হয়, সেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এখানে ৪টী ব্রাহ্মযুবক আছেন। দুই তিনটী পরিবারের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে। পুরুষেরা ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন। কেবল আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ আছে, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্বন্ধে সে ভাব নাই। ৫০ বৎসরের অধিক এখানে খ্রীষ্টিয়ানেরা আসিয়াছেন কিন্তু ৫০ জন (শিশু সমেৎ) খ্রীষ্টিয়ানও এখানে নাই। দুইটীমাত্র ভদ্র পরিবার খ্রীষ্টিয়ান হইয়াছেন। আর নিম্নশ্রেণীর খাসিয়া বোধ হয় ৭।৮ ঘর হইবে। এই দুই পরিবার ছাড়া খাসিয়া পল্লীর ভিতরে তাঁহারা স্থান পান নাই। ইহা অতি সুন্দর কার্য্য ক্ষেত্র। কিন্তু গৃহ চাই। জায়গা বড় দুষ্প্রাপ্য। রাজার নিকট অনুরোধ করিয়া যদি একটু জায়গা পাই দেখিব।

৫ই। মৌসমাইএ যাই। এস্থান ১॥ | ২ মাইল দূরে বলিয়া সর্ব্বদা যাইবার সুবিধা হয় না। বিশেষতঃ এখানকার সকলে সমস্ত দিন কায করে বলিয়া রাত্রি ভিন্ন কায করিবার সুবিধা হয় না। রাত্রে ব্যাঘ্রের ভয়। কাযেই এদিনও ও ভাল কাজ হইল না। কিরূপে একটী গৃহ নির্ম্মাণ বা ক্রয় করা যায়, তাহার জন্য কিছুক্ষণ ঘুরিলাম। পরে কিছুক্ষণ সঙ্গীত শিক্ষা দিয়া সন্ধ্যার সময় চলিয়া আসি। রাত্রে বাসার কিছু দূরে এক খাসিয়ার গৃহে গিয়া ব্রাহ্ম ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মে কি প্রভেদ তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়।

৬ই। দুইজন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিতে চেরাপুঞ্জিতে যাই। তিনটী পরিবারের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়। দুইজন স্ত্রীলোক ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন এবং সমাজগৃহ নির্ম্মাণ করিতে বলেন। অদ্য রবিবার, সামাজিক উপাসনা করিলাম। "সাংসারিক বস্তুতে প্রকৃত সুখ দিতে পারে না, ঈশ্বর সহবাসেই সুখ"—এই বিষয়ে উপদেশ দিই। পরে খাসিয়া বন্ধু সিমিয়ন (Simion) ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোক অধিক উপস্থিত ছিলেন। উপযুক্ত স্থান না থাকাতে অনেকেই গৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। সমাজ গৃহের জন্য সকলেই বড় উৎসুক। এখানে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত রূপে উপাসনা হয় না। এখানকার কেহ কেহ সপরিবারে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতে প্রস্তুত। অনেক স্ত্রীলোকও প্রস্তুত। কেহ কেহ বলিলেন আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে কে ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিবে। ৫০ বৎসর এখানে খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু তিন ঘর মাত্র খ্রীষ্টীয়ান। বালকাদি সমেৎ সংখ্যা ১০। আমাদের সহিত ৬ জন যোগ দিয়াছেন এবং অনেকেই যোগ দিতে প্রস্তুত। এজন্য ঘর করা অত্যন্ত আবশ্যক। এখানে সহজেই ব্রাহ্ম পরিবার গঠনের সুবিধা আছে। শেলায় যদিও ব্রাহ্ম সংখ্যা অধিক, স্ত্রী স্বাধীনতা নাই বলিয়া পরিবার গঠন তত সহজে হইবে না। এখানে একটী ঘর হইলে আমি কিছু দিন বাস করিয়া রীতিমত ক্লাস খুলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারি। আর এখানকার লোকেরা দরিদ্র বলিয়া ঔষধের বড় অভাব। তাহাদিগকে ঔষধও দিতে পারি। আমার বিবেচনায় ইহা ভাল কার্য্য স্থান। খ্রীষ্টীয়ানদের পুরাতন একটী ঘর আছে, গ্রামের সর্দ্দার তাহা আমাকে বিক্রয় করিতে চাহিতেছেন। দাম ৫০৲ টাকা। কেবল পাথরের দেওয়াল আছে। যদি সেটী পাওয়া যায়, তবে সর্ব্বসমেৎ ২০০ টাকা হইলে সুন্দর ঘর হইবে। গ্রামের লোকে খাটিয়া সাহায্য করিবে। সঙ্গে একটী ছোট কুঠারী আছে, আমি তাহাতে থাকিতে পারিব। আর যদি একটী বেড়ার ঘর করা যায়, তবে তাহাতে ৫০৲ টাকা খরচ পড়িবে। প্রবল বর্ষা বলিয়া এক বৎসরের অধিক টিকিবে না। আমি কয়েকজন বন্ধুকে পত্র লিখিয়াছি। একজন ১০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অন্যান্যের নিকট হইতে এখনও ঠিক উত্তর পাই নাই।

রাত্রে তাঁহারা সেইখানে থাকিতে বলিলেন। পরদিন প্রাতে যাত্রা করিতে হইবে বলিয়া থাকিলাম না। দুইজন বন্ধু ৯টার সময় বাসায় রাখিয়া গেলেন। নূতন সঙ্গীত পুস্তক পাইয়া সকলের যে আনন্দ হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।

বিজ্ঞাপন।

আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংস্রবে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বার্ষিক পরীক্ষা হইবে। উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীগণ আগামী ২২এ জুনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে এখানে বা মফস্বলের যে কোন স্থানে পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন। পরীক্ষার্থীকে কোন সুপরিচিত ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত সচ্চরিত্রের প্রশংসাপত্র পাঠাইতে হইবে, এবং মফস্বলবাসী পরীক্ষার্থীকে প্রশংসাপত্র-দাতার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

পরীক্ষার বিষয়।

SENIOR COURSE.—Newman's *Hebrew Theism* : The following five essays :—(1) Animal Instinct, (2) God in Conscience, (3) Immortality of God's Beloved, (4) Worth of the Soul, and (5) Future of the Righteous. Slater's *Law of Duty* : pp. 94—116. *Brahmajijnasa* by Sitanath Datta, Chapter I. pp. 1—53 and Chapter IV (whole.)

JUNIOR COURSE.—বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" প্রথম ভাগ (সমগ্র), আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" (সমগ্র) ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "জাতিভেদ" বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ (সমগ্র)।

PRIMARY COURSE.—আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "ধর্ম্মশিক্ষা" (সমগ্র), ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার ও "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" (সমগ্র)।

১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ২৮এ এপ্রিল, ১৮৯০। — শ্রীসীতানাথ দত্ত, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক।

১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই বৈশাখ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত

ধর্ম্ম ও সমাজ তত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
৩য় সংখ্যা।

১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

কোথা ছিনু আসিনু কোথায় ?

১

নীরব আঁধার ঘরে, কোমল শয়নোপরে,
কত সুখে আছিনু শয়ান,
বাহিরের কোলাহল, ঝঞ্ঝাবাত বৃষ্টি জল,
পারে নাই ব্যথিতে এ কাণ।
সহসা কি বজ্র-রবে, কেঁপে গেল হিয়া
কে ডাকিল, "উঠ এস, এস বাহিরিয়া।"

২

সবলে রুধিয়া দ্বার রহিলাম, বার বার
"এস এস"—শুনিবারে পাই ;
"একি শয্যা একি সাজ, একি ঘুম? ছিছি লাজ !
জীবনে কি কোন কাজ নাই ?"
কহিনু,"নীরব ঘরে, পুষ্প-আস্তরণ-পরে,
আমি সুখে ঘুমাইতে চাই ;
কে তুমি ডাকিছ সেথা, যেথা দিন রাত,
রহে খর রৌদ্র আর বহে ঝঞ্ঝাবাত।"

৩

আগুলি রহিনু দ্বার, কি আঘাত বার বার
ঘর খানি যায় ভেঙ্গে যায় ;
ওই গেল, সর্ব্বনাশ ! একি আলো পরকাশ !
কোথা ছিনু আসিনু কোথায় ?
একি খেলা, হে ঈশ্বর, ভাঙ্গিয়া সুখের ঘর
অন্ধ চক্ষে কর দৃষ্টি দান !
যেথায় আতপ তাপ, অশনি ঝটিকা দাপ,
সেথানেই তুমি দীপ্তিমান্।
তবে ঘর ভাঙ্গা থাক, আঁধারের সুখ
নাহি চাহি, প্রিয়তম, হেরি তব মুখ।

জন্মোৎসবের প্রার্থনা।

হে বিধাতা! আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বাদশ জন্মোৎসবের শুভ মুহূর্ত্তে আমরা তোমার চরণে শরণাপন্ন হইতেছি। এই সমাজের জন্মের সময়ে ইহার স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলেই কত সন্দেহের চক্ষে ইহাকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই শিশু যে বাঁচিবে ও জগতে কোন কার্য্য করিতে পারিবে, তাহা কেহই মনে করিতে পারেন নাই। আমরা যে তোমার ভৃত্য, আমাদিগকে তুমিই দৃঢ়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ইহার কার্য্যক্ষেত্রে ফেলিয়াছিলে, আমরাও সময়ে সময়ে কত ভীত হইয়াছি; অন্তরে বাহিরে বিঘ্ন সকল দেখিয়া কতই সন্দিহান হইয়াছি! সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে, এই দুর্ব্বল লোকদিগের দ্বারা তোমার কার্য্য চলিল না, বুঝি বা পরস্পর বিবাদে আমাদের সমুদয় শক্তি ক্ষয় হইয়া আমরা মৃত্যু দশায় পড়িলাম। এসকল অবিশ্বাসের যাতনা। তুমি যন্ত্রী হইয়া রথারূঢ় আছ, দেখিতে না পাওয়াতেই এত সন্দেহ ও নিরাশা। তোমার প্রসাদে আমরা ক্রমেই অনুভব করিতে পারিতেছি যে, আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রথে তুমি আরূঢ় আছ। আমরা সহস্র হাত মিলাইয়া এই রথ টানিতেছি। পুরুষের হাত, স্ত্রীলোকের হাত, বালক বালিকার হাত,কত হাত মিলিয়াছে। যে পদার্থের উপরে এত লোকের প্রেম তাহা ত দুর্ব্বল হইবে না। এ প্রেম তুমিই আকর্ষণ করিয়াছ, এ প্রেম তুমিই বাড়াইয়াছ। হে পরমেশ্বর! এই সমাজের দ্বাদশ জন্মোৎসবের দিনে,তোমার চরণে প্রণত হইয়া এই প্রার্থনা করি, আমাদিগকে বিশ্বাস-চক্ষু দেও, আমরা দেখি যে এই সমাজ তোমারই দ্বারা অধিষ্ঠিত ও তোমারই শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত। আমাদিগকে বিশ্বাস বলে বলী কর, ও তোমার মহিমা কীর্ত্তনের উপযুক্ত কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব কি ?—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই বিশ্বাসের উপরে দণ্ডায়মান যে, ঈশ্বর যাহাকে যে কিছু আধ্যাত্মিক শক্তি বা আলোক দিয়াছেন, তাহা তাঁহারই সেবার জন্য। তোমাতে যাহা কিছু আছে, আমাতে যাহা কিছু আছে, এ সমুদায় মিলাইয়া তাঁহারই কার্য্য হইবে। এখন যদি তুমি বল, আমি একাই জ্বলি, এবং তোরা সকলে নিবিয়া থাক্, অথবা আমাদের দশটী লোকের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য হউক, তোরা দশ শত জন তাহারই অনুগত থাক্,—তাহা হইলে তাহা ঈশ্বরের ইচ্ছা বিরুদ্ধ কথা হয়। আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশেষত্ব এই যে জগদীশ্বর যাহাকে যাহা

কিছু দিয়াছেন, আমরা সে সমুদয় একত্রিত করিয়া তাঁহার সেবা করিব। আমাদের মানব বুদ্ধির অপূর্ণতা ও মানব শক্তির হীনতা বশতঃ এ উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইতেছে না। কিন্তু উদ্দেশ্যের উচ্চতা বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অসহিষ্ণুতা—এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে বিলম্ব হইতেছে কেন, এই বলিয়া অনেকে অসহিষ্ণু। আমাদের নানা প্রকার ত্রুটী ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া তাঁহারা ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন—এই কি স্বর্গ-রাজ্য ? যেখানে এত অপ্রেম, এত অমিলন, এত স্বার্থপরতা এই কি স্বর্গ-রাজ্য। ইঁহাদের অনেকে এত দূর অসহিষ্ণু যে সমাজের লোকের দোষের সমালোচনা করিবার সময় অতিশয় তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাবে এইরূপ বোধ হয় এই সকল বিচারক আপনাদিগকে সেই সমুদয় দোষ হইতে দূরে রাখিয়া পরের দোষের বিচার করেন। যেন তাঁহারা সে সমাজের লোক নহেন; যেন সে সকল দোষ তাঁহাদিগের নাই ; তাঁহারা যদি নিজেদের মত কতকগুলি লোক পাইতেন,তাহা হইলে যেন একটী প্রকৃত নিখুঁত স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু আমরা এরূপ বিশ্বাস করি না। আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ কার্য্য যে হয় না ইহার কারণ এই, যে আমরা অনেক প্রকার শারীরিক ও আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। এক দিনে বা এক উদ্যমে সে সকলের সীমাকে অতিক্রম করা যায় না। আমরা সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে দুর্ব্বল সুতরাং আমাদের গতি ইচ্ছানুরূপ দ্রুত হইতেছে না। যাঁহারা সমালোচক ও বিচারক তাঁহারা দশ জনে একটী মণ্ডলী গঠন করিলেও তাঁহাদের গতি আশানুরূপ দ্রুত হইবে না; এই সকল অথবা এতৎসজাতীয় সমস্যা সকল তাঁহাদেরও পথে উপস্থিত হইবে। অতএব বিশ্বাস ও কর্ত্তব্য নিষ্ঠা দ্বারা আপনাদিগকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে। যেরূপ মাল মসলা আমাদের আছে, তাহা লইয়াই কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে, সপ্তম স্বর্গ হইতে ত আর মাল মসলা আনিয়া কাজ করিতে পারি না। সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বন কর—চেষ্টাতে অবসন্ন হইও না, সংগ্রামে পরাস্ত হইও না। এস প্রত্যেকে যথাসাধ্য ঈশ্বরের আদেশ ও উপদেশানুসারে চলি, তাঁহার রাজ্য এক যুগে না হয় দশ যুগে গড়িয়া উঠিবে।

চক্ষুলজ্জা—চক্ষুলজ্জা জিনিষটা কি? পাছে অপরে ক্রোধ করে এই ভয়? অথবা পাছে অপরে ক্লেশ পায় এই চিন্তা? পাছে অপরে ক্লেশ পায় এ চিন্তা ত ভালই। তাহা সুশিক্ষা ও ভদ্রতার একটী অঙ্গ। যে ব্যক্তি কথা কহিবার সময় অপরের ক্লেশ হইবে কি না তাহা চিন্তাই করে না, অন্যে মনোবেদনা পাইলে যাহার ক্লেশ হয় না, তাহার শিক্ষার বিশেষ ত্রুটি আছে। ভদ্র ঘরে জন্মিলে ও ভদ্র সংসর্গে থাকিলে যে সৌজন্য শিক্ষা হয় সে শিক্ষা তাহার হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর,এক ব্যক্তিকে অনুরোধ করাতে সভার মধ্যে একটী গান করিয়াছেন; তাঁহার সংগীতের শক্তি নাই, সুতরাং সে অনুরোধ রক্ষা না করিলেই ভাল হইত,তিনি সংগীতটী করাতে এই হইল যে আর পাঁচ জনের সংগীতে যে আনন্দটুকু হইতেছিল তাহা নষ্ট হইয়া গেল। তৎপরে আহার করিতে বসিয়া তুমি বলিতেছ—"যাহাদের সংগীতের শক্তি ঈশ্বর দেন নাই তাহারা ভদ্র মণ্ডলীর মধ্যে গাধার মত চীৎকার করে কেন?" কথাটা সত্য হইলেও এভাবে বলাতে এই প্রকাশ পায় যে তুমি নিজে অভদ্রের অগ্রগণ্য তোমার শিক্ষাই হয় নাই। এ স্থলে "নব্রুয়াৎ সত্য মপ্রিয়ং" প্রকৃষ্ট উপদেশ। অতএব পাছে লোকের ক্লেশ হয় এ চিন্তা ভদ্রতার অঙ্গস্বরূপ। পাছে লোকে রাগ করে, এই ভয় ও অনেক সময়ে এই চিন্তার রূপান্তর মাত্র। যে স্থানে কোন গুরুতর কর্ত্তব্যানুরোধ নাই সে স্থলে লোকের অশান্তি বা ক্লেশ উৎপাদন হইতে বিরত থাকিবার ইচ্ছা নিন্দনীয় নহে বরং প্রশংসনীয়। এ অর্থে চক্ষুলজ্জা ভালই। কিন্তু এই চক্ষুলজ্জা অনেক সময়ে আমাদের চরিত্রের একটী গূঢ় দুর্ব্বলতা স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ইহার জন্য বিবেক যেথানে তীব্র প্রতিবাদ করিতে বলিতেছে সেথানে তীব্র প্রতিবাদ করিতে পারি না ; যেথানে অপর এক ব্যক্তির সহিত স্পষ্ট একটা কথাবার্ত্তা কহিয়া অনেক দিনের একটা মনোবাদ ভঙ্গ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে, তাহা করিতে সাহসী হই না ; এক জনের একটী দোষ দেখিতেছি, অপরে সেজন্য ক্লেশ পাইতেছে, বলি বলি করিতেছি, বলিতে পারিতেছি না ; একজনের কোন ব্যবহারে চটিয়া যাইতেছি, অথচ সে ব্যক্তি জানিতে পারিতেছে না; একজন আমাকে অন্যায় কার্য্যের পোষক বলিয়া মনে করিতেছে ও প্রচার করিতেছে,ত্বরায় তাহার ভ্রম ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত বোধ হইতেছে, দিতে পারিতেছি না। ইহার ফল এই হইতেছে, আমার পুরাতন মনোগ্লানি থাকিয়া যাইতেছে ; এক জনের সমক্ষে মিষ্ট কথা পরোক্ষে রুক্ষ কথা বলিতেছি ; সম্মুখে দোষ দেখাইতে না পারিয়া পরোক্ষে দোষ কীর্ত্তন করিতেছি। আমার ব্যবহারটা অতিশয় ঘৃণিত হইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রতিদিন দেখিতে পাইতেছি অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জার জন্য কত বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটিতেছে ; পাপ প্রশ্রয় পাইতেছে; ও অন্যান্য প্রকারে কত অনিষ্ট হইতেছে—অপরাপর রিপু দমনের ন্যায় কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা অতিরিক্ত চক্ষু-লজ্জাকেও দমন করিতে হইবে।

চক্ষুলজ্জা ও পরনিন্দা—অনেক সময় চক্ষুলজ্জা হইতেই পরনিন্দা-প্রবৃত্তির উদয় হয়। যাহারা অপরের গৌরব সহ্য করিতে পারে না, এবং সেই গৌরব কোন প্রকারে হীন হইলে সুখী হয়, যাহাদের নিজের এরূপ মহত্ব নাই, যদ্দ্বারা লোকের প্রশংসাভাজন হইতে পারে, সুতরাং অপরকে লোকচক্ষে হীন করিয়া মহত্ব সাধন হইল মনে করে এবং সেই জন্যই অপরের কুৎসা রটনাতে আনন্দ পায়, তাহারাই প্রকৃত নিন্দুক। সৌভাগ্যক্রমে জনসমাজে এরূপ লোকের সংখ্যা অধিক নহে। তুমি আমি যে সময়ে সময়ে নিন্দুকের দলে পড়ি তাহা চক্ষুলজ্জার জন্য। নিন্দার সুশাণিত ছুরিকা যে সকল সময়ে শত্রুকুলের প্রতিই প্রয়োগ করা হয় তাহা নহে; আত্মীয় বন্ধুর প্রতিও

প্রয়োগ হইয়া থাকে; যাঁহাদিগকে ভালবাসি তাঁহাদিগের প্রতিও প্রয়োগ করা হয়। সম্মুখে বলিলে পাছে তিনি বিরক্ত হন এই ভয়ে সম্মুখে বলি না, পশ্চাতে দুই চারি জনে যখনই একত্র হই, তখনই সেই কথা। শুনিয়াছ অমুকের বিদ্যে—ইত্যাদি। আমাদের পরনিন্দা অনেক সময়ে পরোক্ষে বন্ধু বান্ধবের দোষের সমালোচনা। ইহাতে বিশেষ অনিষ্ট এই ঘটে যে সম্মুখে বলিলে তিনি হয়ত প্রকৃত ঘটনা বলিয়া দিয়া আমাদের ভ্রম দূর করিতে পারিতেন, তাহা ঘটিয়া উঠে না। যদি আমাদের ধারণার মধ্যে কোন ভ্রম থাকে, সে ভ্রম থাকিয়া যায়, এবং সেই ভ্রম বিস্তৃত হয়। ধীর ব্যক্তিরা এরূপ পরোক্ষ সমালোচনা হইতেও বিরত থাকেন; অপরের যে কিছু দোষ বা ত্রুটী অবগত হন, তাহা অতল জলে পুতিয়া ফেলেন। গুরুতর কর্ত্তব্যানুরোধ ব্যতীত কাহারও গূঢ় চরিত্র ব্যক্ত করেন না।

সৌজন্য কৃত্রিম ও অকৃত্রিম—সৌজন্য দুই প্রকার আছে, কৃত্রিম ও অকৃত্রিম। কৃত্রিম সৌজন্য একস্থানে প্রকাশ পায় অপর স্থানে প্রকাশ পায় না; এক শ্রেণীর প্রতি প্রদর্শিত হয় অপর শ্রেণীর প্রতি প্রদর্শিত হয় না; অকৃত্রিম সৌজন্য ধনী দরিদ্র সকলের প্রতিই সমান। একবার এ দেশীয় তিন জন ভদ্রলোক এ দেশীয় কোন রেল গাড়িতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাইতেছিলেন; ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইলে, তাঁহারা গাড়িতে উঠিয়া বসিয়া আছেন এরূপ সময় কয়েক জন ইংরাজ বালক সেই ষ্টেশনে আসিল। আসিয়াই গাড়িতে কালা মানুষ দেখিয়া জ্বলিয়া গেল। অতিশয় অপভাষা ব্যবহার করিয়া বিবাদ আরম্ভ করিল, ঘুষাঘুষি চলিতে লাগিল। অবশেষে ষ্টেশন মাষ্টার আসিয়া বিবাদের নিষ্পত্তি করিলেন। তাহারা নিরস্ত হইয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—"এ কিরূপ কাল দাঁড়াইতেছে যে ইংরাজকে এ দেশের লোক মারিতে সাহসী হয়" ইহা তাহাদের নূতন শিক্ষা। তাহাদের নিরস্ত হওয়ার পর দেখিতে পাইল যে সম্মুখের একখান গাড়ীতে একজন ইংরাজ ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা বসিয়া আছেন। তখন পরস্পর বলিতে লাগিল, "আঃ ছিঃ! হতভাগাগুলার জন্য ভদ্রলোকদিগের সমক্ষে অভদ্র ভাষা ব্যবহার করিলাম!" এই ব্যবহার হইতে কি উপদেশ পাওয়া যায়। তাহারা যে এ দেশের এতগুলি ভদ্রলোকের প্রতি অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে তাহাতে লজ্জা বোধ হয় নাই; অপর দুই জন ইংরাজ যে তাহা দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে তাহাতে লজ্জা। অর্থ এই,—এই সকল ইংরাজ বালক এই শিক্ষা পাইতেছে যে সৌজন্য ও ভদ্রতা ইংরাজের জন্যই রাখিতে হইবে এদেশীয়গণ তাহার পাত্র নহে। এইরূপ আমাদের মধ্যেও অনেকের সংস্কার দেখা যায় যে সৌজন্য ও ভদ্রতা কেবল সমকক্ষ ও সমাবস্থ লোকদিগের জন্য রাখিতে হইবে, দাস, দাসী, মুটে মজুর গাড়োয়ান প্রভৃতি তাহার পাত্র নহে। এই জন্য ঐ ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ এই সকল শ্রেণীর লোকের প্রতি কর্কশ, অভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে লজ্জিত হন না। ইহাদের প্রতি তেড়া মেজাজ ও পরুষভাষী হওয়া বড়লোকের একটা চিহ্ন বলিয়া মনে করেন। অকৃত্রিম সাধুতা যাঁহাতে আছে, তাঁহার ব্যবহার এরূপ নহে। ধনী দরিদ্র, সমাবস্থ ও হীনাবস্থ সকলেই তাঁহার সৌজন্য ও ভদ্র ব্যবহারের পাত্র।

অভ্যাস—যখন অভ্যাস ব্যতীত কোন বিদ্যাই লাভ হয় না তখন সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম-বিদ্যালাভ করিতে হইলে যে বিশেষ অভ্যাসের প্রয়োজন তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। পৃথিবীর কোন সামান্য বস্তু লাভ করিতে হইলেও যখন পূর্ণ প্রাণে ক্রমাগত চেষ্টা না করিলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না; তখন সেই দেব দুর্ল্লভ পরমধনকে লাভ করিয়া পাপতাপ হইতে মুক্ত হওয়া কি সহজ ব্যাপার? অনেকে নিয়মিত উপাসনা করেন না ও তাহা বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রাণে যখন উপাসনার ভাব হয় তখনই তাঁহারা উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর সাধকেরা নিয়মিত উপাসনাকে অভ্যাসের পূজা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই শ্রেণীর লোকের পক্ষে অনেক বিপদ। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা উজ্জ্বল আত্ম-দৃষ্টির অভাবে তাঁহাদের বিঘ্ন বিপত্তি দেখিতে পান না। ইঁহারা বড়ই সুখ শান্তিপ্রিয় এবং সংগ্রাম করিতে বড়ই ভয় পান। বিশেষতঃ অভ্যাস ও চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া ইঁহারা এমন অলস ও দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে, অবশেষে ইঁহাদের কর্ত্তৃত্ব-শক্তি অনেক পরিমাণে লোপ পায়। এই পরীক্ষা প্রলোভনপূর্ণ সংসারে দুগ্ধ-ফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া যিনি চিরকাল আরাম ও সুখ শান্তিতে দিন কাটাইবার আশা করেন তিনি নিতান্তই ভ্রান্ত। জীবনের বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়াই জীবনপথে অগ্রসর হইতে হইবে। সংগ্রামের জন্যই মানবের জন্ম, সংগ্রামেই মানব-জীবনের প্রকৃত উন্নতি। কিন্তু যাঁহারা স্বাভাবিক ভাবের অনুগত হইয়া সুখ শান্তিতে ব্রহ্ম-পূজা করিতে চান, তাঁহারা যখন শোক দুঃখও পাপের কশাঘাতে অস্থির হইয়া পড়েন, প্রাণ যখন যন্ত্রণায় ছট্ ফট করিতে থাকে, তখন আর তাঁহারা ব্রহ্ম-পূজা করিতে সমর্থ হন না। সুতরাং যতদিন তাঁহাদের প্রাণে আবার সরসভাব ফিরিয়া না আসে ততদিন তাঁহারা ব্রহ্মপূজা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া জীবনের অনেক সময় বিফলে কাটাইয়া থাকেন। ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হওয়াই আমাদের কার্য্য, তাঁহার চরণতলে মস্তক রাখাই আমাদের কর্ত্তব্য। আর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই,—তাঁহার পূজা তিনি নিজেই করাইয়া থাকেন; প্রাণে ব্যাকুলতা তিনি নিজে প্রদান করিয়া থাকেন; প্রাণে প্রেম, ভক্তি ও পবিত্রতার সঞ্চার তাঁহার কৃপা ব্যতীত হয় না। কৃপার ভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হওয়া ভিন্ন আমরা আর কি করিতে পারি। যাঁহারা স্বভাবের দাস তাঁহারা একটু গভীর চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে তাঁহারা ব্রহ্মপূজা চান না, চান শান্তি ও আরাম। ব্রহ্ম সাধকের পক্ষে বিশেষ অভ্যাসের অনুগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। বিশেষ সাধন অবলম্বন না করিলে চরিত্র পরিবর্ত্তিত ও জীবন গঠিত হয় না।

সাধকের পক্ষে প্রতি পদে বিপদ—ঘরে বিপদ,বাহিরে বিপদ ; সুতরাং বিশেষ সাবধানতার সহিত দিবানিশি ব্রহ্ম সত্তা হৃদয়ে অনুধ্যান না করিয়া সাধকের পক্ষে কখনও নিজকে নিরাপদ মনে করা উচিত নয়। যিনি প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের প্রাণে জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও পবিত্রতা প্রেরণ করিতেছেন সেই জীবনের উৎসের সহিত আমাদের আত্মার অবিচ্ছেদ্য যোগ—আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন-স্রোতগুলি সেই মহা স্রোত হইতে উৎপন্ন হইয়া জোয়ার ভাটার ন্যায় তাঁহারই সঙ্গে শুষ্কতায় সরসতায় বিহার করিতেছে, এই জ্ঞানই প্রকৃত অধ্যাত্ম যোগের মূল। এই অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক যিনি জীবন পথে চলিতে দৃঢ় সংকল্প হন ব্রহ্ম-কৃপায় তাঁহার মলিন বাসনা দূর হইতে থাকে তিনি সংযতেন্দ্রিয় ও জিত মনা হইয়া আত্মদ্বারাই আত্মাকে সংসার ও বিষয়-কূপ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।

সোহাগ ও প্রেম—সোহাগ চাও কি প্রেম চাও? সোহাগ ও প্রেমে প্রভেদ কি? সোহাগ বায়ু-তাড়িত নদী তরঙ্গের ন্যায় সময়ে সময়ে উছলিয়া উঠে ; প্রেম স্থায়ী স্রোতের ন্যায় অন্তরে প্রবাহিত থাকে। দুই রূপ প্রকৃতি দেখা গিয়াছে, কাহারও সোহাগ আছে প্রেম নাই ; কাহারও প্রেম আছে সোহাগ নাই। দুটী ছবি দেখ ;—এক ব্যক্তি বড় ভাবুক লোক। একটু বাতাস লাগিবা মাত্রই ভাব উছলিয়া উঠে। তাঁহার একটী বন্ধু ছিলেন,তিনি যখনি বাড়ীতে আসিতেন,অমনি আমাদের ভাবুক লোকটী আনন্দে গলিয়া যাইতেন ; গলা জড়াইয়া, চুম্বন করিয়া, খাটে বসাইয়া, মিষ্টান্ন আনিয়া দিয়া কত আপ্যায়িত করিতেন। কিন্তু বন্ধুর যখন বিপদ ঘটিত তখন তাঁহাকে সাহায্যের জন্য তত ব্যগ্র দেখা যাইত না ; দশ খানি পত্র লিখিয়াও উত্তর পাওয়া যাইত না। যখন বন্ধুর পরলোক হইল, তখন ভাবুকটী তাঁহার পরিবার পরিজনকে একেবারে ভুলিয়া গেলেন, তত আত্মীয়তা একেবারে ফুরাইল। দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রেমিক লোক, তিনি লজ্জার অন্তরালে প্রেমকে ধারণ করিতেন ; হস্ত পেষণ, মুখ চুম্বন, কণ্ঠালিঙ্গন প্রভৃতি তত অধিক পরিমাণে ছিল না ; তবে এক সঙ্গে সর্ব্বদা বেড়াইতেন ও থাকিতেন, লোকে জানিত দুই জনে খুব প্রণয় এই মাত্র। ইতি মধ্যে বন্ধুটীর মৃত্যু হইল। অমনি আমাদের প্রেমিকটী নিজের পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য যে শ্রম করিতেন, তাহা বাদে প্রাতে ও রাত্রে গুরুতর শ্রম করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং তদ্দারা সেই বন্ধুর পরিবার পরিজনের ভরণ-পোষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ শ্রম দ্বাদশ বৎসর চলিল, তৎপরে বন্ধুর সন্তানগুলি মানুষ হইল। তাহাদিগকে নিরাপদ ও সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া তবে তিনি প্রেমের ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। ইহার কোন্ ছবিটী দেখিতে ইচ্ছা করে? একজন ঈশ্বরকে সোহাগ করিতে খুব পটু—ঈশ্বরের সন্দর্শনে,অশ্রু, পুলক, মূর্চ্ছা প্রভৃতি ভাবের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় ; কিন্তু তাঁহার সেবা ও প্রিয় কার্য্য সাধনে মনোযোগ নাই ইহা দেখিতে কি অধিক সুখী হও ; অথবা এক ব্যক্তি ঈশ্বর-প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া বার বৎসর নীরবে কঠিন শ্রম করিতেছে, তাহা দেখিতে ভাল বাস? আমরা বলি সোহাগ ও প্রেম দুই থাকুক,—কেবল এই মাত্র সাবধান, সোহাগ যেন প্রেমের প্রতি দৃষ্টিকে অন্ধ না করে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

দ্বাদশ বৎসরের পরীক্ষার ফল।

জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় দিবস সেই দিন যে দিন প্রবল ঝটিকা ও আন্দোলনের মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যীশু যখন জন্মিয়াছিলেন তখন আকাশে এক বিশেষ তারা উদিত হইয়াছিল ; বুদ্ধ যখন জন্মিয়াছিলেন তখন মেদিনী থর থর কম্পিত হইয়াছিল ; চৈতন্য যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন তখন রাঢ়ে সদ্যোজাত শিশু নিত্যানন্দ অট্ট হাস্য করিয়া উঠিলেন! সকল মহাপুরুষের জন্ম কালে এই রূপ অলৌকিক ঘটনা সকলের কল্পনা আছে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্ম গ্রহণের সময় প্রবল সমাজ-কম্প হইয়াছিল। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আন্দোলিত ও আলোড়িত হইতেছিল। এই শিশু যখন জন্মিল তখন এক হস্তে আশীর্ব্বাদ অপর হস্তে অভিসম্পাতের ডালি লইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্মগ্রহণ করিলে কেশবচন্দ্র ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, ইহার আয়ু পাঁচ বৎসরের অধিক নাই। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন, বিদ্বেষ ভাবে যাহার জন্ম, তাহা ঈশ্বরের রাজ্যে স্থায়ী হইতে পারে না। তিনি যে আমাদের কার্য্যের মধ্যে বিদ্বেষের অধিক আর কিছু দেখিতে পান নাই, এই শোচনীয় ভ্রম হইতেই অনেক অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। যদি এ ভ্রম তাঁহার না হইত তাহা হইলে হয় ত আমরা তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতাম না, এবং তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকে অবশেষে যে অবস্থাতে পরিণত করিয়াছিলেন তাহাও হয় ত করিতে পারিতেন না। অথবা এ সকল কথাই বা বৃথা কেন বলি? মানবীয় বুদ্ধির দ্বারা কেনই বা ইহা না হইলে কি হইত, উহা না হইলে কি হইত, এরূপ বিচার করি? ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য, ভারতের জন্য, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটী পদার্থের প্রয়োজন ছিল বলিয়াই ঈশ্বর ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন।

যাহা হউক সুখে দুঃখে,শান্তিতে অশান্তিতে,আলস্যে সংগ্রামে দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যাহাদিগকে লইয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে হয় ত আর ইহার ক্রোড়ে নাই ; প্রথমে যাঁহারা ইহার সেবা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে হয় ত সে সেবা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এই দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে অনেক ঝড়, অনেক পরীক্ষা, অনেক সংগ্রাম ইহার উপর দিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে সমুদয় অতিক্রম করিয়া আজ ঈশ্বর-কৃপায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দণ্ডায়মান থাকিয়া কার্য্য করিতেছে। বিগত দ্বাদশ বৎসরের পরীক্ষার ফল অতি স্থূলভাবে নিম্নে কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা যাইতেছে,—

প্রতিষ্ঠার সময় যে সকল লোক লইয়া সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের

অঙ্গ গঠিত হইল, তাঁহারা অনেক পরিমাণে পরস্পরের নিকট অপরিচিত ছিলেন। আমরা এক সঙ্গে পূর্ব্বে কখনও কাজ করি নাই; পরস্পরের দোষগুণ পরস্পর অবগত ছিলাম না; এইরূপ কতকগুলি লোক লইয়া আমাদের সমাজের অঙ্গের গঠন হইল। ইহার ফল যাহা হওয়া সম্ভব আমরা প্রথম প্রথম তাহা অনুভব করিতে লাগিলাম। পরস্পরের সহায় হইবার প্রবৃত্তি অপেক্ষা পরস্পরের কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিবার ও বাধা দিবার প্রবৃত্তি প্রবল দেখা যাইতে লাগিল। এক একটী প্রশ্ন লইয়া এমন মতভেদ ও দলাদলি বাঁধিতে লাগিল, এত বাগ্‌বিতণ্ডা হইতে লাগিল যে, সময়ে সময়ে মনে সন্দেহ ও নিরাশা জন্মিতে লাগিল, বুঝি বা সমাজকে দণ্ডায়মান রাখিতে পারা গেল না।

ভিতরে যেমন পরস্পরের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থার অভাব, বাহিরের লোকেরও আমাদের প্রতি আস্থার অভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। বাহিরের লোকের অনাস্থার কারণ এই ছিল, যে সে সময়ে যে সকল ব্রাহ্মবন্ধু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রণীস্বরূপ ছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশের বিষয়ে ব্রাহ্ম সাধারণে বিশেষ কিছু জানিতেন না; তাঁহারা এমন কিছু করেন নাই যাহাতে তাঁহাদের প্রতি আস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; ওদিকে কেশব বাবু প্রভৃতি তাঁহাদের কাগজ পত্রে ব্রাহ্মদিগকে এই বুঝাইতে লাগিলেন, যে ব্রাহ্মসমাজে তাঁহার বিদ্বেষ্টা কতকগুলি লোক ছিল, যাহারা নানা প্রকারে প্রতিবাদ করিতেছিল, এই আন্দোলন তাহাদেরই কার্য্য। এই সকল কারণে ব্রাহ্ম সাধারণের মনে প্রথম হইতেই আমাদের প্রতি অনাস্থার ভাব দৃষ্ট হইল।

এই রূপ অন্তর বাহিরের অনাত্মীয়তার মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ জন্মগ্রহণ করিলেন। আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে সমাজের কার্য্য করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম; কিন্তু নিয়মতন্ত্র প্রণালী যে কি তাহা কেহই ভাল রূপে জানিতাম না। অজ্ঞতার অন্ধকারে পথ হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যেটা আমাদের আবশ্যক ও কর্ত্তব্য বোধ হয় করিবার চেষ্টা করি, ও যেটা অন্যায় বোধ হয় শুধরাইবার চেষ্টা করি, এই রূপেই আমাদের সকল কার্য্য বিভাগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

যে দুইটী মহাসত্য রক্ষা করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইল—তাহা এই—(১ম) চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতা রক্ষা করাই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মহত্ব (২য়) ব্রাহ্ম সমাজ ব্রাহ্ম সাধারণের সম্পত্তি। প্রথম সত্যটী রক্ষার জন্য ইহার গুরুবাদ ও পৌরহিত্যের সহিত বিবাদ; দ্বিতীয়টী রক্ষার জন্য ইহার নিয়মতন্ত্র প্রণালীর দিকে দৃষ্টি। এই দুইটী ভাব ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বিলুপ্ত হইতেছিল বলিয়াই সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের অভ্যুদয়। কেশব বাবু ও তাঁহার শিষ্যগণ এই দুইটীকে রক্ষা করিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইত না। ব্রাহ্মসমাজের ও ভারতের কল্যাণের জন্য এই দুইটী মহাসত্যকে রক্ষা করা ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই জন্যই তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অভ্যুদিত করিলেন।

এখন দেখা যাউক এই দ্বাদশ বৎসর কালের মধ্যে উক্ত উভয় লক্ষ্য সিদ্ধি সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমরা দ্বাদশ বৎসর পরে এই দুইটী ভাবই পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল দেখিতেছি। চিন্তার ও কার্য্যের স্বাধীনতার ভাব আমাদের কার্য্যের সকল বিভাগেই প্রবল। গুরুবাদ ও পৌরহিত্যের প্রতি সভ্যগণের এত বিরাগ যে এ ভাবের যে কিছু কেহ আনিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা দাঁড়াইতে পারিতেছে না; বরং তাঁহারাই দূরে গিয়া দাঁড়াইতেছেন। ব্রাহ্ম-সমাজ ব্রাহ্ম সাধারণের সম্পত্তি এই ভাবও অতিশয় উজ্জ্বল হইয়াছে। এত দিনের পর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য ব্রাহ্মদিগের অনুরাগের ভিত্তির উপর দাঁড়াইতেছে।

এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আরও অনেক কার্য্য করিয়াছেন। প্রথমে নিতান্ত বাহিরের কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করি (১ম) ইহার সভ্যগণ কলিকাতার মধ্যস্থলে এমন একটী উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন যাহাতে ৮০০।৯০০ শত লোক সচ্ছন্দে বসিয়া ঈশ্বরের পূজা করিতে পারেন; (২য়) এতদ্ভিন্ন ইহার সভ্যগণ, কলিকাতা সহরে ও ইহার সন্নিকটে কয়েক লক্ষ টাকার মূল্যের স্থায়ী সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, (৩য়) কলিকাতাতে ছয় খানি সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা চালাইতেছেন; (৪র্থ) ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যার্থ সমাজ একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন ও বহু সংখ্যক পুস্তক ও পুস্তিকা ইংরাজী ও বাঙ্গালাতে মুদ্রিত করিয়াছেন। যুবকদিগের শিক্ষার জন্য একটী স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিয়াছেন ও চালাইতেছেন; এবং আপনাদের মধ্য হইতে জাতিভেদ প্রথা বাল্য বিবাহ প্রভৃতি উন্মূলিত করিতেছেন।

কিন্তু এ সকল বাহিরের বিষয়। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের মহত্ব ও গুরুত্ব আরও অনুভব করিতে পারা যায়। প্রথম, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ না জন্মিলে, ভগ্নোদ্যম হইয়া অনেক ব্রাহ্ম কোথায় চলিয়া যাইতেন, তাহা বলা যায় না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনেকের আশা ভরসার ও দাঁড়াইবার স্থান হইয়াছে; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অনেক হৃদয়ে ধর্ম্ম তৃষ্ণাকে প্রবল করিয়াছে; শত শত যুবককে আকৃষ্ট ও নানা সদনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিয়াছে; সকল প্রকার সমাজ সংস্কারের ভাবকে প্রবল করিয়াছে; সভ্যগণকে পরস্পরের মত ও স্বাধীনতাকে সম্মান করিতে শিখাইয়াছে; ব্রাহ্মসমাজের প্রতি ব্রাহ্মদিগের অনুরাগকে বর্দ্ধিত করিয়াছে; বিশেষ ভাবে নারীগণের উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছে।

এক দিকে যেমন এই সকল দেখিয়া আনন্দিত হইবার কথা অপর দিকে ত্রুটী এবং অভাবও যথেষ্ট রহিয়াছে।

প্রথম, নিয়মতন্ত্র প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যে শক্তি সামর্থ্য আছে, সে সমুদায় আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য এখনও খাটাইতে পারি নাই। যে পরমাণুপুঞ্জে আমাদের সমাজ গঠিত হইয়াছে, সে সকল পরমাণুর মধ্যে ঘন-নিবিষ্টতা নাই। এখনও পরস্পরের কার্য্যের দোষ প্রদর্শন করিতে অনেক সময় নষ্ট হইতেছে; যে শক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারে ব্যয়িত হওয়া উচিত, তাহার অনেকটা পরস্পরের সহিত সংঘর্ষণে নষ্ট হইতেছে। একদিকে যেমন ঘন নিবিষ্টতার অভাব, অপর

দিকে তেমনি কার্য্যের শৃঙ্খলার অভাব। সমাজের সকল কার্য্যে সকলের যোগ ও উৎসাহ পাওয়া যাইতেছে না অনেকস্থলে যাহার যে কার্য্যটা ভাল বোধ হইতেছে, তিনি অন্যান্যের পরামর্শ নিরপেক্ষ হইয়া তাহা আরম্ভ করিতেছেন; ফল এই হইতেছে যে, তাঁহাকে বা তাঁহার মতাক্রান্ত দুই চারি জনকে তাহা চালাইতে হইতেছে; অপরের সাহায্য বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না; একজন একদিকে একভাবে কার্য্যারম্ভ করিতেছেন, অপর জন অপর দিকে আর এক ভাবে কার্য্যারম্ভ করিতেছেন; পরামর্শ নাই, শৃঙ্খলা নাই, শ্রমবিভাগ নাই, এরূপেও অনেক শক্তি ক্ষয় হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা প্রবৃত্তি যত প্রবল হইয়াছে, সাধুভক্তি সে পরিমাণে প্রবল হয় নাই; স্বাবলম্বন শক্তি যত জাগিয়াছে, আত্ম-বিসর্জ্জন শক্তি তত জাগে নাই; ইহাই বোধ হয় সমাজের ঘন-নিবিষ্টতার অভাবের কারণ। আমরা এখনও মানব অন্তরে সে অগ্নি জ্বালাইতে পারিতেছি না, যাহাতে পতঙ্গের ন্যায় মানব আত্মসমর্পণ করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ মানুষ মাত্রেরই একটা স্বভাব থাকে, একটা চরিত্র থাকে; সংবাদপত্র মাত্রেরই একটা policy থাকে, সেটা তার চরিত্র; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধে কোন চরিত্র নাই। সভ্যদিগের মধ্যে যাহার যাহা ভাল লাগিতেছে, তিনি সেইরূপ সাধন পথে চলিয়া যাইতেছেন।

বিগত দ্বাদশ বৎসরে যে সকল কঠিন সমস্যা আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে ও যাহাতে আমাদিগকে অনেক ভাবিতে হইতেছে, তাহার কতকগুলি নির্দ্দেশ করিতেছি। প্রথম, সামাজিক অপরাধ ও সামাজিক শাসন। এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ঘটিয়াছে, ও তজ্জন্য আমাদিগকে পরস্পরের সহিত অনেক বাদানুবাদ করিতে হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে কেবলমাত্র ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছেন, তাহা নহে, একটী নূতন সমাজও গঠন করিতেছেন। প্রাচীন সমাজে সমাজ শাসনের যে সকল রীতি ছিল, তাহা এই নব সমাজের প্রতি খাটে না; অথচ এই নব সমাজের নিজের রীতি নীতি এখনও বদ্ধমূল হয় নাই; আমাদিগকে সামাজিক নীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সকলের প্রত্যেকটীরই নূতন করিয়া বিচার করিতে হইতেছে।

আর একটী বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে সর্ব্বদা বাদানুবাদ হইয়াছে, সেটী পুরুষ ও রমণীর সম্মিলন প্রণালী। আমরা জ্ঞানে স্ত্রী স্বাধীনতাকে অবলম্বন করিয়াছি; কিন্তু প্রাচীন ভাবকে এখনও মন হইতে দূর করিতে পারি নাই। বিশেষতঃ এ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে সকলের মত এক নয়, এই জন্য এতৎসংক্রান্ত কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে মতভেদ ও বাদানুবাদ হইয়া থাকে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার উন্নতি সহকারে ইহা অন্তর্হিত হইবে, তদ্ভিন্ন উপায় দেখা যায় না।

তৃতীয়, আর একটী বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়াছে এবং এখনও চলিতেছে। তাহা সমাজের সহিত প্রচারকদিগের সম্বন্ধ। সমাজ বড়, কি প্রচারক বড়। প্রচার কার্য্য কি সমাজের ইচ্ছাধীন চলিবে, না প্রচারকের ইচ্ছাধীনে চলিবে? এ বিষয়ে আমরা অনেক বাদানুবাদ করিয়াছি। এই বিষয়টী যতদিন স্থির না হইবে, মধ্যে মধ্যে এই গোলযোগ উঠিবে। ইহা বলা বাহুল্য যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীকে যদি দণ্ডায়মান রাখিতে হয়, কোন কর্ম্মচারীকে সমাজ অপেক্ষা বড় হইতে দেওয়া উচিত হইবে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের সকলের অপেক্ষা বড়, ঈশ্বরের দূত ও আমাদিগকে তুলিবার জন্য তাঁহার হস্তস্বরূপ। আমরা যদি সকলে ইহার অনুগত না হই, তাহা হইলে ইহার কার্য্য চলিতে পারে না।

মানবের অকৃতজ্ঞতা।

কোন নগরে এক প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী নরপতি বাস করিতেন। তিনি অন্যান্য নরপতিদিগের ন্যায় ভোগ-লালসা তৃপ্তির জন্য ঈশ্বরদত্ত সম্পত্তি ব্যয় করিতেন না। জনহিতকর কার্য্যে অর্থ ব্যয় করাই তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নগরের অক্ষম শয্যাশায়ী রুগ্ন ব্যক্তিদিগের নিকট পরিচিত ছিলেন। অনেক অন্ধ আতুর তাঁহার দ্বারে নিত্য উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব অভাব মোচন করিয়া লইত। রাজা দানশীল ছিলেন সত্য, কিন্তু কখনও অপাত্রে দান করিতেন না। অপাত্রে দান তিনি ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বিগর্হিত কার্য্য মনে করিতেন। এজন্য দানকালে বিলক্ষণ সাবধান হইয়া পাত্রাপাত্র নির্দ্ধারণ করিতেন। দান গৃহীতা তাঁহার দত্তধন কি কার্য্যে ব্যয় করিয়া থাকে, তাহা গোপনে অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। একদা কোন এক গুপ্তচর আসিয়া মহারাজাকে সংবাদ দিল, যে জনৈক আতুর মহারাজের দত্ত ধন নানা প্রকার দুষ্ক্রিয়াতে ব্যয় করিয়াছে। তৎপর দিন যখন সেই আতুর ভিক্ষা প্রাপ্তির আশায় দ্বারে উপনীত হইল, তখন মহারাজ তাহাকে তাহার অপরাধের বিষয় জানাইয়া দান বন্ধ করিয়া দিলেন। আতুর বলিতে লাগিল, "মহারাজ! আমি নিত্য নিত্য তোমার দ্বারে ভিক্ষা পাইয়া থাকি। আজও আপনাকে দিতে হইবে, ভিক্ষা না পাইলে আমি কোন ক্রমেই দ্বার ছাড়িব না।" মহারাজ বলিলেন, "তুমি তোমার অসদ্ব্যবহারের জন্য আজি ভিক্ষা লাভ করিতে পারিতেছ না। যাহারা আমার দত্ত ধনের সদ্ব্যবহার করে, কেবলমাত্র তাহারাই আমার দান লাভের অধিকারী।" ভিক্ষুক ইহা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইল এবং নিতান্ত বুদ্ধি-বিহীন মূর্খের ন্যায় বলিতে লাগিল, "কেন মহারাজ? আমি যখন প্রতিদিন ভিক্ষা পাইতেছি, তখন আমার এই ভিক্ষার উপর স্বত্ব জন্মিয়াছে, আপনি অন্যায় পূর্ব্বক আমার অধিকার হইতে আমাকে বিচ্যুত করিতেছেন, যদি আপনি বলপূর্ব্বক আমার এই প্রাপ্য ধন হইতে আমাকে বঞ্চিত করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনাকে তজ্জন্য ফল ভোগ করিতে হইবে।" মহারাজ ভিক্ষুকের এইরূপ অস্বাভাবিক ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

পাঠক হয়ত মনে করিবেন ইহা কল্পনার চিত্র,প্রকৃত জীবনে এরূপ ঘটনা দৃষ্ট হয় না। সংসারে এমন নির্ব্বোধ কেহ নাই যে দাতার দত্ত ধনের উপর অধিকার স্থাপনের প্রয়াস পাইয়া থাকে। সংসারের নরপতির সম্বন্ধে এরূপ ঘটনা সত্য না হইতে

পারে। কিন্তু বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পতির প্রতি এরূপ ব্যবহার সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। নরনারী দিবানিশি তাঁহার করুণার ফল ভোগ করিতেছে। পরম কারুণিক পরমেশ্বর আমাদের কল্যাণ সাধন জন্য প্রভূত ঐশ্বর্য্যে আমাদিগকে বিভূষিত করিতেছেন। আমরা মায়া-মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় তাহার অসদ্ব্যবহার করিতেছি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ মহাপুরুষ, তিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, তাঁহার জ্ঞানের অগোচরে মানব কোন কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং তিনি তাঁহার দত্ত ধন আমরা কি কাজে ব্যয় করিতেছি, গুপ্ত চর না পাঠাইয়াও তাহা সমস্ত জানিতেছেন? তিনি আমাদিগের এইরূপ অসদ্ব্যবহার জানিতে পারিয়া আমাদের প্রাপ্য ধন আমাদিগকে আর প্রদান করিতেছেন না। কিন্তু আমরা উল্লিখিত কল্পিত ভিক্ষুকের মত মনে করিতেছি, ঈশ্বর অন্যায় পূর্ব্বক আমাদের স্বত্ব হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিতেছেন।" অনেকে হয়ত মুখে এত গুলি কথা উচ্চারণ করিতে না পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ অনেকেই দেখাইতেছেন যে তাঁহারা ঈশ্বরকে নিষ্ঠুর অন্যায়কারী এক জন দুর্বৃত্ত শাসক মনে করেন। কোটী পতি বণিক হয় ত অনেকের সর্ব্বনাশ করিয়া রাশিকৃত ধন সঞ্চয় করিল দৈব দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাহার সেই সমস্ত ধন বিনষ্ট হইল। ধনী তখন মনে মনে কি ভাবিবে? এত দিন যে দয়াময় ঈশ্বরের করুণার সুফল ভোগ করিয়া আসিয়াছে,যে করুণার উপর তাহার কোন দাওয়া দাবি ছিল না, সেই করুণার কথা স্মরণ করিয়া সে কৃতজ্ঞতার ভারে অবনত হইবে? না চিরকাল দয়া ভোগ করিতে পারিল না বলিয়া দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হৃদয়ে দয়াময় প্রভুকে অভিসম্পাত করিবে? অধিকাংশ স্থলেই প্রমত্ত ধনী ধন হারাইয়া মূর্থ আতুরের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপ কোন প্রকার দুঃখের ব্যাপার হইলেই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অকৃতজ্ঞতাকেই মনে স্থান দিয়া থাকে। শোক, তাপ, আক্ষেপ, অনুশোচনা, কৃতজ্ঞতার বিরোধী শত্রু; যাহা পাইয়াছি তাহার জন্য আমাদের সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত; যাহা পাই নাই, অথবা পাইয়া হারাইয়াছি, তজ্জন্য কাঁদিব কেন? দাতা স্বাধীন, তাঁহার দয়া প্রবৃত্তির উপর দান গৃহীতার কোন আধিপত্য নাই বটে কিন্তু একটা গুরুতর সম্বন্ধ রহিয়াছে। দয়া পাত্র অন্বেষণ করে; পাত্র অভাবে দয়া বাঁচিতে পারে না,পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। যদি সংসারে দুঃখী, তাপী না থাকিত তাহা হইলে দয়ার জন্ম হইত কি না সন্দেহ। প্রাণীর সহিত বায়ুর যেরূপ সম্বন্ধ। দয়া প্রবৃত্তির সহিত পাত্রের সেইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু বায়ু-শূন্যতা যেমন প্রাণ নাশক দূষিত বায়ুও তদ্রূপ। সুপাত্র দয়ার প্রাণ রক্ষা করে, কিন্তু অপাত্র তাহা করিতে পারে না, বরং তাহা দয়া প্রবৃত্তির প্রাণ নাশ করিয়া থাকে। তাই বিশ্ব পতি অপাত্রে দান করিতে বাধ্য নহেন। অপাত্রের তাহা বুঝিয়া লওয়া উচিত; এবং শোকের কান্না না তুলিয়া, সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ থাকাই বিধেয়।

মানব অকৃতজ্ঞ হয় কেন? এখন তাহারই একটু আলোচনা করা যাউক। আমরা ইতি পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে দয়ার সহিত দুঃখী তাপীর সহিত দুশ্চ্ছেদ্য প্রাকৃতিক সম্বন্ধ রহিয়াছে। যখন প্রথম জীবনে একবার দয়ার কার্য্য প্রত্যক্ষ করে, তখনই তাহার মনে এই সম্বন্ধ-তত্ত্ব জাগিয়া উঠে; এবং এই সম্বন্ধ যে কখনও বিচ্ছিন্ন হইতে পারে ইহা সে মনে করিতে পারে না। যে অবস্থায় এই সম্বন্ধ চির স্থায়ী হইতে পারে সে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, মনে করে সর্ব্বাবস্থায় ইহা চির স্থায়ী হইবে। এই রূপ কোন মূর্খ স্বামী এবং কোন জ্ঞান-হীনা স্ত্রী, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ সর্ব্বাবস্থাতে চির স্থায়ী মনে করিয়া থাকে। কিন্তু স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ চির স্থায়ী করিতে হইলে উভয়েই উভয়ের প্রতি একান্ত হৃদয়ে অনুরক্ত বা অনুরক্তা থাকিতে হইবে। অন্যথা তাহা চির স্থায়ী হইতে পারে না। নিশ্চয়ই সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। এইরূপ দাতা এবং গৃহীতার সম্বন্ধ তখনই চির স্থায়ী হইতে পারে, যখন দাতা দান শীল হন, এবং গৃহীতা দত্ত ধনের সদ্ব্যবহার করে। অন্যথা সে সম্বন্ধ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। গৃহীতা সম্বন্ধ চিরস্থায়ী রাখিবার জন্য যাহা কর্ত্তব্য তাহা না করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, তজ্জন্য দাতার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইতেছে, কিন্তু দাতাকে এই অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের বিনাশক মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতেছে; এবং কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে অকৃতজ্ঞতার প্রশ্রয় দিতেছে। যেমন অনেক নীচাশয় স্বামী স্বকীয় অত্যাচারের জন্য পতিব্রতা রমণী কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে, তাহাকে মুখরা বলিয়া পরিত্যাগ করে, এবং তাহার কুৎসা কীর্ত্তনে রসনাকে কলুষিত করে; যেমন অনেক দুশ্চারিণী রমণী, অনুরক্ত স্বামী কর্ত্তৃক নিন্দিতা হইয়া পতি বিদ্বেষিণী হয়, সেইরূপ অনেক ভিক্ষুক ঈশ্বর দত্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া স্বদোষে যখন তাহা হারায় তখন অকৃতজ্ঞতার পাপ-ভারে আত্মাকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলে।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, দ্বিতীয়ভাগ।*

(সমালোচন)

যাহারা মনযোগপূর্ব্বক ব্রাহ্ম-সাহিত্যের চর্চ্চা করেন, আগ্রহের সহিত ব্রাহ্ম-চিন্তার গতি বিধি পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিতেছেন যে বিগত দশ বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজে ধর্ম্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে একটী নূতন যুগ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ,বাবু কেশবচন্দ্র সেন ও বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়দিগের কার্য্য শেষ হইয়াছে। ইহাঁরা পুরাতন যুগের নেতা। পুরাতন যুগের এক জন নেতা বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এখনো এই ক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন বটে, কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্যপ্রণালী, তাঁহার পুরাতন মত, অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; সুতরাং এখন তাঁহাকেও নূতন যুগের লোক বলিয়াই ধরিতে হইবে। ফলতঃ নূতন যুগের অন্যান্য নেতাদিগের সহিত তাঁহার কোন মৌলিক প্রভেদ নাই, সুতরাং তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্য নূতন

---

* ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, দ্বিতীয়ভাগ। শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণবিহারী সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা। ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্ম মিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত দ্বারা মুদ্রিত। ১২৯৬ সাল। মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

যুগেরই অন্তর্গত। পুরাতন ও নূতন যুগের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য এই,—পুরাতন যুগের নেতারা প্রায় সমুদায় ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধেই আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞানের দোহাই দিতেন,আর এরূপ দোহাই দিয়াই নিরস্ত থাকিতেন বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। নানা প্রকার যুক্তি দ্বারা ধর্ম্ম বিশ্বাসকে সমর্থন করা, নিরীশ্বর মত সমূহের সহিত সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল মত খণ্ডনের চেষ্টা করা—এই সমুদায়কে প্রাচীন নেতারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য বলিয়াই মনে করিতেন না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সমূহ বিশ্বজনীন্ ও মানব মনের পক্ষে অনতিক্রমনীয় এই সত্যের আভাস পাইয়াই তাঁহারা তৃপ্ত হইয়াছিলেন। নূতন যুগের নেতারা ইহাতে তৃপ্ত নহেন। ইহাঁরাও আত্মপ্রত্যয়বাদী, সন্দেহ নাই; কিন্তু কেবল আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দিয়াই ইহাঁরা সন্তুষ্ট নহেন। পূর্ব্বাপেক্ষা আত্মপ্রত্যয়ের বিস্তৃততর ব্যাখ্যা দেওয়া, আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ মূল সূত্র অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বিবিধ যুক্তি প্রদান করা, জড়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ, মায়াবাদ, সুখবাদ, সাকারবাদ প্রভৃতি নিরীশ্বর ও অব্রাহ্ম মতের আলোচনা বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্মবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষণ। নূতন যুগের ধর্ম্মবিজ্ঞান-লেখকদিগের মধ্যে বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কোন কোন বিষয়ে উচ্চতম স্থানের অধিকারী। বিষয়ের বৈচিত্র্য এবং রচনার প্রাঞ্জলতা ও মনোহারিত্বে অন্য কোন লেখক তাঁহার সমান নহেন। অপর কাহারো গ্রন্থ তাঁহার গ্রন্থ সমূহের ন্যায় এত অধিক লোকের দ্বারা পঠিত হয় না। নূতন যুগের নূতন মত ও ভাবগুলি যে তাঁহারই দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরো হইবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

আশা করি তত্ত্বকৌমুদীর অনেক পাঠক নগেন্দ্র বাবুর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা প্রথমভাগের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত। উক্ত পুস্তকে ধর্ম্মবিজ্ঞানের কতকগুলি গভীরতর বিষয়ের আলোচনা নাই; কিন্তু যে যে বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা অনেক স্থলেই অতি উৎকৃষ্টরূপে হইয়াছে। সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিতে গেলে অনেক স্থলে বাধ্য হইয়াই দার্শনিক গভীর আলোচনা পরিহার করিতে হয়। নগেন্দ্রবাবু তাঁহার রচিত পুস্তক সমূহে তাহাই করিয়াছেন। কিছু দিন হইল নগেন্দ্র বাবুর ধর্ম্মজিজ্ঞাসার দ্বিতীয় ভাগ বাহির হইয়াছে। আমরা অতিশয় আগ্রহ ও আহ্লাদের সহিত এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ভাষার প্রাঞ্জলতা, বহুল দৃষ্টান্ত, গভীর চিন্তা-প্রসূত সৎযুক্তি, বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পাঠে অনভ্যস্ত পাঠকের ক্লান্তি-নিবারক বিশুদ্ধ রসিকতা প্রভৃতি নগেন্দ্রবাবুর রচনার সমস্ত গুণই এই গ্রন্থে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আশা করা যায় ধর্ম্মজিজ্ঞাসা প্রথমভাগের ন্যায় এই দ্বিতীয়ভাগও ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বিস্তৃত রূপে পঠিত হইবে। এই পুস্তকে নিম্ন-লিখিত বিষয় গুলি আলোচিত হইয়াছেঃ—প্রার্থনা, প্রকৃত শাস্ত্র, আত্মার স্বাধীনতা, পাপ কি? ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত। এই পাঁচটী বিষয়ই অতি প্রয়োজনীয়, এবং প্রথমটী ছাড়িয়া দিলে অসঙ্কুচিত ভাবে বলা যায় যে আর কোন ব্রাহ্ম গ্রন্থে এই সকল বিষয় এরূপ বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হয় নাই। প্রথম বিষয়টীও এরূপ উৎকৃষ্টরূপে আর কোথাও আলোচিত হইতে দেখি নাই। এই বিষয়ের আলোচনা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু বলিব না; কেবল একটী কথা বলিব। প্রার্থনা সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু যত যুক্তি দিয়াছেন তন্মধ্যে শক্তির আধ্যাত্মিকতা—ব্রহ্মশক্তির একাধিপত্য—সম্বন্ধীয় যুক্তিই আমাদের কাছে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। জগতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন অপর কোন শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে প্রার্থনার সাক্ষাৎ ফলদাতা যে স্বয়ং ঈশ্বর তাহা প্রমাণ করা বড়ই কঠিন। এইজন্যই নগেন্দ্রবাবু এই পুস্তকে প্রথমভাগ ধর্ম্মজিজ্ঞাসায় ব্যাখ্যাত শক্তিতত্বের সংক্ষিপ্ত পুনরুক্তি করিয়াছেন। কেবল পুনরুক্তি নহে, তৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু অধিক বলিয়াছেন। জগতে জড়শক্তি বা অন্ধ শক্তি বলিয়া কোন শক্তি নাই, সমুদায় শক্তিই সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি, কেবল তাহাই নহে; জড় বা প্রকৃতি বলিয়া ঈশ্বরাতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই—এইটী নূতন যুগের একটী বিশেষ মত। কোন কোন পুস্তকে এই মত বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। নগেন্দ্র বাবুও এই মতে সায় দিতেছেন;—"প্রাকৃতিক শক্তি ও ঐশীশক্তি একই পদার্থ। প্রকৃতি বলিয়া কোন পদার্থ বা ব্যক্তির স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করি না। এক ঐশী শক্তি বহির্জ্জগতে ও অন্তর্জ্জগতে নিরন্তর কার্য্য করিতেছে। প্রকৃতি ও ঈশ্বর, এই উভয়ের স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনা মাত্র। (২৫ পৃঃ)

"প্রকৃত শাস্ত্র" বিষয়টী স্বভাবতঃই দুইভাগে বিভক্ত হয়, (১) প্রকৃত শাস্ত্র কি নয়? (২) প্রকৃত শাস্ত্র কি? নগেন্দ্রবাবু অতি দক্ষতার সহিত প্রথম বিভাগটীর আলোচনা করিয়াছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ক বিশ্বাস যে সমুদায় মনুষ্য-রচিত ধর্ম্মশাস্ত্র-নিরপেক্ষ, এবং এরূপ সমুদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ভিত্তি, ঈশ্বরের স্বরচিত বা অপ্রাকৃতিক ভাবে অনুপ্রাণিত কোন ধর্ম্মগ্রন্থ যে নিষ্প্রয়োজন এবং অসম্ভব, ইহা তিনি বিবিধ যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং ধর্ম্মগ্রন্থবাদীদিগের যুক্তি সমূহ সুন্দররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মের পক্ষে প্রকৃত শাস্ত্র কি? এই বিষয়ে তিনি অতি অল্পই বলিয়াছেন, এবং যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিশেষ সন্তোষকর হয় নাই; অথচ ব্রাহ্মধর্ম্মের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই বিষয়টীর সন্তোষকর বিচার বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মবিজ্ঞান-লেখকদিগের ন্যায় নগেন্দ্রবাবুও বলিয়াছেন, "প্রকৃত শাস্ত্র আত্মা ও বহির্জগৎ।" "আত্মা মূল শাস্ত্র, 'আদিগ্রন্থ'। মূল শাস্ত্রের আলোকে বহির্জগৎরূপ শাস্ত্রের অর্থ গ্রহণ করিতে পারি; নতুবা পারি না।" অন্যত্র—"আত্মা ও জগৎ পরমেশ্বর-প্রণীত একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র—ইহকাল পরকাল অনন্ত কালের শাস্ত্র। সত্যের সঙ্গে আর সব শাস্ত্র চলিয়া যাইবে, কিন্তু আত্মারূপ মূল শাস্ত্র জীবনে, মরণে, ইহকালে, পরকালে, চিরদিন জীবের সঙ্গে সঙ্গি।" কিন্তু ইহা বলিলেই যথেষ্ট বলা হইল না। জিজ্ঞাসা করি মনুষ্য-রচিত ধর্ম্মগ্রন্থ সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে এই 'আদিগ্রন্থ' সম্বন্ধেও কি সেই সকল আপত্তির অন্ততঃ কতকগুলি উত্থাপিত হইতে পারে না? যে শাস্ত্র অভ্রান্ত নহে, সে শাস্ত্র ঈশ্বর-রচিত হইতে পারে না। নগেন্দ্রবাবু আত্মারূপ শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়াছেন, কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে এক মানবাত্মা হইতেই পরস্পর-বিরোধী

অসংখ্য মত উত্থিত হইতেছে, অসংখ্য ভ্রম উত্থিত হইতেছে, মানবাত্মাকে কিরূপে অভ্রান্ত বলা যায়? তবে কি মানবাত্মার সমুদায় বিভাগ অভ্রান্ত নহে, কোন বিশেষ বিভাগ অভ্রান্ত? সেই বিশেষ বিভাগের নাম কি? আর তার অভ্রান্ততার দলিলই বা কি? বুদ্ধি বল, প্রজ্ঞা বল, বিবেক বল, আদেশ বল, সমুদায়েরই নামে ভয়ানক ভয়ানক ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে। স্থির দাঁড়াইবার স্থান তবে কোথায়? ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সত্য-নির্ণয়ের অভ্রান্ত প্রণালী কি? পাঠক দেখিতেছেন, সত্য-নির্ণয়ের অভ্রান্ত প্রণালী কি, ইহা স্থির না হইলে 'প্রকৃত শাস্ত্র কি'? এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দেওয়া হইল না। সত্য-নির্ণয়ের অভ্রান্ত প্রণালী যাহা তাহাই অভ্রান্ত শাস্ত্র। জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে সত্য-নির্ণয়ের প্রকৃত প্রণালী কতক পরিমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। জড়বিজ্ঞানেও যথেষ্ট মতভেদ আছে, কিন্তু অপরদিকে আবার অকাট্যরূপে নির্ণীত কতিপয় অটল সত্য ও আছে, এবং এরূপ সত্য-নির্ণয়ের প্রকৃত প্রণালী সম্বন্ধেও বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কতক ঐকমত্য আছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী নির্ণায়ক মূল ন্যায় শাস্ত্র (Logic) যে পরিমাণে গঠিত হইয়াছে, সেই পরিমাণেই জড়বিজ্ঞান দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় সত্য-নির্ণয়ের প্রণালী কি, ইহা যত দিন সন্তোষকররূপে স্থিরীকৃত না হইবে, যতদিন এই প্রণালী নির্ণায়ক মূল জ্ঞান-শাস্ত্র (Science of Knowledge) গঠিত না হইবে, ততদিন 'প্রকৃত শাস্ত্র কি'? এই প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকিবে, ততদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও অস্থির ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান থাকিবে। ব্রাহ্মসমাজ এখনও এই প্রশ্নের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে এখনও অনেক পরিমাণে গুরু, আচার্য্য, মানব-রচিত শাস্ত্র, জনপ্রবাদ, অপরীক্ষিত অন্ধ বিশ্বাসের অসাক্ষাৎ আধিপত্য রহিয়াছে, তাহাতেই ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মের প্রকৃত অটল ভিত্তি সম্বন্ধে সন্তোষকর মীমাংসায় উপস্থিত না হইয়াই নিশ্চিন্ত মনে সমাজ-সংগঠন ও অন্যান্য কার্য্যে মন দিয়াছেন। সমুদায় শুভকার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত মূল প্রশ্নের সন্তোষকর মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত আশা করা যাইতে পারে না যে বর্ত্তমান এবং ভাবী স্বাধীন-চেতা ও বিজ্ঞানালোক প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের জীবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থান পাইবে এবং অশিক্ষিত ও চিন্তাহীনদিগের হস্তে ইহা অবিকৃত থাকিবে। আগামী বারে নগেন্দ্র বাবুর লিখিত অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করিব। শ্রীসীতানাথ দত্ত।

সদুক্তি সংগ্রহ।

পুরাকালে যখন বুদ্ধ প্রবস্তি নগরের সন্নিকটস্থ জেতবন নামক স্থানে বাস করিতেছিলেন, তখন এক দিন এক জন ধনী গৃহস্থ তাঁহার নিকটে আসিল; এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া নিবেদন করিল, জগতের বন্দনীয় গুরো! আমি যখন উপাসনা বা কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই, তখন কোন না কোন স্বার্থ প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমার চিত্তকে চঞ্চল করে, ও আমার চিত্তের শান্তি হরণ করে। আপনি কৃপা করিয়া ইহার উপায় নির্দ্দেশ করুন" শাক্যসিংহ তাহাকে বসিতে আদেশ করিলেন এবং তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন সে ব্যক্তি পুনরায় চরণে প্রণত হইয়া বলিল—যে ভূতপূর্ব্ব রাজার অধিকার কালে সে ব্যক্তি তাঁহার হাতীর মাহুত ছিল। শাক্যসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি যে হাতীর মাহুত ছিলে তাহাকে কিরূপে বশ করিতে?" সে ব্যক্তি বলিল—"তিন প্রকারে হাতী বশ করিতাম, প্রথম লোহার ডাঙ্গশের আঘাত দ্বারা, দ্বিতীয়, তাহাকে অনাহারে রাখিয়া, তৃতীয় প্রকাণ্ড একগাছি যষ্টির আঘাতের দ্বারা। বুদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন আচ্ছা এই তিন প্রকার উপায়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ? গৃহস্থ উত্তর করিল —"লোহার ডাঙ্গসটী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কারণ ইহার দ্বারা হাতী এমন কাবু হয় যে ইহার ভয়ে রাজাকে পৃষ্ঠে তুলিবার জন্য শয়ন করিতে বলিলে তৎক্ষণাৎ শয়ন করে; এবং ইহারই ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে মহামারীর মধ্যে অগ্রসর হয়। বুদ্ধ বলিলেন ইহা ভিন্ন হাতী বশ করিবার অন্য কোন উপায় জান কি না? সে ব্যক্তি উত্তর করিল, না। তখন বুদ্ধ বলিলেন—"যেরূপে হাতী বশ করিয়াছ সেইরূপে আপনাকে বশ করিবে। সে ব্যক্তি কহিল—গুরো! ইহার ভাবার্থ সুস্পষ্ট করিয়া বলুন।" তখন বুদ্ধ বলিলেন—"হে হস্তীর মাহুত আমিও তিন উপায়ে মানবের হৃদয় বশীভূত করি; এবং ঐ তিন উপায়ে প্রত্যেক মানব আপনাকে বশীভূত করিতে পারে, সে তিনটী উপায় এই—(১ম) আত্ম-সংযম, (২য়) জীবে প্রেম, (৩য়) বিমল তত্ত্বজ্ঞান। এই বলিয়া বুদ্ধ বলিয়া উঠিলেন—"হস্তীকে ধরিয়া রাখা ও পোষ মানান যেমন দুষ্কর এবং বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিলে সে যেমন এক গ্রাসও আহার করিতে চায় না, কেবল পলাইতে চায়; সেইরূপ আমার এই মন অসংযত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ভাল বাসিত এবং যেখানে প্রীতি পায় সেই খানে যাইতে ভাল বাসিত, কিন্তু এখন আমি ইহাকে জয় করিয়াছি এবং মাহুত যেমন ডাঙ্গসের দ্বারা হাতীকে চালায় সেইরূপ চালাইতে পারি।"

প্রকৃত সত্যাংশে হীন সময়ের লোকেরা প্রচলিত আইনের মধ্যে এই কথা লিখিয়া দিয়াছে—"যে প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহ তাহার দুর্গ স্বরূপ"; কিন্তু সত্য রাজ্যের উন্নতি হইলে এই কথাই দাঁড়াইবে যে প্রত্যেক ব্যক্তির গৃহ তাহার দেব-মন্দির। মানুষ কি এক দিন দেখিবে না, প্রাণ স্বরূপ যিনি তাহার নিকট সে কত প্রিয়? এবং তিনি তাহার কত নিকটে? মানব কি দেখিবে না যে সে যাহাকে আকস্মিক ঘটনা মনে করে তন্মধ্যে মঙ্গল নিয়ম চিরদিন প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার নিজের জীবনও এই মঙ্গল নিয়মের অঙ্গীভূত; যে তাহার নিজের অন্তরেই সেই মঙ্গল নিয়মের আবাস স্থান; যে তাহার ধনোপার্জ্জন, ধন রক্ষা তাহার পরিশ্রম, তাহার সম্পদ বিপদ, তাহার স্বাস্থ্য ও নীতি, এই সকলের মধ্যেই অল্প পরিসর ক্ষেত্রে সেই অনাদ্যনন্ত বিধাতৃত্ব শক্তি নিহিত রহিয়াছে, যখন মানব এই মঙ্গল নিয়ম দেখিবে তখন আর নিরাশ হইবে না। যখন ইহা লক্ষ্য করিবে, তখন তাহার প্রত্যেক চিন্তা ও কার্য্য সমুন্নত হইবে। এবং সেই

চিন্তা ও কার্য্য তাহার ধর্ম্ম জীবনকে গঠন করিবে। রবিবার পবিত্র বার হইয়াছে, তাহার অর্থ কি এই যে সপ্তাহের অন্য দিন সকল অপবিত্র? উপাসনা মন্দির পবিত্র স্থান, ইহার অর্থ কি এই যে গৃহস্থের গৃহ অপবিত্র স্থান, ধর্ম্ম বিশেষ দিনে বা বিশেষ সময়ে সাধনের বস্তু, এ ভাব চলিয়া যাউক এবং যে সকল চিন্তা তরঙ্গ জগতের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় তাহা গৃহস্থের গৃহের হৃদ্দেশ হইতে উত্থিত হউক।"—Emerson—Essay Domatic Life."

একজন ধনী ব্যক্তি একবার এক নূতন প্রাপ্ত রাজ্য অধিকার করিবার জন্য দূর দেশে গেলেন। যাইবার সময় তাঁহার দশজন ভৃত্যকে নিকটে ডাকিয়া প্রত্যেককে এক এক শত মুদ্রা দিলেন; এবং বলিলেন "যাও যতদিন আমি ফিরিয়া না আসি, ততদিন এই টাকা খাটাও। পরে যখন তিনি নূতন রাজ্য অধিকার করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন তিনি সেই সকল ভৃত্যকে নিকটে ডাকিবার জন্য আদেশ করিলেন। তিনি জানিতে চাহেন, তাহারা তাঁহার টাকা খাটাইয়া কি লাভ করিয়াছে। প্রথম ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল,—"প্রভো! আমি আপনার একশত মুদ্রা খাটাইয়া সহস্র মুদ্রা করিয়াছি।" ধনী বলিলেন বেশ করিয়াছ, তুমি আমার উপযুক্ত ভৃত্য; যেহেতু তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বাসীর ন্যায় কার্য্য করিয়াছ, অতএব তুমি দশটী নগরের কর্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইবে। দ্বিতীয় ভৃত্য উপস্থিত হইয়া বলিল,—প্রভো! আপনার শত মুদ্রাতে পাঁচ শত মুদ্রা হইয়াছে। ধনী বলিলেন, তুমি পাঁচটী নগরের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল,—প্রভো! দৃষ্টিপাত করুন এই আপনার শত মুদ্রা, আমি ইহা কাপড়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। কারণ আমি জানি আপনি বড় শক্ত লোক; আপনি যাহা রাখেন নাই, তাহা লইতে চান; যাহা বপন করেন নাই, তাহা কর্ত্তন করিতে চান। ধনী বলিলেন,—"তোমার কথা অনুসারেই আমি তোমার বিচার করি। তুমি জানিতে আমি কড়া লোক আমি যাহা রাখি নাই, তাহা লইতে চাই, যাহা বপন করি নাই, তাহা কর্ত্তন করিতে চাই; তবে কেন তুমি আমার টাকা ব্যাঙ্কে রাখিলে না? তাহা হইলে ত আমি অন্ততঃ শুদটা পাইতাম। ইহা বলিয়া তিনি নিকটস্থিত ব্যক্তিদিগকে আদেশ করিলেন, ইহার নিকট হইতে ঐ একশত মুদ্রা কড়িয়া লও এবং যে ব্যক্তি একশত মুদ্রাকে সহস্র মুদ্রা করিয়াছে, তাহাকে দেও। তখন পার্শ্বস্থ লোকেরা বলিল,—"প্রভো! তাহার ত হাজার টাকা আছে, তখন তিনি বলিলেন,—আমি বলিতেছি শুন, যে রাখিতে জানে তাহাকেই দেওয়া হইবে; যে রাখিতে জানে না তাহার নিকট যাহা আছে, তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইবে।"—New Testament Luke XIX vers 12 to 26.

।

প্রেম অমর। উহার হ্রাসই নাই, মৃত্যু কিরূপ সম্ভব হইবে? উহার গতি বিদ্যুৎ অপেক্ষা দ্রুত। উহা দূরত্বাপহারী। প্রেমের মাপে বহু যোজন অতি নিকট। প্রেম গ্রীষ্মের ছত্র, শীতের আতপ।

গোলাবরাজ যেমন আতপতাপে দগ্ধ বসোরাতেই সম্যক শোভা লাভ করেন, সেইরূপ প্রেম বিপন্ন ও দুঃখপীড়িত হৃদয়েই অধিক শোভা পায় ও সৌরভ ঢালে। বহ্নিতে দগ্ধ না হইলে যেমন গন্ধ দ্রব্যের প্রকৃত সৌরভ বাহির হয় না, পুষ্পকুলকে পেষণ না করিলে যেমন তাহাদের মধ্য হইতে আতর গোলাব পাওয়া যায় না, তেমনিই পরীক্ষারূপ অনলে না পড়িলে, বিপৎভারে নিষ্পেষিত না হইলে প্রেম হইতে প্রকৃত সুসৌরভ নির্গত হয় না।

বহিরাকাশ ভগবানের সদর। অন্তরাকাশ ভগবানের অন্দর। অন্দরে বাহিরের লোকের প্রবেশ নিষেধ। সেখানে প্রেমিক লোকেরাই প্রবেশ করিতে পারে। সেই হৃদয় গুহায় প্রবেশ না করিলে প্রেমময় ভগবানের "খাশ্ দরবার" দেখিতে পাওয়া যায় না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক দিন প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন যে হৃদয়ই ভগবানের "কায়েম্ মোকাম্।" সপ্তম স্বর্গের জ্ঞানেতে উজ্জ্বল দেবতাগণও ব্রহ্মের সন্দর্শন লাভ করেন না, কিন্তু যে প্রেমিক নিজ হৃদয়কানন প্রিয়তমের আগমনের জন্য পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন তিনি সর্ব্বদাই তাহাকে তথায় নিরীক্ষণ করেন। যিনি প্রেমধনে ধনী, "তস্যতুচ্ছং সকলং।" প্রেমিকের হৃদয় পরমেশ্বরের প্রিয় বাসস্থান।

প্রেম আত্মার চক্ষু কর্ণ ফুটাইয়া দেয়, বিশ্বাস চক্ষুকে খুলিয়া দেয়, জ্ঞান দৃষ্টিকে উজ্জ্বল করিয়া দেয়। অন্যে যাহা শুনিতে পায় না, সেই স্বর্গীয় সঙ্গীতের অমৃত লহরী প্রেমিকের শ্রবণ বিবরকে পরিপূরিত করে। অন্যে যেখানে কিছু দেখিতে পায় না, প্রেম সেখানে কি কর্থা, কে জানে, পড়িতে পায়। ঈশ্বর প্রেমিক "ফুটন্ত ফুলের মাঝে লুকান মায়ের হাসি" দেখিতে পান।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

পাপের শ্রেণী বিভাগ।

আইন কর্ত্তারা অপরাধের শ্রেণী বিভাগ করিয়া থাকেন, আইন কর্ত্তাদিগের সমীপে নরহত্যা, চৌর্য্য, মিথ্যা সাক্ষ্য দান, কটূক্তি করা, এক শ্রেণীর অপরাধ নহে। এই সমস্ত অপরাধের শাস্তি বিধানেরও বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। দুই অপরাধের এক শাস্তি নয়। আইন কর্ত্তাদিগের লক্ষ্য সমাজের শান্তি রক্ষা করা, সুতরাং যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে সমাজের শান্তি অধিক পরি-

মাণে বিপন্ন হইয়া থাকে, তাঁহারা সে কার্য্যকেই গুরুতর অপরাধের কার্য্য মনে করেন। যদিও কার্য্যতঃ বিচার করিতে যাইয়া তাঁহারা অভিসন্ধির দিকেও লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহাদের বিশেষ লক্ষ্য সমাজের শান্তির দিকেই থাকে। অপরাধের এইরূপ শ্রেণী বিভাগ প্রত্যক্ষ করিয়া অনেকে পাপেরও শ্রেণী বিভাগ করেন, অনেককে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে ব্যভিচার এবং বাল্যবিবাহ এক শ্রেণীর পাপ নহে। বাল্য বিবাহ পাপ নহে এরূপ কথা তাঁহারা বলেন না। তবে ব্যভিচারকে যেরূপ ঘৃণনীয় মনে করেন বাল্যবিবাহকে সেরূপ মনে করেন না। তাঁহারা ব্যভিচারীর বাড়ীর ত্রিসীমায় পদার্পণকে দূষণীয় মনে করেন; তাহার দর্শনে অন্তর অপবিত্র হইবে এই ভয়ে দূরে গমন করেন। এমন কি অনেকে "ব্যভিচার" কথাটী বলিতে, লিখিতে কিংবা পাঠ করিতেও লজ্জা বোধ করিয়া থাকেন। অথচ শিক্ষিত, বাল্য বিবাহের অনিষ্ট বোধে সমর্থ, এরূপ বাল্য বিবাহকারী স্বার্থপর যুবকের সঙ্গে একত্রে বাস করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। এমন কি তাহার পাপ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া আমোদ প্রমোদ আহার পান করিতেও তত কুণ্ঠিত হন না। কেহ কেহ মদ্য পানকে পাপ মনে করেন, কিন্তু মদ্যপায়ীকে মাদক দ্রব্য প্রদান করিতে পাপ মনে করেন না। এইরূপ অনেক পাপের শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়। কিন্তু পাপের শ্রেণী বিভাগ সম্ভবপর কিনা সে বিষয়ের আলোচনায় আজ আমরা প্রবৃত্ত হইব। আমরা জানি যে পাপের অস্তিত্ব কার্য্যে নহে ; অবিশুদ্ধ অভিসন্ধিতেই পাপ। ভোগেচ্ছাই অবিশুদ্ধ অভিসন্ধি। আমরা কাজ করিব ইহা বিধাতার ইচ্ছা, কিন্তু কাজ করিলে যে একটু আনন্দ হয় তাহা আমাদের লক্ষ্য নহে। সুতরাং যিনি কাজ করিতে যাইয়া একটু সুখ একটু তৃপ্তি অন্বেষণ করেন, স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইতে পারেন না, তাঁহার অভিসন্ধিই মলিন, তিনিই পাপ করিতেছেন। পাঠক এখন বুঝিলেন অভিসন্ধির মলিনতার আর ন্যূনাধিক্য নাই। স্বার্থের আর শ্রেণী বিভাগ নাই, ভোগেচ্ছার আর তারতম্য নাই। অভিসন্ধির দুই শ্রেণী বিভাগই সম্ভবপর হয়, বিশুদ্ধ না হয় অবিশুদ্ধ। অজ্ঞানতা বশতঃ একজন বাল্যবিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহার অভিসন্ধিই নাই। মনে কর শ্যামের পিতা, শ্যামকে তিন বৎসরের বয়সের সময় এক বালিকার সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল শ্যাম এখানে পাপী নহে। কারণ তাহার বিবাহ করিবার কি না করিবার কোন অভিসন্ধিই ছিল না। কিন্তু মনে কর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী একটী যুবক বহুদিন বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে গলাবাজী করিয়াছে, ইহাকে জঘন্য পাপ মনে করিয়া কত প্রবন্ধ লিখিয়াছে, সেই যুবকই টাকার লোভে অথবা অপরের অন্যায় আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া, কিংবা আত্মীয় স্বজনের দুই চারি ফোঁটা অশ্রুবিন্দু দেখিয়া একটি বালিকার পাণিগ্রহণ করিল। তাহার অভিসন্ধিকে কি বিশুদ্ধ মনে করিতে হইবে? ব্যভিচারীর অভিসন্ধি যেমন অবিশুদ্ধ, ব্যভিচারী যেমন ভোগের ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত হইয়া আত্মাকে গভীর কূপে নিপতিত করিতেছে, এই বাল্য বিবাহকারী যুবক কি তাহা করিতেছে না? তবে এই দুইয়ের পার্থক্য কোথায়? লোভ এবং কাম এই দুই ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য বিনষ্ট করিয়া থাকে। নৈতিক জগতে এই উভয়ই সমভাবে বিপর্য্যয় ঘটাইতে সমর্থ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন, গভীর ধর্ম্ম-পিপাসুর এই দুইই সমান শক্তিশালী আততায়ী। এই দুইয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে যাইয়া তাহার সমান শক্তিই প্রয়োগ করিতে হয়, সুতরাং সে উভয়কেই সমান চক্ষে নিরীক্ষণ করে।

এখন মদ্যপায়ী এবং মদ্যদাতার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি না দেখা যাউক। যদি কেহ মত্ততা সম্পাদন জন্য মদ্য পান করে, তাহা হইলে তাহার অভিসন্ধি পঙ্কিল। ভোগেচ্ছা তাহার অস্বাভাবিক তৃষ্ণার কুজ্ঝটিকা জালে আচ্ছাদিত, সে ঘোর পাপী। ঈশ্বরের রাজ্যের বিপ্লবকারী দস্যু। যদি মদ্যদাতা কোন ব্যক্তির মঙ্গল সাধন জন্য মদ্য দান করেন, তাহা হইলে তাহার অভিসন্ধি বিমল। চিকিৎসক রোগাপনোদনের জন্য মদ্য পান ব্যবস্থা করেন, তাহার কোন দোষ নাই, কারণ বিষও সময় সময় প্রাণ রক্ষার কারণ হয়। এইরূপ প্রয়োজন ভিন্নও যদি কেহ স্ব স্ব ভাই ভগিনীকে সুরা বিষ প্রদান করেন, তাহা হইলে তাহার অভিসন্ধিকে কি বলিব? তিনি অজ্ঞানতা বশতঃ কাজ করিলে উহা মার্জ্জনীয়। কিন্তু তিনি জানেন রোগের অবস্থা ভিন্ন অপর অবস্থায় মদ্য পান পাপ। তাঁহার পক্ষে যেরূপ পাপ, অপরের পক্ষেও সেরূপ পাপ। জানিয়া শুনিয়া ভাই ভগিনীর পাপ কার্য্যের সহায়তা করেন কেন? অবশ্য তাঁহার কোন অভিসন্ধি আছে? সে অভিসন্ধি কি অভিসন্ধি? পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব, উহা নিশ্চয়ই অবিশুদ্ধ অভিসন্ধি। কর্ত্তব্যজ্ঞান ঐ কার্য্যের জন্মদাতা নহে। সৎসাহসের অভাবই উহার একমাত্র উৎপত্তির কারণ। সৎসাহসের অভাব কখনও সাধু অভিসন্ধি নহে। সুতরাং মদ্যদান ও মদ্যপান একই শ্রেণীর পাপ। আমরা দৃষ্টান্ত বাহুল্য দ্বারা পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে ইচ্ছুক নই। আমাদের অভিপ্রায় সহজেই বুঝা যাইতেছে যে পাপের শ্রেণী বিভাগ নাই। যাহা পাপ তাহাই ঘৃণার্হ তাহাই পরিত্যাজ্য, কোন ক্রমে তাহার পোষণ করিতে পারি না। পাপ প্রাণে রাখিয়া শান্তি পাইতে পারি না। যে মুহূর্ত্তে জানিব ইহা পাপকার্য্য তন্মুহূর্ত্তে তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য অস্থির হইতে হইবে। ধর্ম্ম পিপাসুর জীবনে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে পাপের সহিত তাহার সন্ধি নাই।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

পিরোজপুর।

পিরোজপুর ব্রাহ্ম সমাজের ৪র্থ সাম্বৎসরিক উৎসব করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছে—

৫ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ৬ই বৈশাখ, শুক্রবার—প্রাতে, উপাসনা। শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র গাঙ্গুলী আচার্য্যের কার্য্য করেন। অপরাহ্ণ, ৫টা হইতে ৬ ঘটিকা

পর্য্যন্ত উপাসনার আবশ্যকতা ও উপাসনা ভাল লাগে কিসে, এই বিষয়ের আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস উক্ত বিষয়গুলি সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। তৎপর সংকীর্ত্তন। ৬½ ঘটিকার সময় উপাসনা, শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়াহ্নে, শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস "বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম" বিষয়ে একটী সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাতে স্বার্থবাদ, পরার্থবাদ ও পরমার্থবাদ এই তিনটী বিষয় স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ৭ই বৈশাখ, শনিবার—প্রাতে, নগর মধ্যে ঊষা সংকীর্ত্তন হইয়া পরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই—আমাদের ধর্ম্মমত যেরূপ উৎকৃষ্ট আমাদের জীবন সেরূপ উৎকৃষ্ট হইতে পারে নাই। প্রগাঢ় প্রেম, অনুরাগ ও ভক্তি সহকারে তাহা সাধন করিতে হইবে।" অপরাহ্ন, ৩টা হইতে প্রায় ৬ ঘটিকা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা হয় এবং পরে কীর্ত্তন হয়। সায়ংকালে উপাসনা, শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনার পর শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ "ধর্ম্ম-বিশ্বাস" সম্বন্ধে একটী সুন্দর বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাতে প্রকৃত বিশ্বাস কিসে জন্মে তাহা হিন্দু শাস্ত্রের একটী শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া বেশ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। ৮ই বৈশাখ, রবিবার—প্রাতে, উপাসনা, শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান হইতে "যথাকারী যথাচারী তথাভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপোভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা-ভবতি পাপঃ পাপেন॥" এই শ্লোক শির্ষক উপদেশটী পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তৎপর একটী ছাত্রসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ন ১টা হইতে ৩ ঘটিকা পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। ৫ টার সময় উপাসকমণ্ডলী বিশেষ প্রার্থনা করতঃ নগর অভ্যন্তরে সংকীর্ত্তন করিতে গমন করেন। পথিমধ্যে শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস ও পরে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ সংক্ষেপে সংসারের অনিত্যতা ও পরমেশ্বরের নিত্যতা সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। কীর্ত্তনের পর উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ আচার্য্যের কার্য্য করেন। উপাসনান্তে বরিশাল জেলার অন্তর্গত বাইসারি গ্রাম নিবাসী অন্যূন ৩০ বর্ষ বয়স্ক শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার-দাস ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। নবপ্রবিষ্ট ধর্ম্মবন্ধুকে কয়েকটী উপদেশ দিয়া উৎসবের কার্য্য শেষ করা হয়।"

উৎসবের পর প্রচারক মহাশয়গণ তথায় নিম্নলিখিত কার্য্য করিয়াছিলেন—

৯ই বৈশাখ, সোমবার—প্রাতে, আলোচনা। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ "সাধন প্রণালী" সম্বন্ধে সুন্দর ও সুদীর্ঘ একটী বক্তৃতা করেন। ইহাতে ব্রাহ্ম সমাজের সাধন প্রণালীর শ্রেষ্ঠত্ব পরিষ্কাররূপে বুঝান হয়। ১০ই বৈশাখ, মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা, শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস আচার্য্যের কার্য্য করেন। সায়ংকালে নবদ্বীপ বাবুর বক্তৃতা করিবার কথা ছিল, কিন্তু ঐ সময়ে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে আশানুরূপ লোক উপস্থিত হন নাই বলিয়া, নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন এবং "মনুষ্যের মহত্ব" কিসে হয় তদ্বিষয়ে উপদেশ দেন। ১১ই বৈশাখ, বুধবার—প্রাতে, নবদ্বীপ বাবু উপাসনা করেন।

খাসিয়া পাহাড়।

গত ৮ই বৈশাখ রবিবার সন্ধ্যার পরে শেলাপুঞ্জির অন্তর্গত জেছির নামক পল্লীনিবাসী শ্রীযুক্ত জইন মানিক (U Join Manik এবং শ্রীমতী লার্মনের (Ka Larmon) তৃতীয়া কন্যার নামকরণ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম স্বর্ণ রাখা হইয়াছে। খাসিয়া ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এই প্রথম অনুষ্ঠান। কোন কোন খাসিয়া ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছেন।

গত ১লা বৈশাখ রবিবার শেলাপুঞ্জির অন্তর্গত নংক্রুম (Nongrum) নামক পল্লীতে একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। জেসির (Jesir) ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রার্থনা করিয়া নগর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে ঐ স্থানে আসা হয়। পরে মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্নে দুইবার উপাসনা ও উপদেশ হয়। চারি প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে একেশ্বরবাদসূচক বাক্য পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। হিন্দু, খ্রীষ্টিয়ান, খাসিয়া ও ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন।

বিজ্ঞাপন।

আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংস্রবে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বার্ষিক পরীক্ষা হইবে। উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীগণ আগামী ২২এ জুনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে এখানে বা মফস্বলের যে কোন স্থানে পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন। পরীক্ষার্থীকে কোন সুপরিচিত ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত সচ্চরিত্রের প্রশংসাপত্র পাঠাইতে হইবে, এবং মফস্বলবাসী পরীক্ষার্থীকে প্রশংসাপত্র-দাতার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

পরীক্ষার বিষয়।

SENIOR COURSE.—Newman's *Hebrew Theism*: The following five essays :—(1) Animal Instinct, (2) God in Conscience, (3) Immortality of God's Beloved, (4) Worth of the Soul, and (5) Future of the Righteous. Slater's *Law of Duty*: pp. 94—116. *Brahmajijnasa* by Sitanath Datta, Chapter I. pp. 1—53 and Chapter IV (whole.)

JUNIOR COURSE.—বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" প্রথম ভাগ (সমগ্র), আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" (সমগ্র) ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "জাতিভেদ" বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ (সমগ্র)।

PRIMARY COURSE.—আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "ধর্ম্মশিক্ষা" (সমগ্র), ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার ও "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" (সমগ্র)।

১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ২৮এ এপ্রিল, ১৮৯০। } শ্রীসীতানাথ দত্ত, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৩১এ বৈশাখ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজ তত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ। ৪র্থ সংখ্যা। | ১৬ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য মফস্বলে প্রতি খণ্ডের মূল্য

জীবন-পথ।

সামান্য জ্ঞানের বাতি প্রবৃত্তির ঝড়ে,
বার বার নিবিছে জ্বলিছে;
চকিতে দেখিনু পথ, আবার আঁধারে
সেই পথ ঢাকিয়া ফেলিছে।

হাতেতে মশাল আছে; তবু দিশাহারা,
খানা খন্দে পড়ে পড়ে যাই;
উঠিয়া ঝাড়িয়া ধূলি আবার হাতাড়ি,
আলো ছায়া পথ নাহি পাই।

কে যেন কর্ণেতে শুনি! কে যেন ডাকিছে,
ধেয়ে যাই ভাবি মনে মনে;
প্রবল প্রবৃত্তি-ঝড়ে সে রব ডুবায়,
আর কেন শুনি না শ্রবণে?

দূরেতে কি আলো দেখি, প্রাণে আশা পাই,
ওথা বুঝি পাইব আশ্রয়;
চারি পা না যেতে কেন আলেয়ার মত,
আঁধারে সে পুন পায় লয়?

এরূপে জীবন-পথে চলিব বা কত,
ক্লান্ত দেহ পরিশ্রান্ত মন;
আছ যদি, আছ কোথা? কেন এ আঁধারে
কৃপা করে না দেও শরণ!

ডাকিছ কি দূর হতে? নিকটে আসিয়া
কেন নাহি ধরিতেছ করে?
আঁধারেতে পড়ে মরি, তব সত্য-জ্যোতি,
কেন নাহি ধর কৃপা করে।

তোমার বাতিটা ধর, হাত খানা দাও,
'ভয় নাই' বলহে পরাণে;
পথটা দেখিয়া লই জনমের মত,
সাহসেতে দাঁড়াই সেখানে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

আমিত্ব বিসর্জ্জন—নিতান্ত নিরুপায় হইয়া প্রভুর হাতে প্রাণ ছাড়িয়া দাও, ব্রহ্ম-শক্তিতে প্রাণ পূর্ণ হইবে। কিন্তু সে শক্তিকে নিজস্ব মনে করিয়া আপনার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে যাও, দেখিবে তুমি যে অপদার্থ সেই অপদার্থ, একটা তৃণকে নড়াইবার শক্তিও তোমার নাই। ব্রহ্ম-শক্তি লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আমিত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইবে। যতক্ষণ আপনাকে একেবারে ভুলিতে পারা না যায়, যতক্ষণ নিজের মান অভিমান, সুখ্যাতি অখ্যাতির দিকে দৃষ্টি থাকে, অপরে আমার চরিত্র বা কার্য্যসম্বন্ধে কি ভাবিতেছে বা ভাবিবে এই ভাবনা জাগরূক থাকে ততক্ষণ ঐশী শক্তির অনুপ্রাণন লাভ করা যায় না।

বিধানে অবিশ্বাস—আমাদের জীবনে অনেক সময় উৎসাহ ও জীবন্ত ভাব থাকে না, তাহার প্রধান কারণ বিধানে অবিশ্বাস। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম ঈশ্বরের ইচ্ছায় উপযুক্ত সময়ে এ দেশের এবং জগতের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছে; তাঁহার ইচ্ছা প্রত্যক্ষভাবে এই ব্রাহ্ম সমাজে কার্য্য করিতেছে, পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহার সত্যকে জয়যুক্ত করিতেছেন ও করিবেন, বিশ্বাসচক্ষে এই সত্য যদি উজ্জ্বলভাবে দর্শন করা যায়, তাহা হইলে আর আপনাদের দুর্ব্বলতা ও অযোগ্যতা ভাবিয়া মন নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতে পারে না। আমরা আজিও ইতিহাসে ঈশ্বরের হস্ত ভাল করিয়া দেখিতে শিখি নাই। ব্রাহ্ম-সমাজে যে ঐশী শক্তির প্রত্যক্ষ প্রকাশ তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াও অনেক সময় ভুলিয়া যাই। এই ব্রাহ্ম-সমাজের ঘটনাবলীর মধ্যে পরমেশ্বর কেমন চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন যে এখানে অসত্য, কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা স্থান পাইবে না? তিনি যাহাদিগকে ডাকিয়া আনিয়াছেন, তাহারা হাজার দুর্ব্বল হইলেও তিনি তাহাদের দ্বারা আপনার কাজ করাইয়া লইবেন। কেহ বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। যাহারা সঙ্কীর্ণতা ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার ইচ্ছাকে বাধা দেয় তিনি যে তাহাদিগকে

ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তাহাদের শক্তি লোপ করেন তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

গুরুভক্তি—সকল প্রকার শিক্ষার মূলে গুরুভক্তি। জ্ঞান অনেকে দিতে পারেন, জ্ঞান-স্পৃহা যিনি উদ্দীপ্ত করেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষক। সেইরূপ সাধুতার লক্ষণ অনেকে বর্ণন করিতে পারেন, সাধুতার আকাঙ্ক্ষা যিনি প্রাণে প্রজ্বলিত করিতে পারেন তিনিই প্রকৃত গুরু। এরূপ চরিত্রের সংস্পর্শে যে শিক্ষা হয়, বহু বহু বেদীর উপদেশে ও বিদ্যালয়ের বক্তৃতাতে তাহা হয় না। আমাদের মধ্যে চরিত্রবান ও ধর্ম্মাগ্নি-বিশিষ্ট পুরুষ ও রমণী যে কয়েক জন আছেন, বালকবালিকা-দিগকে কিরূপে তাঁহাদের সংস্পর্শে আনা যায়? ইহা একটা চিন্তার বিষয়। এরূপ করিতে না পারিলে এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নি ভাবী বংশীয়দিগের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবে না। বর্ত্তমান সময়ের বিদ্যালয়ে বালকবালিকাদিগকে প্রেরণ না করিয়া যদি এরূপ চরিত্রবান্ ব্যক্তিদিগের হস্তে তাহাদিগকে সমর্পণ করিয়া রাখা যায় তাহাতে অধিকতর কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে যদি ব্রাহ্ম পিতা মাতার কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয়ও হয় তাহাতে পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নহে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক তাঁহাদের চরিত্রের যে কিছু শক্তি আছে, আমাদিগের বালকবালিকাগণকে তাহার অধীন করিবার বিশেষ উপায় অবলম্বিত না হইলে, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাহাদের প্রেম সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইবে না।

কার্য্য শৃঙ্খলা—সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে জীবনে শৃঙ্খলার নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের প্রভুর কার্য্যের মধ্যে কেমন শৃঙ্খলা, কেমন সুনিয়ম! দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন, ঋতুর পর ঋতু কেমন সুনিয়মে আসিতেছে যাইতেছে! আমাদের ব্যবহার অন্যরূপ; আমাদের জীবন দেখিয়া মনে হয় যেন অগোছাল না হইলে প্রথম শ্রেণীর ব্রাহ্ম হওয়া যায় না। কাজ করিতে হইলে জীবনকে নিয়মিত করিতে হইবে। নতুবা শাসন-বিহীন, স্বেচ্ছাচারী, বিশৃঙ্খল জীবন লইয়া আমরা কিছুই করিতে পারিব না। অবশ মনকে স্ববশে আনিতে হইলে শাসন (discipline) চাই, জীবনকে নিয়মিত করা চাই। আমরা অনেক সময় অবস্থা ও ভাবের স্রোতে পড়িয়া সাময়িক উত্তেজনা অনুসারে কার্য্য করি। ইহাতে কাজের সুবন্দোবস্ত হয় না, এক জনের দ্বারা যত কাজ হইতে পারিত তাহা সাধিত হয় না। আমরা আমাদের মধ্যে organisation এর (শৃঙ্খলার) অভাব আছে বলিয়া অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেই organisation শৃঙ্খলা নাই, সমাজে organisation (শৃঙ্খলা) হইবে কোথা হইতে? জীবনশাসনের জন্য, জীবনে সুনিয়ম সংস্থাপনের জন্য আমাদের দৈনিক কার্য্য সকল প্রণালীবদ্ধ করা আবশ্যক। একটা সাধারণ প্রণালী স্থির রাখিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে সেই দিনের বিশেষ প্রয়োজন অনুসারে, কার্য্যপ্রণালী স্থির করিলে ও তদনুসারে সমস্ত দিন চলিতে চেষ্টা করিলে বিশৃঙ্খলাজনিত অশান্তির হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। নতুবা অনেক সময় বাহিরের কার্য্যের বিশৃঙ্খলার জন্য মনও বিশৃঙ্খল ও চঞ্চল হইয়া পড়ে।

গূঢ় অবিশ্বাস—আমাদের প্রাণে মধ্যে মধ্যে যে ঘোর শুষ্কতা ও অন্ধকার আসে তাহার প্রধান কারণ অবিশ্বাস। পরমেশ্বর যে আমাদিগকে পৃথিবীর ধূলি হইতে হাত ধরিয়া তুলিয়া তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম-বিধানের মধ্যে আনিয়াছেন, ধর্ম্মপথে আমরা যতটুকু অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছি তাহা যে তাঁহার প্রত্যক্ষ করুণার ফল, তিনিই যে প্রাণে ব্যাকুলতা দেন, উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করেন এবং সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিবার জন্য প্রার্থনা করান, এ কথা আমাদের সকল সময় মনে থাকে না। প্রভু তাঁহার প্রত্যেক সরল উপাসকের সহিত শুভ মুহূর্ত্তে যে সকল অঙ্গীকারে বদ্ধ হন নিশ্চয় তাহা পালন করিবেন এই বিশ্বাস যদি উজ্জ্বল থাকে, তাহা হইলে অনেক সময় আধ্যাত্মিক অবসন্নতার হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। আমরা ক্ষুদ্র ও অপ্রেমিক হইয়াও যখন দুঃখীকে আশা দিয়া নিরাশ করাকে নিতান্ত নিষ্ঠুর কার্য্য বলিয়া মনে করি, তখন মহান্ অনন্ত প্রেমময় পরমেশ্বর যে আমাদের প্রতি সেই নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করিবেন স্বপ্নেও এরূপ চিন্তা মনে পোষণ করা মহা পাপ। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধেও প্রভু যে আদর্শ এক সময় দেখাইয়াছেন কেন ভাবিব যে তাহা আর দেখিব না?

শুষ্কতার সময় আমাদের প্রাণে যে অবিশ্বাস আসে তৎসম্বন্ধে ডাক্তার মার্টিনো এক স্থানে বলিয়াছেন, যে, "এই সময় আমরা জীবনের শুভ মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতা সকল ভুলিয়া যাই এবং তৎপরিবর্ত্তে নীচ সন্দেহকে মনে স্থান দিই। পরমোপকারী বন্ধুর জীবনব্যাপী ভালবাসাতে অবিশ্বাস করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে তুচ্ছ নিন্দাকে মনে স্থান দেওয়া যেরূপ ইহাও সেই শ্রেণীর ব্যবহার। ইহাতে যে কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায় তাহা নহে কিন্তু হৃদয়বিহীনতাও প্রকাশ পায়।" এই কথাগুলি বহু দিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু ইহার ভাব আজিও মনে লাগিয়া আছে। বাস্তবিক আমরা পার্থিব বন্ধুগণের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে যেটুকু ভদ্রতা, বিশ্বাস ও ভালবাসা দ্বারা পরিচালিত হই, পরমেশ্বরের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক সময় সেটুকু ভদ্রতা, বিশ্বাস ও ভালবাসাও প্রাণে পোষণ করি না। বিশ্বাস সম্বন্ধে আমাদের আদর্শ কত উচ্চ, কিন্তু জীবন কত নীচ!

ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্ব—তুমি যদি কোন পাড়ায় একটা কারখানা খুলিতে চাও, তাহা হইলে যাহাতে পাড়ার লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট না হয়, সেরূপ উপায় অবলম্বন করিতে তুমি দায়ী। অর্থাৎ মানুষ যখন কোন কার্য্য করে, তখন তাহার কার্য্য হইতে যে অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতে সে ব্যক্তি দায়ী। এ বুদ্ধি যাহার নাই, তাহাকে আমরা ও দায়িত্ব-বিহীন লোক বলি। দায়িত্ব-বিহীন লোক অতি হেয়। এক্ষণে এই নিয়মের দ্বারা ব্রাহ্ম

সমাজকে বিচার কর। ব্রাহ্মসমাজ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্রাহ্মদিগকে দুইটী বিষয়ে প্ররোচনা দিতেছেন। (১ম) বাল্য বিবাহ নিবারণ, (২য়) নারীগণের স্বাধীনতা সম্বর্দ্ধন। যদি কোন ব্রাহ্ম অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দেন, বা কন্যাদিগকে অশিক্ষিত ও বন্দী দশায় রাখেন, ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে তাঁহাকে নিন্দিত হইতে হয়। ব্রাহ্মদিগের সামাজিক শাসন দ্বারা তাঁহাদিগকে শাসিত হইতে হয়। সে ভালই; কিন্তু কন্যাটীকে বাল্যকালে বিবাহ দিলে, অথবা অজ্ঞ ও বন্দীদশায় রাখিলে যাঁহারা শাসন করেন, তাঁহাদের কি উচিত হয় না যে, সেই কন্যাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে পিতা মাতার সাহায্য করেন? বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যে কেবল তাহাদের পিতা মাতার ভার তাহা নহে, ব্রাহ্মসমাজেরও এ সম্বন্ধে দায়িত্ব আছে। ব্রাহ্মসমাজ মনে করিলে সমবেত ভাবে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে পারেন, ব্যক্তিগত ভাবে অনেক পিতা মাতার পক্ষে তাহা অসাধ্য। তোমার আমার যাহা করিবার সময় বা অবসর নাই, সে কার্য্যের ভার সমাজ গ্রহণ করিবেন, তুমি আমি কেবল অর্থ ও সামার্থ্য দ্বারা সহায়তা করিব। এই ভাবেই জনসমাজের কার্য্য সকল বিভাগ হইয়া থাকে। ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার ভার ব্রাহ্মসমাজ আপনার স্কন্ধ হইতে কখনই তুলিয়া ফেলিতে পারেন না। আর একটী বিষয় একবার কল্পনাতে ধারণা করিবার চেষ্টা করিলেই এই দায়িত্ব ভার কত গুরুতর তাহা অনুভব করিতে পারা যাইবে। সুসময়ে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের সুশিক্ষার যদি কোন ব্যবস্থা না করা হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজ এরূপ ভবিষ্যতে প্রবিষ্ট হইবে, যাহাতে বালক বালিকাগণ অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকিবে এবং স্বাধীন ভাবে পরস্পরের সহিত মিশিবে, অথচ অন্তরে ধর্ম্মাগ্নি বা নীতির অগ্নি থাকিবে না। ইহার ফল যাহা তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। ঈশ্বর করুন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ এ সম্বন্ধে আপনাদের দায়িত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হন।

অভিমান ও আত্ম-সমর্পণ—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনের একটী ঘটনা অনেক বার উল্লিখিত হইয়াছে, আবার উল্লেখ করিতেছি। প্রথমে যখন হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়, সর্ব্বাগ্রে রাজা রামমোহন রায় ও ডেবিড হেয়ার তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী বলিয়া তখনকার সুপ্রিম কোর্টের চীফ জষ্টিস সার হাইড ইষ্ট, কালেজের প্রথম কমিটীর মধ্যে রামমোহন রায়ের নাম সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। অমনি হিন্দু সমাজের দলপতিগণ বলিলেন,—রামমোহন রায়ের নাম কামটীতে থাকিলে তাহার সহিত আমাদের সংস্রব থাকিবে না। সার হাইড ইষ্ট বিপদে পড়িলেন। কোন মুখে রামমোহন রায়ের নাম তুলিয়া দিবেন। কিন্তু রামমোহন রায় এই বার্ত্তা শুনিবামাত্র চীফ জষ্টিসকে লিখিলেন যে, তাঁহার সংস্রব থাকাতে একটা মহৎ অনুষ্ঠান নষ্ট হয়, ইহা প্রার্থনীয় নয়; অতএব নাম তুলিয়া দিবেন, তিনি পশ্চাতে থাকিয়া যে সাহায্য করিতেছেন তাহা করিবেন। তৎকালের ইতিবৃত্ত লেখকগণ সকলেই এক বাক্যে এজন্য রামমোহন রায়ের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা না হইয়া রামমোহন রায় যদি অভিমান করিতেন, যদি বলিতেন,—কি! আমার প্রস্তাবে ও আমার উদ্যোগে যে কার্য্যের আয়োজন তাহার কমিটী হইতে আমার নাম তুলিয়া দেওয়ার অনুরোধ, আমি দেখিব কিরূপে তোমাদের বিদ্যালয় হয়। এই বলিয়া যদি তিনি বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে এতবড় কাজটা হয়ত বাধা প্রাপ্ত হইত, এবং রামমোহন রায়ের নামের গৌরব থাকিত না। এরূপ অভিমানে এই প্রকাশ পায় যে আমরা আপনাদিগকে ভুলিতে পারিতেছি না, ভাল কাজটা হউক এ ইচ্ছা অপেক্ষা আমার মনের মত হউক এই ইচ্ছা প্রবল। আমরা পদে পদে প্রমাণ পাইতেছি যে, আমরা ঈশ্বরের কার্য্যকে নিজেদের মান অপমান অপেক্ষা মহৎ জ্ঞান করিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই আমাদের কার্য্যের এত দুর্গতি হইতেছে। ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-সমর্পণ করিতে সমর্থ করুন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ঘনীভূত শক্তি।

এক খণ্ড ইষ্টক বা প্রস্তরে যে পরমাণু আছে তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া, চূর্ণ করিয়া যদি এক মুষ্টি ধূলি করা যায়, তবে সেই ধূলি মুষ্টি কোন্ কাজে আসে? তদ্দ্বারা যদি কাহাকেও আঘাত করা যায় সে অনুভবই করিতে পারে না যে প্রহার করা গেল। হয়ত আহত ব্যক্তির দেহ স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই বায়ু সেই ধূলি মুষ্টিকে উড়াইয়া লইয়া যায়। প্রস্তর খণ্ডে যতগুলি পরমাণু, সেই ধূলি মুষ্টিতেও সেই পরমাণু তথাপি শক্তির কত প্রভেদ দেখ।

যে পদার্থ অনেকটা স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহাকে ঘনীভূত কর, অল্প পরিসর স্থানের মধ্যে আনয়ন কর, তাহার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। যে জল দুই শত হাত ব্যাপিয়া আছে তাহাকে দুই হাত পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে আনয়ন করিতে গেলে, সেই ক্ষেত্রের গভীরতা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক গুণে বৃদ্ধি করিতে হইবে। বিস্তৃতি কমাইলেই গভীরতা বাড়াইতে হইবে। ইহাতেও দেখা যায় যতই ঘনীভূত ভাব ততই শক্তির বৃদ্ধি।

এই সত্যটী ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের প্রতি প্রয়োগ করিয়া দেখা যাউক। ব্রাহ্ম সমাজ যে কার্য্য করিতেছেন তাহার বিস্তৃতি যে পরিমাণে আছে গভীরতা সে পরিমাণে নাই। একথা বলিবার অভিপ্রায় এরূপ নহে; ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ক্ষেত্র অতিশয় বিস্তৃত হইয়াছে; বরং এই কথাই সত্য যে ব্রাহ্মধর্ম্ম ভালরূপ প্রচার হইতেছে না। দেশের অতি অল্প লোকেই ইহার কথা জানিয়াছে, এরূপ লক্ষ লক্ষ লোক রহিয়াছে, যাহাদের নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে উপস্থিত করা উচিত ছিল, কিন্তু লোকের অভাবে আমরা তাহা করিতে পারি নাই। তবে আমাদের বক্তব্য এই

যে, যে টুকু প্রচার হইয়াছে তাহার মধ্যেও দেখিতে পাই, বিস্তৃতির দিকে যত দৃষ্টি গভীরতার দিকে তত দৃষ্টি নাই। কিরূপে দশ জনে ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিবে সেই জন্য আমরা ব্যস্ত কিন্তু যাহারা শুনিয়াছে কিরূপে ইহা তাহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া বসিবে সে জন্য তত ব্যস্ত নহি।

ঘনীভূত ভাব নাই বলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের বাতিও ভাল করিয়া জ্বলিতেছে না। ব্রাহ্মদিগের শক্তি অল্প হইলেও তাঁহারা জাতীয় জীবনের অনেক বিভাগে আপনাদের শক্তিকে প্রসারিত করিতে পারিবেন। কারণ স্বভাবের নিয়ম এই উদ্যোগ যাহার আছে, শক্তি তাহারই হস্তগত হয়। দেশের আর সকল শ্রেণীর লোক যখন অলস বা নিরুদ্যম, তখন যে শ্রেণী চিন্তা করিবে ও কার্য্য করিবে, অগ্রসর হইবে ও অপরকে প্রবর্ত্তিত করিবে, তাহারই উপর নেতৃত্ব ভার আপনাপনি পড়িয়া যাইবে। এইরূপ ইতিহাসে দেখা যায় এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল দেশের মধ্যে সুমহৎ আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে; লোকের চিন্তা স্রোতকে নূতন পথে ফিরাইয়াছে; ইতিহাসের গতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছে। ইংলণ্ডের পিউরিটানগণ অতি অল্প সংখ্যক ছিলেন; কিন্তু পিউরিটানগণ যে ভাবে ইংলণ্ডের ইতিহাসকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন এমন আর কে করিতে পারিয়াছে? কেবল ইংলণ্ডের কেন, এই পিউরিটানগণই নব আমেরিকার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, এবং জগতের নূতন সভ্যতার দ্বার উদ্ঘাটন করিয়াছেন। পিউরিটানগণের বিশ্বাস দৃঢ়তা ও ঘনীভূত আধ্যাত্মিক শক্তিই ইহার কারণ। সেইরূপ ব্রাহ্ম সমাজও ভারতের বর্ত্তমান চিন্তা স্রোতকে নূতন পথে ফিরাইতে পারেন, যদি তাঁহাদেরও শক্তি ঘনীভূত হয়।

কিরূপে এই শক্তিকে ঘনীভূত করা যায়? ব্রাহ্ম সমাজের ক্রোড়ে যাঁহারা আশ্রিত হইয়াছেন তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে গাঢ় ও দৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। যদি বাহিরে প্রচারের জন্য ছয় আনা চেষ্টা থাকে তবে এরূপ কার্য্যের জন্য বোধ হয় দশ আনা চেষ্টা হওয়া উচিত। কারণ অন্তরে আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি না থাকিলে, বাহিরের প্রচারে আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারা যাইবে না। ধর্ম্ম প্রচারের মূলমন্ত্র যদি কেহ ধরিতে পারিয়া থাকেন তবে নিশ্চয় বুঝিয়াছেন, যে বক্তৃতা বা উপাসনার দ্বারা যে প্রচার হয় না, ধর্ম্মজীবনবিশিষ্ট পুরুষের সংস্পর্শে সেই প্রচার হয়। তুমি আমি যে ভাবে ভগবানের অর্চনা করিতেছি যে ভাবে দিন যাপন করিতেছি তাহা দেখিয়া অপরের মন ফিরিয়া গেল। এক জনের ফিরিল, দুই জনের ফিরিল, দশ জনের ফিরিল, ইহার নাম প্রচার। সুতরাং অন্তরের আধ্যাত্মিক জীবনকে সবল করিতে পারিলে চরমে তাহা জন সমাজের উপরে আপনার শক্তি প্রসারিত করিবেই করিবে; এবং অন্তরের এই শক্তির অভাব হইলে বাহিরের প্রচারের ফলও কম হইবে। আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তির এই ঘনীভূত ভাব বৃদ্ধি করিবার দিকে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

সাধারণ তন্ত্রের গুণ ও দোষ।

অদ্যাবধি মনুষ্য সমাজে কাজ করিবার জন্য যত প্রকার প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণ তন্ত্র প্রণালীকে আপাততঃ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হইতেছে। এই প্রণালী কার্য্যে পরিণত করিবার রীতির অনেক উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রণালী অদ্যাপি উদ্ভাবিত হয় নাই। ইহাতে জগতে কত প্রকার উপকার সাধিত হইতেছে তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রথম,—এই প্রণালীর একটী গুণ এই যে ইহাতে দশখানি হস্তকে এক কার্য্যে আনয়ন করে, দশটী ব্যক্তিকে এক অনুষ্ঠানে নিয়োগ করে। তাহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

দ্বিতীয়,—ইহাতে সমাজের গুণী ও শক্তিশালী পুরুষমাত্রকেই সাধারণের হিতার্থে নিজ শক্তি প্রয়োগ করিবার সুযোগ দেয়।

তৃতীয়,—ইহাতে সমগ্র সমাজের লোককে সমাজের কল্যাণচিন্তাতে অভ্যস্ত করে।

চতুর্থ,—ইহাতে ব্যক্তিগত প্রভুত্ব-প্রিয়তাজনিত বিপদ হইতে সমাজকে রক্ষা করে, অথচ প্রত্যেকের গুণসমষ্টিকে সমবেত করে।

পঞ্চম,—ইহাতে পরস্পরের মত ও কার্য্যের স্বাধীনতাকে সম্মান করিতে শিক্ষা দেয় ও পরের আলোকে আপনার ভ্রম ও ত্রুটী দর্শনে আমাদিগকে সমর্থ করে।

ষষ্ঠ,—ইহাতে কোন কোন বিষয়ের সত্য নির্দ্ধারণ পক্ষে আশ্চর্য্য সাহায্য হয়—কারণ একই বিষয়ের উপরে দশ দিক্ হইতে দশটী আলোক আসিয়া পড়ে; সুতরাং তাহার সত্য নির্দ্ধারণের পক্ষে সাহায্য হয়।

কিন্তু সাধারণ তন্ত্র প্রণালীর যেরূপ উপকার আছে তেমনই ক্ষতির দিকও আছে। সর্ব্ব প্রধান ক্ষতি এই যে সত্য ও সদনুষ্ঠানের গতি বড় মন্দীভূত হয়। ব্যক্তি বিশেষের হস্তে থাকিলে যে সদনুষ্ঠান এক দিনে হইতে পারে, তাহা দশ জনের বিচারাধীন হইয়া নানা প্রকার বাধা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অতি ধীরে অগ্রসর হয়। মানব ইতিবৃত্তে অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে এক জন যীশু তিন বৎসরে যে সকল সত্য প্রকাশ করিয়াছেন, দশ জনে মিলিয়া দুই শত বৎসরেও তাহা পারে নাই। এক জন পিটার দি গ্রেট বা নেপোলিয়ান দশ বৎসরে যে উৎকৃষ্টতর প্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, সাধারণ তন্ত্রে ৫০ বৎসরে তাহা হয় নাই। সত্যটী শীঘ্র লোকের নিকট উপস্থিত হয়—সদনুষ্ঠানটী ত্বরায় জন সমাজে অনুষ্ঠিত হয়, ইহা প্রার্থনীয়, সাধারণ তন্ত্র প্রণালীতে সে সুখের ব্যাঘাত করে। ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে, এক ব্যক্তির দ্বারা যাহা দুদিনে আসে, তাহা সমাজে বদ্ধমূল হয় না; তাহা আবার দুই দিনে চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ তন্ত্র প্রণালীতে বহু দিনের আন্দোলন ও বিচারের পর যাহা সংঘটিত হয়, তাহা সমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়।

সাধারণ তন্ত্র প্রণালীর আর একটী দোষ যে ইহাতে মধ্যে মধ্যে দলাদলি উৎপন্ন করে। দশ জনে মিলিয়া কাজ করিতে

সেই সংগ্রাম এই কার্য্যের উপর নৈতিকতা আরোপ করিয়াছে; ইহা এক দিকে কুকুরের কার্য্যের সদৃশ হইয়াও অপরদিকে অসদৃশ। তৃতীয় কর্ত্তার কার্য্যও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যদ্বয়ের ন্যায় কালাধীন, সুতরাং কারণাধীন বটে, কিন্তু সেই কারণ প্রবৃত্তি নহে। এই কার্য্য প্রবৃত্তির অধীন হওয়া দূরে থাক্,বরং প্রবৃত্তি-বিরুদ্ধ। "পরস্বাপহরণ অনুচিত" ইত্যাকার নৈতিক নিয়মসমূহ প্রবৃত্তি নহে, প্রবৃত্তির অনুরূপও নহে, প্রবৃত্তির ফলও নহে। এই সকল নিয়মের মধ্যে যে বাধ্যতাবোধ রূপ লক্ষণ বর্ত্তমান, এই বাধ্যতাবোধ কোন প্রবৃত্তির লক্ষণ নহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রীতি, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি কোন প্রবৃত্তি হইতে এই বাধ্যতাবোধ নিষ্কাশন করা যায় না। ইহা সমুদায় প্রবৃত্তির অতীত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া প্রবৃত্তি সমূহকে শাসন করে। প্রবৃত্তির অতীত এই বাধ্যতাবোধই নৈতিক কার্য্যকে প্রাকৃতিক কার্য্য হইতে প্রভেদ করে। এই বাধ্যতাবোধের বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছে বলিয়াই উপরোক্ত দ্বিতীয় কর্ত্তার কার্য্য অপবিত্র কার্য্য, আর তৃতীয় কার্য্যে এই বাধ্যতাবোধ সম্মানিত হইয়াছে বলিয়াই ইহা পবিত্র কার্য্য। এস্থলে স্বাধীনতা কোথায় তাহাও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। আত্মা ধর্ম্ম-নিয়মের অধীন হওয়াতেই প্রবৃত্তির আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইল, ধর্ম্মের বলে, বিবেকের বলেই প্রবৃত্তির বলকে অতিক্রম করিল, সুতরাং ধর্ম্মের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা; পুণ্যের শক্তি,—বিবেকের শক্তিই—প্রকৃত আত্ম-শক্তি। এস্থলে ইহাও বুঝা যাইতেছে যে উপরোক্ত দ্বিতীয় কর্ত্তার কার্য্য পাশব কার্য্য হইতে কিয়ৎ-পরিমাণে ভিন্ন বটে, কিন্তু ইহা প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা-প্রসূত নহে। স্বাধীনতা যখন ধর্ম্মাধীনতার নামান্তর মাত্র, পুণ্যশক্তির নামান্তর মাত্র, তখন যে কার্য্য ধর্ম্মনিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইল, প্রবৃত্তির অধীনে অনুষ্ঠিত হইল, সে কার্য্যকে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা-প্রসূত কার্য্য বলা যায় না। উক্ত কার্য্যের নৈতিকতা স্বাধীনতার চালনা-জনিত নহে, স্বাধীনতার ক্ষীণতা জনিত। পাশব কার্য্যের সহিত উক্ত কার্য্যের ভিন্নতা এই যে পশুর সমক্ষে ধর্ম্মনিয়ম কদাচ প্রকাশিত হয় না এবং পশুকে কদাচ ধর্ম্ম-নিয়মের অধীনে আনা যায় না। কিন্তু প্রবৃত্তির অধীন মানবের সমক্ষেও ধর্ম্ম-নিয়ম প্রকাশিত হয়, এবং সে বারংবার প্রবৃত্তির অধীন হইলেও তাহাকে বিবিধ উপায়ে ধর্ম্মাধীন করা যায়। সে যে ধর্ম্মনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া প্রবৃত্তির অধীন হয়, সে কেবল আত্ম-শক্তি অর্থাৎ পুণ্যশক্তির ক্ষীণতা বশতঃ। উপদেশ দৃষ্টান্ত প্রভৃতি উপায়ে তাঁহার আত্ম-শক্তি বা পুণ্যশক্তি প্রবল করিলেই তাহাকে ধর্ম্মাধীনে আনা যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পুণ্যই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা-জনিত, এবং এই অর্থে ভাবাত্মক; পাপ প্রকৃতার্থে স্বাধীনতা-জনিত নহে, বরং স্বাধীনতার ক্ষীণতা-জনিত, স্বাধীনতার অভাব-জনিত, এবং এই অর্থে অভাবাত্মক। এস্থলে স্বাধীনতার অর্থ সম্বন্ধে নগেন্দ্রবাবু ও আমাদের মধ্যে বিশেষ মতদ্বৈধ লক্ষিত হইবে। স্বাধীনতা বা আত্ম-শক্তির লক্ষণ প্রবৃত্তির উপর রাজত্ব, একদিকে ইহা স্বীকার করিয়াও নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন,পাপ পুণ্য উভয়ই স্বাধীনতা-প্রসূত,উভয়ই আত্মশক্তি-প্রসূত। এরূপ বলিতে গিয়া তিনি তাঁহার নিজের প্রদত্ত স্বাধীনতার সংজ্ঞা পরিত্যাগ করিয়া স্বাধীনতা সম্বন্ধে লৌকিক মতে সায় দিয়াছেন। নগেন্দ্র-বাবু তাঁহার "পাপ কি?" শীর্ষক প্রবন্ধে পাপকে অভাবাত্মক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধে পাপকে স্বাধীনতা-প্রসূত, আত্মশক্তি-প্রসূত বলিয়া উক্ত মতের মূলোচ্ছেদ করিয়া রাখিয়াছেন। পাপ পুণ্য উভয়ই যদি স্বাধীনতা-প্রসূত হয়, তবে পাপ পুণ্য উভয়ই ভাবাত্মক। পাপ যদি পুণ্যের ন্যায় আত্মশক্তি-সম্ভূত হয় তবে ইহাকে আর পুণ্যের অভাবমাত্র বলা যায় না; পুণ্য যেমন একটা জীবন্ত সত্তা, পাপও তেমনই একটা জীবন্ত সত্তা হইয়া দাঁড়ায়। যাহা হউক্, এই বিষয় পরে কিছু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল; সম্প্রতি আমরা সংক্ষেপে নগেন্দ্রবাবুর স্বাধীনতা বিষয়ক মতের কতিপয় দোষ দেখাইব। নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, পাপ কর্ম্মকে স্বাধীনতা-প্রসূত না বলিলে পাপীর দায়িত্ব থাকে না, স্বাধীনতা-প্রসূত বলিলেই দায়িত্ব থাকে। তাঁহার মতানুসারে উপরোক্ত দৃষ্টান্তে দ্বিতীয় কর্ত্তা স্বাধীনভাবে ধর্ম্মনিয়ম লঙ্ঘন করিয়া প্রবৃত্তির অধীন হইয়াছে। কার্য্যের সময়ে সে জানিত সে সেই কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারে। এই কথা এক অর্থে ঠিক, এক অর্থে ঠিক নহে। কর্ত্তা জানিত যে যদি তাহার এই কার্য্যে বিরত হইবার ইচ্ছা হয়, যদি তাহার ধর্ম্মনিয়ম পালন করিবার ইচ্ছা হয়, তবে সে এই কার্য্যে বিরত হইতে পারে কার্য্য করিতে করিতেও যদি তাহার ইচ্ছা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় তবে সে কার্য্য হইতে বিরত হয়। এই অর্থে উক্ত কথা ঠিক। আর যদি উক্ত কথার এই অর্থ হয় যে কর্ত্তা জানে যে, সেই কার্য্যে তাহার ইচ্ছা সত্ত্বেও, ধর্ম্মনিয়ম পালনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারে,—তবে উক্ত কথা ঠিক নহে। মূল কথা এই,ইচ্ছা (choice) কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণ, অনিচ্ছা বিরত হইবার কারণ। এখন জিজ্ঞাস্য এই, কর্ত্তা স্বাধীনভাবে উক্ত কার্য্য করিল, ইহার অর্থ কি? যদি বলেন ইহার অর্থ এই যে সে ইচ্ছাবশতঃ ইহা করিল, তবে কার্য্যের স্বাধীনতা কোথায়? কার্য্য ইচ্ছার অধীন, সুতরাং স্বাধীন নহে। যদি বলেন কার্য্যটা ইচ্ছার অধীন বটে, কিন্তু ইচ্ছাটা স্বাধীন, ইচ্ছাটা সে স্বাধীনভাবেই করিয়াছে, তবে জিজ্ঞাসা করি এমন ইচ্ছা সে কেন করিল? পুণ্য সম্মুখে থাকিতেও কেন পাপ ইচ্ছা করিল? তাহার পাপেচ্ছার কারণ কি? যদি বলেন পাপেচ্ছার কারণ ভোগেচ্ছা,ভোগেচ্ছার অধীনেই সে পাপ ইচ্ছা করিল, তবে পাপেচ্ছা আর স্বাধীন রহিল না—পাপ আর স্বাধীন ইচ্ছা-সম্ভূত রহিল না। যদি বলেন সে ইচ্ছাপূর্ব্বক পাপেচ্ছা করিয়াছে,তবে জিজ্ঞাসা করি ঐ ইচ্ছারই বা কারণ কি? ঐ ইচ্ছার কারণ অবশ্য আর একটা ইচ্ছা, তার কারণ আবার আর একটা ইচ্ছা, এইরূপে অনন্ত ইচ্ছা-শৃঙ্খল কল্পনা ভিন্ন এরূপ প্রশ্নের আর উত্তর নাই। এই অনন্ত ইচ্ছা-শৃঙ্খলা অতিক্রম করিবার উদ্দেশে যদি বলা হয় যে পাপেচ্ছার আর কোন কারণ নাই, পাপী অকারণে পাপ ইচ্ছা পোষণ করে, তবে এই মতে তিনটী গুরুতর দোষ লক্ষিত হয়—(১) কারণশূন্য কার্য্য হইতে পারে, এবং প্রত্যেক স্বাধীন কার্য্যই কারণশূন্য।

(২) দায়িত্বের লক্ষণ কারণ-শূন্যতা; যে কার্য্য আত্মা কারণ নিরপেক্ষ হইয়া করে, কেন করিল বলিতে পারে না, বলাও সম্ভব নহে, সেই কার্য্যের জন্যই আত্মা দায়ী। কারণ-প্রসূত কার্য্যের জন্য আত্মা দায়ী নহে, কেননা সে কার্য্য আত্মা স্বাধীনভাবে করে না। (৩) ইহাই যদি সত্য হয় যে পাপ কার্য্যের অন্য কোন কারণ নাই, পাপী সুখের জন্য পাপ করে না, প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য পাপ করে না, পাপের জন্যই পাপ করে, তবে সপ্রমাণ হইল যে মানব-প্রকৃতিতে একটী মৌলিক কলঙ্ক আছে, অনর্থক অকারণে পাপ করিবার একটী প্রবৃত্তি আছে। তবে কি খৃষ্টীয় মৌলিক পাপ (original sin) এর মতই ঠিক?

আমরা আমাদের তৃতীয় প্রস্তাবে নগেন্দ্রবাবুর "পাপ কি?" ও "পাপের প্রায়শ্চিত্ত" বিষয়ক প্রবন্ধদ্বয়ের সমালোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত কোন কোন বিষয় আরও বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। শ্রীসীতানাথ দত্ত।

[ভ্রম সংশোধন—এই বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবের ৩য় স্তম্ভের নিম্ন হইতে ৭ম পংক্তিতে "সঙ্গি" স্থলে "সঙ্গে," আর ৯ম পংক্তিতে "সত্যের" স্থলে "মৃত্যুর" হইবে, আর ৪র্থ স্তম্ভের ২য় পংক্তিতে "মানবাত্মাকে" এই শব্দের পূর্ব্বে "তখন" এই শব্দ বসিবে।]

আখ্যানমালা।

(মহর্ষি সক্রেটিস্।)

১। একদা ডেল্‌ফিস্থ দেবমন্দিরে দৈববাণী হইল, যে সক্রেটিস্ জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাহা শুনিয়া তাঁহার বিপক্ষ দলের লোকেরা খেপিয়া উঠিল। সক্রেটিস্ বলিলেন, "আমি যে অজ্ঞান ও কিছুই জানি না, ইহা বেশ বুঝিয়াছি। কিন্তু নিজের যে অজ্ঞানতা আছে, অন্যে তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। তজ্জন্যই বোধ হয় দৈববাণী আমাকে জ্ঞানিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকিবে।" এই দৈববাণী শুনিয়া অবধি মহাত্মা তাঁহার শিষ্যবর্গকে আত্মানুসন্ধান শিখাইতে লাগিলেন।

২। একদা মহর্ষি সক্রেটিস্ ধনকুবের এল্‌কিবায়েডিস্ ইত্যাদি শিষ্যগণ পরিবেষ্টিত হইয়া এথেন্স নগরে ভ্রমণ করিতেছেন, এমৎ সময়ে হঠাৎ জনৈক দুরাচার তাঁহাকে অযথা নিন্দা ও গালি দিতে লাগিল। শিষ্যগণ রোষপরবশ হইয়া দুষ্টাত্মাকে উত্তম মধ্যম দিতে উদ্যত হইলেন। ইহা দেখিয়া মহাত্মা সক্রেটিস্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ তোমরাই বরং আমার অপমান করিতেছ, কারণ তোমরা আমার উপদেশবিরুদ্ধ কার্য্য করিতেছ। আচ্ছা তোমরা কি কাহাকেও খঞ্জ বা সৌন্দর্য্যহীন বলিয়া প্রহার কর?" সকলে উত্তর করিলেন, "না"। মহাত্মা কহিলেন, "তবে যাহার মন বা হৃদয় অসুন্দর তাহাকে মারিতে যাও কেন?" এই প্রকার উপদেশে সকলেই লজ্জিত হইলেন এবং দুষ্টকে প্রহার করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

৩। একবার অর্কিলাস্ নামক সক্রেটিসের ধনাঢ্য এক শিষ্য উক্ত মহাত্মার নিকট দূত দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি সক্রেটিস্‌কে ধনবান করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন। সক্রেটিস্ ইহার সুন্দর উত্তর দিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "যে উপহারের প্রতিদান দিতে পারি না, উহা লইব কি রূপে? ইহা ব্যতীত, (প্রায়) দুই আনা হইলেই এথেন্স্ নগরে এক প্রকার উদর পূর্ণ করা চলে, এবং নির্ঝরিণী সর্ব্বদাই স্বচ্ছবারিপূর্ণ থাকে। তবে, আমার আর্থিক অবস্থা যদি আমার পক্ষে প্রচুর না হয়, আমিই স্বয়ং আমার অবস্থানুরূপ হইব, (অর্থাৎ অভাব সমূহ তদনুযায়ী অল্প করিব,) তাহা হইলেই আমার যাহা কিছু আছে, আমার পক্ষে প্রচুর হইবে।"

৪। এক দিবস এল্‌কিবায়েডিস্ নিজ ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব করিতেছিলেন। তৎকালে আর কেহই তাঁহার ন্যায় ধনবান ছিল না। তাঁহার গুরু সক্রেটিস্ একটী মানচিত্রের নিকট তাঁহাকে লইয়া গিয়া "এটিকা" দেখাইতে আদেশ করিলেন। এথেন্স্ যে প্রদেশের রাজধানী ছিল, তাহারই নাম এটিকা। মানচিত্রের উপর উহা বড়ই ক্ষুদ্র দেখায়। শিষ্য বহু কষ্টে এটিকা বাহির করিলেন। মহর্ষি কহিলেন, "ইহার মধ্যে তোমার প্রাসাদ ও সম্পত্তি দেখাও।" এল্‌কিবায়েডিস্ উত্তর করিলেন "প্রভো! উহা এত ক্ষুদ্র যে দেখিতেই পাওয়া যায় না।" মহাত্মা সহাস্য বদনে বলিলেন "দেখ! তুমি কি সামান্য বিষয়ের জন্য গর্ব্বে অন্ধ হইতেছিলে!" শিষ্য লজ্জিত ও উপদিষ্ট হইয়া নীরবেই রহিলেন।

৫। জনৈক স্কন্ধতত্ত্ববিবেকী (phrenologist) মহাত্মা সক্রেটিস্‌কে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার কিম্ভূত কিমাকার চেহারা দেখিয়া বোধ হয়, যে তুমি একজন নিতান্ত বদ্‌মায়েশ্ লোক।" মহাত্মা বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, "আপনি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন। আমার দেহ যেমন কদর্য্য, আত্মাও তেমনি। আমি কেবল মানসিক বল দ্বারা কুপ্রবৃত্তিগুলিকে শাসনে রাখিয়াছি।"

৬। স্থান—ডেলিয়াম্ রণক্ষেত্র। সময়—ঘোরতর সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া এবং শত্রু দ্বারা তাড়িত হইয়া এথিনীয়গণ গৃহাভিমুখে পলায়ন করিতেছে। একজন দীর্ঘকায় ও বলশালী পুরুষ এই সময়ে রণক্ষেত্রের উপর দিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া শয়নকক্ষে পদচালনার ন্যায় ধীরে ধীরে এথেন্সাভিমুখে আসিতেছেন। এ বীর পুরুষ কে? মহাত্মা সক্রেটিস্। এল্‌কিবায়েডিস্ সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই একদিন সক্রেটিসের প্রশংসা করিতে করিতে এই ঘটনাটী উল্লেখ করেন। ইহা প্লেটোর সিম্‌পোশিয়ামে বর্ণিত আছে।

৭। জেন্থিপী এথেন্সের একজন প্রসিদ্ধ ব্যাপিকা। ইনি মহাত্মা সক্রেটিসের পত্নী ছিলেন। একদিন ইনি সক্রেটিসের সহিত তুমুল কলহ আরম্ভ করিলেন। কলহান্তে সক্রেটিস্ গৃহ হইতে (অর্দ্ধচন্দ্র লাভ করিয়া?) বাহির হইতেছেন। এমৎ সময়ে ছাদ হইতে মস্তকের উপর সমল এক কলস জল পড়িল। মহাত্মা উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়াই দেখেন যে দন্তপাটি বিকসিত করিয়া তাঁহার মুখরা ভার্য্যা আনন্দে উল্লাস করিতেছে। হাস্যের মর্ম্ম বুঝিয়া সুরসিক সক্রেটিস্ বলিলেন, "এত তর্জ্জন গর্জ্জনের পর যে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে, এ ত আমি পূর্ব্বেই জানিতাম!" এই

করিতে মতভেদ ও অপরাপর কারণে সময়ে সময়ে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব উৎপন্ন হয়। তখন সত্যের জন্য সত্যের পক্ষ সমর্থন চলিয়া গিয়া জিগীষা নিবন্ধন বিচার উপস্থিত হয়। সেই কালে বৃথা বিবাদ ও পরস্পরের প্রতিবাদে অনেক শক্তি ক্ষয় হইতে থাকে। তখন সাধারণতন্ত্র প্রণালীর সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য মানুষ ভুলিয়া যায়; অর্থাৎ সাধারণ কার্য্য সাধন সম্বন্ধে পরস্পরের সহায়তা না করিয়া পরস্পরের শক্তিকে বিনষ্ট করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হইতে থাকে।

সাধারণ তন্ত্র প্রণালীর আর একটী দোষ আছে। ইহাতে মানবের দায়িত্ব জ্ঞানকে শিথিল করে। ব্যক্তি বিশেষের হুইটী স্কন্ধের উপরে যদি কোন কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার থাকে তাহাতে তাহার দায়িত্ব জ্ঞান যেরূপ উজ্জ্বল হয়, সেই কার্য্যের ভার যদি দশ জনের স্কন্ধে অর্পিত হয়, সকলেই পরিমাণানুসারে সেই দায়িত্ব ভার অল্প বলিয়া অনুভব করে। এদেশে একটী চলিত কথা আছে। "দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ"। এই কথাতেই প্রমাণ হয়, দশে মিলে যে কাজ করা যায় তাহাতে হার জিতের তত চিন্তা থাকে না; সুতরাং তাহার দায়িত্ব ভারও লোকের স্কন্ধে তেমন জোরে পড়ে না। ইহার ফল এই হয় কেহই বিশেষ রূপে সে জন্য চিন্তা বা শ্রম করে না। সুতরাং সাধারণ কার্য্যের ব্যাঘাত হয়।

এইরূপ যে কার্য্য ত্বরিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে বিলম্ব হইলে, কিংবা ইতস্ততঃ করিলে কার্য্য হানির সম্ভাবনা, সে কার্য্য যদি দশ জনের উপরে থাকে, তাহাতে কাল বিলম্ব হইয়া কার্য্য হানি হইয়া যায়।

এই কারণে সাধারণ তন্ত্র প্রণালী যে সকল দেশে প্রতিষ্ঠিত, সে সকল দেশেও দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল কার্য্যে কাল বিলম্বে কার্য্য হানির সম্ভাবনা সে সকল কার্য্যে ব্যক্তি বিশেষ বা কর্ম্মচারি বিশেষের উপর সর্ব্বময় কর্তৃত্ব দেওয়া হইয়াছে। আয়র্লণ্ডের বর্ত্তমান সেক্রেটারি আয়র্লণ্ড বাসিদিগকে যেরূপ কঠোর শাসন করিতেছেন, রাজ তন্ত্র ইটালী দেশের রাজ অত্যাচারের দিনেও সেরূপ হয় নাই। কিন্তু ব্যালফোর কোন্ শক্তির বলে এরূপ কঠোর শাসন করিতেছেন? পার্লেমেণ্ট তাঁহাকে সে শক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই রূপে বিদ্যালয়ের হেড মাষ্টারকে যদি বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার প্রত্যেকটী নির্দ্ধারণের জন্য কমিটী ডাকিতে হয় তাহা হইলে পাঠ ও শিশুদের শাসন অনেক দিন ধরিয়া বন্ধ থাকে। এজন্য নৌকাতে যেমন একজন মাঝি ও গায়ক দলে যেমন একজন ব্যাণ্ড মাষ্টার বা মূল গাইন দিতে হয়, সেইরূপ বিদ্যালয়েও হেড মাষ্টারকে প্রভূত শক্তিশালী করিয়া রাখিতে হয়। সাধারণের শক্তিকে দূরে ও পরোক্ষস্থলে রাখিয়া ব্যক্তিগত শক্তিকে প্রবল করিতে হয়।

যে সমাজে অতিরিক্ত সাধারণ-তন্ত্রতা এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব বিকাশের অবসর অল্প, সেখানে কার্য্যের মধ্যে শৃঙ্খলা ও কৃতকার্য্যতা দেখা যায় না।

এক্ষণে দেখা যাউক সমাজ মধ্যে কি কি সদ্‌গুণ না থাকিলে সাধারণ তন্ত্র প্রণালী অনুসারে কখনই কার্য্য চলিতে পারে না। প্রথমতঃ যে সমাজের অধিকাংশ লোক সমাজের কল্যাণের প্রতি উদাসীন ও কিরূপে কার্য্য চলিতেছে তাহা দেখিতে অলস, সে সমাজে সাধারণতন্ত্রপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, এবং যদিও বা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ত্বরায় ব্যক্তি বিশেষের প্রভুত্বে পরিণত হয়। মনে করুন আমরা দশ জনে মিলিয়া একটী স্কুল স্থাপন করিলাম; এবং একটী কমিটী ও একজন সম্পাদক নিয়োগ করিয়া তাঁহাদের উপরে কর্ম্ম ভার দিয়া গেলাম। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে আর কেহ সে বিষয়ে মনোযোগী থাকিলেন না; কিরূপে বিদ্যালয় চলিতেছে কেহ একবার অনুসন্ধান করেন না; কমিটীর কোন সভ্য ডাকিলেও আসেন না; একবার জিজ্ঞাসাও করেন না। ফলে এই দাঁড়াইল সেই সম্পাদকই সর্ব্বে সর্ব্বা হইলেন। সাধারণতন্ত্র প্রণালী নামেই রহিল।

দ্বিতীয়, সদ্‌গুণ পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর। যে সমাজে কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না; কেহ কাহারও প্রতি নির্ভর করিতে পারে না, সে সমাজে সাধারণতন্ত্র প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হওয়াই অসম্ভব। বিবাদেই তাহাদের দিন পর্য্যবসিত হয়। পরস্পর দ্বেষাদ্বেষিতে কাল কাটিয়া যায়।

আমরা যদি সাধারণতন্ত্র প্রণালী সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত সত্যগুলি স্মরণ রাখি তদ্দ্বারা আমাদের একত্রে কাজ করিবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হইতে পারে।

ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় ভাগ।

(সমালোচনা)

(২)

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" দ্বিতীয় ভাগের "আত্মার স্বাধীনতা" শীর্ষক প্রবন্ধটী অতিশয় জটিল। বিষয়টী যেরূপ গুরুতর তাহাতে প্রবন্ধটী জটিল হইবারই কথা। কিন্তু নগেন্দ্রবাবুর লেখার গুণে এরূপ জটিল যুক্তি-সম্বলিত প্রবন্ধও অনেক পাঠকের পক্ষেই সুবোধ্য হইবে, আশা করা যায়। এই প্রবন্ধে নগেন্দ্রবাবুর তর্কশক্তি বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধটীর এই সকল গুণ সত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে ইহাতে আলোচ্য বিষয়ের সন্তোষকর মীমাংসা হইয়াছে—বিরুদ্ধবাদাদিগের মতের সদ্‌বিচার হইয়াছে। প্রবন্ধের শেষ ভাগে লেখক প্রবন্ধে আলোচিত বিষয় গুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছেন। বিষয়গুলি এই;—"প্রথমতঃ যে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে জড় জগৎ ও মানব মন বদ্ধ, মনুষ্যের ভিতরে তাহার অতীত স্থান আছে। তাহাই স্বাধীনতার অধিষ্ঠান ভূমি। দ্বিতীয়তঃ পরমেশ্বরের ত্রিকালজ্ঞতা মনুষ্যের স্বাধীনতাকে বিনাশ করে না। তৃতীয়তঃ দেশ বিশেষে বার্ষিক অপরাধের সংখ্যার অনেক পরিমাণে সমতা স্বাধীনতার অস্তিত্ব অপ্রমাণ করে না। চতুর্থতঃ মনুষ্য কার্য্য করিবার পূর্ব্বে, কার্য্য করিবার সময়, এবং 'কার্য্য করিবার' পরে, আপনার স্বাধীনতা আপনি অনুভব করে; এই জন্য দুষ্কার্য্য করিয়া অনুতপ্ত হয়; পরস্পরকে সেই জন্য অপরাধী বা নিরপরাধী মনে করে। ইহাতে স্বাধীনতায় স্বাভাবিক বিশ্বজনীন বিশ্বাস প্রকাশ পায়। পঞ্চমতঃ স্বাধীনতায়

বিশ্বাস বিলুপ্ত হইলে কার্য্য বিষয়ে বিবেচনা ও বিচার সম্পূর্ণ-রূপে চলিয়া যায়। ষষ্ঠতঃ ন্যায়ান্যায়বোধের মূলে স্বাধীনতা। স্বাধীনতায় বিশ্বাস না থাকিলে ন্যায় অন্যায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ বিনষ্ট হইয়া যায়। সপ্তমতঃ স্বাধীনতায় বিশ্বাস না থাকিলে দায়িত্ববোধ থাকে না। দায়িত্ববোধ না থাকিলে পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই থাকে না। অষ্টমতঃ স্বাধীনতা-বিরোধীদিগের মতে সুদৃঢ় ও সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিলে উদ্যোগ ও চেষ্টা একেবারে বিনাশদশা প্রাপ্ত হইবে।” এরূপ বহুশাখা সম্পন্ন প্রবন্ধ পাঠে অনেকের অনেক আপত্তি খণ্ডিত হইবে, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমরা মূল মতটী নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারিলাম না; আমরা এই সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলিব। প্রথমতঃ “স্বাধীনতার” অর্থ কি? নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন,—“মনুষ্যের প্রবৃত্তি সকল মনুষ্যকে সম্পূর্ণ পরিচালিত করে না। মানবাত্মা আত্ম-শক্তিদ্বারা প্রবৃত্তি সকলকে পরিচালিত করে; প্রবৃত্তি-প্রবাহকে প্রবলীকৃত, মন্দীভূত, বিভিন্ন পথে প্রধাবিত বা একেবারে নিরুদ্ধ করিতে পারে। ইহারই নাম আত্মার স্বাধীনতা।” উত্তম সংজ্ঞা। নগেন্দ্রবাবু যদি এই সংজ্ঞাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া এই “আত্মশক্তির” প্রকৃতি আরো কিছু বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন, আর স্বাধীনতার যে একটা মিথ্যা অর্থ আছে, সেই অর্থটা সমর্থন না করিতেন, তবে তাঁহার প্রবন্ধ আরো সন্তোষকর হইত, আর তাঁহার সহিত আমাদের বিশেষ কোন মতান্তর থাকিত না। কিন্তু যাঁহারা বলেন, স্বাধীনতার অর্থ এই যে মানবের কতকগুলি কার্য্য (নৈতিক কার্য্য—ধর্ম্মাধর্ম্ম) কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অতীত—ঘটনা প্রবাহের অতীত—এই সকল কার্য্যের নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা নাই,—নগেন্দ্রবাবু তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া প্রবন্ধটীকে কিয়ৎ পরিমাণে অসন্তোষকর করিয়া ফেলিয়াছেন। যাঁহারা বলেন ভৌতিক মানসিক সমুদায় কার্য্যই অনাদি অনন্ত ঘটনা-শৃঙ্খলের অন্তর্গত, তাঁহাদের যুক্তি নগেন্দ্রবাবু অনেকটা পরিষ্কার রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু এই যুক্তি কোথাও সাক্ষাৎ ভাবে খণ্ডন করেন নাই। এই মত মানিলে ধর্ম্মাধর্ম্ম থাকে না, দায়িত্ব-বোধের কোন অর্থ থাকে না—কেবল এই কথাই নানা ভাবে প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এরূপ যুক্তি-প্রণালী আমাদের কাছে ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। ঘটনা মাত্রেরই নিয়ত-নিরপেক্ষ- পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা আছে—এই মতের প্রমাণ দার্শনিক (metaphysical) প্রমাণ। এই মত খণ্ডন করিতে হইলে ইহার বিরুদ্ধে দার্শনিক প্রমাণ প্রয়োগ করাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু নগেন্দ্রবাবু যে প্রমাণ দ্বারা এই মত খণ্ডনের চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা নৈতিক প্রমাণ। নৈতিক প্রমাণ দ্বারা দার্শনিক মত সমর্থন বা খণ্ডন করিতে যাওয়া স্পষ্টতঃই অন্যায়, এবং এরূপ সমর্থন বা খণ্ডন সম্ভবপরও নহে। যাহা হউক এই বিষয়ে আমাদের মত এই যে উপরে স্বাধীনতার যে অর্থ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এই অর্থে স্বাধীনতা সমর্থন করিতে হইলে উক্ত দার্শনিক মত খণ্ডনের চেষ্টা পাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। ঘটনা মাত্রেরই নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা আছে, ইহা বিজ্ঞানের মূল সূত্র; ইহার বিরুদ্ধ কথা বলিলে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কথা বলা হয়। যে ঘটনা ধারা-বাহিক ঘটনা-শৃঙ্খলের অন্তর্গত নহে, সে ঘটনা অপ্রাকৃতিক (supernatural—miraculous) ঘটনা। এরূপ ঘটনা যে একটা অসম্ভব স্ববিরোধী ব্যাপার, যথেষ্ট স্থান থাকিলে তাহা আমরা দার্শনিক প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে পারিতাম। * মানুষের নৈতিক কার্য্য যদি এরূপ ঘটনা হয় যাহা অন্য ঘটনার সহিত কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে, মানুষের স্বাধীনতার অর্থ যদি ইহাই হয়, তবে মানুষ স্বাধীন নহে, এরূপ স্বাধীনতা অসম্ভব। যাহা কিছু কালে ঘটে, তাহাই অনাদি অনন্ত ঘটনা-শৃঙ্খলের অন্তর্গত। মানুষের নৈতিক কার্য্য যখন কালে ঘটে, তখন ইহাও প্রাকৃতিক কার্য্যের ন্যায় ঘটনা-শৃঙ্খলের অধীন; এই বিষয়ে নৈতিক কার্য্য ও প্রাকৃতিক কার্য্যে কিছুই প্রভেদ নাই। স্বাধীনতার স্থান এখানে নহে, অন্যত্র। কিন্তু নৈতিক কার্য্য কালাধীনতা সম্বন্ধে প্রাকৃতিক কার্য্যের সদৃশ হইয়াও নৈতিকতা (ethical quality) সম্বন্ধে প্রাকৃতিক কার্য্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। নৈতিক কার্য্যের কার্য্যত্ব যতটুকু, তাহা প্রাকৃতিক কারণ দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয়,—নিয়ত-নিরপেক্ষ-পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয়। কিন্তু ইহার নৈতিকতা প্রাকৃতিক কারণে ব্যাখ্যাত হয় না, এই নৈতিকতা ব্যাখ্যার জন্য নৈতিক কারণ চাই; এই নৈতিক কারণ “আত্মশক্তি”—ধর্ম্মবল। দৃষ্টান্ত,—দুই ব্যক্তি একটী কুকুর সঙ্গে লইয়া দীর্ঘ পথ ভ্রমণের পর অপর এক ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইল। গৃহটী নির্জ্জন, সম্মুখে টেবিলের উপর সুখাদ্য দ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। ব্যক্তিদ্বয় এবং কুকুর সকলেই ক্ষুধার্ত্ত। কুকুরটী খাদ্য দ্রব্য দেখিবামাত্রই ক্ষুধার বশে কতকটা খাইয়া ফেলিল। ব্যক্তিদ্বয় ক্ষুধার্ত্ত হইলেও “পরস্বাপহরণ অনুচিত” এই ধর্ম্ম-নিয়ম অবগত থাকাতে খাইবে কি না ভাবিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ ইতঃস্ততের পর এক ব্যক্তি লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া খাইল, অপর ব্যক্তি ধর্ম্ম-নিয়মের অধীন হইয়া লোভ সম্বরণ করিল। এই তিনটী কার্য্যই কালের অধীন ঘটনা এবং তিনটীই পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার অধীন। কুকুর ও প্রথমোক্ত ব্যক্তির কার্য্যের কারণ ক্ষুধা, দ্বিতীয় ব্যক্তির কার্য্যের কারণ ধর্ম্ম-নিয়মাধীন হইবার ইচ্ছা। কার্য্যত্ব সম্বন্ধে, পূর্ব্ববর্ত্তী কারণাধীনতা সম্বন্ধে, কার্য্য-ত্রয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। স্বাধীনতা-প্রসূত হইতে গেলে কার্য্যকে যদি কারণ-শূন্য হইতে হয়,—পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা-শূন্য হইতে হয়,—তবে এই কার্য্যত্রয়ের মধ্যে কোন কার্য্যই স্বাধীনতা-প্রসূত নহে। কিন্তু এই কার্য্যত্রয় কারণাধীনতা সম্বন্ধে সদৃশ হইলেও ইহাদিগকে আমরা এক শ্রেণীর কার্য্য মনে করি না। কুকুরের কার্য্যে আমরা কোন নৈতিকতা আরোপ করি না, ব্যক্তিদ্বয়ের কার্য্যে নৈতিকতা আরোপ করি। ইহার কারণ এই যে, কুকুরকে আমরা কেবল প্রবৃত্তির অধীন বলিয়াই জানি, সুতরাং ক্ষুধাই তাহার কার্য্যের যথেষ্ট কারণ বলিয়া মনে করি। দ্বিতীয় কার্য্যের মুখ্য কারণ প্রবৃত্তিই বটে, কিন্তু কার্য্যের পূর্ব্বে প্রবৃত্তি আর বিবেকের মধ্যে যে সংগ্রাম চলিয়াছিল,

* “ব্রহ্মজিজ্ঞাসা,” দ্বিতীয় অধ্যায়, চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখুন।

বলিয়া হাস্য মুখে তিনি চলিয়া গেলেন। মহাত্মা এত বিশ্বাসী ও ধৈর্য্যশালী ছিলেন যে তিনি গম্ভীর ভাবে বলিতেন "আমার পরম সৌভাগ্য, তাই জেন্থিপীর মত ভার্য্যা লাভ করিয়াছি। ইহা পরমেশ্বরের মঙ্গল বিধান। আমি গৃহে চরিত্র-গঠন ও চরিত্র-পরীক্ষা করিতে পারি এবং ক্ষমা, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতাদিগুণ শিক্ষা করিতে পারি। জেন্থিপীর ব্যবহার ও অত্যাচারেও যদি মনের স্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারি, তবে সংসার-ক্ষেত্রে কখনই আমার কোন প্রকার চিত্ত-চাঞ্চল্য ঘটিবে না।"

৮। সক্রেটিস্ ঋণশোধ করা সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার অঙ্গ মনে করিতেন। হেমলক্ বিষ পান করিয়া অচেতন-প্রায় হইয়া পড়িতেছেন, এমৎ সময়ে একবার বস্ত্রাচ্ছাদিত মুখ খুলিলেন। সকলে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নিকটে গেল। মহাত্মা ক্রিটো নামক জনৈক শিষ্যকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "আমি এস্কেপিয়াসের নিকট একটী কুক্কুটের জন্য ঋণী। আমার স্ত্রীকে বলিও। তাহার ঋণ যেন শোধ করা হয়।" এই গল্পটী হইতে মহাত্মার সাংসারিক অবস্থা, সত্যনিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভাগবতী লীলা।

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিগত দ্বাদশ জন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ভাগবতী লীলা" সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকটিত করা গেল—

প্রাচীন গ্রীকদিগের দেবগণের মধ্যে "জিয়স" সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। প্রাচীন য়িহুদীগণ "জাভে" অথবা "জিহোভা" নামক সর্ব্বপ্রধান দেবের উপাসনা করিতেন; ভারতবর্ষীয় প্রাচীন আর্য্যগণ দেবকুলের মধ্যে ইন্দ্রকেই সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে অধিরোহণ করাইতেন। এই তিন জাতির লোকেই বিশ্বাস করিতেন যে ইহাঁদের আরাধ্য দেবতা ভক্তবৎসল—ভক্তের সুখে সুখী ও ভক্তের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন। তাঁহারা যে কেবল ভক্তের বন্ধু তাহা নহে, ভক্তের শত্রু কুলেরও শত্রু। ভক্তের সহিত তাঁহাদের এত নিকট ও নিগূঢ় সম্বন্ধ। এমন কি আরাধ্য দেবগণ যুদ্ধক্ষেত্রে ভক্তদিগের নিকটে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। ক্রমে যখন ঈশ্বরের এই ক্ষুদ্র ভাব গিয়া অনন্ত ভাব প্রস্ফুটিত হইল, যখন অগ্নিতে এক দেবতা, জলে অপর দেবতা, বায়ুতে তৃতীয় দেবতা না দেখিয়া, অধ্যাত্ম চিন্তার উন্নতি সহকারে আর্য্যগণ ঈশ্বরের অনন্তত্ব ও সর্ব্বব্যাপিত্ব ধারণা করিতে সমর্থ হইলেন, যখন তাঁহারা "যো দেবোগ্নৌ, যোপ্সু, যো বিশ্বং ভুবন মাবিবেশ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন, তখন ইন্দ্রাদির সহিত ভক্তের যে নৈকট্য সম্বন্ধ ছিল তাহার যেন কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইল। ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপের অনুধ্যানে তাঁহার মহিমা যতই অন্তরে জাগিতে লাগিল, ততই যেন বোধ হইতে লাগিল মনুষ্য কোন্ ছার কীটানুকীট, ঈশ্বর কি তাহার তত্ত্ব লন।

ঈশ্বরকে এরূপ দূরে রাখিয়া মানব হৃদয় কখনই তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। সুতরাং এই ভাবের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী মতের সৃষ্টি হইল, সেটী অবতারবাদ। অবতারবাদ বলে—ঈশ্বর অনন্ত এবং মহান্ কিন্তু তিনি মানবকুলের কল্যাণের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অনন্ত ভাব ঈশ্বরকে দূরে ফেলিয়া দিল, অবতারবাদ আবার তাঁহাকে নিকটে আনিয়া দিল। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। অবতারগণ মর্ত্ত্য লোকে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন তাহাই লীলা নামে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু আমরা সে প্রকার লীলাতে বিশ্বাস করি না। আমরা অবতারবাদে বিশ্বাস করি না—প্রথম কারণ, একই বস্তুকে অনন্ত ও সান্ত এই উভয় ভাবে হৃদয়ে ধারণ করা যায় না; দ্বিতীয় অবতারত্ব স্বীকারের সমুচিত কারণ দেখা যায় না; সকল বিভাগেই তাঁহার জীবন্ত শক্তি দ্বারা মানবের সর্ব্ব প্রকার কল্যাণ হইতেছে, যদি কেবল মানবের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য তাঁহার রক্তমাংসের অধীনতা স্বীকার প্রয়োজন হয়, ইহা দ্বারা তাঁহাতে অপূর্ণতার আরোপ করা হয়; তৃতীয় যদি দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার জন্য অবতারত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন হইয়া থাকে, সেরূপ প্রয়োজন সর্ব্বদাই বিদ্যমান। সে জন্য প্রতি গৃহে, তাঁহার অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক। অতীত কালের কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ দেশে অবতীর্ণ হইলে কি ইষ্ট সিদ্ধ হইল। চতুর্থতঃ এই অবতারবাদের মত প্রচলিত হওয়াতেই মানবকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ইতিবৃত্তের উপর, মৃত ভাষার উপর, টীকা-কর্ত্তাদিগের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। ইহা হইতেই জগতে পৌরহিত্য প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে।

কিন্তু এপ্রকার অবতারবাদে বিশ্বাস করি না বলিয়া যে আমরা ঈশ্বরের লীলায় বিশ্বাস করি না, তাহা নহে। আমরা বিশ্বাস করি—ঈশ্বরের জীবন্ত শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে মানব-হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিয়া লীলা করিতেছে! সেই শক্তির প্রভাবেই আমরা পাপকে বর্জ্জন করিতেছি ও পুণ্যের দিকে ধাবিত হইতেছি। মানব-অন্তরের যে পুণ্য-শক্তি তাহা তাঁহারই শক্তি। এই শক্তির প্রকাশ ব্যক্তিগত জীবনে এবং জাতীয় জীবনে কি প্রকারে হইয়া থাকে? সাধু মহাজনদিগের জীবনে এই শক্তিরই প্রকাশ। সহস্র হৃদয়ের প্রধূমিত আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের হৃদয়ে ঘনীভূত হইয়া দুর্জ্জয় শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়। প্রত্যেক সাধু মহাজন এই অর্থে মানবেরও পুত্র এবং ঈশ্বরেরও পুত্র। তাঁহারা মানবের দিক হইতে মানবের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষার মুখপাত্র, ঈশ্বরের দিক হইতে তাঁহার আশা ও আশ্বাসের বাণী। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেও আমরা এই ঐশী শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাইতেছি'—ব্রাহ্মসমাজের হৃদয়ে বর্ত্তমান যুগের আকাঙ্ক্ষা ঘনীভূত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মসমাজ ভাগবতী লীলার একটী প্রধান ক্ষেত্র, যাঁহারা বিশ্বাস নয়নে ইহা দর্শন করিতেছেন না, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মহৎ লক্ষ্য এখনও হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন নাই।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

গত ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের তত্ত্ব-কৌমুদী পত্রিকাতে "দ্বাদশ বৎসরের পরীক্ষার ফল" প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম সম্বন্ধে কত ঘটনা যে মনে পড়িল তাহা বলিতে পারি না। "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ"কে প্রাণের সহিত ভালবাসি তাই কয়েকটী কথা লিখিলাম। অনুগ্রহপূর্ব্বক তত্ত্ব-কৌমুদীতে স্থান দিলে সুখী হইব।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম যে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়, তাহার নাম কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সৃষ্টি হইলে উক্ত সমাজ "আদি ব্রাহ্মসমাজ" নামে অভিহিত হয়। কোচবিহার-বিবাহের ৫।৬ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই বাবু কেশবচন্দ্র সেনের সহিত অনেক গুলি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও সমাজের কার্য্য পরিচালনা সম্বন্ধে মতভেদ চলিতেছিল। অবশেষ কোচবিহার-বিবাহ দ্বারা ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে এমত ভয়ানক ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হয়, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় একটী সমাজের সৃষ্টি অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কি শুভক্ষণেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইয়াছিল। ইহার অভ্যুদয় না হইলে ভারতবর্ষে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে কি দুর্গতি হইত, তাহা ভাবিতে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। অনেক গুলি ব্রাহ্ম বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একাধিপত্যে দিন দিন অকর্ম্মণ্য ও হতাশ্বাস হইয়া যাইতেছিলেন। কোচবিহার বিবাহ তাঁহাদিগকে জাগাইয়া দিল। তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু দুর্গামোহন দাস, শিবচন্দ্র দেব, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, কালীনাথ দত্ত, গুরুচরণ মহলানবিশ, উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ টাউনহলে সভা আহ্বান করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিলেন। সেই সময়ে এই সকল লোক যে কত খাটিয়াছিলেন তাহা মনে করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ধর্ম্ম প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ, নগেন্দ্রনাথ জ্বলন্ত উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। রামকুমার বিদ্যারত্ন আসিয়া তাঁহাদের সহিত যোগ দিলেন। পূজনীয় বৃদ্ধ শিবচন্দ্র দেব যুবক ব্রাহ্মদিগের মন্ত্রী হইলেন। "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" গঠিত হইল, বাবু শিবচন্দ্র দেবের নিকট হইতে যখন টেলিগ্রাফ পাইলাম, সেই সময়ে মনে কি যে অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম তাহা লিখিয়া জানাইতে অক্ষম। তখন মনে করিলাম আজ হইতে আমাদের ন্যায় সাধারণ ব্রাহ্মদিগের মাথা রাখিবার স্থান হইল আমাদের "নিজ" সমাজ সংস্থাপিত হইল। আর লোক-বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ চালিত হইবে না। গুরুবাদ, পৌরহিত্য, বিদূরিত হইল। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ 'স্বাধীন চিন্তা' পুনর্ব্বার সম্মানিত হইল। এই আন্দোলনে মফস্বলের ব্রাহ্মগণও জাগিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশিত হইতে লাগিল। এই সময়ে ঢাকা নগরে আমরাও কেশব বাবুর শিষ্যদের সহিত ঘোরতর বাদানুবাদ ও আন্দোলনে প্রবৃত্ত ছিলাম। মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণের মধ্যে যাঁহারা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য খাটিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়, স্বর্গীয় বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, চণ্ডীচরণ সেন, আনন্দচন্দ্র মিত্র; শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, অঘোর নাথ মুখোপাধ্যাপায়, শিবনারায়ণ অগ্নিহোত্রীর নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বাবু গোবিন্দচন্দ্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে এত ভাল বাসিতেন যে উহার স্মরণার্থ স্বীয় পুত্রের নাম "সাধারণ চন্দ্র" রাখিয়াছিলেন। বস্তুতঃই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আমাদের অতিপ্রিয় বস্তু। বিলাত হইতে মিস্ কলেট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা ব্রাহ্মগণ কখনও ভুলিতে পারিবেন না। তিনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম এবং যত্ন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে আমাদিগকে লজ্জিত হইতে হয়। "সাধারণ" ব্রাহ্মসমাজ নামটী উপযুক্তই হইয়াছে। ইহার উপর সকল ব্রাহ্মের সমান অধিকার। ইহার ত্রুটী দেখিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম দূরে চলিয়া যান। ত্রুটী নাই এমন কোন ধর্ম্মসমাজ কি জগতে আছে? যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিতে কত বাঁধা বিঘ্ন, নিন্দা ও কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, আহা! সেই সমাজের কোন ত্রুটী জন্মিলে কি আমরা উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইব? যে সকল ব্রাহ্ম অল্পকাল হইল, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সৃষ্টির পূর্ব্বাপর ঘটনা সকল যাঁহারা অবগত নহেন; তাঁহারা সহজেই উহার নিন্দা করিয়া দূরে যাইতে পারেন। কিন্তু আমাদের প্রাণ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত গাঁথিয়া গিয়াছে, আমরা ইহা ছাড়িয়া কোথায় যাইয়া আশ্রয় লইব? কেশব বাবুর অবৈধ আচরণে যখন ব্রাহ্ম সমাজ টলমল করিতেছিল, যখন হিন্দু খৃষ্টীয়ান এবং অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় ব্রাহ্মসমাজের চরমকাল উপস্থিত বলিয়া ঘোষণা করিতেছিলেন;—সেই সময়ে যে সমাজের জন্ম হওয়াতে আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি,—আরাম স্থল পাইয়াছি; তাহা কি কখনও পরিত্যাগ করিতে পারি। ইহার দোষ দেখিলে সংস্কার করিতে যত্ন করিব, কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিবার কথা মুখেও আনিতে পারি না। স্বয়ং ঈশ্বর যে সমাজের জন্মদাতা, তাহা কি বিনাশ পাইতে পারে? যদি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মূলে বিন্দুমাত্রও অসৎভাব থাকিত, তাহা হইলে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভবিষ্যৎ বাক্য ফলিত সন্দেহ নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ, লক্ষ্য অতি মহৎ। ভারতের ধর্ম্ম, নীতি, সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা সকল বিষয়েই সংস্কার সাধন করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমাদের মধ্যে মত বিভিন্নতা আছে ও থাকিবে। কিন্তু এই মত বিভিন্নতা যেন আমাদের সকলের প্রিয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত না করে, সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বলিতে দুঃখ হয়, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ গঠনের সময় যাঁহারা অগ্রণী

ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহার সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং কেহ কেহ এমন শিথিলভাব ধারণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সম্বন্ধ থাকা না থাকা তুল্য হইয়া উঠিয়াছে। তবে কথা এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তা মনুষ্য নহে। যিনি যাইবেন তিনিই যাইবেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অটল থাকিবেই থাকিবে। ইতি

আপনাদের

ঢাকা শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

ইন্দোর প্রার্থনা সমাজের ৭ম বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উজ্জয়িনী, রাতলাম, ধার, দেওয়াজ, পুনা, খাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণ আসিয়া উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন।

২রা মে—পূর্ব্বাহ্লে—উপাসনা হয়। অপরাহ্লে—দেওয়াসের রাজমন্ত্রী, রায় বাহাদুর নীলকান্ত জনার্দ্দন কীর্ত্তনে—ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বক্তৃতা করেন।

৩রা মে—পূর্ব্বাহ্লে—উপাসনা হয়। অপরাহ্লে—ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাধান্য সম্বন্ধে পণ্ডিত বেঙ্কাভূষ মাধবরাও বক্তৃতা করেন।

৪ঠা মে—পূর্ব্বাহ্লে—উপাসনা এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে বোম্বে প্রার্থনা সমাজের প্রচারক সদাশিব রাও কেলকার উপদেশ দেন এবং অপরাহ্লে তিনিই পুনরায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

৫ই মে—অপরাহ্লে—সঙ্গত সভা হয়।

৬ই মে—পূর্ব্বাহ্লে—উপাসনা হয়। অপরাহ্লে—ধর্ম্ম মতের সংস্কারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে পণ্ডিত নবীনচন্দ্র রায় হিন্দিতে বক্তৃতা করেন।

৭ই মে—অপরাহ্লে—History of India in religious point of view এই সম্বন্ধে ইংরেজিতে শ্রীকাশীনাথ কীর্ত্তনে বি, এ, বক্তৃতা করেন।

৮ই মে—গবর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট মহাশয়ের বাগানে প্রীতি-ভোজন হয়। তথায় মহারাজা হোলকার-রাজমন্ত্রীর কন্যা এবং পুত্রবধূ প্রভৃতি প্রায় ২০ বিংশতি জন মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

৯ই মে—কীর্ত্তন হয়।

বক্তৃতা উপদেশাদির সময় প্রত্যহই প্রায় ২০০ শত লোক নিবিষ্ট চিত্তে বক্তৃতাদি শ্রবণ করিয়াছেন। স্থানীয় লোকের ব্রাহ্মসমাজের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি আছে। হোলকার মহারাজ স্বয়ং সমাজ মন্দির নির্ম্মাণের জন্য ৫০০৲ শত টাকা নগদ এবং উপযুক্ত জায়গা প্রদান করিয়াছেন।

হিন্দি এবং মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় প্রচার করিতে পারেন এরূপ প্রচারকের এ প্রদেশে বড়ই অভাব। আশা করি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ এবিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় কিছুদিন হইল শিলং হইতে খাসিয়ার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্র হইতে শেলা নামক স্থানের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এবারে এস্থানে ১৪ জন নূতন লোক ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দিয়াছেন। আরও কয়েক জন পরে যোগ দিবেন বলিয়াছেন। দুই এক জন বৃদ্ধও যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন। এক জন ওয়াদার (গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা) আমার নিকট ব্রাহ্ম ধর্ম্মের খুব প্রশংসা করিলেন। শুনিলাম তাঁহার এ ধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছাও আছে। এখানকার ব্রাহ্ম সংখ্যা ৩৫ জন। তন্মধ্যে ৩ জন অন্য গ্রামের লোক। এখানকার সমাজের অবস্থা বেশ। গতবারে আমি যেরূপ উপাসনা প্রণালী দেখাইয়াছিলাম, সেই ভাবেই উপাসনাদি চলে। সকলেই প্রায় বেশ সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন করিতে পারেন। যখন এতগুলি লোক গলা মিলাইয়া একত্রে সঙ্গীত করেন তখন শুনিতে বড় মিষ্ট লাগে। প্রতি রবিবার তিন বার সামাজিক কার্য্য হয়। প্রাতে ভিন্ন ভিন্ন সমাজে প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়। মধ্যাহ্নে ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী অনুসারে সকল সমাজের লোক এক সমাজে মিলিত হইয়া উপাসনা করেন। অপরাহ্নে আলোচনা, গ্রন্থপাঠ এবং প্রার্থনা হয়। এই সময় ৫০।৬০ জন লোক প্রায় প্রত্যেক বারে উপস্থিত হন। কোন কোন সময় আরও অধিক উপস্থিত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রাহ্ম তাঁহাদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য করিতে হয়। কয়েক জনের বেশ ব্যাকুলতা আছে। এবারে যাঁহারা যোগ দিয়াছেন তাঁহাদের বয়স অধিকাংশেরই ২০ হইতে ৩০ বৎসর। ২০ বৎসরের নীচে এবং ৩০ বৎসরের উপরে ৬ জন। প্রায় সকলেই পড়িতে জানেন। আমাদের কয়েক জন ভ্রাতার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

১ম। মান সিং—বয়স ৭০।৭৫ বৎসর। ইনি বড় বিশ্বাসী। যখন ইনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তখন বড় অনুতাপ করিয়া কতকগুলি পাপের কথা উল্লেখ করিয়া আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ঈশ্বর কি আমাকে ক্ষমা করিবেন? এবারে বিদায়ের সময় আমায় বলিলেন যেথায় যত ব্রাহ্ম বন্ধু আছেন সকলকে আমার নমস্কার দিবেন। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি কবে মরিয়া যাইব। সকলকে আমার জন্য প্রার্থনা করিতে বলিবেন। আমি গত জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি।

বাড সিং—বৃদ্ধ, বয়স ৬০।৬৫। ইনি প্রায় ১৮ বৎসর খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন এবং ঐ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ইনি খ্রীষ্টিয়ান চর্চ্চের একজন এল্ডার (elder) ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ত্রিত্ববাদে অবিশ্বাসী হওয়াতে উপধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একেশ্বরবাদী হন। তাঁহার স্ত্রী ও পুত্র অদ্যাবধি খ্রীষ্টিয়ান আছেন, এজন্য তাঁহাকে স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া কষ্টে বিদেশে একাকী জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতে হইতেছে। তিনি প্রায় ২০ বৎসর একেশ্বরবাদী হইয়াছেন। সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম পাইয়া তাঁহার বড়ই আনন্দ। তিনি বড় প্রার্থনাশীল। সমস্ত দিন কায করেন, রাত্রি ভিন্ন অবকাশ নাই। এবারে আমার বাসা অনেক দূরে ছিল বলিয়া

রাত্রে আসিতে পারিতেন না। কিন্তু পূর্ব্ববারে অনেক রাত্রে একত্রে আলোচনা ও শয়ন করিতেন। একত্রিত হইলেই ইনি বলেন সঙ্গীত ও উপাসনা করুন।

জইন মাণিক—বয়স ৩৫।৪০। ইনি ধর্ম্মের জন্য বড়ই ব্যাকুল। যে কয়েক জনে প্রচারক পাঠাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন ইনিই তাঁহাদের অগ্রণী। ইনি সম্প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে আপন কন্যার নামকরণ করিয়াছেন। আপনার পরিবারবর্গকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য ইহাঁর বড়ই ইচ্ছা। আমি ইহাঁর বাড়ীতে কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম।

কৃষ্ণধন রায়—বয়স ২৬।২৭। ইনি উৎসাহী এবং বেশ বাঙ্গালা পড়িতে ও লিখিতে জানেন। ইনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন এবং হিন্দুধর্ম্মের পুস্তক পড়িয়াছেন। আমি ইহাঁর বাড়ীতেও কয়েক দিন ছিলাম।

মান সিং ব্যতীত ইহাঁরা সকলে সময়ে সময়ে উপাসনাদির কায করেন। ইহাঁরা ব্যতীত আরও অনেক ভাল লোক আছেন যুবকেরা বড়ই উৎসাহী। আমি যতদিন ছিলাম, অনেকে কার্য্য ক্ষতি করিয়া সমস্ত দিন আমার নিকট থাকিতেন। কেহ কেহ রাত্রে সেইখানেই শয়ন করিতেন। দুই এক জন বন্ধু কিরূপে তাঁহাদের স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া হইবে এ সম্বন্ধে আমায় জিজ্ঞাসা করেন। এখানে স্ত্রী স্বাধীনতা নাই, এজন্য ইহার কোন উপায়ও দেখা যায় না। শুনিলাম দুই এক জন স্ত্রীলোক নাকি আপনা আপনি এই ধর্ম্ম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন পত্র। দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে, এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিব না। মোটের উপর এই কথা বলা যায় যে যদি কার্য্য করিবার লোক থাকে, তবে শেলায় ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী।

শুনিলাম পূর্ব্বে এখানে ৪৫০।৫০০ হিন্দু বা শূদ্র ছিলেন (কারণ তাঁহারা আপনাদিগকে হিন্দু না বলিয়া শূদ্র বলেন।) এখন ন্যূনাধিক ৫০ জন আছেন। নিতান্ত অজ্ঞ যাঁহারা তাঁহারাই পৌত্তলিকতার সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিলে কথার সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা লিখিতে পড়িতে জানেন, তাঁহারা রাম মানেন, কিন্তু এ রাম দশরথের পুত্র নন এবং তিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। দোলের সময় আবির দিয়া দোলযাত্রা হয়,অথচ মূর্ত্তি নাই। স্বাভাবিক বিশ্বাসকে বিকৃত করা যে বড় সহজ ব্যাপার নয়, তাহা ইহা দ্বারা বুঝা যায়।

পূর্ব্বে এখানে অনেক খ্রীষ্টিয়ান ছিলেন। এখন কমিয়া তাহার সিকি দাঁড়াইয়াছে। শুনিলাম ভদ্রবংশসম্ভূত লোক বড় এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। খাসিয়া খ্রীষ্টিয়ানদিগকে প্রকৃত-ভাবে ত্রিত্ববাদ মানিতে বড় দেখি নাই। কারণ এরূপ লোক অতি অল্পই আছেন, যাঁহারা যীশুকেই ঈশ্বর বলিয়া মানেন। ঈশ্বর একমাত্র অদ্বিতীয়; কিন্তু যীশু তাঁহার মন্ত্রী, মধ্যবর্ত্তী, উকিল বা নেতা বা জামিন। আমার সঙ্গে তর্ক করিবার সময় অনেকে মন্ত্রী ও জামিন এই দুইটী কথাই ব্যবহার করিয়াছেন। একটা খাসিয়া কথা সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়—যথা u ksing। তাহার ইংরাজী অর্থ advocate ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে তাঁহাদের এক ঈশ্বরে যে স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে, তাহা অদ্যাবধি যায় নাই।

এখানে অনেকে আমার নিকট হইতে ঔষধ লইতেছেন। এখানে একটী হাঁসপাতাল আছে, তথাপি সেখানকার ঔষধ না লইয়া আমার নিকট হইতে প্রায় প্রত্যহ ২০।২৫ জনে ঔষধ লইয়াছেন। অন্যান্য কার্য্য করিয়া যে সময় পাইয়াছি তাহা প্রায় চিকিৎসা কার্য্যেই গিয়াছে। অনেকের উপকারও হইয়াছে।

উৎসব—নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ১২শ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে,—

১লা জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রাতঃকালে উপাসনা। শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ভাগবতী লীলা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার সার মর্ম্ম স্থানান্তরে প্রদান করা গেল।

২রা জ্যৈষ্ঠ, প্রাতঃকালে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। অপ-রাহ্ণ ৫ঘটিকার পর পাঠ, ব্যাখ্যা, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন হয়। সায়ংকালে উপাসনা হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আচা-র্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে ব্রাহ্ম বালকবালিকাগণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটী স্কুল খোলা হয়। তদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের একটী সম্মিলন সভা হইয়াছিল। প্রথমতঃ প্রার্থনা হইয়া সভার কার্য্যারম্ভ হয়, পরে সম্পাদক মহাশয় স্কুল সম্বন্ধীয় আনুষঙ্গিক বিবরণ সভ্যগণের গোচর করিয়া স্কুল আরম্ভ হইবে বলিয়া জ্ঞাপন করেন।

বিদ্যারম্ভ—কিছুদিন হইল শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্রের পুত্র এবং বাবু রাধানাথ দেবের কন্যার বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে উপা-সনা হইয়াছিল। প্রথমটীতে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং দ্বিতীয়টীতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। বিদ্যা-রম্ভ জীবনের একটী প্রধান ঘটনা সুতরাং তদুপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। ব্রাহ্মবন্ধুগণের এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্মের গৃহের সকল কার্য্যের পূর্ব্বেই ব্রহ্মোপাসনার বিধি থাকা আবশ্যক।

শ্রাদ্ধ—বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার; কলিকাতা নগরে বরিশালের অন্তর্গত কুলকাটী নিবাসী বাবু উমাচরণ সেন মহা-শয়ের পরলোক গত পিতা কাশীচন্দ্র সেন মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞ-তার সহিত জানাইতেছি যে উমাচরণ বাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

দীক্ষা—বিগত ২৯এ বৈশাখ রবিবার কাঁথি নগরে তত্রত্য বঙ্গবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন জানা এবং কাঁথি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ বেরা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই দীক্ষা কার্য্যে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর ধর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট তাঁহার সন্তান দ্বয়ের প্রাণে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ইহাদিগকে ধর্ম্মপথে চির প্রতিষ্ঠিত রাখুন এই প্রার্থনা।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেস শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই জ্যৈষ্ঠ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজ তত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
৫ম সংখ্যা।

১লা আষাঢ় শনিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৶০

অভাব কি থাকে অপূরণ ?

তুমি প্রভু আমি দাস তব,
জীবন নিজস্ব মোর নয় ;
যাহা আজ্ঞা শিরে ধরি লব,
তুমি জান কিসে ভাল হয়।

তুমি জান কবে কোন স্থানে,
কোন কাজে আসিবে এ জন ;
আর কেহ জানে বা না জানে,
তুমি জান মোর প্রয়োজন।

শক্তিময় তুমি মহারাজ,
ইচ্ছায় শাসিছ ভূমণ্ডল ;
ছোট হাতে দেছ ছোট কাজ
ভার বুঝি প্রাণে দেছ বল।

জ্ঞান আঁখি জাগ্রত তোমার,
অভাব কি থাকে অপূরণ ?
আমারি নয়নে অন্ধকার
তাই মোর ব্যাকুলিত মন।

কাঁদি হেরি কার্য্য অগণন
শকতির অতীত আমার ;
মিছা চিন্তা ; অন্য কোন জন
শক্তিমান্ পেয়েছে সে ভার।

আমা হ'তে যেই কাজ হয়,
তাহে ঢালি দিই তনু মন ;
তোমার জগতে প্রেমময়
অভাব কি থাকে অপূরণ ?

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

শৃঙ্খল—বল দেখি কোন্ শৃঙ্খল সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও ভগ্ন করা অসাধ্য ? স্বর্ণ শৃঙ্খল, লৌহ শৃঙ্খল, ইস্পাতের শৃঙ্খল প্রভৃতি নানা শৃঙ্খল আছে। সে সকল অতি দৃঢ়; কিন্তু তাহা অপেক্ষা সুদৃঢ় কোনও শৃঙ্খল কি আছে ? আমাদের বোধ হয় অভ্যাস-শৃঙ্খল অপেক্ষা কঠিন শৃঙ্খল আর নাই। এই শৃঙ্খলে একবার বাঁধা পড়িলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য। অভ্যাস কি দৃঢ়সূত্রে যে আমাদের প্রকৃতিকে বাঁধিয়া রাখে, যাহা করি কিছুতেই সে সূত্র ছিন্ন করিতে পারি না। যাঁহাদের মানসিক শক্তি অতিশয় প্রবল এবং প্রতিজ্ঞা দুর্জ্জয়, তাঁহারাও অভ্যাস-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কর্ত্তৃত্ব-বিহীন হইয়া পড়েন। যাঁহারা বিশ্বাসের জন্য সহস্র বাধা সহ্য করিয়াছেন, কত মানসিক বল ও তেজের পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহারা দেখি একটী সামান্য মাদক দ্রব্য পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। নস্য দানিটী মাসের মধ্যে দুইবার ছুড়িয়া ফেলিয়া দিতেছেন, আবার কুড়াইয়া আনিতেছেন। কঠিন প্রতিজ্ঞা সহকারে তামাকু সেবন পরিত্যাগ করিতেছেন, আবার কিছুদিন পরে অল্পে অল্পে ধরিতেছেন। ধর্ম্ম-জীবনের গূঢ়তর বিষয়ে প্রবিষ্ট হইলেও এই অভ্যাসের অধীনতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কতবার ভাবিতেছি, জীবনটা বিশৃঙ্খল রহিয়াছে, শৃঙ্খলা স্থাপন করিব ; সমুদায় কার্য্য অনিয়মিত রহিয়াছে, সময়ে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না ; পাঠের সময়ে কাজ করি, কাজের সময়ে পাঠে বসি ; বিশ্রামের সময়ে ঘুরিয়া বেড়াই, ঘুরিবার সময়ে বিশ্রাম করি ; এরূপ অনিয়মিত জীবন আর রাখিব না। এবারে জীবনকে নিয়মাধীন করিব। উপাসনা, ধর্ম্ম-সাধন, আত্মচিন্তা, সদালাপ সমুদায়ের জন্য সময় বিভাগ করিয়া রাখিব। এই নববর্ষের প্রথম দিন হইতে নূতন জীবন আরম্ভ করিলাম ; এই নূতন দৈনিক লিপি খুলিলাম ; এই আপনাকে বাঁধিলাম, আর ভাঙ্গিতে দিব না ; এই বলিয়া মনকে কত আশ্বাস দিলাম ; কিন্তু হায় প্রকৃতির মধ্যে কোথায় কি ছিল, সে সব প্রতিজ্ঞা দাঁড়াইতে দিল না। অল্পে অল্পে যে বিশৃঙ্খলা সেই বিশৃঙ্খলা আসিয়া পড়িল। প্রকৃতির মধ্যে অভ্যাসের শৃঙ্খল ছিল। বহু বৎসরে যাহা অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ভেদ করা কঠিন।

সুখ-লালসা—অভ্যাসের যে কঠোর শাসন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে কি দেখিতে পাই ? কতবার দেখা গিয়াছে সুরাপায়ী ব্যক্তির শুভ মুহূর্ত্তে কত অনুতাপের উদয়

হইয়াছে; নিজ স্ত্রী পুত্রের দুর্দশা দেখিয়া নেত্রে জল ধারা বহিয়াছে; আর এমন কাজ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। প্রথমে বোধ হইয়াছিল মানুষটা বুঝি এ যাত্রা ফিরিল। কিন্তু আবার দেখা গেল, যেই পুনরায় সুরার সহিত সাক্ষাৎকার অমনি তাহার পতন। তবে কি তাহার অনুতাপ মৌখিক ছিল? অনেকে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়া থাকেন, সে অনুতাপ কোন কার্য্যের নহে, তাহা কৃত্রিম ও লোক প্রদর্শন মাত্র। আমরা এরূপ বলি না। সে অনুতাপ প্রকৃত অনুতাপই ছিল। সে ব্যক্তি বাস্তবিক আপনাকে সুরার করাল কবল হইতে জন্মের মত বাঁচাইবার ইচ্ছা করিয়াছিল। তবে পড়িল কেন? উত্তর—তাহার আধ্যাত্মিক শক্তি অপেক্ষা সুখ-লালসা অধিক। সুরাপান-নিবন্ধন যে এক প্রকার ক্ষণিক দৈহিক ও মানসিক উত্তেজনা হয়, সেই উত্তেজনা জনিত সুখটুকুর প্রতি তাহার এত লোভ যে তাহা স্মরণ করিবামাত্র তাহার প্রতিজ্ঞার বল গলিয়া যায়। সে আবার সুরার আলিঙ্গন পাশে বন্দী হইয়া পড়ে। যতবার পড়ে মনের বাধা দিবার শক্তি ততই বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশেষে সে সুখ-লালসার ক্রীতদাস হইয়া পড়ে। সুখ-লালসাকে যিনি জয় করিয়াছেন, তিনিই অভ্যাস-শৃঙ্খল ভেদ করিতে পারেন।

ধর্ম্মসাধনের জমি—বড় বড় ধনিদের প্রাসাদের রেইল বারাণ্ডা প্রভৃতিতে রং করিবার সময় প্রথমে দুই তিন রকম রং দিয়া থাকে। তখন জিজ্ঞাসা করিলে বলে জমি প্রস্তুত হইতেছে। প্রস্তুত জমির উপরে শেষ রংটী দিলে, তাহা সুন্দররূপ ফলিয়া থাকে। ধর্ম্ম সাধনেরও জমি আছে। যে সে চরিত্রে ধর্ম্মসাধন ফলে না। যেখানে নৈতিক জমি প্রস্তুত নয়, যে প্রকৃতিতে হিংসা বা বিদ্বেষ প্রবল, যাহার ভাব স্বভাবতঃ সংকীর্ণ ও অনুদার যে ব্যক্তি স্বভাবতঃ পরছিদ্রান্বেষী, বা পরনিন্দাতে সুখ পায়, সে চরিত্রে যদি ধর্ম্ম সাধন থাকে, তাহা যেন ফলে না, তাহার শোভাই হয় না। মানুষটী পাঁচ ঘণ্টা করিয়া সাধন করে; কিন্তু মানবের গুণভাগ অপেক্ষা দোষভাগ দেখিতে অধিক সুখ পায়, এবং পরনিন্দাতে আনন্দ লাভ করে; এরূপ স্থলে সে পাঁচ ঘণ্টা সাধন ও কদর্য্য দেখায়। ধর্ম্মসাধনের ভিত্তি নৈতিক ভিত্তি। যে সমাজের নৈতিক অবস্থা হীন, সে সমাজে উচ্চ ধর্ম্মের কথা হইলেও তাহা উপহাসের বস্তু হয়। নৈতিক দুর্ব্বলতা লইয়া উচ্চ ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলে, পদে পদে ভগ্নোদ্যম হইতে হয়। ব্রাহ্মসমাজের সেই দশা ঘটিয়াছে; আমরা যে উচ্চ ধর্ম্মভাব সাধন করিতে যাইতেছি, আমাদের নৈতিক জীবন তাহার অনুকূল নয় বলিয়া আমাদিগকে পদে পদে নিরাশ হইতে হইতেছে। এই নৈতিক দুর্ব্বলতা সমাজের অনেক সদনুষ্ঠানকে বাধা দিতেছে।

সামাজিক শিক্ষা—একজন সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ মহিলা বিলাতের একখানি সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন,—"আমার বাঙ্গালি বন্ধুগণ বিবাহ পূর্ব্বরাগ প্রভৃতি বিষয়ে সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ের "ক" "খ" জানেন না।" এই উক্তিটী পাঠ করিবার সময় একটী চিন্তা অন্তরে উদিত হইল। উক্ত মহিলা আমাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক বোধ হয় না। মানুষ যে প্রকার সামাজিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে বাস করে, তাহার চিন্তা ও আদর্শ প্রায় সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। যে সমাজে বালিকাদিগকে দশ বৎসরের অধিক কাল অবিবাহিত রাখিলে নিন্দা-ভাজন হইতে হয়; যাহাতে ১৩।১৪ বৎসরের বালকদিগকে বিবাহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ করা অন্যায় বোধ হয় না, যাহাতে কন্যা দায় একটী বিষম দায়, যে সমাজে বিবাহ কার্য্যটা পাত্র পাত্রীর পরীক্ষা বা সম্মতির উপর নির্ভর করে না, যে সমাজে রমণী সর্ব্ব বিষয়ে অতি হীন অবস্থাতে বাস করিতেছেন, সেই সমাজে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও বর্দ্ধিত হইয়াছেন তাঁহারা কি প্রকারে বুঝিবেন, ইংরাজ সমাজে বিবাহাদি কি প্রকারে ঘটিয়া থাকে? যে সমাজে বালিকাগণ ২৩ বৎসর বয়ক্রমের পূর্ব্বে প্রায় বিবাহিত হয় না এবং যে সমাজে নারীগণ সম্পূর্ণরূপে সামাজিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন, সে সমাজে বিবাহ-সম্বন্ধ প্রণয়-সম্ভূত। এই প্রণয়ের প্রকার ও প্রণালী কি প্রকার, তাহা সে সমাজে বাস না করিলে অনুভব করা যায় না। আমাদিগকে পূর্ব্বরাগের কথা ভাবিতে হইলে কবির কল্পনার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে হয়, এবং সে অবস্থাতে যে কল্পনা করি তাহা হয় অল্প-রঞ্জিত না হয় অতি-রঞ্জিত হইয়া যায়। আমাদের দেশে প্রণয় শব্দ ব্যবহার করিলেই লোকের মনে অতি কুৎসিত ব্রীড়াজনক ভাবের উদয় হয়। ইহার কারণ এই বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, দাম্পত্য সম্বন্ধ বলিলেই লোকের মনে হীন ভাবের উদিত হয়। দাম্পত্য সম্বন্ধের মূলে প্রণয়; সুতরাং দাম্পত্য সম্বন্ধের পঙ্কিল ভাব প্রণয়ের ভাবকেও পঙ্কিল করিয়া দিয়াছে। আমরা যে ভাবে বিবাহ ও প্রণয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি, তাহার মধ্যে একজন ইংরাজ-মহিলা অজ্ঞতার লক্ষণ দেখিতে পান তাহা বিচিত্র নহে।

নীরব শিক্ষা—যদি কোন ব্রাহ্মের এরূপ ইচ্ছা থাকে যে তাঁহার পুত্র বা কন্যাটীর মনে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হয়, ঈশ্বরোপাসনা ও ধর্ম্ম সাধনে অনুরাগ জন্মে, তাহা হইলে সেই পুত্র বা কন্যাকে কি এমন পরিবারে রাখা উচিত, যেখানে প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্মের নিন্দা কেহ করে না, কিন্তু প্রতি মুহূর্ত্তের ব্যবহার দ্বারা প্রকাশ করে যে ধর্ম্মসাধনকে তাহারা নির্ব্বোধের কাজ মনে করে; এবং তদপেক্ষা আমোদ প্রমোদকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করে। এরূপ পরিবারে রাখার ফল এই হয় যে, তাহারা ক্রমে ধর্ম্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। এরূপ পরিবারে পুত্র কন্যাকে রাখিলে যদি অনিষ্ট হয় তাহা হইলে যে শিক্ষা-প্রণালীতে নিরন্তর বলিতেছে, যে বুদ্ধিবৃত্তির চালনাই মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য নীতি ও ধর্ম্মের উন্নতি সে লক্ষ্যের অন্তর্গত নহে, সেরূপ শিক্ষা প্রণালীতে সন্তানদিগকে রাখিলেও অনিষ্ট হয়। কেহ কেহ হয়ত বলিবেন সেরূপ শিক্ষা-প্রণালী কোথায়? বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী কি সেরূপ নহে? এ প্রণালী নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার প্রতি উদাসীন।

ব্রাহ্মেরা চিরদিন যে কথা বলিয়া আসিতেছেন এবং পরেও বলিবেন এ প্রণালী ঠিক তাহার বিপরীত কথা বলিতেছে। ব্রাহ্মেরা বলিয়া আসিতেছেন—"একজন যদি বি, এ, বা এম, এ, হয়, যদি সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্থান অধিকার করে, কিন্তু অপর দিকে পিতা মাতার প্রতি ভক্তিবিহীন, পত্নীর প্রতি প্রেমবিহীন, শিশুদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ, জগতের সুখ দুঃখের প্রতি উদাসীন হয়, তবে তাহার সে বি,এ, বা এম, এ,র কোন মূল্য নাই। সে জ্ঞানকে অজ্ঞতা বলিয়া গণনা করিতে হইবে।" এই ত গেল ব্রাহ্মদের উপদেশ, এখন শুনুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান প্রণালী কি উপদেশ দিতেছে। এই প্রণালী বলিতেছে—"এক ব্যক্তি পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ, পত্নীর প্রতি প্রেমহীন, পুত্র কন্যার প্রতি উদাসীন, স্বার্থপর, ইন্দ্রিয়াসক্ত হউক আর যাহাই হউক, তাহার নীতি ও চরিত্রের সহিত আমাদের সম্পর্ক নাই। বুদ্ধি বিদ্যাতে যে ব্যক্তি অগ্রসর সেই আমাদের নিকট পূজনীয়।" কেমন বিপরীত কথা। যে প্রণালী নীরব ভাষাতে নিরন্তর এই কথা প্রচার করিতেছে, তাহার মধ্যে যাহারা বাস করিয়া বর্দ্ধিত হয়, তাহারাও অল্পে অল্পে ধর্ম্ম ও নীতিকে অবান্তর লক্ষ্যের মধ্যে গণনা করিতে শিখে। এই কারণেই বর্ত্তমান প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য ভাব দৃষ্ট হইতেছে। এইরূপ বিদ্যালয় সকলে পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম বালক বালিকাগণ যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিদ্রূপকারী ও বিরোধী হইয়া উঠে তাহা কিছুই বিচিত্র নহে। যদি ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার সমুচিত ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলেও এক দিন বিদ্যালয়ের এই নীরব শিক্ষার অনিষ্ট ফল কতক পরিমাণে নিবারণ করা যাইত। কিন্তু তাহাও নাই। সুতরাং এই হইতেছে যে আমরা ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে যে নীতি ও ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতেছি, বালক বালিকা বিদ্যালয়ে সেই ধর্ম্ম ও নীতিকে সর্ব্বাপেক্ষা হীন স্থানে পতিত দেখিতেছে। আমরা যদি ব্রাহ্ম বালক বালিকার ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না করি, এবং সংসারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহাদের মনে ধর্ম্মভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিতে না পারি, তাহা হইলে এ ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ মধ্যে দাঁড়াইবে না।

এখন কর্ত্তব্য কি? এ সম্বন্ধে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীগণ যাহা করিতেছেন তাহা কিয়ৎ পরিমাণে দৃষ্টান্ত স্বরূপ অবলম্বন করা যাইতে পারে। তাঁহারা যদিও নিজ নিজ বালক বালিকাদিগকে বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে প্রেরণ করিতেছেন, তথাপি তাহাদিগকে শৈশবে ও যৌবনে আপনাদের বিদ্যালয়ে রাখিয়া যথাসাধ্য ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার উপায় বিধান করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। এই চেষ্টা যে সকল স্থলেই সফল হইতেছে তাহা নহে, তথাপি তাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে প্রয়াসী বলিয়া প্রশংসা করিতেছি? এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মগণ কি করিতেছেন? সেরূপ বিদ্যালয় কই? যাহাতে জ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইতেছে? ব্রাহ্মেরা যদিও দরিদ্র তথাপি মিলিতভাবে চেষ্টা করিলে তাঁহারা স্বীয় বালক বালিকাদিগের জন্য আপনাদের ইচ্ছার অনুরূপ বিদ্যালয় করিতে পারেন। সেখানে তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতির ভিত্তি স্থাপন করা হইবে, তৎপরে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর অধীন হইলেও বিশেষ অনিষ্ট হইবে না।

ধারণা ও সাধনা—একজন চিত্রকর একটী উপত্যকা আঁকিবেন, তাঁহাকে অগ্রে সমগ্র উপত্যকাটী মনে ধারণা করিতে হয়, তৎপরে বর্ণবিন্যাস দ্বারা তাহাকে চিত্রে ফলিত করিতে হয়। মনের চিত্রটী যতক্ষণ বাহিরে না আসে ততক্ষণ বর্ণের উপরে বর্ণ রেখার উপরে রেখা দিয়া দেখিতে হয়। অবশেষে মনের চিত্রটী যখন ঠিক বাহিরে আসে, তখন লোকে বুঝিতে পারে সে ব্যক্তি উপত্যকা বর্ণিতে কি বুঝিয়াছিল। ব্রাহ্মধর্ম্মের ধারণা ও ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন এই উভয়ে এই প্রভেদ। ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব তোমার মনে এক প্রকার, আমার মনে এক প্রকার—তৃতীয় ব্যক্তির মনে এক প্রকার। যতক্ষণ সাধন দ্বারা তাহা জীবন্ত চরিত্রে ফলিত না হইতেছে ততক্ষণ লোকে আমাদের হৃদগত ভাব বুঝিতেই পারে না। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিলে কি বুঝি তাহা ধারণা করিতে পারে না। যদি সেই হৃদয়স্থিত ভাব প্রকৃত জীবনে পরিণত হয়, তখন লোকের সংশয় ভঞ্জন হইয়া যায়,—লোকে বলে এই কি ব্রাহ্মধর্ম্ম? যদি সে চরিত্র উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়—লোকে বলে আহা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি সুন্দর! এরূপ একটী জীবনের দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভাব মানব মনে যেরূপ উজ্জ্বল হয়, শতটী বক্তৃতার দ্বারা তাহা হয় না। একথা সত্য, যে খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে অদ্যাপি যত উপদেশ হইয়াছে, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ যীশুর জীবন-চরিত। তিনি ধর্ম্মকে জীবনে ফলাইয়া দেখাইয়াছেন খ্রীষ্টধর্ম্ম কাহাকে বলে। এই কারণে ধর্ম্মজগতে জীবনের আদর্শের এত আদর। যে উচ্চ আদর্শের কথা বলিতেছ, একটা লোক দেখাও যাহার চরিত্রে সে আদর্শ পূর্ণ হইয়াছে, অমনি দেখিবে সে বিষয়ে লোকের দশগুণ অনুরাগ বাড়িবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

মহম্মদ শিক্ষিত লোক ছিলেন কি না?

এ প্রশ্ন কেন করি? ইহার কিছু তাৎপর্য্য আছে। মহম্মদের জীবন-চরিত পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার শিষ্যগণ কোরানের অভ্রান্ততা ও দৈবভাব প্রতিপন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা এই কথা বলিতেন যে, কোরান যদি ঐশ্বরিক লীলা প্রসূত না হইবে, তাহা হইলে মহম্মদের ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা কিরূপে তাহা লিখিত হইল। আরব্য ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন যে কোরানের রচনা এমন উৎকৃষ্ট যে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। কত শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যাইতেছে এমন উৎকৃষ্ট আরবী আর লিখিত হইল না। অথচ ইহাও একটী বিদিত কথা যে মহম্মদ কিছুই লেখা পড়া জানিতেন না। ইহা একটী বিস্ময়কর ব্যাপার। মহম্মদ বহু শাস্ত্রে পারদর্শী সুপণ্ডিত লোক ছিলেন না, তবে

কি প্রকারে এমন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন? শিক্ষা শব্দ ব্যবহার করিলে আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তদ্দ্বারা বিচার করিলে মহম্মদ অশিক্ষিত লোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে উপাধি দেন নাই, কোন পণ্ডিত মণ্ডলীর নিকট তাঁহার পাণ্ডিত্যের আদর হয় নাই। ইহা সত্য, কিন্তু কোরানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষার যে সকল প্রকৃত লক্ষণ তাহা তাহার প্রত্যেক পত্রে সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কোরান যে ব্যক্তির রচিত তিনি মানব প্রকৃতি, সমাজতত্ত্ব, প্রাকৃতিক তত্ত্ব ও প্রাচীন ইতিবৃত্ত বিষয়ে যে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি য়িহুদী ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত ও নিয়মাদি যে সুন্দররূপে জানিতেন তাহার চিহ্ন কোরানের মধ্যেই বিদ্যমান। মহম্মদ এ সকল কোথায় শিক্ষা করিলেন? কোন্ বিদ্যালয়ে বা কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়াছিলেন? তাঁহার জীবন চরিতে এই মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি খাদিজার বাণিজ্য দ্রব্যের রক্ষক হইয়া নানা স্থানে গমন করিতেন; এবং সেই সকল যাত্রা কালে নানা শ্রেণীর ও নানা ভাবাপন্ন লোকের সহিত মিশিতেন, ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করিতেন ও তাহাদের রীতি নীতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই বিদ্যালয়ে মহম্মদ পাঠ করিয়াছিলেন। তবে তুমি আমি এবং মহম্মদে এই প্রভেদ যে, তুমি আমি অসার-গ্রাহী লোক, যে ক্ষেত্রে মহাজনগণ ধন রত্ন কুড়াইয়া পান, সেই ক্ষেত্র হইতে তুমি আমি কাচখণ্ড কুড়াইয়া আনি। মার্কিন পণ্ডিত এমারসন মহাপুরুষের এই লক্ষণ দিয়াছেন যে তাঁহার পেট খুব বড়। ইহা আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে;—অর্থাৎ মহাপুরুষ মাত্রেরই ধারণা শক্তি অতি আশ্চর্য্য। তাঁহারা চারিদিক হইতে জ্ঞানায় এমন সঞ্চয় করিয়া লন যে দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহাদের কি এক অদ্ভুত মানসিক শক্তি আছে, যাহা স্পঞ্জের ন্যায় মানব জীবনের উপরে পড়িয়া সত্য সকল শুষিয়া লয়। সামান্য কথাবার্ত্তা হইতে তাঁহারা মহামূল্য জ্ঞান সঞ্চয় করেন, যাহা হইতে তাঁহারা নিজ নিজ কার্য্যের উপাদান সকল সংগ্রহ করেন। এইরূপেই মহম্মদের জ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছিল। পরলোকগত দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেই দেখা যাইত যে তিনি বাইবেল ও খ্রীষ্টধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব অবগত ছিলেন। অনেক লোকে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেন। একজন সংস্কৃতজ্ঞ প্রাচীন পণ্ডিত যিনি ইংরাজীর এক বর্ণ জানিতেন না, তিনি বাইবেলে কি আছে কিরূপে জানিলেন? ভিতরের কথা এই, অনেক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোক তাঁহার সহিত তর্ক করিতে আসিতেন, এবং তাঁহার গোচরে নিজ নিজ শাস্ত্রের ও ধর্ম্ম মতের ব্যাখ্যা করিতেন। অসাধারণ সার-গ্রাহিতা গুণে দয়ানন্দ তাঁহাদের ভিতরকার সত্য শুষিয়া লইতেন। মনিষী ব্যক্তি মাত্রেরই এই শক্তি আছে।

এখন বিবেচনা করা যাউক শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষার দুইটী উদ্দেশ্য, প্রথম মনোভাণ্ডারে জ্ঞান সঞ্চয় করা, দ্বিতীয় সঞ্চিত জ্ঞানকে লইয়া জীবনে কার্য্য করিবার উপযুক্ত শক্তি বিকাশ করা। গৃহ নির্ম্মাতার গৃহ নির্ম্মাণের সহিত ইহার তুলনা করা যায়। গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চাহিলে দুইটী চাই, প্রথম ইষ্টক কাষ্ঠ প্রভৃতি উপাদান সকল যথা সময়ে সংগ্রহ করিতে হয়, দ্বিতীয় সেই সকলকে কি ভাবে মিলিত করিলে গৃহ হইতে পারে, তাহা জানা চাই। যদি সুপরিপক্ব নির্ম্মাণ-বিদ্যা থাকে, কিন্তু ইষ্টক কাষ্ঠ প্রভৃতি না থাকে, তাহা হইলে গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না; আবার অপর দিকে যদি উৎকৃষ্ট উপাদান সকল সঞ্চিত হইয়া থাকে, কিন্তু নির্ম্মাণ কুশল লোক না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও গৃহ নির্ম্মিত হইতে পারে না। শিক্ষাসম্বন্ধেও সেইরূপ। মনে যদি জ্ঞান সঞ্চিত না থাকে, তাহা হইলে প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রতিভাও পূর্ণভাবে কার্য্য করিতে পারে না, আবার প্রয়োগ শক্তির অভাবে বহুল সঞ্চিত জ্ঞানও ব্যর্থ হইয়া যায়।

শিক্ষার যদি এই দুইটী উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলেই বুঝিতে পারা যাইবে, যে এ শিক্ষা লাভ করিবার জন্য নানা ভাষা শিক্ষা করা বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করা অত্যাবশ্যক নহে। এক বর্ণ ও ভাষা শিক্ষা না করিয়া একজন অনেক উপাধিধারী ব্যক্তির অপেক্ষা সুশিক্ষিত হইতে পারে। আমাদের দেশে একটী প্রচলিত কথা আছে;—

'যদি না পড়ে পো
তবে সভার মাঝে থো।'

ইহার অর্থ, এই যে ব্যক্তি গ্রন্থ পাঠ করিয়া শিক্ষিত হয় নাই, তাহাকে পণ্ডিত মণ্ডলীর সভার মধ্যে রাখিলে সে শিক্ষা লাভ করে। এক বর্ণ না পড়িয়া বক্তৃতা উপদেশ শ্রবণ দ্বারা অদ্ভুত জ্ঞানের সঞ্চয় ও চিন্তা শক্তির বিকাশ হইতে পারে।

এই প্রণালীতে বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের অনেক শ্রমজীবী লোকের শিক্ষা হইতেছে। বড় বড় গ্রন্থ পড়ে তাহাদের এত বিদ্যা নাই, এমন অর্থ বল নাই এবং এমন অবসরও নাই। সুতরাং জনহিতৈষীগণ তাহাদের শিক্ষার জন্য নৈশ বক্তৃতা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। দেশের বড় বড় বিজ্ঞানবিৎ জ্ঞানী পণ্ডিতদিগকে ধরিয়া শ্রমজীবীদিগের সভাতে বক্তৃতা দেওয়াইয়া থাকেন। তাহাদের গ্রহণোপযোগী সরল ভাষাতে উপদেশ হয়। এই ভাবে তাহাদের জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে। এই প্রণালীতে এমন উৎকৃষ্ট ফল ফলিতেছে যে দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। একজন সামান্য শ্রমজীবীকে একখানি গ্রন্থ খুলিয়া ধর হয় ত পড়িয়া অর্থ করিয়া দিতে পারিবে না, কিন্তু প্রশ্ন কর দেখিবে বিজ্ঞানের, ইতিবৃত্তের, সমাজতত্ত্বের ও অর্থ নীতির অনেক গূঢ় তত্ত্ব অবগত আছে। তাহারা যে গ্রন্থ পড়ে নাই তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে? গ্রন্থ পড়িলে আর অধিক কি শিখিত? হয় ত শব্দের অর্থ গ্রহণ ও অভিধান দেখিতে যে সময় যাইত তাহাতে এতটা শিখিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইত। ভবিষ্যতের শিক্ষা প্রণালীতে গ্রন্থের শিক্ষা অপেক্ষা মৌখিক শিক্ষার ভাগ অধিক হওয়া আবশ্যক।

থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন যে সেণ্টপলকে কেহ ডাক্তার অব ডিভিনিটি (D. D.) উপাধি দেয় নাই, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া পণ্ডিত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর

যে বিদ্যালয়ে রাখিয়া পলকে মানুষ করিয়াছিলেন, সে বিদ্যালয় তোমার আমার জন্য সর্ব্বদা উন্মুক্ত রহিয়াছে। যে ভৌতিক প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতিরূপ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ঈশা, মুষা, মহম্মদ জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন, সে গ্রন্থ এখনও খোলা রহিয়াছে। বালক বালিকাদিগকে এই গ্রন্থের নিকট উপস্থিত করা ও ইহার পঙ্‌ক্তি সকল পাঠ করিবার শক্তি জন্মাইয়া দেওয়া আমাদের সকল শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া কর্ত্তব্য।

দুর্ভাগ্য বশতঃ কৃপণ যেমন ধনের লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া ধনের জন্য ধনকে ভাল বাসে, সেইরূপ আমরাও অনেক সময়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া শিক্ষা-প্রণালীর ভক্ত হইয়া পড়ি। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত আছে, অনেকে তাহার এত ভক্ত হইয়াছেন, যে তাঁহারা মনে করেন যে পুত্র কন্যা যদি সে শিক্ষা না পাইল, তবেই যেন আর মানুষ হইতে পারিবে না; তাহাদের ঐহিক সুখ ও পারত্রিক কল্যাণের আশা যেন বিনষ্ট হইল। এমন কি অনেকের সংস্কার এত দূর পর্য্যন্ত গিয়াছে যে বালিকাদিগকেও এ প্রণালীতে শিক্ষা না দিলে শিক্ষাই হইল না। কোথায় ব্রাহ্মগণ এদেশে বালিকাদিগের শিক্ষার উৎকৃষ্ট পথ প্রদর্শন করিবেন না তাঁহারাও প্রচলিত স্রোতের সঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছেন।

ধর্ম্ম সাধন ও মানসিক বল।

আমাদের দেশে একটী চলিত কথা আছে, "বাঁশ বনে ডোম কাণা" ইহার অর্থ এই ডোমের বাঁশের প্রয়োজন, সে বাঁশ বনে প্রবেশ করিয়াছে; তথা হইতে তাহার প্রয়োজনানুরূপ একটী বাঁশ কাটিয়া লইবে, কিন্তু প্রবেশ করিয়া দেখে সেখানে এত বাঁশ ও এত ভাল ভাল বাঁশ যে কোন্‌টিকে রাখিয়া কোন্‌টিকে লয়, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছে না, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বর্ত্তমান সময়ের বড় বড় পুস্তকালয়ে প্রবেশ করিলেও পাঠার্থীর পক্ষে সেইরূপ দুরবস্থা ঘটে। পাঠের জন্য ব্যগ্রতা আছে, উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নির্ব্বাচনের বাসনাও আছে, কিন্তু উৎকৃষ্ট গ্রন্থের সংখ্যা এত যে নির্ব্বাচন করা কঠিন বোধ হয়। অবশেষে পাঠার্থীর মনে নিরাশার উদয় হয়; এত গ্রন্থ, কোন খানিই বা পড়ি, আর কতগুলিই বা পড়িয়া শেষ করি।

একবার একজন দুর্ব্বলচেতা বিচার-পতির বিবরণ শুনা গিয়াছিল। তিনি বিচারাসনে আসীন হইলে উকীলগণ যখন স্বীয় স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, তখন প্রথম উকীলের বাক্‌চাতুরী ও তর্কপটুতাতে তাঁহার বোধ হইল, সেই পক্ষই ন্যায় পক্ষ; তদনুসারে মত প্রকাশ করিতে যাইতেছেন এমন সময় অপর পক্ষের উকীল লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিল,—ধর্ম্মাবতার অপেক্ষা করুন ওসকল অসার কথা আমি কাটিয়া দিতেছি। দ্বিতীয় ব্যক্তির তর্ক শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল যে সেই ব্যক্তির কথাই সত্য। আবার প্রথম ব্যক্তি তাহা ভাঙ্গিয়া দিয়া নিজ পক্ষ স্থাপন করিল। অবশেষে সেই বিচারপতি দেখিলেন যে তাঁহার দ্বারা বিচার কার্য্য চলা ভার, সুতরাং সে কার্য্য তিনি পরিত্যাগ করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত তিন স্থলেই এক কারণ, যাহাদের বিচার শক্তি ও মানসিক বল কম তাহাদের এই প্রকার দুর্দ্দশাই ঘটিয়া থাকে। ত্বরিত কর্ত্তব্য পথ নির্দ্ধারণের শক্তি না থাকিলে, বর্ত্তমান সভ্যতার কোলাহল ও ব্যস্ততার মধ্যে মানুষ কখনই দাঁড়াইতে পারিবে না। এখন চারিদিকে জনসমাজ দ্রুত গতিতে ছুটিতেছে; তোমার কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে যদি বিলম্ব হয়, যদি তুমি কি করিবে না করিবে, তাহা ঠিক করিতে না পার, তাহা হইলে তুমি পথে দাঁড়াইয়াই ভাব, ঐ জগতের চিন্তা ও কার্য্যের স্রোত তোমার চারিধার দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় লোকের জন্য কাহারও অপেক্ষা করিবার অবসর নাই। এই কোলাহলের মধ্যে দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতে হইলে বিশেষ মানসিক বল চাই। আমি যাহা চাই, এবং তাহার উপযোগী উপায় স্বরূপ যাহা মনে হয়, তাহা আমি দৃঢ়তার সহিত ধরিব; এই কোলাহলের প্রতি বধির হইয়া ধরিব, দেখি কিরূপ ফল ফলে;—এইরূপ দৃঢ়তার সহিত কার্য্য না করিলে, কোনও বিষয়ে উন্নতি লাভ করিবার আশা নাই।

ধর্ম্ম সাধনের বিষয়েও এই সত্য স্মরণ রাখিতে হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতাতে মানবের চিত্তকে এত চঞ্চল করিতেছে, দেখিবার ও শুনিবার এত বিষয় আনিয়া সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে, এক বিষয়ে এত প্রকার মতামত ও তর্ক বিতর্ক চলিতেছে যে, ইহার মধ্যে সুস্থির ভাবে বসিয়া দৃঢ়চিত্তে কোন সাধন-পন্থা অবলম্বন করিয়া চলা অতি দুষ্কর। প্রাচীনকালে এ সকল উপদ্রব ছিল না। মানবের রুচি ও ভাবের বিনিময় এত অধিক ছিল না। সাধকগণ স্বীয় স্বীয় স্থানে নিরুপদ্রবে বসিয়া নিজের রুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে সাধন ভজন করিতেন। এখন তাহা হইবার উপায় নাই; দশদিক হইতে দশটা বিষয় সাধকের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে; ধর্ম্ম সাধনের বিরোধী কত বিষয় ও কত ভাব নিরন্তর চারিদিক হইতে প্রবাহিত হইয়া মনের মধ্যে আসিতেছে। সাধকের পক্ষে মানসিক বলের প্রয়োজন যদি কোন কালে হইয়া থাকে, এখন হইয়াছে। পূর্ব্বকালের সাধকগণ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এখন তদপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার প্রয়োজন, নতুবা কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংলণ্ডের মুক্তিফৌজের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সভ্য জগতের কেন্দ্র-স্বরূপ লণ্ডন নগরে ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র, সেখানে সভ্যতার পূর্ণালোকের মধ্যে ইহারা বাস করিতেছেন। ইহারা যে কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার প্রতি সকলেই উপহাস ও বিদ্রূপ বর্ষণ করিতেছে; সকলেই যে জন্য ইহাদিগকে ঘৃণা করিতেছে সে দিকে ইহাঁদের দৃষ্টি নাই। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া ইহাঁরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন সেই পথে অবাধে অগ্রসর হইতেছেন। সহস্র প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও এক দিনের নিমিত্ত ভগ্নোদ্যম হইতেছেন না। এই দৃঢ়তার জন্যই ইহাঁরা স্বীয় অভীষ্ট সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে সমুদায় সাধন পথাবলম্বীকে এইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন করিতে হইবে। লোকে বিরোধী হয় হউক, আপত্তি করে করুক, বাধা দেয় দিউক, যাহা ধরিয়াছি যাহা কর্ত্তব্য

বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা সাধন করিবই করিব। দেখি কিরূপ ফল দাঁড়ায়। আমাদিগকে লোকালয়ে থাকিয়াও আপনাদিগকে নির্জ্জন বলিয়া ভাবিতে হইবে; কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও বধিরের ন্যায় তাহার প্রতি উদাসীন হইতেই হইবে; তবে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। নতুবা সভ্যতার কোলাহলের প্রতি একবার কর্ণপাত করিলে, অপরের তর্ক বিতর্কের প্রতি একবার মনোযোগী হইলে, একবার দাঁড়াইয়া ভাবিতে আরম্ভ করিলে আর পা তুলিতে পারা যাইবে না।

এইরূপ দৃঢ়তা যে কেবল সাধনের বড় বড় বিষয়েই অবলম্বন করিতে হইবে তাহা নহে। ধর্ম্ম জীবনের ও ধর্ম্ম সমাজের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যেও দৃঢ়তার প্রয়োজন হইবে। বর্ত্তমান সময়ে এমন কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতে পারা যাইবে না, যাহাতে মতদ্বৈধ ও বিচার উপস্থিত হইবে না; যাহাতে কেহ অনুকূল কেহ প্রতিকূল হইবে না। সে সময়ে ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন আবশ্যক। নিজের কর্ত্তব্য বুদ্ধির উপরে সুদৃঢ় ভাবে দাঁড়াইয়া কার্য্য করিতে হইবে। এতদ্দ্বারা চরিত্রেরও বিকাশ হয়; কর্ত্তব্য-জ্ঞান উজ্জ্বল হয়; ঈশ্বর প্রীতি দৃঢ় হয়; এবং আত্ম-নির্ভরের শক্তিও বর্দ্ধিত হয়। বাঁশবনে ডোম কাণার ন্যায় কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলে বর্ত্তমান সময়ে কোন কার্য্যই চলিবে না।

জমাট বাঁধে না কেন?

ব্রাহ্ম সমাজের কাজে তেমন জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে না, দেখিয়া অনেক বন্ধুই দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং এমন কি, কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে তজ্জন্য গভীর নিরাশার ভাবও ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এতগুলি কাজ আমরা হাতে লইয়াছি, কিন্তু তার একটীও সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ধর্ম্মসাধনে শিথিলতা, সমাজ সংস্কারে নিরুৎসাহ, আপনাদিগের মধ্যে অপ্রেম ও অসদ্ভাব ও দেশহিতকর কার্য্যে ঔদাসীন্য, এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হওয়াও নিতান্ত আশ্চর্য্যের কথা নহে। ফলতঃ যখন আমরা আপনাদিগের প্রতি চাহিয়া দেখি, অভিমান ও অহঙ্কার বিবর্জ্জিত হইয়া যখন নিজেদের দুর্ব্বলতা ও অসমর্থতার বিষয় চিন্তা করি, যে গুরুভার পরমেশ্বর আমাদিগের ক্ষুদ্র মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে যখন আমাদের সামান্য আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বলের তুলনা করি, ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর ও সুবিস্তৃত কর্ত্তব্য রাশির তুলনায় যখন বিগত ষষ্টি বৎসরের অনুষ্ঠিত কার্য্য কলাপের হিসাব নিকাষ করিতে যাই, তখন স্বভাবতঃই হৃদয়ে নিরাশার সঞ্চার হয়। কিন্তু পক্ষান্তরে আবার যখন মনুষ্য সমাজে ভাগবতী লীলার ভূত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, কি সামান্য উপকরণে, কি প্রতিকূল অবস্থাধীনে কি নিরাশাও বিঘ্ন ও বিপত্তির মধ্য দিয়া জগতের সনাতন সত্য সমূহ আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহা যখন ভাবিয়া দেখি, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় আমাদের প্রিয় ব্রাহ্মসমাজই এই শৈশব জীবনে যে সকল কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাহা যখন তলাইয়া দেখি, তখন নিজেদের সমুদায় অক্ষমতা এবং দুর্ব্বলতা বিস্মৃত হইয়া ব্রহ্ম-কৃপার লীলা অনুভব করিয়া প্রাণ আশ্বস্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য মানুষের স্বার্থ-বাসনার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা ভগবানের মঙ্গল বিধানের অনুগত, তাঁহারই আদিষ্ট এবং তাঁহার দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; এই কার্য্যের উপকরণ তিনি স্বয়ং সংগ্রহ করিতেছেন, এই কার্য্য তিনি স্বয়ং সাধন করিবেন; আমরা উপলক্ষ মাত্র। এই সকল কথা যখন ভাবিয়া দেখি, তখন শত সহস্র ভ্রম ত্রুটী, শত সহস্র প্রতিকূল ঘটনা, শত সহস্র নিরাশার কারণ থাকিলেও প্রাণে আশা ও উদ্যমের সঞ্চার হয়।

এই যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জমাট বাঁধিতেছে না বলিয়া আমরা এত দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকি, এই দুঃখের কি বস্তুতঃ তেমন কোনও বিশেষ কারণ আছে? জমাট বাঁধিতেছে না সত্য এবং দ্বিবিধ কারণে জমাট বাঁধিতেছে না, ইহাও সত্য। এই দ্বিবিধ কারণের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ কারণ,—অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী; অপর কতকগুলি আমাদিগের আপনাদিগের দুর্ব্বলতা ও অপদার্থতা প্রসূত,—সেগুলি কিয়ৎপরিমাণে নিবারণ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাহাও আবার বহু সময় সাপেক্ষ। একদিনে বা দুইদিনে জগতের কোনও মহৎ কার্য্যই সিদ্ধ হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজের এমন গুরুতর কার্য্য যে অল্প সময়ের মধ্যেই সুসম্পন্ন হইবে এমন আশা বা কল্পনাই বা আমরা কেন করি?

ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে যে বর্ত্তমান সময়ে এক প্রকার নির্জ্জীবতা আসিয়া পড়িতেছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই নির্জ্জীবতা কি কেবল ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই দৃষ্ট হইতেছে? এদেশের কোন্ দলের মধ্যে, কোন্ সম্প্রদায়ের মধ্যে, কোন্ দেশহিতকর সদনুষ্ঠানে লোকের আজি কালি তেমন উৎসাহ উদ্যম দেখিতে পাওয়া যায়? এই নির্জ্জীবতা কেবল ব্রাহ্মসমাজে নহে, কিন্তু সমস্ত বঙ্গসমাজ ব্যাপিয়া পড়িয়াছে। এই অবসাদ দেশের সর্ব্বত্র ছাইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসেই সময় সময় এরূপ অবসাদ ও নির্জ্জীবতার একটা যুগ উপস্থিত হয়। যখন লোকের মনে আর যেন বলবীর্য্য থাকে না; পার্থিব ও পারলৌকিক কোনও বিষয়েই আর তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যম দৃষ্ট হয় না; যখন সকল কার্য্যই জীবনও স্ফূর্ত্তি বিহীন হইয়া পড়ে। অনেক সময় আবার ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই অবসাদ কেবল উচ্চতর ও প্রবলতর জীবনের পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র। এই অবসাদ জনিত বিশ্রাম দ্বারা অনেক সময়ই বিধাতা মানুষের দেহ মনকে আসন্ন সংগ্রামের উপযোগী করিয়া থাকেন। এই অবসাদই সেই জাতির প্রাণে নিগূঢ় বলের সঞ্চার করিয়া দেয়, এবং এই নিদ্রিত ও নির্জ্জীব জাতিই প্রতিক্রিয়ার নিয়মাধীন হইয়া বল ও তেজ সহকারে আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাধনে নিযুক্ত হয়। ভারত সমাজে ঘোর অবসাদের রজনী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা যে প্রবলতর জীবনের পূর্ব্বলক্ষণ নহে, এ কথা কে বলিতে পারে? এ দেশের সর্ব্বত্র যে অবসাদ পরিব্যাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের উপরেও আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা দ্বারা যে ব্রাহ্মগণকে ভগবান গুরুতর সংগ্রা-

মের জন্য প্রস্তুত করিতেছেন না, তাহাই বা কোন্ সাহসে বলিব? বরং চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া ইহাই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয় যে, একটা প্রবল প্রতিক্রিয়ার দিন অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারে এ দেশের শিক্ষিত সমাজের চিন্তা ক্রমে ধর্ম্ম,সমাজ,রাজনীতি প্রভৃতি জাতীয় জীবনের সমুদায় বিভাগেই একে একে প্রবাহিত হইয়া, এখন কোনও দিকে কিছু হইল না দেখিয়া অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই যে কিছু হইল না জ্ঞান ইহাতেই প্রকৃত জ্ঞান চক্ষু যে ফুটিয়া উঠিবে না, তাহা কে বলিতে পারে? এই যে সর্ব্ব প্রকার সংস্কারের প্রতি অসম্মান ও অশ্রদ্ধা ও অনাস্থা তাহা হইতেই প্রতিক্রিয়ার নিয়মে যে সংস্কার কার্য্যে প্রবলতর উৎসাহ ও উদ্যমের সঞ্চার হইবে না কে বলিবে? জন সমাজের ভূত ইতিহাস দেখিলে তাহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয় এবং যখন এই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে, তখন ব্রাহ্মগণকে সেই অভিনব শক্তির নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের এই অবসাদের দিনে তাহারই জন্য প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। বিধাতার ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া, এই নির্জ্জীবতা হইতেই আমাদিগের আভ্যন্তরীণ বল সঞ্চারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, সেদিন অতি নিকটে আসিতেছে, যে দিন ব্রাহ্মসমাজকে পুনরায় এ দেশের সর্ব্বপ্রকার সংস্কার কার্য্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলনে এখনও দেশের শিক্ষিত লোকদিগের একটু উৎসাহ আছে। এই উৎসাহ ও কিন্তু ক্রমে নিবিয়া আসিতেছে। ইহা যেদিন একেবারে নিবিয়া যাইবে, সে দিনই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে। সে দিন যেন ব্রাহ্মসমাজকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখিতে না হয়, ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন!

ব্রাহ্ম সমাজের কাজে যে তেমন জমাট বাঁধিতেছে না তাহার দ্বিতীয় কারণ এই যে আমরা যে প্রণালীতে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি তাহা এদেশে কখনও ইতিপূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এ দেশের লোকে চিরদিন নেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া, গুরু বা রাজার পদতলে আপনাদিগের শরীর মন সমুদায় অর্পন করিয়া, তাঁহারই আদেশ ও ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়া কাজ করিয়া আসিয়াছে। দশজনে মিলিয়া, পরস্পরের সমকক্ষ হইয়া,আপন আপন স্বাধীন চিন্তা ও ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোনও উদ্দেশ্য সাধনে সমবেত চেষ্টা কি করিয়া করিতে হয়, তাহা এ দেশের লোকে এখনও শিক্ষা করেন নাই। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই সর্ব্ব প্রথমে এই দেশে সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইরূপ প্রণালীতে কার্য্য করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে যে সকল উপকরণের প্রয়োজন আমাদিগের তাহা এখনও সংগৃহীত হয় নাই। আপনার স্বাধীনতার সঙ্গে অপরের অধিকারের সামঞ্জস্য কি করিয়া করিতে হয়; আপনার মত বজায় রাখিয়া অপরের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন কি করিয়া করিতে হয়; সে শিক্ষা আমাদিগের এখনও লাভ হয় নাই। সে শিক্ষা লাভ করা বহু সময় সাপেক্ষ। সুতরাং এই শিক্ষার অভাবে আমাদের কার্য্য সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছে না। আমরা স্বাধীনতারই মূল্য বুঝিয়াছি, কিন্তু দশের মুখ চাহিয়া দশজনের কাজ করিবার সময়, আপনাদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করাই যে সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য, ও তাহা দ্বারা স্বাধীনতার তেজ ও মহিমা হ্রাস না হইয়া যে বিশেষ বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে, সে জ্ঞান আমাদিগের এখনও জন্মে নাই। দশজনে মিলিত হইয়া কোনও কাজ করিতে যাওয়ার অর্থই যে দশজনের স্বাধীনতার খাতিরে নিজের স্বাধীনতা কিয়ৎ পরিমাণে সঙ্কুচিত করিতে প্রতিশ্রুত হওয়া, এ সত্য আমরা আজি পর্য্যন্ত সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাহাতেই দেখিতে পাই যে আজ এক বন্ধুর মতের সঙ্গে কোনও বিষয়ে অপর দশজন বন্ধুর মতভেদ উপস্থিত হইল, অমনি তিনি সমাজের সঙ্গে সর্ব্ব প্রকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়া বসিলেন। প্রচারকের সঙ্গে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মতভেদ উপস্থিত হইল, প্রচারক মহাশয় অমনি কমিটীর সঙ্গে সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি একথা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না যে, কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে যে দিন তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন সে দিনই কিয়ৎ পরিমাণে এই সভার অনুরোধে আপনার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রুচি ও প্রবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া চলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। দশজনের সঙ্গে মিলিত হইয়া কাজ করিবার অর্থই এই যে আমি একাকী যে কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারি না, বা পারিব না বলিয়া বোধ হয়, তাহা আমি অপর দশজনের সাহায্যে সাধন করিতে চাই। যে সাহায্য টুকু না পাইলে আমার শত চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়া যায়, —সেই সাহায্য টুকুর বিনিময়ে কি আমার কিছু দেওয়া কর্ত্তব্য নহে? আমি কি ইহার মূল্য দিতে বাধ্য নই? এবং সে মূল্য কি? না আমার এক কণা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। আমার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার এক রতি দিয়া তোমার সাহায্য ক্রয় করিতেছি, এবং সে সাহায্যলাভে বলীয়ান হইয়া আমার কার্য্যসিদ্ধি করিতেছি। এই মূল সত্যটী আমরা এখনও শিক্ষা করি নাই। আমাদের কাজে যে তেমন জমাট বাঁধিতেছে না ইহাও তাহার একটা প্রধান কারণ। এই কারণ দূর হইতেও অনেক সময় লাগিবে। সুতরাং তার জন্যও তত নিরাশ হওয়া উচিত নহে।

ইহার তৃতীয় কারণ কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা ও দায়িত্বের অভাব। এদেশের লোকে নেতার অধীনতা স্বীকার করিয়া, এক জন বা দুই জনের ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, ব্যক্তি বিশেষের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা স্থাপন করিয়া জলন্ত উৎসাহ সহকারে অনেক কার্য্য করিয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজেও যত কাল ব্যক্তি বিশেষের একাধিপত্য ছিল, ততকাল আমাদিগের কাজের জমাট ছিল। সে আধিপত্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া, এবং আমরা অপর দিকে সাধারণ তন্ত্র প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইলে যে সকল গুণ ও শিক্ষার প্রয়োজন তাহা লাভ করি নাই বলিয়া সকল বিষয়েই আমাদের কার্য্য বিচ্ছিন্ন ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে।

আমাদের কাজে তেমন জমাট বাঁধিতেছে না কেন, ইহার চতুর্থ কারণ, বাহিক অত্যাচার ও নির্য্যাতনের অভাব।

আমরা অনেক সময় জগতের প্রাচীন ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমূহের শৈশব অবস্থার ইতিহাস পাঠ করিয়া, তাহাদের বাল্য জীবনের তেজ ও বলের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের তেজ ও বলের তুলনা করিয়া নিরাশ হইয়া থাকি। কিন্তু যে সকল অবস্থাধীনে ঐ সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বল বৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহা যে এখন, এ যুগে কোনও ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর কার্য্য করিতে পারে না, ইহা ভুলিয়া যাওয়াতেই এইরূপ আক্ষেপ ও নিরাশা প্রকাশ পায়। রোমীয় সম্রাটদিগের ভীষণ অত্যাচারে ও নির্য্যাতনে আদিম খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর শক্তি বিকাশের কত না সহায়তা করিয়াছিল। আরব অত্যাচারে নিপীড়িত না হইলে মুসলমানগণের শৈশবের সে তেজ প্রকাশিত হইতে পারিত না। পাঠান ও মোগল অত্যাচারই আমাদিগের দেশে শিখ ধর্ম্মের আশ্চর্য্য বল বৃদ্ধির প্রধান কারণ। বাহিরের অত্যাচারের পীড়নে এই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের জীবনের শৈশব কালে তাহাদের মধ্যে ঘন-নিবিষ্টতা ও দৃঢ়তা উৎপাদন করিয়াছিল। ব্রাহ্ম সমাজেও এক সময় যে একটু জমাট বাঁধিতেছিল, তাহা বহুল পরিমাণে সেই সময়ের হিন্দু সমাজের অত্যাচার ও নির্য্যাতন নিবন্ধন। কেহ কেহ মনে করেন আজি কালি ব্রাহ্মদিগের উপর পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী অত্যাচার হইতেছে। ব্রাহ্মদিগের কুৎসা রটনা লোকে এখন যত করে, আগে এত করিত না। সভা সমিতিতে, রঙ্গালয়ে, সংবাদ পত্রে, ব্রাহ্মদিগের উপর যেরূপ আক্রমণ করা হয়, পূর্ব্বে সেরূপ হইত না। কিন্তু এই সকলের দ্বারা ব্রাহ্মগণ কি তেমন ভাবে পীড়িত হইতেছেন? মুখের কথা আকাশে মিশাইয়া যায়, কাগজের লেখা কাগজেই পড়িয়া থাকে, গায়ে তাহাতে তেমন আঁচড় লাগে না। যাঁহারা ব্রাহ্মগণের এত নিন্দা কুৎসা করেন তাঁহারাও গোপনে ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে মিলিত হইতে আর তেমন আপত্তি করেন না। বাহিরে গালাগালি দেন, অথচ ভিতরে ভিতরে ব্রাহ্ম আত্মীয় স্বজনদিগের সঙ্গে আহারাদি করিতে কুণ্ঠিত হন না। এই কারণে ব্রাহ্মেরাও আগেকার মত হিন্দু সমাজের অত্যাচার ও নির্য্যাতন এখন তেমন তীব্র ভাবে অনুভব করেন না। এই অত্যাচারের শিথিলতাও আমাদের সামাজিক শিথিলতার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

পঞ্চম কারণ,—ব্রাহ্মসমাজ-প্রচলিত তত্ত্ববিদ্যার উদারতা। খৃষ্টধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম যেমন অনুদার ব্রাহ্মধর্ম্ম তেমন অনুদার নহে। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজ প্রচারিত সত্য গ্রহণ করেন না বা করিতে পারেন না, তাঁহারা অনন্ত জীবন নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবেন, এ বিশ্বাস আমাদিগের নাই। ইহাও আমাদের শিথিলতার একটী কারণ বলিয়া বোধ হয়।

উপরে যে কয়টী কারণ নির্দ্দেশ করা গেল তাহা দ্বারা আমাদের প্রচার প্রভৃতি বাহিরের কার্য্যের তেমন জমাট বাঁধিতেছে না। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরকার কার্য্যে যে জমাট বাঁধিতেছে না, তাহার এতদ্ব্যতীত আরো দুই একটী অতি গুরুতর কারণ আছে, এবং সে কারণ গুলি একেবারে অনিবার্য্য নহে। আমাদের মধ্যে তেমন সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে না। সমাজ গঠন কার্য্যে আমরা বিশেষ অগ্রসর ও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না, ব্রাহ্মসমাজের আভ্যন্তরীণ মঙ্গল চেষ্টায় তন্নিবন্ধন আমাদিগের তেমন উৎসাহ নাই। ইহার প্রধান কারণ আমাদিগের মধ্যে প্রেমের অভাব ও সমাজ বন্ধনের শোচনীয় শিথিলতা। এইটী অতি গুরুতর কারণ, বারান্তরে ইহার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

কাকিনীয়া ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার পঞ্চম সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে নির্ব্বাহিত হইয়াছে। ছাত্র সমাজের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবও ঐ সঙ্গে সম্পন্ন হইয়াছে।

১৭ই বৈশাখ, মঙ্গলবার—রজনী ৭ ঘটিকার সময় ছাত্র সমাজের চতুর্থ বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ব্রহ্মোৎসব যে কি ব্যাপার তাহা তিনি উপদেশে বুঝাইয়া দেন।

১৮ই বৈশাখ, বুধবার—রজনী ৭ ঘটিকার সময় ছাত্র সমাজে উপাসনা হয়। উপাসনায় পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—রজনী ৭ ঘটিকার সময় ব্রাহ্ম সমাজের পঞ্চম বার্ষিক উৎসবের উদ্বোধন। বাবু গৌরলাল রায় মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন।

২০শে বৈশাখ, শুক্রবার—প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়। রাজা মহিমারঞ্জন রায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। রজনী ৭॥ ঘটিকার সময় সমাজ মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। এদিন নগর সংকীর্ত্তন হইবার কথা ছিল, কিন্তু কোন গুরুতর প্রতিবন্ধকে তাহা হয় নাই।

২১শে বৈশাখ, শনিবার—প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় সমাজগৃহে উপাসনা হয়, পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। "সৃষ্টি মধ্যে ভগবানের জ্ঞান কৌশল" বিষয়ে রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

২২শে বৈশাখ, রবিবার—প্রাতে সমাজস্থ মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হয়। পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন।

২৩শে বৈশাখ, সোমবার প্রাতে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়। উপাসনার কার্য্য পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় করিয়াছিলেন।

২৪শে বৈশাখ, মঙ্গলবার—বৈকালে মনোরঞ্জন বাবু "ব্রাহ্ম সমাজের মূল কি" বিষয়ে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে অভ্রান্ত শাস্ত্র গুরুবাদ ইত্যাদি না থাকিলেও ইহার ভিতরে যাহা রহিয়াছে, তাহাতেই এ ধর্ম্ম সনাতন ধর্ম্ম। ইহার বিনাশ নাই। যতই ঘাত প্রতিঘাত হউক না কেন দিন দিন ভগবানের কৃপায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি হইবে। ঘাত প্রতিঘাতে এ ধর্ম্মের অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, ইহার ঔজ্জ্বল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত

হইবে। জগতের নরনারী ইহার পবিত্র সুশীতল ছায়ায় আত্মার ক্লান্তি বিদূরিত করিবে।

২৫শে বৈশাখ, বুধবার—বৈকালে কাঙ্গালিদিগকে চাউল পয়সা বিতরণ করা হয়।

২৬শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার—বৈকালে মনোরঞ্জন বাবু "ধর্ম্মসাধন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতাটী সর্ব্বজন প্রিয় হইয়াছিল। ধর্ম্ম কেমন করিয়া সাধন করিতে হয়, তাহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রীযুক্ত তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

মান্যবরেষু—

মহাশয়,

বাঙ্গালীর বিশেষতঃ ব্রাহ্মদিগের আর্থিক অবস্থা নিতান্ত অসচ্ছল তাহা আপনাদের অবিদিত নাই। আপনারা সময় সময় এই বিষয়ের চিন্তা করিয়া থাকেন দেখিতে পাই। আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের সুবিধার জন্য একটী উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি। আমাদের উদ্ভাবিত উপায়টী আপনাদের বিচারার্থ প্রেরণ করিতেছি।

এই ফণ্ডের নাম ফেমিলী ডোনেসন্ ফণ্ড লিমিটেড্।

ফণ্ডের উদ্দেশ্য।

১। যে যে মেম্বর এই ফণ্ডে চাঁদা দান করিবেন, তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীগণের উপকারার্থে এই ফণ্ডের সৃষ্টি হইল।

২। চাঁদাদাতা মেম্বরের মৃত্যুকালীন যত মেম্বর বর্ত্তমান থাকিবেন তত টাকা তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হইবেন।

মেম্বরের উপযুক্ততা।

৩। নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে ভারতবাসী মাত্রেই এই ফণ্ডের মেম্বর হইতে পারিবেন।

(ক) এই কোম্পানীতে প্রবেশ কালীন প্রত্যেক মেম্বরকে য়্যাড্মিসন ফি এক টাকা দিতে হইবে।

(খ) নিম্নলিখিত বয়সানুসারে প্রত্যেক মেম্বরকে মাসিক চাঁদা দিতে হইবে।

২০	বৎসর	হইতে	২৫	বৎসর	পর্য্যন্ত	।০
২৬	"	"	৩০	"	"	।৵০
৩১	"	"	৩৫	"	"	॥০
৩৬	"	"	৪০	"	"	॥৵০
৪১	"	"	৪৫	"	"	৸০
৪৬	"	"	৫০	"	"	৸৵০

এই চাঁদা মেম্বরগণের সুবিধানুসারে প্রতিমাসে কিম্বা প্রতি তিন মাসে দিতে পারিবেন। প্রতিমেম্বরের মৃত্যুর পর ডাইরেক্টর-গণের আদেশ সূত্রে একমাস মধ্যে প্রতি চাঁদাদাতা মেম্বর-গণকে ১৲ এক টাকা দান করিতে হইবে।

কি কি উপায় শ্রেণীভুক্ত হওয়া যাইতে পারিবে।

২০ বৎসর হইতে ৫০ বৎসর বয়সের ব্যক্তিগণ মাত্রই মেম্বর হইতে পারিবেন।

যে যে ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য ও চরিত্র ভাল, তাহাদিগকে মেম্বর শ্রেণীভুক্ত করা যাইবে।

বয়স চরিত্র ও স্বাস্থ্যের প্রমাণ স্বরূপ নিজ নিজ প্রতিজ্ঞা পত্র ও বর্ত্তমান অন্তত দুইজন মেম্বরের সার্টিফিকেট দিতে হইবে।

ডিরেক্টরগণ এই সার্টিফিকেট এবং প্রতিজ্ঞাপত্র মঞ্জুর করিলেই তাহারা মেম্বর শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

সাধারণ নিয়ম।

মাসিক চাঁদা ও ডোনেসন যে যে তারিখে দিতে নির্দ্দেশ করা হইবে, ঐ তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে আদায় না করিলে, মেম্বর শ্রেণী হইতে তাহার নাম খারিজ করা যাইবে।

কোন ব্যক্তি পীড়া নিবন্ধন কি অন্য কোন গুরুতর কারণ বশতঃ চাঁদা কি ডোনেসন দিতে অপারগ হওয়ার দরুন মেম্বর শ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেও ডিরেক্টরগণ ইচ্ছা করিলে ও উপযুক্ত কারণ বোধ করিলে উপযুক্ত কারণ গ্রহণে অনাদায় সমস্ত টাকার মাসিক শতকরা ১৲ এক টাকা সুদ সহ সমস্ত টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাকে পুনরায় মেম্বর শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিবেন।

ডোনেসনের টাকা মৃত্যুর প্রমাণের তিন মাস মধ্যে মেম্বরের উত্তরাধিকারিকে দিতে হইবে।

চিকিৎসক কি কোন একজন মেম্বর সার্টিফিকেট অথবা গ্রামস্থ দুইজন ভদ্রবংশীয় প্রতিবাসির প্রতিজ্ঞাপত্র মৃত্যুর প্রমাণ স্বরূপ এক মাস মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

প্রতি মেম্বর সম্পাদক ও দুইজন ডিরেক্টরের সার্টিফিকেট প্রথম প্রবেশের সময় প্রাপ্ত হইবেন।

মাসিক চাঁদা ও ডোনেসন দানের রসিদে সম্পাদক ও কোন একজন ডিরেক্টর মেম্বরের দস্তখত থাকিবে।

আদায়ী টাকা খরচ বাদে ম্যানেজিং কমিটীর যোগে কোন ব্যাঙ্কে স্থিত রাখা হইবে।

এই আমানতী টাকা কোম্পানীর "রিজর্ভ ফণ্ড" নামে অভিহিত হইবে।

কোন মেম্বর ডোনেসন্ দিতে অপারগ হইলে তাহার টাকা পূরণ করিবার জন্য কেবল মাত্র এই ফণ্ড হইতে ম্যানিজিং কমিটী সেই পরিমাণ টাকা উঠাইতে পারিবেন।

সভা।

এই কোম্পানীর কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য মাসিক একবার সভার অধিবেশন হইবে।

দশজন মেম্বরের কম সভার কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারিবে না।

এই ফণ্ডের যাবতীয় কার্য্য এই সভার দ্বারা সম্পন্ন হইবে।

কার্য্যকারক।

সভার কার্য্যনির্ব্বাহ জন্য আটজন ডাইরেক্টর, একজন সেক্রেটারী ও একজন এসিষ্টেণ্ট সেক্রেটারী থাকিবেন।

কোন একজন ডাইরেক্টর এই কমিটীর প্রেসিডেণ্ট হইবেন। কোন টাকাই এই সভার বিনা অনুমতিতে খরচ হইতে পারিবে না।

বশম্বদ
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন,
সম্পাদক, নেলফামারি ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মসমাজ।

নামকরণ—বিগত ১৫ই চৈত্র বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পরে দিনাজপুর নগরে শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন দের প্রথম পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ব্রাহ্মমন্দিরে উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে শিশুর মাতা শ্রীমতী সুনীতিবালা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শিশুটীর নাম শ্রীমান্ জিতেন্দ্রমোহন রাখা হইয়াছে।

২। বিগত ১৮ই চৈত্র রবিবার মধ্যাহ্নে দিনাজপুরে শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র কর মহাশয়ের ৬ষ্ঠ সন্তানের (৪র্থ পুত্র) শুভ নামকরণ উপলক্ষে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভুবনমোহন কর মহাশয়ের গৃহে উপাসনা, সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সন্তানটীর নাম শ্রীমান্ নরেশচন্দ্র কর রাখা হইয়াছে।

কাঁথি হইতে বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন,—"বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ—বৃহস্পতিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষভাবে আমাদের গৃহে উপাসনাদি হইয়াছিল এবং উহার উদ্দেশ্য বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছিল। নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে কার্য্য নির্ব্বাহার্থে কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের সহযোগীরূপে একটী প্রার্থনাসমাজের সূত্রপাত হইয়াছে। কাঁথি হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী চণ্ডীভেটী গ্রামে ইতিপূর্ব্বে একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু কিছু পূর্ব্ব হইতে তাহা উঠিয়া যায়। বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার "চণ্ডীভেটী প্রার্থনা সমাজ" পুনঃ সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে তথায় উক্ত দিবস ও তৎপরদিন উপাসনা আলোচনা ও সংকীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। স্থানীয় বন্ধুগণের মনে পুনরায় ধর্ম্মতৃষ্ণা দেখা দিয়াছে। তাঁহারা নিয়মিতরূপে কার্য্য চালাইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। মঙ্গলময় তাঁহাদের সহায় হউন। এখানে বিগত ২২ শে জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন জানার গৃহে নিয়মিত পারিবারিক উপাসনার সাম্বৎসরিক উৎসব স্বরূপে বিশেষভাবে উপাসনাদি হইয়াছিল। কয়েক স্থলেই আমাকে উপাসনাদির কার্য্য করিতে হইয়াছিল। কাঁথি হইতে আরও কয়েকটী বন্ধু চণ্ডীভেটী গিয়াছিলেন।"

আমাদের বন্ধু লক্ষ্মণ প্রসাদ লাহোর হইতে তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র তুলিয়া লইয়া এলাহাবাদে আসিয়াছেন। যে মুদ্রাযন্ত্র তিনি লাহোর ব্রাহ্মসমাজের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা প্রত্যর্পণ করাতে তিনি উক্ত মুদ্রাযন্ত্র এলাহাবাদে আনিয়াছেন। সুখ সংবাদ পত্র এক্ষণে এলাহাবাদ হইতে প্রচারিত হইতেছে। এতদ্ভিন্ন উক্ত সহরের দুইটী সমাজে নিয়মিত উপাসনা এবং তত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়ে প্রতি সপ্তাহে বক্তৃতাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি একাকী, সাহায্য করিবার লোকের অভাবে তিনি বাহিরে প্রচারাদি করিতে যাইতে পারিতেছেন না। যদি এরূপ একজন লোক পান যিনি গিয়া অন্ততঃ তাঁহার ছাপাখানা ও কাগজ প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করেন, তাহা হইলে তিনি বাহিরে গিয়া অর্থ সংগ্রহ এবং প্রচার করিতে পারেন।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—আমরা ইতিপূর্ব্বেই সংবাদ দিয়াছি যে ব্রাহ্ম বালিকাদিগের ধর্ম্মশিক্ষা ও জ্ঞানোন্নতি সাধনের জন্য১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। এক্ষণে বিদ্যালয় সমূহে বালক বালিকাগণ যে শিক্ষা লাভ করিতেছে তাহাতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার কোন উপায় নাই। বিশেষতঃ সে শিক্ষার দ্বারা আশানুরূপ জ্ঞানোন্নতিরও সাহায্য হইতেছে না। ঐ প্রণালী ব্রাহ্ম বালিকাগণের সম্পূর্ণরূপে উপযোগী নহে। প্রবেশিকা পরীক্ষা বলিলে এই বুঝায় যে তাহা উচ্চতর শিক্ষাতে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ। কিন্তু ব্রাহ্ম বালিকাদিগের অনেকের পক্ষে ঐ খানেই শেষ। তৎপরেই তাহাদিগকে গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিতে হইবে। যদি অল্প সংখ্যক বালিকাকে উদরান্নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মুখাপেক্ষা করিতে হয়—তাঁহাদের সংখ্যাই বা কত। আর উপাধি লইয়াই বা কি হইবে, তাঁহারা যে শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইয়া অর্থোপার্জ্জন করিবেন তাহার স্থলই বা কোথায়? সে বিদ্যালয়ই বা দেশে কত যেখানে রমণী বি এ বা এম এ গণ, শিক্ষয়িত্রী হইবেন। তবে হয়ত অনেকে মেডিকেল কলেজে যাইতে পারেন। এরূপেই বা কত বালিকার অর্থোপার্জ্জনের উপায় হওয়া সম্ভব? অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীর মুখাপেক্ষা করাতে এই ফল হইতেছে, যে বহু সংখ্যক বালিকাকে বাধ্য হইয়া তদনুরূপ শিক্ষা দিতে হইতেছে। বালিকাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় শিখান যাইতে পারিতেছে না; ধর্ম্ম শিক্ষা ও নীতি শিক্ষার বিশেষ উপায় বিধান করা যাইতে পারিতেছে না; প্রকৃত জ্ঞানোন্নতির উপায় হইতেছে না। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত শিক্ষালয়টী স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার উপায় বিধান করা হইবে, তদ্ভিন্ন বিদ্যা শিক্ষারও এরূপ বন্দোবস্ত করা হইবে, যাহাতে এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ শ্রেণীতে উঠিয়া বালিকাদের এত জ্ঞানোন্নতি হইবে, এত বিষয় এত অল্প সময়ে শিখিবে যে এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে সচরাচর সেরূপ দেখা যায় না। তৎপরে কেহ যদি স্বীয় কন্যাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে প্রেরণ করিতে চাহেন, দুই বৎসরে উৎকৃষ্ট রূপে প্রস্তুত হইতে পারিবে। আর যাঁহারা সে পথে যাইবেন না, তাঁহাদের বালিকাগণ আর দুই বৎসরে আরও জ্ঞান লাভ করিয়া গৃহধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবার উপযুক্ত হইবে। এই শিক্ষালয়ে বাঙ্গালা অতি উত্তমরূপে শিখান হইবে, তদ্ভিন্ন ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, বিজ্ঞান, শিল্প, সংগীত

প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। ব্রাহ্ম-বন্ধুগণ সকলে সহায় হইলে এই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা কঠিন হইবে না। শিক্ষালয়টীর কার্য্য ১৬ মে হইতে চলিতেছে, এবং আপাততঃ ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলার বন্দোবস্ত হইয়াছে। স্কুলের কমিটি প্রথমে যে অনুষ্ঠানপত্র বাহির করিয়াছিলেন, তাহা স্থানান্তরে মুদ্রিত করা গেল। ত্বরায় স্কুলের সময় পরবর্ত্তন হইবার ও গাড়ি নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা। যথাসময়ে তাহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবে।

পূর্ব্বোক্ত শিক্ষালয় সম্বন্ধে আর একটী সংবাদ আছে। আমাদের কুষ্টীয়াস্থ শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত মহাশয় তাঁহার স্বর্গগতা জননীর সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উক্ত শিক্ষালয়ের সাহায্যার্থ এক কালীন ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। আশা করি অন্যান্য ব্রাহ্ম বন্ধুগণও এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন।

অনেক প্রকারে এই বিদ্যালয়কে সাহায্য করা যাইতে পারে। রমণীগণের পাঠ্য পুস্তক উপহার দিলে সাদরে গৃহীত হইবে। স্বদেশ ও বিদেশের সাধু সাধ্বীগণের ছবি দিলে ও স্কুল গৃহে ঝুলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বালক বালিকাগণ যদি সাধু মণ্ডলীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকে এবং তাঁহাদের চরিত্রের আদর্শের দিকে তাহাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করা যায় তদ্দ্বারা তাহাদের চিত্তে সাধুভক্তি উদ্দীপনের বিশেষ সাহায্য হইবে। রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম উপদেষ্টাগণের ছবি, কুমারী কার্পেণ্টার, কুমারী নাইটিঙ্গেল, প্রভৃতি যশস্বিনী ইংরাজ রমণীদিগের ছবি অতি সাদরে গৃহীত হইবে। ভাল ভাল ছবির পুস্তক ও গল্পের পুস্তক যিনি যাহা দিতে পারেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

মোকদ্দমা—আমরা কিছুদিন হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি যে,ব্রাহ্মসমাজের বিপক্ষগণ ভদ্র উপায়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপক্ষতা করিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া সময় সময় অতি অভদ্রভাবে বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে ব্রাহ্মদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা;গুপ্তভাবে ব্রাহ্মদিগের প্রতি ক্রোধোক্তি করা ও ব্রাহ্মসমাজের কুৎসা রটনা করা, এই সকল উপায় অবলম্বিত হইতেছে। আমরা এই সকল কাপুরুষের আচরণকে উপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু দেখা যাইতেছে ইহাদের সাহস ও ধৃষ্টতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। সম্প্রতি বরিশালে একটী ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ "সহযোগী" হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। "সহযোগী" ব্রাহ্মদিগের দ্বারা সম্পাদিত পত্রিকা। অভিযোগ কর্ত্তা রেবতীমোহন সেন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য।

"প্রায় মাসাবধি হইল গ্রেট্ বেঙ্গল সার্কাস নামে এখানে একটী সার্কাস কোম্পানী আসিয়াছে। তাহাদের সঙ্গে দুইটী যুবতী অভিনেত্রী আছে। সকলেই বোধ হয় জানেন এরূপ কার্য্যে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে কোন গৃহস্থের ঘরের মেয়ে পাওয়ার সম্ভাবনাই নাই। কলিকাতার ব্যবসাদারী থিয়াটরে যে শ্রেণীর যুবতীগণ অভিনয় করে ইহারাও অবশ্য সেই শ্রেণীর। "আমরা যে ভাবে বেশ্যামিশ্রিত থিয়াটারের প্রতিবাদ করি সেই ভাবে এই সার্কাসের বিরুদ্ধেও কিছু বলিয়াছিলাম। তাহাতে কোম্পানী আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কুৎসিতভাব ও অশ্লীল ভাষাপূর্ণ একখানা পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া সাধারণের মধ্যে বিতরণ করিয়াছে। সম্প্রদায় বিশেষের (ব্রাহ্মদিগের) মনোবেদনা দানের জন্য তাহাদের ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়া কোন অভিনয় করিবে ইহাও প্রকাশ করিয়াছে। ঐ পুস্তকের মধ্যে এমন সকল কুৎসিত শব্দ আছে যাহা ভদ্র লোকের মধ্যে উচ্চারণ করা যায় না। বিশেষতঃ ঈশ্বরের উপাসনাকে উপহাস করিয়া উহাতে সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এই কথা জানাইলে তিনি কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকট এই কথা বলিয়া পাঠান যে কোন ধর্ম্মকে পরিহাস করিয়া কিছু অভিনয় করিলে তোমরা কঠিনরূপে দণ্ডিত হইবে। ইহারা কিন্তু মাজিষ্ট্রেটের সে কথা বড় গ্রাহ্য করে নাই, এমন কি শত শত লোকের মধ্যে অভিনয় স্থলে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছে—'যে পাঁচ শত টাকা জরিমানা দিলেও আমাকে ইহা করিতে হইবে' খুব সৎ সাহস বটে! শুনিলাম যাহা সঙ্কল্প ছিল, ষোল আনারূপে তাহা নাকি করিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু যাহা করা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট।

"যাহা হউক ঈশ্বরের উপাসনাকে পরিহাস করিয়া যখন অভিনয় ও সঙ্গীত হইতেছিল তখন দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ উঠিয়া বলিলেন 'আপনারা এরূপ করায় আমাদের ধর্ম্মে (ব্রাহ্মধর্ম্মে) আঘাত লাগিতেছে এবং আমরা বড়ই কষ্ট পাইতেছি, আপনারা এরূপ কার্য্যে ক্ষান্ত হউন। এ বাধা না শুনিয়া তাহারা আরও অধিক উৎসাহে অভিনয় করিতে লাগিল এবং দর্শকমণ্ডলী বড়ই তৃপ্ত হইয়া ঘন ঘন করতালী দিতে লাগিলেন।

সুখের বিষয় এই যে ঐরূপ কুৎসিত বিজ্ঞাপন দেখিয়া জজকোর্টের প্রায় সমস্ত উকীলই ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে সেই রাত্রে ঐ বিজ্ঞাপন দেখিয়াই অনেকে সার্কাস দেখিতে যান নাই।

বাবু রেবতীমোহন সেন নামক একটী যুবক উক্ত সার্কাস কোম্পানির নামে দণ্ডবিধি আইনের ২৯২।২৯৪ ও ২৯৮ ধারা অনুসারে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। মাজিষ্ট্রট সাহেব সুযোগ্য ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের নিকট মোকদ্দমা বিচারার্থ অর্পণ করিয়াছেন। আসামীর নামে শমনের হুকুম হইয়াছে।"

* * * * *

পরে শুনা গেল যে প্রতিবাদীগণ প্রকাশ্য ভাবে বাদীর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করাতে তাঁহারা মোকদ্দমা তুলিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাহাদের অপরাধ দণ্ড বিধির ২৯২ ও ২৯৪ ধারা অনুসারে অমার্জ্জনীয় জ্ঞানে, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মহাশয় পুনরায় নাকি,মহারাণীর তরফ হইতে তাহাদিগকে ধৃত করিবার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিয়াছেন। দেখা যাউক মোকদ্দমাতে কি হয়।

সাহায্য প্রার্থনা।*

হে প্রিয় বিশ্বাসী ভ্রাতা সকল!

ভাই, তোমাদিগকে ধন্যবাদ! আমরা তোমাদের সম বিশ্বাসী খাসিয়া ভ্রাতা, আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর। আমরা দরিদ্র, আমরা তোমাদের সাহায্য ব্যতীত স্কুল (অর্থাৎ ভজনালয়) নির্ম্মাণ করিতে পারি না। কারণ খাসিয়া যে আমরা, আমাদের গৃহ ঈশ্বরের উপাসনার উপযুক্ত নয়। তাহা বড় কদর্য্য ও অন্ধকারময়। সেই জন্য যে আমরা তোমাদের সঙ্গে ভ্রাতা ও আত্মীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ,—সেই আমরা তোমাদিগের নিকট প্রার্থনা করি যে তোমরা অর্থ সাহায্য কর। যেন আমরা মৌসমাইএ ভজনালয় নির্ম্মাণ করিতে পারি। আমরা এক ঈশ্বর এবং এক ধর্ম্ম বিশ্বাসের মধ্যে, এজন্য আমরা বিশ্বাসে তোমাদের সহোদর ভ্রাতা ও নিকট কুটম্ব হই। আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি তোমাদের এবং আমাদের কার্য্যের প্রতি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা ক্রমশঃ ঈশ্বরের কার্য্যকে পর্ব্বতের দেশে এবং সমতল দেশে বিস্তৃত করিতে পারি। ঈশ্বর তোমাদিগকে এবং আমাদিগকে এখন এবং চিরজীবন আশীর্ব্বাদ করুন। আমরা তোমাদিগকে এমন ধন্যবাদ প্রদান করি, যাহা আর বলা যায় না।

নিবেদক

মৌসমাই ব্রাহ্মসমাজ

১ সিমিয়ন (U Simion)
২ লুপ সিং (U Lup Sing)
৩ বুলো রায় (U Bulo Rai)
৪ মহা সিং (U Maha Sing)
৫ রাইমণি (U Raimoni)
৬ রুমমুম্ (U Rummum)

* খাসিয়া পাহাড়ের কতিপয় ব্রাহ্ম খাসিয়া ভাষায় একখানি পত্র লিখিয়া ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট অর্থ সাহায্য চাহিতেছেন। এই প্রার্থনা পত্রখানি তাহারই অনুবাদ।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়।

(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত)

১৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উদ্দেশ্য—যে শিক্ষা ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যাহাতে মানসিক ও শারীরিক শক্তিকে ভারাক্রান্ত না করিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানোন্নতি সাধনের সহায়তা করে, ব্রাহ্ম-বালিকাদিগকে সেরূপ শিক্ষা দেওয়া এই শিক্ষালয়ের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া এই শিক্ষালয়ে বালিকাদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পদার্থতত্ত্ব, গণিত, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি বালিকাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সকল শিক্ষা দেওয়া হইবে।

তত্ত্বাবধায়ক সভা—নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ তত্ত্বাবধায়ক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মধুসূদন সেন।
,, ডাক্তার মোহিনী মোহন বসু।
,, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।
,, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত বাবু উমাপদ রায়।
,, ,, উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী বি এ।
,, ,, উমেশচন্দ্র দত্ত বি এ—সম্পাদক।
কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু—সহঃ সম্পাদক।

শিক্ষকগণ—শিক্ষা কার্য্যের ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রয়োজন মত আরও শিক্ষক নিযুক্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বি, এ।
,, ,, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়।
কুমারী লাবণ্য প্রভা বসু।
,, সরোজিনী ঘোষ।

দ্বিতীয় বিজ্ঞাপন বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত স্কুলের কার্য্য প্রাতে ৬॥ টা হইতে ৯॥ টা পর্য্যন্ত চলিবে।

আপাততঃ এই শিক্ষালয়ে এণ্ট্রান্স স্কুলের ৪র্থ শ্রেণীর অনুরূপ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলার বন্দোবস্ত হইয়াছে। ক্রমে অপরাপর শ্রেণী খুলিবারও ইচ্ছা আছে। দূরস্থ বালিকাদিগকে গাড়ী করিয়া বিদ্যালয়ে আনিবার আয়োজন হয় নাই। শিক্ষালয়ের ভৃত্য শিশুদিগকে আনিতে পারে; যাঁহারা অন্য কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিতে ইচ্ছা করেন নিজে করিবেন। ত্বরায় গাড়ীর বন্দোবস্ত করিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা আছে; এবং এই শিক্ষালয়ের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত সংখ্যক বালিকা জুটিলে, একটী ছাত্রী-নিবাস বা বোর্ডিং স্থাপনেরও বাসনা আছে।

বেতন—প্রথম বার্ষিক শ্রেণী মাসিক ১৲ এক টাকা, অপরাপর শ্রেণী ২৲ দুই টাকা, ভর্ত্তির ফী ১৲ এক টাকা। ভর্ত্তির ফী ও মাসিক বেতন অগ্রিম দেয়। ৭ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের বালকগণও এই শিক্ষালয়ে পড়িতে পারিবে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত বি, এ,—সম্পাদক।
লাবণ্যপ্রভা বসু—সহকারী সম্পাদক।

আগামী জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংস্রবে ব্রহ্মবিদ্যা বিষয়ক বার্ষিক পরীক্ষা হইবে। উক্ত বিদ্যালয়ের সহিত অসংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীগণ আগামী ২২এ জুনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করিলে এখানে বা মফস্বলের যে কোন স্থানে পরীক্ষা প্রদান করিতে পারিবেন। পরীক্ষার্থীকে কোন সুপরিচিত ব্রাহ্মের স্বাক্ষরিত সচ্চরিত্রের প্রশংসাপত্র পাঠাইতে হইবে, এবং মফস্বলবাসী পরীক্ষার্থীকে প্রশংসাপত্র-দাতার তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

পরীক্ষার বিষয়।

SENIOR COURSE.—Newman's *Hebrew Theism*: The following five essays:—(1) Animal Instinct, (2) God in Conscience, (3) Immortality of God's Beloved, (4) Worth of the Soul, and (5) Future of the Righteous. Slater's *Law of Duty*: pp. 94—116. *Brahmajijnasa* by Sitanath Datta, Chapter I. pp. 1—53 and Chapter IV (whole.)

JUNIOR COURSE.—বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" প্রথম ভাগ (সমগ্র), আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস" (সমগ্র) ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "জাতিভেদ" বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ (সমগ্র)।

PRIMARY COURSE.—আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "ধর্ম্মশিক্ষা" (সমগ্র), ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার ও "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" (সমগ্র)।

১৩, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ২৮এ এপ্রিল, ১৮৯০। } শ্রীসীতানাথ দত্ত, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেস শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা আষাঢ় প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজ'তত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

১৬ই আষাঢ় রবিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥০
মফস্বলে	৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৵০

ধর্ম্ম-জ্ঞান।

এ কি জ্যোতি নরশিরে রহেছে ঘেরিয়া
ছুটে প্রভা অদৃশ্য গগনে;
অপার্থিব দীপ্তি তাহা, স্বরগে পশিয়া
মিশিয়াছে দেব-দীপ্তি সনে।

সংসার-কুয়াসা জালে ঘিরেছে মানবে,
পদদ্বয় প্রোথিত-কর্দ্দমে;
বহিছে স্বার্থের ঝড়, বধিবু সে রবে,
পথ-ভ্রান্ত সদা দিক্-ভ্রমে!

এর মাঝে এ কি জ্যোতি মস্তক উপরে!
সেই নরে দেবত্ব দিতেছে!
কুয়াসা, কর্দ্দম, ঝড়ে জাগিয়া অন্তরে
সেই নরে স্বরগে নিতেছে?

অরূপ রূপের আভা, নাম—"ধর্ম্ম-জ্ঞান,"
বিধাতার মুখ-দীপ্তি তাহা;
যার গুণে এই নর ঈশ্বর-সন্তান,
পুত্র মুখে পিতৃ-চিহ্ন যাহা।

ইহা চক্ষু—ধর্ম্ম-রাজ্য-সৌন্দর্য্য দেখিতে,
সে শাসন ইহাতে প্রকাশে;
ইহা শক্তি—পারে লক্ষ নরেশে শাসিতে,
কাঁপে ধরা ইহার সন্ত্রাসে।

ইহা বাণী—শুনি যাঁর গভীর আহ্বানে,
স্বার্থ জাল ছিঁড়িয়া হুঙ্কারে,
স্তুতি নিন্দা পায়ে ঠেলে, আত্ম-বলিদানে,
ধায় নর নিয়ত সংসারে!

কে গো অপার্থিব শক্তি?—জাগ গো হৃদয়ে,
ধরে তোলো প্রবৃত্তি-কর্দ্দমে;
কে গো বাণি!—এই প্রাণে জাগো স্পষ্ট হয়ে,
পাই পথ ঘোর পথ-ভ্রমে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ঈশ্বর শুভ সংকল্পের সহায়—প্রাচীন য়িহুদী নৃপতি দায়ূদের প্রার্থনামালা বলিয়া বাইবেল গ্রন্থে যে সকল প্রার্থনা দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে এক স্থলে আছে—"হে পরমেশ্বর আমি যখন তোমার পথে চলিবার চেষ্টা করি তখন আমার সহায় হও।" এই প্রার্থনাটী অতি সুন্দর! মানব যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত হইবার জন্য প্রয়াসী হয়, তখন কি ঈশ্বর তাহার সহায় হইবেন না? ইহার অপেক্ষা উচ্চ প্রার্থনা আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর মানবের শুভ সংকল্পের চিরসহায়; প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমিক যাঁহারা, তাঁহারাও অপরের শুভ সংকল্পের চির-সহায়! ধার্ম্মিক লোক যদি দেখিতে পান যে অপর এক ব্যক্তি ঈশ্বরের পথে চলিবার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিতেছে, তখন তিনি সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত হন। অর্থ বা সামর্থ্য যেরূপ উপায়ে সহায়তা হইতে পারে, তাহা বিধান করেন; এবং সাহায্য করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ বলিয়া জ্ঞান করেন। জগতের সাধুদের এই এক আশ্চর্য্য উদারতা দেখা গিয়াছে যে তাঁহারা এই আকাঙ্ক্ষাটুকুর মূল্য অনেক দিয়াছেন। যে ব্যক্তিতে এই আকাঙ্ক্ষা দেখিয়াছেন তাহাকেই হস্ত প্রসারণ করিয়া ধরিয়াছেন, এবং অগ্রসর করিয়া দিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। তাঁহাদের সংস্রবে আসিয়া মানুষ দেখিয়াছে যে, তাহাদের এক রতি সাধুতার কত সমাদর; দেখিয়া লজ্জিত হইয়াছে ও সেই সাধুতাকে আদর করিতে শিখিয়াছে। যে ভাল হইবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহার ভাল হওয়াটা সহজ করিয়া দেও, তাহার যদি কোন দুর্ব্বলতা থাকে, তাহা ধরিয়া টানাটানি করিয়া তাহাকে নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম না করিয়া তাহাকে শক্তি ও সাহস দেও, যাহাতে সে ত্বরায় তদুপরে উঠিতে পারে।—ধর্ম্ম-সমাজ যখন এই ভাবে চলে তখন তাহা মানবের আধ্যাত্মিক জীবনের পোষক হয়।

ঘনীভূত কর্ম্ম—একজন ধনী কোন শুভকর্ম্ম উপলক্ষে দান করিতে ইচ্ছুক, তিনি এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে,

কোন এক বিশেষ দিনে তিনি সহরের দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগকে দান করিবেন। নির্দ্দিষ্ট দিবসের রজনী প্রভাত হইতে না হইতে, পিপীলিকা শ্রেণীর ন্যায় ভিক্ষুকদল আসিয়া সেই দ্বারে যুটিতে লাগিল। যতই বেলা বাড়িতে লাগিল, ভিক্ষুক বৃন্দে বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। দানের শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্ত করিতে দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়া গেল। অবশেষে ধনী মহাশয়ের পরিচারকগণ বদ্ধ-পরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। তখন সেই বিপুল জনতার ব্যস্ততাতে কত লোকের হস্ত পদের দারুণ যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে লাগিল, দুর্ব্বলেরা বলবানদিগের দ্বারা নিপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; শিশুগণ জননীর ক্রোড়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিল; মাতাগণ আঘাত-প্রাপ্ত শিশুর পক্ষ হইয়া বিবাদ করিতে লাগিল। ফল দাঁড়াইল কি? বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ এক আনা করিয়া এবং শিশুগণ অর্দ্ধ আনা করিয়া দান প্রাপ্ত হইল। সেই এক আনা পথে যাইতে যাইতেই ব্যয় হইয়া গেল। এক ব্যক্তি ত এইরূপ করিলেন। আর একজন ধনী সেই পরিমাণ ধন দান করিবেন, সংকল্প করিয়া কতকগুলি অনাথা স্ত্রীলোক যাহাদের আর অন্য গতি নাই, এবং কতকগুলি পিতৃ মাতৃ হীন বালক, যাহাদের দেখিবার কেহ নাই, বাছিয়া বাহির করিলেন এবং সেই বিধবাদিগের প্রতিপালনের ও সেই শিশুগুলির শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বালকগুলি সেই অর্থে পাঁচ সাত দশ বৎসর প্রতিপালিত, শিক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইয়া যখন সংসারে প্রবিষ্ট হইল, তখন তাহাদের অনেকে আবার দশজন দরিদ্রকে প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইল। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার দানের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ ও যুক্তি-সঙ্গত? সকলেই বলিবেন দ্বিতীয়টী। ধর্ম্মপ্রচার সম্বন্ধেও দুইটী প্রণালী আছে। এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের উপরে ধর্ম্মের বীজ বপন করা,—বহু সংখ্যক লোককে দুই একটী ভাল কথা শ্রবণ করান; দ্বিতীয় স্বল্প পরিমিত ক্ষেত্রে সেই শক্তিকে ঘনীভূত করা। দশটী হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ভাল করিয়া বদ্ধমূল হইলে, তাহা হইতে নব শক্তি উৎপন্ন হইয়া ভবিষ্যতে কার্য্য করিতে পারে। আমরা ধর্ম্মভাবকে স্থায়ী করিবার জন্য এখনও বিশেষ চেষ্টা করিতেছি না। আমাদের কার্য্যের প্রসার যত হইতেছে, গভীরতা তত হইতেছে না।

পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে এ পুস্তক কেন?—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা "ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়" নামে যে বিদ্যালয়টী স্থাপন করিয়াছেন, সেখানে অপরাপর পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে "ধর্ম্ম-শিক্ষা," "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান" প্রভৃতি গ্রন্থও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা দেখিয়া একটী বুর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীতে শিক্ষিত ব্রাহ্ম বালিকা বলিয়া উঠিল,—"পড়ার বইএর ভিতরে এসকল বই কেন?" উত্তর করা গেল,—"এগুলি কি অপাঠ্য? আর একটী বালিকা বলিল,—"হাঁ হাঁ এজন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয় থাকা ভাল।" প্রশ্ন এই—প্রথমোক্ত বালিকাটীর মনে ওরূপ প্রশ্নের উদয় হইল কেন? তাহার অপরাধ কি? সে বাল্যকাল হইতে যে প্রণালীর মধ্যে বাস করিতেছে ও যাহাতে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাতে এই শিক্ষা দিতেছে যে ধর্ম্মশিক্ষা শিক্ষার অন্তর্গত নহে; ধর্ম্মটা মানব জীবনের একটা উপরি কাজ। এরূপ শিক্ষা হাড়ে হাড়ে বসিয়া গেলে আর কি ব্রাহ্মসমাজ ইহার বিপরীত শিক্ষা জমাইতে পারিবেন? আমরা অনেকবার এই চিন্তায় নিযুক্ত হইয়াছি, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের গতি এত মন্দ হইতেছে কেন? জগতের অপরাপর ধর্ম্মের ইতিবৃত্তের সহিত তুলনা করিলে, দেখা যায় যে, আমরা বিগত ষষ্টি বৎসরে যে উন্নতি লাভ করিয়াছি, তাহা গণনীয় নয়। ইহায় কারণ কি? ইহার নানা প্রকার কারণ থাকিতে পারে। কিন্তু একটা কারণ বোধ হয় এই, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রধানতঃ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই প্রচার হইতেছে। অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে যাঁহারা একবার সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি আস্থা-বিহীন ও উদাসীন হইতেছেন, আমরা সেখানে পুনর্ব্বার আস্থা গড়িবার প্রয়াস পাইতেছি। এই ভাঙ্গিয়া গড়ার চেষ্টাতেই আমাদের শ্রমের আশানুরূপ ফল ফলিতেছে না। এক দিকে দেখিতে গেলে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সাহায্য করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রতিবন্ধকস্বরূপ যে সকল কুসংস্কার দণ্ডায়মান আছে,তাহাদিগকে ভগ্ন করিয়া দিতেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম ও অলক্ষিত ভাবে ধর্ম্মের প্রতি এরূপ ঔদাসীন্য ভাব জন্মাইয়া দিতেছে যে, সে ক্ষেত্রে আর আমরা ধর্ম্মভাবকে জমাইতে পারিতেছি না। শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশ আমাদের আহ্বান ধ্বনির প্রতি কর্ণপাত করিতেছেন না। এই ঔদাসীন্য ভাব আমাদের পথে সুমহৎ অন্তরায় স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। এই কারণেই বোধ হয় ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে ও আমরা ধর্ম্মভাবকে বসাইতে পারিতেছি না। এখনকার বাতাস যেন আমাদের প্রতিকূল। আমরা সন্তানদিগকে যাহা বলিব ও করাইব, তাহার বিরুদ্ধ ভাব চারিদিক হইতে প্রাপ্ত হইতেছে; ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইতেছে বলিয়া আমরা নিজেও নিজ নিজ জীবনকে ধর্ম্মভাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়মিত করিতে পারিতেছি না। ঘোলের উপরে যেরূপ মাখন ভাসে, সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের পরিবার ও সমাজের উপরে ভাসিতেছে, এক দণ্ডে সরাইয়া ফেলিতে পারা যায়, আর ইহার চিহ্ন ও থাকিবে না। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে যে ভাবে রাখিয়াছি, আমাদের সন্তানদিগের মুখ দিয়া সেই ভাব বাহির হইতেছে। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে যদি এ ভাবে থাকিতে দি, তাহা হইলে কালে যে ইহা অন্তর্হিত হইবে, তাহাতে সংশয় নাই।

বালকবালিকার ধর্ম্মশিক্ষা কিরূপে দিতে হইবে?—অনেকে হয়ত আর এক কারণে জিজ্ঞাসা করিবেন, পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে এসকল গ্রন্থ কেন? আমরা শিক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দেখিয়াছি, যে সকল গ্রন্থ বালক বালিকার পাঠ্য গ্রন্থরূপে মনোনীত হয়, সে সকল গ্রন্থের প্রতি তাহাদের কিরূপ এক প্রকার বিতৃষ্ণা জন্মে। তাহারা প্রায় সেগুলির প্রতি মনোযোগী হয় না, যদিও বা মনোযোগী হয়, তাহা কেবল শিক্ষকদিগের ভয়ে। ধর্ম্ম গ্রন্থকে যদি পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে

নির্দ্দেশ কর, তবে তাহাও অপ্রীতিভাজন হইবে। এমন করিয়া ধর্ম্ম শিখাইতে গেলে, ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের বিরাগ জন্মিবে। অতএব পাঠ্য-গ্রন্থের মধ্যে এগুলি নির্দ্দিষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নয়। এবিষয়ে বক্তব্য এই,—পাঠ্য-গ্রন্থ সকল দুই কারণে বালক বালিকার অপ্রীতিকর হইয়া থাকে। প্রথম শিক্ষকদিগের শিক্ষা কৌশলের অভাব, তাঁহারা পাঠকে আনন্দ-জনক করিতে পারেন না; নিজেরা তাহার মধ্যে প্রাণ ঢালিয়া তাহার রসে বসিয়া পড়াইতে পারেন না;—দ্বিতীয়তঃ পাঠ্য-গ্রন্থের ভাবের প্রতিই সকল সময়ে মনোযোগ করিতে পারা যায় না, তাহার ভাষা, তাহার সন্ধি সমাস, তাহার ধাতু প্রত্যয় প্রভৃতি লইয়া পীড়াপীড়ি করিতে হয়, সুতরাং বিষয়গুলি বালক বালিকার নিকট নীরস হইয়া পড়ে। ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সেরূপে পড়াইবার প্রয়োজন নাই। বালক বালিকার হস্তে এক একখানি গ্রন্থ থাকিবে, শিক্ষকের হস্তে একখানি থাকিবে, তাহারা পড়িয়া যাইবে, পড়িতে পড়িতে শিক্ষকের মনে স্বতঃই যে সকল ভাবের উদয় হইবে, যে সকল সত্য তাহাদের অন্তরে মুদ্রিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিবেন, তাহা তাহাদের অন্তরে মুদ্রিত করিবেন। ইহাতে দুই প্রকার উপকার হইবে, প্রথমে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতগুলি পরিষ্কার হইবে, দ্বিতীয় ধর্ম্মভাবের সংস্পর্শে ধর্ম্মভাব প্রবল হইবে। এরূপ শিক্ষার সুফল অনতি-দীর্ঘকালের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যাইবে। গ্রন্থখানি উপলক্ষ মাত্র থাকিবে, শিক্ষককে আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় উৎস হইতে ভাব সকল উৎসারিত করিয়া দিতে হইবে। শিক্ষক ও ছাত্রে এইরূপ আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপিত না হইলে, আমাদের সন্তানদিগের অন্তরে শ্রদ্ধা ও সাধুভক্তি উদ্দীপ্ত হইবে না, এবং শ্রদ্ধা ও সাধুভক্তির অভাবে ধর্ম্মও দাঁড়াইতে পারিবে না। জগদীশ্বর আমাদের সহায় হউন!

ঈশ্বরকে সংসারে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া—আমরা নলহাটী সমাজ হইতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। পত্র প্রেরক অনেক কথা বলিয়াছেন যাহার প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই কিছু না কিছু বক্তব্য আছে, কিন্তু তাহার সমুদয় বলা যাইবে না। এখানে একটী বিষয়ের বিশেষরূপে উল্লেখ করা যাইতেছে। কিছু দিন হইল, আমাদের দুই জন বন্ধু ঈশ্বরোপাসনা করিয়া নিজ নিজ পুত্র কন্যার বিদ্যারম্ভ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ঐ সকল অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের পত্রে সন্তোষ প্রকাশ করা হইয়াছে বলিয়া পত্র-প্রেরক দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মনে যে ভীতি রহিয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। তিনি এবং তাঁহার বন্ধুগণ ভয় পাইতেছেন যে এই রূপ করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্ম কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বদ্ধ থাকিবে ও ইহার অন্তরস্থ ভাব বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্ম যাঁহাকে নিজ সংসারের প্রভু ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া মনে করেন, সংসারের সকল প্রকার শুভানুষ্ঠানে তাঁহার অর্চ্চনা করা ও তাঁহার কৃপা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা কি কর্ত্তব্য নহে? সন্তানের বিদ্যারম্ভ পরিবার মধ্যে কি একটী বিশেষ ঘটনা নয়? সকল কার্য্যই মঙ্গল বিধাতার নাম লইয়া কি করা কর্ত্তব্য নয়? বিশেষতঃ এইরূপ অনুষ্ঠান গুলি পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম-ভাবকে মুদ্রিত করিবার প্রধান উপায়। মুখে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া যায়, পারিবারিক ব্যবস্থা সকলের দ্বারা ও সন্তানদিগকে নীরব ভাবে তদপেক্ষা অধিক শিক্ষা দেওয়া যায়। সন্তানগণ যদি দেখে গৃহের কোন মঙ্গল কার্য্যই মঙ্গল বিধাতাকে ধন্যবাদ না করিয়া হয় না, তাহারা তদ্দ্বারা নীরব ভাবে অনেক শিক্ষা করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম যদি গৃহস্থের ধর্ম্ম হয়, তবে গৃহস্থের সকল কার্য্যেই ইহার সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ভক্তি-ভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় এবিষয়ে আমাদের আদর্শ। আমরা যখন তাঁহার চুঁচুড়াস্থ ভবনে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র দিতে গিয়াছিলাম, তখন তিনি অগ্রে একটী বন্দনা পাঠ করিয়া তৎপরে অভিনন্দন পত্রখানি লইলেন। তিনি উপদেশ দিলেন ব্রাহ্মের সর্ব্ব কার্য্যেই ঈশ্বরের নাম। অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িতেছে বলিয়া দুঃখ করা দূরে থাকুক, আমরা এই বলিয়া দুঃখিত হইতেছি, যে আমরা প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় গৃহধর্ম্ম করিতে পারিতেছি না। অনেক পরিবারে সপরিবারে দৈনিক উপাসনার নিয়মই অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আমার প্রতিবেশী একজন অবিশ্বাসী লোক; ধর্ম্ম সাধনের আবশ্যকতাতে তিনি সংশয়ভাবাপন্ন; তিনি যেমন আনিতেছেন, খাইতেছেন, আহার বিহার করিতেছেন ঈশ্বরের নামের সহিত খোঁজ খবর নাই, আমি যে তাঁহার প্রতিবেশী ব্রাহ্ম—আমিও তেমনি আনিতেছি, খাইতেছি, আহার বিহার করিতেছি, ঈশ্বরের নামের সহিত আমার পরিবার মধ্যেও খোঁজ খবর নাই। ইহাকে কি বিশ্বাসী হইয়া অবিশ্বাসীর ন্যায় জীবন যাপন করা বলে না? তখন আর কিরূপে দুঃখ করি যে আমরা অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি করিতেছি?

সমাজের নেতাগণ কি উত্তর দেন?—মফস্বল হইতে একজন ব্রাহ্মবন্ধু লিখিয়াছেন।—"আমার একটী কন্যা আছে, বয়স ১১।১২ বৎসরের। বাঙ্গালা আখ্যানমঞ্জরী প্রভৃতি পড়িয়াছে, ইংরাজী First Book এর কতক পড়িয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার রীতিমত লেখা পড়া শিখিবার কোন উপায় নাই। তাহাকে ভাল করে লেখা পড়া শিখাই আমার একান্ত ইচ্ছা হইলেও তাহাকে কলিকাতাতে রাখি এমন স্থান নাই। * * * তাই আজ আপনাদের শরণাপন্ন হইলাম। আপনারা যদি বিশেষ দয়া করিয়া আমার মেয়েটীকে কোথাও আশ্রয় প্রদান করেন এবং আমার সাধ্যাতীত না হয় এরূপ খরচের দ্বারা তাহার আহারাদি ও লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেন তাহা হইলে আমি আপনাদের কাছে যাবজ্জীবন অনুগৃহীত ও বাধিত থাকিব।" "পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া হিন্দু আত্মীয় বা বন্ধুবান্ধবদিগের নিকটে কোন বিষয়ের সাহায্য পাইবার আশা নাই। বরঞ্চ তাঁহারা আমাদের সকল কাজেই,—বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রদানে ঘোরতর প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকেন। এরূপ স্থলে আমাদের ন্যায় দুঃখী ব্রাহ্মদিগের প্রতি যদি আপনারা কৃপা কটাক্ষপাত না করেন, তাহা হইলে এ হতভাগ্যদিগের পুত্র কন্যাদিগের বিদ্যাশিক্ষা ও মানসিক উন্নতি প্রভৃতির কোন আশা ভরসা নাই।"

আমাদের এই বন্ধুটী যেরূপ ক্লেশে পড়িয়াছেন, এরূপ ক্লেশে আরও অনেক ব্রাহ্ম বাস করিতেছেন। যদি কেহ ব্রাহ্ম সমাজের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের ন্যূন বয়সে কন্যার বিবাহ দেন, ব্রাহ্মগণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে শত-মুখে নিন্দা করিবেন। কিন্তু মফস্বলে বালিকাদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া যায় এরূপ উপায় নাই। চতুর্দ্দিকের বাতাস যেরূপ, প্রতিদিনের সংসর্গ যেরূপ, প্রতিদিন সেখানে বালিকাগণ যাহা দেখে ও শোনে, তাহার ভিতর অজ্ঞ ও অবিবাহিত বালিকাদিগকে লইয়া বাস করিতে পিতা মাতাকে সর্ব্বদা সতর্ক ও সশঙ্ক থাকিতে হয়। অপর দিকে হিন্দু আত্মীয় স্বজন নিরন্তর আসিয়া বালিকাদিগকে দেখাইয়া দিয়া উপহাস ও কটূক্তি করিতে থাকে। আমাদের অনেক ব্রাহ্মবন্ধু এইরূপ ক্লেশের মধ্যে বাস করিতেছেন। ইঁহাদিগকে সাহায্য করিবার উপায় কি? অনেকের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সহরে রাখিয়া বিদ্যাশিক্ষা দেওয়ার ব্যয় বহন করিতে অক্ষম। তবে কি এই সকল ব্রাহ্মের কন্যাগণ অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিবে? যদি অশিক্ষিত থাকে, তাহাদিগকে শিক্ষিত যুবকগণ বিবাহ করিতে চাহিবে না। তৎপরে বালিকারা অশিক্ষিত ও অলস অবস্থাতে থাকিলে অনেক প্রকার বিপদ আছে। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে সেই সকল বিপদ ঘটিতে আরম্ভ হইলে, অপর লোকে ভগ্নোদ্যম হইয়া যাইবে, তখন ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করিতে লোকের আতঙ্ক হইবে। এ গুলি ব্রাহ্ম মণ্ডলীর গুরুতর আলোচ্য বিষয়। একের দ্বারা যে কাজ না হয় দশের দ্বারা তাহা হইতে পারে—এই জন্যই জনসমাজ। আমরা দশজনে মিলিলে কি আমাদের বালিকাগুলির শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিতে পারি না? পত্র প্রেরকের ন্যায় যে পিতা যথাসাধ্য আপনার কর্ত্তব্য পালনের জন্য উৎসুক তাঁহাকে সে বিষয়ে সাহায্য করা কি ধর্ম্মবন্ধুদিগের কর্ত্তব্য নহে? সুখের বিষয়, এই গুরুতর কর্ত্তব্যের দিকে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহাদের বিগত অধিবেশনে তাঁহারা কয়েক ব্যক্তির প্রতি এই ভার দিয়াছেন, যে তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অধীনে যদি একটী বালিকাদিগের প্রবাসাশ্রম করা যায় তাহা হইলে কতগুলি বালিকা যুটিবার সম্ভাবনা। সহরে থাকিতে এক একটী বালিকার নিতান্ত ন্যূন কল্পেও যে ব্যয় পড়িবে, তাহা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, যে স্কুলের বেতন বাদে ১০৲ টাকা পড়িবে। ২০টী বালিকা পাওয়া যাইবে এরূপ সম্ভাবনা দেখিলেই, একটা বন্দোবস্ত হইতে পারে। কিন্তু প্রবাসাশ্রম বলিলে কেহ যেন লম্বা চৌড়া ভাব মনে না লন, এখানে বালিকাগণ সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থায় শাদা মাটা খাইয়া পরিয়া থাকিবে। এ সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক দ্বারায় মফস্বলের বন্ধুদিগকে পত্র লিখিবেন। এই মাত্র বলা যাইতে পারে, যদি সকলে অভাব বোধ করেন, ও সকলে সহায়তা করিতে প্রস্তুত হন, তাহা হইলে এ অভাবটা ত্বরায় দূর হইতে পারে। যাঁহাদের আবশ্যক ব্যয় দিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদের সে অভাব দূর করিবারও উপায় হওয়া কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা।

উপনিষদের সে বচনটী ব্রাহ্ম মাত্রেই অবগত আছেন যাহাতে বলিয়াছে যে চারিবেদ ও ছয় বেদাঙ্গের বিদ্যা অপরা বিদ্যা এবং যদ্দ্বারা সেই অক্ষয় অবিনাশী পুরুষকে জানা যায় তাহা পরা বিদ্যা। শাস্ত্রে ব্রহ্মের কথা বলে, ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করে, ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেয় সত্য। কিন্তু যদি সেই শাস্ত্র পড়িয়াই কেহ সন্তুষ্ট থাকে, যদি তাহার দর্শন তাহার অধিক না যায়, যদি সে নিজ জীবনে সেই সকল সত্যের প্রমাণ না পায়, তবে সে শাস্ত্রগত বিদ্যা অপরা বিদ্যা—নিকৃষ্ট বিদ্যা; যে বিদ্যা দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরকে অন্তরে দর্শন করা যায় তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইবে যে সকল বিষয়েই অপরা বিদ্যা ও পরা বিদ্যা আছে। প্রথমে বিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা যাউক। একজন বিজ্ঞানের সত্য সকল আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। তিনি প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়াছেন এবং মনোযোগ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি যতই অধ্যয়ন করিতেছেন ততই তাঁহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে; এমন অনেক বিষয় শিখিতেছেন যাহা পূর্ব্বে জানিতেন না। বিজ্ঞানবিদ্গণ যে অদ্ভুত তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার অনেক গুলি জানিতেছেন। কিন্তু তাহার কোনটাই তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন না; সাক্ষাৎ ভাবে প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপন হইতেছে না। গ্রন্থে বলিয়াছে কোন কোন গ্যাসের সংমিশ্রণে জল হয় তিনিও তাহাই বলিতেছেন—কিন্তু কখনও উক্ত গ্যাস সংমিশ্রিত করিয়া জল উৎপাদন করিয়া দেখেন নাই। এরূপ ব্যক্তির জ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞান, মৃত জ্ঞান, তাহা চিত্তকে আনন্দ বিধান করিতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানী যিনি তিনি কখনই পরোক্ষ জ্ঞানে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। তাঁহার চিত্ত প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎভাবে মিলিত হইবার জন্য উৎসুক হয়। সেই ঔৎসুক্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়া যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে প্রকৃতির দ্বারে সমুপস্থিত হন, এবং অনুরাগের সহিত প্রকৃতির তত্ত্ব সকলের আলোচনা করেন, তাঁহার বিদ্যাই পরা বিদ্যা, অপর সকলের বিদ্যা অপরা বিদ্যা। হাক্সলি, টিণ্ডেল প্রভৃতির বিদ্যা পরা বিদ্যা, তুমি আমি কেবল মাত্র তাঁহাদের গ্রন্থে বদ্ধ থাকিয়া যে বিদ্যা লাভ করিতেছি তাহা অপরা বিদ্যা।

সকল বিষয়েই এইরূপ। একজন কোন দূরদেশে গিয়াছিলেন, সেখানে যে সকল বিষয় দেখিয়াছেন, যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহার বিবরণ সম্বলিত একখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। তুমি আমি সেই গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সে দেশের রীতি নীতির বিষয় অবগত হইতেছি। সেই সকল বিবরণের সাহায্যে কল্পনার উপরে নির্ভর করিয়া সে দেশের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা মনে ধারণা করিবার চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু এ বিদ্যা

কি প্রকৃত বিদ্যা? যতই কেন উজ্জ্বলরূপে ধারণা করিবার প্রয়াস পাই না, আমাদের মনের ধারণা কখনই সত্যানুগত হয় না। কিছু না কিছু অসত্য তাহার মধ্যে থাকিয়া যায়। পরে সেই দেশে যখন নিজেরা গমন করি এবং সেই সকল অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে থাকি, তখন আমাদের অপরা বিদ্যার হীনতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারি। সেই শিক্ষাই উৎকৃষ্ট শিক্ষা যাহা অপরা বিদ্যা দান করিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া, পরা বিদ্যা দিবার প্রয়াস পায়; যাহা "সিংহের ঘাড়ে কোঁকড়া কোঁকড়া লোম হয় তাহাকে কেশর বলে" এই মাত্র বলিয়া সন্তুষ্ট না থাকিয়া শিশুদিগকে লইয়া জীবন্ত সিংহ দেখাইয়া আনিতে চায়। এই কারণে সভ্য সমাজে এক্ষণে পশুশালা ও মিউজিয়ম শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে গৃহীত হইতেছে। সর্ব্ববিষয়েই শিক্ষকদিগের এই দৃষ্টি থাকা উচিত, কিরূপে বালক বালিকার স্বাধীন চিন্তা শক্তি ও সাক্ষাৎ পরীক্ষা শক্তি বর্দ্ধিত হয়। তাঁহাই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য।

ধর্ম্মশিক্ষার ও প্রধান উদ্দেশ্য এই হইবে। ধর্ম্মমতগুলি পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার নহে; তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প আয়াস-সাধ্য। আমাদের কথার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে ধর্ম্মমতগুলি বুঝাইয়া দিতে হইবে না, বা হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতে হইবে না। তাহাও আবশ্যক, এবং তাহা না হইলে তাহাদের মনে ধর্ম্মবিশ্বাস স্থির থাকিবে না। কিন্তু একজন যদি মতগুলি বিশদভাবে বুঝিতে পারে ও ব্যাখ্যা করিতে পারে, কিন্তু হৃদয়ে ধর্ম্মানুরাগ উদ্দীপ্ত না হয়, যদি সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বর দর্শনের প্রবৃত্তি ও শক্তি না জন্মে, তবে সে শুষ্ক জ্ঞান বৃথা। অপরা বিদ্যা যাহাতে পরা বিদ্যাতে পরিণত হয়, ধর্ম্মোপদেশ দিবার সময়েও সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মজীবন।

ধর্ম্মমতের সহিত ধর্ম্মজীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ। একের দ্বারা অপরের বিশেষ সাহায্য এবং একের পুষ্টিসাধনে অপরের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ধর্ম্মজীবনের ফল ধর্ম্মমত এবং বিশুদ্ধ ও উন্নত ধর্ম্মমত দ্বারা ধর্ম্মজীবন নিয়মিত করাতেই ধর্ম্মজীবনের উন্নতি। জ্ঞানী ও সাধকেরা জ্ঞান চর্চ্চা ও সাধনা দ্বারা জীবনে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন—যে সত্য-রত্নসকল উপার্জ্জন করেন তাহাই তাঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস। এই মত ও বিশ্বাস দ্বারা তাঁহারা আপনারা নিয়মিত হন ও জনসাধারণকে পরিচালিত করিয়া থাকেন। এই কারণেই সর্ব্বত্র জ্ঞানী ও সজ্জনগণের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর মধ্যে যে জাতি সভ্যতা, স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের গৌরব করিতেছেন—নর নারী, ধনী দরিদ্র, উচ্চ ও নিম্ন বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের তুল্যাধিকার ঘোষণা করিতেছেন, সে জাতির ইতিহাস তলাইয়া দেখিলেও ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ লক্ষ নর নারী দুই চারি জন শক্তিশালী মহাপুরুষের অঙ্গুলি নির্দ্দেশে প্রত্যক্ষ ও অলক্ষিতভাবে পরিচালিত হইতেছে। সে জাতির অদৃষ্ট অনেক পরিমাণে দুই চারি জন পরাক্রমশালী ব্যক্তির উপর নির্ভর করিতেছে। কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি সমাজ সংস্কার সকল বিষয়েই অসাধারণ চিন্তাশীল লোকেরা নেতৃত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা গভীর চিন্তা-বলে সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল নিরূপণ করিতে সমর্থ হন, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা-বলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা দেখিতে পান এবং আপনাদের জীবনের অভিজ্ঞতায় সত্য লাভ করিয়া সেই পরীক্ষিত সত্য দ্বারা জীবন চালাইয়া থাকেন, তাঁহারাই জন সমাজের প্রকৃত নেতা। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে জনসমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করুন বা অন্তরালে থাকিয়া কার্য্য করুন, তাঁহাদের প্রভাব বিশেষরূপে জনসমাজের উপর কার্য্য করিয়া থাকে।

যাঁহারা জলপথে ষ্টীমার যোগে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই দেখিয়াছেন যে, কলের চতুঃপার্শ্বস্থ চক্রাকার যন্ত্রগুলি অনবরত সঞ্চালিত হইতেছে—উপরে উপরে তাহাদের গতি নিরীক্ষণ করিলে বোধ হয় যেন তাহারাই জলযানখানিকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছে। বাস্তবিক তাহা নহে। চিন্তাশীল লোকেরা দেখিতে পান যে, যে প্রকাণ্ড স্থালীতে কল চালাইবার শক্তি বাষ্প প্রস্তুত হইতেছে সেই বয়লার (Boiler) ধীরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া বাষ্পরাশি উদ্গীরণ করিতেছে বলিয়াই জলযান চলিয়া যাইতেছে। সেইরূপ জনসমাজের উন্নতি সংকল্পে গভীর চিন্তাশক্তি, প্রেম ও নিঃস্বার্থতা লাভ না করিয়া যাঁহারা দিবানিশি ছুটাছুটি করেন, বাহির হইতে তাঁহাদের কার্য্য দেখিয়াও মনে হয় যে, তাঁহারাই যেন সমাজের সকল অভাব মোচন করিতেছেন, কিন্তু একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, ধূমকলের চক্রাকার যন্ত্রগুলির ন্যায় তাঁহারাও সমাজ যানকে অগ্রসর হইবার পক্ষে সাহায্য করিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহারা বয়লারের (Boiler) স্থানীয় নহেন। যিনি শক্তি উৎপন্ন করেন, যিনি জীবনের পরীক্ষিত মত ও সত্যসকল বৈদ্যুতিক শক্তিতে জনসাধারণের প্রাণে সঞ্চারিত করেন, তিনি বয়লারের ন্যায় ধীর ও নির্ব্বাক। বয়লার যেমন দগ্ধীভূত হইয়া আপনার অভ্যন্তরে নীরবে জলযান চালাইবার শক্তি বাষ্প সঞ্চয় করিয়া থাকে, যাঁহারা ধর্ম্মসমাজের নেতা হইতে চান—ধর্ম্মসমাজকে শাসন, পালন ও উন্নত করিতে অভিলাষী, তাঁহারাও তদ্রূপ আপনাদের হৃদয়ে ধর্ম্মসমাজের সমস্ত উত্তাপ ও উপদ্রব সহ্য করিয়া নরনারীগণের প্রকৃত আধ্যাত্মিক কল্যাণসাধন মানসে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিতে প্রয়াস পান।

যাঁহারা জীবন দ্বারা মত প্রচার করেন, তাঁহাদের তর্জ্জন গর্জ্জন নাই। তাঁহারা আপনাদের মতকে শক্তিপূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, সুতরাং সর্ব্বদাই মতের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান হন। তাঁহারা আপনাদের মতকে এতদূর শ্রদ্ধা করেন বলিয়াই অপরের মত সম্বন্ধে উদার ভাব অবলম্বন করেন, কিন্তু সকল অবস্থাতেই আপনাদের মত সকলকে ষোলআনা বজায় রাখেন, কোন মতে তাহার অন্যথা করিতে প্রস্তুত হন না। পক্ষান্তরে যে সকল লোক উপরোক্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের ন্যায় কঠোর সাধনা-বলে সত্য লাভ করিতে সক্ষম হয় না—আপনাদের জীবনের পরীক্ষায় প্রচলিত মতের সত্য ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ না হইয়া অন্যের মুখে শুনিয়া সত্যকে মত বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহারা সে সকল মতকে কখনও

জীবন-সহায় মনে করিয়া তাহা জীবনে পরিণত করিতে প্রয়াস পান না।

এই শ্রেণীর লোকেরা আপনাদের অবলম্বিত মতের প্রতিও সমুচিত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন না—যখন যেরূপ সুবিধা হয়—যখন যেরূপ অবস্থায় পতিত হন তদনুসারেই কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। অপরের মতের প্রতি শ্রদ্ধা ও উদার ভাব দেখাইতে পারেন না। ইঁহারা মতকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে মতের ভেরী বাজাইয়া থাকেন, জীবনের প্রতি কদাপি দৃষ্টিপাত করেন না। অন্যের মতের শ্রেষ্ঠতা ও অপকৃষ্টতার সমালোচনা করিয়া তৃপ্ত হন বটে, কিন্তু অন্যের জীবনের সাধুতা অসাধুতা, মহত্ত্ব ও নীচত্ব দেখিতে পান না। জীবন গঠনের জন্যই বিশুদ্ধ মতের আবশ্যক, জীবনের উন্নতি সাধনের জন্যই উন্নত মতের প্রয়োজন। কিন্তু যেখানে জীবনের প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই—উন্নত ভাব ও মত সকল প্রচার করিয়াও অতি হীন ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন সেখানে সে উন্নত মতের সার্থকতা কি হইল?

তবে বিশুদ্ধ মতের গৌণ ফল অস্বীকার করা যায় না। বহু অধ্যয়ন করিয়া, গভীর জ্ঞানের কথা শুনিয়াও শুধু আত্ম-চিন্তা, বিচার শক্তি ও আত্মচেষ্টার অভাবে যেমন কেহ প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পারেন না, সেইরূপ নীতি ও ধর্ম্মের উচ্চ উচ্চ মত সকল জানিয়াও যদি তাহা জীবনে পরিণত করিবার পক্ষে জলন্ত আকাঙ্ক্ষা ও একান্ত চেষ্টা না থাকে তবে তাহার মুখ্য ফল ফলে না। শুধু বহু অধ্যয়ন ও বহু শ্রবণ দ্বারা যেমন এক ব্যক্তির চরিত্র উন্নত না হইলেও কুসংস্কার দূরীভূত হয়, উন্নত মতের প্রভাবেও তেমনি মানবের উচ্চ জীবন লাভ না হইলেও অন্ধ বিশ্বাস তিরোহিত হইয়া থাকে। জ্ঞান চর্চ্চাতে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় এবং বুদ্ধি যত মার্জ্জিত হইতে থাকে মানব মন ততই বিচারাধীন হইতে থাকে, এ কথা অতি সত্য, কিন্তু যাঁহারা কেবল জ্ঞানের উচ্চ উচ্চ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া, জ্ঞানের বাহিরের চাকচিক্যে সুসজ্জিত হইয়া পণ্ডিত সমাজে বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত হইতে চান, তাঁহারা কখনও জ্ঞানের সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন না, তাঁহারা শিক্ষার সেইরূপ বাহ্যভাব দ্বারা জ্ঞানের বহু উচ্চ কথা কণ্ঠস্থ ও আবৃত্তি করিয়া জনসমাজে খ্যাতি লাভ করিতে পারেন বটে, কিন্তু সেইরূপ শিক্ষায় তাঁহাদের হৃদয় মন ও আত্মার প্রকৃত কল্যাণ হয় না, এবং তাঁহাদের দ্বারা জনসমাজেরও বিশেষ কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। বিশুদ্ধ মত সম্বন্ধেও সেইরূপ যাঁহারা গভীর বিচার ও বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সাময়িক উচ্ছ্বাসে অথবা প্রচলিত হুজুকে কোন মত গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সেরূপ মত গ্রহণ দ্বারা তাঁহাদের আপনাদেরও বিশেষ কোন উপকার হয় না, এবং সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্ট হইবারই অধিকতর সম্ভাবনা। জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞানোপার্জ্জনকে যিনি উচ্চজীবন লাভের উপায়স্বরূপ মনে করেন, তিনিই বিশেষ সতর্কতার সহিত সত্যাসত্য বিচার করিয়া জ্ঞানমার্গে বিচরণ করেন এবং আত্ম-চেষ্টায় যাহা কিছু লাভ করিতে কৃতকার্য্য হন, তাহার আলোকেই জীবন চালাইতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানোপার্জ্জনই সার্থক হয়, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া জীবনের উন্নতিসাধন করেন। সেইরূপ যিনি সামাজিক অবস্থার গূঢ়তম স্থানে প্রবেশ করিয়া সমাজ প্রচলিত মতের গূঢ় ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন এবং আপনার শক্তি, জ্ঞান ও বিশ্বাসের সহিত মিলাইয়া প্রচলিত মত গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাঁহার দ্বারা সমাজ লাভবান হন এবং তিনি স্বয়ংও উপকৃত হইয়া থাকেন। মতের সত্যতা জীবনে পরীক্ষা না করিয়া তাহা গ্রহণ করিলে যেমন তাহা দ্বারা উচ্চ জীবন লাভের সাহায্য হয় না, মত জীবনে পরিণত করিবার জন্য সরল ভাবে সাধন না করিয়া তাহা মুখে স্বীকার করিলেও তাহাতে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয় না। যাহা প্রত্যক্ষ করা যায় নাই, তাহা কখনই জীবনে দাঁড়ায় না এবং তাহা প্রচার দ্বারা জনসমাজের বিশেষ অকল্যাণ ঘটিয়া থাকে। পৃথিবীর নাস্তিকতা ও অধর্ম্মের প্রায় সমগ্রই অসত্য প্রচারের ফল। অসত্য প্রচারের দ্বারা মানুষের যে পরিমাণে ক্ষতি হয়, মানবের স্বভাবে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যে পরিমাণে বিনষ্ট হয়, এরূপ আর কিছুতেই হয় না। আজ যিনি চিরবন্দিনী বঙ্গ-ললনার ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতা ও অধিকার দিতে যাইয়া সমাজের প্রচলিত রীতি নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেও সঙ্কুচিত হন না, রক্ষণশীল দলের নিন্দা ঘৃণা ও উৎপীড়ন হাস্য মুখে সহ্য করিতে পারেন, কাল যদি দেখি তিনি স্ত্রী স্বাধীনতার ঘোর বিরোধী হইয়াছেন, তবে আর কেমন করিয়া স্বীকার করিব, যে তিনি উজ্জ্বল জ্ঞান ও বিশ্বাসের আলোকে কার্য্য করিয়াছিলেন? তাঁহার কার্য্য হুজুক বই আর কিছুই নয়, এবং এইরূপ কার্য্য দ্বারা জনসাধারণের চিত্ত প্রশস্ত ও উন্নত হইবার পরিবর্ত্তে সংকীর্ণ ও সন্দিগ্ধ হইয়া উঠে। এইরূপ আজ যিনি ধর্ম্মপ্রচারক, কাল যদি তিনি দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া জীবনধারণ করেন, আজ যিনি ধর্ম্মের জন্য সংসারের সুখসম্পদ পরিত্যাগ করিয়া ফকির হইলেন, কাল যদি তাঁহাকে ঘোর সংসারীর ন্যায় বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত দেখা যায়, তবে মানুষের স্বাভাবিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আর কেমন করিয়া অটল থাকিতে পারে? অবশ্য যাঁহারা বিশ্বাসের ভূমি লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন, এবং যাঁহাদের ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহারা মানুষের দুর্ব্বলতা দেখিয়া ধার্ম্মিক লোকের পতন দেখিয়া কখনও বিচলিত হইবেন না,—তাঁহাদের শ্রদ্ধা বিশ্বাস কিছুতেই শিথিল করিতে পারিবে না, বরং এই সকল ঘটনা দেখিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হইতে থাকে এবং ধর্ম্ম সাধনে অধিকতর একাগ্রতা জন্মে। কিন্তু যাঁহাদের বিশ্বাস অতি দুর্ব্বল, যাঁহাদের প্রাণে অপ্রেম সন্দেহ ও নিরাশা অত্যন্ত প্রবল তাঁহারা এই সকল ঘটনা দেখিয়া আর ধর্ম্মের কথা শুনিতে চান না, এবং ক্রমে ক্রমে ঘোরতর ধর্ম্ম-বিদ্বেষী হইয়া ধর্ম্মকে উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হন না। পৃথিবীর সাধু মহাজনগণের জীবন অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা কখনও লোকের মুখের কথা শুনিয়া জীবন-পথে চলেন নাই। তাঁহারা ধর্ম্ম, মনুষ্য ও সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়েই প্রকৃতি ও আত্মা হইতে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা মনুষ্য সমাজে সাধারণ ভাবে

যে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য কেহ বা বিজন বনে, কেহ বা শৈল শিখরে গমন করিয়া নির্জনে গভীর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং আত্মাতে যে বাণী শুনিয়াছেন, যে আলোক লাভ করিয়াছেন তদনুসারেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই স্থানেই মহাজনগণের স্বাতন্ত্র্য ভাব, এই স্থানেই তাঁহাদের জীবনের বিশেষত্ব, এই বিশেষ ভাবের জন্য তাঁহারা সাধারণ লোকের দ্বারা উৎপীড়িত অবমানিত এবং কেহ বা জীবন পর্য্যন্ত হারাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের শক্তিতে শত সহস্র লোক নূতন জীবন পাইয়াছে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক যে ভাবে রীতি, নীতি, লৌকিকতা ও সামাজিকতার দাস হইয়া জীবন যাপন করে, মহাজনগণ তাহার অন্যথা করেন বলিয়াই তাঁহাদের এত নির্য্যাতন ও ক্লেশ! তাঁহারা যদি সাধারণ লোকের ন্যায় পৃথিবীর পাপ তাপের প্রতি উদাসীন হইয়া সুখ শান্তিতে দিন কাটাইতে পারিতেন, তবে আর তাঁহাদের শিরশ্ছেদন হইত না। কিন্তু তাঁহাদের জীবন স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত, তাঁহারা জ্ঞান, ধর্ম্ম, পুণ্য ও শক্তি প্রত্যক্ষভাবে লাভ না করিয়া সন্তুষ্ট হন নাই এবং কার্য্যগত জীবনে এই সকল না খাটাইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা সাময়িক ভাবের উচ্ছ্বাসে, উৎসাহের প্রাবল্যে, অথবা কল্পনার কুহকে কোন কাজে প্রবৃত্ত হন নাই। "যাও, ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যের কথা প্রচার কর," যীশু যখন আপন আত্মাতে ঈশ্বরের এই বাণী শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি কি করিয়াছিলেন? তিনি আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতার সহিত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন, নির্জ্জনে গভীর সাধনাবলে এই বাণীর সত্যতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন এবং যখন তাঁহার সংশয় দূর হইল, অন্তরে যে আদেশ লাভ করিয়াছিলেন বাহিরের ঘটনায় তাহা পরীক্ষিত হইল। তখনই তিনি পিতার আদেশ পালনে আত্মোৎসর্গ করিলেন! সকলেই যে মহাজনগণের ন্যায় কঠোর সাধনা বলে সত্য লাভ করিয়া তাহার আলোকে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইবেন আমাদের সেরূপ বিশ্বাস নাই। তবে মত পরীক্ষা করিয়া তাহা সত্য ভাবে গ্রহণ করা ও জীবনে পরিণত করিবার জন্য সরল ভাবে চেষ্টা করা, ইহা কিছু বেশী কঠিন ব্যাপার নহে। আমরা যদি মত সম্বন্ধে এতটুকু সাবধান ও অনুরাগী হই তবুও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। মত যত দিন প্রত্যক্ষের বিষয় না হইবে তত দিন তাহা মৃত কথা। তাহাতে কখনই সত্যের শক্তি অনুভূত হইবে না, এবং হাজার বৎসর ধরিয়া সে মত প্রচার করিলেও তাহাতে জন সমাজের কোন স্থায়ী কল্যাণ সংসাধিত হইবে না। শক্তি হীন বাক্যের যেমন প্রাণ নাই, এবং তাহাতে মানুষের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারেনা, সাধন হীন মতেরও তেমনি প্রাণ নাই, সে মত প্রচার দ্বারা নরনারীর হৃদয় মন উন্নত হইতে পারে না। মত যখন ধর্ম্মজীবন হইতে প্রসূত অথবা ধর্ম্মজীবনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখনই তাহার বল হয়, তখন তাহা জীবন্ত হইয়া উঠে, এবং ধর্ম্মজীবন যখন জীবন্ত মতের সম্পূর্ণ অনুগত হয়, তখনই তাহার সৌন্দর্য্য জ্যোতি ও মহিমা প্রকাশিত হয়।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় ভাগ।

(সমালোচনা।)

৩

নগেন্দ্রবাবুর পুস্তকের শেষ দুটী প্রবন্ধের নাম "পাপ কি," ও "পাপের প্রায়শ্চিত্ত"। এই দুটী প্রবন্ধের আলোচনা করিয়া আমরা এই সমালোচনা শেষ করিব। "পাপ কি?" শীর্ষক প্রবন্ধে গ্রন্থকার প্রথমতঃ প্রচলিত হিন্দু ও খৃষ্টীয় মতের ভ্রম দেখাইয়া তৎপর এই সম্বন্ধে নিজের মত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ব্যাখ্যাতে 'পাপ কি?' এই প্রশ্নের উত্তর তাদৃশ স্পষ্টরূপে দেওয়া হয় নাই, 'পাপের উৎপত্তি কোথায়?' এই প্রশ্নেরই বিচার করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত বিষয়ে প্রবন্ধে দুটী পরস্পর-বিরোধী মত প্রকাশ করা হইয়াছে, সেই জন্যই আমরা গ্রন্থকারের ব্যাখ্যায় তেমন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না। এই বিরোধের পূর্ব্বাভাস আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাবেই দিয়াছিলাম, এই প্রস্তাবে আর একটু স্পষ্টরূপে দেখাইব। মানব স্বাধীন ইচ্ছাতে বা আত্ম-শক্তিতে পাপ করে, অর্থাৎ সুখের জন্য নয়, পাপের জন্যই পাপ করে, এই কথা মানিতে গেলে যে মানুষের মধ্যে একটী স্বাভাবিক পাপ-প্রবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়, তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইয়াছি। এই স্বাভাবিক পাপ-প্রবৃত্তি মানিতে গেলে যে ঈশ্বরকেই এই পাপ-প্রবৃত্তির সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। অথচ পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বর কদাচ পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। এই কঠিন সমস্যা দেখিয়াই নগেন্দ্রবাবু তাঁহার ব্যাখ্যার প্রথমাংশে পাপের ভাবাত্মক সত্তা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—'পাপ কোথা হইতে আসিল?' এই প্রশ্নই হইতে পারে না। পাপ যদি কোন বাস্তব পদার্থ হইত, যদি উহার বাস্তব সত্তা থাকিত, তাহা হইলে 'পাপ কোথা হইতে আসিল?' 'কেমন করিয়া আসিল?' 'কে উহার সৃষ্টি করিল?' ইত্যাদি প্রশ্ন সুসঙ্গত হইত। পাপের সত্তা নাই। পাপ অভাব পদার্থ।......জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান, আলোকের অভাব অন্ধকার, ধনের অভাব দরিদ্রতা, সেইরূপ পুণ্যের অভাবের নাম পাপ।" (১২৩—২৪ পৃষ্ঠা) পুনশ্চ,—"মনুষ্যের স্বাভাবিক অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতার ফল পাপ। শৈশব কালে আমরা প্রত্যেকেই য়িহুদী শাস্ত্রবর্ণিত আদমের ন্যায় নির্দ্দোষ ছিলাম। কিন্তু যখনই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলাম, মনের প্রবৃত্তি সকল বিকাশপ্রাপ্ত হইল, বাহিরের প্রলোভন সকল সম্মুখীন হইল, তখনই স্বাভাবিক অপূর্ণতা ও দুর্ব্বলতাবশতঃ আমাদের পতন হইল। পাপ মানুষের স্বাভাবিক অপূর্ণতার অবশ্যম্ভাবী ফল" (১১৭ পৃষ্ঠা)। পাপ যখন অভাব বস্তু, ইহা যখন পরিমিত জীবের স্বাভাবিক অপূর্ণতার বাহ্য প্রকাশমাত্র, তখন ঈশ্বরকে ইহার জন্য দায়ী করা যায় না—ঈশ্বর কিছু মানুষকে তাঁহার ন্যায় পূর্ণ করিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত সমস্যার মীমাংসা এই। এই মীমাংসা হইতে আবার নূতন সমস্যা উঠিতেছে কি না এই বিষয় আমরা কিছু বলিব না। এখন নগেন্দ্রবাবুর মতের আর এক দিক্ দেখা যাক্। একদিকে পাপকে

অভাব বস্তু বলিয়া—মানবীয় অপূর্ণতার অবশ্যম্ভাবী ফল বলিয়া—নগেন্দ্র বাবু আবার বলিতেছেন,—"তরবারে পাপ নাই, হস্তে পাপ নাই, কোন মানসিক বৃত্তিতে পাপ নাই, তবে পাপ কোথায়? স্বাধীনভাবে ইচ্ছাপূর্ব্বক উহাদের অপব্যবহারে পাপ। মানুষ অপব্যবহার করে কেন? স্বাধীনতা আছে বলিয়া?" (১২০ পৃ) পুনশ্চ,—"ইচ্ছা-শক্তি পাপের মূল। ইচ্ছা-শক্তি হইতেই পাপের উৎপত্তি।" (১২৫ পৃ।) 'মানুষ দুর্ব্বলতাবশতঃ—শক্তির অভাববশতঃ—পাপ করে', আর 'স্বাধীন ইচ্ছাপূর্ব্বক—ইচ্ছাশক্তি দ্বারা—পাপ করে' এই দুই মতের বিরোধ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এক মতে পাপ শক্তির অভাব-প্রসূত, অপর মতে ইহা শক্তি-প্রসূত। এই বিরোধ গ্রন্থকার স্বয়ংই কিয়ৎ পরিমাণে দেখিতে পাইয়াছেন, এবং দেখিতে পাইয়া বিরোধ ভঙ্গের প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাঁহার প্রয়াস সফল হয় নাই। তিনি বলিতেছেন, —"এখন কেহ আপত্তি করিতে পারেন যে, মনুষ্যের ইচ্ছাতেই যখন পাপ, তখন পাপকে অভাব পদার্থ কেন বলিব? ইচ্ছাশক্তির বাস্তব সত্তা আছে; ইচ্ছাশক্তি যখন পাপময় হইল, তখন পাপেরও বাস্তব সত্তা কেন স্বীকার করিব না?" এই প্রশ্নের উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন,—"ইচ্ছাশক্তি কখন পাপময় নহে। ইচ্ছাশক্তি পরমেশ্বর প্রদত্ত পবিত্র শক্তি। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যখন আমরা পরমেশ্বরের আদেশ অতিক্রম করি, যখন তাঁহার ধর্ম্ম নিয়ম পালন না করি, তখন পাপের উৎপত্তি। সুতরাং ইচ্ছাশক্তি বাস্তব সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ হইলেও, পাপ নিশ্চয়ই অভাব পদার্থ।" উত্তরটা আমাদের নিকট সন্তোষকর বোধ হইল না। ইচ্ছা-শক্তিকে স্বভাবতঃ পাপময় বলা আপত্তিকারীর অভিপ্রায় নহে; পুণ্য কার্য্যের সময়ে ইচ্ছাশক্তি পুণ্যময়, পাপ কার্য্যের সময় পাপময়—ইহাই আপত্তিকারীর অভিপ্রায়। এখন কথা এই, ইচ্ছাতেই যখন পাপ পুণ্য, পুণ্য ইচ্ছাই যখন পুণ্য, এবং পাপ ইচ্ছাই যখন পাপ, আর পুণ্য ইচ্ছা ও পাপ ইচ্ছা উভয়ই যখন স্বাধীন, তখন কেবল পুণ্য ইচ্ছাকেই কেন ভাবাত্মক বলা হইবে, আর পাপ ইচ্ছাকেই বা কেন অভাবাত্মক বলা হইবে? নগেন্দ্র বাবু এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। বরং স্থানান্তরে আপত্তিকারীর কথায় এক প্রকার সায় দিয়াছেন,—"আমরা ইচ্ছা করিয়া পাপ করি। আমাদের ইচ্ছা অভাব পদার্থ নহে। উহার বাস্তব সত্তা আছে। সুতরাং পাপ অভাব পদার্থ হইলেও, 'উহা কিছুই না' এরূপ বলা যায় না।"

এই সমালোচক প্রস্তাবের সঙ্কীর্ণ সীমার ভিতরে এই প্রশ্নের সন্তোষকর উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। সম্পূর্ণ সন্তোষকর উত্তর দিতে আমরা সমর্থও নহি। যাহা হউক এ সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলিব। 'পাপ অভাবাত্মক'—নগেন্দ্র বাবু এই মতের যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, সেই ব্যাখ্যা আর একটু বিশদ ও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। তিনি বলিতেছেন,—"'পাপ কি?' ধর্ম্ম, পুণ্য, পরমেশ্বরের ইচ্ছা এই সকলকে উল্লঙ্ঘন করা, ভঙ্গ করা, তদনুসারে কার্য্য না করা। 'পাপ কি?' এই প্রশ্নের উত্তরে যাহাই কেন বল না, উহাতে একটা 'না' আসিয়া পড়িবে।" (১২৪ পৃ) তা ঠিক। কিন্তু আপত্তি উঠিতে পারে যে কেবল এই 'না'তেই পাপের পাপত্ব নহে, পাপের যেমন একটা 'না'র দিক্ আছে, তেমনি একটা 'হাঁ'র দিকও আছে। চুরি করাটা কেবল ধর্ম্ম-নিয়ম পালন 'না করা' নয়, একটা অসৎ কার্য্য 'করা'। অন্যের অনিষ্ট করা কেবল ধর্ম্ম 'না করা' নয়, একটা পাপ কার্য্য 'করা'। আর এই পাপ কার্য্যগুলি যদি পাপের জন্যই করা হয়, 'পাপী হইব' এই ইচ্ছার বশে করা হয়, তবে পুণ্যকার্য্য অপেক্ষা এই পাপ কার্য্যগুলি কোন অংশেই কম ভাবাত্মক নহে। আর পাপ যদি ভাবাত্মক হয়, তবে পাপের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত সমস্যা সম্পূর্ণরূপেই অমীমাংসিত থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কথা এই যে মানুষ পাপকার্য্য পাপের জন্য করে না, 'পাপী হইব' এই অভিপ্রায়ে করে না। প্রবৃত্তির বশে সুখের লোভেই মানুষ পাপ করে। পাপ কার্য্যে মানুষের ইচ্ছা যাহাকে সাক্ষাৎভাবে আলিঙ্গন করে—যাহাকে লক্ষ্য করে,—তাহা পাপ নহে, তাহা কোন সুখ—কোন ঈপ্সিত বস্তু। সেই সুখ লাভের ইচ্ছা, সেই ঈপ্সিত বস্তু লাভের ইচ্ছা ধর্ম্ম-নিয়মের বিরোধী না হইলে আদবে পাপই হইত না, ধর্ম্ম-নিয়মের বিরোধী হওয়াতেই তাহা পাপ হইয়াছে। কিন্তু এরূপ স্থলে 'সুখ অন্বেষণ করিতে গিয়া পাপ করিতেছি' ইহা জানিয়াও মানুষ প্রকৃত পক্ষে পাপকে লক্ষ্য করে না, সুখকেই লক্ষ্য করে, সুতরাং তাহার কার্য্যের ভাবাত্মক দিক্ সুখান্বেষণ করা, অভাবাত্মক দিক ধর্ম্ম-নিয়ম পালন না করা। সুখান্বেষণ করাটা পাপ নহে, ধর্ম্ম-নিয়ম পালন না করাটাই পাপ। এরূপ, প্রত্যেক পাপকার্য্যের অভাবাত্মক দিকটাই পাপ—যেটুকু না করা হয় সেটুকুই পাপ, যেটুকু করা হয় সেটুকু পাপ নহে। এই 'না করাটা' যে কর্ত্তৃত্ব মূলক নহে, স্বাধীনতা-মূলক নহে, ইহা যে প্রবৃত্তির অধীনতা-মূলক তাহা আমরা পূর্ব্ব প্রস্তাবে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি।

"পাপের প্রায়শ্চিত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে নগেন্দ্রবাবু প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে প্রচলিত খৃষ্টীয় মতের ভ্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক অনুতাপই যে পাপের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত এই মত দক্ষতার সহিত সমর্থন করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক কথা বলিয়াছেন। এই প্রবন্ধের বিশেষ আলোচনা আমাদের আবশ্যক বোধ হইতেছে না। আমাদের সমালোচনা শেষ হইল। এখন আশা এই, প্রত্যেক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা এই চিন্তাপূর্ণ পুস্তক আগ্রহ, চিন্তা ও আলোচনার সহিত পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সংস্থাপনের সহায়তা করিবেন।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বাগেরহাট।

করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় বাগেরহাট ব্রাহ্ম সমাজের ৭ম সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উৎসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই;—

১৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার।—উৎসবের উদ্বোধন। বাবু হৃদয় নাথ ঘোষ বি, এ, উপাসনার কার্য্য করেন। "ব্যাকুলতা" সম্বন্ধে অতি মনোহর একটী উপদেশ প্রদান করেন।

১৯এ জ্যৈষ্ঠ রবিবার।—সকাল বেলা হইতে কীর্ত্তন ও সঙ্গীত হইতে থাকে, তৎপর উপাসনা হয়। বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী উপাসনা করেন। "ঈশ্বরকে যে প্রাণ দেয় সেই প্রাণ পায়" এই বিষয়ে একটী উপদেশ দেন। দুই প্রহরের পর শ্লোক সংগ্রহ এবং গীতা হইতে কিয়দংশ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন, তৎপর কিছু কাল আলোচনা হয়। বিকালবেলা বাজারে গিয়া প্রথমতঃ কীর্ত্তন হইতে থাকে; তার পর প্রার্থনান্তে বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী এবং বাবু অমৃতলাল গুপ্ত সংক্ষেপে দুইটী বক্তৃতা করেন, রাত্রিতে সঙ্গীত ও উপাসনা হয়, বাবু মন্মথমোহন দাস উপাসনার কার্য্য করেন, "ব্রহ্মকে শুধু জ্ঞানে লাভ করিলে হইবে না, প্রাণে পাওয়া চাই" এই বিষয়ে একটী উপদেশ দেন। উপাসনান্তে বাবু নবীনচন্দ্র সিংহ উকিল মহাশয়ের বাটীতে প্রীতি-ভোজন হয়।

২০এ জ্যৈষ্ঠ সোমবার।—সকালে বাড়ী বাড়ী গিয়া কীর্ত্তন করা হয়। মধ্যাহ্নে স্কুলসবইন্স্পেক্টর সারদা বাবুর বাটীতে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। পরে সেখানে প্রীতি-ভোজন এবং রাত্রিতে উপাসনা হয়। বাবু অমৃতলাল গুপ্ত উপাসনার কার্য্য করেন। জীবনের একটী কথা লইয়া "নির্ভর" বিষয়ে উপদেশ দেন।

২১এ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার।—সকালে উপাসনা হয়; বাবু হরিনাথ দাস উপাসনা করেন। বৈকালে মনিগঞ্জ নামক একটী গ্রামে গমন করা হয়। সেখানে নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী (জেলে প্রভৃতি) অনেক লোকের বাস। প্রথমে তাঁহারা কয়েকটী কীর্ত্তন করেন,তৎপর ব্রহ্মসঙ্গীত ও কীর্ত্তন করা হয়। নানা বিষয়ে কথা-বার্ত্তার পর বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী শিক্ষা, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সরল ভাষায় একটী সুদীর্ঘ উপদেশ প্রদান করেন। এই প্রকারে সেখানে প্রায় রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে লইয়া কাটান যায়।

২২এ জ্যৈষ্ঠ বুধবার।—অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হওয়া যায়। বাজারের ভিতর গিয়া অত্যন্ত জমাটের সহিত কীর্ত্তন হয়। সংকীর্ত্তন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হইলে, বাবু হরিনাথ দাস "নামে রুচি জীবে দয়া" সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাবে সময়োপযোগী একটী বক্তৃতা করেন। তৎপর পুনরায় সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে আগমন করা যায়। তৎপর উপাসনা হয়; বাবু হরিনাথ দাস উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনান্তে বাবু আনন্দচন্দ্র সেন উকীল মহাশয়ের বাসায় প্রীতিভোজন হয়।

২৩এ জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার।—কীর্ত্তন হয়, তৎপর বাবু মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় একটী প্রার্থনা করিয়া উৎসব শেষ করেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

ভারতের ধর্ম্ম বিপ্লবের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা অতি স্পষ্টরূপে দেখিতে পান যে, নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব ও তিরোভাব কত সহজে ও শীঘ্র শীঘ্র এদেশে সম্পন্ন হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মের সর্ব্বগ্রাসী কবলে প্রায় সকলকেই একে একে কবলিত হইতে হইয়াছে। খৃষ্ট ও মুসলমান ধর্ম্ম বিদেশাগত, ইহাদিগকে গ্রাস এবং জীর্ণ করা তত সহজ নহে বলিয়া ইহাদের পার্থক্য ও বিশেষত্ব এখনও সম্পূর্ণরূপে হিন্দু ধর্ম্মের মধ্যে বিলয় প্রাপ্ত হয় নাই। তবুও স্থানের গুণে জলবায়ুর গুণে এ উভয় ধর্ম্মাবলম্বীগণ কতক পরিমাণে বিকৃত হিন্দু ভাবের পোষক হইয়া উঠিতেছেন।* তদ্ভিন্ন ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম্ম, বৈষ্ণব ধর্ম্ম, শিখধর্ম্ম, নানক ও কবীরপন্থী প্রভৃতি অসংখ্য ধর্ম্ম নিজ নিজ বিশেষত্ব হারাইয়া, হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভূত হইয়াছে। এইরূপ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। এদেশের জলবায়ু হইতে আমরা সমূহ বিপদের আশঙ্কা দেখিতেছি।

ব্রাহ্মধর্ম্মও কতকগুলি বিশেষত্ব লইয়া ভগবানের নাম জয়যুক্ত করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই অর্দ্ধ শতাব্দী মাত্র ইহা নিজ জীবন ক্ষেত্রে অবতীর্ণ। হিন্দু ধর্ম্মের কবল প্রসারিত, গ্রাস করিবার জন্য সদাই সচেষ্ট। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্ম যে সহজে কুক্ষিগত হইয়াছে, এ ধর্ম্মে সে সুবিধা খাটিতেছে না। অন্যান্য ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে এক এক জন মহাপুরুষ (অভ্রান্ত গুরু?) এবং এক একখানী শাস্ত্র (অভ্রান্ত) ছিল। সেই মহাপুরুষকে অবতার এবং তাঁহার প্রণীত শাস্ত্রকে হিন্দুশাস্ত্র স্বীকার করিলেই, সেই সেই ধর্ম্ম হিন্দুর ধর্ম্ম হইয়া যাইত। এইরূপে কবলিত করিয়া সেই সকল ধর্ম্মকে বিশেষত্ব হইতে বঞ্চিত এবং নিজের ভাবে গঠিত করিয়া লওয়া হইয়াছে। কি অপূর্ব্ব কৌশল জাল? ইহা ভেদ করে কাহার সাধ্য? বুদ্ধ অবতার হইলেন, ললিত বিস্তার হিন্দুশাস্ত্র মধ্যে স্থান পাইলেন। কিন্তু নিষ্কাম ও অহিংসার ভাব হিন্দু সমাজে স্থান পাইল না। চৈতন্য অবতার হইলেন, বৈষ্ণবগণ হিন্দু ধর্ম্মের কলেবর পুষ্ট করিলেন কিন্তু "সর্ব্ব জীবে সাম্যভাব, উদার বিশ্বপ্রেম" তথায় স্থান পাইল না; জাতিভেদ রহিয়া গেল, স্ত্রীজাতি অনাদৃত রহিলেন। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মধ্যে মধ্যবর্ত্তীতা এবং শাস্ত্রবাদ নাই। তাই কোন মতে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইতেছেন। কিন্তু আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। অতিশয় ভয়জনক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইয়াছে। হিন্দু সমাজ শিথিল হইয়া যাইতেছেন। পূর্ব্বের ন্যায় অত্যাচার আর নাই। বুকের উপর ব্রাহ্ম সমাজ চাপিয়া বসিয়া সংহার করিতে উদ্যত, তথাপি হিন্দু সমাজ বলিতেছেন— "ওরা হিন্দু ধর্ম্মেরই সার লইয়াছে; হিন্দু হতে ওরা দূরে নয়।" আগে ব্রাহ্মের নামে যে স্থান উত্তেজিত হইয়া উঠিত, এখন ব্রাহ্মকে লইয়া সেখানে আনন্দে আহার বিহার চলিতেছে। দুঃখের বিষয় অনেক ব্রাহ্ম এ কুহকের হাত এড়াইতে পারিতেছেন না। তাই কেহ কেহ "জাতীয়তার" কথা তুলিতেছেন, কেহ বা আমরা হিন্দুভাব ছাড়িতে পারি না, জাতীয়ভাব ছাড়িলে সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী ইত্যাদি" কথা বলিতেছেন। আরো কত অন্যায্য কথা শুনা যাইতেছে।

ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ৩টী বিশেষত্ব লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ১। ঈশ্বরের পিতৃত্ব সুতরাং সকল প্রাণীর প্রতি সাম্য ভাব। ২। স্থান ও ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে প্রত্যক্ষ উপাসনা। ৩। সার্ব্বভৌমিক উদারতা। ইহার একটী হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মকে বঞ্চিত কর ইহার পতন নিশ্চয়। অনেক স্থলে এই বিশেষত্বকে মলিন দেখিয়া আমরা ব্যথিত হইতেছি।

প্রথমতঃ, হিন্দুভাব লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিষদের উপাসনা প্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস হিন্দুশাস্ত্র হইতেই গ্রহণ করা হয়। ভক্তিভাজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কেবল মাত্র উপনিষদাদি হিন্দুশাস্ত্র হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্র বলিলে নির্দ্দিষ্ট কোন বস্তু বুঝা যায় না,—ন্যায়, অন্যায়, সৎ, অসৎ, নীতি, দুর্নীতি, আস্তি-

* কৃতবিদ্য খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীকে বাল্যবিবাহ এবং জাতিভেদের সমর্থন করিতে দেখিয়াছি। "জাতীয়তার" কথা অনেক স্থানে শুনিয়াছি। পল্লীস্থ অনেক মুসলমান হিন্দুর দেবতা পর্য্যন্ত মানিয়া থাকে।

কতা, নাস্তিকতা, সকলই এখানে মিলিবে। সুতরাং ইহার ভিতর হইতে ভাল জিনিস বাহির করা অসম্ভব কেন হইবে? ভক্তিভাজন মহর্ষি মহাশয়ের সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ ভাব কিছুই প্রকাশ পায় নাই। তৎপরে মহাত্মা কেশবচন্দ্র ইহার মধ্যে সার্ব্বভৌমিক ভাব প্রবেশ করাইতে সচেষ্ট হন। এই সময়ে নানা দেশীয় ও নানা সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে সংগ্রহপূর্ব্বক শ্লোক-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়—ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহা এক নূতন বিষয়। এই সময় দেশীয় এবং পাশ্চাত্য ভাবের সংমিশ্রণ দ্বারা দেশের প্রকৃত উপকার হয় এবং তাঁহারই বলে ব্রাহ্মসমাজ সমাজ রূপে পরিণত হয়। ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ ছিল বলিলে ভুল করা হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে হিন্দুত্বের এত প্রভুত্ব, ধর্ম্মের বাহ্য আবরণ ও ক্রিয়া কলাপের এমনি মোহিনী শক্তি, জাতি-ভেদ, গুরু-বাদ প্রভৃতির এমনি দৃঢ় বন্ধন যে, কিছু দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহাকেও (কেশবচন্দ্র) পশ্চাৎপদ হইতে হইল, এমন কি তিনি ঐ সকলের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। যাগ যজ্ঞ, নৃত্য নাটক আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মসমাজ আরো অগ্রসর হইলেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হইল। কিছু দিন প্রতিবাদের ভাবে একটা জীবনী শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু হায় দেশীয় বিকৃত জল বায়ু ভগবানের এই ক্ষুদ্র শিশুর জীবনী শক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া তুলিতেছে! ইহার মধ্যে কুৎসিত জাতি-ভেদ দিন দিন অধিকার পাইতেছে। যাঁহারা এক সময় নিজে অসবর্ণ বিবাহ করিয়াছেন, বহু দিন ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া জাতি-ভেদ গুরুবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সমর-ঘোষণা করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার নিজ নিজ পুত্র কন্যাগণের বিবাহের সময় স্বজাতীয় পাত্র পাত্রী অনুসন্ধান করিয়া থাকেন; সভা করিয়া জাতিভেদের পক্ষ সমর্থন করেন, হিন্দুসমাজের নীচ জাতীয় ব্রাহ্ম বন্ধুকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন। বস্তুতঃ জাতিভেদের এতই প্রভুত্ব দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম এবং প্রধান বিশেষত্ব "ভগবানের পিতৃত্ব" শীঘ্রই লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমাদের শিরায় শিরায় জাতিভেদ অনুপ্রবিষ্ট। আমাদের উপাসনায় জাতিভেদ,একজন পুরোহিত—এক জন উপাসক; আমাদের উপাসনালয়ে জাতিভেদ—আচার্য্য,বেদী,বসিবার জন্য বিশেষ আসন, সাধারণ আসন; আমাদের নামে জাতিভেদ—একজন "ভট্টাচার্য্য," এক জন "দাস," আমাদের ভাষায় জাতিভেদ—কেবলই সংস্কৃত শ্লোকের ছড়াছড়ি; আমাদের সামাজিক ব্যাপারে জাতিভেদ—ধনীর সম্মান কত? ব্রাহ্মধর্ম্মে সার্ব্বভৌমিকতার পরিবর্ত্তে জাতীয়তার রাজত্ব, প্রভুত্ব।

বাহিরের আড়ম্বর ও ক্রিয়া কলাপে ধর্ম্ম হয় না। ধর্ম্ম সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যাপার। এই আধ্যাত্মিক উপাসনা প্রচার ব্রাহ্মধর্ম্মের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। এ বিশেষত্বও দিন দিন উজ্জ্বল হইতে পারিতেছে না। সংসারের কায কর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াই ভগবানকে লইয়া কৃতার্থ হওয়া যায়—ইহা আমরা মুখে স্বীকার করিলেও আমাদের জীবনে এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারিতেছি না। সে জন্য আমাদের যত্নের শিথিলতাও দেখা যাইতেছে। আমরা অনুষ্ঠানের পর অনুষ্ঠান বাড়াইতেছি। নূতন নূতন অনুষ্ঠানের জন্ম হইতেছে। পুরোহিত ডাকিয়া সে দিন "হাতে খড়ি" ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। কেহ স্বাধীন ইচ্ছার বলে কোন বিশেষ অনুষ্ঠান করিলে আমাদের কিছুই বলিবার ছিল না—আমাদের পত্রিকা সাধারণকে সেই ক্রিয়া অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন বলিয়া ইহার উল্লেখ করিলাম। ভগবানকে প্রাণ দিতে, তাঁহাকে সকলের উপরে স্থান দিতে এবং এক মাত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া পবিত্র থাকিতে আমাদের আগ্রহ কিছু বাড়িবে না কি—দিন দিন বাহিরের আড়ম্বর বাড়িতেছে! দয়াময় সহায় হউন। তাঁহার ধর্ম্মকে তিনিই রক্ষা করুন।

তৃতীয়, ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের ধর্ম্ম নহে। হিন্দুভাব প্রধান ব্যক্তিগণ উদার অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুভাব-প্রধান করিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না, বিলাতে কিম্বা আফগানিস্থানে যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে, ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবে, দলে দলে নরনারী ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখন "জাতীয়তা রক্ষা" "হিন্দুভাব রক্ষা" কোথায় থাকিবে। তুমি কি ভাবিতেছ, এই জীবন্ত ধর্ম্ম ভারতের জাতীয়তার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবার জন্য ভগবান পাঠাইয়াছেন? সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্রাহ্মসমাজাশ্রিত ইংরেজ ভাই ভগ্নীগণের মুখে সে দিন উপনিষদের "সত্যংজ্ঞানমনন্তম্" শ্লোক শুনিয়া বস্তুতই কেমন কষ্ট বোধ হইয়াছিল। আবার ভাষা বিশেষের শ্লোক বিশেষের অযথা আদর। ইহাকেই বলে, রক্ষণশীলতা। উপরোক্ত উপাসকমণ্ডলীর খৃষ্টসমাজের অনুকরণে পুনঃপুনঃ উঠা বসাও গর্হিত বোধ হইল। ঠিক ভাবে ব্রহ্মে আত্মসমর্পণের ভাব সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। আমরা সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতার এবং রক্ষণশীলতার প্রতিবাদ করি। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মনাম, হরিনাম, আল্লানাম, গডের নাম ব্যবহৃত হউক। বেদ, বাইবেল, কোরানকে সমদৃষ্টিতে দেখা হউক। ব্রাহ্মের সঙ্গীত, উপাসনায়, উপদেশে একদেশদর্শিতা স্থান না পায় আমাদের প্রার্থনা। আমরা আরো প্রার্থনা করি,—উপাসকের প্রাণের ভাবে উপাসনা হওয়া কর্ত্তব্য। প্রণালীবদ্ধ উপাসনা দ্বারা অনেক সময়ে সত্য স্বরূপের উপাসনার অভিনয় হইয়া যায়। বাহিরের "প্রণালী" চলিয়া যাউক—উপাসনার প্রাণ "ভাবের" আদর হউক।

হিন্দুভাব প্রাধান্যের জন্য ব্রাহ্মসমাজের কত বিপদ আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমরা আরো দু একটী কথা বলিয়া নীরব হইব। ইহাদের প্রত্যেকটী এতই গুরুতর যে, ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের জীবন মরণ সম্বন্ধ। ১। হিন্দু ভাব প্রবলতা লক্ষিত বা অলক্ষিত ভাবে "গুরুবাদ" আনয়ন করিয়াছে। ২। হিন্দুভাব প্রবলতা "জাতিভেদ" প্রথাকে ব্রাহ্মসমাজে প্রশ্রয় দিতে ষড়যন্ত্র করিতেছে। অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নামক স্বমত বিরোধী এক দলকে ব্রাহ্মসমাজে চালাইবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছে। ৩। হিন্দুভাব প্রবলতা spirit ছাড়িয়া form এর দিকে—আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। ৪। হিন্দুভাব প্রবলতা আমাদিগকে সঙ্কীর্ণ ও অনুদার করিয়া তুলিতেছে। ৫। হিন্দুধর্ম্ম প্রবলতা নিরাকার সত্য স্বরূপকে হস্ত, পদ, প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদিতে ভূষিত করিয়া ফুল দুর্ব্বাদলাদি দ্বারা পূজা

ও তাঁহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া সমর্থন করিতেছে। ব্রাহ্মের সঙ্গীত, সাহিত্য, পৌত্তলিক ভাবের ভাষায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুধর্মে কিছুই ভাল নাই আমরা এরূপ গর্হিত কথা বলিতেছি না। সত্য সর্ব্বত্রই আছে। হিন্দু-যোগীর গভীর মগ্ন ভাব—ব্রহ্মযোগের আদর্শ। তবে তাঁহারা ত্যাগী, ব্রাহ্ম কর্ম্ম-যোগী।

শেষ কথা,—আমরা ধর্ম্মের উপর সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাই, সমাজের উপর ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। সমাজের ভিত্তি ধর্ম্ম, ধর্ম্মের ভিত্তি সমাজ নহে। বিবেকের আদেশ, ন্যায়ের ইঙ্গিতে চলিতে চলিতে যে কয়েকটী ভাই ভগ্নী পাইব, তাহাদের দ্বারা একটী সমাজ হইবে, তাহাই ব্রাহ্মসমাজ। তর্ক যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়া, লাভালাভ গণনার উপর সর্ব্ব প্রকার সুবিধা এবং স্বার্থের উপর যাহা গড়িয়া উঠিবে, তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। জাতিবিশেষ বা জাতীয় ভাববিশেষ আমাদের লক্ষ্য নহে। আমাদের লক্ষ্য ভগবান্। তিনি পিতা, সকলে ভাই বোন। সব সমান। সকলে প্রাণে প্রাণে এক হইলে তবে পবিত্র সমাজ বন্ধন হইবে। প্রাণের ভাই বোন, আমরা পিতাকে চাহিয়া আসিয়াছি। পিতার প্রতি দৃষ্টি থাকিলে আমাদের ভয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই পবিত্র ইচ্ছাসম্ভূত। আমরা তাঁহার সুসন্তান হইয়া, তাঁহারই আদিষ্ট পথে চলিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করি। পিতা আমাদের সহায় হউন।

নলহাটী ব্রাহ্ম সমাজের একজন সভ্য।

ব্রাহ্মসমাজ।

আমাদের খাসিয়া পর্ব্বতপ্রবাসী বন্ধু নীলমনি চক্রবর্ত্তী মহাশয় চেরাপুঞ্জির সন্নিকটস্থ নঙ্‌জ্রী নামক স্থানে প্রচার কার্য্যে যে ফল লাভ করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ তাঁহার পত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে—

"এখানে ৭ জন ব্রাহ্ম হইলেন। পুরুষ ৩ জন এবং স্ত্রীলোক ৪ জন। স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ইঁহারাই সর্ব্ব প্রথমে এই ধর্ম্মে যোগ দিলেন। একটী পরিবার (বৃদ্ধা মাতা ও দুইটী কন্যা) ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। মাতার একান্ত ইচ্ছা যে কন্যা দুটীকে ভাল করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের কয়েক খানি পুস্তক কিনিয়া দিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা পূর্ব্বেই ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়া ছিলেন এবং সঙ্গীত পুস্তক পাইয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে মাতা ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনেন। মাতা ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সব কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন ভবিষ্যতে আমার কন্যার বিবাহ যেন এই ধর্ম্ম মতে হয়। এই স্থানের নৈতিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়। স্ত্রী ও পুরুষ অনেকেই মদ খাইয়া থাকে। যাঁহারা আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই পূর্ব্ব হইতে ভাল ছিলেন। একজন অনেক বৎসর পূর্ব্বে আফিমাদি খাইতেন। এখন তাঁর কোনও দোষ নাই, ইঁহারা পূর্ব্বেই ব্রাহ্মধর্ম্মের কোন কোন পুস্তক পাইয়াছিলেন। তখনই ব্রাহ্মধর্ম্ম জানিতে ইচ্ছা হয়। ডিম ভাঙ্গা ইঁহারা অগ্রেই ছাড়িয়াছেন। এখানে অধিক খ্রীষ্টীয়ান নাই। পাদ্রীরা এখানকার কার্য্য হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। তাঁহারাই নিজ সমাজের কায চালাইয়া থাকেন। আমাদের বন্ধুগণ সমাজগৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া স্থির করিবেন। তাঁহারা এজন্য আমাকে তথায় অধিক দিন থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অর্থাভাব ও গ্রীষ্মাতিশয্য বশতঃ থাকিতে পারা গেল না। এই স্থান অতি সুন্দর কার্য্য ক্ষেত্র।

জগন্নাথপুর হইতে একজন বন্ধু লিখিয়াছেন।—

শোক সংবাদ—মাসাধিক কাল হইল, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত বাসাইল নিবাসী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হরিদাস রায় মহাশয় পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। ইনি মানিকদহ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের কায করিতেন। ইনি ৩টী পুত্র ও একটী কন্যার সহিত রুগ্না স্ত্রীকে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক গমনের পর প্রায় দুই সপ্তাহকাল মধ্যেই কন্যাটীও পরলোকে চলিয়া গিয়াছে। এখন ৩টী পুত্র ও স্ত্রী আছেন, ইনি যৌবনকালের প্রথম হইতেই ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়াছিলেন। জীবনের পরীক্ষায় বিশেষরূপে বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন। এবার রোগ শয্যায় ও শেষ অবস্থায় বেশ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন। প্রায় ৭।৮ মাস কাল রোগ যন্ত্রণা পাইয়াছেন,প্রথমাবস্থায় শুশ্রূষার ক্রটী হইলে বিরক্ত হইতেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে অতি শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন; এমনকি লোক নিকটে থাকিলে বিরক্ত হইতেন,সর্ব্বদা ভগবানের নাম করিতেন। এইরূপে নাম করিতে করিতে অতি প্রফুল্লতার সহিত শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন।

গত ২রা আষাঢ় রবিবার তাঁহার শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে তাঁহার স্ত্রী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই নিরাশ্রয় পরিবারের ভার মানিকদহের জমিদার সদাশয় শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনবিহারী রায় মহাশয় লইয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর এই পরলোকগত আত্মাদিগকে শান্তিতে রাখুন এই প্রার্থনা।

শ্রীযুক্তবাবু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় উড়িষ্যা হইতে লিখিয়াছেন,— "মৃত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারিগণের সুবিধার জন্য নেলফামারি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন,তাহা নূতন নহে। আমার বিবেচনায় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মাত্রেরই Oriental Life Assurance কোম্পানির এজেণ্ট হইয়া ব্রাহ্মদিগকে জীবনবীমা করিতে প্রবৃত্ত করা উচিত। কলিকাতার শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন দাস মহাশয় প্রধান এজেণ্ট আছেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে পোনের আনা লোক চাকুরি করিয়া থাকেন। এইরূপ চাকুরিই যাঁহাদের অবলম্বন তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জীবনবীমা করা উচিত।"

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়—এই শিক্ষালয়টীর বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। আমরা সুখের সহিত সংবাদ দিতেছি

যে, ইহার শিক্ষাকার্য্যের সাহায্যের জন্য নূতন দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে শিক্ষা কার্য্যের ভার যাঁহাদের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের নাম;—শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বি, এ; শ্রীযুক্ত বাবু নকুড়চন্দ্র ঘোষ বি, এ; শ্রীযুক্ত বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমারী শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু, কুমারী শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র বসু।

স্কুলের কমিটী আপাততঃ যে নিয়মগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এই—

১। এই শিক্ষালয়ে ৯ নয় বৎসরের বালকেরা বালিকাদের সহিত পড়িতে পারিবে।

২। স্কুলে ভর্ত্তি হইবার ফিস ১৲ এক টাকা, শিশুশ্রেণীর মাসিক বেতন ১৲ এক টাকা; অপরাপর শ্রেণীর ২৲ দুই টাকা। শিশুশ্রেণীর যে সকল বালক বালিকা স্কুলের গাড়ীতে আসিবে, তাহাদিগকে অপরদিগের ন্যায় মাসে ২৲ দুই টাকাই দিতে হইবে।

৩। প্রত্যেক মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে সে মাসের বেতন দিতে হইবে। বিলম্ব হইলে প্রতিদিন এক আনার হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে। মাসকাবার হইলে নাম কাটা যাইবে।

৪। প্রতি বৃহস্পতিবার ও রবিবার স্কুল বন্ধ থাকিবে। বৃহস্পতিবার গৃহপাঠ্য পুস্তক সকলের পড়া ও অঙ্ক প্রভৃতি দেওয়া হইবে।

৫। স্কুলের কার্য্য ১১টার সময় আরম্ভ হইয়া ৪টা পর্য্যন্ত চলিবে, মধ্যে এক কোয়াটার জলখাবারের ছুটী হইবে।

৬। শিশুদের শ্রেণীর কার্য্য তিন ঘণ্টান্তেই অর্থাৎ ২টার সময়েই শেষ হইবে।

যাঁহারা গাড়ীতে সন্তানদিগকে প্রেরণ করিতে চান, তাঁহারা সংবাদ দিলেই তাঁহাদের সন্তানদের জন্য গাড়ী প্রেরিত হইবে।

বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত পাঠ্যগ্রন্থ সকল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

COURSES OF STUDY FOR THE CURRENT SESSION.

INFANT CLASS.

Bengali—প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠ, Handwriting.
Arith—Counting up to hundred, and easy numeration.
Lessons on common things. Games and Singing.

1ST STANDARD.

Bengali—কথামালা, কবিতামালা—১ম ভাগ। Handwriting and Dictation.
Arith—Up to multiplication. Tables 10 × 10.
Lessons on common things, games and singing.
Religious and Moral—Oral.

2ND STANDARD.

Bengali—আখ্যানমঞ্জরী—১ম ভাগ, পদ্যপাঠ—১ম ভাগ, Writing of short sentences, Handwriting and Dictation.
Arith—Division, easy tables, thorough revision of the 4 Rules, Mental Arithmetic, Tables 20 × 20.
Lessons on common things (বস্তু পরিচয়)। Singing.
English—Step by Step and Royal Reader No. I.
Riligious and Moral—Biographical anecdotes,—Oral.

3RD STANDARD.

Bengali—আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ, কবিতামালা ২য় ভাগ, ব্যাকরণ প্রবেশিকা, Letter-writing and short composition.
Arith—Compound Addition, Subtraction, Multiplication and Division; Mental arithmetic; Miscellaneous examples; Table 20 × 20.
Geography—General knowledge, from maps and oral lectures, of continents, oceans, seas, bays and countries of Asia, Europe, N. America with the principal rivers, mountains and chief cities.
English—Royal Reader No. III. Translating and speaking short sentences (Oral).
Needle work—
Science—Oral lectures.
Religious and Moral—কুমুদিনী চরিত—বেদিয়া বালিকা।

4TH STANDARD.

Bengali—প্রবন্ধ কুসুম, পদ্যপাঠ ৩য় ভাগ, Bengali essay writing, Home Study (গারফিল্ড চরিত), ব্যাকরণ, জগবন্ধু মোদক প্রণীত।
Arith—G. C. M., L. C. M., Vulgar fractions, Decimals, Rule of three, Mental arithmetic.
Geography—Continued from maps.
History—R. C. Dutt's History of India (Bengali).
English—Royal Reader No. III., Child's Own Grammar, by Sitanath Datta; Handwriting; easy translation and speaking.
Science—Oral lectures.
Religious and Moral—ধর্ম্মশিক্ষা, মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী।
Needle-work and Singing.

5TH STANDARD.

Bengali—সাহিত্য শিক্ষা, পুষ্পমালা, Essay-writing, জগবন্ধু মোদকের ব্যাকরণ; Home-study—রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত and ভগিনী ডোরা।
Arith—Practice, Square and Cubic measures, Double rule of Three, Simple interest. Euclid—I. 26.
Geography—ভূগোল বিবরণ
History—পুরাবৃত্তসার (Greece, Rome and ancient history).
English—Longman's No. IV., Lennie's Grammar, Easy composition and translation.
Science—Oral lectures.
Religious and Moral—ধর্ম্মশিক্ষা, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।
Needle-work and Singing.

আর একটী সুখের সংবাদ আমাদের একজন বন্ধু শিক্ষালয়ের জন্য একখানি ওমনিবস গাড়ী দান করিয়াছেন; ত্বরায় যাহাতে ঘোড়ার বন্দোবস্ত হইতে পারে এরূপ চেষ্টা হইতেছে। যতদিন না ওমনিবসের বন্দোবস্ত হয়, ততদিন ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বালক বালিকাদিগকে আনা হইবে।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৯এ জুলাই অপরাহ্ণ ৭½ ঘটিকার সময় ১৩ নং মৃজাপুরষ্ট্রীটস্থ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। সভ্যগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

বিবেচ্য বিষয়।

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃক নিয়মাবলীর যে রূপ সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল এবং ১লা ও ১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্ব-কৌমুদীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অষ্টম নিয়ম হইতে) সংশোধন সম্বন্ধে বিচার।

২। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট
২৮এ জুন ১৮৯০।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেস শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৬ই আষাঢ় মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১৭ই আষাঢ় প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ববিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
৭ম সংখ্যা।

১লা শ্রাবণ বুধবার, ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

ধর্ম্ম-যুদ্ধ।

ছিনু শুয়ে আলস্যের বিশ্রাম শয্যাতে
বিষয়ের সুখের স্বপনে;
ভেরীর আওয়াজ হলো, আর সে নিদ্রাতে
রহিবারে নারিনু শয়নে।

সাজিয়া বাহির হয়ে দেখি সৈন্য দল
সাজিয়াছে, উড়ায়ে কেতন;
করি ব্রহ্ম-জয়ধ্বনি চলেছে তাহারা,
পাপ দুর্গ হবে আক্রমণ!

এ কি লীলা বিধাতার! এ কি সৈন্যদল!
রুগ্ন ভগ্ন জীর্ণ শীর্ণ সবে;
পঙ্গু না চলিতে পারে, সেও দেখি হায়,
মাতিয়াছে সেই মহোৎসবে!

পাহাড় সমান দুর্গ দাঁড়ায়ে অদূরে
দৃঢ়বদ্ধ পাষাণ-প্রাচীর;
এই সেনা, ওই দুর্গ, কৌতুকের কথা,
দেখে হলো নিরাশা গভীর!

বিষাদে ডুবিছে মন; পুন ভেরী ধ্বনি!
সাজ সাজ অবিরত ডাকে;
ত্বরাতে সাজিনু তাই, ছুটিনু উদ্দেশে,
হয় হবে যাহা ভাগ্যে থাকে।

সেই ক্ষুদ্র সৈন্যদল চলিল নির্ভয়ে
ব্রহ্ম-জয়ধ্বনি করি ধায়;
বিধির বিচিত্র লীলা, তাদের আঘাতে
সে পাষাণ ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।

প্রভু হে! এ রণে নিজে তুমি সেনাপতি;
তব বলে বলী যেই জন,
ডরে না সে এ সংগ্রামে,সে জন জানে না,
অবসাদ, নিরাশা কেমন!

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ভিজা খড়—একজন ইংরাজ ধর্ম্মাচার্য্য একদিন তাঁহার উপদেশের মধ্যে একটী সুন্দর কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"দেখ, অগ্নির স্বভাবই এই যে তৃণকে দগ্ধ করে। তৃণের সহিত অগ্নির যোগ হইলেই তাহা দগ্ধ হইবেই হইবে। সেইরূপ ব্রহ্মাগ্নিরও স্বভাব এই যে তাহা মানব হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করে, তাহাকে অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু তৃণের সহিত অগ্নির দাহ্য দাহক সম্বন্ধ থাকিলেও, খড় যদি ভিজা খড় হয় তাহা হইলে সেই অগ্নি আপনার শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না; ভিজা খড়ে অগ্নি দিয়া, ফুৎকারের উপর ফুৎকার দেও, তুমি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবে, ধূমে ধূমে দুই চক্ষু ফুলিয়া যাইবে, সে ভিজা খড় জ্বলিবে না। সেইরূপ স্বার্থপতার রসে যে প্রকৃতি সিক্ত, তাহাতেও ফুৎকার পাড়িয়া ব্রহ্মাগ্নি উদ্দীপ্ত করা যায় না। অগ্নি বাণ বর্ষণের ন্যায় জ্বলন্ত বাক্য সকল উদ্গীরণ কর, ভিজা খড়ে লাগিয়া সে বাক্যের অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া যায়।" আমরা দেখিতেছি ভিজা খড়ে ব্রাহ্মসমাজের অগ্নি ভাল করিয়া লাগিতে পারিতেছে না। উপদেশের যে কিছু অপ্রতুল আছে এরূপ বোধ হয় না। "বৈরাগ্য", "স্বার্থত্যাগ", "স্বার্থনাশ", "ত্যাগস্বীকার", "ঈশ্বরকে সর্ব্বস্ব সমর্পণ", প্রভৃতি বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজে বহু উপদেশ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অতি উচ্চ উচ্চ কথা ব্রাহ্মদিগের মুখে শ্রবণ করা গিয়াছে; কিন্তু এত উপদেশের পরেও দেখিতেছি যে ভিজা খড়ে ধোঁয়াই হইতেছে, আগুণ জ্বলিতেছে না।

উপদেশ ও দৃষ্টান্ত—এত উপদেশেও লোক জাগিতেছে না কেন? স্বার্থের শৃঙ্খল ছিঁড়িতে পারিতেছে না কেন? কারণ বোধ হয় এই, চিত্তের উন্মাদকারী আদর্শ ব্রাহ্ম-চরিত্র অদ্যাপি বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মান্ধ য়িহুদীগণ যীশুকে ধরিয়া প্রহার ও অপমান করিয়া কণ্টকের মুকুট পরাইয়া দিয়া, অবশেষে দারুণ যন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া যীশুর শিষ্যগণ সেই কণ্টক-

মুকুট-শোভিত ও রুধিরাক্ত যীশুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করি-তেছে এবং হৃদয়ের আবেগে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিতেছে। এ কি সাধারণ দৃষ্টান্ত!! যীশুর শিষ্যগণ ভাবিয়া থাকেন—"যিনি পৃথিবীর ত্রাণকর্ত্তা তিনি যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদনের জন্য কণ্টকের মুকুট মস্তকে পরিলেন ও লোক-হস্তে নিগ্রহ সহ্য করিলেন, তখন আমি অধম পাতকী, আমি কি ধর্ম্মের জন্য সামান্য একটু ক্লেশ সহ্য করিতে কাতর হইব?" তাঁহারা যতই এরূপ চিন্তা সহকারে যীশুর ক্রুশাবদ্ধ মূর্ত্তি অনুধ্যান করিতে থাকেন, ততই তাঁহাদের চিত্তে এক নব আকাঙ্ক্ষা ও নব শক্তির আবির্ভাব হইতে থাকে। ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিদিগের জীবনে জলন্ত স্বার্থনাশের ভাব সে পরিমাণে প্রকাশিত হয় নাই; সেই জন্যই ব্রাহ্মদিগের মন মাতিয়া উঠি-তেছে না। দৃষ্টান্তবিহীন উপদেশ কার্য্যকর হইতেছে না। ব্রাহ্মদিগের স্বার্থপরতা দেখিয়া যাঁহারা শোক করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জীবনে যদি স্বার্থনাশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন তাহা হইলে ভিজা খড় গুলি শুকাইবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। একজন এই বলিয়া সর্ব্বদা শোক করিতেছেন—হায় হায়! ব্রাহ্মসমাজের জন্য কেহ খাটিতে চায় না; তিনি একবার কেন এই কথা বলুন না—"ভাল অন্যে না খাটে আমি ত খাটি। যে সময় বৃথা শোকে যাইতেছে তাহা আমি ঈশ্বর-সেবায়, ব্রাহ্মসমাজের সেবায়, নিয়োগ করিব।" যদি আমরা প্রত্যেকেই এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে পারি তাহা হইলে ব্রহ্মশক্তি জাগিবার পক্ষে কিঞ্চিৎ সাহায্য হইতে পারে। মানবের স্বভাবই এই যে নিঃস্বার্থতার চিন্তনে চিত্ত সমুন্নত হয়, নিজের স্বার্থ-প্রবৃত্তি দমন হয়, মলিন বাসনা সকল সংযত হয়। সুতরাং যে সমাজে একজন প্রকৃত নিঃস্বার্থ ভাবে কার্য্য করে সে সমাজে অপর দশ জনের চিত্তে সেই নিঃস্বার্থতার অগ্নি সংক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহা আধ্যাত্মিক নিয়ম। এস তুমি আমি দশ জনে স্বার্থনাশ-ব্রত সাধন করিতে আরম্ভ করি—দেখিবে কালে ভিজা খড় শুকাইয়া তাহাতে আগুণ লাগিতে আরম্ভ হইবে। স্বার্থনাশ-ব্রত কিরূপে সাধন করা যায়?—নিজের যে কার্য্যে স্বার্থপরতার গন্ধ পাইবে তাহা হইতে বিরত হইবে; এবং যে কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণজনক মনে করিবে তাহাতে আপনাকে সমর্পণ করিবে। এই একটা মূল নিয়ম থাকিলে ও তদনুসারে কার্য্য করিলে অনেক সময়ে অনেক উপকার দর্শিতে পারে।

যেখানে প্রত্যাশা সেই খানে নিরাশা—এরূপ অনেক রমণী ব্রাহ্মসমাজে বিবাহিতা হইয়া এখন সংসার ধর্ম্ম করিতেছেন, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের নিকটে বিশেষ ঋণী। তাঁহাদের অনেকে হয়ত এক সময়ে হিন্দু-সমাজের কঠোর শাসনের মধ্যে বাস করিয়া বৈধব্য দুঃখ ভোগ করিতেছিলেন, কেহ হয়ত সমাজ হইতে তাড়িত ও নিরাশ্রয় অবস্থাতে পড়িয়া-ছিলেন, কেহ হয়ত কৌলীন্যের দারুণ নিয়মে বহু বিবাহকারী পতির সহিত পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইতে যাইতেছিলেন; এমন সময়ে ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের দুঃখে দুঃখী হইয়া নিজেরা নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। কোন কোন বালিকাকে উদ্ধার করিতে গিয়া অনেকের প্রাণ সংশয় হই-য়াছে। তৎপরে সেই সকল রমণী ব্রাহ্ম-গৃহস্থদিগের গৃহে কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালিতা হইয়া, শিক্ষা লাভ করিয়া, ব্রাহ্ম পতি লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রসাদে তাঁহাদের অনেকে এক্ষণে সুখ সম্পদের মুখ দেখিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাদের ঘর ধনে জনে সন্তানে পূর্ণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ আমাদের সকলেরই কল্যাণ করিয়াছেন, আমরা সকলেই ব্রাহ্মসমাজের নিকট ঋণী; কিন্তু এই শ্রেণীর রমণীগণ বিশেষ ভাবে ঋণী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে আমরা যদি আশা করি যে এই শ্রেণীর রমণীগণ সুখ সৌভাগ্যের দিনে ব্রাহ্ম-সমাজকে ভুলিবেন না; অপরে যাহাই করুন তাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যে উৎসাহের সহিত যোগ দিতে ত্রুটী করিবেন না, তাহা হইলে কি অন্যায় আশা করা হয়? যে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া ক্রোড়ে প্রতিপালন করিয়াছেন ও সম্পদের পথে তুলিয়া দিয়াছেন, সেই ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্যে তাঁহারাও যদি উৎসাহিত না হন, তবে আর কাহার নিকট উৎসাহ দেখিবার আশা করিব? কিন্তু আমা-দের এরূপ দুর্ভাগ্য, ব্রাহ্মসমাজের এই সকল কন্যাদিগের সক-লের নিকট হইতেও আমরা আশানুরূপ সাহায্য পাইতেছি না। অপর দশ জন স্ত্রীলোক যেমন অর্থ সঞ্চয় ও ভোগ বিলাসের সুখে নিমগ্ন হইয়া থাকে, তাঁহাদের অনেকেও সেইরূপ রহি-য়াছেন। অর্থাভাবে ব্রাহ্মসমাজের অনেক কাজ ভাল রূপে চলিতেছে না, তাঁহাদের অর্থ আছে কিন্তু দিবার প্রবৃত্তি হই-তেছে না; ব্রাহ্মসমাজে কত ভাল কাজের অনুষ্ঠান হইতেছে, তাঁহারা শুনিতেছেন, যোগ দিবার সময় ও সুবিধা আছে অথচ যোগ দিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না; অনেক স্থলে পতিগণের উৎসাহাগ্নি তাঁহাদের দ্বারা উদ্দীপিত না হইয়া নির্ব্বাপিত হই-তেছে। এরূপ কেন হইল? আমরা আশ্রয় দিলাম, স্নেহ দিলাম, গৃহ দিলাম, শিক্ষা দিলাম, ধর্ম্মাগ্নি কেন দিতে পারি-লাম না? ব্রাহ্মপরিবারগুলি ব্রাহ্মসমাজের বলবৃদ্ধি কেন করিতেছেন না? এই সকল চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলেই অনুভব করা যাইবে যে নারীগণের হৃদয়ে ধর্ম্মাগ্নি উদ্দীপ্ত করিতে না পারিলে, ব্রাহ্মবিবাহের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বলবৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে না।

দিবার ইচ্ছা করি কিন্তু পাইবার প্রত্যাশা রাখি না—এক শ্রেণীর ব্রাহ্মের মুখে সর্ব্বদাই কাতরোক্তি শুনিতে পাওয়া যায়। সমাজের লোক আমাকে দেখিল না—আমি পীড়িত হইয়া পড়িয়া রহিলাম, সংবাদ লইল না, আমি দারি-দ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতেছি সংবাদ লইল না; আমি বিপদে পড়িয়া সাহায্য চাহিলাম সাহায্য করিল না; এরূপ হৃদয়-বিহীন সমাজে থাকা অপেক্ষা বনে থাকা ভাল। ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রাহ্মেরা যে এ দোষে দোষী নহেন তাহা বলিতেছি না। এ সকল ত্রুটী আমাদের প্রতিদিন ঘটিতেছে। কিন্তু অনুযোগকর্ত্তাদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা নিজে কি অপরের

প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে কোন ত্রুটী করেন না? অমুক আমাকে দেখিল না, অমুক আমাকে সাহায্য করিল না, বলিয়া যত দুঃখ করিয়া থাকেন, আমি অমুককে দেখিলাম না, আমি অমুককে সাহায্য করিলাম না, বলিয়া তত দুঃখ করেন কি না? ফলতঃ দেখিতে পাই, মানুষ অপরের নিকট পাইবার জন্য যত ইচ্ছুক অপরকে দিতে তত ইচ্ছুক নহে। আমি দিবার ইচ্ছা করি কিন্তু পাইবার প্রত্যাশা রাখি না, ইহা যিনি বলিতে পারেন, এবং তদনুসারে চলিতে পারেন, তিনিই, ধর্ম্মের মর্ম্ম জানিয়াছেন। প্রকৃত সাধুতা নিরপেক্ষ সাধুতা। অপরের ব্যবহার সাধুই হউক আর অসাধুই হউক, প্রকৃত ধার্ম্মিকের ব্যবহার চিরদিন সাধুতা-সঙ্গত। ঈশ্বরের মঙ্গল ভাব যেমন মানবের দুর্ব্বলতা ও পাপ তাপ দেখিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ প্রকৃত ধার্ম্মিকের চিত্তও অপরের ত্রুটী দেখিয়া পরাজিত হয় না।

কোন্ অস্ত্রে ব্রাহ্মসমাজ যুদ্ধ করিবেন?—আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি এ দেশের বহুশতাব্দীর সঞ্চিত কুসংস্কার দুর্নীতি ও পাপরাশির সহিত ব্রাহ্মসমাজ যুদ্ধ করিবেন ও সেই যুদ্ধে পাপ দুর্নীতিকে পরাস্ত করিয়া তদুপরি ব্রহ্মের বিজয়-নিশান উড্ডীন করিবেন। কিন্তু যুদ্ধ করিতে গেলেই অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োজন। এ যুদ্ধে অস্ত্র কি? কোন্ বলের দ্বারা শত্রুকুলকে পরাভব করিবেন? যদি বল বুদ্ধি বিদ্যার বল। বুদ্ধি বিদ্যা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ এ পথে আসিবেন কেন? জগদীশ্বর যাঁহাদিগকে প্রতিভাশালী করিয়াছেন, তাঁহারা সেই প্রতিভার ক্ষেত্র অন্বেষণ করিবেন; যেখানে তন্নিবন্ধন যশস্বী বা ধনী হইবার সম্ভাবনা সেই দিকেই তাঁহাদের গতি হইবে। ব্রাহ্মসমাজে আসিলে না লোকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যাইবে, না ধনমানের কোন সম্ভাবনা আছে, সুতরাং এ দিকে তাঁহাদের গতি হইবে না। যদি বল ধনবলের দ্বারা জয়লাভ করিবে; তাহাও সম্ভব নহে। যাঁহাদের ধন আছে, যথেচ্ছাচারের দ্বার যাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাঁহারা কেন ব্রাহ্মসমাজে পদার্পণ করিয়া আপনাদের যথেচ্ছাচারের পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন? যদি বল লোক বল—সে বল কোথায়? এই প্রকাণ্ড ভারত মহাসমুদ্রে ব্রাহ্মসমাজ একটী বুদবুদের ন্যায় ভাসিতেছে। এই মুষ্টিমেয় লোক কিরূপে কুসংস্কার ও পাপের দুর্গকে পরাজয় করিবে? সে কি অস্ত্র, যাহার উপরে ব্রাহ্মগণ আশা ভরসা স্থাপন করিতেছেন? যদি বলেন খৃষ্টধর্ম্ম ও ত প্রারম্ভে অতি সামান্ত বেশে ও ক্ষুদ্রাকারে সমুদিত হইয়াছিল; সর্ব্বাগ্রে জুডিয়া দেশের কতিপয় অশিক্ষিত দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন নরনারীর দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, সেই খৃষ্টধর্ম্ম কালে গ্রীসের সভ্যতা, ও রোমের রাজশক্তিকে পরাভব করিল। তাহা যথার্থ। যীশু যখন শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন, যখন জেরুশালেম নগরের এক দ্বিতল গৃহে তাঁহার শিষ্যগণ সমবেত হইয়া শোক করিতে লাগিলেন; তখন তাহাদের সংখ্যা ১২০ একশত বিশের অধিক ছিল না। এই ১২০ জন দরিদ্র লোক, এমন একটা কিছু শক্তি পাইয়াছিল যাহাতে কালে সমস্ত জগতের চিন্তা ও রীতি নীতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল। সে শক্তি কি শক্তি এবং সে অস্ত্র কি অস্ত্র? ইহার উত্তর অতি সংক্ষিপ্ত—তাহা বিশ্বাস অস্ত্র। সে সময়কার লোক আদিম খৃষ্টানদিগকে অজ্ঞ, বাতুল, ধর্ম্মান্ধ প্রভৃতি নানা কটূক্তি করিত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত; কিন্তু সেই সকল দরিদ্র লোকের আর কোন বল থাকুক না থাকুক,—বিশ্বাস-বল ছিল। তাঁহারা তাঁহাদের গুরুর প্রত্যেক উপদেশের উপরে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি যে সমস্ত সত্যকে স্বর্গরাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন সে সমুদায়কে সমগ্র হৃদয়ের সহিত অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং সে প্রেমাগ্নিতে আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব আহুতি দিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস বলের নিকটে সমুদায় বল চূর্ণ হইয়াছিল। যীশু বলিয়াছিলেন—বিশ্বাসের বলে পাহাড় অন্তরিত হইবে। কার্য্যেও তাহাই ফলিল। পর্ব্বত সমান বহুদিনের সঞ্চিত কুসংস্কার ও পাপরাশি সেই বলের নিকট পরাভূত হইল। ব্রাহ্মসমাজকেও ঐ বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতার অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত থাকিতে হইবে। ব্রাহ্মেরা প্রেমের অনলে আত্ম-সমর্পণ না করিলে, তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মশক্তি জাগিবে না। তুমি আমি স্বার্থের পুঁটুলি বাঁধিব, ঈশ্বরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারিব না, অথচ আমাদের বাক্যের দ্বারা জগত তরিয়া যাইবে। বাক্যে এতদূর যাহারা বিশ্বাস করে তাহারা ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের বিশ্বাস ও নিঃস্বার্থতার অস্ত্রটা ধারাল নহে; তদ্দ্বারা নিজেদেরই আসক্তি-পাশ ভাল করিয়া ছেদন করিতে পারিতেছি না; অপরের আসক্তি-পাশ কিরূপে ছেদন করিব। এরূপ অস্ত্রে যুদ্ধ কিরূপে চলিবে বুঝিতে পারি না; তবে বিধাতার কৃপার অসাধ্য কিছুই নাই।

ঈশ্বর পরিত্রাতা—হিন্দুধর্ম্ম দীনজনকে দয়া করিবার জন্য অনেক উপদেশ দিয়াছেন। তাহার প্রকৃষ্ট ফলও ফলিয়াছে। দরিদ্রকে অর্থদান, ক্ষুধিতকে অন্নদান, শ্রান্তকে ছায়া দান, তৃষ্ণার্ত্তকে জল দান, গৃহস্থ হিন্দুদিগের প্রধান ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে। এ দেশের ধনশালী ব্যক্তিগণ, কত অন্নছত্র, কত জল ছত্র, কত পান্থশালা, কত দীর্ঘিকা, কত স্নানের ঘাট প্রভৃতি করিয়া দিয়াছেন; সে সমুদায় অদ্যাপি ভারতীয় হিন্দুগণের দয়ার নিদর্শনরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে দীনের প্রতি দয়া করিবার উপদেশ যে পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, পাপীর প্রতি দয়া করিবার উপদেশ সে পরিমাণে পাওয়া যায় না। ভগবদ্গীতাতে আছে—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

অর্থ—শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন, "আমি সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত এবং পাপিদিগের বিনাশার্থ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।" শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন—এই দুইটীই ভগবানের অবতারত্ব গ্রহণ করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে পাপীর প্রতি করুণার প্রকাশ নাই। পাপীর উচ্ছেদ-সাধনই প্রধান উদ্দেশ্য। হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত ভাবও এই। নরসিংহঅবতারে হিরণ্য-কশি-

পুর বিনাশ; রামাবতারে রাবণবধ; কৃষ্ণ অবতারে কংস বিনাশ; এইরূপ সকল অবতারেই পাপীর বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্ট ধর্ম্মের ভাব ঠিক ইহার বিপরীত। যীশু সর্ব্বদাই বলিতেন যে পাপীগণের উদ্ধারের জন্যই তাঁহার জন্ম। নানা প্রকার দৃষ্টান্তের দ্বারা তিনি এই সত্য বিশদ করিবার চেষ্টা করিতেন। তন্মধ্যে একটী দৃষ্টান্ত এই,—"মনে কর একজন মেষপালক এক শতটী মেষ চরাইয়া ফিরিয়া আসিতেছে, পথে দেখিতে পাইল যে, একটী মেষ নাই, দল ছাড়া হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া আছে। তখন সে কি করে? সে কি সেই ৯৯টী মেষ পথে দণ্ডায়মান রাখিয়া সেই একটী হারান মেষের অনুসন্ধানে ধাবিত হয় না? পথভ্রান্ত মেষটীকে যখন পায়, তখন কি আগ্রহের সহিত তাহাকে বুকে করিয়া আনে না?" এই দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেন, ঈশ্বর পাপীর উদ্ধারের জন্য এইরূপ ব্যগ্র। ৯৯টী সাধুকে পথে দণ্ডায়মান রাখিয়া তিনি একটী পাপীকে অন্বেষণ করিতে যান। ঈশ্বর পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য অন্বেষণ করেন, খ্রীষ্টধর্ম্মের এই ভাবটী অতি মধুর; এবং ইহারই গুণে খ্রীষ্টধর্ম্ম জগতে আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ হিন্দু-সমাজের ক্রোড়ে প্রতিপালিত বলিয়াই বোধ হয় পাপীর প্রতি কৃপার ভাব ব্রাহ্মসমাজে অদ্যাপি বড় প্রস্ফুটিত হয় নাই।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

এক পুরুষে ব্রাহ্ম।

হে ব্রাহ্মগণ! কেন তোমরা প্রাচীন-সমাজের বিরাগ-ভাজন হইয়াছ? কেন জাতিচ্যুত, সমাজচ্যুত ও সুখ সৌভাগ্য হইতে চ্যুত হইয়াছ? কি ভাবিয়া, কি আশাতে, এ সকল করিয়াছ ও সহিয়াছ? তোমাদের বিপক্ষগণ বলে, তোমরা যৌবনের উত্তেজনায়, বাহাদুরি দেখাইবার ইচ্ছায়, বিবাদ-প্রিয়তার কারণে, দুরন্ত বালকের ন্যায় ভগ্ন করিবার আমোদে এই সকল করিয়াছ। তাহাই কি যথার্থ? আমরা জানি এ অপ-বাদ সত্য নহে। যাঁহারা তোমাদের আচার ব্যবহার,তোমাদের প্রতিদিনের জীবন, প্রার্থনা ও সংগ্রাম দেখেন নাই, তাঁহারাই এ প্রকার বলিয়া থাকেন। আমরা বিশ্বাস করি, তোমরা ঈশ্বরের আহ্বানধ্বনি শুনিয়া ব্যাকুল হইয়া পাপ তাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়াছিলে। আমরা জানি তোমাদের অনেকে বিশ্বাস কর যে, যে আলোক তোমরা অন্তরে পাইয়াছ, তাহা ঈশ্বরের আলোক, সেই আলোকে বাস করিতে পারিলেই তোমাদের সদ্গতি। আচ্ছা তাহাই যদি হয়, তবে প্রশ্ন করি, এ আলোক যাহাতে নিজ নিজ বংশে ও পরিবার মধ্যে থাকে, সে জন্য কিছু করিতেছ কি না? অদ্য পর্য্যন্ত যেরূপ ভাবগতি দেখিতেছ, তাহাতে এই আলোক নিজ নিজ বংশে থাকিবে এরূপ আশা মনে হইতেছে কি না?

আমরা ইতিমধ্যে যাহা দেখিতেছি, তাহাতে মনে প্রবল আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, যদি ত্বরায় বর্ত্তমান অবস্থার কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে এ ব্রাহ্মধর্ম্মের অগ্নি ব্রাহ্মদের পরিবারে থাকিবে না। যে ব্রাহ্মদল ধর্ম্মের অনুরোধে সহস্র ক্লেশ স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন, সেই বিশ্বাসী দল এখনও অন্তর্হিত হন নাই। বলিতে গেলে এখনও ব্রাহ্মসমাজের নবোদ্যমের দিন। এই নবোদ্যমের সময়েই অনেক স্থলে ব্রাহ্মদিগের সন্তানগণের কি দুর্দ্দশা দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যে এতদূর হইয়াছে যে, ব্রাহ্মের সন্তান চুরির অপরাধে অপরাধী হইয়াছে; ব্রাহ্মের সন্তান প্রকাশ্য ভাবে নাস্তিকতা প্রচার করিয়াছে। যাহারা এতদূর যায় নাই, তাহাদের অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রতি উদাসীন ও অনুরাগ-বিহীন হইতেছে। পিতা মাতা হয়ত এখনও সে কার্য্যে উৎসাহী রহিয়াছেন, কিন্তু সন্তানদিগের হৃদয় সে পথ দিয়া চলিতেছে না। ইহার ফল কি দাঁড়াইবে? ধর্ম্মাগ্নি যদি তাহাদের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে চারিদিকের কুসংসর্গ ও প্রলোভনের মধ্যে আমরা তাহাদের চরিত্র ও নীতি রক্ষা করিতে পারিব কি না? ধর্ম্মাগ্নিই মানব চরিত্রকে প্রলোভনের মধ্যে রক্ষা করিতে পারে। যে আপ-নাকে আপনি রক্ষা করিবার জন্য ব্যগ্র নহে, তাহাকে কোন সামাজিক ভয় বা সামাজিক বিধি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারা যায় না। কিন্তু আপনাকে আপনার দ্বারা রক্ষা করে কে? সে শাসন কোথা হইতে উৎপন্ন হয়? সে শাসন ভয় হইতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু প্রেম হইতেই উৎপন্ন হয়। ভয়ের শাসনে মানুষকে নিকৃষ্ট করে, অপদার্থ করে, ভীরু ও কাপুরুষ করে; কিন্তু প্রেমের শাসনে মানুষকে উন্নত করে, স্বাধীনচেতা করে, তেজস্বী ও পৌরুষবান করে। প্রেমে ঘোর অধীনতাকে স্বাধীনতাতে পরিণত করে। সাধুতার প্রতি জাগ্রত প্রেম যে হৃদয়ে আছে, সেই হৃদয় এই জগতে বিশ্বাসের আলো হস্তে লইয়া সহস্র প্রকার প্রলোভনের মধ্যে অকুতোভয়ে যাইতেছে। আমাদের সন্তানদিগকে চতুর্দ্দিকের পাপ প্রলোভনের মধ্যে রক্ষা করিবার মূলমন্ত্র এই যে সাধুতার প্রতি তাহাদের প্রেম উদয় করিতে হইবে। নীতির নিয়ম এক ঝুড়ি শিখাইয়া দেওয়া কঠিন কথা নয়। দুই চারি খানি নীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করাইলেই সে বিদ্যাটা জন্মিতে পারে; তাহারা নীতিশাস্ত্রে পাকা জ্ঞানী হইতে পারে। কিন্তু নীতির প্রতি প্রেম জন্মে কিসে?

নীতির প্রতি যেরূপ প্রেম জন্মাইয়া দিতে হইবে, ধর্ম্মের প্রতিও সেইরূপ প্রেম জন্মান আবশ্যক; তদভাবে নীতির প্রতি প্রকৃত প্রেম জন্মিবে না এবং ব্রাহ্মসমাজের কোন কার্য্যের প্রতি তাহাদের উৎসাহ থাকিবে না। ধর্ম্মানুরাগ না থাকিলে তাহাদের অন্তরে বিষয়ানুরাগ প্রবল হইবেই হইবে। এ সকল অনিবার্য্য ফল। ব্রাহ্মগণ কি এই সকল ফলের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকিবেন। এরূপ ব্রাহ্ম বোধ হয় অধিক নাই, যাঁহারা ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদের হৃদয়স্থ আলোক তাঁহাদের সন্তান-গণের অন্তরে না যাউক। এরূপ ব্রাহ্ম পিতা মাতার কথা আমরা অধিক শুনি নাই। সকলেই বোধ হয় ইচ্ছা করেন যে, সন্তানগুলি নীতি-পরায়ণ ও ধর্ম্মানুরাগী হয়; কিন্তু তাহার অনুরূপ উপায় আমরা অবলম্বন করিতেছি না। এক একজন

এক এক প্রকার ভাবে কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ মনে করেন, বালক বালিকাদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। এই বিশ্বাসে তাঁহারা বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর হস্তে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আছেন। ধর্ম্ম-বিহীন শিক্ষা প্রণালীতে যতদূর হয় তাহাই হইয়া উঠিতেছে, তাহারা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাদের সকলই হইবে, পণ্ডিত হইবে, বুদ্ধিমান হইবে, চালাক চতুর হইবে, উপার্জ্জনক্ষম হইবে, কেবল হইবে না একটী, ধর্ম্মের প্রতি ও ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রতি অনুরাগী হইবে না। ইহাতেই কি ব্রাহ্ম পিতা মাতা সন্তুষ্ট হইবেন?

আবার কেহ কেহ হয়ত ব্রাহ্মবন্ধুদিগের প্রতি কোন কোন কারণে বিরক্ত আছেন, তাঁহারা সন্তানগুলি ব্রাহ্মসমাজ হইতে দূরে রাখিতেছেন; ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে ও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দিতেছেন না; ব্রাহ্ম মহিলারা উৎসাহের সহিত রবিবাসরিক বিদ্যালয় করিতেছেন, সেখানে তাঁহাদের বালক বালিকা আসে না; ব্রাহ্মবালিকাদের জন্য বিদ্যালয় হইতেছে, সেখানে তাঁহাদের বালক বালিকা আসে না; বালক বালিকাকে লইয়া আমোদ উদ্যানযাত্রা উৎসব প্রভৃতি করা হয়, সেখানে তাঁহাদের বালক বালিকার দেখা নাই। জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন, "তোমাদের ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া ছেলে খারাপ হইবে, তাই পাঠাই না!" যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ভাল ব্রাহ্ম বালক বালিকার সঙ্গেত মিশিতে দিলেন না, কিন্তু স্কুলে ও রাজপথে অব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজের বিদ্রুপকারী বালকগণের সহিত মেশা বন্ধ করিতে পারিয়াছেন কি না? উত্তরে বলিতেই হইবে যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে পারিতেছেন না। তবে ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে, যে সংসর্গে মিশিলে তাহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা দুইটা শুনিতে পারে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে একটু উৎসাহ দেখিতে পারে, তাহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগ একটু উদ্দীপ্ত হইতে পারে, সে সংসর্গে মিশিতে পাইতেছে না; কিন্তু যে সংসর্গে মিশিলে তাহারা ব্রাহ্মবিদ্বেষ লাভ করিতে পারে, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকে উপহাস করিতে শিখিতে পারে, সেরূপ সংসর্গেই মিশিতে পাইতেছে। ইহার ফল কি এই দাঁড়াইবে না যে উত্তরকালে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রতি তাহাদের অনুরাগ থাকিবে না, বরং সেই সকল কার্য্যকে তাহারা উপহাস ও বিদ্রুপ করিতে শিখিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মদিগের পরিবারগুলি ব্রাহ্মসমাজের অনুকূল শক্তি না হইয়া প্রতিকূল শক্তি হইয়া দাঁড়াইবে। যদি এরূপ ফল ফলে তাহা হইলে দায়ী কে হইবে? সেই পিতা মাতাই কি দায়ী নহেন? যাঁহারা সন্তানদিগকে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-স্রোত হইতে দূরে রাখিতেছেন, তাঁহারা চিন্তা করুন।

ধর্ম্মাগ্নি যদি আমাদের সন্তানদিগের অন্তরে না যায় তাহার অনিষ্ট ফল কি তাহাও একবার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। যদি কেহ মনে করেন, ব্রাহ্মদিগের পরিবারে ধর্ম্মাগ্নি না থাকিল, তাহাতে হানি কি? নিত্য নিত্য নূতন নূতন বিশ্বাসী দল আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজকে পূর্ণ করিবে, এবং তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য চলিবে। সে বিষয়েও চিন্তা করিবার আছে। ব্রাহ্ম পরিবারে যদি ধর্ম্মাগ্নি না থাকে, আর বাহিরে যদি ব্রাহ্মেরা উৎসাহের সহিত প্রচার করিতে যান, লোকে তাঁহাদিগকে উপহাস করিবে। ইহা অনুমানের কথা নহে। এরূপ ঘটনা বাস্তবিক ঘটিয়াছে। একবার একজন ব্রাহ্ম পঞ্জাবের কোন স্থানে দাঁড়াইয়া উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রোতাবর্গের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হাসিয়া বলিয়া উঠিল।—"বাবু সাহেব চেরাককা নীচে আঁধেরা।" অর্থাৎ দীপের নিম্নেই অন্ধকার। একথার তাৎপর্য্য এই, উক্ত ব্রাহ্মের সন্তান গুলি অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিল। যে ভাবে ঐ ব্যক্তি ব্রাহ্মকে উপহাস করিয়াছিল সেইরূপ বাহিরের লোকে আমাদিগকেও বিদ্রুপ করিবে। বলিবে—জগতের পরিত্রাণের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, যাহারা ঘরে জন্মিয়াছে, যাহাদিগকে নিরন্তর ক্রোড়ে পাইতেছ, তাহাদিগকে অগ্রে পরিত্রাণ কর। অতএব ব্রাহ্ম বংশে ধর্ম্মাগ্নি না থাকিলে তাহার ফল এই হইবে যে বাহিরের প্রচার বন্ধ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় ফল আরও শোচনীয়। ব্রাহ্মগণ বাল্য বিবাহ দিতে পারিবেন না, সকলেরই ঘরে বালক বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া অবিবাহিত থাকিবে। তাহারা অবিবাহিত থাকিবে এবং পরস্পরের সহিত মিশিবে, অথচ নীতি ও ধর্ম্মের প্রতি প্রেম থাকিবে না। ইহার ফল এই হইবে দুর্নীতির স্রোত ব্রাহ্ম গৃহের মধ্যেই প্রবাহিত হইবে। সেই কলঙ্কে ব্রাহ্মসমাজ লোকের ঘৃণার তলে ডুবিয়া যাইবে। নৈতিক বল যদি একবার লোপ প্রাপ্ত হয়—সহস্র প্রচারের চেষ্টা বিফল হইয়া যাইবে। অতএব বাহিরের লোক আনিয়া যে ঘর পুরিবেন সে সম্ভাবনাও থাকিবে না। ব্রাহ্ম বংশে ধর্ম্মাগ্নি থাকিল না এবং বাহিরের লোক আসাও বন্ধ হইল—ইহার ফল যাহা তাহা জ্ঞান-চক্ষে একবার দেখিবার চেষ্টা কর।

ক্ষোভের বিষয়, পরিতাপের বিষয় এই এত বড় একটা সংকটের দিকে ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি পড়িতেছে না। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্রাহ্মের যে দায়িত্ব আছে তাহা অন্তরে জাগিতেছে না; এই সকল অনিষ্ট নিবারণের যে কিছু উপায় অবলম্বিত হইতে পারে সে বিষয়ে কাহারও মনোযোগ হইতেছে না!!!

এই অনিষ্ট নিবারণের তিন প্রকার উপায় অবলম্বিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক—(১) প্রথম, ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার উপায় করিতে হইবে। যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের সত্য সকল তাহাদের মনে মুদ্রিত হইতে পারে, যাহাতে সুনীতির প্রতি আদর ও দুর্নীতির প্রতি ঘৃণা জন্মিতে পারে এরূপ উপায় করিতে হইবে। (২) দ্বিতীয়, আমাদের মধ্যে চরিত্র ও ধর্ম্মনিষ্ঠাতে অগ্রসর জীবন্ত মানুষ যাঁহারা তাঁহাদের সংসর্গে পুত্র কন্যাকে রাখিবার উপায় করিতে হইবে। (৩) ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্য ও অনুষ্ঠান হইতে কখনই সন্তানদিগকে দূরে রাখা হইবে না; তাহার সহিত তাহাদের যোগ রাখিতে হইবে ও সে বিষয়ে উৎসাহ দিতে হইবে।

চিন্তা করিলেই ব্রাহ্ম বন্ধুগণ দেখিতে পাইবেন, যে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় নামে যে শিক্ষালয়টী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা অল্প বা অধিক পরিমাণে এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইতেছে। প্রথমতঃ সেখানে রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্ম রীতি নীতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ সেখানকার শিক্ষা কার্য্যের ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা সকলেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুরাগী উৎসাহশীল জীবন্ত লোক, তাঁহাদের চরিত্রের সংস্রবে আসিলে তাঁহাদের হৃদয়ের অগ্নি ব্রাহ্ম বালক বালিকার হৃদয়ে সংক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। তৃতীয়তঃ এই বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীগণ ব্রাহ্ম সমাজের ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইবে, ব্রাহ্ম শিক্ষক ও ব্রাহ্ম সহাধ্যায়ীদিগের নিকট থাকিলে, ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের কথা সর্ব্বদা শুনিবে ও তাহা চক্ষে দেখিবে। আশা করা যায়, এখানে থাকিতে থাকিতে ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের প্রতি তাহাদের অনুরাগ বাড়িবে। এই সকল ফলের আশা করিয়াই এই শিক্ষালয়টীকে স্থায়ী করিবার জন্য এত চেষ্টা করা যাইতেছে। যাঁহারা এই উদ্দেশ্যের গুরুতা অনুভব করিবেন, তাঁহাদের সকলেরই যথা-সাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য। আমরা বিশ্বাস নয়নে দেখিতেছি বিধাতা এত দিনের পর আমাদিগকে একটী স্থায়ী কল্যাণ জনক কার্য্যে হস্তার্পণ করিতে আদেশ করিতেছেন।

ধর্ম্মের সুরভি নিঃশ্বাস।

ধর্ম্ম শব্দটী অনেক বিষয়ী লোকের পক্ষে ভীতিজনক হইয়াছে। "ধর্ম্ম", ধার্ম্মিক" "ধর্ম্মসাধন" এই সকল শব্দ তাঁহাদের কর্ণে উচ্চারণ করিলে যে ছবি তাঁহাদের অন্তরে উদিত হয় তাহা প্রীতিকর নহে। ধর্ম্মের মুখ সর্ব্বদা গম্ভীর, খিট্‌খিটে, সামান্য নির্দ্দোষ আমোদকেও সহ্য করে না; প্রাণ খুলিয়া কোন সুখ ভোগ করে না; সমাজের অনেক কার্য্যের প্রতি সর্ব্বদা ভ্রূকুটী করে; এবং ঘরে দ্বার দিয়া কি এক প্রকার কুস্তী করে যাহাতে শরীর ও মন উভয় পরিশ্রান্ত হয়। ধর্ম্ম অস্বাভাবিক সুরে ঈশ্বরের সহিত কথা বলে; এবং অপরাধী কুকুর যেমন ভয়ে ভয়ে স্বীয় প্রভুর নিকটে যায়, সেইরূপ ধর্ম্ম ও ভীতভাবে ঈশ্বরের সন্নিধানে যায় এবং সর্ব্বদাই সকল কার্য্যে অনুতাপের কান্না কাঁদে। পিতার দুই জন বন্ধু আছেন; এক জন বিষয়ী লোক অপর ব্যক্তি ধর্ম্ম-প্রচারক। বিষয়ী বন্ধু আসিতেছেন দেখিলে বাড়ীর ছেলেরা দূর হইতেই নৃত্য ও কোলাহল করিতে থাকে, কত আমোদ করিবে, কত খেলিবে, কত গল্প শুনিবে, কত হাসিবে; কিন্তু ধর্ম্ম-প্রচারক যখন আসিতেছেন তখন তাহাদের আমোদ প্রমোদ উড়িয়া যায়। মুখটা কি গম্ভীর করিয়া আসিতেছেন! অধিক আমোদে লঘু-চিত্ততা হয় বলিয়া তিনি তাহার বিরোধী। তিনি আসিয়া বালক বালিকাদিগকে ধরিয়া নীতি বিষয়ে গভীর গভীর উপদেশ দিবেন। সেই উপদেশের ভয়ে বালক বালিকা তাঁহার নিকটে ঘেঁষে না।

ধর্ম্মসাধন ব্যাপারটা অনেকের পক্ষে অতি কষ্টকর। মনটা সহজে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে চাহে না। যদিও বা বলপূর্ব্বক প্রবিষ্ট করা যায়, যতক্ষণ তন্মধ্যে থাকে যেন ক্লেশে থাকে এবং তাহা হইতে উন্মুক্ত হইলেই আপনাকে সুখী বলিয়া অনুভব করে। ধর্ম্ম সাধন যদি এরূপ কষ্টকর হয় তাহা হইলে মানবের মন দীর্ঘকাল তন্মধ্যে তৃপ্ত হইয়া তিষ্টিতে পারে না। কিন্তু কেহ কেহ হয়ত বলিবেন কোন প্রকার নিয়ম বা সাধনাধীন করিতে গেলেই মানবের মন কিছু না কিছু কষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। বালককে যখন বিদ্যাভাসে নিযুক্ত করা যায় এবং প্রতিদিন তাহাকে নিয়মপূর্ব্বক পাঠাভ্যাসে কিছু সময় যাপন করিতে হয় তখন সেই নিয়ম, তাহার পক্ষে প্রীতিকর হইবার কথা ত নহে। সেইরূপ যখন কোন ব্যক্তি সংগীত শাস্ত্র শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহাকে প্রথম প্রথম কত কঠোর সাধন করিতে হয়। প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া তানপুরাটী বাঁধিয়া 'সা রে গা মা' সাধিতে সাধিতে পাড়ার লোক বিরক্ত হইয়া উঠে, তাঁহারও শরীর মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। সেইরূপ আপনাকে ধর্ম্ম সাধনাধীন করিতে গেলেও মন সে নিয়মাধীন হইতে চাহিবে না এবং তাহাকে বলপূর্ব্বক নিয়মাধীন করিতে হইবে, তাহাতে কি? মনের প্রীতি অপ্রীতি দেখিলে চলিবে কেন? যেমন আদুরে ছেলেটা কি চায় তাহা দেখিয়া চলিতে গেলে সে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে, সেইরূপ মন কিসে প্রীত থাকে তাহা দেখিয়া কাজ করিতে গেলেও মনকে স্বেচ্ছাচারী করিয়া তোলা হইবে। মনের অভিরুচির অনুসারে চলা ধর্ম্ম নহে; কিন্তু মনের অভিরুচিকে ধর্ম্ম নিয়মের অনুসারী করিয়া চলাই ধর্ম্ম। ইহা অতি সত্য কথা—অতি মূল্যবান কথা। কিন্তু এই সঙ্গে আর একটী বিবেচ্য বিষয় আছে। বিদ্যাভ্যাস কিছু চিরদিন কষ্টকর থাকে না; চিরদিন শিক্ষক ও অভিধানের শরণাপন্ন হইয়া থাকিতে হয় না; চিরদিন শাস্তি ভয়ে গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে হয় না। এমন এক সময় আসে যখন মানুষ বিদ্যার রসজ্ঞ হইয়া পড়ে। তখন সে সেই রসে রসিক হইয়া তাহাতেই নিবিষ্ট হয়। তখন তাহার মন পাঠের নিয়মাধীন হইয়া অসুখী হওয়া দূরে থাকুক গভীর তৃপ্তি অনুভব করে। পাঠ তাহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয়। সঙ্গীতবিদ্যা সম্বন্ধেও এইরূপ। এমন এক সময় আসে যখন সাধক সঙ্গীতের রসজ্ঞ হইয়া উঠে। তখন তানপুরাটী হাতে লইয়া নির্জ্জনে বসিয়া অপূর্ব্ব সুধা-সাগরে সন্তরণ করিতে থাকে।

ধর্ম্ম সাধন সম্বন্ধেও সেইরূপ; ধর্ম্ম যখন প্রেমের বস্তু হয়, যখন সত্য স্বরূপকে বিশ্বাস নয়নে প্রত্যক্ষ করিয়া মন তাঁহাতে বিশ্রাম লাভ করে, যখন হৃদয়ের গভীর প্রেম তাঁহার প্রতি অর্পিত হয়, তখন ধর্ম্ম ভাব চরিত্রের, চিন্তা ও ভাবের অস্থি মজ্জাতে বসিয়া যায়। তখন সেই ধার্ম্মিক ব্যক্তি যাহা করেন, তাহাই ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়; এবং এমন কিছু করিতে পারেন না যাহা ধর্ম্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় না। তাঁহার আহার বিশুদ্ধ, বিহার বিশুদ্ধ, আমোদ প্রমোদ বিশুদ্ধ সমুদায় বিশুদ্ধ হইয়া যায়। তিনি বালকের ন্যায় প্রসন্ন চিত্ত, সরল ও অমায়িক হইয়া পড়েন। তিনি বাঁকা পথ ভুলিয়া যান, এবং সোজা পথেই চলিতে থাকেন। ধর্ম্ম তখন সুরভি নিঃশ্বাসের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বহিতে থাকে। সাধনাধীন হওয়া আর কষ্টকর থাকে না; জীবনের প্রতিদিনের কার্য্যের সঙ্গে আর বিরোধ থাকে না। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে সমুদয় সুখ ভোগ করেন এবং

সকল প্রকার প্রলোভনের মধ্যে বাস করিয়াও তাহার দ্বারা কলঙ্কিত হন না।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়!

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় তত্ত্বকৌমুদীর কয়েক সংখ্যায় ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ২য় ভাগের সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি চিন্তাশীলতা ও অপক্ষপাতিতার সহিত উক্ত পুস্তকের মত ও যুক্তি নিচয়ের বিচার করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রশংসা করি। সীতানাথ বাবু একজন সুবিদ্বান্, চিন্তাশীল ও ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি, তাঁহার লেখনী হইতে যাহা কিছু নিঃসৃত হয় তাহাই নিবিষ্ট চিত্তে সকলের পাঠ করা উচিত। তিনি আমার পুস্তক সমালোচনা করিবার জন্য যেরূপ পরিশ্রম, যত্ন ও সময় ব্যয় করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহাকে আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা অর্পণ না করিয়া থাকিতে পারি না।

ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ২য় ভাগের প্রশংসা করিয়া তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না। ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, সে সকল প্রশংসার মূল আছে কি না? পুস্তকের দোষ বা অভাব প্রদর্শন করিয়া তিনি যে সকল কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে কএকটী প্রধান কথা সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে নিম্নে সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

প্রথমতঃ—"প্রকৃত শাস্ত্র" শিরোনামাঙ্কিত বক্তৃতাটী সম্বন্ধে তিনি একটী আপত্তি উপস্থিত করিয়াছেন। যে সকল গ্রন্থ ধর্ম্ম শাস্ত্র বলিয়া বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সে সকলের অভ্রান্ততা খণ্ডন করিয়া উক্ত পুস্তকে যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহাতে তিনি কোন দোষ বা ত্রুটী দেখিতে পান নাই। তাঁহার মতে উক্ত পুস্তকে ধর্ম্ম-শাস্ত্র নামে অভিহিত গ্রন্থ সকলের অভ্রান্ততা নিশ্চিত রূপে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ২য় ভাগে বলা হইয়াছে যে বেদ, কোরাণাদি শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও কার্য্যতঃ তাহাতে কোন ফল হয় না। শাস্ত্র অভ্রান্ত হইলেও অভ্রান্ত ভাবে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিবার কোন উপায় না থাকাতে একই শাস্ত্রবাদী লোকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান; বেদ, কোরাণ ও বাইবেলকে অভ্রান্ত শাস্ত্র রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াও অসংখ্য বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এ স্থলে সীতানাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসায় উক্ত হইয়াছে যে আত্মা ও জগৎ ঈশ্বর প্রণীত একমাত্র অভ্রান্ত শাস্ত্র কিন্তু আত্মা ও জগৎ রূপ শাস্ত্র হইতে সত্য নিষ্কাশনের অভ্রান্ত উপায় কি? মনুষ্য বেদ কোরাণাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে গিয়া যেমন ভ্রম প্রমাদে পতিত হয়, সেইরূপ আত্মা ও জগৎ রূপ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে গিয়াও ভ্রম প্রমাদে পতিত হইতেছে। বেদাদি শাস্ত্রের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে জগৎ রূপ শাস্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা যাইতে পারে।

এস্থলে আমার মনের ভাব একটু পরিষ্কার করিয়া বলি। প্রথমতঃ, বেদ কোরাণাদি শাস্ত্র ঈশ্বর প্রণীত আপ্ত বাক্য কি না তদ্বিষয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। মুসলমানের নিকট যাহা ঈশ্বর প্রণীতশাস্ত্র, হিন্দুর নিকটে তাহা নহে; আবার হিন্দুর নিকটে যাহা ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র মুসলমানের নিকট তাহা নহে। এমন একখানি গ্রন্থ জগতে প্রচলিত নাই যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত রূপে ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইয়াছে। কিন্তু আত্মা ও বহির্জ্জগৎ রূপ শাস্ত্র সম্বন্ধে একথা কেহই বলিতে পারেন না। আত্মা ও বহির্জ্জগৎ সর্ব্ববাদীসম্মত রূপে সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমগ্র মানব মণ্ডলী মধ্যে ঈশ্বর প্রণীত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিতেছেন।

এ সম্বন্ধে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ২য় ভাগের ৫৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে;—নাস্তিক ভিন্ন সকলেই বলিবে যে এই দুই শাস্ত্র, আত্মা ও বহির্জ্জগৎ পরমেশ্বর প্রণীত শাস্ত্র। হিন্দু হও, মুসলমান হও, খৃষ্টীয়ান হও, ঐ ব্রহ্মাণ্ডরূপ পরম শাস্ত্র, সকলেরই স্বীকার্য্য।" মুসলমান যখন বলেন যে কোরাণ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র, তখন সে কথায় আপত্তি হইতে পারে এবং মানব জাতির মধ্যে বহু সংখ্যক লোকের আপত্তিও আছে। কিন্তু আমি যখন বলিলাম যে আত্মা ও বহির্জ্জগৎ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র, তখন সে কথায় নাস্তিক ভিন্ন কেহ আপত্তি করিতে পারে না।

আর একটী কথা, জগৎ বা প্রকৃতি রূপ শাস্ত্র মানুষের নিকটে চিরদিন রহিয়াছে। সে শাস্ত্র সত্ত্বেও গ্রন্থের আকারে নূতন অভ্রান্ত শাস্ত্র আসিল কেন? ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থবাদীরা বলেন যে মনুষ্যের ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মজীবনের সম্বন্ধে আত্মা ও বহির্জ্জগৎরূপ শাস্ত্র যথেষ্ট নহে। আত্মা ও বহির্জ্জগৎরূপ শাস্ত্রের অভাব পূরণ করিয়া দিবার জন্যই পরমেশ্বর গ্রন্থরূপ শাস্ত্র প্রেরণ করিয়াছেন, প্রকৃতি রাজ্যে যে অভাব দৃষ্ট হয়, গ্রন্থে তাহা হয় না। ঈশ্বরপ্রণীত ধর্ম্মগ্রন্থ মানুষের ধর্ম্মজীবনের সকল অভাব পূরণ করিতে পারে, প্রকৃতি যাহা পারে না গ্রন্থ তাহা পারে।

এ কথাটী যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে পারি না. ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ২য় ভাগের ৫৪ পৃষ্ঠায় এইরূপ লিখিত আছে;—"অভ্রান্ত গ্রন্থ প্রেরণের উদ্দেশ্য কি? মানুষ নিজের জ্ঞানবলে, ব্রহ্মাণ্ডরূপ শাস্ত্রের সাহায্যে সত্য নির্দ্ধারণে অক্ষম বলিয়াই ত তিনি অভ্রান্ত ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রেরণ করিলেন? কিন্তু সে অভ্রান্ত গ্রন্থ মনুষ্যকে প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান দিতে সক্ষম হইল কৈ? ধর্ম্ম গ্রন্থ পাইয়াও মানুষ সহস্র বিভিন্ন পথে ছুটিতেছে কেন? ত্রিকালজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না, ইহা কেমন করিয়া বলিব?" প্রকৃতি Insufficient বলিয়া পুস্তক রূপ শাস্ত্র আসিল, তাহাও Insufficient হয় কেন?

এস্থলে আত্মা ও বহির্জ্জগৎরূপ শাস্ত্র এবং ধর্ম্মগ্রন্থরূপ শাস্ত্রের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ২য় ভাগে এই প্রভেদ পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে। সীতানাথ বাবু এখনও বলিবেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আত্মা ও বহির্জ্জগৎরূপ শাস্ত্র হইতে সত্য নিষ্কাশনের অভ্রান্ত প্রণালী বলিয়া দেওয়া হইতেছে ততক্ষণ আত্মা ও বহির্জ্জগৎরূপ শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও বাস্তবিক অভ্রান্ত সত্য লাভের কোন উপায় হইল না।

আমি বলিয়াছি আত্মা ও বহির্জ্জগৎ ঈশ্বর প্রণীত শাস্ত্র, বহির্জ্জগতে যে সকল সত্য নিহিত রহিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিবার উপায় কি? সীতানাথ বাবু নিজেই বলিতেছেন যে বিজ্ঞান তদ্বিষয়ে অনেক সুপ্রণালী স্থির করিয়াছেন। সেই সকল প্রণালী অবলম্বন করিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল নির্দ্ধারণ করিতেছেন। তারপর মানবের মন। মনো-বিজ্ঞানের যতদূর উন্নতি হইয়াছে সেই পরিমাণে মনস্তত্ত্ব নির্দ্ধারণের উপায় হইয়াছে। তার পর মানবের ধর্ম্মপ্রকৃতি বা মানব-প্রকৃতির আধ্যাত্মিক বিভাগ আধ্যাত্মিক সত্যসকল নির্দ্ধারণের উপায় কি? সীতানাথ বাবু নিজেই বলিতেছেন;—"বুদ্ধি বল, প্রজ্ঞা বল, বিবেক বল, আদেশ বল, সমুদায়েরই নামে ভয়ানক ভয়ানক ভ্রম প্রচারিত হইয়াছে। স্থির দাঁড়াইবার স্থান তবে কোথায়? আমি বলি আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা (experience) দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য প্রত্যক্ষরূপে আত্মাতে লাভ করা যায়। সত্য অনন্ত, আত্মার উন্নতিও অনন্ত। অনন্ত উন্নতি-পথে আত্মা অনন্ত সত্যের সহিত ক্রমে ক্রমে সাক্ষাৎ করে সুতরাং যাঁহার যেমন উন্নতি ও অভিজ্ঞতা তিনি সেই পরিমাণে সত্য লাভ করেন। এক অবস্থার লোকে যাহা পাইয়াছেন নিকৃষ্ট অবস্থার লোককে তাহা বুঝাইয়া দিতে পারেন না। একজন আধ্যাত্মিক উন্নতির এমন এক সোপানে উঠিয়াছেন যে যেখানে পরলোক তাঁহার পক্ষে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ সত্য হইয়া গিয়াছে। তিনি এমন এক চক্ষু পাইয়াছেন যদ্দ্বারা তিনি ঈশ্বর পরলোক সকলই প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। অন্য লোকের নিকট যাহা তর্কের মিমাংসা তাঁহার নিকটে তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। ঈশ্বর ও পরলোক যে প্রত্যক্ষ সত্য হইতে পারে নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক সকলকে তাহা তিনি কেমন করিয়া বুঝাইবেন। যাহার যেমন অবস্থা সে তেমনই দেখে সুতরাং আধ্যাত্মিক সত্য লাভের এক অভ্রান্ত প্রণালী সকলের পক্ষে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে। কেবল তর্কের দ্বারা আধ্যাত্মিক সত্য জানা যায় না; আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বিকাশের পরিমাণের উপর সত্য লাভের পরিমাণ নির্ভর করে। যে ব্যক্তি পর্ব্বতের নিম্নদেশমাত্র দেখিয়াছে, সে তুষারমণ্ডিত ধবল শেখরের সংবাদ কেমন করিয়া দিবে!

তবে সীতানাথ বাবু বলিতে পারেন যে উচ্চতর সত্য সম্বন্ধে যাহাই কেন হউক না, ধর্ম্মের মূল সত্য, অর্থাৎ ঈশ্বরের অস্তিত্ব, ঈশ্বরের স্বরূপ, মানবাত্মার স্বরূপ, পরমাত্মার সহিত তাহার সম্বন্ধ, পরলোকতত্ত্ব প্রভৃতি মূল বিষয়ের মূলতত্ত্ব সকলের নির্দ্ধারণের অভ্রান্ত প্রণালী দেখাইয়া দেওয়া উচিৎ। এ কথার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করি। কিন্তু ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ২য় ভাগের ন্যায় ক্ষুদ্র পুস্তকের একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে তাহার ব্যাখ্যা সম্ভব নহে। সেরূপ প্রত্যাশা করাও উচিত হয় নাই।

সীতানাথ বাবুর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উক্ত বিষয়ের একখানি গ্রন্থ। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার ন্যায় একখানি গ্রন্থ লিখিয়াও সীতানাথ বাবু বোধ হয় মনে করেন যে, সকল কথা বিস্তৃতরূপে ও পরিষ্কাররূপে বুঝান হয় নাই। অন্ততঃ তাঁহার পাঠকদিগের মধ্যে অনেকে সেইরূপ মনে করেন। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসারূপ একখানি গভীর চিন্তাপূর্ণ উপাদেয় গ্রন্থে যাহা সম্পূর্ণরূপে হইল না, তাহা ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ২য় ভাগের ন্যায় একখানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুস্তকের একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে! উহাতে তাহা কেমন করিয়াই বা প্রত্যাশা করা সঙ্গত হইতে পারে!

সীতানাথ বাবু ধর্ম্ম দর্শন বিষয়ে ব্রাহ্ম সমাজের সুতরাং সাধারণ ভাবে এ দেশের বিশেষ উপকার করিতেছেন। তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব নির্দ্ধারণের অভ্রান্ত প্রণালী বিশেষভাবে ব্রাহ্ম সমাজকে এবং সাধারণ ভাবে দেশের লোককে শিক্ষা দিন। আমরা তাঁহার পদতলে বসিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতার উপহার অর্পণ করি।

পত্র দীর্ঘ হইয়া উঠিল। সীতানাথ বাবু আত্মার স্বাধীনতা ও পাপের স্বরূপ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য আছে, পরে তত্ত্ব-কৌমুদী পাঠকবর্গের নিকটে নিবেদন করিব। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীনগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়—জগদীশ্বরের প্রসাদে উক্ত বিদ্যালয়টীর কার্য্য এক প্রকার সুচারুরূপে চলিতেছে। ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। এখনও অনেক ব্রাহ্মবন্ধু এখানে স্বীয় স্বীয় বালক বালিকাদিগকে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছেন। অথচ ইহা নিশ্চিত যে ব্রাহ্মদিগের সন্তানদিগের পড়িবার প্রকৃত স্থান এই। এখানে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, জ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে তাহা কোন বিদ্যালয় অপেক্ষা ন্যূন নহে; অধিকন্তু বালক বালিকাগণ সংগীত, চিত্রবিদ্যা, শিল্পকার্য্য ও বিজ্ঞান বিষয়ে উপদেশ পাইতেছে, এবং এই সমুদায় শিক্ষা ধর্ম্ম শিক্ষার ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইতেছে। যাহাতে বালক বালিকার মনে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সকল দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয়, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাহাদের অনুরাগ জন্মে, যাহাতে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহিত তাহাদের সহানুভূতি জন্মে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইবে। এরূপ আশা হইতেছে, ঈশ্বরের কৃপায় এই শিক্ষালয়টী যদি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে ইহার উৎকৃষ্ট ফল আমরা দেখিতে পাইব। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী নিবন্ধন ধর্ম্মের প্রতি যে ঔদাসীন্য জন্মিতেছে, ব্রাহ্ম বালিকাদিগকে সে বিপদে গ্রাস করিবে না। তাহারা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী ও ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যের প্রতি উৎসাহী হইয়া উঠিবে। পিতা মাতা

ঘরে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে পারিতেছেন না, তাহা এই শিক্ষালয়ে পাইবে।

এ বৎসরে যে সকল পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন, আগামী বর্ষেও এই প্রকার থাকিবে। এ বৎসর অসময়ে শিক্ষালয়টী খোলা হইয়াছে বলিয়া ঠিক্ মনের মত করিয়া ব্যবস্থা করিতে পারা যায় নাই। আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই, বালিকাগণ, নিম্নশ্রেণীতে উত্তমরূপে বাঙ্গালা শিখিবে, বাঙ্গালা ভাষাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবে। উপরের কয়েক শ্রেণীতে ইংরাজির প্রতি বেশী মনোযোগ দিয়া তাহাদের ইংরাজী পাকা করিয়া দেওয়া হইবে। এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হইবে, যাহাতে এই শিক্ষালয়ের সপ্তম বার্ষিক শ্রেণীর পর কেহ যদি এণ্ট্রান্স দিতে চায়, সে আর দুই বৎসরে অনায়াসে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে। আর যাহারা এণ্ট্রান্সের দিকে না যাইবে, তাহারা আমাদের শিক্ষালয়ে আরও দুই বৎসর থাকিয়া উৎকৃষ্টরূপ বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিক্ষা করিয়া জগতের কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইবে।

আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস এই, জগদীশ্বর এত দিনের পর আমাদিগকে একটী পাকা কাজ করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, এখন বিশ্বাসের সহিত এই পথে চলিতে পারিলে হয়।

বিবাহ—বিগত ২৭এ আষাঢ় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে একটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্র বিক্রমপুরের অন্তর্গত বয়রাগাদি নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকুমার ঘোষ বয়স ২৫ বৎসর। বরিশালে কার্য্য করেন। পাত্রী নেপালদেশীয়া কন্যা শ্রীমতী হিমাদ্রিবালা (পূর্ব্বনাম পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক এই নামটী কিছু দিন হইল রাখা হইয়াছে) বয়স অনুমান ১৭ বৎসর। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তিনি বিবাহ সভায় উপদেশের সময় কন্যার পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করিলাম। ৪ চারি বৎসরের কিছু অধিক সময় হইল নেপাল রাজ্যে একটি বিশেষ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ঘটে। তথাকার মন্ত্রীগণের দুইটী দল আছে। তাঁহাদের যখন যে দল প্রবল হয় তাঁহারাই রাজ্যে কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। উক্ত সময়ে যিনি মন্ত্রী ছিলেন তাঁহার বিপক্ষগণ হঠাৎ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে এবং এই উপলক্ষে নেপাল রাজধানীতে বিষম বিশৃঙ্খলা অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে থাকে। হত মন্ত্রীর স্ত্রী এবং পরিজনগণ পলায়নপূর্ব্বক কলিকাতায় আগমন করেন। আমাদের হিমাদ্রিবালা তাহাদেরই একজন। এই বালিকা নেপাল রাজপরিবারে রাণী (মন্ত্রী-পত্নী) দিগের এক জন সঙ্গিনী রূপে কার্য্য করিত। মন্ত্রী পরিবারের এই দুর্দ্দশার সময়ে হিমাদ্রিবালা এবং ইহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী এবং ইহাদের সম অবস্থাপন্না আর একটী রমণী উক্ত মন্ত্রী পরিবারের সহিত এখানে আগমন করিয়াছিল। কিছুকাল কলিকাতায় থাকিয়া ইহারা সকল প্রকার অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভের আশায় এক দিন পলায়ন করিয়া কলিকাতার পথে ভ্রমণ করিতেছিল। কলিকাতার পথে দুষ্ট লোকের অভাব নাই। তাহারা এই ভিন্ন দেশীয় পরিচ্ছদ পরিধানা ও অপরিচিতাদিগকে পাইয়া, আপনাদিগের মন্দ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ইহাদের পশ্চাতে জুটিয়াছিল। এবং প্রলোভনে ফেলিবার আয়োজন করিতেছিল। কিন্তু বিধাতার কৃপায় অতি আশ্চর্য্যরূপে ইহারা ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টিতে পতিত হইল। কলিকাতার কত প্রশস্ত পথ থাকিতে ইহারা বেনেটোলা গলিতে উপস্থিত হইয়াছিল। সেখানে কয়েকটী ব্রাহ্ম পরিবার বাস করিতেন। ইহারা তাঁহাদেরই আশ্রয় লাভ করিয়া এত দিন প্রতিপালিত হইয়াছে। যদি ব্রাহ্মগণ ইহাদিগকে আপন ভবনে স্থান না দিতেন, তাহা হইলে ইহাদিগের যে কি দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই ঘটনায় আমরা পরমেশ্বরের কৃপার আশ্চর্য্য নিদর্শন দেখিতেছি।

এই হিমাদ্রিবালার প্রতিপালন ভার বাবু উমাপদ রায় মহাশয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যথাসাধ্য ইহাকে কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছেন এবং শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। কিছুদিন হইতে এই বালিকাটী বরাহনগরের মহিলা বোর্ডিংএ থাকিয়া শিক্ষা লাভ করিতেছিল। উমাপদ বাবু এই বিবাহে যথোচিত অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং হিমাদ্রিবালার সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক যৌতুক উপহার প্রদান করিয়াছেন। এই বালিকার বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়ায়, আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি এবং প্রার্থনা করিতেছি এই নব দম্পতিকে দয়াময় ঈশ্বর নিরন্তর জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত করুন।

পূর্ব্ব বর্ণিত বিবাহটী ১৮৭২ সালের ৩আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করা হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ—গত ২৮এ আষাঢ় কলিকাতাবাসী শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাস মহাশয়ের পরলোক গতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় শ্রাদ্ধোপলক্ষে উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে হেম বাবু সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য ২০৲ কুড়ি টাকা দান করিয়াছেন।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ২য় ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণ।—১৮৯০

বিগত ১ম ত্রৈমাসিক রিপোর্টে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন প্রতি বুধবারে না হইয়া প্রতি মাসের ২য় ও ৪র্থ সপ্তাহে হইবে। এই তিন মাসও সেই বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য চলিয়াছে। এই তিন মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৬টী নিয়মিত ও ৪টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত ভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও এই সময় মধ্যে ২টী উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। (১ম) বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ৩১শে চৈত্র সায়ংকালে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে "ধর্ম্মসাধন প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ১লা বৈশাখ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে উপাসনা হয়। অপরাহ্নে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছিল।

বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রাতে ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সন্ধ্যাকালে উপাসনার কার্য্য করেন। (২য়) সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মোৎসব। নিম্নলিখিত ভাবে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ১লা জ্যৈষ্ঠ প্রাতে বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন। সন্ধ্যার সময় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় "ভাগবতী লীলা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন। পরদিন (সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের জন্মদিনে) প্রাতে বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় অপরাহ্নে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন এবং সায়ংকালে উপাসনা করেন।

৩রা জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে একটী সামাজিকসম্মিলন হয়। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্ম বালিকাদের জন্য একটী বিদ্যালয় খুলিবেন স্থির করিয়াছিলেন, এই সভায় সেই বিদ্যালয় প্রকাশ্য ভাবে খোলা হয়।

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়—বিগত ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে এই বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার সহিত জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানোন্নতি সাধনের সহায়তা করাই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই বিদ্যালয় খোলার প্রারম্ভ হইতেই ছোট ছোট বালকদিগকেও বালিকাদিগের সহিত শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। প্রথমে কয়েকটি বালক বালিকা লইয়া একটী Infant School খোলা হইয়াছিল। পরে Entrance School এর ৪র্থ শ্রেণীর অনুরূপ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে অপরাপর শ্রেণী খোলা যাইবে। এক্ষণে শিক্ষা কার্য্যের ভার যাঁহাদের উপরে ন্যস্ত রহিয়াছে, তাঁহাদের নাম—বাবু উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, বিএ, বাবু নকুড়চন্দ্র ঘোষ, বিএ, কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, কুমারী সরোজিনী ঘোষ, এবং বাবু অবিনাশ চন্দ্র বসু। আমাদের কয়েকটী বন্ধু এই স্কুলের সাহায্যার্থে এক কালীন অর্থ দান করিয়াছেন এবং কয়েকটী বন্ধু মাসিক দান করিতেছেন। এক জন বন্ধু শিক্ষালয়ের জন্য এক খানি ওমনিবস গাড়ী দান করিয়াছেন; ঘোড়া কিনিবার বন্দোবস্ত হইতেছে। যতদিন তাহা না হয়, ততদিন ভাড়াটিয়া গাড়ীতে বালক বালিকাদিগকে আনা হইবে। যাঁহারা এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন কোনও প্রকার অর্থ সাহায্য গ্রহণ না করিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাদিগকে এবং যাঁহারা অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন। বাবু মধুসূদন সেন, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমাপদ রায়, বাবু উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, আনন্দ মোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, কেদারনাথ রায়, মোহিনী মোহন বসু, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক, এবং কুমারী লাবণ্যপ্রভা বসু—সহকারী সম্পাদক।

প্রচার—নিম্নলিখিত স্থান হইতে প্রচারক মহাশয়দিগের নিমন্ত্রণ আসিয়াছিল;—কুষ্টিয়া, মুর্শিদাবাদ, বাগেরহাট, হাজারিবাগ, নওগাঁ, বরিশাল, কুমারখালী, শিলাইদহ, উলুবেড়িয়া, বংশবাটী, শিলচর, পুর্ণিয়া, এবং টাঙ্গাইল।

প্রচারক মহাশয়গণ নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—৩০এ চৈত্র হইতে ২৮এ বৈশাখ পর্য্যন্ত হাজারিবাগে অবস্থিতি করেন। এই সময় মধ্যে "অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম কি," "ভারত শাসন," "কয়েকটী আপত্তি খণ্ডন," "রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব" বিষয়ে ৪টী বক্তৃতা করেন। তথাকার উৎসব উপলক্ষে, ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং সামাজিক উপাসনাদিতে উপাসনা করেন, এবং উপদেশ প্রদান করেন। এবং কয়েকদিন আলোচনা ও সংকীর্ত্তনাদি করিয়াছেন। তথা হইতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবের সময় কলিকাতায় আগমন করেন। তৎপর ৮ই জ্যৈষ্ঠ বাঁশবেড়িয়ায় গমন করেন, এবং ৯ই আষাঢ় পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া, তথাকার উৎসব উপলক্ষে এবং সামাজিক উপাসনার দিনে উপাসনা ও আলোচনা করেন। এবং উপদেশ প্রদান করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—এই সময় মধ্যে অধিকাংশ সময় কলিকতায় থাকিয়া এখানকার সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসবোপলক্ষে উপাসনা ও "ধর্ম্ম-সাধন প্রাচীন ও নবীন" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসবে "ভাগবতী লীলা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন এবং এক বেলা উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য এবং পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। তত্ত্ব-কৌমুদী পত্রিকার সম্পাদকের কার্য্য এবং ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার সম্পাদনের সাহায্য করিয়াছেন। কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমনপূর্ব্বক উপাসনা আলোচনা ও বক্তৃতাদি করিয়াছেন। বরিশাল, উলুবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়ায় গমন পূর্ব্বক উপাসনা ও বক্তৃতা করিয়াছেন। এখানকার ছাত্রসমাজে একটী বক্তৃতা ও ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে পারিবারিক ঘটনা উপলক্ষে উপাসনা করিয়াছেন।

পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন—তাঁহার কার্য্যের কোন বিবরণ প্রদান করেন নাই।

শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব উপলক্ষে উপাসনা করেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের বাহিরেই কার্য্য করিয়াছেন, অধ্যক্ষ সভার নির্দ্ধারণানুসারে তাহা এই কার্য্যবিবরণে প্রদত্ত হইল না।

বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—উত্তর বঙ্গে নেলফামারী হইতে সৈয়দপুরে যান। সেখানে উপসনাদি করেন, তৎপর দিনাজপুরে দুইটী অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপাসনা করেন উপদেশ দেন। সমাজে এবং বন্ধুগণের গৃহে উপাসনা, আলোচনা করেন। এখান হইতে নাটোর ষ্টেশনে যান এবং উপাসনাদি করেন, এখান হইতে ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজে যান, তথাতে উপাসনাদি করেন। ফুলবাড়ী হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। এখানে কোন কোন পরিবারে উপাসনা করেন। কলিকাতা হইতে পিরোজপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যান, পথে বাগেরহাটে এক দিন থাকিয়া স্থানীয় নূতন প্রতিষ্ঠিত একটী সভায় উপদেশ

দেন। পিরোজপুরে ৪।৫ দিন থাকিয়া উৎসবোপলক্ষে উপাসনা, আলোচনা, পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। একদিন একটী প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, বক্তৃতার বিষয় "আধুনিক ধর্ম্ম।" পিরোজপুর হইতে বরিশালে যান, এখানে প্রায় তিন সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন, এ সময়ে সমাজে এবং বন্ধুগণের গৃহেতে উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন। সঙ্গতে আলোচনা করেন। ছাত্রসমাজে "ধর্ম্ম শিক্ষার সময়" "এখন আমরা করি কি?" এই বিষয়ে দুইটীবক্তৃতা হয়। বরিশাল হইতে ফিরিবার সময় পথে নলধা নামক গ্রামে বিশেষরূপে আহূত হইয়া যান, নলধা বালক সমিতির উৎসব উপলক্ষে তথাকার সভাতে বক্তৃতা ও উপাসনা করেন। নলধা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় কয়েকদিন থাকিয়া এক মৃত বন্ধুর পরিবারদের বন্দোবস্তের জন্য জগন্নাথপুরে যান, পথে কুষ্টিয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন। জগন্নাথপুরেও উপাসনাদি হয়, জগন্নাথপুর হইতে মানিকদহ যান, পথে রাজবাড়ী ষ্টেশনে একবেলা থাকিয়া সামান্য কিছু কায করেন, তৎপর ফরিদপুর গমন করেন, একদিন মাত্র থাকিয়া পারিবারিক উপাসনা করেন, তৎপর মানিকদহে যান, তথাকার সমাজে উপাসনা ও উপদেশ হয়। পুনরায় ফরিদপুরে আসিয়া ৭।৮ দিন থাকিয়া সমাজে, পরিবারে উপাসনা, উপদেশ প্রদান করেন, একদিন "ধর্ম্ম মানি কেন?" এই বিষয়ে একটী বক্তৃতা করেন, ফরিদপুর হইতে পুনরায় জগন্নাথপুরে মৃত বন্ধুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে যান, পথে হিজলাবটে পারিবারিক উপাসনা করেন। জগন্নাথপুরে শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশেষ উপাসনাদি হয়, রবিবারে কয়েকটী ভদ্রলোকদিগকে লইয়া উপাসনা ও উপদেশ প্রদান করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ বসু—বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক কলিকাতাতেই অবস্থিতি করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় এই তিন মাসের প্রথমভাগে ঢাকায় অবস্থিতি করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে উপাসনা করিয়াছেন। তথাকার আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকিয়া প্রশ্নের মীমাংসার সাহায্য করিয়াছেন। তথা হইতে তিস্তি, শ্রীবাড়ী, জলপাইগুড়ি, সিলিগুড়ি, হলদিবাড়ী, নেলফামারি, খোলাবাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে গমন পূর্ব্বক নানা প্রকারে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী শিলং হইতে চেরাপুঞ্জি, শেলা, মৌসমাই, মসলু, জেছির, মস্ত, নংজি প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্ব্বক উপাসনা আলোচনা ও বক্তৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে খাসিয়াদিগের অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। জেছির নামক স্থানে একটী বালিকার নামকরণ ব্রাহ্মধর্ম্মের পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। এবং বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী, শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ প্রসাদ, বাবু মনোরঞ্জন গুহ, বাবু কালীমোহন দাস, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন প্রভৃতি মহাশয়গণ নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন।

সঙ্গত সভা—এপ্রিল মাসে ২টী মে মাসে ৩টী ও জুন মাসে ৪টী অধিবেশন হয়। সকল অধিবেশনেই সভ্যগণ মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর উপস্থিত হইয়া উপাসনা ও প্রার্থনার পর আলোচনা করিয়াছিলেন। গত তিন মাসে সঙ্গতের সভ্য সংখ্যা বাড়িয়াছে। ১০।১২ জন সভ্য নিয়মিতরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এ ছাড়া আর ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রচারকগণ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনেক সভ্য উপস্থিত হইয়া ছিলেন। উক্ত তিন মাসে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির আলোচনা হইয়াছিল। "জীবনগত ও সমাজগত চরিত্র কত দূর সাধন হইয়াছে;" "বিশ্বাস কাহাকে বলে," "সংক্রামক রোগ," "ব্রাহ্মগণ সাঃ ব্রাঃ সমাজ দ্বারা কি কি উপকার লাভ করিয়াছেন," "সংসার মধ্যে সচেতন ভাব কি প্রকারে রক্ষা করা যায়," "পারিবারিক উপাসনা," "ধর্ম্মেতে কেন এত অমিল হইতেছে ও কি উপায় অবলম্বন করিলে পরস্পরে মিল হইতে পারে।" এ ছাড়া আর ২টী বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল।

দাতব্য বিভাগ—এই তিন মাসে মাসিক ৩৲ টাকা ২৲ টাকা, ১৲ টাকা, ৷৷০ আনা, হিসাবে ৫।৬টী পরিবারকে এবং ৪টী ছাত্রকে, এবং একটী পরিবারকে এককালীন ৬৲ ছয় টাকা দেওয়া হইয়াছে। মাসিক প্রায় ১৫৲ টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছে। এই তিন মাসের আয় ব্যয় বিবরণ এই—

জমা			খরচ	
পূর্ব্বস্থিত		১০৫/১০	মাসিক দান	৩৯৷৷০
চাঁদা আদায়		১০৪৲	এককালীন দান	৬৲
এককালীন	৮১৲		বিবিধ ব্যয়	/১৫
বার্ষিক	১৫৲			
মাসিক	৮৲			৪৫৷/১৫
	১০৪৲		স্থিত	১৬৩৷৶১৫
				২০৯
		২০৯/১০		

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—ইহার কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। এই তিন মাসের মধ্যে প্রেসে ৭৪৯।/০ টাকার কাজ হইয়াছে এবং ৭৫০৶১৫ আদায় হইয়াছে। নানা প্রকারে ৫৯০৶০ খরচ হইয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়াছেন। ইহার আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়। কিন্তু মেসেঞ্জারের অবস্থা আজিও ভাল হইতেছে না। পরলোকগত বন্ধু বজরংবিহারী মহাশয় তাঁহার উইলে মেসেঞ্জারের জন্য ২০০৲ টাকা দান করিয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি উক্ত বন্ধুর পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীরঙ্গ বিহারী এই টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় কমিটি—এই কমিটী বর্ত্তমান বৎসরের যে আনুমানিক হিসাব (Budget) প্রদান করিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, প্রায় ৫০০৲ টাকা দেনা না করিলে এবৎসর কার্য্য চলিবে না। এই অবস্থায় তাঁহারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে আয় বাড়াইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

এই তিন মাসে শিক্ষা কমিটির কোনও কাজ হয় নাই। প্রচার কমিটিরও কোন কাজ হয় নাই। উপাসক মণ্ডলীর কাজ নিয়মিত ভাবে চলিতেছে, কিন্তু আমরা তাহার বিশেষ কোন কার্য্যবিবরণ পাই নাই। ছাত্রসমাজের কার্য্য এতদিন বন্ধ ছিল, সম্প্রতি তাহার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিয়াছে, শীঘ্র এই বিদ্যালয়ের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। রবিবাসরিক বিদ্যালয়, পুস্তকালয় কমিটির কোন কার্য্যবিবরণ পাওয়া যায় নাই।

পুস্তক প্রচার কমিটি—"পরিবারে শিশুশিক্ষা" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। আরও দুই খানা পুস্তক কমিটির বিবেচনাধীনে আছে। জাতিভেদ (২য় প্রবন্ধ) ও চিন্তা-কণিকা নামক দুইখানা পুস্তক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়-			ব্যয়-	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের			প্রচার ব্যয়	৪৭৬॥৶১০
চাঁদা		২০২৶১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	২০৬।১৫
বার্ষিক চাঁদা	১৩৯৸৶০		ডাক মাশুল	৩৸৵১৫
মাসিক	৪৫৵০		পাথেয় হিঃ	২০৸/১৫
এককালীন	২৲		প্রচারক গৃহ হিঃ	১০৬৸/১০
শুভকর্ম্মোপ-লক্ষে প্রাপ্ত	১৫৵১৫		দরিদ্র ব্রাহ্ম বালকদিগের স্কুলের বেতন দান	৫৩৲
			কমিশন হিঃ	১০৸/০
	২০২৶১৫		বিবিধ হিঃ	৪১৸৶৫
প্রচার ফণ্ডের চাঁদা		৩০৮/৫		৯২০।৵১০
বার্ষিক	৫৩॥০		হাওলাত শোধ	১৯৲
মাসিক ,,	২৫১॥/৫			৯৩৯।৵১০
এককালীন	৩৲		স্থিত	১৭৯৶১৫
	৩০৮/৫			১১১৮॥৵৫
পাথেয় হিঃ		২২।০		
প্রচারক গৃহ হিঃ (বাড়ী ভাড়া)		১০০৲		
দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য সিটী কলেজ হইতে প্রাপ্ত		৫৩৲		
কর্ম্মচারীর বেতন তত্ত্ব-কৌমুদী ও পুস্তক ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত		৯০৲		
বিবিধ হিঃ				
গচ্ছিত হিঃ				
হাওলাত হিঃ				
পূর্ব্ব স্থিত				
		১১১৮॥৵৫		

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

বাকী মূল্য আদায়	৭৮।৵১০	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ	৪৪৸৶
নগদ বিক্রয়	৯০॥৶৫	পুস্তক বাঁধাই	৬./
সমাজের ৬১৸৵৫		কমিশন	
অপরের ২৮৸/		পুস্তকের ডাকমাশুল	৯।১০
	৯০॥৶৫	ডাক মাশুল	॥/
কমিশন	৫৸৶১৫	কাগজ	৩১॥/১০
পুস্তকের ডাকমাশুল	৫॥/১০	কর্ম্মচারীর বেতন	২১৲
গচ্ছিত হিঃ	।১০	মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	২৬॥০
		বিবিধ হিঃ	৶
	১৮০৸৶১০		১৪৫॥/৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	২৭৪৪৸৵	স্থিত	২৭৮০।৫
	২৯২৫৸/১০		২৯২৫৸/১০

তত্ত্বকৌমুদী।

মূল্য প্রাপ্তি	৩২৪৸৶	ডাকমাশুল	৬৯।৵৫
নগদ বিক্রয়	৵	কাগজ	৪৬৸৵
		কমিশন	৮৸৫
	৩২৫/	মুদ্রাঙ্কণ	১৩৫৲
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১৩৭৯৸৫	কর্ম্মচারীর বেতন	২৪৲
	১৭০৪৸/৫	বিবিধ হিঃ	৯।৶
			২৯৩।৶১০
		গচ্ছিত শোধ	৩২৲
			৩২৫।৶১০
		স্থিত	১৩৭৯।/১৫
			১৭০৪৸/৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্য প্রাপ্তি	৩০২৵	ডাক মাশুল	১০৯।৫
বিজ্ঞাপন হিঃ	১৬৲	কাগজ	৬৩॥০
দান প্রাপ্তি	২০০৲	মুদ্রাঙ্কণ	২৭৭৲
	৫১৮৵	কর্ম্মচারীর বেতন	৩০৲
গত স্থিত	২০৪।১৫	কমিশন	৮৸
	৭২২।৵১৫	বিবিধ হিঃ	১০৶৫
			৪৯৮॥৶১০
		স্থিত	২২৩॥৶৫
			৭২২।৵১৫

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত,
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২৭এ জুলাই অপরাহ্ণ ৭½ ঘটিকার সময় ১৩ নং মৃজাপুরষ্ট্রীটস্থ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। সভ্যগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

বিবেচ্য বিষয়।

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃক নিয়মাবলীর যে রূপ সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল এবং ১লা ও ১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্ব-কৌমুদীতে যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার অষ্টম নিয়ম হইতে) সংশোধন সম্বন্ধে বিচার।

২। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২১১নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট
২৮এ জুন ১৮৯০।

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেস শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১লা শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ১লা শ্রাবণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
৮ম সংখ্যা।

১৬ই শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য

কায়মনোবাক্যে।

কি কাজ তাহাতে যদি উঠিতে বসিতে
এ রসনা তব নাম গায়?
কি কাজ তাহাতে যদি তব নামাঙ্কিত
হয় দেহ মৃগ-চর্ম্ম প্রায়!
অসার—অসার—তাহা নারে জুড়াইতে
সংসার-উত্তাপ-তপ্ত মলিন আত্মায়।

—

রসনা রাখিব বাঁধা তোমার চরণে
দেহ মন রাখিব বিষয়ে;
তা হলে কিরূপে পাব সে অমূল্য ধনে
মূল্য যায় আপনা বিক্রয়ে?
প্রভু হয়ে বস যদি প্রাণ সিংহাসনে
তবে প্রেম জাগে ত হৃদয়ে।

—

এমনি রাজত্ব হোক, দেহ বাক্য মন
তিন হোক চরণে সংযত;
ঘুচুক বিদ্রোহ মোর জনম মতন;
থাকি তব ইচ্ছা অনুগত।
আনুগত্য হোক মোর অমৃত-ভোজন,
তাহে চিত্ত বাঁচুক নিয়ত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রণয় ও পরিণয়।—নরনারীর মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হওয়া কিছুই কঠিন কথা নহে। তাহা অল্প দিনে জন্মিতে পারে; পরস্পরে মিশিতে মিশিতে কাহারও রূপ গুণের কোনও দিক এরূপ মনে লাগিতে পারে, যে মন তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়িতে পারে। প্রণয়ের নবোচ্ছ্বাস আবেগের সহিত আসে; তখন যুবক যুবতীর মন তন্ময় হইয়া যায়; সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই জপমালা। কিন্তু প্রণয় যখন পরিণয়ে পরিণত হয়, সেই আবেগ-যুক্ত প্রেম যখন আপনার পাত্র বা পাত্রীকে চিরদিনের মত লাভ করে, তখনই প্রণয়ের পরীক্ষার দিন উপস্থিত হয়। একজনকে দুই দিন আবেগের সহিত প্রীতি করা এক কথা, আর চিরদিন তাহাকে প্রেমের সহিত সেবা করা আর এক কথা। প্রণয় কালে যে পূজা ও সেবা করিতেছে, সে যদি পরিণয় কালেও চিরজীবন সেবা ও পূজা করে, তবেই বুঝিতে পারা যায়, যে সেই প্রীতি প্রকৃত ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ঈশ্বর-প্রীতির সম্বন্ধেও এইরূপ। যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহার চিত্ত এক দিনে এক মুহূর্ত্তে ঈশ্বরের দিকে ফিরিতে পারে, ঈশ্বরের গুণানুবাদ শুনিয়া তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইতে পারে, তাঁহার করুণা স্মরণ করিয়া তাঁহার সহিত যোগের জন্য ব্যাকুল হইতে পারে; কিন্তু সেই পরিবর্ত্তিত হৃদয়কে চিরদিন ঈশ্বরের চরণে রক্ষা করা অতি কঠিন কথা। অনেকের অনুরাগের নবোচ্ছ্বাস আবার জুড়াইয়া যায়। ধর্ম্ম-জীবনের প্রারম্ভে বোধ হইয়াছিল, তাঁহারা দেহ মন প্রাণ ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে পারেন, একেবারে আত্মবিক্রয় করিয়া জন্মের মত তাঁহার ক্রীতদাস হইতে পারেন, তখন তাঁহাদের ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, ও স্বার্থত্যাগের যেন সীমা পরিসীমা ছিল না। কিন্তু প্রণয় যখন পরিণয়ে পরিণত হইল, ঈশ্বরের উপাসক শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল, তখন ক্রমে ক্রমে প্রেমের সেই উগ্রতা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। শেষে তাঁহারা নাম মাত্র ধর্ম্ম সমাজে ও ঈশ্বরের উপাসক দলে রহিলেন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ অন্য প্রভুর সেবা করিতে লাগিলেন। এই জন্য ধর্ম্ম-জীবনে প্রবেশেচ্ছু ব্যক্তি মাত্রকেই অনুরোধ করি, প্রেমের আবেগের সময়ে চিন্তা কর চিরদিনের মত ঈশ্বরকে হৃদয় মন অর্পণ করিতেছ কি না?

ভ্রাতৃভাব।—কোন গৃহস্থ প্রাতে উঠিয়া আপনার ক্ষেত্রে কতকগুলি মজুর প্রেরণ করিলেন। তাহারা গিয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। কেহ বা জমি চষিতেছে, কেহ বা ঘাস মারিতেছে, কেহ বা বীজ বাছিতেছে, কেহ বা রোপণ করিতেছে। বেলা এক প্রহর অতীত হইলে আর কয়েক জন মজুর সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল এবং আসিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। দ্বিতীয়

মজুরগণ আসিলে প্রথম মজুরগণ একটু একটু ঈর্ষা করিতে লাগিল। আমাদের কাজে ইহারা আসিল কেন? তাহারা কাস্তেখানা চায়,ইহারা দিতে সম্মত নহে,তাহারা হুকাতে তামাকু খাইতে চায়, ইহারা বারণ করে; যেন তাহাদিগকে কাজ করিতেই দিবে না। দ্বিতীয় ব্যক্তিগণ বার বার বলিতে লাগিল, ক্ষেত্রের প্রভু স্বয়ং আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। 'কিন্তু ইহারা সে কথাতে কর্ণপাত করে না; ঈর্ষার চক্ষেই দেখিতেছে ও ক্ষেত্র হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। এমন সময়ে ক্ষেত্রস্বামী উপস্থিত হইলেন, এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, ইহাদিগকে আমি প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষেত্রে তোমাদের যেরূপ কাজ করিবার অধিকার, ইহাদেরও সেইরূপ অধিকার, অতএব ইহাদের পথে বাধা দিও না। তখন প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ নিরস্ত হইল, এবং স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে লাগিল। ক্রমে উভয় দলের মধ্যে মিত্রতা জন্মিল। উভয় দলে আনন্দে গান করিতে লাগিল। ধর্ম্ম-সমাজ মধ্যে আমরা যে অনেক সময়ে পরস্পরকে ঈর্ষার চক্ষে দেখি ও এক দল অপর দলকে দূরে রাখিবার ইচ্ছা করি, তাহার কারণ এই যে আমরা ইহা বিশ্বাস করি না যে, যিনি আমাদিগকে তাঁহার ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার জন্য আনিয়াছেন, তিনিই অপর দলকে প্রেরণ করিয়াছেন। ঈশ্বর আমাদের সকলকে আনিয়াছেন, এই সত্যে যদি আমরা একবার বিশ্বাস করিতে পারি, এবং যদি স্বীয় স্বীয় উপাসনাকালে এই সত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে অনেক অপ্রেম বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে ঈশ্বরের হস্ত না দেখিতে পাওয়াতেই আমাদের দ্বারা তাঁহার কার্য্য সমুচিতরূপে সাধিত হইতেছে না।

ব্রাহ্ম সমাজের ভাব কিরূপ হইবে?—ব্রাহ্মসমাজ কি ভাবে চলিলে ঠিক ঈশ্বরের উপাসকদিগের সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, এই চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে কি অনুভব করা যায়? এই অনুভব করা যায় যে ঈশ্বর মানবের সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন,ব্রাহ্মসমাজের ও তদনুযায়ী ব্যবহার করা উচিত। প্রথমতঃ ঈশ্বর যেমন পাপীর উদ্ধারের জন্য ব্যগ্র ব্রাহ্মসমাজের ও সেইরূপ ব্যগ্রতা থাকা আবশ্যক। ঈশ্বর পাপীকে পরিত্রাণ করিবার জন্য যেমন তাহাকে অন্বেষণ করিতেছেন,ব্রাহ্মসমাজকেও সেইরূপ পাপীকে অন্বেষণ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর যেমন নবজীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিক অন্নপান দিয়া প্রতিপালন করেন, ব্রাহ্মসমাজ ও সেইরূপ ধাত্রীর ন্যায় প্রত্যেক নবজীবন প্রাপ্ত আত্মাকে পালন করিবেন। তৃতীয়তঃ ঈশ্বর যেরূপ সাধু-সংকল্পের চিরসহায় ব্রাহ্মসমাজও সেইরূপ মানবের সাধু-সংকল্পের চিরসহায় হইবেন। সাধু ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া যে ব্যক্তি আসিতেছে, তাহার সাধু-ইচ্ছা অনুভব করিবামাত্র সকলে তাহার সহায় হইবেন, বিঘ্ন উৎপাদনের প্রবৃত্তি থাকিবে না কিন্তু সাহায্যের প্রবৃত্তিই থাকিবে। চতুর্থতঃ ঈশ্বরের নিকট যেমন গুণের আদর ব্রাহ্মসমাজের নিকট ও সেইরূপ গুণের আদর হইবে; সেখানে ধনানুসারে পদ হইবে না কিন্তু ধর্ম্মানুরাগের অনুসারে পদ হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব্বদাই পূর্ব্বোক্ত কয়েকটী নিয়মানুসারে বিচার করিতে হইবে। যদি দেখা যায় ব্রাহ্মসমাজে পাপীর পরিত্রাণের জন্য ব্যগ্রতা নাই; নবজীবন প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে পোষণ ও প্রতিপালন করিবার দিকে দৃষ্টি নাই; সে জন্য কোন উপায় নাই; মানবের সাধু-সংকল্পের সহায়তা করিবার প্রবৃত্তি নাই; বরং এরূপ ব্যক্তির পক্ষে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া অনেকে সুখী হয়; এবং এখানে বিশ্বাসী প্রেমিক ও ধর্ম্মানুরাগী লোকের পদ নাই,ধনী ও বিষয়ীদিগেরই পদ, তাহা হইলে ভাবিতে হইবে এই সমাজ ধর্ম্মভাবে চলিতেছে না, তাহার মধ্যে বিষয়াসক্তির বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে।

গুরু ও শিষ্য—হিন্দুসমাজ মধ্যে গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধটা অগ্রে যাহাই থাকুক, এক্ষণে তাহা মৃত ব্যাপার হইয়া দাড়াইয়াছে। গুরু একবার আসিয়া কাণে মন্ত্র দিয়া যান; তৎপরে শিষ্যের সহিত তাঁহার কোন প্রকার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ থাকে না। শিষ্যের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতেছে কি অধোগতি হইতেছে গুরু সে সংবাদ রাখেন না। কেবলমাত্র মধ্যে মধ্যে আসিয়া কিছু অর্থ আদায় করিবার সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। হিন্দু সমাজের শিক্ষার গুণে গুরুর প্রতি বাহিরের সম্ভ্রম প্রদর্শন করিবার রীতি আছে। গুরুর চরণ বন্দনা করা, তাঁহার পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করা, তিনি না বসিলে আসন গ্রহণ না করা, প্রভৃতি সম্ভ্রমের সমুদয় চিহ্ন প্রকাশ করা হইয়া থাকে। এমন কি রমণীগণ গুরুর চরণ ধৌত করিয়া দিয়া আপনাদের আলুলায়িত কেশপাশ দ্বারা সেই চরণ মুছিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু এই সকলের মূলে যদি প্রবিষ্ট হওয়া যায়, তাহা হইলে কোন প্রকার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় না। এ সকল কার্য্যের সহিত আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তির কোন সংশ্রব নাই। যে রমণী নিজ কেশপাশ দ্বারা গুরুর চরণ মুছাইয়া দিতেছেন তাঁহার জীবন ও গুরুর জীবন একত্র তুলনা করিলে মনে হয় যে নিজের কেশ দ্বারা সেই নারীর পদ মুছাইয়া দেওয়া উক্ত গুরুর কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়, এরূপ লৌকিক শিক্ষা দাঁড়াইয়াছে যে গুরুর চরিত্র যেরূপ হউক না কেন, শিষ্যের পক্ষে তাঁহার সমুচিত পূজা করা কর্ত্তব্য। গুরু যখন নিকটে নাই, তখন তাঁহার চরিত্রের উল্লেখ করিয়া নারীগণ হয়ত ঘৃণা প্রকাশ করিতেছেন, আবার সেই গুরু গৃহে আসিলেই সেই নারীগণকে গলবস্ত্রে তাঁহার চরণধূলি লইতে হইতেছে। এইরূপে বর্ত্তমান গুরু শিষ্যের সম্বন্ধের বিষয় চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাহিরের আবরণটা আছে, ভিতরের প্রাণটা নাই। এই সকল কারণে গুরু ও শিষ্য এই দুইটী শব্দ উচ্চারণ করিলে ব্রাহ্মদিগের মনে এক প্রকার ত্রাস জন্মে। কিন্তু প্রকৃত গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে ত্রাসের বিষয় কিছুই নাই। বরং এতদূর বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ ধর্ম্ম জীবন গঠনের অতিশয় উপযোগী। এমন সহায়তা অতি অল্প বিষয় হইতেই লাভ করা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধের এক দিকে গভীর দায়িত্ব বোধ, অপর দিকে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং প্রেম উভয়ের বন্ধন-রজ্জু স্বরূপ। মনে কর সমাজ মধ্যে একজন ধর্ম্ম জীবনে অগ্রসর ব্যক্তি

আছেন, স্বভাবতঃই কতকগুলি ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন; সর্ব্বদা একত্র বাস, একত্র আলাপ, একত্র সাধনদ্বারা তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার গভীর ও মধুর আত্মীয়তা স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত অগ্রসর ব্যক্তির মুখ হইতে যে কথা বিনির্গত হয়, ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিগণ তাহা সমগ্র হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করেন; তাঁহার এক একটী উপদেশ জীবন্ত শক্তিরূপে তাঁহাদের হৃদয়ে বাস করে; তাঁহারও উক্ত ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তিদের প্রতি গভীর প্রেম, তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের প্রতি তাঁহার সজাগ দৃষ্টি; সর্ব্বদাই তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত। ইহাই প্রকৃত গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ, এরূপ সম্বন্ধ দ্বারা কল্যাণ ভিন্ন অকল্যাণের সম্ভাবনা নাই। আমাদের এতদূর মনে হয়, যে সমাজে এরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্ভব নহে, সে সমাজ ধর্ম্ম সাধনের অনুকূল নয়, তাহাতে ধর্ম্মজীবন গড়িতে পারে না। ধর্ম্মানুরাগ এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে সংক্রান্ত হইয়া থাকে; যেখানে নিগূঢ় আধ্যাত্মিক যোগ নাই, এই প্রকার গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেমের সম্বন্ধ নাই, সেখানে ধর্ম্মানুরাগ এক হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে যাইতে পারে না। এই কারণেই কাহারও সাধুভক্তি ও গুরুভক্তি বাড়িতেছে দেখিলে আমরা সুখ অনুভব করিয়া থাকি; এবং যে প্রচার বা যে আচরণ দ্বারা সাধুভক্তি ভাঙ্গিয়া যায়, তাহাকে ধর্ম্ম-জীবনের পক্ষে অনর্থকর বলিয়া মনে করি।

গুরুভক্তি ও জ্ঞানোন্নতি—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ উৎকট স্বাধীনতা-প্রিয়তার সময়। এই যুগ গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ বর্দ্ধিত হইবার সময় নহে। তথাপি দেখিতেছি, এ সময়েও যেখানে যেখানে পূর্ব্বোক্ত প্রকার আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন হইতেছে, সেই খানেই প্রকৃত উন্নতি দেখা যাইতেছে। টিণ্ডেল যদি ফ্যারাডের চরণে না বসিতেন, তবে তাঁহার বিজ্ঞানের প্রতি এত প্রেম জন্মিত কি না সন্দেহ। এক একজন প্রতিভাশালী গুরু কতিপয় অনুরাগী শিষ্যের অন্তরে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত করিয়া যাইতেছেন, তাঁহার সেই জ্ঞানস্পৃহাকে শিষ্যেরা জ্বলন্ত অগ্নিশিখার ন্যায় হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্য করিতেছেন। যেখানে এরূপ অনুরাগী ও জ্ঞান-স্পৃহাবান শিষ্যদল থাকিতেছে না, সেখানে জ্ঞানচর্চ্চা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া যাইতেছে। লৌকিক জ্ঞানের উন্নতিই যখন আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ ব্যতীত সাধিত হয় না, তখন ধর্ম্মজীবনের উন্নতি কিরূপে সাধিত হইবে? ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগকে যাহাতে আমাদের মধ্যে ধর্ম্মানুরাগে অগ্রসর ব্যক্তিদিগের চরণে বসাইতে পারা যায়, সে দিকে ব্রাহ্ম পিতা মাতার দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতা কোথায়?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সপক্ষ বিপক্ষ উভয় শ্রেণীর লোকেই মধ্যে মধ্যে উক্ত সমাজের দোষ গুণের সমালোচনা করিয়া থাকেন এবং মধ্যে মধ্যে ইহার কার্য্য প্রণালীর দোষ প্রদর্শন করিয়া অনেকে আমাদিগকে পত্রাদিও লিখিয়া থাকেন। আমাদের যে কিছু ত্রুটী আছে, আমরা যে তাহার প্রতি অন্ধ এরূপ নহে। কোন কার্য্যের ভার যাঁহাদিগের উপরে থাকে সে কার্য্যের গুরুত্ব ও দায়িত্ব যেরূপ তাঁহারা বুঝিতে পারেন সেরূপ অপরে পারে না। দূর হইতে একটী বিষয়কে সহজ ও সুন্দর বোধ হইতে পারে; কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেই তাহার মধ্যে কোথা কি আছে, তাহার পথে কি কি বিঘ্ন বিদ্যমান আছে তাহা বুঝিতে পারা যায়; সে বিষয়ের দুর্ব্বলতা কোথায় তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। বিশেষতঃ সামাজিক গঠন ও শাসন বিষয়ে, কাগজ পত্রে একটী সুন্দর অত্যুৎকৃষ্ট অতি উদার শাসন-প্রণালী রচনা করা যাইতে পারে; কাগজে তাহা নির্দ্দোষ দেখাইতে পারে; কিন্তু যখন এই দোষ গুণে জড়িত মানব-সমাজে সেই প্রণালী খাটাইতে যাওয়া যায়, তখন তাহার ভিতরকার ত্রুটী বাহির হইয়া পড়ে; হয়ত কাগজের সুন্দর প্রণালী কার্য্যতঃ অবলম্বনের অনুপযুক্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়। সেই সকল ব্যক্তিই সুচতুর ও বুদ্ধিমান্, যাঁহারা কাগজে উৎকৃষ্ট প্রণালী রচনা করিবার জন্য ব্যগ্র নহেন, কিন্তু জাতীয় প্রকৃতির দোষগুণ বিচার করিয়া তাহাদের উপযোগী উন্নতিশীল প্রণালী আবিষ্কার করিতে পারেন। আমরা বিগত দ্বাদশ বৎসরকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের সহিত সংসৃষ্ট রহিয়াছি। ইহার কার্য্যপ্রণালীর দোষগুণ কি তাহা আমরা যেমন অনুভব করিতে পারিয়াছি এরূপ অপরে পারেন নাই। তবে একথা সত্য যে মানুষ নিজের দোষ নিজে যত দেখিতে না পায় অপরে তাহা দেখে। এই কারণে আমাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যখন যিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়াছি; এবং বিগত দ্বাদশ বৎসরে দেখিতেছি, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ সর্ব্বদাই আপনাদের কার্য্যপ্রণালীর উন্নতি সাধনে সচেষ্ট রহিয়াছেন। কার্য্য করিতে যেখানে বাধিতেছে; কোনও ত্রুটী ধরা পড়িতেছে, অমনি তাহার প্রতিবিধানে তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন। ইহা আশা-প্রদ। মানুষ যদি সজাগ থাকে ও নিজের দোষের প্রতি অন্ধ না হয় তাহা হইলেই তাহার বাঁচিবার পথ রহিল। আমরা অদ্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কয়েকটী দুর্ব্বলতার কারণ উল্লেখ করিব। ইহা অপরের জন্য নহে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের জন্য। তাঁহারা এই সকল বিষয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তা করেন ইহাই প্রার্থনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে কিছু দুর্ব্বলতা দেখা যাইতেছে, তাহা ইহার জন্মগত দুর্ব্বলতা। ইহার জন্মকালে ইহা যে যে ভাব লইয়া অভ্যুদিত হইয়াছিল, সেই সকল ভাব এখনও ইহার মধ্যে কার্য্য করিতেছে এবং সেগুলি এক সময়ে সবলতার কারণ হইয়াও এক্ষণে দুর্ব্বলতার কারণ হইতেছে।

যে যে বিশেষ ভাব লইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান ভাব ব্রাহ্মসমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী সংস্থাপন। ইহার উদ্যোগ-কর্ত্তারা অনুভব করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপিত না হইলে, ইহার কার্য্য সুচারু রূপে চলিবে না। তাঁহারা যেন ব্রাহ্মসমাজের লোকদিগকে বলিলেন,—দেখ নিয়মতন্ত্র

প্রণালী না থাকাতে কি অনিষ্ট ঘটিতেছে; অতএব আমরা এই নূতন সমাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর আদর্শ দেখাইব। এই নিয়মতন্ত্র প্রণালীর ভাব তখন প্রধান রূপে তাঁহাদের চিত্তে ছিল। এই টাই যেন তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। সে সময়ে তাঁহারা যে নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়াছিলেন এবং যে নিয়মাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী রূপে পরিগৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহার সর্ব্ব প্রথমে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যে উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রতীতি হইবে যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করাই তাঁহাদের সর্ব্ব প্রধান লক্ষ্য ছিল।

নিয়মতন্ত্র প্রণালী স্থাপন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য এই ভাব মাথায় লইয়া আমরা যাত্রা করিলাম। আবার নিয়মতন্ত্র প্রণালীর অর্থ তখন আমরা এই বুঝিয়াছিলাম, যে তদ্দারা ব্যক্তিগত যথেচ্ছাচারকে দমনে রাখে। আমরা যেন মনে মনে বলিতে লাগিলাম—কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিয়াছেন, তাঁহাকে শাসনাধীন করিবার কেহ নাই, আমাদের মধ্যে এরূপ হইবে না, কারণ আমরা নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিব। নিয়মতন্ত্র প্রণালীর অর্থ কর্ম্মচারীদিগকে দমনে রাখা। এই ভাব মাথায় লইয়া আমরা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আমাদের সকল কাজেই এই ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। যখনই কোন সভা ডাকা হয়, আমরা এই ভাব মাথায় লইয়া যাই, যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী রাখিতে হইবে অর্থাৎ কর্ম্মচারীদিগকে শাসনাধীন করিতে হইবে। সুতরাং সভাতে বসিয়া এভাব মনে আসে না যে দশজনে কাজটা কিরূপে সহজে ও শীঘ্র করিয়া ফেলিব, কর্ম্মচারিদিগকে দশটা মাথার সাহায্য দিয়া কিরূপে সবল করিব, কিন্তু এই ভাবই মনে আসে, তাহাদের কার্য্যের কোথায় কি ত্রুটী আছে, কোথায় কি দোষ আছে, তাহা ধরিয়া টানাটানি করিতে হইবে, কারণ আমরা যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর পাণ্ডা; অর্থাৎ আমরা যে দমন ও শাসন করিতে আসিয়াছি। এই ভাব সভ্যদের মনে প্রবল থাকাতে প্রথম কয়েক বৎসর সভার কার্য্য করা দুর্ঘট হইত,—সামান্য একটা রিপোর্ট পাঠ, যাহা অন্যান্য সভাতে ৫ মিনিটে হয়, আমাদের পাঁচ ঘণ্টা লইত। পাছে কেহ অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করে, এই ভয় সভ্যগণের মনে এত প্রবল দেখা যাইতে লাগিল যে, যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা প্রতি বৎসর নূতন করিয়া গঠিত হয়, যাঁহাদিগকে প্রত্যেক তিন মাস নিজ কার্য্যের হিসাব দিতে হয়, সেরূপ কার্য্যনির্ব্বাহক সভারও সভ্যগণ অতিরিক্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমাজকে বিপদে ফেলিবেন বলিয়া মধ্যে মধ্যে আন্দোলন উঠিতে লাগিল। ঐ যে মূলাতে সেই ভাব আছে, শাসন—শাসন—শাসন। নিয়মতন্ত্রের অর্থই শাসন। নিয়মতন্ত্রের আর একটা অর্থ আছে। সেটা এই;—দুখানা হাতেও একটা মাথাতে যে কাজ হয়, তদপেক্ষা বিশখানা হাতে ও দশটা মাথাতে ভাল কাজ হয়; একজনের শক্তিতে সমাজের যে সেবা হয়, দশজনের শক্তি সমবেত হইলে তদপেক্ষা ভাল সেবা হয়। এ অর্থটা এখন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মনে ভাল করিয়া বসে নাই। এখনও সমাজের কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বন্ধে পরস্পরের সহায় হইবার প্রবৃত্তি প্রবল দেখা যাইতেছে না।

নিয়মতন্ত্র প্রণালীই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য—এই ভাব এখনও সভ্যদিগের মনে প্রবল রহিয়াছে। ইহার দুইটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতে পারে। প্রথম, আজ যদি ইহঁাদিগকে সভাতে ডাকিয়া বলা যায় "তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন কতকগুলি ব্যক্তিকে মনোনীত কর, যাঁহারা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য হইবেন, যাঁহাদের উপরে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার কার্য্যের ভার অর্পিত থাকিবে। তখন তাঁহারা কিরূপ ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিবেন? যাঁহারা ধর্ম্মভাবে সকলের শ্রদ্ধেয়, উপাসনাশীল, আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর এরূপ ব্যক্তিদিগকেই কি বাছিবেন? না নিয়মতন্ত্র প্রণালী যাঁহারা বুঝেন, সে বিষয়ে যাঁহাদের দূরদর্শিতা আছে, সে বিষয়ে যাঁহাদের সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ ব্যক্তিদিগকেই মনোনীত করিবেন? তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকেই মনোনীত করিবেন। তাহাদের ধর্ম্মভাব আছে কিনা, বৎসরের মধ্যে একদিনও উপাসনালয়ে আসেন কিনা, সমাজের কোন প্রকার আধ্যাত্মিক কার্য্যে যোগ দেন কিনা তাহা দেখিবেন না। ধর্ম্মভাব নাই বা থাকিল, বৎসরে একবারও মন্দিরের চৌকাট নাই বা পার হইল—নিয়মতন্ত্র আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, আমরা সেইরূপ লোকই চাই। ইহা দেখিয়া যদি কেহ বলেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্ম জীবন গঠন অপেক্ষা নিয়মতন্ত্র গঠনের দিকে অধিক দৃষ্টি তাহা হইলে কি অন্যায় কথা বলা হয়?

আর একটী দৃষ্টান্ত—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যখন সভাসীন হন, তখন কিরূপ কার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সময় যাপন করেন? সমাজ মধ্যে কিরূপে ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি হয় সেই চিন্তাতে? অথবা নিয়মতন্ত্রটা কিরূপে পাকারূপ চলে সেই চিন্তাতে? একথা যদি বলা যায় যে নিয়মতন্ত্রের উন্নতি তাঁহাদের অধিকাংশ চিন্তাও সময় গ্রাস করে, ধর্ম্ম জীবনের চিন্তা অতি স্বল্প সময় অধিকার করে তাহা হইলে কি অত্যুক্তি করা হয়? ইহাতেই সমাজের ভাব গতিক বেশ বুঝিতে পারা যায়। একজন উত্তর পশ্চিমে বাস করিত, সে সরবত খাইবার জন্য ১০টার সময় বাটী মাজিতে গেল। বাটী মাজিতেছে, বাটী মাজিতেছে, বাটী মাজিতেছে, ১১টা, ১২টা, ১টা, ২টা, ৩টা, ৪টা, সকল ঘণ্টাই বাজিয়া গেল; শেষে সায়ংকালে বাটী মাজা শেষ হইল; তখন আর সরবত খাইবার সময় নাই। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সভ্যগণের যেন এইরূপ দশা ঘটিয়াছে। ইহাঁরা ধর্ম্ম-জীবন-রূপ সরবত রাখিবার জন্য নিয়মতন্ত্ররূপ বাটী মাজিতেছেন; কিন্তু বার বৎসরে এ বাটী মাজা শেষ হইল না; সরবতটা ভাল করিয়া প্রস্তুত করিবার অবসর নাই। শেষে যখন সূর্য্য অস্ত যাইবেন, অন্ধকার আসিবে, তখন বোধ হয় সরবতের চিন্তা হৃদয়ে উদিত হইবে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় দোষও জন্মগত দোষ। ইহার উদ্যোগী সভ্যগণ কেশব চন্দ্রের শিষ্যগণের তাঁহার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি দেখিয়াছিলেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির

হইলেন, আমাদের এখানে মানবের প্রতি এত অতিরিক্ত ভক্তি কখনই দেখান হইবে না। এই ভাব প্রবল থাকাতে আমাদের মধ্যে সাধুভক্তি সমুচিত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে পারে নাই। এখানে নবাগত যুবকেরা প্রাচীনদিগের কার্য্যের যেরূপ ভাবে সমালোচনা করে, তাহাতে ধর্ম্ম ভাব বর্দ্ধিত হইবার কথা নয়। কিন্তু অপর দিকে সাধুভক্তি না হইলে ধর্ম্মজীবন দাঁড়াইতে পারে না। একারণেও ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধেও আমাদের সমুচিত উন্নতি হইতেছে না।

তৃতীয় দুর্ব্বলতাটীও সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। নববিধানী বন্ধুগণ তাঁহাদের সমাজকে বিধান—বিধান—বিধান বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাদের বিরুদ্ধ ভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তাঁহারা যে কথার বাড়াবাড়ি করেন আমাদের তাহাতে বিরুদ্ধভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। বিধান শব্দটার প্রতি যেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের কিছু অপ্রীতি জন্মিল। নববিধানীগণ বলিতে লাগিলেন, আমাদের এটা বিধান, এখানে ভগবান লীলা করিতেছেন,—সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যগণ যেন বলিতে লাগিলেন,—আমাদের সমাজে আমরাই লীলা করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে বিধাতার একটা বিধি এভাব ইহার সভ্যগণের মনে আজিও তেমন করিয়া বসে নাই। ইহার প্রমাণ এই, অনেকে এক কথায় ইহাকে ছাড়িতে পারেন, আবার এক কথায় ধরিতে পারেন। এ সমাজকে ঈশ্বরের বিধি বলিয়া বিশ্বাস না থাকাতে সভ্যগণ ইহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বরের হস্ত ইহার মধ্যে না দেখিলে কেন লোকের স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি জন্মিবে। যিনি দেখিতেছেন, ভগবান ইহার কার্য্যের সারথিরূপে বিদ্যমান, তিনিই ইহার জন্য সর্ব্বস্ব দিয়াও ভাবিবেন কিছু দিলাম না। আর যিনি দেখিবেন ইহা তোমার আমার কার্য্য তাঁহার সে প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন? সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতা এই সকল মৌলিক কারণের মধ্যে নিহিত।

আইন সম্মত বিবাহ।

পূর্ব্বোক্ত শিরোনাম দিয়া একটী প্রবন্ধ শ্রাবণ মাসের তত্ত্ব-বোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধ লেখক পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে তিনি তাঁহার জীবনের শেষদশায় ১৮৭২ সালের তিন আইনকে নিরীশ্বর বিবাহ বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। উদ্ধৃত অংশটুকু এই—The Act passed for the benefit of Brahmos in 1872 Act III discards the very name of God and tends to promote godless civil marriages for which India is not ripe. . . . Marriages of a godless and atheistic character ought to find no encouragement."—তত্ত্ববোধিনী ইহার যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা এই—"ব্রাহ্মগণের উপকারের জন্য যে ১৮৭২ সালের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ঈশ্বরের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে; ইহাতে নিরীশ্বর ও অধর্ম্ম্য বিবাহ প্রশ্রয় পাইবে, ভারত বর্ষ এরূপ বিবাহ প্রবর্ত্তন জন্য প্রস্তুত নহেন। * * নিরীশ্বর ও নাস্তিক ভাবের বিবাহে উৎসাহ দেওয়া কোন রূপেই কর্ত্তব্য নহে।" এই পত্র কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৮০ সালে Sir William Muir কে লিখিয়াছিলেন।

আমরা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পত্রের শেষ অংশটুকুর সহিত সায় দিতে পারিতেছি না। যাঁহারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নহেন, যাঁহাদিগের বিবেক বিবাহকালে ঈশ্বরের নাম গ্রহণে বাধা দেয়, তাঁহারা বিবাহের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিবেন এরূপ কথা আমরা বলিতে পারি না। আমরা যে তাঁহাদিগকে বলিব—তোরা যখন ঈশ্বর মানিস না তখন তোদের আবার বিবাহ কি? তোদের আবার স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ কি? তোরা পশুর মত জীবন যাপন কর, তাহা হইতে পারে না। বরং যতদূর স্মরণ আছে ১৮৭২ সালের ৩ আইনের আন্দোলনের সময়ে কেশব বাবু যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী প্রধান যুক্তি এই ছিল, যে যদি দুই জন লোকও এরূপ উপস্থিত হয় যাহারা বলিতেছে, যে তাহারা প্রচলিত কোন বিবাহ প্রণালী অনুসারে বিবাহিত হইতে পারে না, কারণ তাহাদের বিবেকে বাধা দেয়, গবর্ণমেণ্টের এমন উপায় করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে তাহারা আইন অনুসারে বিবাহিত হইতে পারে; তাহা না হইলে তাহা-দিগকে বিবেকপরায়ণতার ও মনুষ্যত্বের জন্য গুরুতর সাজা দেওয়া হয়। তিনি যে ভাবে এই যুক্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, আমরা সেই ভাবেই বলি আস্তিক, নাস্তিক, সকলেরই বিবাহের অধিকার থাকা কর্ত্তব্য এবং সকলের বিবাহকেই রাজবিধির আশ্রয় দেওয়া আবশ্যক।

তবে নিরীশ্বর বিবাহবিধি ব্রাহ্মদিগের লওয়া উচিত কিনা ইহা স্বতন্ত্র প্রশ্ন। নিরীশ্বর বিবাহ ব্রাহ্মের চক্ষে বিবাহই নয় এবং আমরা কখনই এরূপ বিবাহকে ব্রাহ্ম-বিবাহ বলিয়া পরি-গণিত করি নাই। বিগত অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যে এরূপ কতকগুলি বিবাহ হইয়া গিয়াছে, যাহাতে পাত্র পাত্রী ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহারা ধর্ম্ম-সমাজের নিয়মানুসারে বিবাহ করেন নাই, কেবল মাত্র তিন জন সাক্ষী ও রেজীষ্ট্রারের নিকটে স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বিবাহিত হইয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখাই এরূপ বিবাহকে ব্রাহ্মবিবাহ বলেন নাই। বরং ব্রাহ্মদিগের যত-গুলি বিবাহ ৩ আইন অনুসারে হইয়াছে, তাহাতে ৩ আইনকে উপলক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহাই ঠিক হইয়াছে, ইহা ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মভাবের প্রবলতারএকটী প্রধান প্রমাণ। কিন্তু আইনটী আর এক কথা বলিতেছে, আইনটী বলিতেছে তিন জন সাক্ষী ও রেজিষ্ট্রারের সমক্ষে পরস্পরকে পতি পত্নী বলিয়া প্রমাণ করাই মুখ্য কার্য্য,ধর্ম্মার্থে যাহা কর তাহা উপলক্ষ্য মাত্র, করিলেও হয়, না করিলেও হয়। বিবাহের ন্যায় গুরুতর কার্য্যেও ঈশ্বরের নাম গ্রহণ না করিলেও চলে। আমরা জানি এই কারণে অনেক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মের ৩ আইনের প্রতি ততটা আস্থা নাই।

কিন্তু এস্থলে ইহাও ব্যক্তব্য এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের কোন দোষ নাই, তাঁহারা অনেক ঘা খাইয়া সর্ব্বশেষে এই নিরীশ্বর ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে ব্রাহ্ম বিবাহ বিধি বলিয়া ব্রাহ্মদিগের জন্য বিবাহ বিধি করিতে যাইতেছিলেন। তখন

আদি সমাজ বলিলেন, আমরাও ব্রাহ্ম, আমরা রাজবিধি প্রার্থী নহি, আমাদের নামে কেন আইন কর। সেই ধাক্কা খাইয়া রাজপুরুষগণ আবার পরিবর্ত্তিত করিয়া ব্রাহ্ম নাম ছাড়িয়া দিয়া এক বিল প্রস্তুত করিলেন। তাহা হইতে ব্রাহ্ম নাম গেল কিন্তু ঈশ্বরের নাম থাকিল। তখন কলিকাতাবাসী নাস্তিক দিগের মুখপাত্র স্বরূপ কয়েক ব্যক্তি রাজপুরুষদিগের সহিত দেখা করিয়া বলিলেন—এত দূর যদি আসিয়াছ তবে ঈশ্বরের নামটাও বর্জ্জন কর। আমাদিগকে কেন বিবাহের অধিকার হইতে বঞ্চিত কর। কাজেই তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরীশ্বর সিভিল বিবাহের বিধি প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইলেন। সে সময়ে কেশব বাবু যদি এই অনুরোধ করিতেন যে আচ্ছা নাস্তিকদের জন্য একটা নিরীশ্বর প্রতিজ্ঞাপত্র থাক, ব্রাহ্মদিগের জন্য ঈশ্বরের নাম যুক্ত একটা প্রতিজ্ঞা ও থাক তাহা হইলে বোধ হয় সে অনুরোধ গ্রাহ্য হইতে পারিত। কিন্তু সেরূপ অনুরোধ করা হয় নাই, কাজেই ৩ আইন সম্পূর্ণ সিবিল বিবাহের বিধি হইয়া বহির্গত হইল।

আর একটা বিষয়ে অনেক ব্রাহ্মের বিশেষ আপত্তি দেখিতে পাই। ৩ আইনের রেজিষ্ট্রারের নিকটে যে বর কন্যাকে বলিতে হয়, আমি হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি কোন ধর্ম্মে বিশ্বাস করি না। এটা অনেক ব্রাহ্মের মনে লাগে। তাঁহারা এরূপ অভাব মুখে আপনাদের বিশ্বাসের পরিচয় দিতে ইচ্ছা করেন না। আমি ইহা নই, তাহা নই, এরূপ পরিচয় দেওয়া অপেক্ষা তাঁহারা ইহাই বলিতে চান যে আমরা একমাত্র চিন্ময় ঈশ্বরের উপাসক। অন্য সকল ধর্ম্মের সহিত বিরোধ থাকা দূরে থাক, সকলের প্রতি আমাদের প্রেম ও সকলের সহিত আমাদের সদ্ভাব। ইহা অতি সত্য ও সারবান কথা। কিন্তু এ বিষয়েও আমরা রাজ পুরুষদিগকে দোষ দিতে পারি না। সার হেন্‌রি মেইন কেশব বাবুকে ব্রাহ্মের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ঠিক লক্ষণ দেওয়া দুষ্কর বোধ করিয়াছিলেন। সেই জন্যই ঐ প্রকার অভাবাত্মক লক্ষণ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

যাহা হউক যাঁহারা ৩ আইনের উক্ত অংশ গুলির প্রতি আপত্তি করিতেছেন, তাঁহারা কেন উদ্যোগী হইয়া তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করেন না? গবর্ণমেণ্টকে যদি অনুরোধ করা যায়, যে তাঁহারা ব্রাহ্মদিগের উপযুক্ত একটী প্রতিজ্ঞাপত্র ঐ আইনে যোগ করিয়া দিন, যাহার ইচ্ছা হইবে, নিরীশ্বর প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণ করিতে পারিবে, ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞাপত্রই গ্রহণ করিবেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট যে সে কথায় কর্ণপাত করিবেন না, এরূপ বোধ হয় না।

সংগ্রামেই বিকাশ।

১২ই শ্রাবণ রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

আমরা প্রতিদিন যে সকল দ্রব্য আহার করি, যে সকল পদার্থ আমাদের উদরসাৎ হইয়া দেহের পুষ্টি সাধন করে তাহার সকলই কি সারভাগ? তাহা ত নহে। তাহার সারাংশের সহিত অনেক অসার অংশ থাকে, যাহাদ্বারা আমাদের দৈহিক ধাতুপুঞ্জের কিছুই গঠিত হয় না। না হয় অস্থি, না হয় মজ্জা, না হয় মাংসপেশী, কিছুই হয় না। প্রত্যুত ঐ সকল অসার দ্রব্য কোন না কোন আকারে আমাদের দেহ হইতে বহির্গত হইয়া যায়। এমন খাদ্য দ্রব্যই নাই যাহাতে সার অসার মিলিত নহে। এখন প্রশ্ন এই, যে দ্রব্যে আমাদের দেহের কিছুই' গঠিত হইবে না, বিধাতা তাহাকে আমাদের খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলেন কেন? সম্পূর্ণ সারভাগ দ্বারা আমাদের খাদ্য বস্তু প্রস্তুত করিলেন না কেন? আমি একবার মান্দ্রাজ সহরে একজন ডাক্তারের একটী বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম। বক্তৃতাটী মানবের খাদ্য বিষয়ক ছিল। বক্তা বলিলেন—আমাদের খাদ্য বস্তুর সহিত সর্ব্বদাই কিছু না কিছু ধূলা মাটী থাকে, তাহাতে ভীত বা চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই, কারণ উত্তমরূপ পরিপাক কার্য্যের জন্য সার ভাগের সহিত কিঞ্চিৎ অসার ভাগ থাকা প্রয়োজন, এবং সকল খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে তাহা আছে। কথাটী তখন আমার নূতন লাগিয়াছিল। পরে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি সকল বিভাগেই প্রকৃতির এই নিয়ম দেখা যায়, যে সার ও অসার, সৎ ও অসৎ একত্র হইয়া থাকিবে। মহা সাবধান হইয়াও যদি ক্ষেত্রে বীজ বপন কর শস্যের সঙ্গে ঘাস জন্মিবেই জন্মিবে। এইরূপ গূঢ় আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিন্তা করিলেও দেখা যায় যে প্রত্যেক ব্যক্তির চরিত্রে ও প্রত্যেক সমাজের চরিত্রে সৎ ও অসৎ মিশিয়া আছে। এমন সাধু কে আছেন, যাঁহার পর্ব্বত সমান উচ্চতার পার্শ্বে উপত্যকার গভীরতা নাই? যাঁহার অত্যুজ্জ্বল ও প্রশংসনীয় গুণরাশির নিম্নে লুক্কায়িত দুর্ব্বলতা নাই? তাঁহার গুণ রাশির উজ্জ্বলতাতে তাহা তুমি আমি দেখিতে না পাইতে পারি, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রাণকে সময়ে সময়ে মলিন করে। সেণ্টপল একস্থলে তাহার কোন বিশেষ দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে বিধাতা তাঁহার গাত্রে কণ্টক বিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে সময়ে সময়ে অতিশয় ক্লেশ দেয় ও তাঁহার দর্পকে চূর্ণ করে। যিনি ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন, যাঁহার চরিত্রের উজ্জ্বলতায় খ্রীষ্ট ধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, যিনি আত্ম-জিত পুরুষদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার এমন কি দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে, যাহাতে তাঁহার দর্প ধূলিসাৎ হইয়া যাইত? রেনান বলিয়াছেন ইহা কোন উৎকট শারীরিক রোগ ছিল। কিন্তু পলের গভীর অনুতাপ ও শরীরের প্রতি ঘৃণা দেখিয়া বোধ হয় ইহা কোন প্রকার আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা হইবে। পল সরল লোক, তিনি মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন, অনেকে করে না, নতুবা একথা সত্য এমন পাহাড় নাই যাহার উপত্যকা নাই, এমন চরিত্রের উচ্চতা নাই যাহার অভ্যন্তরে দুর্ব্বলতা নাই।

এখন প্রশ্ন এই সারের সঙ্গে অসার, সৎএর সঙ্গে অসৎ এরূপ মিশিয়া রহিল কেন? সেণ্টপল তাঁহার দুর্ব্বলতার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"আমি রাজসিক লোক এ দুর্ব্বলতা না থাকিলে হয়ত আমি অহঙ্কারে স্ফীত হইতাম, সেই জন্যই বিধাতা করুণা করিয়া আমার দেহে এই কণ্টক বিদ্ধ করিয়া

রাখিয়াছেন। তিনি বিশ্বাসী লোক বিশ্বাসের চক্ষেই সকল ব্যাপারকে দেখিতেন, তিনি নিজের দুর্ব্বলতার এক সুন্দর অর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা সৎ ও অসৎএর মিশ্রণের কি অর্থ নির্ণয় করিতে পারি? আমার বিবেচনায় অসৎ যদি সৎএর পার্শ্বে না থাকে, তাহা হইলে সংগ্রাম থাকে না এবং সংগ্রাম না থাকিলে সৎ ফুটিয়া উঠিতে পারে না। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এই নিয়ম দেখিতে পাওয়া যে সংগ্রামের দ্বারা বিকাশ হইতেছে। পণ্ডিতেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে এই মেদিনীর প্রত্যেক পরমাণুর উপরে যুগপৎ দুইটী শক্তি কার্য্য করিতেছে। একটী কেন্দ্রাভিসারিণী অর্থাৎ তাহার গতি কেন্দ্রের দিকে, অপরটী কেন্দ্রাপসারিণী অর্থাৎ তাহার গতি কেন্দ্র হইতে দূরে যাইবার দিকে। এই উভয় শক্তি এক সঙ্গে কার্য্য করাতেই এই মেদিনী এমন সুন্দর বর্ত্তুল আকৃতি ধারণ করিয়াছে। অঙ্গুলিতে একটী দড়ি বাঁধিয়া সেই দড়িতে কোন ভারি দ্রব্য বাঁধিয়া যদি ঘুরাও, উক্ত দ্রব্য বর্ত্তুলাকার গতিতে অঙ্গুলির চারি দিকে আবর্ত্তণ করিতে থাকে। এই দুই শক্তিতে তাহার গতিকে বর্ত্তুলাকার করে। দেখ এক সঙ্গে কেমন পরস্পর বিরোধী শক্তি এক বস্তুর উপরে কার্য্য করিতেছে। ইহাতে আপাততঃ দেখিবে সংগ্রাম কিন্তু চরমে অতি সুন্দর ফল ফলিতেছে! এই মানব দেহের রক্ষা ও পোষণের বিষয় চিন্তা করিলেও এই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দেহের মধ্যে নিরন্তর দুইটী পরস্পর বিরোধী শক্তির কার্য্য চলিতেছে; তাহাদের নাম "ক্ষয় ও উপচয়।" একটীর গতি ধ্বংসের দিকে, অপরটীর গতি রক্ষার দিকে। আমাদের দেহে নিরন্তর যে সকল কার্য্য চলিতেছে, এই যে আমি কথা কহিতেছি ইহাতে দৈহিক ধাতুপুঞ্জকে ক্ষয় প্রাপ্ত করিতেছে। এই ক্ষয় এত দ্রুত দ্রুত হয় যে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, প্রত্যেক তিন বৎসরে এই দেহের সমুদায় পুরাতন পরমাণু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, পুরাতন একটীও পরমাণু থাকে না। এক দিকে যেমন এই প্রকার ক্ষয় অপর দিকে উপচয়। প্রতিদিন যে অন্ন পান গ্রহণ করিতেছি, যে বায়ু সেবন করিতেছি, তাহাতে আবার "উপচয়" হইতেছে। এক দেহের মধ্যে দুই বিরুদ্ধ শক্তির বিবাদ কেন? উত্তর এই বিবাদেই দেহের বিকাশ। সৃষ্টির সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। বাঘে তাড়া না করিলে হরিণের পা ও প্রকার সরু হইত না। এই জন্যই হরিণও আছে আবার তাড়া করিবার জন্য বাঘও আছে। একজন একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, বল দেখি রামায়ণের মধ্যে কোন চরিত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়, রাম চরিত্র কিম্বা রাবণের চরিত্র? এক জন উত্তর করিলেন রাম চরিত্র। তখন প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন না উভয় চরিত্রই সমান প্রয়োজনীয়, কারণ রাবণ চরিত্র না হইলে রাম চরিত্র ফুটিত না। রাম চরিত্র বিকাশের জন্য যেমন রাবণ চাই তেমনি সৎএর বিকাশের জন্য অসতের সান্নিধ্য চাই। যে সৎ অসতের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় লাভ করে নাই সে সৎ সম্পূর্ণরূপে ফুটে নাই।

আমরা যখন এই বলিয়া দুঃখ করি যে সমাজের মানুষগুলি মনের মত নয় তখন ভাবা উচিত সকল লোকগুলিই যদি মনের মত হইত, সকলেই যদি নির্দ্দোষ, নির্ম্মল, নিঃস্বার্থ হইত, তাহা হইলে কাহার সঙ্গে আমাদের বিবেক ও সাধুতার সংগ্রাম হইত? এবং কিরূপেই বা সেই সাধুতা ফুটিত? যাঁহারা এরূপ অভিযোগ করেন, তাঁহারা বোধ হয় সপ্তম স্বর্গ হইতে ধোয়া পোছা লোকগুলি ইণ্ডেণ্ট করিয়া সমাজ গড়িতে চাহেন। বিধাতার এ সৃষ্টির মধ্যে সেরূপ ব্যবস্থা কুত্রাপি নাই। অসাধুতার সহিত সংগ্রামেই সাধুতার স্ফূর্ত্তি। কোন ভাল কাজে দশজনে বাধা দিলে তাহা করিতে যেরূপ আনন্দ হয় কেহ বাধা না দিলে সেরূপ হয় না। বাঘেরা মৃত জন্তু অপেক্ষা জীবন্ত প্রাণীকে আহার করিতে ভালবাসে, কারণ জীবন্ত প্রাণীকে সংহার করিতে যে সংগ্রাম করিতে হয় তাহাতে বাঘের আহারের আনন্দকে দশগুণ বর্দ্ধিত করে; সেইরূপ লোকে বিশ্বাসী ব্যক্তির সদনুষ্ঠানের বিরোধী হইলে, তাহাতে তাঁহার আনন্দই বর্দ্ধিত হয়; কারণ তদ্ভিন্ন তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তা কিরূপে হইত? অতএব যখনি দেখিবে দশজন তোমার কোন সনুষ্ঠানের বিরোধী হইতেছে, তখন আনন্দিত হও যে বিধাতা তোমার বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার জন্যই ও প্রকার বিধান করিতেছেন। লোকের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ যিনি নিরাশ হন, তিনি বস্তুতঃ ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেন। কারণ নিরাশ হওয়ার অর্থ এই যে, সাধুতা জয়যুক্ত হইবে না। সত্য অসত্যের নিকট পরাজিত হইবে। ইহা বলিলে এই কথাই বলা হয়, এজগত ধর্ম্মনিয়মের দ্বারা শাসিত নহে; ইহার উপরে কোন মালিক নাই! অতএব সৎ অসতের সংমিশ্রণ দেখিয়া নিরাশ হইও না, সতের দ্বারা অসতকে জয় করিবার চেষ্টা কর।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বিক্রমপুর প্রচার সভা।

বিক্রমপুর প্রচার সভার প্রথমবার্ষিক কার্য্য বিবরণ নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের কতিপয় উৎসাহী ব্যক্তির যত্নে বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী (১৮৮৯) কলিকাতা নগরে এই সভা সংস্থাপিত হয়। বিক্রমপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই এই সভার উদ্দেশ্য। বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব স্থান, বর্ত্তমান শতাব্দীর শিক্ষা ও সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া যে সকল লোক বঙ্গদেশে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন—গবর্ণমেণ্টের অধীনে দায়িত্বপূর্ণ বড় বড় পদ লাভ করিয়াছেন, তাহাতে বিক্রমপুরবাসীর সংখ্যা কম নহে। সৌভাগ্যের বিষয় যে তাঁহাদের মধ্যে আবার অনেকেই পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। বিক্রমপুরের ন্যায় স্থানে স্থায়ীরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বন্দোবস্ত করিয়া উদ্যোগীগণ ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। গত এক বৎসরের চেষ্টায় যে ফল ফলিয়াছে, তাহা দেখিয়া আশা করা যায় যে অচিরকাল মধ্যেই এ সভার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বিশেষ সাহায্য হইবে। বিক্রমপুরের অন্তর্গত পাইকপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একজন উপবীতত্যাগী ব্রাহ্ম বজ্রযোগিনী গ্রামের অন্তর্গত পূর্ব্বপাড়া নামক পল্লীতে

সভার নিয়োজিত প্রচারকরূপে কার্য্য করিতেছেন। পূর্ব্বপাড়ায় একটী ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। বালক বৃদ্ধ সমেত ১০। ১২ জন উপাসনায় উপস্থিত হন এবং দুই একটী মহিলাও উপস্থিত হইয়া থাকেন। পল্লীবাসীদের গৃহে গৃহে মধ্যে মধ্যে সন্ধ্যাকালে ও প্রাতে কীর্ত্তন করা হয়। বালক ও যুবকগণের চরিত্র গঠনের জন্য উপাসনা সমাজের যোগে একটী নৈতিক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বালক ও যুবকগণ ব্যতীত অনেক কৃতবিদ্য লোকও এই আলোচনায় যোগ দিয়া থাকেন। চণ্ডী বাবু সমাজের ও নৈতিক বিদ্যালয়ের কার্য্য ব্যতীত স্থানীয় বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্র ও ছাত্রীকে বিনা বেতনে ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দিয়া থাকেন, এবং অবসর ক্রমে গ্রামের বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদিগের সহিত ধর্ম্মালোচনা করেন। স্থানীয় লোকেরা চণ্ডী বাবুর ব্যবহারে ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া আশাতীত ভাল ব্যবহার করিতেছেন। গত বৎসর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দাস সপরিবারে প্রকাশ্যরূপে ব্রাহ্মসমাজে যোগ দান করিয়াছেন এবং অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়া বিশ্বাসের পরিচয় দিতেছেন। ইনিও প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই একবার করিয়া বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে প্রচারার্থ যাত্রা করা হয়। গত বর্ষে অন্যূন ২৪ বার এই যাত্রা করা হয় এবং ১৭টী গ্রাম পরিদর্শন করা হইয়াছে। বেজগাঁ, পাইকপাড়া ও বড়াইল গ্রামের সহানুভূতিকারী বন্ধুগণ প্রচার যাত্রীদলকে বিশেষ যত্নের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্যপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র সেন মহাশয় প্রতি মাসে একবার তাঁহার বাড়ীতে উপাসনা করিবার জন্য এক খানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়া প্রচারক মহাশয়কে চিঠি লিখিয়াছেন। গত বর্ষে বিক্রমপুরে ৫ টী উৎসব হইয়াছে, ভরাকর গ্রামে জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন ও মাঘ মাসে তিনটী উৎসব হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের উৎসবে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু উপস্থিত ছিলেন, গত সরস্বতী পূজার দিনে পূর্ব্বপাড়াতে শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষালের বাড়ীতে যে উৎসব হয় তাহাতে স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে অনেকেই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে পূর্ব্বপাড়া উপাসনা সমাজের প্রথম শারদীয় উৎসব হইয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জ, ভরাকর, বেজগাঁ প্রভৃতি গ্রাম হইতে কোন কোন ব্রাহ্মবন্ধু যোগ দিয়াছিলেন এবং তখন একটী বিশেষ আলোচনা (Conference) হয়। এই আলোচনা সভায় স্থির হয় যে, বিক্রমপুরের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের ব্রাহ্মদিগকে লইয়া বিক্রমপুর প্রচার সভার একটী স্থানীয় বিভাগ গঠিত হওয়া আবশ্যক। বিক্রমপুরের নানা স্থানবাসী ব্রাহ্মদিগেরও সহানুভূতিকারী ব্যক্তিগণের একটী তালিকা প্রস্তুত, সৎকার্য্যের জন্য একটী Charity fund এবং বৎসরের মধ্যে একবার বিক্রমপুরবাসী ব্রাহ্মদিগের হয় ঢাকাতে নতুবা বিক্রমপুরের অন্য কোন স্থানে সম্মিলন হওয়া আবশ্যক। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়ার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু অর্থাভাবে ও অন্যান্য অসুবিধা হেতু এখনও আশানুরূপ ফলোদয় হইতেছে না। গত বর্ষে ১৩৩৶, আয় ও ব্যয় হইয়াছে। গত জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় এই সভার ১ম বার্ষিক অধিবেশন হয় এবং তাহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, বিক্রমপুরের অন্তর্গত পূর্ব্বপাড়াতে একটী প্রচারক নিবাস ও উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিবার জন্য ১২০০ বার শত টাকা চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে। তদনুসারে বিক্রমপুরবাসী ও সভার প্রধান উদ্যোগীগণের মধ্য হইতে ৩০০ তিন শত টাকা স্বাক্ষরিত হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট আবেদন করা হইবে। আশা করা যায় এইরূপ মহৎ কার্য্যের সাহায্যার্থ ব্রাহ্ম মাত্রেই যথাসাধ্য অর্থানুকূল্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। বর্ত্তমানে সভ্য সংখ্যা ৪২ জন তন্মধ্যে ৬ জন মহিলা। আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস এই সভার সভাপতি, শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ রায় মহাশয় সহকারী সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন সভা তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া দিন দিন তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হউন।

ময়মনসিংহ।

সম্প্রতি ময়মনসিংহ ছাত্রসমাজের ষড়বিংশ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই সমাজের নাম ময়মনসিংহ শাখা ব্রাহ্মসমাজ ছিল, কিন্তু গত বার্ষিক অধিবেশনে ইহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ছাত্রসমাজ নাম রাখা হইয়াছে। ছাত্রগণ এই সমাজে শিক্ষিত হইয়া পবিত্রতা এবং পুণ্যে ভূষিত হউন এই প্রার্থনা। প্রতি রবিবার প্রাতে ছাত্রদিগের উপাসনা এবং বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে সঙ্গত সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় উপাসনা এবং সঙ্গতের কার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। ছাত্রসমাজের উৎসব উপলক্ষে ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী এবং বাবু জ্যোতিরিন্দ্র প্রসাদ মিত্র বি,এ এখানে আসিয়াছিলেন।

উৎসবের কার্য্যবিবরণ।

২০এ আষাঢ় বৃহস্পতিবার—সন্ধ্যার পর সঙ্গত সভার সাম্বৎসরিক উৎসব হয়।

২১এ আষাঢ় শুক্রবার—সন্ধ্যার পর উৎসবের উদ্বোধন। বাবু অমরচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

২২এ আষাঢ় শনিবার—প্রাতে উপাসনা। বাবু গুরুদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। ব্রহ্মকৃপার উপর নির্ভর না করিলে ধর্ম্ম জগতে অগ্রসর হওয়া যায় না। তাঁহার কৃপায়ই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমরা আত্ম-চেষ্টায় কিছুই করিতে পারি না ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশ দেন।

সন্ধ্যার পর সিটিকলেজিয়েট স্কুল-গৃহে বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় "নবজীবনের নব দায়িত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় অনেক ছাত্র উপস্থিত ছিলেন।

২৩এ আষাঢ় রবিবার—প্রাতে উপাসনা। বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় উপাসনা করেন। ছাব্বিশ বৎসরকাল তিনি এই ছাত্র সমাজের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত আছেন, তাঁহার অভিজ্ঞতা অবলম্বন করিয়া তিনি এই বলিয়া উপদেশ দেন যে বিশ্বাস এবং দীনতাই এই সমাজের প্রাণ। এই ছাব্বিশ বৎসরকাল মধ্যে এই সমাজে অনেক বিশ্বাসী ছাত্র আপনাদের বিশ্বাস

অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া বিবিধ প্রকারে উৎপীড়িত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছিল। পৃথিবীর দরিদ্রতার নিষ্পেষণে জর্জরিত হইয়া এবং নানাপ্রকার সামাজিক শাসনে অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া পরিণামে তাঁহারা বিশ্বাস বলে জয়লাভ করিয়াছেন। অতএব বিশ্বাস এবং দীনতায় এই সমাজের বিশেষত্ব। বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া, বাধ্যতায় ভূষিত হইয়া দীনতাকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মকৃপার শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মসমাজের ভূমিতে পড়িয়া থাকিতে পারিবেন।

অপরাহ্নে প্রথমতঃ মাধ্যাহ্নিক উপাসনা। বাবু চন্দ্রমোহন বিশ্বাস মহাশয় উপাসনা করেন। পরে আলোচনা, পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। বাবু গোলোকচন্দ্র দাস মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান এবং শ্লোক সংগ্রহ হইতে পাঠ করেন। সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তনের পর বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। শিশুর জীবন ধারণ জন্য মাতৃস্তন্য,এবং বয়স্কের শরীর রক্ষার জন্য অন্নের যেরূপ প্রয়োজন, মানবাত্মার পুষ্টি সাধনের জন্য ধর্ম্মের তেমনি প্রয়োজন। ধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে একাগ্রতা এবং উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে তিনি উপদেশ দেন।

কোচবিহার।

ভিত্তি সংস্থাপন—বিগত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার প্রাতে বেলা ৮টার সময়ে উপাসনা এবং সংগীত ও সংকীর্ত্তনের পর কোচবিহার ব্রাহ্মসমাজের পাকা গৃহের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রায় কালিকাদাস দত্ত দেওয়ান বাহাদুর স্বহস্তে এই শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। উপাসনাস্থলে সিভিল জজ শ্রীযুক্ত বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি এখানকার কতিপয় প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী ও অন্যান্য কয়েক জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। রাজকীয় পূর্ত্ত বিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় আগ্রহের সহিত সমাজগৃহ নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় আশা করা যায়, এবার সাম্বৎসরিক উৎসব নব গৃহে সম্পন্নহইবে।

প্রেরিত পত্র

(পত্রপ্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ,

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।—

(২)

আত্মার স্বাধীনতা বিষয়ে সীতানাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা সংক্ষেপে নিম্নে ব্যক্ত করিলাম।

সীতানাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, নিবিষ্ট চিত্তে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহার দার্শনিক মতে বাস্তবিক আত্মার স্বাধীনতার স্থান নাই। তিনি যাহাই কেন বলুন না, তিনি যখন স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, মনুষ্য কার্য্যকারণশৃঙ্খলকে অতিক্রম করিয়া কিছুই করিতে পারে না;—মনুষ্যের মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলের অতীত স্থান নাই,—তখন বাস্তবিক আত্মার স্বাধীনতা রক্ষা পাইতেছে না। আমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক বাসনা ও ইচ্ছা যখন কারণাধীন, তখন স্বাধীনতা কোথায় থাকিল?

সীতানাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, মানবাত্মার মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলের অতীত স্থান কোথায়? এ প্রশ্নের উত্তর আমি ধর্ম্মজিজ্ঞাসা দ্বিতীয় ভাগে দিয়াছি;—"স্বাধীনতার স্থান কোথায়? মানসিক অবস্থা সকল নিয়তপরিবর্ত্তনশীল। নদীর তরঙ্গের ন্যায় মনুষ্য-মনের অবস্থা সকল ক্রমাগত উঠিতেছে ও মিলাইয়া যাইতেছে। জন্মদিবস হইতে অদ্য পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনশীল মানসিক অবস্থা সকলের স্রোত বহিয়া আসিতেছে। একটীর পর আর একটী, তাহার পর আবার একটী, এইরূপ চলিতেছে, কোনটীই স্থায়ী হয় না।"

"কিন্তু এই সকল কার্য্যকারণ শৃঙ্খলবদ্ধ, পরিবর্ত্তনশীল, অস্থায়ী অবস্থা ব্যতীত মানুষের মধ্যে কি এমন কিছু নাই, যাহা কার্য্যকারণসূত্রের অতীত এবং সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থায়ী? নিশ্চয়ই আছে; আমি নিজেই তাহা। মানসিক অবস্থা সকলের নিয়ত পরিবর্ত্তন হইতেছে; কিন্তু আমি চিরদিন একই রহিয়াছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি। পাঁচশতটী মানসিক অবস্থা, একটীর পর আর একটী উদয় হইল, অদৃশ্য হইয়া গেল। কিন্তু এই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে সাধারণ কিছু আছে;—সকল অবস্থাগুলিই 'আমার'। মানসিক অবস্থা সকল অসংখ্য; কিন্তু "আমি" এক। মানসিক অবস্থা সকল নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু আমি অপরিবর্ত্তনীয়। স্মৃতিশক্তি ভূতকাল ও বর্ত্তমানের সংযোগ সাধন করিতেছে। সুতরাং ইহা বলিতেই হইবে যে, অন্তর্জগতে এমন কিছু আছে, যাহা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল অস্থায়ী ঘটনাস্রোতের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থায়ীরূপে কাল-স্রোতের অতীত হইয়া স্থিতি করিতেছে।

"যাহাকে আমি বলি, তাহাই আত্মা। এই অপরিবর্ত্তনীয়, কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলের অতীত আত্মাই স্বাধীনতার বাসভূমি। মানসিক অবস্থাস্রোতের উৎস-প্রদেশে,—জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা-সমন্বিত প্রাকৃতিক যবনিকার অন্তরালে স্বাধীনতার অবস্থিতি।

"কার্য্যকারণ সূত্রেরসীমা,—মানসিক অবস্থা সকল (Mental Phenomena); কিন্তু "আমি বা আত্মা" মানসিক অবস্থা নহে। মানসিক অবস্থা সকলের অস্তিত্ব, "আমি বা আত্মার" উপরে নির্ভর করে। আত্মারূপ সাগরে, মানসিক অবস্থা রূপ অগণ্য তরঙ্গ উঠিতেছে ও মিশাইতেছে। আমি বা আত্মা কার্য্যকারণসূত্রের অতীত; সুতরাং উহাই স্বাধীনতার অধিষ্ঠান ভূমি।"

উদ্ধৃত অংশটী নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসু পাঠক সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন যে, মানবাত্মার মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলের অতীতস্থান কোথায়? যাহা কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলের অতীত স্থান, তাহাই স্বাধীনতার স্থান। যাঁহারা কার্য্য-

কারণ-শৃঙ্খলবদ্ধ আত্মার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মত সহজবুদ্ধির বিরুদ্ধ। মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সকলই কারণাধীন, অথচ মানুষ স্বাধীন, এই দুই কথা পরস্পর বিরোধী। সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলবদ্ধ আত্মার স্বাধীনতায় যাহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সোণার পাথর বাটী ও তেঁতুলের আমসত্ত্বেও বিশ্বাস করিতে পারেন।

সীতানাথ বাবু যে একটী কুকুর ও দুইটী মনুষ্যের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিতেছেন যে, কুকুরের স্বাধীনতা নাই, সে সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির মনে প্রবৃত্তি ও ধর্ম্মজ্ঞানের মধ্যে যুদ্ধ হইয়া প্রবৃত্তির জয় হইল। সে পরিশেষে প্রবৃত্তির অধীন হইয়াই কার্য্য করিল। তৃতীয় ব্যক্তির মনেও ধর্ম্মজ্ঞান ও প্রবৃত্তির মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল; কিন্তু ধর্ম্মজ্ঞান জয়যুক্ত হইল। সীতানাথ বাবু বলিতেছেন যে, এই তৃতীয় ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিল; কেননা সে প্রবৃত্তির অধীন হইল না, ধর্ম্মনিয়মের অধীন হইল। এস্থলে সীতানাথ বাবুর কথানুসারেই বলি যে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মনিয়মের অধীন হইল কেন? অবশ্য, অকারণ হয় নাই। যে কারণেই কেন সে ব্যক্তি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বিরত, এবং ধর্ম্মনিয়মের অধীন হউক না, ঐ বিরতি এবং ধর্ম্মনিয়মের আনুগত্যের অবশ্য কারণ আছে,—নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা আছে,—সেই কারণ না থাকিলে সে উহা করিতে পারিত না; তবে তাহার স্বাধীনতা কোথায় রহিল? সে যখন অখণ্ডনীয় কার্য্য কারণ শৃঙ্খলের অধীন, তখন সে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বিরত হইয়া ধর্ম্মনিয়মের অনুগত হইলেও, কোনক্রমেই সে স্বাধীন নহে। বায়ুহিল্লোলে উড্ডীয়মান তৃণকণা যেমন স্বাধীন, সে ব্যক্তিও তেমনই স্বাধীন। উভয়েই সমানরূপে অখণ্ডনীয় কার্য্যকারণশৃঙ্খলের সম্পূর্ণ অধীন। তবে স্বাধীনতা কোথায় রহিল?

দ্বিতীয় ব্যক্তি যে ধর্ম্মনিয়ম পালন করিতে না পারিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল, সীতানাথ বাবু বলিতেছেন সে ব্যক্তি স্বাধীন ভাবে তাহা করিল না, প্রবৃত্তির অধীন হইয়াই কার্য্য করিল। আমি বলি সীতানাথ বাবুর মত মানিতে হইলে দুই জনের মধ্যে কেহই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিল না। একজন যদিও প্রবৃত্তির অধীন হইয়া কার্য্য করিল এবং অপর ব্যক্তি ধর্ম্মনিয়মের অধীন হইয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে বিরত হইল, তথাচ উভয়ের কার্য্যই কারণাধীন। সীতানাথ বাবুর মত মানিতে হইলে, আমি বলিব, উভয়ের মধ্যে কেহই স্বাধীনভাবে কার্য্য করিল না। কেননা উভয়েই সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলবদ্ধ।

এস্থলে আর একটী কথা বলিব। সীতানাথ বাবুর দৃষ্টান্তানুসারে যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ধর্ম্মনিয়ম না মানিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল, তাহার অপরাধ কোথায়? সে যদি জলস্রোতে ভাসমান শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অধীন হয়; তবে তাহার স্বাধীনতা কোথায়? তাহার স্বাধীনতা না থাকিলে তাহার দায়িত্ব কোথায়? তাহার দায়িত্ব না থাকিলে তাহার অপরাধ কোথায়? তাহার পাপ কোথায়? ঐ জলস্রোতে ভাসমান শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড যেমন কার্য্য কারণ শৃঙ্খলের সম্পূর্ণ অধীন, সেইরূপ যে ব্যক্তি ধর্ম্মনিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল, সেও সম্পূর্ণরূপে কার্য্যকারণ শৃঙ্খলের অধীন। প্রথম স্থলে ভৌতিক নিয়ম কার্য্য করিতেছে, দ্বিতীয় স্থলে প্রধানতঃ মানসিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মের কার্য্য হইতেছে। কিন্তু এই উভয় স্থলেই কার্য্যকারণশৃঙ্খল সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। ঐ জলস্রোতে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ড এবং ঐ ধর্ম্মনিয়মলঙ্ঘনকারী প্রবৃত্তিপরায়ণ মনুষ্য, উভয়েই সম্পূর্ণরূপে কার্য্য কারণ শৃঙ্খলের অধীন, তবে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মনিয়ম অতিক্রম করিয়া প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিল বলিয়া কেন অপরাধী হয়? অপরাধ বা পাপ স্বীকার করিলেই দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইবে? দায়িত্ব স্বীকার করিলেই স্বাধীনতা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যদি কার্য্যকারণ শৃঙ্খল ব্যতীত মানুষের মধ্যে আর কিছু না থাকে, তবে স্বাধীনতা কোথায়? স্বাধীনতা না থাকিলে দায়িত্ব কোথায়? দায়িত্ব না থাকিলে পাপ পুণ্য কোথায়?

এস্থলে সীতানাথ বাবু বলিবেন যে, তবে কি অকারণ কার্য্য মানিতে হইবে? মনুষ্য দুষ্কার্য্য করিল কেন, তাহার কোন কারণ নাই—ধর্ম্মনিয়ম পালন করিল কেন, তাহারও কোন কারণ নাই, নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা নাই,—ইহাই মানিতে হইবে? মনুষ্য যখন দুষ্কার্য্য বা সৎকার্য্য করে, তখন সেই কার্য্যের বৈজ্ঞানিক কারণ, অর্থাৎ নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা যে মানিতেই হইবে, ইহা স্বীকার করি না। তবে কি, কার্য্যের কারণ নাই? অন্যভাবে কার্য্যের কারণ আছে। "আমি" আমার কার্য্যের কারণ। পাপ করি বা পুণ্য করি তাহার কর্ত্তা কে? "আমি" নিজে। সেই জন্যই আমি আমার কার্য্যের জন্য দায়ী। যখন বলিতেছি যে, আমি আমার কার্য্যের কারণ, তখন বৈজ্ঞানিক অর্থে কারণ শব্দ ব্যবহার করিতেছি না। যখন আমরা বলি জগদীশ্বর জগতের কারণ, সে স্থলে কারণ শব্দের অর্থ কি? তখন কি কারণ শব্দ বৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়? জগদীশ্বর জগতের কারণ, এ কথার অর্থ কি এই, যে জগদীশ্বর এজগতের নিয়ত নিরপেক্ষ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা! সে কথা বলিলে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব লোপ হইয়া যায়। জগদীশ্বর একটা ঘটনা হইয়া যান। জগতের কারণ ঈশ্বর, আবার তাহার কারণ আর কিছু, এইরূপে অনন্ত কারণশ্রেণী আসিয়া পড়ে। আমরা যখন বলি জগতের কারণ জগদীশ্বর, তখন তাহার অর্থ এই যে, তিনি এই জগতের মূল কর্ত্তা। যে অর্থে জগদীশ্বর জগতের কারণ, সেই অর্থে আমি আমার অসৎ বা সৎ কার্য্যের কারণ।

বাইবেল গ্রন্থে আছে "Man is made in the image of God" মনুষ্য পরমেশ্বরের প্রতিকৃতিতে গঠিত। তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা মনুষ্য পাইয়াছে। সেইরূপ তাঁহার কর্ত্তৃত্বশক্তিও মনুষ্য পাইয়াছে, তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও স্বতন্ত্রতা সকলই অনন্ত। সেই অনন্ত সিন্ধুর বিন্দু মানুষের মধ্যে আসিয়াছে। মানুষের জ্ঞান প্রেম, পবিত্রতা ও স্বতন্ত্রতা সেই অনন্ত সিন্ধুর বিন্দু। তাঁহার জ্ঞানে আমরা জ্ঞানী, তাঁহার প্রেমে আমরা প্রেমিক, তাঁহার পবিত্রতায় আমরা পবিত্র, তাঁহার স্বতন্ত্রতায় আমরা স্বতন্ত্র। পিতার ন্যায়

পুত্র স্বাধীন। তবে পিতার স্বাধীনতা অনন্ত, পুত্রের স্বাধীনতা পরিমিত। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

পত্র দীর্ঘ হইয়া উঠিল। পাপের স্বরূপ বিষয়ে সীতানাথ বাবু যাহা বলিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য, পরে তত্ত্বকৌমুদীর পাঠক বর্গের নিকটে নিবেদন করিব। ইতি—

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

গত ১লা আষাঢ় তারিখের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকাতে ব্রাহ্ম সমাজে "জমাট বাঁধে না কেন" বিষয়ে যে সকল কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা যথার্থ বটে। ঐ সকল কারণ ব্যতীত আরও যে কতিপয় কারণ ব্রাহ্ম সমাজের উন্নতির ব্যাঘাত করিতেছে বলিয়া আমি মনে করি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক তত্ত্বকৌমুদীতে স্থান দিলে সুখী হইব।

১। হিন্দু সমাজ হইতেই ব্রাহ্ম সমাজে অধিকাংশ লোক প্রবেশ করিয়াছেন। গত ৬০ বৎসরের মধ্যে ক্রমে যে সকল লোক ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হইয়াছেন, আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দু সমাজের উচ্চ শ্রেণী হইতে আসিয়াছেন। এবং ঐ সকল লোকই অনেক স্থানে ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক! "যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার" যখন এই উদার মহাবাক্য ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রধান মন্ত্র; তখন নিম্ন শ্রেণীর লোকও যে ব্রাহ্মসমাজে স্থান পাইবে তাহার আর সন্দেহ কি। তবে নিম্নশ্রেণীর লোক সকল কি উদ্দেশ্য ও ভাব লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছেন তৎপ্রতি এখন দৃষ্টি রাখা আবশ্যক বোধ হইতেছে। কারণ হিন্দু সমাজে যে সকল লোকের পদ নাই, এমত লোক কিছু মাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য না করিয়াও ব্রাহ্মসমাজে পদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রবেশ করিতেছেন এমতও দেখা যায়। অবশ্য এরূপ লোকের সংখ্যা এখনও অধিক নাই। এই শ্রেণীর লোকের আচরণে দেখা যায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ এবং ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির প্রতি ইহাদের বিশেষ লক্ষ্য নাই। ইহারা কেবল মাত্র **সামাজিক যোগ** রক্ষা করিয়া চলেন। অনেক সময় এই শ্রেণীর লোক দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে কলঙ্ক আসিতেছে এবং উন্নতির ব্যাঘাত হইতেছে। এক মাত্র ধর্ম্ম লক্ষ্য এবং নানা প্রকার কষ্টের মধ্য দিয়া নিম্নশ্রেণী হইতে কেহই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন নাই তাহা বলিতেছি না।

২। অপর এক শ্রেণীর লোক কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কিম্বা অন্য কোন আকর্ষণে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহাদের লক্ষ্যও ধর্ম্ম নহে। হিন্দু সমাজে যাঁহাদের বিবাহ করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হইত, কিম্বা অন্য কোন প্রকার অসুবিধা ছিল, এমত লোকও ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন ইঁহাদের সংখ্যাও এখন পর্য্যন্ত অধিক হয় নাই। কিন্তু ইঁহাদের প্রবেশ সম্বন্ধেও বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি এই সকল লোকের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়া গেলে ইঁহাদের ব্রাহ্মগণের সহিত **সামাজিক যোগ** ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। যে সকল লোক ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি বিষয়ে উদাসীন লোক যে নাই তাহা বলি না। কিন্তু যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্য লইয়াই ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের দ্বারা অধিকাংশ স্থানে ব্রাহ্মসমাজের অপকার হইতে দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিবাহ কি অন্য কোন আকর্ষণে যে সকল লোক ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির জন্য যত্ন করিতেছেন না এমত বলা যায় না।

৩। পূর্ব্বাপেক্ষা ব্রাহ্মগণ অধিকতর স্বার্থপর হইয়াছেন। ইহাতে যে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অতিশয় ব্যাঘাত হইতেছে বলা বাহুল্য। গেরুয়া বসন পরিধান কিম্বা এই প্রকার অন্য কোন রূপ বাহ্য চিহ্ন ব্রাহ্মগণের বৈরাগ্যের লক্ষণ নহে। "স্বার্থ নাশস্ত বৈরাগ্যং" ব্রাহ্মদিগের বৈরাগ্যের লক্ষণ। আমি নিজের স্বার্থ ষোল আনা ঠিক রাখিব অথচ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যত্ন করিব, ইহা কখনই হইতে পারে না। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ব্রাহ্মের মধ্যে এই রূপ ভয়ানক স্বার্থপরতা প্রবেশ করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের অনেক লোক দরিদ্র জানি; কিন্তু এমত লোকও অনেক আছেন, যাঁহাদের অবস্থা অতি উত্তম যাঁহারা অক্লেশে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর ব্রাহ্ম আপনাপন অবস্থানুসারে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করিলে এত দিনে ব্রাহ্মসমাজের অনেক অভাব দূর হইত। ব্রাহ্মসমাজকে কোন্ ব্রাহ্ম কতদূর ভাল বাসেন, তাহা সমাজের জন্য ত্যাগ-স্বীকার দ্বারাই বুঝা যাইতেছে। আমি যদি বলি ব্রাহ্মসমাজকে প্রাণের সহিত ভালবাসি অথচ কার্য্য কালে উহার সেবা করিতে প্রস্তুত না হই, তবে ইহাই প্রকাশ পাইবে যে আমার ভালবাসা মৌখিক। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় **"আমার"** ব্রাহ্মসমাজ, ইহার জন্য আমি **বাঁচি কি মরি** এই ভাব আমাদের মধ্যে অতি বিরল। তাই সমাজের উপযুক্ত রূপ উন্নতি দেখা যাইতেছে না। আমরা নিজ স্বার্থ লইয়াই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত। বাহিরের বাধা বিঘ্ন ব্রাহ্মসমাজের অপকার না করিয়া উপকার করিতেছে; কিন্তু আমাদের গৃহে যে প্রকার **অসদ্ভাব** এবং **স্বার্থপরতা** প্রবেশ করিয়াছে তাহা শীঘ্র দূর করিবার জন্য ব্রাহ্ম মাত্রের যত্ন করা কর্ত্তব্য। স্বার্থপরতা বিনাশ করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের **বলিদান।** ব্রাহ্মসমাজকে আঘাত করিলে যদি আমার প্রাণে না লাগে, তবে এই বুঝিব যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমার ভালবাসা নাই। আমার যোগ **সাময়িক যোগ** মাত্র। ক্ষতি স্বীকার না করিলে উন্নতির আশা নাই।

৪। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক হিন্দু সমাজের আচার ব্যবহারের প্রতি এতদূর ঝুকিয়া পড়িয়াছেন যে তাহাতেও ব্রাহ্মসমাজের অপকার হইতেছে। কেবল আচার ব্যবহার নহে; ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরোধী মতও পোষণ করিতেছেন। পৌত্তলিকতা এবং জাতিভেদ সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য ভারতবর্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, এই ভাব ব্রাহ্মসমাজে পূর্ব্বে যেরূপ জাগরূক ছিল এখন তেমন দেখা যায় না। বলিতে দুঃখ হয় কতক ব্রাহ্মের মধ্যে এই ভাব দিন দিন অতিশয় ম্লান হইতেছে। ইহাতেও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির ব্যাঘাত করিতেছে।

ঢাকা শ্রীনবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

"পুনর্জ্জন্ম আছে কি না?"—এই পুস্তক খানি অনেক দিন হইল আমাদের নিকট সমালোচনার্থ প্রেরিত হইয়াছে, যথাসময়ে আমরা সমালোচনা করিতে না পারিয়া দুঃখিত আছি। লেখকের উদ্দেশ্য ভাল একথা কাহাকেও বোধ হয় বলিতে হইবে না। তবে বিষয়টী যেরূপ গুরুতর এবং এরূপ গুরুতর বিষয়ে কিছু লিখিতে হইলে যেরূপ গবেষণার আবশ্যক, পুস্তকে সেরূপ বেশী

কিছু পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশেই পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মত দৃঢ় করিবার জন্য বোধ হয় এ পুস্তক লিখিত হয় নাই। যাঁহারা পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের স্বপক্ষ সমর্থনার্থ কি বলিবার আছে তাহার বিশেষ উল্লেখ দেখিলাম না। সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে আর অধিক কি লিখা সম্ভব।

ব্রাহ্মসমাজ।

জাতকর্ম্ম—বিগত ২রা আষাঢ় মানিকদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুহ মহাশয়ের প্রথমা কন্যার জন্ম উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে, দুর্গাচরণ বাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডে ১৲ এক টাকা প্রদান করিয়াছেন।

নামকরণ—বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ মানিকদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ২য় পুত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। এই অনুষ্ঠানে বাবু দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে সতীশ বাবু এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার বিভাগে ২৲ দুই টাকা প্রদান করিয়াছেন।

নামকরণ—বিগত ৫ই শ্রাবণ রবিবার বালি এন্‌ট্রেন্স স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ২য় পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বালকের নাম শ্রীমান্ সন্তোষ কুমার রাখা হইয়াছে।

দীক্ষা—বরাহনগর মহিলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু নেপালচন্দ্র রায় বি,এ বিগত ৫ই শ্রাবণ রবিবার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। ইঁহার নিবাস খুলনার অন্তর্গত মূলঘর গ্রামে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। দীক্ষাকার্য্য বরাহনগরে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ১২ই শ্রাবণ রবিবার বাঁকুড়ার সিবিল সার্জ্জন শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। দীক্ষা কার্য্য কলিকাতায় সম্পন্ন হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ক বার্ষিক পরীক্ষায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন প্রদত্ত হইয়াছিল।—পরীক্ষক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম, এ।

জুনিয়ার কোর্স।

১। সৃষ্টি-কৌশলবাদী ও বিবর্ত্তনবাদী ইঁহাদের মধ্যে বিবাদ কোথায়? সে বিবাদ সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য কি? সংক্ষেপে উত্তর দিবে।

২। "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা"তে সৃষ্টিকৌশলের যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যে যেটী তোমার মতে অত্যাশ্চর্য্য তাহা প্রদর্শন কর।

৩। "অন্ধ শক্তি অর্থ-শূন্য বাক্য"—এ কথার যুক্তি কি?

৪। বাধ্যতাবোধ হইতে ঈশ্বরের সত্তা কিরূপে নির্ণীত হয়?

৫। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুদ্ধি ও বিবেকের পার্থক্য বুঝাইয়া দেও।

৬। "পরলোক সাধনের পূর্ব্বে আত্ম-দৃষ্টি আবশ্যক"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেও।

৭। পরলোক সম্বন্ধে যে কয়েকটী যুক্তি জান, তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ কর।

৮। কোন কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের এরূপ বিশ্বাস যে, মানবের অনন্ত সুখ বা অনন্ত দুঃখ এই পার্থিব জীবনের কয়েক বৎসরের উপর নির্ভর করিতেছে। মৃত্যু অন্তে হয় অনন্ত নরক ভোগ না হয় অনন্ত স্বর্গবাস হইবে। এ মত কেমন? যদি যুক্তিসঙ্গত বোধ না কর তাহার কারণ নির্দ্দেশ কর।

৯। ব্রাহ্মেরা স্বর্গ ও নরক বলিলে কি বুঝিয়া থাকেন?

১০। মুক্তি বিষয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মত কি সংক্ষেপে নির্দ্দেশ কর। এ মতের শ্রেষ্ঠতা কোন্ বিষয়ে?

১১। ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র—জাতিভেদের উৎপত্তির এই বিবরণ সত্য কি না? যদি না হয়, ভারতে জাতিভেদ প্রথা কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার বিবরণ সংক্ষেপে লিখ।

১২। প্রধানতঃ কি কি কারণে এদেশে জাতিভেদের শাসন শিথিল হইয়াছে?

১৩। জাতিভেদ প্রথায় কোনও ইষ্ট সাধনের কথা কি জান?

১৪। কেহ কেহ বলেন—"জাতিভেদ প্রথা সকল সমাজেই আছে, ইংরাজদিগের মধ্যে ধনী দরিদ্র দুই জাতি, তবে এ দেশে জাতিভেদ প্রথার উন্মূলনের চেষ্টা কর কেন? এই তর্কের উত্তরে তোমার কি বলিবার আছে?

১৫। জাতিভেদের নানা অনিষ্ট ফলের মধ্যে তুমি কোন্ কোন্‌টীকে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া মনে কর?

বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নলিখিত বিষয় সকল ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ENNGLISH COURSES.

Senior.

Intended mainly for 3rd and 4th year College Students.
MARTINEAU'S *Study of Religion.*
" *Types of Ethical Theory.*
Lectnrers.—Babus Khetramohan Mukerji B. A. and Sitanath Datta.

Junior.

Intended mainly for College Students generally.
WRIGHT'S *Grounds and Principles of Religion.*
SLATER'S *Law of Duty.*
Lecturers.—Babus Herambachandra Maitra M. A. and Adityakumar Chatturji B. A.

BENGALI COURSES.

Senior.

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রথম ও দ্বিতীয়ভাগ।

বাবু রাজনারায়ণ বসু-প্রণীত 'ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা' প্রথম ভাগ।

বাবু সীতানাথ দত্ত-প্রণীত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'।

Lecturers.—Babus Khetramohan Mukhurji B. A. and Sitanath Datta.

Junior.

আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস'।

বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত 'ধর্ম্মজিজ্ঞাসা' প্রথমভাগ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-প্রণীত 'জাতিভেদ'।

Lecturers.—Babus Adityakumar Chatturji B. A. and Mohinimohan Ray.

Primary.

আদি ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত, 'ধর্ম্মশিক্ষা', ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ-প্রকাশিত 'ব্রাহ্মধর্ম্মের মত সার' ও ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

Lecturers.—Babu Mohinimohan Ray.

The classes meet on Sunday afternoons at the Sadharan Brahmo Samaj *Mandir.* Further particulars can be known on applying to the Secretary.

13, Cornwallis Street, Calcutta. } SITANATH DATTA, *Secy. Theological Institution.*

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৮ই শ্রাবণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ১৯এ শ্রাবণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
৯ম সংখ্যা।

১লা ভাদ্র শনিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

কে স্বাধীন?

প্রবৃত্তি-ইঙ্গিতে সদা কুকুরের মত
ছুটিছে যে জ্ঞান-হারা হয়ে,
মোহ-পাশে কণ্ঠ যার বাঁধা অবিরত
আছে ডুবে ক্ষুদ্র সুখ লয়ে,

সেই কি স্বাধীন? কিংবা ঈশ্বর-চরণে
বিকাইয়ে দেহ-মন-প্রাণ,
তাঁহারি দাসত্ব-ব্রতে সপেছে জীবনে
তাঁহারি দাসত্ব যার অমৃত সমান,

সে স্বাধীন? ধন্য দেব! এ কি হে বিচিত্র
লীলা তব! সুদৃঢ় বন্ধনে
আপনা বাঁধিয়া যেবা, তোমার পবিত্র
ইচ্ছা-স্রোতে ঢালিয়া জীবনে,

আপনারে হারাইয়ে দাস-অনু-দাস
যে হয়েছে বিকায়ে আপনা
পেয়েছে আপনা, শক্তি হয়েছে বিকাশ;
তব পদে চিরবন্দী স্বাধীন সে জনা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

প্রেমেই স্বাধীনতা।—দৃষ্টান্তটা অনেকবার দিয়াছি আবার দি। আবু সোফিয়ান নামক মক্কানগর বাসী একজন সম্ভ্রান্ত লোক মহম্মদের প্রধান শত্রু ছিলেন। ঐ ব্যক্তিরই অত্যাচারে মহম্মদ সশিষ্যে মক্কানগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মহম্মদ মক্কানগর হইতে তাড়িত হইলেন; তাঁহার শিষ্যদল ছিন্ন বিছিন্ন হইয়া পড়িল; তথাপি আবু সোফিয়ানের বিদ্বেষ বুদ্ধি ঘুচিল না। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহম্মদকে শাসন করিবার জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। আবু সোফিয়ানের পরিবার মধ্যে মহম্মদ-বিদ্বেষ এতই প্রবল ছিল যে আবু সোফিয়ানের এক বিধবা কন্যা পিতার সহিত এই অভিপ্রায়ে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিলেন, যেই মহম্মদ যুদ্ধে নিহত হইবেন, আর তিনি মহম্মদের রুধিরাক্ত হৃৎপিণ্ড (কলিজা) আহার করিবেন। কি ভয়ানক প্রতিজ্ঞা! ঘটনাক্রমে আবু সোফিয়ান উক্ত যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন এবং তাঁহার স্বদলের অনেকে মহম্মদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইলেন। আবু সোফিয়ানের কন্যাও ঐ সঙ্গে বন্দী হইলেন। মহম্মদ যখন শুনিলেন যে আবু সোফিয়ানের কন্যা বন্দী হইয়াছেন, অমনি আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন, যে তাঁহাকে যেন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া নারীগণের অনুরূপ সম্ভ্রম ও যত্নে রাখা হয়। অমনি তাঁহার পরিচর্য্যার্থ দাস দাসী নিযুক্ত হইল এবং তাঁহার যত্নের কোন ত্রুটী থাকিল না। কিন্তু সেই সমুদায় আদর ও যত্ন উক্ত রমণীর নিকট বিষস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। তিনি কেবল শিরস্তাড়ন ও আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। ক্রমে তাঁহার শোকের আবেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইলে মহম্মদ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ক্রমে উক্ত রমণী মহম্মদের গুণে এত আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন। কিছু দিন যায় অবশেষে আবু সোফিয়ান যুদ্ধে পরাজিত ও ভগ্নোদ্যম হইয়া সন্ধি-প্রার্থী হইলেন। তখন বিবেচনা করিলেন;—কন্যা এখন মহম্মদের পত্নী, কন্যার দ্বারা তাঁহাকে হাত করিব। এই ভাবিয়া কন্যার ভবনে উপস্থিত হইলেন। কন্যার দাস দাসী নাই, বিভব সম্পদ নাই, ফকিরের স্ত্রী ফকিরাণী হইয়াছেন। তাঁহার ঘরে একখানি সামান্য মাঁদুর পাতা রহিয়াছে, এ মাঁদুরে মহম্মদ বিশ্রাম লাভ করিয়া থাকেন। আবু সোফিয়ান তাহাতে বসিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে কন্যা ধাবিত হইয়া আসিয়া বলিলেন—"বাবা কর কি ঈশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষের মাঁদুরে বসিও না, আমি তোমাকে স্বতন্ত্র মাঁদুর দিতেছি।" দেখ কেমন পরিবর্ত্তন! যে ব্যক্তি দাস দাসী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ও পরম আদরে থাকিয়াও আপনাকে পরাধীন বন্দী ভাবিয়া শিরস্তাড়ন করিয়াছিল সেই এখন ধরাসনে মাঁদুরে বসিয়া সুখী হইতেছে; এবং তদপেক্ষা অনেকগুণে কঠোর বন্দী দশাকেও সুখের কারণ বিবেচনা করিতেছে? এ পরিবর্ত্তন ঘটাইল কে? উত্তর—প্রেম। যেই প্রেমের জন্ম অমনি ভয় ভাবনা, পরাধীনতার অন্তর্ধান। এইরূপে লক্ষ লক্ষ স্ত্রীলোক আজ স্বীয় স্বীয় পতির

সঙ্গে পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাইতেছে, পতির অনুগত হইয়া চলিতেছে—পরাধীনতা যদি দেখিতে চাও তাহাদের জীবনে। তাহারা বন্দী হইয়া সুখী হইতেছে; জীবন বিসর্জ্জন করিয়া জীবন পাইতেছে; আত্ম-বিক্রয় করিয়া আত্মার সুখ সঞ্চয় করিতেছে। যেখানে প্রেম সেইখানেই স্বাধীনতা।

"সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ"—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, তাঁহার স্বদেশবাসিগণকে নানাবিধ নিগড়ে আবদ্ধ ও ঘোর দুঃখে মগ্ন দেখিয়া বলিলেন—"সত্যে কর প্রীতি পাইবে পরিত্রাণ।" সত্যে প্রীতি কর তোমাদের বন্ধন দশা আর থাকিবে না। প্রীতিকেই তিনি প্রকৃত স্বাধীনতার দ্বার স্বরূপ মনে করিয়াছিলেন। মহাত্মা যীশুও নিজ শিষ্যগণকে এই উপদেশ দিয়াছিলেন—"সত্যকে জান, সত্যই তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" সত্যকে যে বিশুদ্ধ প্রীতি করিতে সমর্থ হইয়াছে সে রাজা, সম্রাট, সেনাপতি, এ সকলের উপরে উঠিয়া গিয়াছে; সে ভয় ও স্বার্থপরতাকে অতিক্রম করিয়াছে—তাহার মত স্বাধীন পুরুষ আর কে? স্বাধীনতার অর্থ অনেকে বুঝেন, কাহারও কর্তৃত্বাধীন না হওয়া, কাহারও চরণে প্রণত না হওয়া, কাহারও দ্বারা কার্য্যে বাধা না পাওয়া। ইহা স্বাধীনতার নিকৃষ্ট অর্থ। এক জনের উপরে কেহ প্রভু না থাকিতে পারে, তাহার গর্ব্বিত মস্তক সর্ব্বোপরি উন্নত থাকিতে পারে, তাহার কার্য্যের পথে কেহ বিঘ্ন উৎপাদন না করিতে পারে, তথাপি তাহার প্রকৃত স্বাধীনতা না থাকিতে পারে। যে স্বাধীনতাতে নবজীবন দেয়, যাহাতে মনুষ্যত্বকে বিকশিত করে, যাহাতে আত্মার শক্তিকে বর্দ্ধিত করে, তাহা প্রীতি ভিন্ন জন্মে না। যিনি দুরন্ত প্রতিজ্ঞা দ্বারা আপনাকে কঠিন নিগড়ে সংযত করিয়াছেন; প্রবৃত্তিকুলকে ধর্ম্মের নিয়মের অনুগত করিয়াছেন, আপনার জীবনকে ঈশ্বরেচ্ছার অধীন করিয়াছেন, একদিকে তাঁহার কি ঘোর অধীনতা আবার অপর দিকে তাঁহার ন্যায় স্বাধীন কে? যে প্রবৃত্তির দাস, স্বার্থপর ও স্বেচ্ছাচারপরতন্ত্র, সে কাহারও অধীন নহে, কিন্তু ঘোর পরাধীন! যাহার প্রেম নাই কেবল ভয়ে শাস্ত্র বা গুরুর অনুসরণ করে সেই পরাধীন।

গুরুভক্তি ও স্বাধীনতা—আমরা গতবারে গুরু শিষ্য সম্বন্ধ বিষয়ে যে দুই একটী কথা বলিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদের যুবকদলের কাহারও কাহারও ত্রাসের উদয় করিয়াছে। ঘর পোড়া গরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখিলে ডরায়, সেইরূপ গুরু ও গুরুভক্তি প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিলে তাঁহাদেরও মনে ভীতির সঞ্চার হয়, মনে করেন এই বুঝি সেই পুরাতন কুৎসিৎ ব্যাপারটার সপক্ষতা হইতেছে। এরূপে শব্দের পশ্চাতে ধাবিত না হইয়া স্থির ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে, মানব চরিত্রে ধর্ম্মভাব বর্দ্ধিত হইবার যত প্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে সাধুসঙ্গ একটী প্রধান কি না? এরূপ কোন ধর্ম্মানুরাগী, বিশ্বাসী ও ঈশ্বর-প্রেমিক পুরুষ যদি পাওয়া যায়; যাঁহার সংশ্রবে আসিলেই তাঁহার হৃদয়স্থ অগ্নি আরও দশটী হৃদয়ে সংক্রান্ত হয়, তবে সেরূপ পুরুষের চরণে ধর্ম্মশিক্ষার্থী যুবকদিগকে বসিতে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য কিনা? ইহাই গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ। তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে যদি অন্তরে ঈশ্বর-প্রীতি জাগে তবে স্বাধীনতার লোপ কি প্রকারে হইবে? সাধুজনের প্রতি ভক্তি করিতে গিয়া মানুষের স্বাধীনতা যায় অর্থাৎ তাহার মনুষ্যত্ব লোপ হয়, ইহা নূতন শোনা গেল। ভক্তিই ত প্রকৃত স্বাধীনতা, তাহাতে আত্মাকে পোষণ করে, সবল করে, ও জীবন্ত করে। যে দিন পূর্ব্বোক্ত গুণ সম্পন্ন পুরুষ সকল আমাদের মধ্যে ভূরি পরিমাণে জন্মিতে থাকিবেন ও আমাদের যুবক যুবতীগণ ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণে প্রণত হইয়া, তাঁহাদের জীবন হইতে জ্যোতি ও তেজ সংগ্রহ করিতে থাকিবেন, সে দিন এই ব্রাহ্মসমাজের শক্তি দুর্জ্জয় হইয়া উঠিবে। যীশু যদি কতিপয় বিশ্বাসী ও অনুরাগী শিষ্য না রাখিয়া যাইতেন, তাহা হইলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের এ শক্তি কেহ দেখিতে পাইত না। ঈশ্বর করুন আমাদিগের এরূপ সকল পুরুষ ও বিশ্বাসী শিষ্যদল আবির্ভূত হউন।

ধর্ম্মজীবন ও অনুষ্ঠান—পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে, আমাদের কলিকাতাস্থ একজন ব্রাহ্মবন্ধুর একটী পুত্রের বিদ্যারম্ভ সূচক অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়া নলহাটীর একজন ব্রাহ্মভ্রাতা প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরে তত্ত্বকৌমুদীতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে অনুকূল মত প্রকাশ করা হয়। সম্প্রতি উক্ত ব্রাহ্মভ্রাতা আবার আমাদের উক্তির প্রতিবাদ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, স্থানাভাব বশতঃ তাঁহার সমগ্র পত্রখানি মুদ্রিত করিতে পারা গেল না, কিন্তু তাহার সারভাগ এই;—

"ঈশ্বরকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ থাকিতে পারে না। বাহিরের আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি দ্বারা সে উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় আমরা বিশ্বাস করি না। বরং এ সব আড়ম্বর লোককে ঈশ্বর থেকে দূরে নিয়া যায় মনে করি। আমার জীবন যদি ভাল না হইল, রিপুগুলি যদি বশীভূত না হইল, প্রাণের ভিতরে যদি প্রেম ভক্তি বিকশিত না হইল এবং উপাসনার প্রতি যদি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ না জন্মিল তবে কি ২।৪টী অনুষ্ঠান করিয়া আমি ধর্ম্মকে উচ্চ স্থানে স্থাপন করিতে পারিব? তদ্দ্বারা কি আমি পরিবারস্থ ছেলে মেয়েদিগকে ধর্ম্ম-শিক্ষা দিতে পারিব? কি প্রতিবাসীর নিকটে ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব? সম্পূর্ণ অসম্ভব কথা। জীবন্ত ধর্ম্মভাব ব্যতীত কেবল অনুষ্ঠান দ্বারা পরিবারে ধর্ম্মভাব মুদ্রিত করা অসম্ভব। যাহাদের পরিবারে দৈনিক উপাসনা নাই, প্রেম ভক্তির বিকাশ নাই, তাহারা ২।৪টী অনুষ্ঠান করিয়া যদি ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হয়, তবে উহা ব্রাহ্ম সমাজের কলঙ্কের কথা বলিতে হইবে, ব্রহ্মের উপাসক ব্যতীত আবার কে ব্রাহ্ম হইতে পারে বুঝি না।"

অনুষ্ঠান ও অনুরাগ-বিহীনতার মধ্যে এমন কি অপরিহার্য্য সম্বন্ধ আছে যে যেখানে অনুষ্ঠান থাকিবে সেখানে অনুরাগ-বিহীনতা থাকিবেই? কে এরূপ বলিয়াছে যে অনুরাগ বিহীন হইয়া, রিপুগুলিকে বশীভূত না করিয়া, প্রাণের ভিতর ভক্তি বিকশিত

না করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হইবে? বরং যে ব্যক্তি অনুরাগ-বিহীন তাহারই অনুষ্ঠানের প্রতি উদাসীন হইবার অধিক সম্ভাবনা। আমাদের বক্তব্য এই মাত্র—যিনি ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মের বিশ্বাসী উপাসক তিনি গার্হস্থ্য অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানে, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাকেও সর্ব্বোচ্চ স্থান দিতে পারেন না; এবং তিনি যে কার্য্য করেন, তাহা ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ করিয়াও তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠানগুলি আর কিছুই নহে। অনুষ্ঠানগুলি যখন অনুরাগ বিহীন হয় তখন শুষ্ক প্রাণ-বিহীন ক্রিয়া মাত্র হয়। সেরূপ অনুষ্ঠান প্রার্থনীয় নহে।

অভ্যাস ও আত্ম-নিগ্রহ—অর্জ্জুন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং॥
ভগবদ্গীতা ৬ অঃ ৩৪ শ্লোঃ।

অর্থ। হে কৃষ্ণ! আমার মন অতি চঞ্চল, এবং সতত বিক্ষেপশীল, এই মনকে সংযত করা বায়ুর সংযমের ন্যায় দুষ্কর বলিয়া মনে করি।

তাহাতে কৃষ্ণ উত্তর করিলেন;—

অসংশয়ং মহাবাহো মনোদুর্নিগ্রহং চলং।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"
ভগবদ্গীতা, ৬অঃ ৩৫শ্লোক।

অর্থ। হে মহাবাহো! মনকে সংযত করা যে দুষ্কর তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা ইহাকে সংযত করা যায়।

অভ্যাসের অনেক গুণ। একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ইংরাজকে যদি জানুর উপরে জানু দিয়া যোগাসনে বসিতে বলা যায়, তবে তাহার পক্ষে কি কষ্টকর অবস্থাই উপস্থিত হয়! প্রথমে ত বসিয়া জানুর উপরে জানু তোলাই তাহার পক্ষে দুষ্কর—যদিও বা অনেক কষ্টে তুলিতে পারে, এক মিনিটের অধিক কখনই রাখিতে পারিবে না। কিন্তু আমাদের কত যোগী, সন্ন্যাসী আছেন যাঁহারা উদয়াস্ত ঐ প্রকার বসিয়া থাকিতে পারেন। আমরা উপাসনা কালে দুই তিন ঘণ্টা ঐ প্রকারে বসিয়া থাকি কিছুই ক্লেশ হয় না? দুই শ্রেণীর মানুষে কিরূপে এত প্রভেদ হয়? উত্তর—অভ্যাস গুণে। আমরা বালক কাল হইতে যোগাসনে বসিবার অভ্যাস করি। শৈশব কালে আহার করাইবার সময় মাতা ঐ প্রকারে বসিতে শিখাইয়াছেন; বাবু হইয়া বসো, বাবু হইয়া বসো, বলিয়া পা দুখানি মুড়িয়া দিয়াছেন। তদবধি যেখানে সেখানে পা মুড়িয়া বসিয়া বসিয়া ঐ প্রকারে বসা অভ্যাস প্রাপ্ত হইয়াছে—পদদ্বয় অভ্যাস গুণে সংযত ও বশীভূত হইয়াছে। দেহ যেরূপ অভ্যাসগুণে সংযত হইয়াছে, মনও অভ্যাসগুণে সেই প্রকার সংযত হইতে পারে। চঞ্চল মনকে ঈশ্বরোপাসনাতে বার বার বসাইতে বসাইতে অভ্যাস হইয়া যায়, তখন আর উপাসনাতে বসা ক্লেশকর থাকে না। আমরা অনেক ব্রাহ্মের গৃহে দেখিয়াছি পারিবারিক উপাসনার নিয়ম না থাকাতে, এবং সন্তানদিগকে উপাসনাদিতে বসাইবার রীতি না থাকাতে, সে পরিবারের ছেলে মেয়ে ঈশ্বরোপাসনাতে বসিতে পারে না; দু মিনিট মন স্থির হয় না; উপাসনাতে বসিতে বলিলে ছটফট্ করে; উঠিয়া চলিয়া যায়। উপাসনা ভালই লাগে না। ব্রাহ্ম গৃহে ছেলে মেয়ের উপাসনাতে বসিবার অভ্যাস হওয়া আবশ্যক। ব্রাহ্মেরা কত দিনে প্রত্যহ পারিবারিক উপাসনা করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিবেন?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

রোগেই রোগের শান্তি।

চিকিৎসা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন যে, রোগের মধ্যেই আরোগ্যের বীজ নিহিত থাকে। রোগের প্রকোপ বাড়িতে বাড়িতে এরূপ একটী অবস্থাতে উপস্থিত হয়, যাহার পর আর বাড়িতে পারে না। সেইখানে হয় প্রকৃতি পরাস্ত হয়, রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়, না হয় সেইখান হইতেই আরোগ্যের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে থাকে। ঐ অবস্থাকে ইংরাজীতে (crisis) বলিয়া থাকে; বাঙ্গালাতে ইহাকে রোগ সংকট বলা যাইতে পারে। সূর্য্যের উদয় ও অস্তগমনের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সৌসাদৃশ্য আছে। প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদয় হইয়া সূর্য্য উঠিতে উঠিতে মধ্যদিনে এমন এক সীমায় উপনীত হয়, যাহার উপরে আর উঠিতে পারে না। তৎপরে সূর্য্যের অস্তের দিকে গতি হয়।

যেমন দৈহিক ব্যাধি সম্বন্ধে রোগ-সংকট আছে, সেইরূপ সামাজিক ব্যাধি সম্বন্ধেও রোগ সংকট দেখিতে পাওয়া যায়। কোন একটী সামাজিক দুর্নীতির প্রকোপ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; তাহার অত্যাচার ভারে প্রপীড়িত হইয়া নরনারী দিন দিন অবসন্ন ও মলিন হইয়া পড়িতেছে; সমাজের নানাদিকে নানাপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হইতেছে; এরূপ অবস্থাতে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অবশেষে সেই রোগই আপনার প্রতীকার আপনি করে। লোকের সহিষ্ণুতা শক্তি পর্য্যবসিত হইয়া যায়; মানব প্রকৃতি পদদলিত হইয়া অবশেষে পদাহত ফণীর ন্যায় প্রতিহিংসা সাধন করিতে অগ্রসর হয়। এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ভূরি ভূরি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র ইউরোপ যখন ধর্ম্মযাজকদিগের প্রপীড়নে অবসন্ন হইয়া পড়িল; পোপ যখন নরপতি ও সম্রাটদিগের অপেক্ষাও প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন; যখন পয়সা দিয়া মুক্তি ক্রয় হইতে লাগিল, এবং ধর্ম্মযাজকগণ প্রকাশ্যভাবে মুক্তি বিক্রয়ের ব্যবসা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; যখন ধর্ম্ম মন্দিরে ও সর্ব্ব প্রধান তীর্থস্থানের মধ্যে পাপের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল, তখন সেই রোগের মধ্য হইতেই প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। সেই প্রতিক্রিয়ার নায়ক পুরুষ হইয়া মহাত্মা লুথার সমাজ রঙ্গভূমে দেখা দিলেন। লুথার এই প্রতিক্রিয়াকে আনয়ন করেন নাই, প্রত্যুত এই প্রতিক্রিয়াই লুথারকে অভ্যুত্থিত করিয়াছিল। সকল মহাজনের জন্ম এই প্রকারে। মহাত্মা বুদ্ধও এই প্রকারে অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন।

ইতিহাসের বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা ও সমাজের প্রধান প্রধান বিষয় পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজের দৈনিক জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও ঐরূপ ঘাত প্রতিঘাত, রোগ ও প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সভ্য জগতের সর্ব্বত্র সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের জন্য যে সকল আন্দোলন হইতেছে তাহা রোগের প্রতীকারের চেষ্টা মাত্র। পূর্ব্বোক্ত সত্যটী স্মরণ রাখিয়া আমরা যদি ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করি তাহা হইলে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই ব্রাহ্মসমাজ যেন এক রোগ সংকটের অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে। ভিতরে পরস্পরের মধ্যে অনাত্মীয়তা ও ঘনিষ্টতার অভাব ও বাহিরে শক্তির হ্রাস—এই উভয়বিধ লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে। ভিতরের ঘনিষ্ট যোগের অভাব হইতেই বাহিরের কার্য্যকারিতার হ্রাস হইতেছে। মানুষ পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া অমূল্য শক্তি কিরূপে ক্ষয় করিতে পারে, আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া কিরূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে পারে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারণে অভিমান করিয়া কিরূপে ঈশ্বরের মহৎকার্য্যের ব্যাঘাত করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত যদি কেহ দেখিতে চাহেন, তবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমরা কোন এক বিশেষ সমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না—সাধারণ ভাবে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি—একদিকে যেরূপ রোগের লক্ষণ দেখিতেছি আবার অপরদিকে মঙ্গল বিধাতার মঙ্গল বিধানের বিষয় স্মরণ করিতেছি। রোগ যাঁহার হস্ত হইতে শাস্তি স্বরূপ আসে, তাঁহারই মঙ্গল বিধানে তন্মধ্যে আরোগ্যের বীজ নিহিত থাকে। দৈহিক প্রকৃতি যেমন প্রতিক্রিয়া-পরায়ণ হয়, আধ্যাত্মিক প্রকৃতিও সেই প্রকার প্রতিক্রিয়া পরায়ণ হইয়া থাকে। এরূপ আশা হইতেছে ত্বরায় ব্রাহ্মদিগের দৃষ্টি আপনাদের দুরবস্থার প্রতি পতিত হইবে, এবং তাঁহারা ব্যাকুল অন্তরে ঈশ্বরের চরণে ক্রন্দন করিবেন; তাঁহাদের মধ্যে নবশক্তি আবির্ভূত হইবে। কারণ ঈশ্বর ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, ধর্ম্মকে সর্ব্বদাই তিনি রক্ষা করিতেছেন।

ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়।

উদ্দেশ্য—এই কলিকাতা সহরে ব্রাহ্ম-বালিকাদিগকে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত অতি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় আছে। বেথুন বিদ্যালয় সকলের সুপরিচিত; সেখানে শিক্ষাকার্য্যের ভার অতি উপযুক্ত,সচ্চরিত্র শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে এবং তাঁহারা যেরূপ পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহা অতীব প্রশংসনীয়। তৎপরে ভিক্টোরিয়া কলেজ রহিয়াছে। তাহারও সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য বিশেষ উদ্যোগ হইতেছে। এসকল বিদ্যালয় থাকিতে ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয় খোলা হইল কেন?

উত্তর—বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ধর্ম্মশিক্ষাবিহীন শিক্ষা-প্রণালীর অনিষ্ট ফল আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি। এই প্রণালীতে বালক বালিকাকে এই শিক্ষা দিতেছে, যে ধর্ম্মশিক্ষা মানবের শিক্ষার অন্তর্গত নহে; ও ধর্ম্মশিক্ষা নিকৃষ্ট স্থান অধিকার করিবার যোগ্য। ইহার অপরিহার্য্য ফল এই হইতেছে,যে এই প্রণালীতে যাহারা শিক্ষিত হইতেছে, তাহারা ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য বৃদ্ধি লইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। প্রতি বৎসর যে হাজার হাজার শিক্ষিত যুবক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া সংসার-ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন,তাঁহাদের ভাব ও আচরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাহ্ম-বালকবালিকাগণ যদি নিরবচ্ছিন্ন সেই প্রণালীতে বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে তাহারাও সেই ভাব প্রাপ্ত হইবে, তাহা কে বারণ করিতে পারে। যদি গৃহে ধর্ম্মশিক্ষার নিয়ম থাকে তাহা হইলে এ অনিষ্ট ফল অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু তাহাও নাই; হিন্দু সমাজের ত কথাই নাই। ধর্ম্মশিক্ষা হিন্দু গৃহস্থদের গৃহ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে,ব্রাহ্ম গৃহস্থের গৃহেও তাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এরূপ অবস্থায় আমাদের বালক বালিকা-দিগকে জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার যদি উপায় না করা যায়, তাহারা ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়া বর্দ্ধিত হইবে। যে ধর্ম্মানুরাগের জন্য তাহাদের পিতা মাতা এত ক্লেশ সহিলেন সে অনুরাগ আর তাহাদের হৃদয়ে থাকিবে না। ইতি মধ্যেই অনেক ব্রাহ্ম বালককে এই ভাব প্রাপ্ত দেখিতেছি। তাহারা গৃহে ধর্ম্ম শিক্ষা পাইতেছে না; সমাজেও তাহাদের ধর্ম্ম-শিক্ষার বিশেষ উপায় অবলম্বিত হইতেছে না; অপরদিকে প্রতি দিন বিদ্যালয়ে গিয়া ব্রাহ্ম-বিরোধী বালকদিগের মুখে ব্রাহ্ম বিরোধী কথা শুনিতেছে। ফল এই হইতেছে, তাহাদের হৃদয় ব্রাহ্মসমাজের লক্ষ্য ও কার্য্য হইতে দূরে গিয়া পড়িতেছে; আমরা যখন মন্দিরে সমবেত হইয়া জগতের পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা করিতেছি—তখন তাঁহারা হয় ত বয়স্যদিগের সহিত আমোদ প্রমোদে কাল কাটাইতেছে। বালকগুলি ত এইরূপে বিনাশের পথে দাঁড়াইতেছে,—বালিকাগুলিকেও কি সেই পথে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত? এই সকল বালক বালিকা ভবিষ্যতে যে ব্রাহ্মপরিবার নির্ম্মাণ করিবে,তদ্দ্বারা কি ব্রাহ্মসমাজের বলবৃদ্ধি করিবে? এই জন্য আমরা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় স্থাপন করিলাম যে সেখানে জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা দিব। দ্বিতীয়তঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার অর্থ এই যে সেটী আর একটী স্থানে উঠিবার দ্বার-স্বরূপ। যাহা প্রবেশের দ্বার সেখানে অনেক ব্রাহ্মবালিকার শিক্ষার সমাধা হইবে; তৎপরেই তাঁহারা বিবাহিত হইয়া গৃহধর্ম্মে প্রবেশ করিবে। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ স্থানে যাইতে চান, যাউন, তাঁহাদের জন্য সেরূপ বন্দোবস্ত থাক, কিন্তু যাহারা সে স্থানে উঠিবে না, তাহাদিগকে এমন অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য, যাহাতে তাহাদের শিক্ষাটা গৃহধর্ম্মে প্রবেশের পূর্ব্বে একপ্রকার সাঙ্গ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশার্থী বালিকার যে প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন,—সে পথে গমনের ইচ্ছা বা শক্তি যাহার নাই এমন বালিকার পক্ষেও কি সেই প্রকার শিক্ষার প্রয়োজন? তবে সকল বালিকাকে এক চাকায় বাঁধিয়া রাখ কেন? তাহাদের জন্য কি স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত উচিত নয়? আর যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইবেন, তাঁহাদিগকেও কি বাল্যকালে ও যৌবনের প্রারম্ভে নিজেদের

তত্ত্বাবধানে ধর্ম্মশিক্ষার অধীন রাখিলে ভাল হয় না? সমুচিত রূপ জ্ঞানশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া, চরিত্র গড়িয়া, ও একটু মানুষের মত করিয়া তার পরে কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে পাঠাও না। জিজ্ঞাসা করি বেথুন স্কুলে ত সুশিক্ষার এমন ব্যবস্থা, তবে সেখানে খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের বালিকা এত কম কেন? সহরে কি খ্রীষ্টান দল কম? কারণ এই, খ্রীষ্টীয় গণের নিজেদের স্কুল আছে, সেখানে তাঁহারা আপনাদের বালিকাদিগকে আপনাদের মত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ব্রাহ্মদিগের কি সেরূপ শিক্ষা দিবার উপায় করা কর্ত্তব্য নহে? খ্রীষ্টীয়গণ চিরদিন যাহা করিয়া আসিতেছেন, তাহা কিয়ৎপরিমাণে করিবার জন্য এতদিনের পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ চেষ্টা করিতেছেন।

উপকার কি?—এই শিক্ষালয় হইতে কি প্রকার উপকারের প্রত্যাশা করা যায়?

উত্তর—প্রথমতঃ এখানে আপনাদের অভিপ্রায়ানুরূপ শিক্ষা দিতে পারা যাইবে, তদ্দ্বারা জ্ঞান শিক্ষা উত্তমরূপ হইবে। (২য়) দ্বিতীয়তঃ এখানে বালিকাগণ ব্রাহ্ম শিক্ষকদিগের হস্তে ব্রাহ্ম সহাধ্যায়িদিগের সঙ্গে ও ব্রাহ্ম সমাজের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইবে, সুতরাং জ্ঞানশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্যের প্রতি তাহাদের অনুরাগ জন্মিবে। (৩য়) তৃতীয়তঃ এখানে রীতিমত ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পড়ান হইবে, তদ্দ্বারা তাহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস দৃঢ় হইবে। (৪র্থ) চতুর্থতঃ এখানে সংগীত, চিত্রবিদ্যা সূচিকার্য্য প্রভৃতি স্ত্রীলোকের অবশ্য জ্ঞাতব্য শিল্প সকল শিক্ষা দেওয়া হইবে, তদ্দ্বারা ভাবী ব্রাহ্মপরিবার সকলকে সুখের স্থান করা হইবে। (৫ম) এই সকল বালিকা উত্তরকালে যখন বিবাহিতা হইবে তখন নিজ নিজ ধর্ম্মানুরাগ-বিহীনতার দ্বারা পতিদিগকে নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত না করিয়া বরং নিজ নিজ পরিবারকে ধর্ম্মানুরাগের এক একটী উৎসস্বরূপ করিয়া তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের বল বৃদ্ধি করিবে। (৬) ষষ্ঠতঃ ইহাদের মনে আমরা যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ নিহিত করিব, তাহা ইহারা নিজ নিজ পুত্র কন্যার মনে সুসময়ে নিহিত করিবে। এইরূপে ব্রাহ্মসমাজ সুগঠিত হইয়া বাড়িতে থাকিবে।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষা—এই শিক্ষালয় হইতে বালিকাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে প্রেরিত হইবে কিনা?

উত্তর—সে বিষয়ে এখনও স্থির নাই। আপাততঃ এণ্ট্রান্স স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ শ্রেণী পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। ক্রমে অপরাপর শ্রেণী খোলা হইবে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া যাইতেছে, তাহাতে যদি কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থিনী হন, তাঁহার পরীক্ষা দিবার পক্ষে সম্পূর্ণ আনুকূল্য হইবে। এখনও এমন অনেক ছাত্রী আছে যাহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে প্রেরণ করা অভিভাবকদিগের অভিপ্রায়। তবে অপরাপর বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রণালীর সহিত তুলনায় এখানকার শিক্ষা প্রণালীর একটু প্রভেদ এই আছে যে, এখানে নিম্নশ্রেণীতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়। নিম্নশ্রেণীতে বাঙ্গালাটা একটু পাকা না করিলে কাঁচাই থাকিয়া যায়। আর পরীক্ষাতে দেখা গিয়াছে, যাহারা বাঙ্গালা ভাল জানে ও লিখিতে পারে, তাহারা ইংরাজীও সত্বর শিখিতে পারে। নিম্নশ্রেণীতে যেমন বাঙ্গালাতে অধিক মনোযোগ দেওয়া হয়, উচ্চ শ্রেণীতে সেইরূপ ইংরাজীতে অধিক মনোযোগ দেওয়া হইবে।

এখানে ব্রাহ্মেতর বালকবালিকা লওয়া হইবে কি না?—উত্তর, যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অনুরাগী ও স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আপত্তি করেন না, এরূপ ব্যক্তির পুত্র কন্যাকে লওয়া যদি কমিটী উচিত বোধ করেন, তাহা হইলে লইতে পারিবেন।

ব্রাহ্মেরা কি প্রকারে ইহার সাহায্য করিতে পারেন—উত্তর,—অনেক প্রকারে সাহায্য করিতে পারেন। (১ম) স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যাকে প্রেরণ করিয়া, (২য়) ইহার কার্য্য বিষয়ে পরামর্শ দিয়া, (৩য়) ইহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সাহায্য করিয়া,(৪র্থ) এখানে পুত্র কন্যাকে প্রেরণ করিবার জন্য অপরকে প্ররোচনা করিয়া; এবং ইহার উন্নতির জন্য ঈশ্বর চরণে প্রার্থনা করিয়া।

এই শিক্ষালয়ের বর্ত্তমান অভাব কি?—অভাব অনেক; স্কুলের নিতান্ত আবশ্যক ব্যবহার্য্য দ্রব্য আল্‌মারী, পাখা, টেবিল, ম্যাপ প্রভৃতি এখনও উপযুক্তরূপে ক্রয় করা হয় নাই। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গামোহন দাস মহাশয় কৃপা করিয়া একখানি ওমনিবশ গাড়ি দিয়াছেন, তাহার ঘোড়া এখনও ক্রয় করিতে পারা যায় নাই; এখনও কয়েকজন শিক্ষক বিনা বেতনে খাটিতেছেন,তাঁহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দেওয়া যাইতেছে না; স্কুল ঘরের সুন্দর সিঁড়ীতে কতকগুলি ফুলের টব দিলে সুন্দর হয়, এবং স্বাস্থ্যও ভাল হয়, অর্থাভাবে তাহা পারা যায় নাই; স্কুল ঘরের মধ্যে বিবিধ ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে প্রবচনাবলী মুদ্রিত করিয়া ঝুলাইয়া দিলে ভাল হয়, এবং নানা দেশীয় সাধু সাধ্বীদিগের ছবি রাখিলে বিনয় সাধুভক্তি প্রভৃতি বিকাশের সাহায্য হইতে পারে, অর্থাভাবে তাহা হয় নাই; শিক্ষালয়ের সঙ্গে একটী পুস্তকালয় থাকা আবশ্যক, তাহাও অর্থাভাবে হইতেছে না। সেই জন্যই বলা গিয়াছে, সম্পূর্ণ অভাব। আমরা একজনে যাহা করিতে না পারি, তাহা দশজনে সমবেত ভাবে করিতে পারি।

উপসংহারে ব্রাহ্মবন্ধুগণের সমীপে এই নিবেদন, তাঁহারা সকলে ঈশ্বর-চরণে এই প্রার্থনা করুন, যেন এই শিক্ষালয় দ্বারা ভাবী ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়।

কর্ত্তব্য।

(প্রাপ্ত)

কর্ত্তব্যজ্ঞান মানবজীবনের একটী অতি উচ্চ অধিকার। এই অধিকার লাভ করিয়াই মানুষ পশ্বাদি ইতর প্রাণীগণ ও বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ পদার্থ সমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ। মানবের ন্যায় ইতরপ্রাণীরও প্রাণ ও অনুভব শক্তি আছে, কিন্তু কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই। প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন

যে মানবের ন্যায় পশ্বাদির ও কৃতজ্ঞতা, স্নেহ, ভালবাসা প্রভৃতি অনেক সদ্‌গুণ আছে। কিন্তু যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি মানবকে পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, পশুজীবনে কদাপি তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ত্তব্যবুদ্ধি অপেক্ষা মানবের আরও অনেক মহৎগুণ আছে তাহাতে সন্দেহ নাই কিন্তু কর্ত্তব্য বুদ্ধিই মানবের প্রকৃত মনুষ্যত্বের চিহ্ন। এক বিন্দু জল আস্বাদন করিয়া যেমন মহাসাগরের লবণাক্ত জলের পরিচয় পাওয়া যায়, কর্ত্তব্যজ্ঞানের একটী সামান্য দৃষ্টান্ত দেখিয়াও তেমনি এক ব্যক্তির প্রকৃত মনুষ্যত্বের ভাব হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। এখন কথা হইতেছে যে, যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানই মনুষ্যত্বের প্রকৃত লক্ষণ হয়, তবে প্রত্যেক মানব-জীবনেই ত তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমরা সচরাচর এ নিয়মের বিপর্য্যয় দেখিতে পাই কেন? আমরা দৈনান্দিন জীবনে দেখিতে পাই যে, কত শত নরনারী কর্ত্তব্য বুদ্ধিবিহীন হইয়া সংসার পথে বিচরণ করিতেছে; কর্ত্তব্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া অকর্ত্তব্যকে আলিঙ্গন করিতেছে; পশ্বাদির ন্যায় আহার নিদ্রা ও রিপুকুলের অধীন হইয়া কত লোক আপনাদের মনুষ্যত্ব ক্ষয় করিতেছে—ইন্দ্রিয়াসক্তি ও পানাসক্তিই এই সকল লোকের জীবনের নিয়ামক। ইহারা কেবল আপনার সর্ব্বনাশ ঘটাইতেছে এমন নয়, স্ত্রী পুত্র পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন না করিয়া পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্ট জীবন ধারণ করিতেছে। সমাজ ও স্বদেশের উন্নতি সাধনের কথা এ সকল লোকের পক্ষে কোন রূপেই খাটে না। তবে কি এই সকল লোক মানব নামের উপযুক্ত নয়? যদি মানব নামেরই উপযুক্ত না হইবে তবে মানবদেহ ধারণ করিয়া মনুষ্য সমাজে জন্ম গ্রহণ করা কেন? ইহার গূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এ সকল লোকের জীবনে যে কর্ত্তব্যজ্ঞান নাই এমত নহে, তবে সে কর্ত্তব্যজ্ঞানটুকু ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দুষ্প্রবৃত্তি-রাশির দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই তাহার দীপ্তি নাই, তাহার ক্রিয়া নাই। মানব জীবন, পশুভাব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্বের সমাবেশ মাত্র। পশুভাবের বিনাশেই মনুষ্যত্বের জন্ম এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের নামই দেবত্ব। এই তিন অবস্থার মধ্য দিয়া শ্রেষ্ঠতর লোকের জন্য উপযুক্ত হইবার উদ্দেশেই মানব ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে। ইহাই মানব জীবনের মহাসাধন এবং এই সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইলেই মানবজীবন সফল হইয়া থাকে। সুতরাং যে জীবনে পশুভাবের আধিক্য—পাশব শক্তির প্রাবল্য সেখানে মনুষ্যত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাইবে কেন? এবং মনুষ্যত্বের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে না বলিয়াই যে মনুষ্যত্বের লক্ষণ বিদ্যমান নাই এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। মলিন পঙ্কিল জলে যেমন চাঁদের আলো খেলে না, হাসে না, পশুভাবপূর্ণ মলিন হৃদয়েও তেমনি কর্ত্তব্যজ্ঞানের উজ্জ্বল আলোক প্রকাশিত হইতে পারে না। পাশব শক্তির সহিত সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া কত লোক মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিতেছে, আবার কেহ বা এই দুর্দ্দান্ত পশুকে পরাজয় করিয়া মানব শক্তির বিকাশ সাধন করিতেছে। যখনই পশুর বিনাশ সাধন হয় তখনই মানব হৃদয়ে কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হইয়া থাকে। মানব মনে একবার কর্ত্তব্যবুদ্ধির উদয় হইলে আর রক্ষা থাকে না। কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রবল স্রোতের ন্যায় মানব-চিত্তকে চতুর্দ্দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। মানব-জীবনের কর্ত্তব্য অনন্ত, সুতরাং কর্ত্তব্যবুদ্ধি-পরায়ণ মানব যে দিকে নিরীক্ষণ করেন সেই দিকেই কর্ত্তব্য দেখিতে পাইয়া অনেক সময়ে বিশৃঙ্খল ভাবে কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হন! কিন্তু প্রকৃতির এমন নিয়ম নয় যে বিশৃঙ্খল ভাবে কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হইতে পারে। কি জড় কি চেতন সকলকেই শৃঙ্খলার অধীন হইয়া চলিতে হয়।

শৃঙ্খলাই প্রকৃতির স্বভাব এবং যেখানে এই স্বভাবের বৈপরীত্য সেখানেই অকাল মৃত্যু। যখন জড় জগতে সামান্য বিশৃঙ্খলভাব উপস্থিত হইলে বিষম উপদ্রব উপস্থিত হয়, তখন মানব হৃদয়ে শৃঙ্খলার অভাবে যে বিষম অনিষ্ট সংসাধিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মানব আপনা হইতে আরম্ভ করিয়া বিশ্বসংসারে অনন্ত কর্ত্তব্যকার্য্য দেখিতে পাইয়া কর্ত্তব্য সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকে। জীবনের বিশেষ কর্ত্তব্য কি এবং সর্ব্বাগ্রে কি করণীয় ইহা স্থির করিতে না পারিয়া মানুষ নানাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করে এবং কিছুই সুচারুরূপে সাধন করিতে না পারিয়া অচিরে হতাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যিনি কর্ত্তব্যের অনন্ত স্রোতের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে সুস্থির রাখিতে সক্ষম হন, আপনাকে বিস্মৃত না হইয়া সুশৃঙ্খলভাবে কর্ত্তব্য সাধনে প্রবৃত্ত হন তিনিই কৃতার্থ হইয়া থাকেন। আত্মোন্নতি সাধনই মানবজীবনের সমস্ত কর্ত্তব্যের প্রথম সোপান। যে শক্তির দ্বারা কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে সেই আত্মার শক্তি জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তিকে আপন আপন জীবনে সাধনা দ্বারা জাগ্রত করিতে হইবে—বিকশিত করিতে হইবে। যে অস্ত্র লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে সেই অস্ত্রই যদি ভোঁতা রহিল তবে আর আত্মরক্ষা হইবে কিসে? আপনার জীবন গঠন না করিয়া আপনাকে জ্ঞান, প্রীতি, পবিত্রতা ও শক্তির কবচে আচ্ছাদিত না করিয়া যিনি সামাজিক বা জন সাধারণের হিত সাধনরূপ মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হন তিনি সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকিয়া সময়ে সময়ে লম্ফ ঝম্ফ ও আস্ফালন করিতে পারেন বটে কিন্তু কদাপি অগ্রসর হইয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে সাহসী হন না। সেইরূপ অপদার্থ লোক সৈন্যদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে বটে, কিন্তু বাস্তবিক সেইরূপ অসার ভীরুপ্রকৃতি লোক দ্বারা সৈন্যদলের প্রকৃতরূপে কোন সাহায্য হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে দেশের লোক সাধারণতঃ সারবান—যাঁহাদের বাক্যের আড়ম্বর নাই কার্য্যের দিকেই সর্ব্বদা দৃষ্টি রহিয়াছে, এক কথায় বলিতে গেলে, যাঁহারা হুজুগ-প্রিয় নহেন, তাঁহারা যেমন লোক চিনিয়া কাজে লাগাইতে পারেন, এমন আর কেহ পারেন না। কাজের লোকেরাই কাজের লোক চিনেন, সুতরাং সেখানে বাক্যসর্ব্বস্ব অপদার্থ লোকের আদর হইতে পারে না। কিন্তু যে দেশে হুজুগের মাত্রাটাই কিছু বেশী—বাক্যের আড়ম্বরেই কার্য্যের পর্য্যবসান, সে দেশে সারবত্তা অপেক্ষা বাক্‌চাতুর্য্যেরই

অধিক আদর—ত্যাগ স্বীকারের মহৎ দৃষ্টান্ত অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি ও পদেরই অধিকতর সম্মান, সুতরাং সে দেশের সাধারণ হিতকর কার্য্যে যে অসার ও অপদার্থ লোকেরও স্থান হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এই জন্যই দেখিতে পাই এই হতভাগ্য দেশে যখনই কোন হিতকর কার্য্যের উদ্যোগ হয়, যখনই কোন মহৎ ব্রতের আয়োজন হয় তখনই চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে মুখসর্ব্বস্ব লোক আসিয়া দুই চারি জন সারবান ব্যক্তির সঙ্গে যোগ দিয়া সেই সকল মহৎ ব্রত সাধনের প্রকৃত অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। বাহিরে বাহিরে দেখিতে গেলে, এই সকল লোক সংখ্যা দেখিয়া ইহাদের আস্ফালন ও কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া আশা ও উৎসাহ জন্মিতে পারে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে এই সকল অপদার্থ লোক যোগ দেওয়াতেই কার্য্যের প্রকৃত অনিষ্ট সাধন হইতেছে। কাম ক্রোধ হিংসা প্রভৃতি পাশববৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া ঘোর অমানুষিক কার্য্য সম্পাদন করা যাঁহাদের পক্ষে এখনও সম্ভব—অভিমানে আঘাত লাগিলে বিচার শক্তি হারাইয়া সাধারণের অহিতাচরণ করিতেও যাঁহারা সংকুচিত হন না—যশ মান ও পদ লাভই যাঁহাদের সাধারণ হিতকর কার্য্যে যোগ দেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য, তাঁহাদের দ্বারা যে দেশের লোকের প্রকৃত কোন স্থায়ী মঙ্গল সাধিত হইতে পারে এরূপ আশা যাঁহারা করেন তাঁহারাও ভ্রান্ত।

বাস্তবিক অগ্রে নিজে মানুষ না হইয়া জন সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষা করা বা দেশ উদ্ধার করিতে যাওয়া, আর বামন হইয়া চাঁদ ধরিবার চেষ্টা করা এ উভয়ই তুল্য। যাঁহারা জগতের প্রকৃত কোন হিতসাধন করিতে চান—নরনারীর প্রকৃত কল্যাণ সাধনের জন্য ও জন সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যাঁহাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়, তাঁহারা স্বতন্ত্র ধাতুর লোক এবং তাঁহাদের কার্য্য প্রণালীও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; তাঁহারা অগ্রে সুদৃঢ়রূপে ভিত্তি স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন, ভিত্তি সুদৃঢ় হইলে তাহার উপর প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেও আশঙ্কার কারণ থাকে না; কিন্তু কাঁচা ভিত্তির উপর কিছুই বেশী দিন দাঁড়ায় না, দাঁড়াইলেও কিছুতেই তাহার আশঙ্কা দূর হয় না—কখন সামান্য ঝড় বৃষ্টিতে ভূমিসাৎ হয় এই চিন্তাতেই নিরন্তর অস্থির থাকিতে হয়। এই কারণেই তাঁহারা জগতের অন্যান্য সমস্ত কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসীন হইয়া সর্ব্বাগ্রে আপন আপন জীবন গঠনের জন্য ব্যস্ত হন; সমস্ত জন-কোলাহল হইতে পলায়ন করিয়া আপনার অভ্যন্তরে মগ্ন হন এবং আত্মার অতলস্পর্শ শক্তিসাগরে ডুবিয়া আপনাতে যে সকল রত্ন লুক্কায়িত আছে তাহা সংগ্রহ করিতে থাকেন। যাঁহারা আপন ধনের হিসাব করিয়া মহাযজ্ঞের আয়োজন করেন—আপন শক্তির পরিচয় লইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন তাঁহারাই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। যাঁহারা সকল উন্নতির মূলশক্তি আত্মশক্তির বিকাশ সাধন করিতে সমর্থ হন, তাঁহাদের দ্বারাই জগতের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয়। যাঁহার প্রাণে তত্ত্বজ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়, তিনি সেই আলোকে জগতের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ দেখিতে পান এবং চেতনা লাভ করিয়া স্বাধীন ও সত্যভাবে প্রকৃত বীরের ন্যায় সংসারে প্রবেশ করেন। প্রেম পবিত্রতা ও ইচ্ছাশক্তির প্রকাশে তিনি নির্লিপ্ত, নির্ম্মল ও উদারভাবে কর্ত্তব্য-রূপ মহাযজ্ঞে আপনাকে আহুতি প্রদান করেন। কিন্তু আত্মোন্নতির পরীক্ষা পরিবারে। জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতা ও ইচ্ছাশক্তি কতদূর লাভ হইয়াছে, পরিবারে যেমন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এমন আর কোথাও নয়। কোন বিষয় বিশেষে অভিজ্ঞব্যক্তির নিকট পরীক্ষা দিয়া যেমন সেই বিষয় কতদূর শিক্ষা লাভ হইয়াছে ইহা বেশ বুঝা যায়, আপন জীবন কতদূর গঠিত হইয়াছে নিঃস্বার্থতা ও জিতেন্দ্রিয়তা কতদূর লাভ হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে হইলেও পারিবারিক জীবনের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। স্ত্রী পুত্র লাভ করিয়া যে গৃহী তাঁহাদের শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা না করেন, তিনি তাঁহাদের সঙ্গে বাস করিয়া জীবনের পরীক্ষা দিবারও সুবিধা পান না এবং পরিবারবর্গও তাঁহার সংসর্গে কোন উপকার লাভ করে না। কিন্তু সুগঠিত পরিবারে নিয়ত বাস করিয়া যাঁহার সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থভাবের বিকাশ হইয়াছে, তিনি আপন পরিবারস্থ স্ত্রী পুত্রগণের ন্যায় আপন সমাজের ভাই ভগ্নীগণের উন্নতি সাধনেও সমর্থ। সমাজের বিভিন্ন প্রকৃতির নর নারীগণের কল্যাণ করিতে গিয়া মানুষকে মহা সংগ্রামে পতিত হইতে হয়। কত লোক অভিপ্রায় বুঝিতে অক্ষম হইয়া কার্য্যোদ্ধারের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়, কেহবা হৃদয়ের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ সংগ্রামের মধ্যে যাঁহারা নিন্দা, প্রশংসা, লজ্জা, ভয়, মান ও পদকে অগ্রাহ্য করিয়া ন্যায় উদারতা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর সুস্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারেন, অচিরকাল মধ্যে তাঁহাদের এক গুণ শক্তি দশগুণ বাড়িয়া যায়—তাঁহাদের উৎসাহ উদ্যম বর্দ্ধিত হইয়া জনসমাজের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে। স্বাধীনভাবে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইবে অথচ অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে আচরণ করিতে হইবে, অপরের কল্যাণ সাধন করাই অভিপ্রায় হইবে, স্বার্থপরতার লেশও থাকিবে না, অধ্যবসায় ও অদম্য উৎসাহের সহিত যথা-সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে, ফলের প্রতি দৃষ্টি থাকিবে না, এই-রূপে যিনি সাধারণের হিতসাধন করিতে অভ্যস্ত হন, তাঁহার দ্বারাই জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় এবং তাঁহার পক্ষে পরিবার ও জনসমাজ এক হইয়া যায়। এই উচ্চ আদর্শা-নুসারে যাঁহার জীবন গঠিত হইয়াছে তিনি অভয়পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন—তাঁহার পদচিহ্ন অনুসরণ করা অপরের পক্ষে শ্লাঘার বিষয়।

প্রীতি ও পরিচর্য্যা।

১০ই আগষ্ট রবিবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রদত্ত উপদেশের সারাংশ।

বাইবেল গ্রন্থের মধ্যে একটী আখ্যায়িকা আছে। সে আখ্যায়িকটী এই—এরূপ লিখিত আছে যে যীশুর মৃত্যুর কয়েকদিন পরে তিনি কবর হইতে উঠিয়া আপনার শিষ্যগণকে দেখা দিয়াছিলেন। এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলিতে

পারি না, এবং সে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়াও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যাহা হউক এরূপ কথিত আছে, যে একদিন রাত্রে পিটর ও অপরাপর শিষ্যগণ স্থির করিলেন যে মাছ ধরিবেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া জাল লইয়া মাছ ধরিতে গেলেন। সমস্ত রাত্রি জাল ফেলা হইল, একটীও মাছ উঠিল না; সমুদয় প্রয়াস বিফল হইল। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে; প্রত্যূষের প্রাক্‌কালে যখন তাঁহারা নিরাশ মনে মৎস্য ধরিবার প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন, তখন কে একজন সেখানে আগমন করিলেন। নবাগত ব্যক্তি সাদর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কেমন মাছ ধরিলে? তাঁহারা উত্তর করিলেন সমুদায় রাত্রি জাল ফেলিলাম কিছুই হইল না। তখন সেই আগন্তুক আদেশ করিলেন, পুনরায় ঐ নৌকার বাম পার্শ্বে জাল ফেল। তাঁহার আদেশে জাল ফেলিবামাত্র এত মাছ উঠিল যে টানিয়া তোলা দুষ্কর। তখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে যীশু স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। সেই মৎস্য রন্ধন করিয়া সকলে একত্রে আহার করিলেন, অবশেষে যীশু পিটারকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"জোনাসের পুত্র পিটার তুমি কি আমাকে ইহাদের সকলের অপেক্ষা ভাল বাস? পিটার উত্তর করিলেন প্রভো আপনি ত জানেন আমি আপনাকে ভাল বাসি। যীশু বলিলেন—"তবে আমার মেষগুলির পরিচর্য্যা কর।" যীশু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"জোনাসের পুত্র পিটার তুমি কি আমাকে ভাল বাস?—পিটার বলিলেন সে কি আপনি কি জানেন না? যে আমি আপনাকে ভাল বাসি? যীশু বলিলেন তবে আমার মেষগুলির পরিচর্য্যা কর।"—যীশু তৃতীয় বার প্রশ্ন করিলেন—"পিটার তুমি কি আমাকে ভাল বাস?" পিটার কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া বলিলেন—"আপনি কেন বার বার প্রশ্ন করিতেছেন, আপনার অগোচর কি আছে আপনি ত জানেন আমি আপনাকে ভাল বাসি। "যীশু বলিলেন—"আমার মেষদলের পরিচর্য্যা কর।"

এই আখ্যায়িকা হইতে আমরা অনেক উপদেশ লাভ করিতে পারি। প্রথম, পিটার প্রভৃতি যখন আপনাপনি জাল ফেলিতেছিলেন—তখন একটীও মাছ জালে উঠে নাই; কিন্তু যীশু স্বয়ং আসিয়া যখন আদেশ করিলেন এবং তাঁহার আদেশে জাল ফেলা হইল, তখন জালে মাছ ধরে না। ইহা হইতে এই উপদেশ পাওয়া যায়, যে ঈশ্বরকে ভুলিয়া ও তাঁহার আদেশ না পাইয়া যে প্রচার করা যায়, তদ্দ্বারা প্রচারের ফল ফলে না, কিন্তু ঈশ্বর-আদেশে ও তাঁহার ভাব হৃদয়ে লইয়া যে প্রচার হয় তদ্দ্বারাই মানব-হৃদয় আকৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় উপদেশ, "যদি তুমি আমাকে ভাল বাস,তবে আমার মেষ দলের পরিচর্য্যা কর, এখানে অকৃত্রিম প্রীতি এবং যাহারা প্রেমাস্পদের প্রিয় তাহাদের পরিচর্য্যা, এই উভয়ের মধ্যে কেমন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলেও ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমার এক জন বন্ধু ছিলেন; বাল্যাবধি তাঁহার সহিত অকৃত্রিম মিত্রতা ছিল। তিনি পরলোকগত হইয়াছেন তাঁহার পুত্র কন্যাগণ এক্ষণে দূর দেশে বাস করিতেছে। তাহারা দূরদেশে বাস করিলেও আমার নিকটে দূর নয়, সকল ছেলেমেয়ের মধ্যে সেই ছেলেমেয়েগুলি যেন আমার বিশেষ ভাবে আপনার, এখন যদি তাহাদের কোন বিপদ ঘটে আমার বোধ হয় যেন শত যোজন পার হইয়া তাহাদিগকে আনিতে পারি, তাহাদের জন্য শ্রম স্বীকার করিতে ও কষ্ট পাইতে, শ্রম ও কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না।" জিজ্ঞাসা করি এ প্রেম কোথা হইতে আসিল? এ পরিচর্য্যার প্রবৃত্তি কিরূপে অভ্যুদিত হইল? তাহাদের পিতার প্রতি যে প্রেম ছিল, সেই প্রেম সংক্রান্ত হইয়া তাহাদের উপর গিয়া পড়িয়াছে। অগ্নির উত্তাপের ন্যায় প্রেমেরও সংক্রামনী শক্তি আছে, তাপ যেমন এক পদার্থ হইতে তাহার নিকটস্থ পদার্থে সংক্রান্ত হয়, প্রেমও সেইরূপ সম্বন্ধসূত্র ধরিয়া প্রেমাস্পদ ব্যক্তি হইতে তাঁহার আত্মীয় স্বজনে গিয়া থাকে। যেখানে পতি পত্নীর মধ্যে অকৃত্রিম প্রণয় আছে, সেখানে পতির বন্ধুগণ পত্নীর প্রিয়, এবং পত্নীর সখীগণ পতির প্রিয়। প্রেমাস্পদের প্রিয় বস্তু প্রেমিকের প্রিয় এটী মানব প্রকৃতির একটী গূঢ় রহস্য।

এই সত্যটী হৃদয়ে রাখিয়া একবার বিচার করা যাউক, ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আমাদের কি প্রকার ভাব! যে ভক্তমণ্ডলী লইয়া ব্রাহ্মসমাজ গঠিত তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে ঈশ্বরের মেষদল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে কিনা? তাঁহার প্রিয় সকলেই, কিন্তু তিনি সকলের প্রিয় নহেন। ব্রাহ্মগণ অনন্যগতি হইয়া তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছেন সুতরাং এই ভক্তদল বিশেষভাবে তাঁহার চরণাশ্রিত। যিনি ঈশ্বরকে অকৃত্রিম ভাবে প্রীতি করেন, তিনি এই মেষদলের পরিচর্য্যাতে সর্ব্বদা উদ্যোগী, অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে তিনি সর্ব্বদা মনোযোগী। যদি দেখা যায় সে বিষয়ে আমাদের মনোযোগ নাই, তাহা হইলে কি এই প্রমাণ হয় না যে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অকৃত্রিম প্রীতি নাই। যদি দেখা যায় যে আমরা সামান্য মান, অভিমান লইয়া এত ব্যস্ত, পরস্পরের সহিত এত বিবাদ পরায়ণ তদ্দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে অবহেলা হইতেছে, সে কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে কি এই প্রমাণ হয় না যে আমরা ঈশ্বরের কার্য্য অপেক্ষা আপনাদিগকেই অধিক প্রীতি করি? সামান্য মানবীয় প্রীতিতে মানুষ প্রতিদিন মান অভিমান ভুলিয়া যাইতেছে? আমি যেরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে যাইতেছি, এরূপ দৃষ্টান্ত অনেকে অনেকবার দেখিয়া থাকিবেন। একজন ভদ্রলোক অতি সদাশয় ও গুণশালী। তাঁহার বন্ধু বান্ধব সকলে তাহাকে অন্তরের সহিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা করেন। একবার উক্ত ভদ্রলোকটীর গৃহে একটী বিবাহোৎসব উপস্থিত। দেখি বন্ধুগণের মধ্যে যে আসিতেছে সেই অনুরোধের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোমর বাঁধিতেছে এবং যাহার দ্বারা যে কাজ হয় করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছে। কেহ ভাড়ারে গিয়া বসিয়াছে, কেহ পরিবেষ্টার সাজ সাজিয়াছে। সকলেই উৎসাহের সহিত কাজ করিতেছে। যে ব্যক্তি ভাড়ারের দ্বারে বসিয়াছে তাহার প্রকৃতি কিঞ্চিৎ উষ্ণ। সে ব্যক্তি পরিবেষ্টাদিগের মধ্যে এক জনের সামান্য ত্রুটী দেখিয়া অতি কর্কশ ভাষায় গালি দিয়াছে ও অপমান করিয়াছে। তাহাতে উক্ত পরিবেষ্টা মর্ম্মান্তিক ক্লেশ

পাইয়াছে—বাহিরে আসিয়া বলিতেছে, কি বলবো অমুকের কাজ নতুবা এখনি দধির হাঁড়ি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়া যাইতাম। আর একজন পরিবেষ্টা সান্ত্বনা দিয়া বলিল। "আরে ছেড়ে দেও, জানই ত ওর মেজাজ গরম। কাজটা ত সারা যাউক পরে দেখা যাইবে।" দেখিলাম বিরোধ ঘটিল, খুব গালাগালি হইল, কিন্তু গৃহস্বামীর কাজ কেহ ছাড়িল না, কারণ তাঁহার সহিত কাহারও বিরোধ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মদিগের গৃহস্বামীর প্রতি এতই প্রেমের অল্পতা, নিজেদের মান সম্ভ্রম লইয়া এতই ব্যস্ত যে বিবাদ বিসম্বাদে তাঁহাদিগের দিন পর্য্যবসিত হইতেছে, ঈশ্বরের কাজ পড়িয়া থাকিতেছে। তাঁহারা আপনাদিগকে ভুলিতে পারিতেছেন না। ঈশ্বর বলিতেছেন—ব্রাহ্ম তুমি কি আমাকে ভাল বাস? তবে আমার ভক্তদলের পরিচর্য্যা কর। হায়! হায়! আমরা কি অধম হইয়াছি, কি আত্মম্ভরি হইয়া রহিয়াছি, যে আমরা তাঁহার সমাজের পরিচর্য্যা ভাল করিয়া করিতে পারিতেছি না।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বালেশ্বর।

বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ৭ম বার্ষিক জন্মোৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।—

২৬এ জুলাই শনিবার সায়ংকালে উৎসব আরম্ভসূচক উদ্বোধন ও উপাসনা।

২৭এ জুলাই রবিবার, প্রাতঃকালে ব্রহ্মোপাসনা এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সম্বন্ধে উপদেশ। সায়ংকালে উপাসনা ও হিন্দু-ধর্ম্মের জ্ঞান ও কর্ম্মকাণ্ডের বিষয়ে উপদেশ।

২৮এ জুলাই সোমবার, সায়ংকালে উপাসনা এবং প্রকৃত মৃত্যুতে জীবন লাভ সম্বন্ধে উপদেশ।

২৯এ জুলাই মঙ্গলবার সমস্ত দিনব্যাপী মহোৎসব।

৩০এ জুলাই বুধবার সায়ংকালে উপাসনা ও বার্ষিক সভার অধিবেশন।

৩১এ জুলাই বৃহস্পতিবার সায়ংকালে উপাসনা ও সমাপ্তিসূচক প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার মিত্র মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার উপাসনা ও উপদেশ সকলের হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু বরদাকান্ত বর্দ্ধন মহাশয়ও এই উৎসবে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়েন।)

ভক্তিভাজন,

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু।—

মহাশয়!

১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদী পাঠ করিয়া আমি আপনার এবং তত্ত্বকৌমুদীর পাঠকদিগের অবগতির জন্য কয়েকটি কথা লিখিতেছি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী বারের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

১। "গুরুভক্তি ও জ্ঞানোন্নতি শীর্ষক" নোটে আপনি লিখিয়াছেন "উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ উৎকট স্বাধীনতা-প্রিয়তার সময়।" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বদাই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার গৌরব ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন। এই সমাজের কোন কোন প্রাচীন সভ্যকেও এই সমাজের লোকদিগের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিন দিন বিকাশ পাইতেছে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু স্বাধীনতার পরিপোষক তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক মহাশয় স্বাধীনতা-প্রিয়তার পূর্ব্বে "উৎকট" বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-প্রিয় ব্যক্তিদিগকে শ্লেষ এবং বিদ্রূপ করিয়াছেন কিনা?

২। "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দুর্ব্বলতা কোথায়?" প্রবন্ধে লিখা হইয়াছে "প্রথম আজ যদি ইহাদিগকে সভাতে ডাকিয়া বলা যায় তোমরা তোমাদের মধ্য হইতে সাধারণের শ্রদ্ধাভাজন কতকগুলি লোককে মনোনীত কর, যাঁহারা কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য হইবেন, যাঁহাদিগের উপরে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক সকল প্রকার কার্য্যের ভার অর্পিত থাকিবে।' তখন তাঁহারা কিরূপ ব্যক্তিদিগকে মনোনীত করিবেন? যাঁহারা ধর্ম্ম-ভাবে সকলের শ্রদ্ধেয়, উপাসনাশীল আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর এরূপ ব্যক্তিদিগকেই কি বাছিবেন? না নিয়মতন্ত্র প্রণালী যাঁহারা বুঝেন, সে বিষয়ে যাঁহাদিগের দূরদর্শীতা আছে, সে বিষয়ে যাঁহাদিগের সাহায্য পাওয়া যাইবে, এরূপ ব্যক্তিদিগকেই মনোনীত করিবেন? তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকেই মনোনীত করিবেন। তাহাদের ধর্ম্মভাব আছে কিনা, বৎসরের মধ্যে একদিনও উপাসনালয়ে আসেন কিনা, সমাজের কোন প্রকার আধ্যাত্মিক কার্য্যে যোগ দেন কিনা তাহা দেখিবেন না। ধর্ম্মভাব নাই বা থাকিল, বৎসরে একবারও মন্দিরের চৌকাট নাই বা পার হইল, নিয়মতন্ত্র আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, আমরা সেইরূপ লোকই চাই। এক্ষণে "তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকই মনোনীত করিবেন ইত্যাদি" একথা প্রকৃত পক্ষে অতি রঞ্জিত কিনা? অতি অল্প দিন হইল অধ্যক্ষ সভার সভ্যদিগকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ নির্ব্বাচন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অধ্যক্ষ সভায় প্রতি বৎসর যে সমুদায় ব্যক্তি নির্ব্বাচিত হন তাঁহাদের তালিকা দেখিয়া এ প্রকার উক্তি প্রতিপন্ন হয় কিনা? যদি না হয় তাহা হইলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের বিরুদ্ধে এ প্রকার অভিযোগ আনিয়া বিপক্ষ দলের সমালোচনার সুবিধা করিয়া দেওয়া কি সঙ্গত?

৩। আপনি বলিয়াছেন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ যেন বলিতে লাগিলেন—আমাদের সমাজে আমরাই 'লীলা করিতেছি।" বিধান শব্দ নিয়া অবশ্যই মত বিরোধ রহিয়াছে। কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মকে নববিধান, কেহ কেহ বিশেষ বিধান আবার কেহ কেহ ইহাকে ভগবানের এক পুরাতন ধর্ম্মবিধান বলিয়া থাকেন। এই মত বিরোধের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু "আমাদের সমাজে আমরাই লীলা

করিতেছি” এ প্রকার উক্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের উপর প্রযোজ্য হইতে পারে কিনা? এমন অনেক লোক কি এই সমাজে নাই যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে ঈশ্বরের বিধান মনে করিয়া প্রতিনিয়ত ইহার পরিচর্য্যায় রত আছেন?

৪। আপনি সম্প্রতি সাধুভক্তি এবং গুরুভক্তির প্রতি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এদেশে “গুরুভক্তি যে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে এবং অনুচিত ও অতিরিক্ত গুরুভক্তি হিন্দু সমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজে যেরূপ অনর্থ উৎপাদন করিয়াছে, তাহাতে “গুরুভক্তি শব্দটার উপর এই সমাজের সভ্যদিগের একটুকু ভয় থাকা অসম্ভব এবং অস্বাভাবিক নহে। সাধুভক্তি এ সমাজের লোকের একেবারে নাই একথা আপনি বলিতেছেন না “সাধুভক্তি সমুচিতরূপে বর্দ্ধিত হইতেছে না” ইহাই আপনার অভিযোগ। আপনি সাধুভক্তি এবং গুরুভক্তির উপর যতদূর গুরুত্ব প্রদান করিতেছেন ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যেক সভ্যই ততদূর গুরুত্ব প্রদান করেন কিনা সন্দেহ। তবে সাধুতা এবং সৎকার্য্যের উপর অনুরাগ বর্দ্ধিত হয়—ভাবভক্তি সকলের প্রাণে জাগিয়া উঠে ইহা সকলেই ইচ্ছা করেন। এবিষয়ে কাহারও মত বিরোধ নাই। আর ধর্ম্ম জগতে অগ্রসর হইতে হইলেই একজন মানুষ গুরুর পদতলে বসিতে হইবে এ প্রকার মতেও সকলে বিশ্বাস করেন না। ভগবানের সঙ্গে প্রত্যেক মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, তাঁহার কৃপায়, বিবেকের উপদেশে মানুষ ধর্ম্মজগতে অগ্রসর হইতে পারে এ প্রকার মতে বিশ্বাসী লোকও ব্রাহ্মসমাজে অনেক আছেন। তবে ধর্ম্ম-উপদেষ্টার উপদেশ মানুষের ধর্ম্মজীবন গঠনের বিশেষ সহায় হয় ইহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মপল্লী
ময়মনসিংহ
২৫শে শ্রাবণ ১২৯৭।

একান্ত অনুগত
দ্বারকানাথ সরকার

গুরুবাদ-প্রতিবাদ।

ব্রাহ্মধর্ম্মের নিগূঢ় শ্রেষ্ঠত্ব—“ব্রহ্মের সঙ্গে আত্মার সাক্ষাৎ এবং প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ।” জগতের অন্যান্য প্রচলিত ধর্ম্ম সমূহ মানবাত্মাকে কোন মধ্যবর্ত্তী পুরুষ, গুরু বা শাস্ত্রের কঠিন নিগড়ে বন্ধন করিয়া, সঙ্কীর্ণতার কঠোর কারাগারে বহুকাল হইতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। দয়াময় পরমেশ্বর সেই কারারুদ্ধ মানবাত্মাকে স্বাধীন এবং মুক্ত করিবার জন্য জগতে উদার ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় করিয়া দিয়াছেন। বহুদিনের কারাবাসী কারামুক্তির সমাচারে যেমন আনন্দিত হয়, ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসমাচার দাসত্ব প্রপীড়িত মানবাত্মার পক্ষে তেমনি আনন্দকর এবং আশাপ্রদ। “পাপী, পাপের জন্য অনুতাপ কর, পিতার কাছে সরলভাবে অবিশ্রান্ত প্রার্থনা কর, দয়াময় পিতা স্বয়ং তোমার পাপ মোচন করিবেন এবং তোমার নিকট প্রকাশিত হইয়া তোমাকে কৃতার্থ করিবেন”—ব্রাহ্মধর্ম্ম জগতে এই আশার সমাচার প্রচার করিয়াছেন। পাপ-মুক্তির জন্য কোন মধ্যবর্ত্তী পুরুষের প্রসন্নতা লাভের আবশ্যকতা নাই; গুরুনামধারী কোন ব্যক্তি বিশেষের গভীর ধর্ম্মপিপাসা, উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মচিন্তার বলে পতিত আত্মার উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা নাই; সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইলেই আত্মার কল্যাণ হয় না; কিন্তু সাক্ষাৎভাবে এবং কায়মনোবাক্যে ভগবানের সেবাই প্রত্যেক জীবের মুক্তির হেতু—ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উক্তি। ব্রাহ্মধর্ম্ম পুরাতন গুরু এবং শাস্ত্রবাদীদিগের হৃদয়কে কম্পিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—“রেখে দাও তোমার মধ্যবর্ত্তীতা, দূর কর তোমার গুরুগিরি, ফেলে দাও তোমার শাস্ত্র,—এ সবে আত্মার প্রকৃত কল্যাণ করিতে পারে না—“বরং ডুবাতে পারে”; ব্রহ্মে প্রীতি এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন দ্বারা পিতা পুত্রে মহাযোগ স্থাপিত হয়।” এ কথা কে অস্বীকার করিবেন?

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রথম হইতেই গুরুবাদের প্রতিবাদ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, নতুবা অকালে সাধু বিজয়কৃষ্ণকে যুথভ্রষ্ট দেখিয়া আমাদিগকে শোক করিতে হইত না! কিন্তু আমরা অতীব দুঃখের সহিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখ পাত্র তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার ১৬ই শ্রাবণের সংখ্যায় অকস্মাৎ সেই পুরাতন গুরুবাদকে সমর্থিত হইতে দেখিতেছি। বিষয়টী আমাদের প্রাণে এতই লাগিয়াছে এবং ইহা এতদূর অযৌক্তিক এবং অনিষ্টকারী বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, নিতান্ত মূঢ় এবং অনুপযুক্ত হইয়াও বিজ্ঞ, প্রবীণ, সাধু সম্পাদক মহাশয়ের কথাগুলির প্রতিবাদ করা একান্ত কর্ত্তব্য মনে করিতেছি।

১ম, সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন—“প্রকৃত গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধের মধ্যে ভ্রমের বিষয় কিছুই নাই। বরং এতদূর বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃত গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ ধর্ম্মজীবন গঠনের অতিশয় উপযোগী।” আমরা বিনীত ভাবে সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি “প্রকৃত গুরু” শব্দের অর্থ কি? “প্রকৃত গুরুর” লক্ষণ কি এবং কি উপায়ে “প্রকৃত গুরু” বাছিয়া লইতে হয়? ভ্রান্ত মানুষ কি কখনও “প্রকৃত গুরু” স্থানীয় হইতে পারেন? সাধকগণ উদার সমদৃষ্টি লাভ করেন। তাঁহারা সমগ্র জীব-জগৎ হইতে সাধু-শক্তি গ্রহণ করিয়া নিজের জীবনকে প্রস্তুত করেন। তাঁহারা সাধুতার আদর করেন, পুণ্যের আদর করেন এবং ধর্ম্মের আদর করেন। পাপী পুণ্যবান, উচ্চ নীচ, বালক বৃদ্ধ এবং পশু পক্ষী নির্ব্বিশেষে সর্ব্বস্থান হইতেই তাঁহারা ব্যাকুল অন্তরে সাধুভাব এবং সাধু শিক্ষা গ্রহণ করেন। সাধক তৃণ হইতেও উপদেশ লাভ করেন। তবে ব্যক্তি বিশেষকে “গুরু” এই গুরুতর আখ্যা কিরূপে প্রদান করা যায়? ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে এরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া কেবল অনিষ্টকর কেন, আমরা ইহাকে ভয়ানক সর্ব্বনাশজনক মনে করি। এরূপ অবস্থায় মানুষ কতদূর ভ্রান্ত হইয়া যায়, এতকাল পরে তাহার বিস্তারিত আলোচনা করা আমরা একেবারেই অনাবশ্যক মনে করি। এই ব্রাহ্মসমাজেরই শাখা বিশেষের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন, ইহার বিষময়ফল দেখিতে পাইবেন।

২য়, সম্পাদক মহাশয় স্থানান্তরে বলিয়াছেন,—“উক্ত অগ্রসর ব্যক্তির (গুরুর) মুখ হইতে যে কথা বিনির্গত হয়, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণ তাহা সমগ্র হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করেন; তাঁহার

এক একটী উপদেশ জীবন্ত শক্তিরূপে তাহাদের হৃদয়ে বাস করে; তাঁহারও উক্ত ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদের প্রতি গভীর প্রেম, তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি; সর্ব্বদাই তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যস্ত।" এ কথার উত্তর আর কি দিব? সম্পাদক মহাশয়কে মহাত্মা কেশবচন্দ্র এবং তাঁহার শিষ্যদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করিয়া আমরা নীরবে শোক প্রকাশ করিতে চাই, ঐ রূপ অবস্থায় সর্ব্বত্রই গুরুর কতকগুলি শক্তির বিকাশ হইতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু শিষ্যদিগের স্বাধীন চিন্তা, বিবেকের স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব এবং স্বাতন্ত্র্য একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায় এবং মানবাত্মা অশেষ প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বরং একথা স্পষ্টাক্ষরে বলা যাইতে পারে যে, যেস্থলে এরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সে স্থলে মানব ধর্ম্ম হইতে পতিত হয় এবং সর্ব্ব প্রকার দাসত্বের উচ্ছেদকারী মুক্তিপ্রদ ব্রাহ্মধর্ম্ম, আপন শ্রেষ্ঠত্ব হইতে বঞ্চিত হন।

৩য়, সম্পাদক মহাশয় "সাধুভক্তি" এবং "গুরু ভক্তি"কে একই স্থান প্রদান করিয়াছেন। সাধুভক্তি খুব চাই। সাধুতার প্রতি যে ভক্তি, তাহাতে আত্মা সাধুভাব লাভ করে। ভগবান করুন, আমরা সাধুতার নিকট চির অবনত থাকি। কিন্তু কে সাধু, কে অসাধু বিচার করে কাহার সাধ্য? একাধারেই সাধুতা দেখিয়া মোহিত হই, আবার অসাধুতা দেখিয়া ক্লেশ পাই। অপূর্ণ মানব চরিত্রের এ বিষম সমস্যা কখনও ঘুচিবার নয়। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ ভাবে শ্রদ্ধা কিম্বা বিশেষ ভাবে অশ্রদ্ধা কিরূপে করা যাইতে পারে? বস্তুতঃ সকলের মধ্য হইতেই সাধুতার আদর করিব—গুরুভক্তি জগতগুরু ভগবান্ ভিন্ন আর কাহাকেও দেওয়া যাইতে পারে না। "গুরুভক্তি" এই কথাটীর কোন অবিকৃত অর্থ তো হৃদয়ঙ্গম হয় না। গুরুভক্তি বলিলেই যেন পুরাতন ভাব মনে পড়ে—মানবাত্মার দাসত্ব-কারাগারের কথা ভাবিয়া ভীত হই। তাই বলিয়া সাধুসঙ্গের অশেষ উপকারিতার কথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না, আমরা সকলের নিকট সাধুভক্তি লাভ করিবার জন্য প্রয়াসী।

৪র্থ, সম্পাদক মহাশয় "উনবিংশ শতাব্দির" শেষভাগের "উৎকট স্বাধীনতা-প্রিয়তার" মধ্যে "গুরুশিষ্য সম্বন্ধ বর্দ্ধিত হইবার সময় নহে" বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে ক্ষোভ করিবার কিছুই নাই। বহুদিনের কারাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া আমরা একটু সজোরে ছুটিতে চাহিতেছি, বাধা বিঘ্ন মানিতে চাহিতেছি না, এটা অতিশয় স্বাভাবিক এবং শুভ চিহ্ন। একটু বেশী না ছুটিলে বহু শতাব্দীর জড়তা ঘুচিবে কেন? ইহার মধ্যে করুণাময় বিশ্বপিতার অপার কৃপার চিহ্ন নিহিত আছে। "স্বাধীনতা" কখনই "উৎকট" ব্যাপার নহে। এই স্বাধীনতা টুকু যদি না থাকিত, তাহা হইলে সুবিজ্ঞ প্রাচীন সম্পাদক মহাশয়ের প্রতিবাদ এ হেন ব্যক্তি দ্বারা কখনই সম্ভবপর হইত না। ভগবান্ প্রত্যেককেই স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বাধীনতা অশেষ মঙ্গলের হেতু। ঈশ্বর আমাদিগকে স্বেচ্ছাচারিতা হইতে রক্ষা করুন।

৫ম, আমরা এই প্রথার আর একটী গুরুতর অনিষ্টকারিতার কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব। শিষ্যগণ স্বভাবতঃ গুরুকে যে উচ্চস্থান প্রদান করেন, গুরু কোন অবস্থাতেই শিষ্যদিগকে তদ্রূপ উচ্চ স্থান দিতে পারেন না। জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাসে গুরুকে অতিক্রম করিলেও শিষ্য গুরুর পদপ্রান্তে অবস্থিত। এক ব্যক্তি চিরদিনই একজনকে উচ্চস্থান দিতেছেন, অপর ব্যক্তি চিরদিনই নীচস্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই জন্য গুরুবাদ জগতের ভীষণ অপকারজনক **ভেদভাবকে** প্রবল করিয়া থাকে এবং সার্ব্বভৌমিক উদারতাকে বিনষ্ট করে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মে গুরুভাব স্থান পাইতে পারে না।

সাধকগণ সমদৃষ্টি লাভ করেন। উচ্চ নীচ, ছোট বড়, গুরু শিষ্য প্রভৃতি ভেদভাব নীচ সংসারে দৃষ্ট হয়, সাধকের চক্ষে সকলে সমভূমিতে অবস্থিত। ঈশ্বর পিতা, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক নির্ব্বিশেষে আমরা সকলেই তাঁহার সন্তান—ইহা উদার প্রেমিক সাধকের স্বাভাবিক ভাব। এ ভাবের ব্যত্যয় যেখানে, পিতা পুত্রের দূরত্ব সেখানে। এক উদার সমদৃষ্টি, এক মহান্ প্রেমে যখন সমস্ত বিশ্ব এক হয়—তখনই পিতা পুত্রে মহাযোগ স্থাপিত হয়। ব্রহ্মকে লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম। এখানে কোন প্রকারের বৈষম্য বা ভেদভাব স্থান পাইতে পারে না; সুতরাং বর্ত্তমান **গুরুর ভাব** ব্রাহ্মসমাজের সীমায় বাহিরে দূর করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ভগবান আমাদিগের সহায় হউন!!

নিবেদক
নলহাট্টি ব্রাহ্মসমাজের একজন সভ্য।

ব্রাহ্মসমাজ।

রাজাপুর হইতে বাবু গোপীমোহন নাথ লিখিয়াছেন—

২৫এ আষাঢ় মঙ্গলবার, সিরাজগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রাজাপুর গ্রামের স্কুলে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ছাত্রদিগকে সুনীতি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন, ছাত্রগণ উপদেশ পাইয়া বিশেষ সন্তোষ লাভ করিয়াছে।

২৬এ আষাঢ় বুধবার, উক্ত বক্তা রাজাপুর স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও অন্যান্য অনেকের সমক্ষে চিত্তশুদ্ধি সম্বন্ধে দুই ঘণ্টা ব্যাপী একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়া লোকদিগকে সুখী করিয়াছেন।

২৯এ শনিবার, মুসলমান বন্ধুদিগের প্রযত্নে বেলগাছি গ্রামে শ্রীযুক্ত মুন্সী মফেতুল্লা সরকারের বাড়ীতে উক্ত বক্তা পবিত্রতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। কৃষকগণ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

ইনি মধ্যে মধ্যে এ অঞ্চলে আসিয়া স্কুলে, হরিসভায় এবং পল্লীতে পল্লীতে বক্তৃতা করিয়া দেশের অনেক উপকার করিতেছেন। ইঁহার ন্যায় প্রচারকগণ যদি পল্লীতে পল্লীতে প্রচার করিয়া বেড়ান, তবে দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

গত ১৭ই আষাঢ় সোমবার বিক্রমপুরের অন্তর্গত ভরাকর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দাস মহাশয়ের কন্যার নামকরণ, গৃহ প্রতিষ্ঠা এবং একটী পুত্রের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষে

উপাসনাদি হইয়াছিল। অতি প্রত্যুষে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নূতন গৃহাভিমুখে গমন করা হয়, তৎপর গৃহে গমনপূর্ব্বক উপাসনা হয়। কন্যার নাম শ্রীমতী প্রিয়তমা রাখা হইয়াছে।

সাহায্য প্রার্থনা।

বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

সাত বৎসর হইল দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ৫ বৎসর হইল উক্ত সমাজের সামাজিক উপাসনার জন্য একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে প্রতি রবিবার ২০।২৫ স্কুলের ছাত্র ও কয়েক জন দীন দুঃখী লোক উপাসনা করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠানাদি করিয়া সমাজচ্যুত ও সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্কুলের ছাত্রও দরিদ্র। উক্ত খড়ের কুটীরটির এখন জীর্ণাবস্থা ও অংশ বিশেষ ভগ্ন হইয়াছে। ভগবানের কৃপায় উপাসক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। বিশেষতঃ উৎসবের সময় সকলের সমাবেশ অসম্ভব হইয়া পড়ে। আবশ্যকমত উপাসনালয় প্রস্তুত করিতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। স্থানীয় লোকদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রতি যেরূপ আস্থার অভাব তাহাতে এখানে বিশেষ সাহায্য পাওয়া সুকঠিন। ২।১ জন সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার গ্রামে গ্রামে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিতে ইচ্ছুক হইলেও অর্থাভাবে প্রচার-ফণ্ড এবং ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক পুস্তকালয় না থাকায় তাহাও সুচারু রূপে সম্পন্ন হওয়া বড় কঠিন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে মানিকদহের জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী রায় চৌধুরী মহাশয় সমাজের Libraryর জন্য ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সমাজ মন্দির ও পুস্তকালয়ের জন্য অন্ততঃ এক হাজার ১০০০৲ টাকার প্রয়োজন। এই টাকা সাধারণের বিশেষ সাহায্য ব্যতীত সংগৃহীত হওয়া অসম্ভব। প্রার্থনা ও আশা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মানুরাগী সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া বাধিত করিবেন। যিনি যাহা এই মহৎ উদ্দেশ্যে দান করিবেন, তাহা বালেশ্বর সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিলডিং ফণ্ডের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার মিত্রের নামে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। তিনি স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন।

মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জানুয়ারি হইতে মার্চ্চ—১৮৯০।

সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ, গিরিধি	৩৲
" " বোয়ালিয়া	১০৲
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলিকাতা	২॥০
বাবু রজনীকান্ত নিয়োগী ঐ	১॥০
" কৃষ্ণদয়াল রায় ঐ	২॥৶০
" রাধানাথ দত্ত ঐ	১৲
শ্রীমতী যামিনী সেন ঐ	২॥৶০
বাবু কেশবচন্দ্র দাস, ভবানীপুর	১৸৵০
বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু, রসাপাগলা	১।০
" কমলাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা	১॥০
১৬নং রাজার লেনস্থ ছাত্রগণ ঐ	৸০
বাবু গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী, কলিকাতা	২॥০
শ্রীমতী যোগেন্দ্রমোহিনী চট্টোপাধ্যায়, কালনা	
বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কোচবিহার	
" কালিকাদাস দত্ত ঐ	
" ভগবতীচরণ মল্লিক, বগুড়া	
সম্পাদক বাগআঁচড়া ব্রাহ্মসমাজ	
লালা দেবী চাঁদ, লাহোর	
বাবু অবিনাশচন্দ্র মজুমদার, লাহোর	
বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী, শিলং	
" সতীশচন্দ্র সেন ঐ	
" গুরুদাস সেন, নালি	৩৲
" শরচ্চন্দ্র বসু, কুমিল্লা	৯৲
" রামগোপাল বিশ্বাস, মানিকদহ	
" কেদারনাথ সরকার, এলাহাবাদ	
" কালীনারায়ণ রায়, চাঁচল	
" আনন্দচন্দ্র সেন, মাহিগঞ্জ	
" তারকচন্দ্র ঘোষ, কাঁথি	
" নৃসিংহ মুরারি পাঁজা, বর্দ্ধমান	
" মুরারিমোহন মাইতি, কাঁথি	
" ভুবনমোহন দাস, ভবানীপুর	২॥০
" রোহিনীকুমার দত্ত, শ্যামনগর	৫৲
" ক্ষেত্রমোহন সিংহ রায়, বাহিরগড়া	২৲
" গগনচন্দ্র সেন, জামালপুর	৩৲
" আনন্দচন্দ্র সেন, বাগেরহাট	
" প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, কলিকাতা	
" কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ঐ	
" শশিভূষণ সেন ঐ	১৶০
" অদ্বৈতচরণ মল্লিক ঐ	
" ব্রজেন্দ্রকুমার গুহ, বাঁকুড়া	
" বসন্তকুমার রায়, শিলচর	
" রতিকান্ত মজুমদার, জগতি	
" জানকীনাথ দাস, কলিকাতা	
" আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ	
" কেদারনাথ চৌধুরী, শিমলা	৩৲
" কৃপানাথ মজুমদার, দ্বারভাঙ্গা	৪॥৵০
" শ্যামলাল শেঠ, কলিকাতা	১/৫
" লালবিহারী পাল, চন্দ্রপুর	১৲
" ক্ষেত্রমোহন ধর, কলিকাতা	১৲
" বেণীমাধব পাল, ঐ	২॥০
" হরিনারায়ণ দাঁ, ঐ	১।০
" বেণীমাধব রায়, বাঁন্দা	৩৲
" দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী, কাটিয়ার	২৲
" বিপিনবিহারী রায়, মানিকদহ	৩৲
" গোবিন্দ চন্দ্র বসু, কলিকাতা	১৲
" জহরলাল পাইন, ঐ	১৲
" ক্ষেত্রমোহন দত্ত, ঐ	
" কালীপ্রসন্ন দাস, ঐ	
শ্রীমতী সৌদামিনী সেন, ধুবড়ি	১২৲
বাবু ললিতমোহন সিংহ, শিবপুর	৯৲
" জে, এল, দাস, কলিকাতা	১।০
" প্রসন্নকুমার দাস, কালীগঞ্জ	৩৲
শ্রীমতী জ্ঞানদাপ্রভা দে, রছুলপুর	৩৲
বাবু হরনাথ ঘোষ, করটিয়া	১।০
" কালীকৃষ্ণ দত্ত, কলিকাতা	২৲
শ্রীমতী বিরাজমোহিনী মুখোপাধ্যায়, হাজারিবাগ	৩৲

ক্রমশঃ

২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৫ই ভাদ্র মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ৬ই ভাদ্র প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
১০ম সংখ্যা।

১৬ই ভাদ্র রবিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

তোমার প্রকাশে।

মঙ্গল বিধাতারূপে হৃদয়-আসনে
যবে তুমি, দেবতাগো হও সুপ্রকাশ,
কি যেন আনন্দ ধারা প্রবাহি' ভুবনে,
হৃদয়ে ঢালিয়া দেয় সহস্র উচ্ছ্বাস!
আসক্তি-বন্ধন সব হয় গো শিথিল,
উন্মুক্ত পরাণ যায় কোথায় চলিয়া—
আলিঙ্গিতে চায় যেন অনন্ত নিখিল,
পরিমিতে, পরিতৃপ্ত নাহি হয় হিয়া!
দেশ কাল ভেদাভেদ সব ঘুচে যায়,
বিশ্বের অনন্ত প্রাণে মিশে যায় প্রাণ,
বৈষম্য ভুলিয়া হৃদি জলদ গম্ভীরে
গায় গো বিজয় গীতি সাম্যের মহান্!
তখনি যায় যে চলি সংশয় আঁধার,
অজ্ঞতা ঘুচিয়া হয় জ্ঞানের বিকাশ;
অনন্ত এ জগতের প্রাণীপুঞ্জ মাঝে
দেখি প্রভু প্রাণ রূপে তোমার প্রকাশ।

প্রার্থনা।—হে দয়াময় দীনবন্ধু, আমরা তোমার দ্বারের ভিক্ষুক—আমাদের চাহিবার শক্তি আছে, কিন্তু দেওয়া না দেওয়ার শক্তি তোমাতেই অবস্থিতি করিতেছে। জোর করিয়া লাভ করিতে পারি আমাদের এমন কোন শক্তি বা সুবিধা নাই। দাতা যদি অনুগ্রহ করিয়া কিছু প্রদান করেন তাহা হইলেই যখন ভিক্ষুকের পাইবার সম্ভাবনা তখন আমরা তোমার অনুগ্রহের প্রার্থী হইয়াই যেন বাস করিতে পারি। তুমি না দিলে যখন পাইব না, তখন আমাদিগের প্রাণে এমন আকাঙ্ক্ষা ও সহিষ্ণুতা প্রদান কর যেন তোমার অনুগ্রহের অপেক্ষাতেই জীবন ধারণ করিতে পারি। অসহিষ্ণু বা দাতার প্রতি বিরক্ত ভিক্ষুকের যেমন কিছুই লাভ হয় না, আমাদের যেন সেরূপ দুর্ম্মতি না হয়। তোমার দ্বারে দুই একবার চাহিয়াই যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িতে না হয়। সহিষ্ণুতার সহিত তোমার দ্বারে আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে শিক্ষা দেও। চঞ্চলতা পরিহার করিয়া আশা ও নির্ভরের সহিত যাহাতে দ্বারে পড়িয়া থাকিতে পারি; আমাদিগকে এরূপ সুমতি প্রদান কর। হে আমাদিগের চিরসদয় প্রভো! তোমার করুণার প্রতি যখন লোকের সন্দেহ হয়, তখন হইতেই তাহার মৃত্যুর সূচনা হইতে থাকে। সুতরাং তোমার প্রতি সন্দেহের ভাব আমাদিগের প্রাণ হইতে একেবারে বিলুপ্ত হউক। হে করুণাময়, তুমি দিন দিন আমাদের প্রাণে আশার উদ্রেক করিয়া তোমাতে বিশ্বস্ত করিয়া লও।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

দিব্য চক্ষু—অর্জ্জুন বলিলেন,

এবমেতদ্যথাথ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম॥
গীতা—১১—৩।

অর্থাৎ হে পরমেশ্বর, তুমি আপনাকে যেরূপ বলিলে, আমি তোমার সেই বিশ্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করি।

কৃষ্ণ, রূপ দেখাইবার পূর্ব্বে বলিলেন,

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরং॥
গীতা—১১—৮।

অর্থাৎ তুমি আমাকে তোমার এই আপনার চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইবে না, আমি তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি, তুমি আমার ঐশী যোগশক্তি অবলোকন কর।

ঈশ্বর লুকাইয়া আছেন, সাধন ভজনের বলে প্রকাশিত হন, ইহা প্রকৃত নহে। তিনি যদি আপনি প্রকাশিত না হইতেন, তবে তাঁহাকে কে প্রকাশ করিতে পারিত? এই জন্যই ঈশ্বরের একটী নাম স্বপ্রকাশ। প্রকৃত কথা এই ঈশ্বর জগতে ও মানব হৃদয়ে নিত্য প্রকাশিত! মোহান্ধ বলিয়া আমরা চিনিতে পারি না। যখন বিশ্বাসের সহিত প্রাণ এই সত্য সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করে, তখন সে অস্থির হইয়া উঠে। যে দেবতার বিন্দুমাত্র প্রকাশের জন্য আমরা লালায়িত ও দিবা-

নিশি আর্ত্তনাদ করিতেছি, সেই দেবতা আপনা হইতে দিবা-নিশি আমার মধ্যে প্রকাশিত। আমি তবে এতদিন অন্ধ হইয়া কি করিতেছিলাম।

প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস আত্মাকে নূতন চক্ষু দান করে। চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বৃক্ষ, লতা, প্রাণী, জীব মানবাত্মা প্রভৃতি আমি যাহা দেখিতেছি, বিশ্বাসী সেই সকল বস্তুই দেখেন! কিন্তু আমার দর্শন ও বিশ্বাসীর দর্শনে আকাশ পাতাল প্রভেদ। আমি কেবল বস্তু দেখি, বিশ্বাসী সেই সকল বস্তুর মধ্যে পরম বস্তু দেখেন। আমার দর্শন নিরীশ্বর,৷ বিশ্বাসীর দর্শন ব্রহ্মদর্শন। তিনি বিশ্ব ব্রহ্মময় ব্রহ্মরঞ্জিত দেখেন। আমি যে সূর্য্যকিরণে কিছুই দেখিতে পাই নাই, বিশ্বাসী তাহাতে ব্রহ্মের অপূর্ব্ব বিমলালোক দেখিয়া কৃতার্থ হন। সাধনার ইতিহাসে এই সত্যের প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাত্মা মহম্মদ সম্বন্ধে কথিত আছে যে যখন তিনি অগ্নির উপাসনা হইতে মুক্ত হন, তখন সমস্ত বিশ্বে ব্রহ্ম দর্শন করিয়াছিলেন। ভক্ত চূড়ামণি শ্রীচৈতন্যে যখন প্রথম ভক্তির সঞ্চার হয়, তিনি তাঁহার ইষ্টদেবতাকে বিশ্বময় দর্শন করিয়া অস্থির হইয়াছিলেন। বিশ্বাসই আত্মার এই অলৌকিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। বিশ্বাস চক্ষু ভিন্ন আত্মা বিশ্বপতির বিশ্বরূপ দর্শন করিতে পারে না। যখন বিশ্বাস চক্ষু লাভ করিয়া আমরা নিত্য প্রকাশবান পরম দেবতাকে চিনি, তখনই বলি, ঈশ্বরকে ধরিয়াছি, ঈশ্বর লুকাইয়া ছিলেন প্রকাশিত হইলেন। লৌকিক চক্ষুতে লৌকিক দর্শনই সম্ভব, অলৌকিক দর্শনের জন্য দিব্যচক্ষু প্রয়োজন।

ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু—সাধনা রাজ্যের এই কথা। ধর্ম্ম জীবগণ সম্বন্ধে মধু স্বরূপ। ধর্ম্মের সহবাসে (১) তিক্ততার অবসান, এবং (২) মধুরতার উদয়। ধর্ম্মের সঙ্গে পরিচয় হইলেই ধর্ম্ম-বিপ্লবকারী সংসারের সঙ্গে প্রথম বড় বিরোধ উপস্থিত হয়। সংসারের কোলাহল ও প্রলোভন বড়ই তিক্ত লাগে। সংসারে সাধক থাকিতে চান না, পুনঃ পুনঃ ধর্ম্মের সহবাস করেন। ধর্ম্মের সহবাসে সংসারের তিক্ততা বিস্মৃত হন। এই অবস্থাতেই লোকে সংসার পরিত্যাগ করিতে চায়, বনগমন বা মনগমন করে, ইহাই বৈরাগ্যের বাল্যকাল। সাধনা করিতে করিতে ক্রমশঃ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। ধর্ম্মের সহবাসে ক্রমে সংসারও মধুর হইয়া যায়। তখন ধর্ম্মে ও সংসারে বিরোধ থাকে না, সংসারের ভিতর সাধক ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন, অথবা ধর্ম্মের ভিতর সংসারকে আকর্ষণ করিয়া বসান। সংসারের কোলাহল তখন সঙ্গীত এবং প্রলোভন গৌরবের সাধন-ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীক হয়।

ধর্ম্ম মধু না হইলে, লোভের বস্তু হয় না, লোভের বস্তু না হইলে ধর্ম্মে চিত্ত নিবদ্ধ হয় না, চিত্ত নিবদ্ধ না হইলে বন্ধন ছিন্ন হয় না, বন্ধন ছিন্ন না হইলে পুনঃ পুনঃ সংসারে পতন ও যোগবিচ্যুতি ঘটে; এবং ধর্ম্ম কথায় ও প্রথায় বদ্ধ থাকে। ধর্ম্ম যদি সকল মধুরতার অধিক মধুরতা না দিতে পারে, তবে পতনের দ্বার উন্মুক্ত থাকে। পতি-প্রেম সতীর নিকটে যেমন মধুর, পুত্রস্নেহ জননীর নিকটে যেমন মধুর, ধর্ম্মসাধকের নিকট তদধিক মধুর না হইলে আত্মা তৃপ্তি লাভ করে না। ধর্ম্মের মধুরতার যখন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকে, তখন সাধক প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের সহিত সমকণ্ঠে গাইয়া বলেন, **ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।**

দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ।—কোন সাধক বলিয়াছেন, "ঘটীর ভিতর জল, মা জলের ভিতর ঘটী" বাউল বলেন "দুইই"। "সুবিশাল মিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরং" শুনিয়া দয়ানন্দ সরস্বতী বলিয়াছিলেন, বিশ্বকে ব্রহ্মমন্দির কেন বল, ব্রহ্মকে কেন বিশ্ব-মন্দির বল না? এসকল অতি গভীর সারগর্ভ সাধনের কথা। সাধনার ইতিহাসে আমরা ঘটীর ভিতর জল ও জলের ভিতর ঘটী এই দুই অবস্থাই দেখিতে পাই। অগ্রে বিশ্বকে সাধক ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মনে করেন, পরে দেখিতে পান, যে কোটী ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত। অগ্রে আপনাকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র দেখেন, পরে বুঝিতে পারেন যে তিনি ও তাবৎ সাধক মণ্ডলী ব্রহ্মের অন্তর্ভূত।

ধর্ম্ম পিপাসু লোকে ধর্ম্মরাজের মন্দির আগে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করে, তারপরে যখন দেখে যে ব্রহ্ম স্বয়ংই মন্দির ও তাঁহাতে সকলি প্রতিষ্ঠিত, তখন আর বাহিরের মন্দির লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না। আবার দেখা যায় যে প্রথমে ভক্তগণ আপন আপন হৃদয়ে দেবতার মন্দির স্থাপন করিতে সচেষ্ট হন। কিছু দিন পরে যখন দেখিতে পান, তাঁহারা নিজেই দেবতাতে প্রতিষ্ঠিত, তখন আর নিজের হৃদয়ে দেবতাকে নিবদ্ধ রাখিয়া তৃপ্ত হন না!

দেবতার ভিতরে শেষে সকলই দেখিতে হইবে। দেবতাতে সকলের সংস্থিতি, সকলের সংযোগ যত দিন না দেখা যায়, তত দিন আত্মা নিরাপদ হয় না। যত দিন দ্বৈত ভাব তত দিন আত্মাভিমান, পাপ ও পতন! যখন প্রকৃত অদ্বৈত ভাবের উদয় হয় অর্থাৎ ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলন হয়, তখনই আত্মা অনন্ত কাল স্থায়ী ভিত্তি লাভ করে।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা—একটী ইংরেজ মহিলা দীন দুঃখী লোকদিগের সেবার জন্য আপন জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময় দীন দুঃখী লোকদিগের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া, যাহাতে তাহাদের দুঃখভার হ্রাস হয়, দুষ্কর্ম্মান্বিতেরা সুমতি লাভ করিয়া সুপথে আগমন করিতে সমর্থ হয়, এই সকল পবিত্র কার্য্যেই তাঁহার অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন। কিন্তু তিনি আপনার বন্ধুগণকে সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে ভাল বাসিতেন। বন্ধুগণকে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া আনন্দানুভব করিতেন। একদা তাঁহার কোন বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিতে লিখিতে তাঁহার মনে হইল, আমি এই যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়া সময় যাপন করিতেছি এবং সুখ অনুভব করিতেছি, ইহা ত আমার পক্ষে সুসঙ্গত নয়। সুখের বাসনায় কর্ত্তব্যকর্ম্মের ত্রুটী করা এবং যে সময় সেবাব্রতে দেওয়া উচিত, তাহা অন্য কার্য্যে ব্যয় করা ত আমার পক্ষে কখনই উচিত নয়। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি তাঁহার সেই বন্ধুকে জানাইলেন যে সম্ভবতঃ ভবিষ্যতে আর এরূপ দীর্ঘ পত্র

আমার নিকট হইতে আপনি পাইবেন না। কারণ আমি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া যে সুখ পাই তাহা আমার জন্য শ্রেয়স্কর নয়। কর্ত্তব্য-কার্য্যে যথোপযুক্ত সময় না দিয়া আত্ম-সুখের জন্য সে সময় ব্যয় করা আমার উচিত নয়। উপরে যে দৃষ্টান্তটীর উল্লেখ করা গেল, তাহার সঙ্গে যদি আমাদের অবস্থার তুলনা করি তাহা হইলে কি আমরা আর উচুমুখে হাস্য পরিহাস করিয়া দিন যাপন করিতে পারি? বিধাতা আমাদিগকে অনেক কার্য্য করিবার জন্য ডাকিয়াছেন, সে কার্য্য-পরিমাণের দিকে তাকাইলে আমরা যাহা করিতেছি তাহা গণনার মধ্যেই আসে না। তথাপি আমরা কেমন প্রফুল্লতার সহিত বৃথা আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইয়া দিতেছি। রুগ্ন ব্যক্তি যদি আপন রোগের জ্বালা বিস্মৃত হইয়া আমোদ প্রমোদে রত হয়, তাহা দ্বারা যেমন তাহার ঘোর বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং সে রোগ প্রতিকারের আশা যেমন অতি অল্পই থাকে, তেমনই আমরা যখন কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিয়াও স্বচ্ছন্দমনে আহার বিহার, আমোদ প্রমোদে দিন কাটাইতেছি, এবং বৃথা সময় নষ্ট করিয়াও অনুতপ্ত হইতেছি না, তখন ইহাদ্বারা কি সহজেই অনুভূত হয় না যে আমরা ঘোর বিকারগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছি? আত্মসুখপরায়ণতা আমাদিগকে একবারে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের স্থির হইয়া ভাবিবার অবসর নাই যে কি করিতেছি। কি ভাবে দিন কাটাইতেছি। দাসত্বব্রত গ্রহণ করিয়া অন্য কার্য্যে সময় দিবার স্বাধীনতা কাহারও নাই। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের দাস বলিয়া পরিচিত হইয়াও যদি আত্মসুখপরায়ণতার সেবা করি, যদি নিজের সুখ স্বার্থ-পরিমাণ-হ্রাস করিতে সমর্থ না হই, তাহা হইলে সে ব্রত গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া আর বৃথাভিমান করিবার প্রয়োজন কি? দাসত্ব ব্রত গ্রহণ করিয়া সে ব্রত পালনে মনোনিবেশ না করিলে, প্রভু কখনই অধিক দিন কার্য্যভার কাহারও উপর ন্যস্ত রাখিবেন না। অথচ তাঁহার কার্য্য স্রোতও অবরুদ্ধ থাকিবে না। অন্য লোক তাঁহার কার্য্যোদ্ধারের জন্য আহূত হইবে। তখন আমাদের মোহনিদ্রা যে না ঘুচিবে এমন নয় কিন্তু সময় থাকিতে ঘুচিলে যে ফল পাওয়া যাইত, জীবনকে ধন্য করিবার যে সুবিধা পাওয়া যাইত, সে সুবিধা আর ঘটিবে না। সুতরাং ঈশ্বরের সেবক বলিয়া যাহারা আপনাদিগকে মনে করেন, তাহাদের জীবনের গতি কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করিতে উদাসীন হওয়া কখনই প্রার্থনীয় নয়।

ঋণমুক্তি—হে ব্রাহ্ম! তুমি যে সত্য ধর্ম্ম পাইয়াছ বলিয়া—অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছ বলিয়া, আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেছ, সহস্র সহস্র নরনারীর মধ্যে তুমি যে এই উন্নত ও পবিত্র ধর্ম্ম লাভ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেছ, ইহাতে কি তোমার নিজের কোন যোগ্যতা দেখিতে পাও? হাজার হাজার শিক্ষিত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মধ্যে তুমি কি এমন একজন যে আর কেহ এই সত্য বুঝিতে সমর্থ হইল না, কেবল তুমিই এই অধিকারের উপযুক্ত হইলে? না এমন ভাব মনে স্থান দেওয়া তোমার উচিত নয়। অনুভব কর কেন সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে তোমার অন্তরে এই সত্য জ্যোতি স্থান পাইল। যদি সরল ভাবে স্থিরচিত্তে আত্ম-পরীক্ষায় নিযুক্ত হও, তবে দেখিতে পাইবে তোমার গুণগরীমা ইহাতে বেশী কিছু নাই। কিন্তু দাতা—যিনি সকলের দ্বারে দ্বারে অমৃতের পাত্র লইয়া ফিরিতেছেন, তাঁহারই প্রসাদে তোমার প্রাণে এই সত্য জ্যোতি প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ভিন্ন এ কার্য্যে সাহায্য-দাতারূপে আর কাহারও হস্ত দেখিতে পাইবে না। দেখিবে সেই পরম মাতাই নিয়ত তোমার প্রাণে সত্য জ্যোতি বিস্তার করিয়া তোমাকে এই উন্নত ও পবিত্র ধর্ম্মে রক্ষা করিতেছেন। পরম মাতা যে কেবল তোমার নিকটেই এই সত্য জ্যোতি ধরিতেছেন, এমনও নয় কিন্তু সকলের জন্য জ্যোতি আসিলেও যে অনুগত হইয়া এই জ্যোতিকে প্রাণে স্থান না দেয়—এই জ্যোতিকে সমাদর না করে, সে কখনই ইহার অধিকারী হয় না। তোমাতে যে পরিমাণে সেই আনুগত্য বর্ত্তমান আছে, সেই পরিমাণে তুমি এই জ্যোতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছ। কিন্তু এই আনুগত্যের ভাব যদি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত না হয়, তাহা হইলে এই উচ্চ অধিকার বেশী দিন তোমাতে থাকিবে না। এই আনুগত্য যদি দিন দিন প্রাবল্য লাভ না করে, তবে তোমার অন্তরে এই জ্যোতি নিরন্তর বর্দ্ধিত আকার ধারণ না করিয়া ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকিবে। সুতরাং তোমার পরীক্ষা করা উচিত এই আনুগত্য দিন দিন বাড়িতেছে কিনা। অবনত মস্তকে সর্ব্বদা পরম মাতার দান গ্রহণ করিবার জন্য তোমার ব্যাকুলতা আছে কিনা? যদি তাহা না থাকে তবে আর বেশী দিন এ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিবার আশা করিও না।

পরমেশ্বর যে তোমাকে এরূপ অমূল্য ধন দান করিলেন, তোমার ইহাও দেখা উচিত, তোমার তাহার পরিবর্ত্তে কিছু প্রদান করিবার আছে কি না? যদি থাকে তাহা কি? ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে আমাদের দাতা যিনি তাঁহার কোনই অভাব নাই। তিনি আমাদিগের নিকট হইতে কিছু প্রত্যাশাও করেন না কিন্তু তাঁহার নিজের অভাব না থাকিলেও তাঁহার সন্তানের ত অভাব যায় নাই—সে ত অভাব সাগরে মগ্ন রহিয়াছে। সুতরাং তাঁহার কি ইচ্ছা হয় না, যে তুমি তোমার প্রতিবেশীর নিকট যাইয়া তোমার লব্ধ ধনের ভাগ তাহাদিগকে প্রদান কর; তুমি একা তাঁহার সত্য গ্রহণ করিয়াছ, তিনি কি ইচ্ছা করেন না যে তোমার প্রতিবেশী শত শত নরনারীও এই ধন লাভ করুক এবং তুমি তোমার হৃদগত সত্য তাহাদিগকে প্রদান কর। তাহারা গ্রহণ করিতে না চাহিলেও তাহাদের দ্বারে যাইয়া এই শুভ সংবাদ প্রদান কর। লজ্জা ও সম্ভ্রম ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগকে এই সুসমাচার প্রদান কর। তাহারা ত লইতে ইচ্ছা করিবেই না, তুমিই কি প্রথমে এ সত্য গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে? না অনেককে তুমি ফিরাইয়াছ এবং পরম মাতাকেও বার বার ফিরাইয়াছ। সুতরাং নিজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, সহিষ্ণুতার সহিত কি তোমার এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না? ঋণমুক্ত হইবার যদি কোন সম্ভাবনা থাকে, তবে এই পথ ভিন্ন অন্য পথ নাই। নরনারীর সেবাব্রত গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুতেই যে ঋণ আমাদের হইয়াছে তাহা

হইতে মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।.. কাহারও উপকার করিব এমন ভাব মনে থাকিলে কিছুই করিতে সমর্থ হওয়া যাইবে না। কিন্তু আপন কল্যাণ ও পরিত্রাণের সাহায্য জন্যই এ কার্য্য গ্রহণ করা অত্যাবশুক। ঋণ-দায় হইতে উন্মুক্ত হইবার জন্যই এই কল্যাণকর ব্রত গ্রহণ করা আবশুক। সুতরাং যদি পর-সেবা আপন পরিত্রাণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজন হয়, যদি তাহা নিজের কল্যাণেরই নামান্তর হয়, তবে ত আর কাহারও মুখাপেক্ষা করিয়া একার্য্য গ্রহণ করিলে চলিবে না। কেহ নিযুক্ত করিলে তবে কাজে যাইব, এমন ভাব মনে থাকিলে ত চলিবে না। কিম্বা কাহারও অনুমোদন অনুরাগও ত তোমার কার্য্যের নিয়ামক হইতে পারে না। তোমারই পরিত্রাণ ইহার উপর নির্ভর করে। এরূপ কল্যাণকর কার্য্যে শিথিলতা আসিলে ইহাই প্রকাশ পায় যে আমরা নিজ নিজ পরিত্রাণই প্রার্থনা করিতেছি না। অথবা মূল উদ্দেশুই ভুলিয়া গিয়া বৃথা গোল-যোগে দিন কাটাইতেছি। ঈশ্বর আমাদিগকে অনেক দিয়াছেন, আমাদের তাহার পরিবর্ত্তে অলিক সুখ-বাসনা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। আলস্যের ক্রোড়ে সুখনিদ্রা সম্ভোগের বাসনাকে কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করিতে হইবে। তবেই আমরা দান পাইবার উপযুক্ততা লাভ করিব। অন্যথা চির কৃতঘ্নতার ভারই বহিতে হইবে এবং তাহাই ভূষণ স্বরূপ হইয়া আমাদিগকে কলঙ্কিত রাখিবে।

নিষ্ঠা ও অনুষ্ঠান।—ঈশ্বর-পরায়ণ নিষ্ঠাবান ব্যক্তির পক্ষে আহার বিহার প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই তাঁহার স্মরণও তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভার্থী হইয়া প্রার্থনার সহিত সম্পন্ন করা স্বাভাবিক। তাঁহার জীবনের সামান্য কার্য্যও ঈশ্বর-স্মরণবিহীন ভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়, সুতরাং তাঁহার পরিবারের কোন ঘটনা যে, ঈশ্বরোপাসনা শূন্য হইয়া সম্পন্ন হইবে, তাহা সম্ভবপর নহে। এজন্য তাঁহার গৃহের অনুষ্ঠানের সংখ্যা কত হইবে তাহা কেহই সীমাবদ্ধ করিয়া দিতে সমর্থ নহে। কিন্তু যাঁহার জীবন সেরূপ নয়, ঈশ্বর-ভক্তি যাঁহার প্রাণে প্রবল নয়। ঈশ্বরানুরাগ যাঁহাকে প্রবলরূপে অধিকার করিয়া রহে না, সে ব্যক্তির পক্ষে অনুষ্ঠানের সংখ্যা বর্দ্ধিত করা উচিত কি না? অনুরাগবিহীন ভাবে কোন অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ তদ্দ্বারা লোকে অকারণ আত্ম-প্রতারিত হয়, নিজের অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া বাহ্য আড়ম্বরে অন্তর্দৃষ্টি হীন হইয়া বৃথা গর্ব্বিত হয় এবং বাহ্যানুষ্ঠান করিয়া দশজনের মধ্যে একজন গণনীয় রূপে গৃহীত হয়। এক দিকে এরূপ অনিষ্টের আশঙ্কা থাকিলেও কিন্তু অনুরাগবিহীনগৃহেও অনুষ্ঠান উপলক্ষে ব্রহ্মোপাসনার প্রয়োজন আছে। কারণ ঈশ্বরের নাম এমন বস্তু যাহা অনলের ন্যায় অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আন্তরিক জঞ্জাল রাশি বিনাশ করিয়া দেয়। অগ্নি সংযোগে যেমন সকল প্রকার দূষিত পদার্থ অপসৃত হইয়া যায়, পার্থিব বস্তুর বিশুদ্ধতার জন্য যেমন অনলের কার্য্যকারিতা অত্যন্ত প্রবল, তেমনি আত্মার ব্যাধি দূর করিবার জন্যও ঈশ্বরের নামরূপ অনল প্রয়োগের বিশেষ প্রয়োজন। যে ব্যক্তি অনুরাগের সহিত নিত্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করে না, তাহাকেই সেই নাম বিশেষ রূপে শ্রবণ করান উচিত। যে কোন উপায়ে হউক তাহার কর্ণে নাম-সুধা ঢালিয়া দেওয়া উচিত। রোগীর জন্য ঔষধ প্রয়োগ যেমন নিত্য প্রয়োজন। ভক্তিহীনের নিকট ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন তাহাপেক্ষা কোন অংশে অল্প প্রয়োজন নয়। ঈশ্বরের নামের এই অরুচি নাশক গুণ যদি না থাকিত, তাহা হইলে অতি অল্প লোকের পক্ষে তাঁহার নাম গ্রহণ করা সম্ভবপর হইত। এজন্য আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে যত অধিক পরিমাণে ঈশ্বরোপাসনা হইতে থাকে, ততই কল্যাণের কারণ মনে করি। ঈশ্বরের পূজা অর্চনা—তাঁহার নিকট প্রার্থনা ব্যর্থ হইবার নয়। তাঁহার প্রভাব মানব জীবনের উপর কার্য্যক্ষম হইবেই হইবে। তবে এ সকল স্থলে বাহ্য-আড়ম্বর যত কম হয়, ততই ভাল। বাহ্য-আড়ম্বর যাহাতে অন্তরকে লঘুতার দিকে লইয়া না যায়, তন্নিমিত্ত বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে।

বাক্যের দায়িত্ব।—ভাব ভাল হউক আর মন্দই হউক তাহাকে সর্ব্বদাই সংযতাবস্থায় রাখা আবশুক। ক্রোধ পরবশ হইয়া অপভাষা ব্যবহার করিলে যেমন মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রকাশ পায়, হর্ষ বিষাদে অভিভূত হইয়া ঈশ্বরের নিকট অতিশয়োক্তি করিলেও তদ্রূপ দুর্ব্বলতা ও অসারতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। অনেকেই ব্রহ্মদর্শন লাভের জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাণে যখন ব্রহ্ম লাভের জন্য তাদৃশ স্পৃহা না থাকে, তখন এইরূপ প্রার্থনায় উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। আমরা সকলেই দুর্ব্বল আমাদের অনেক অপরাধ আছে একথা সত্য। তাই বলিয়াই যে আমরা ব্রহ্মদর্শন লাভের অধিকারী নই, একথা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ব্রহ্মের দর্শন লাভের জন্য যখন সঙ্গীত বা প্রার্থনা করিব, তখন জীবনের দিকে একটু দৃষ্টি পড়িলেই অনেক সময়ে রসনা সংযত হইবে। আমরা রাজপথ পার্শ্বে অনেক ভিখারী দেখিতে পাই। কত ভিখারী "দাও মা বাপ" ইত্যাদি করুণোদ্দীপক কথায় কর্ণ বধির করিয়া ফেলে অথচ তাহাদের প্রতি দয়ার উদ্রেক হয় না। আবার যথার্থ দীন হীনার ন্যায় একটী শিশু সন্তান কোলে করিয়া এক ভিখারিণী বসিয়া রহিয়াছে,—মুখে কথাটী নাই,—প্রাণের গভীর বিষাদ মুখে প্রতিভাত হইতেছে, তাহার হস্তে একটী পয়সা না দিয়া আর সে স্থান হইতে পা সরে না। এমন দৃষ্টান্ত সচরাচরই দেখা গিয়া থাকে। বিশ্বের মা বাপ যিনি তিনি কাঙ্গাল দেখিয়াই দান করিয়া থাকেন,—যাহার প্রাণ যাহা চায় তিনি তাহাই বিধান করিতেছেন। যিনি আর কিছুতে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারিয়া পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত হইতে প্রিয়তর সেই ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য যথার্থই ব্যাকুল হন, তিনিই তাঁহার কৃপায় তাঁহাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ

আইনসম্মত বিবাহ।

ব্রাহ্মগণ যে রাজবিধি অনুসারে এখন বিবাহিত হইতেছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইবার কারণ আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। আইনটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলেও কেন ব্রাহ্মগণ এই আইনের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন, সে বিষয়ের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন নহে। আদি ব্রাহ্মসমাজ যে প্রণালীতে আপনাদের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছেন, তদনুসারে ব্রাহ্ম সমাজের অপরাপর শাখা সকলের চলিবার সম্ভাবনা নাই। প্রথমতঃ যদি তত্ত্ববোধিনীর কথা মানিয়া লওয়া যায় যে এই বিধি অনুসারে যে সকল বিবাহ হইবে, তাহা রাজদ্বারেও বৈধবিবাহ বলিয়া গৃহীত হইবে। তথাপি ব্রাহ্মগণের পক্ষে সে বিধি সকল স্থলে গ্রহণীয় হইতে পারে না। কারণ সে প্রণালী অনুসারে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইলে সর্ব্বদাই উপবীতধারী পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক। অন্যথা সে বিবাহ রাজদ্বারে বৈধ বলিয়া গৃহীত হইবে না। অন্য কোন বর্ণের কেহ পুরোহিতের কার্য্য সম্পন্ন করিলে তাহা যে কোনক্রমে হিন্দু বিবাহ বলিয়া গণ্য হইবে তাহার সম্ভাবনা নাই। এরূপ উপবীতধারী পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণ করাকে ব্রাহ্মগণ আপনাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন। অপর আদি সমাজের প্রণালীতে সবর্ণে সবর্ণে বিবাহ হওয়াই রীতি। অসবর্ণ বিবাহ কখনই উক্ত প্রণালীসম্মত নয়। কিন্তু ব্রাহ্মগণ যখন বর্ণগত প্রভেদ উন্মূলন করা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া জানেন। জাতিভেদ প্রথার সপক্ষতা করা যখন ব্রাহ্মধর্ম্মের বিষম বিরোধী, এমন কি এই জাতিভেদের সপক্ষতা করা যখন তাঁহারা একটী গুরুতর অপরাধ বলিয়া মনে করেন, তখন জীবনের একটী প্রধান ঘটনায় তাহার সমর্থন কিরূপে করিবেন। যে বিধি নিয়ত এরূপ ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে বাধ্য করে, তাহার অনুগত হইয়া চলিতে কিরূপে সমর্থ হইবেন?

দেশকালের উপযুক্ত বিধি যদি ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুকূল হয়, তবেই তাহা গ্রহণীয় এবং তাহা হইলেই সে বিধি মানবের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়। কিন্তু যাহার সহিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের মিল নাই বরং ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত বিরোধিতা আছে, এমন বিধি একমাত্র দেশীয় বিধির অনুকূল বলিয়া কখনই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সর্ব্বাগ্রে নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাসকে রক্ষা করিতে হইবে। সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করা উচিত। ধর্ম্মবিশ্বাসকে যথাযথরূপে রক্ষা করাই প্রধান কর্ত্তব্য সুতরাং এমন কোন বিধিই গ্রহণ করা সঙ্গত নয়, যাহাতে জীবনের মূল লক্ষ্যের প্রতি আঘাত লাগে। ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুরোধে অনেক দেশীয় প্রথা ও জাতীয়তার বন্ধনকে অতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জাতীয়তার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় বিশ্বাসানুসারে চলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রতিকূল না হইলে, সে সকল জাতীয়ভাবকে অবহেলা করিবার যে কোন প্রয়োজন ছিল এমন নয়। ধর্ম্ম বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই তাঁহারা উপবীত পরিত্যাগ প্রভৃতি অতি গুরুতর পরিবর্ত্তনের অনুসরণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যদি এরূপ সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে বিবাহের জন্য কোন নূতন বিধির সাহায্য লইবারই বা কি প্রয়োজন ছিল? আদি ব্রাহ্মসমাজ যেমন ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুরোধে বিবাহপদ্ধতি হইতে পৌত্তলিকতার অংশ পরিবর্জ্জন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, অন্যান্য ব্রাহ্মগণও তেমনি ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুরোধে জাতিভেদ পরিত্যাগ করিয়া সকল বর্ণের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ সংঘটন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আদি সমাজের অবলম্বিত বিধি অনুসারে বিবাহ দিতে গেলে কখনই জাতিভেদকে অতিক্রম করা যায় না। অসবর্ণ বিবাহ কখনই আদিসমাজ বৈধ বলিয়া গ্রহণ করেন না। সুতরাং সে বিধি ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখাস্থ ব্রাহ্মগণ গ্রহণ করিতে সমর্থ নহেন।

আদি সমাজের অবলম্বিত বিধি অনুসারে বিবাহ দিতে হইলে কন্যাকর্ত্তাকে বাধ্য হইয়া কন্যা সম্প্রদান করিতে হয়। কিন্তু এরূপ কোন বিধির অধীন হইয়া নিয়ত কন্যা সম্প্রদান করিতে ব্রাহ্মগণ প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা কন্যা সম্প্রদানকে অসঙ্গত মনে করেন না, তাঁহাদের পক্ষে উক্তরূপে বিধি গ্রহণ করা সম্ভবপর হইলেও যাহারা কন্যা সম্প্রদানকে অসঙ্গত মনে করেন, তাহাদের পক্ষে সেরূপ বিধি গ্রহণ করা কখনই উচিত নহে। বিধি এরূপ উদার হওয়া উচিত যাহাতে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিবার পক্ষে কাহারও বিশেষ আপত্তি থাকিবার সম্ভাবনা নাই। আদি সমাজের অবলম্বিত বিধির কোন অংশ পরিত্যাগ করিলে যে তাহার বৈধতা থাকিবে তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। সুতরাং সে বিধি কখনই সকলের জন্য উপযুক্ত হইতে পারে না। উক্ত বিধিতে সপ্তপদি গমন প্রভৃতি আরও এমন কোন কোন অনুষ্ঠান আছে, যাহা সকলে কখনই সুসঙ্গত মনে করেন না। এমন কি অনুচিত ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরোধী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এজন্যও তাহা সকলের পক্ষে গ্রহণ-যোগ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমান সময়ে যে রাজবিধি অনুসারে ব্রাহ্মগণ বিবাহিত হইতেছেন, তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও এমন কিছু তাহাতে নাই, যাহার অনুসরণে ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর আঘাত পড়ে বা যাহার আশ্রয় লইতে হইলে বিবেকের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। এজন্য বিধিটি সুন্দর না হইলেও তাহা গ্রহণ করিতে বিশেষ কোন আপত্তির হেতু দেখা যায় না। যেসকল ব্রাহ্ম উক্ত বিধি অনুসারে বিবাহিত হইতেছেন, তাঁহারা যে একমাত্র আইনানুযায়ী কার্য্য করিয়াই বিবাহ সুসম্পন্ন হইল বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহাও নয়। বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান উপাসনাদি না হইলে ব্রাহ্মসমাজের কোন শাখাই তাহাকে প্রকৃত বিবাহ নামে অভিহিত করেন না। সুতরাং আইনে ঈশ্বরের নাম না থাকিলেও ব্রাহ্মগণ সে অভাব আপনাদের অবলম্বিত প্রণালী দ্বারা সংশোধিত করিয়া লইয়াছেন।

এখন কথা এই যে, যদি ব্রাহ্মগণ আপনাদের মনোমত প্রণালীর অনুসরণ করাই সঙ্গত মনে করেন, তবে আর রাজ-

বিধির শরণাগত হইবার প্রয়োজন কি? সমাজ যখন বিবাহকে অনুমোদন করিতেছেন, তখন রাজবিধির সাহায্য লইবার ত কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই বিবাহের ফলাফল যদি একমাত্র বিবাহিত ব্যক্তিদ্বয়েই আবদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে সমাজের অনুমোদনেই কার্য্য চলিতে পারিত, কিন্তু যখন বিবাহের বৈধতা এবং অবৈধতার ফল সন্তানগণকে বিশেষ ভাবে ভোগ করিতে হইবে, তখন কোন বিবাহার্থীরই এরূপ আচরণ করা উচিত নয় যদ্দ্বারা তাঁহাদের ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা নিরাপদে পূর্ব্ব পুরুষের সম্পত্তি সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে বাধ্য হয়। যাঁহারা আপন সন্তানগণের কল্যাণ বিস্মৃত হইয়া, তাহাদিগের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পরাঙ্মুখ হওয়াকে অনুচিত মনে করেন না, তাঁহাদিগকে সুবিবেচক বলিয়া অভিহিত করিবার কোন হেতুই নাই। তাঁহারা সমাজের বিষম অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়া যান, এজন্য রাজদ্বারে যাহা গ্রাহ্য না হয়, এমন কার্য্য করা বিবেচকের পক্ষে কর্ত্তব্য নয়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মগণ এক মাত্র আপনাদিগের সমাজানুমোদিত প্রণালীর অনুসারে যদি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করেন, তাহা রাজদ্বারে বৈধ বলিয়া গৃহীত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। যখন সেরূপ অবস্থা হইবে তখন অবশ্যই আইনের সাহায্য লইবার কোন প্রয়োজন থাকিবে না। আদি সমাজ যে প্রণালীতে বিবাহ প্রদান করিতেছেন সে সম্বন্ধে রাজদ্বারে এ পর্য্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই। সুতরাং তাহা যে সম্পূর্ণ রূপে নিরাপদ এরূপ বলিবার উপায় নাই। এজন্য বর্ত্তমান আইন অসম্পূর্ণ হইলেও যখন তাহা ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরোধী নয় এবং তাহার সাহায্য গ্রহণে অন্য প্রকারে নিরাপদ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে, তখন অনিশ্চিত বিধির পশ্চাতে যাওয়া অপেক্ষা নিশ্চিত পথে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

সাধু জন্ হেন্‌রি নিউম্যান।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে যে সকল মহাত্মা আপনাদের গভীর চিন্তাশীলতা, সুতীক্ষ্ণ প্রতিভা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও জীবন্ত সাধু জীবন দ্বারা সুসভ্য ইংলণ্ডের সৌভাগ্যের স্রোত ফিরাইয়াছেন —ইংলণ্ডের প্রকৃত নেতার কাজ করিয়াছেন,' এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাত্মার নাম রহিয়াছে, ইনি তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। যখন ইংলণ্ডের ধর্ম্মভাব অত্যন্ত ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, —যখন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং চর্চ্চ অব ইংলণ্ড (Church of England) অসাড় মৃত ভাব ধারণ করিয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মের কঙ্কাল বুকে ধারণ করিয়াছিলেন, তখন বিধাতার নির্দ্দেশে কতিপয় অসাধারণ শক্তিশালী লোক অভ্যুত্থিত হইলেন। ডাক্তার এড্‌ওয়ার্ড পুশি, কেবেল্ (Keble) হ্যামডেন্ (Hampden) উইলবার ফোরস্ (Wilberforce) এবং সাধু নিউম্যানের নামই তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

এই সকল সাধু পুরুষদিগের জন্মের প্রায় ৩০ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম্মের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে, ভগবানের কৃপায় যাঁহাদের প্রাণে একটু ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত হইত,—যাঁহাদের হৃদয় ধর্ম্মের জন্য একটু ব্যাকুল হইত, তাঁহারা দেশের কোনও সম্প্রদায়েই যোগ দিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেন না,—ধর্ম্ম জীবন লাভ করিবার সাহায্য পাইতেন না। তাই চর্চ্চের (High Church) লোকেরা রোমান ক্যাথলিক ও ডিসেণ্টার সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তিগণকে ঘৃণা করিতেন বটে, কিন্তু নিজেরা ঘোর বিলাস পরায়ণ সংসারাসক্ত ও অসার ভদ্রতাভিমানী হইয়া চিরাগত রীতি ও পদ্ধতির সেবা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। এই সম্প্রদায়ের এতদূর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছিল যে, বিশপেরা ধর্ম্মোৎসাহকে ঘোরতর বিপদজনক ভ্রান্তি বলিয়া প্রচার করিতেন এবং সকলকে এই মহাভ্রমের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সাবধান করিতেন। লো চর্চ্চের (Low Church) দশাও তদ্রূপই ছিল। এই সম্প্রদায়েও ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানের অপ্রতুল ছিল না। মহাত্মা ওয়েশ্‌লী (Wesly) এই সম্প্রদায়ে যে বৈরাগ্য ভাব সরলতা ও উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, সে সকল ভাব লোপ পাইয়াছিল। এই সময়ে অক্সফোর্ডে (Oxford) আর একটী নূতন সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। এই দলের লোকেরা আপনাদের সম্প্রদায়ের নাম (Noetic School) 'নোইটিক স্কুল' রাখিয়াছিলেন। হোয়েট্‌লি (Whately) হ্যাম্পডেন্ (Hampden) প্রভৃতি সুবিজ্ঞ পুরুষেরা এই সম্প্রদায়ের নেতা স্বরূপ ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই শুষ্কজ্ঞানী ছিলেন,—সরল ভক্তি ও বিশ্বাস অপেক্ষা তর্কশাস্ত্রানুমোদিত জটিল বিচারের উপরেই ইহাঁদের সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পূর্ণ নির্ভর করিত।

ইংলণ্ডে যখন ধর্ম্মের এইরূপ অবস্থা তখন স্কট (Scott) ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) কোলেরিজ (Coleridge) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের ভাব-প্রস্রবণে ভাব-বারি পান করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় হইতে কতিপয় যুবাপুরুষ সমবেত হইয়া দেশে এক মহাশক্তি অভ্যুদিত করিলেন। ন্যায় সঙ্গতরূপে মহাত্মা নিউম্যানকে এই দলের সঞ্জীবনীশক্তি (Inspiring spirit) বলিতে হয়। এই সকল বীরপুরুষের অভ্যুত্থানই অক্সফোর্ড মুভমেণ্ট (Oxford movement) নামে সুবিখ্যাত। ইহারা অভ্যুত্থিত হইয়া একদিকে স্বদেশের ধর্ম্মভাব যাহাতে জাগ্রত হয়—ধর্ম্মের গূঢ়ভাব সকল—নিয়ম ও পদ্ধতি সকল যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইলেন; অপর দিকে জর্ম্মণি দেশ হইতে হেতুবাদের (Rationalism) যে প্রবল বাত্যা সমাগত হইয়াছিল তাহার গতি ফিরাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার পুশী ও সাধু নিউম্যান উভয়েই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ভগবানের ইচ্ছায় ইহাদের উভয়ের মধ্যে অতি অল্পদিনের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ জন্মে। এই নব অভ্যুত্থিত দলের প্রকৃত নেতা স্থানীয় পুশী, নিউম্যান ও কেবেল্ এই তিন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের লোক ছিলেন, অথচ ইহাদের মধ্যে উদ্দেশ্যের আশ্চর্য্য একতা ও অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ ছিল। কেবেল্ কবিত্ব সাগরে নিমগ্ন থাকিতেন—যুক্তি তর্কের কোন ধার ধারিতেন না; নিজের পাঁড়াগেঁয়ে বাটীতে থাকিয়া অতি শান্ত ভাবে জীবন কাটাইতেন, অথচ অক্সফোর্ডের বন্ধুগণের সহিত

প্রাণের যোগ ছিল—সমস্ত কার্য্যে হৃদয়ের সহানুভূতি ছিল এবং বন্ধুগণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেও ত্রুটি করিতেন না। এরূপও কথিত আছে যে তিনি খৃষ্টীয় সালের কবিতা "The poetry of the Christian year" নামক এক কবিতায় যে গভীর ভাব ও উচ্চ আদর্শ চিত্রিত করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিয়াই তাঁহার বন্ধুগণের হৃদয়ে নব আশা ও নব আকাঙ্ক্ষার উদয় হয় এবং সেই হইতেই ইংলণ্ডের সৌভাগ্যের ঊষা সমুদিত হয়। ডাক্তার পুশীর কবিত্ব ছিল না,—ভাষার ছটা ও লালিত্ব ছিল না। কিন্তু তাঁহার ভাবের গভীরতা, প্রতিভার প্রখরতা ও পাণ্ডিত্যের অসাধারণত্ব ছিল। তিনি যখন ক্রাইষ্ট চর্চ্চের সেণ্ট মেরীর গির্জ্জায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেন কিম্বা উপাসক মণ্ডলীকে উপদেশ দিতেন, তখন যাঁহারা সৌভাগ্য ক্রমে তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া ও যুক্তির সরলতা ও গভীরতা দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়াছেন। ডাক্তার পুশী জর্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন করিয়া, জর্ম্মাণ ভাষা ও জর্ম্মাণ চিন্তা প্রণালী অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, জর্ম্মাণ দেশে যে হেতুবাদ (Rationalism) ধর্ম্মজগৎ অধিকার করিয়া রহিয়াছে স্বরায় সেই হেতুবাদের প্রবল বাত্যা ইংলণ্ডের আধ্যাত্মিক আকাশে প্রকাশিত হইয়া ভয়ানক বিশৃঙ্খলা ঘটাইবে। সুতরাং যাহাতে চিরাগত ধর্ম্ম মতের সহিত জীবন্ত ধর্ম্মভাবের সামঞ্জস্য করিয়া, খৃষ্ট ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে পারেন, তজ্জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিউম্যানের একাধারে বহু গুণের সমাবেশ ছিল। তাঁহার গভীর চিন্তাশীলতা, স্বাভাবিক কবিত্ব, আড়ম্বর হীন পাণ্ডিত্য ও জীবন্ত ধর্ম্মভাব দেখিয়া সহজেই মানুষের প্রাণ তাঁহাতে আকৃষ্ট হইত। খৃষ্টধর্ম্মের কল্যাণ সাধন মানসে ও উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভের আশায় তিনি বিষয়কোলাহল হইতে অবসর লইয়া অতি শান্ত ভাবে নির্জ্জনে ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। রবিবার সায়ং কালে সেণ্ট মেরীর গীর্জায় বসিয়া যখন তিনি উপাসনা করিতেন ও উপদেশ দিতেন, তখন তাঁহার শ্রোতৃবর্গ অনুভব করিতেন, যেন স্বর্গীয় সাধু মহাজনগণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জনৈক স্বর্গীয় সাধু কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রত্যেক বাক্য জীবন্ত শক্তির ন্যায় শ্রোতৃবর্গের প্রাণ স্পর্শ করিত। কত নর নারী তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে অশ্রু জলে অভিষিক্ত হইতেন, কত লোক তাঁহার মুখ পানে তাকাইয়া অবাক হইয়া থাকিতেন।

যাঁহাদের প্রাণে একটুকু ধর্ম্মভাব ছিল, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, তাঁহারা নিউম্যানের নিকট গমন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার কথা শোনা, তাঁহাকে একটী বার চক্ষে দেখা অক্সফোর্ডবাসীগণের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। ১৮৩৩ সালের জুলাই মাসে কেবেল (Keble) "জাতীয় ধর্ম্মচ্যুতি" (National Apostacy) বিষয়ে সেণ্টমেরীর গির্জ্জায় উপদেশ দেন এবং এই ভেরী নিনাদ শুনিয়াই ইংলণ্ডের ধর্ম্ম যাজক ও পুরোহিতগণের নিদ্রাভঙ্গ হয়। চতুর্দ্দিক হইতে প্রতিবাদের তরঙ্গ উত্থিত হইতে লাগিল, লোকের মনে সংস্কারকদিগের সম্বন্ধে মহা আশঙ্কার ভাব উদিত হইল। লর্ড গ্রে প্রভৃতি রাজপুরুষেরা বিশপদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, উপাসনা প্রণালী ও পদ্ধতিসকল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে। রাজনীতির বায়ু যেদিকে বহিতেছে, ধর্ম্মের বায়ু যদি তাহার অনুকূল না হয় তবে বিষম অনিষ্টের কথা,এবং আধুনিক উদার ভাবের সহিত প্রাচীন খৃষ্ট ধর্ম্মের যাহা কিছু না মিলে তাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক হইয়াছে!

এদিকে মহাত্মা নিউম্যান প্রভৃতি ধর্ম্মরক্ষকগণ ("Tracts for the Times") "বর্ত্তমান সময়োপযোগী পুস্তক সমূহ" দ্বারা আপনাদিগের মত ও বিশ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিউম্যান ১সংখ্যা ট্রাক্ট প্রণয়ন করিয়া বাহির করিলেন। এইরূপে উক্ত সমিতি হইতে অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হইল। অবশেষে নিউম্যান ৯০ ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাহা লইয়া বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয় এবং ঐ পুস্তিকা ধ্বংস করিবার জন্য তাঁহার প্রতি আজ্ঞা বিধান হয়। নিউম্যানের আপন পক্ষ সমর্থনের জন্য আর কি বলিবার আছে, ইহা না শুনিয়াই তাঁহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা বিধান করা হয়; কিন্তু এই দণ্ডাজ্ঞা বিধানের ছয় দিনের দিনেই তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া এক পুস্তিকা বাহির করেন। এই বিপদের সময়ে তাঁহার বন্ধু পুশী ও কেবেল প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই গোলযোগের পর দুই বৎসর পর্য্যন্তও সেণ্টমেরীর গির্জ্জায় নিউম্যানের মধুর স্বর শুনা গিয়াছে। কিন্তু ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে তিনি প্রচারকের পদ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জনবাসে গমন করেন। দুই বৎসরকাল নির্জ্জনবাসের পর নিউম্যান রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে যোগ দিলেন। তিনি চর্চ্চ অব ইংলণ্ড অর্থাৎ ষ্টেট চর্চ্চকে রোমান ক্যাথলিক ও ডিসেণ্টার এই উভয় দলের মিলন স্থান (Via Media) বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু অবশেষে দুই বৎসরকাল গভীর চিন্তা করিয়া রোমান ক্যাথলিক হওয়াই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি রোমান ক্যাথলিক হওয়ায় কেবল যে পুশী, কেবেল প্রভৃতি তাঁহার প্রিয়তম ধর্ম্মবন্ধুগণের প্রাণে বিষম আঘাত লাগিল তাহা নয়, সমস্ত ষ্টেট চর্চ্চের একটী স্তম্ভ খসিয়া পড়িল বলিয়া উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত নর নারীগণের মহা শোকের উদয় হইল। ১৮৪৫ সালে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে যোগ দিয়া তিনি বার্ম্মিঙ্গহামের ধর্ম্মালয়ের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলেন। মিষ্টার এ,ডবলিউ হউন্ ১৮৮৬ সালে উক্ত ধর্ম্মালয়ের সম্বন্ধে বর্ণনা করিতে যাইয়া ইহার অধ্যক্ষের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। "সাধু নিউম্যানকে দেখিলেই মনে হয় যেন ভগবানের দ্বারা আর এক নূতন মুশা প্রেরিত হইয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত জনৈক শ্রদ্ধেয় বন্ধুর মুখেও উক্ত মহাত্মা সম্বন্ধে ঠিক এই ভাবের আর একটা কথা শুনা গিয়াছে। তিনি বলিয়াছিলেন, ইংলণ্ডের সমস্ত দর্শনযোগ্য পদার্থের মধ্যে সাধু কার্ডিন্যাল নিউম্যান এক বিশেষ পদার্থ। তাঁহাকে দেখিলেই পুরাকালের হিন্দু ঋষিগণের কথা মনে পড়ে। এই মহাত্মা আর এ জগতে নাই! তিনি ইহ-

লোক পরিত্যাগ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মজীবন—সাধুতা মহত্ব ও জ্ঞান চিরকাল মনুষ্যসমাজে পূজিত হইবে। তিনি প্রকৃত সাধু ছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে প্রত্যেক দেশের ধর্ম্মসমাজেরই শোকের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় সাধু মহাজনগণ যে দেশে জন্ম গ্রহণ করেন সে দেশ পবিত্র হয়,সে দেশের নর নারীগণ ধন্য হয়। ইঁহাদের জীবন দ্বারা সকল দেশের ধর্ম্মসমাজেরই প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। ইঁহারা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন কেবল সেই দেশেরই যে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন এমন নয়। প্রত্যুত ইঁহাদের দ্বারা গূঢ়রূপে সমস্ত ধর্ম্ম সমাজেরই পুষ্টিসাধন হয়।

পরলোকগত নবীনচন্দ্র রায়।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে জানাইতেছি যে অল্প দিন হইল আমরা ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়াছি। পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ও হিতৈষী নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট সুপরিচিত। কয়েক দিন হইল ইনি পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহারই উদ্যোগে ও প্রযত্নে লাহোর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রতিষ্ঠা অবধি তিনিই উক্ত সমাজের প্রধান সহায় ও বন্ধুরূপে তাহার সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই অর্থ সাহায্যে উক্ত সমাজের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা বিষয়েও তিনি বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছিলেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার ৪ | ৫ বৎসর পূর্ব্বাবধি যে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মদল, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন, নবীন বাবু তাহার মধ্যে একজন প্রধান ছিলেন। তৎপরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিবস অবধি বিধিমতে ইহার সাহায্য করিতে তিনি ক্রটি করেন নাই।

নবীনচন্দ্র রায় অনেক বিষয়ে ব্রাহ্মগণের—ব্রাহ্মগণের কেন এদেশের লোকের দৃষ্টান্ত স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে;—অনুমান ১৮৩৭ কি ১৮৩৮ সালে, পঞ্জাব প্রদেশে তাঁহার জন্ম হয়। সে কালে যে সকল বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে সে দেশে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা তাঁহাদের মধ্যে একজন। অতি শৈশবে তিনি পিতৃহীন হন। সে সময়ে একমাত্র বিধবা মাতা ভিন্ন সংসারে তাঁহার সহায় সম্বল কিছুই ছিল না। অপর বাঙ্গালিরা দয়া করিয়া বিধবা ও তাঁহার পুত্রকে কিছু কিছু সাহায্য করিতেন, তাহাতে অতি কষ্টে তাঁহাদের চলিত। বালক নবীনচন্দ্র বেশ সুর করিয়া রামায়ণ পড়িতে পারিতেন, সেই জন্য লোকে ডাকিয়া রামায়ণ পড়াইত ও দুই একটী পয়সা দিত, তাহাতে তাঁহার পঠদ্দশার ব্যয় অতি কষ্টে চলিত। কিন্তু এরূপে পাঠ কত দিন চলিতে পারে? ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই তাঁহাকে পাঠ সাঙ্গ করিয়া সামান্য ১৫ | ১৬ টাকা বেতনের চাকুরী লইতে হইল। তিনি চাকুরীতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু দুইটী গুণে দিন দিন আত্মার উন্নতি করিতে লাগিলেন। প্রথম গুণ, তাঁহার প্রকৃতি অতি সরল ও পবিত্র ছিল। পাপের পথ তিনি চিনিতেন না; কুসঙ্গ হইতে দূরে থাকিতেন; অসাধুতা দেখিয়াও দেখিতেন না, তাহাতে তাঁহার চিত্তকে কলুষিত করিতে পারিত না। প্রত্যুত, কিছু ভাল দেখিলে বা শুনিলে যত্নপূর্ব্বক সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। দ্বিতীয় গুণ, অসাধারণ জ্ঞানস্পৃহা। তিনি যেখানে যাইতেন, যে অবস্থায় থাকিতেন সর্ব্বদাই, আত্মোন্নতি সাধনে মনোযোগী থাকিতেন। এই দুই গুণে তিনি দিন দিন নিজের উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন। ১৫ | ১৬ টাকার বেতন হইতে দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়া ৮০০।৯০০ টাকা বেতনের পদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। ওদিকে পাঠ ও শাস্ত্রালোচনাদ্বারা সংস্কৃত, ইংরাজী, উর্দ্দু, হিন্দী, বাঙ্গালাতে কৃতবিদ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। একদিকে যেমন নানা ভাষায় পারদর্শী হইয়াছিলেন, অপর দিকে তেমনই নানা বিদ্যা অধিকার করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বালকগণের শিক্ষার সাহায্যার্থ তিনি হিন্দী ভাষাতে, নানা গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভূগোল, ব্যাকরণ, ষ্টাটিক্স্, ডাইনামিকস্, হাইড্রোষ্টাটিকস্, সিবিল ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়ে তিনি প্রতি বৎসর কোন না কোন গ্রন্থ প্রচার করিতেন। যেখানে যাইতেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করা তাঁহার জীবনের একটী ব্রত ছিল। ইঁহার সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য দেখিয়া ইঁহাকে লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের রেজিষ্টার ও প্রতিনিধি প্রিন্সিপাল করা হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ইনি মধ্য-ভারতবর্ষে রতলাম রাজ্যে দেওয়ান ও প্রধান বিচারপতির কর্ম্ম পাইয়াছিলেন। সে কাজ পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি খাণ্ডোয়া নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। কলিকাতাতে একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, ইচ্ছা ছিল যে জীবনের শেষ কালটা কলিকাতায় বাস করিয়া ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিবেন। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। বাড়ীটী শেষ করিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া গুরুতর রক্তামাশয়রোগে আক্রান্ত হইলেন। পূর্ব্বাবধিই শরীর বহুমূত্র রোগে অন্তঃসার শূন্য হইয়াছিল, তদুপরি এই কঠিন রোগ একবারে দুরারোগ্য হইয়া উঠিল। ঐ রোগে কয়েক দিন কষ্ট পাইয়া বিগত ২৮এ আগষ্ট বৃহস্পতিবার প্রাতে ১১টার সময় মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

রোগের প্রারম্ভ হইতেই, এক প্রকার অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে এ যাত্রা নিষ্কৃতি নাই। সেই জন্য সত্বর হইয়া পরিবারদিগকে খাণ্ডোয়া হইতে আনাইয়াছিলেন। স্ত্রী পুত্র খাণ্ডোয়া হইতে আসিল, প্রথমা কন্যা হেমন্ত কুমারী শিলঙ্গ পাহাড় হইতে সমাগত হইলেন, একজন জামাতা লাহোর হইতে আসিলেন। এদিকে রোগ দিন দিন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল। তিনি গোপনে আপনার উইলখানি কাপি করাইয়া ও দুইজন বন্ধুর সমক্ষে স্বাক্ষর করিয়া,তাঁহার প্রিয় বন্ধু শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন,এবং যতই সময় ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, ততই এ সংসারের কথা শুনিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস শিবনাথ বাবু তাহার মস্তকের নিকট

বসিয়া আছেন, তাঁহার হস্তে হস্ত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই দেহের প্রতি আত্মার এত মমতা কেন? ছাড়িতে ক্লেশ বোধ করে কেন? শাস্ত্রী মহাশয় উত্তর করিলেন—"বহুদিনের দেহ ও আত্মাতে একত্র বাস, এ মিত্রতা ত স্বাভাবিক। তখন বলিলেন —"প্রার্থনা করুন যাহাতে আমি উদ্ধার হই। অপরাহ্নে পরিবার পরিজনকে সাংসারিক কথা কহিতে নিষেধ করিলেন এবং ক্রমাগত একটী মহিলাকে—"ওই যে দেখা যায় আনন্দধাম ভব জলধির পারে অপূর্ব্ব শোভন জ্যোতির্ম্ময়" এই গানটী গাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সেই দিন সায়ংকালে একটী বন্ধু দুই একটী গান শুনাইলে অতিশয় তৃপ্তিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। এবং বক্ষস্থলে অঞ্জলি বাঁধিয়া কিয়ৎক্ষণ প্রার্থনার ভাবে গলিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমি জানিতাম না তোমার রূপ এত সুন্দর।" ঐ দিন বার বার "স্বর্গ রাজ্য" "ভক্তদল" এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিতে শুনা গিয়াছিল। মৃত্যুর দিন প্রাতঃকালে তাঁহার রোরুদ্যমানা পত্নীকে সম্বোধন করিয়া হিন্দীতে বলিলেন প্রেমে সকলের সহিত সম্মিলিত হইয়া চিরদিন এখানে (কলিকাতে) থাকিও। তৎপরে তাঁহার চৈতন্য ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। বন্ধু বান্ধবগণ নিরন্তর তাঁহার প্রিয় সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে ভাটার জল যেমন তিল তিল করিয়া কমিতে থাকে, তেমনি সেই সাধুর জীবন তিল তিল করিয়া অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঠিক বেলা ১১টার সময় প্রাণবায়ু তাঁহার দেহকে ত্যাগ করিয়া গেল।

ব্রহ্মবিদ্যালয়।

(প্রাপ্ত)

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার তত্ত্বাবধানে ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় আছে। বর্ষে বর্ষে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীগণের পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এবং নিয়মিত রূপে শিক্ষারও সুব্যবস্থা আছে। এরূপ বিদ্যালয় দ্বারা বালক এবং যুবকগণের বিশেষ লাভের সম্ভাবনা আছে। এজন্য উক্ত বিদ্যালয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মগণের বিশেষ মনোযোগ থাকা প্রয়োজন। কারণ তাঁহাদের বালক বালিকাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষার স্থান আর [illegible] একটা দেখা যায় না। অনেক উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং কার্য্য-পরিচালনার ভার রহিয়াছে, তাঁহাদের চেষ্টায় ইহার কার্য্য সুচারুরূপেই চলিবার সম্ভাবনা। সুতরাং সে বিষয়ে কিছু ভাবিবার না থাকিলেও উক্ত স্কুলের কমিটি যে সকল পুস্তক পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আবশ্যক বোধে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

একটী বিদ্যালয় স্থাপন পূর্ব্বক যখন শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তখন তাহার পাঠ্য পুস্তকগুলি এরূপ ভাবাপন্ন হওয়া উচিত যেন তাহাতে পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য থাকে। অন্যথা শিক্ষার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না। দুই বৎসর পূর্ব্বে যাহা শিক্ষা হইয়াছে, দুই বৎসর পরে যদি তাহার বিপরীত বিষয় শিক্ষা করিতে হয়, তাহা দ্বারা শিক্ষার্থীগণের বাস্তবিক সুশিক্ষা লাভের সম্ভাবনা নাই। শিক্ষক কোন পুস্তক পড়াইবার সময় নিম্নশ্রেণীতে যাহা পড়াইয়া আসিলেন, উপরের শ্রেণীতে যাইয়া যদি তাহার ভিন্ন রূপ শিক্ষা দিতে বাধ্য হন, তবে তাহার বাক্যে কাহারও শ্রদ্ধা হইবার সম্ভাবনা নাই। এরূপ শিক্ষায় সত্যাসত্য নিরূপণ করিবার পক্ষে শিক্ষার্থী বাস্তবিক কোন সাহায্য পায় না। এমন সময় প্রত্যেকের জন্য অবশ্যই আসে যখন পরস্পর বিরুদ্ধ মতের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া আপন মতকে সুদৃঢ় করিবার অবস্থা লাভ করা যায়। তখন নানা মতের গ্রন্থ পাঠ কখনও অবিধেয় নহে। কিন্তু যখন কোন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতে হয় অর্থাৎ যখন শিক্ষার্থীর এমন বিচার শক্তি লাভ হয় নাই, যাহার সাহায্যে পরস্পর বিরোধী গ্রন্থ হইতে আপনার বিশ্বাসানুযায়ী শিক্ষা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তখন তাহাকে একবিধ এবং অবিসম্বাদী বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া উচিত। পরে উপযুক্তরূপ বিচার ক্ষমতা লাভ হইলে সে যে কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়া আপন বিশ্বাসকে দৃঢ় করিতে পারে।

উপরে যে কথাগুলি লিখা হইল এরূপ লিখিবার যে কোন কারণ নাই এমন নয়। বর্ত্তমান বর্ষের জন্য উক্ত বিদ্যালয়ের যে সকল গ্রন্থ পাঠ্যরূপে নির্ণীত হইয়াছে, তাহার কোন কোন গ্রন্থে পরস্পর বিরোধী মত ও ভাব আছে। নিম্নশ্রেণীতে ধর্ম্মশিক্ষা নামক পুস্তক পাঠ্য আছে, আর উপরের শ্রেণীতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা দেখিতেছি এই দুই পুস্তকে পরস্পর বিরোধী ভাবের প্রসঙ্গ আছে। ধর্ম্মশিক্ষায়—ঈশ্বরাস্তিত্ব —জ্ঞানকে মানবের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সহজ জ্ঞানকেই প্রধানতঃ ভিত্তি করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়—সহজ জ্ঞানকে অনেক স্থানে অজ্ঞানতার নামান্তর মাত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সহজজ্ঞান সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে বিশেষ অনাস্থাই প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ১ম ভাগে সৃষ্টিকৌশল দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে—ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় তাহাতে দোষারোপ করা হইয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষায় মনুষ্যের আত্মাকে সীমাবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় ইহার বিরোধী মত ব্যক্ত হইয়াছে এবং আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষাদি পুস্তকে দ্বৈতবাদের মতই সমর্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় তাহার পরিবর্ত্তে প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদের মতকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে এবং দ্বৈতাদ্বৈত নামক নূতন মতের সৃষ্টি করা হইয়াছে। এই সকল মতের কোন্‌টী সত্য কোন্‌টী অসত্য সে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু কোন বিদ্যালয়ে একই বিষয়ে এরূপ বিভিন্ন মতবিষয়ক গ্রন্থ পাঠ্য রূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত কি না তাহাই বিবেচনার বিষয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি নানা রূপ মতের গ্রন্থ অবশ্যই পড়িতে হইবে। কিন্তু তাহার সময় আছে। যখন বিচার শক্তি দৃঢ় হইবে তখন যে কোন পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু যত দিন সেরূপ অবস্থা হয় নাই অর্থাৎ শিক্ষার্থীদিগকে যে অবস্থায় বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক আছে, সেই অবস্থায় এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের গ্রন্থ এক বিদ্যালয়ে পড়ান উচিত নয়। শিক্ষার্থীরা এরূপ বিভিন্ন মতের গ্রন্থ হইতে কি শিক্ষা করিবে? কোন্ মতটী

তাহারা প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিবে? শিক্ষকই বা পূর্ব্বে যাহা পড়াইয়াছেন, তাহার বিপরীত কথা কিরূপে শিক্ষা দিবেন।

আরও একটী কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে, ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ২য় ভাগে যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় তাহার কোন কোনটীর প্রতিবাদ করিয়া তাহার ভ্রম প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আবার ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ২য় ভাগের প্রণেতা তাঁহার নিজ মত সমর্থন করিতেছেন, এস্থলে অবশ্যই বলিতে হইবে, উক্ত পুস্তকে যে সকল মত ব্যক্ত হইয়াছে তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত নয়। এইরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা প্রভৃতি গ্রন্থ সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে যে তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত নয়। সুতরাং কোন বিদ্যালয়ে এরূপ গ্রন্থ পাঠ্য রূপে গৃহীত হওয়া কি উচিত? যে সকল তত্ত্ব এখনও তর্কের বিষয়ীভূত রহিয়াছে, তাহা বিচারাক্ষমদিগের পাঠের জন্য নিরূপণ করা কখনই সুসঙ্গত নয়। তাহাদের শিক্ষার জন্য এমন সকল বিষয়ই নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য, যাহাতে কোন মতদ্বৈধ নাই। এরূপ অবিসম্বাদী বিষয় সকলই শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহার সাহায্যে শিক্ষার্থীগণের প্রাণে ধর্ম্ম-ক্ষুধার উদ্রেক হইবে।—ঈশ্বর বিশ্বাস ও তাঁহাতে গাঢ় অনুরাগশীল হইয়া ভবিষ্যতে জীবনপথে চলিতে সাহায্য পাইবে।

সদুক্তিসংগ্রহ।

রাজা যুধিষ্ঠিরের একটী প্রশ্নোত্তরে মহামনা ভীষ্ম—"হংস ও সাধ্যগণের সংবাদ" নামক যে সদুক্তি করেন, তাহা হইতে কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হংস বলিলেন, হে অমৃত পায়ি দেবগণ! আমি ইহাই শুনিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, যথার্থ ভাষণ চিত্তবিজয় করা বিধেয়, হৃদয়গ্রন্থি রাগ প্রভৃতিকে বিমোচন পূর্ব্বক হর্ষ ও বিষাদকে বশীভূত করা উচিত। কাহারও মর্ম্মচ্ছেদি ও নিষ্ঠুরভাষী হওয়া উচিত নহে। * * * * লোকের যে কথা দ্বারা অপরে উদ্বিগ্ন হয়, সেই অকল্যাণকর বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। বাক্য স্বরূপ সায়ক সকল বদন হইতে বহির্গত হয়, লোক যদ্দ্বারা আহত হইয়া অহোরাত্র শোকার্ত্ত হইয়া থাকে, সেই বাক্যশর সমুদয় অন্যের মর্ম্মস্থল ভিন্ন অন্য স্থানে পতিত হয় না, অতএব পণ্ডিত ব্যক্তির তাদৃশ বাক্যবাণ সমুদয় অন্যের প্রতি প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। অন্যে যদি সেই ধীর ব্যক্তিকে অতিবাদ বাণ দ্বারা অতিশয় বিদ্ধ করে, তবে তাঁহার শান্তিরস অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। যিনি অন্য কর্ত্তৃক ক্রুধ্যমান্ হইয়াও তাহার প্রতি রোষ প্রকাশ না করিয়া বরং হৃষ্ট হন, তিনি অপরের সুকৃত গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিনি অধিক্ষেপকারী অভিনিবেশবশতঃ অপ্রিয় প্রজ্বলিত ক্রোধের নিগ্রহ করেন, সেই অদুষ্টচেতা, অসূয়াশূন্য, মানব অন্যের সুকৃতি আদান করিয়া থাকেন। কেহ আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ করিলে আমি তাহাকে কিছুই বলি না এবং আমাকে কেহ তাড়না করিলে আমি নিয়ত তাহাকে ক্ষমা করিয়া থাকি, এইরূপ আচরণই শ্রেষ্ঠ; যে হেতু আর্য্যগণ সত্য, সরলতা, আনৃশংস্য এবং ক্ষমাকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। বেদাধিগমের ফল সত্য, সত্যের ফলদম অর্থাৎ বাহেন্দ্রিয় নিগ্রহ, দমের ফল মোক্ষ, ইহা সকল শাস্ত্রে অনুশিষ্ট হইয়াছে। যিনি বাক্য, মন, ক্রোধ, * * * এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবল বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হন, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্মিষ্ঠ মুনি বলিয়া বোধ করি। ক্রোধী পুরুষ অপেক্ষা ক্রোধহীন পুরুষ, ক্ষমাগুণ বিরহিত ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষমাবান ব্যক্তি, কুকর্ম্মশীল মানুষ অপেক্ষা সদাচার মানুষ এবং জ্ঞান হীন লোক অপেক্ষা জ্ঞানবান লোকেরাই প্রশংসিত হইয়া থাকেন। কেহ যদি অন্য কর্ত্তৃক আক্রুশ্যমান হইয়াও তাহার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করেন, তাহা হইলে সেই তিতিক্ষু ব্যক্তি * * * আক্রোশকারীর সুকৃত লাভ করিয়া থাকেন। কেহ যদি অন্য কর্ত্তৃক অতিশয় নিন্দিত হইয়াও ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে প্রিয় বা অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ না করেন, অথবা আহত হইয়া হনন কারীকে প্রতিহনন না করেন এবং সেই হনন কর্ত্তার পাপ হউক এরূপ ইচ্ছাও না করেন, তাহা হইলে তিনি ইহলোকেই নিয়ত দেবগণের স্পৃহনীয় হইয়া থাকেন। কোন ব্যক্তি আপনার সমকক্ষ অথবা আপন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা, অপকৃষ্ট লোকের নিকট অবমানিত হইলে তাঁহার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলে তাঁহার সিদ্ধ লাভ হইয়া থাকে।"

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়েন।)

শ্রদ্ধাস্পদ তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমিপেষু—

মহাশয়!

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এক অতি গুরুতর সময় উপস্থিত। ব্রহ্মকে লইয়া ব্রাহ্মসমাজ। তাঁহারই কৃপায় পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, অবরোধ প্রথা প্রভৃতি উপধর্ম্ম এবং কুসংস্কার সমূহ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় শুকাইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ তাহাদিগের মূল ছেদন করিতেছেন; ভগবানের কৃপায় দেশে শিক্ষার এমন প্রবল প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইয়াছে যে, সেই ছিন্ন-মূল তরু অচিরে ভূতলশায়ী এবং অদৃশ্য হইবে। তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের গুরুতর এবং কঠিনতর কর্ত্তব্যের ইহা প্রথম সোপান মাত্র। ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কার্য্য "গঠন।" সর্ব্বাগ্রে "জীবন গঠন"। ব্রাহ্মের সমস্ত কার্য্য পণ্ড, যদি ব্রহ্মের সঙ্গে নিত্যযোগ স্থাপিত না হয়। দেশহিতকর কার্য্য দম্ভ, অহঙ্কার আনয়ন করে, সংস্কার কার্য্য অপ্রেম ও শুষ্কতা আনয়ন করে, যদি যাঁহার কার্য্য তাঁহার সঙ্গে যোগ স্থাপিত না হয়। ব্রহ্ম-যোগ সাধন, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মধু। ব্রাহ্মের প্রাণ সেই মধু পানে মত্ত হইলে, মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সমস্ত জগৎ ব্রাহ্মধর্ম্মের সুসমাচার গ্রহণে ব্যস্ত হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা অনেক বিষয়ে বাহিরে পড়িয়া রহিয়াছি। বাহিরে বাহিরে থাকিতেই যেন আমরা কতকটা ভালবাসি। আজ আমরা আমাদের "বাহির প্রিয়তা" সম্বন্ধে একটী গুরুতর বিষয়ের আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। নিরাকার সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের স্বরূপ প্রকাশ করিতে যাইয়া, আমরা তাঁহার হস্ত পদাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উল্লেখ করিয়া থাকি। আমা-

দের সঙ্গীত, আমাদের উপাসনা, প্রার্থনা, আমাদের ধর্ম্ম গ্রন্থাদি এই প্রকার রূপক-কল্পনা দোষে দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। পৌত্তলিকেরা আমাদের এই ভ্রম অনেক বার দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরা তর্ক যুক্তির সাহায্যে তাঁহাদের আপত্তি খণ্ডন করিতে পারিয়াছি বটে। কিন্তু আমাদের প্রাণকে কোন মতেই বুঝাইয়া উঠিতে পারি নাই। সংসারে এমন বিষয় কি আছে, যাহার সমর্থন করিবার জন্য যুক্তির অভাব লক্ষিত হয়! জাতিভেদ, জীবহিংসা, মদ্যপান প্রভৃতির সমর্থন করিবার যখন যুক্তি আজও শুনিতে পাওয়া যায়, তখন পৌত্তলিক ভাষা মাত্র ব্যবহারের যুক্তির কেনই বা অভাব হইবে? যাহা হউক আমরা ইহার অযৌক্তিকতা এবং অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিতেছি। ইহাদ্বারা (১) সত্যের অপলাপ হয়, (২) কল্পনার প্রশ্রয় দেওয়া হয়, (৩) ভাবের অপবিত্রতা আসে, (৪) পৌত্তলিকতা দোষ ঘটে এবং (৫) সাধন পথে ব্যাঘাত ঘটায়।

"সত্যের অপলাপ" অতিশয় গুরুতর পাপ। সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সকল অবস্থাতেই সত্যকে অবলম্বন করা যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম্ম। প্রত্যক্ষ হউক কিম্বা অপ্রত্যক্ষ হউক মিথ্যা সর্ব্বত্রই দূষনীয় ও পরিত্যাজ্য। সত্যস্বরূপ অনন্ত, নিরাকার ঈশ্বরের হস্ত পদাদি উল্লেখ করিলে অসত্য কথা বলা হয়; সুতরাং কোন ভাব বিশেষের চরিতার্থতার জন্য সত্যস্বরূপে অসত্য আরোপ করা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, চরণাদি ব্যবহারে ভক্তিভাবের বৃদ্ধি হয়। এ যুক্তি আমরা বুঝিতে অক্ষম। এই অসত্য শব্দগুলি ছাড়িয়া ভক্তি বৃদ্ধি পায় না? মূক কি ভক্ত হইতে পারে না? এই পৌত্তলিকতা প্লাবিত দেশেই পৌত্তলিক ভাষায় এত বাড়াবাড়ি। এ দেশ ছাড়া অন্যত্র কি ভক্ত জন্মে নাই? এই ব্রাহ্মসমাজেই এমন সাধু ভক্তের নাম করিতে পারা যায়, যিনি পৌত্তলিক ভাষা ব্যবহারকে পাপ মনে করেন। পৌত্তলিকতার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমরা এমনই অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি যে, পুতুল ছাড়িয়াছি কিন্তু পৌত্তলিক ভাষা ছাড়িতে পারিতেছি না। আর একটী কথা শুনিতে পাই,—"ভাষা অসম্পূর্ণ সুতরাং ও কথাগুলি ত্যাগ করিয়া উপাসনাদি চলে না।" এ কথা আমরা আদৌ যুক্তিসঙ্গত মনে করি না। সত্যের উপাসক হইয়া কিরূপে বলিব—অসত্য না কহিলে চলে না? একথার উত্তরে কেহ কেহ বলেন "ঈশ্বর যখন বাক্যের অতীত, তাঁহার প্রতি যে ভাষা ব্যবহার কর, তাহাতে তাঁহাকে খর্ব্ব করা হয়।" ইহা সত্য কথা; কিন্তু যথাসাধ্য ভাষার সত্যতা রক্ষা করিয়া চলা অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রত্যক্ষ ভাবে যাহার সঙ্গে অসত্য এবং পৌত্তলিকতার যোগ আছে, তাহা ছাড়া সহজ। এরূপ ২।৩টী সমাজ এবং উপাসকমণ্ডলীর বিষয় আমরা অবগত আছি, যেখানে পৌত্তলিক ভাষা প্রয়োগ হয় না। তবে কি জন্য এত কাল এই অসত্য ব্রাহ্মসমাজে রাজত্ব করিতেছে, আমরা বুঝিতে পারি না।

দ্বিতীয় দোষ—"কল্পনা"। যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই, তাহার বিষয় বর্ণনা করিতে যাইয়া কবিগণ কল্পনার সাহায্য লইয়া থাকেন। মিল্টন স্বর্গ ও নরকের কল্পনা করিয়াছেন। বাস্তবিক স্বর্গ কি নরক নামে কোন স্থান নাই। ব্রাহ্মধর্ম্মে কল্পনা স্থান পাইতে পারে না, অন্যান্য উপধর্ম্ম হইতে ইহার পার্থক্য এই। সত্য, প্রত্যক্ষ, নিরাকার ঈশ্বর আছেন, তিনি আমাদিগকে ভাল বাসেন, ইহার সঙ্গে কল্পনা যেরূপেই যোগ করা যায়, তাহাতেই অপরাধ হয়। কল্পনার সাহায্যে সাময়িক কোন উপকার হইলেও হইতে পারে, কিন্তু পরিণামে কত অপকার হইবার ভয় আছে, ভাই ভগ্নী একবার ভাবিয়া দেখিবেন।

তৃতীয় দোষ—"ভাবের অপবিত্রতা"। পবিত্র স্বরূপে জড় দেহের ভাব আরোপ করিলে পবিত্রতার খর্ব্ব করা হয়। ইহা গুরুতর অপরাধ। ঘটনা এতদূর গুরুতর হইয়াছে যে, অনেক সময়ে মানবীয় দোষ ও দুর্ব্বলতা ও ভগবানে আরোপ করিতে শুনিয়াছি। "হে হরি, পদাঘাতে এ পাপীর মস্তক চূর্ণ কর," পবিত্র স্বরূপকে এভাবে অনুরোধ করা বিকৃত ভাবের পরিচায়ক।

চতুর্থ দোষ—"পৌত্তলিক ভাব"। হস্ত, পদ, মস্তক, চক্ষু সকলই যথাযথরূপে বর্ণনা কর, সুন্দর মূর্ত্তি গঠিত হইবে। মানসপটে এই প্রকার মূর্ত্তি রচনা করিয়া প্রেমফুল ও ভক্তি চন্দন উপহার দেওয়াই পৌত্তলিকতা। আবার এই পৌত্তলিকতা দোষে দূষিত সঙ্গীত ও গ্রন্থাদি দ্বারা সরলমতি বালক বালিকাগণের চিন্তা ও ধারণা শক্তিকে কতদূর মলিন করা হইতেছে, তাহা ভাই ভগ্নী একবার চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। তাহারা তত যুক্তি তর্ক জানে না। "মুখ" বলিলে একখানী মুখই বুঝে, "চরণ" বলিলে মনে মনে পঞ্চাঙ্গুলী বিশিষ্ট পাই বুঝে। আমরা কি প্রকারে এতগুলি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিতেছি। একবার তাহার পরিণাম চিন্তা করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চমতঃ ইহা দ্বারা সাধন বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। অসত্য, কল্পনা, জড়ীয় ভাব ও অপবিত্রতা মিলিত হইয়া প্রাণকে সঙ্কীর্ণ করে, ভাবকে মলিন করে এবং অভ্যাসকে দূষিত করে,—ইহারা প্রত্যেকেই সাধন পথের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। ধ্যান যোগে অন্তরে প্রবেশ করিয়া সাধক এ সকল অপরাধের বিষম ফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধে আমাদের তর্ক করিবার কোন অধিকার নাই। ইহা কোন সাধক যোগীর প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা।

এত অমঙ্গল যাহার মধ্যে, তাহা এত কাল কিরূপে অবাধে ব্রাহ্মসমাজে চলিয়া আসিতেছে, আমরা ভাবিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজে অসত্য তিষ্ঠিতে পারিবে না, ইহা প্রাণের বিশ্বাস। আমরা আশা করি, দেশময় সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতা, ভগ্নী এ বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এখনও সতর্ক হইলে সহজে ভ্রমকে বিদায় করা যাইতে পারে। আস্তে আস্তে ব্রাহ্ম সঙ্গীত, ব্রাহ্মের ধর্ম্ম গ্রন্থ, ব্রাহ্ম সাহিত্য এই কাল্পনিক পৌত্তলিকতায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ক্রমশঃ এ ভ্রমের মূল সমগ্র ধর্ম্মকে এরূপে জড়াইয়া ধরিবে যে, আর উৎপাটন করিবার সাধ্য থাকিবে না; ভয় হয় পাছে, হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় অসত্যকে উৎপাটন করিতে যাইয়া সমগ্র ধর্ম্ম পড়িয়া যাইবে। সময় থাকিতে এখনও সতর্ক হওয়া কর্ত্তব্য। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন।

গুরুবাদ-প্রতিবাদ

মহাশয়!

১লা ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় "গুরুভক্তি ও স্বাধীনতা" শীর্ষক প্রস্তাবটী পাঠ করিয়া আমরা একেবারে স্তম্ভিত হইলাম। সাধারণকে শিক্ষা দান করা যখন মহাশয়ের জীবনের মহাব্রত, তখন "যুবকদিগের উপর যে শ্লেষ এবং শাসন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং একান্ত প্রীতি লাভ করিয়াছি। কিন্তু আপনার স্বীয় মত সমর্থনার্থে যে যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই আমাদের বিস্ময়ের কারণ। একদিকে আপনি পুরাতন গুরুবাদকে "কুৎসিৎ ব্যাপার" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অপর দিকে আবার খৃষ্টের ন্যায় গুরু এবং তাঁহার শিষ্যদিগের ন্যায় শিষ্যদল ব্রাহ্মসমাজে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। জগতে যত প্রকার গুরুবাদ আছে, তন্মধ্যে খৃষ্টাশ্রিতদিগের গুরুবাদ অতিশয় গুরুতর এবং ভীষণ ভ্রমাত্মক। খৃষ্টাশ্রিতগণ মহাত্মা খৃষ্টকে কেবল "মানুষ গুরু" মাত্র বলিয়া তৃপ্ত হন নাই, কিন্তু ঈশ্বরের অবতাররূপে, মুক্তিদাতারূপে জ্ঞান করিয়া তাঁহার চরণে পূজা প্রদান করিতেছেন। মানুষকে আদর্শ করিতে যাইয়া সংসারে কি প্রকার শোচনীয় ধর্ম্ম-বিভ্রাট ঘটিয়াছে, খৃষ্টধর্ম্ম তাহার একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত। অথচ আপনি সমধিক দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন,—"ঈশ্বর করুন, আমাদের এরূপ সকল পুরুষ ও বিশ্বাসী **শিষ্যদল** আবির্ভূত হউন।" একথায় আমরা নীরব হইয়া, তত্ত্বকৌমুদীর পাঠক এবং ব্রাহ্ম সাধারণকে তত্ত্বকৌমুদীর উক্তি গুলি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা সত্যের অনুরোধে মাত্র ২।১টী কথা বলা আবশ্যক মনে করিলাম।

আপনি আর একস্থানে বলিয়াছেন, "সাধুজনের প্রতি ভক্তি করিতে গিয়া মানুষের স্বাধীনতা যায়, অর্থাৎ তাহার মনুষ্যত্ব লোপ হয়, ইহা নূতন শুনা গেল।" আপনি ইহা অবশ্যই নূতন **শুনিলেন** না—নিজেই ইহার জন্য অনেক সময় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সে দুঃখময় কাহিনীর পুনরুল্লেখ করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। যেখানে **শিষ্যদল** সেখানেই স্বাধীন ভাবের বিনাশ। অন্যান্য সম্প্রদায়ের শিষ্যদলকে ছাড়িয়া ব্রাহ্মসমাজের শাখা বিশেষের প্রতি তাকাইলেই, একথা প্রমাণিত হইয়া যায়। সাধুসঙ্গ এবং সাধুভক্তিকে আমরা কখনই অবহেলা করি না। ইহা দ্বারা জীবনে সাধুভাব জাগিয়া উঠে, ইহা আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি এবং চিরদিনই বলিব। আপনি যে ভাবে ব্যক্তি বিশেষের "চরণতলে বসিয়া" তাঁহারা মুখ-নিঃসৃত সমুদয় কথা "সমগ্র হৃদয়ের সহিত" গ্রহণ করিয়া "কৃতার্থ হইতে" উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই আমাদের প্রতিবাদের বিষয়। আমরা এ বিষয়ে আর বেশী বলিতে চাই না, ব্রাহ্ম সাধারণ বিচার করুন।

একান্ত অনুগত

নলহাটী কুঞ্জলাল ঘোষ।

ব্রাহ্মসমাজ।

শ্রাদ্ধ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে আমাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু অধরচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যা ১ বৎসর ২ মাস বয়সে জ্বর বিকার রোগে গত ১৩ই শ্রাবণ পরলোক গত হইয়াছে। কন্যার মাতা পিতা এবং আত্মীয়গণ এই শিশুর মৃত্যুতে বিশেষ শোকাকুল হইয়াছেন। পরমেশ্বর এই শোকাকুল পরিবারে সান্ত্বনা প্রদান করুন। গত ১১ই ভাদ্র সোমবার পরলোকগত বালিকার আত্মার কল্যাণার্থ বিশেষ ভাবে উপাসনা হইয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার সহিত জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে বালিকার মাতুল শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সম্প্রতি ব্রাহ্ম বালিকাদিগের জন্য যে একটী বোর্ডিং স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহাতে একটী বালিকার মাসিক বেতনের অর্দ্ধেক সাহায্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

দানপ্রাপ্তি—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থায়ী প্রচার ফণ্ড নামে একটী ফণ্ড স্থাপন করিতে অনেক দিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। এ প্রকার একটী ফণ্ড স্থাপিত হইলে বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা। কিন্তু ব্রাহ্মগণ এবিষয়ে যে উপযুক্তরূপ সাহায্য করিয়াছেন এরূপ মনে হয় না। সম্প্রতি উক্ত ফণ্ড স্থাপনোদ্যোগীদিগের কয়েক জনের প্রার্থনায় শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এককালীন ৪০০৲ চারি শত টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই দান প্রাপ্ত হইয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা মহর্ষি মহাশয়কে কৃতজ্ঞতার সহিত বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর তাঁহার স্নেহ সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে। যখন পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ঢাকায় ছিলেন। তখন তাঁহার তথায় থাকিবার ব্যয় স্বরূপ মাসিক ৫০ টাকা হারে দান করিতে সম্মত হন। সে সময় হইতে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত বৃত্তি সম্ভোগ করিতেছেন। আমরা মহর্ষি মহাশয়ের নিকট নানাপ্রকারেই ঋণী হইয়া পড়িতেছি। আশা করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার এই স্নেহ সম্ভোগের অনুপযুক্ত হইবে না।

আমরা অবগত হইলাম, রেঙ্গুন নগরের ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত মিঃ, পি, সি, সেন মহাশয় ব্রাহ্ম বালকবালিকাদিগকে ভোজ দিবার জন্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট ১০০৲ এক শত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত এই দান পাইয়া সেন মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই টাকা দ্বারা ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগকে মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রদান করিলে তাহারা বিশেষ প্রীত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্ম বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য কিম্বা ব্রাহ্ম বালিকা বোর্ডিংয়ের জন্য এই টাকা ব্যয়িত হইলে টাকার অধিক সদ্ব্যবহার হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। আশা করি দাতা এবং গ্রহণকর্ত্তা উভয়ে এই বিষয়ে বিবেচনা করিবেন।

এজেন্ট—বাবু কুঞ্জবিহারী সেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট প্রাপ্য চাঁদা, প্রচার ফণ্ডের চাঁদা এবং তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের প্রাপ্য মূল্য আদায় করিবার জন্য এজেন্ট নিযুক্ত হইয়া উত্তর বাঙ্গালায় গমন করিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উত্তরবঙ্গস্থ সভ্য ও উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইঁহার নিকট আপন আপন দেয় প্রদান করিয়া বাধিত করিবেন।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২০এ ভাদ্র মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ২১এ ভাদ্র প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
১১শ সংখ্যা।

১লা আশ্বিন মঙ্গলবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬০।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

তুমি পিতা।

পদে পদে পড়িবার ভয়,
তাই অতি ব্যাকুল হৃদয়,
তাই বলি তুমি ধর হাত;
তবু কেন হাত ছেড়ে দাও?
তবু কেন দূরে সরে যাও?
কত আর সহিব আঘাত?

পড়ে গেলে এস একবার,
তুলিয়া মুছাও অশ্রুধার,
ভাবি বুঝি চিরতরে এলে,
সুখ অশ্রু বহিবারে রয়;
আঁখি তুলি চাহি যে সময়,
দেখি তুমি গেছ একা ফেলে।

পড়ে গিয়ে যদি কাছে পাই,
তবে পড়ি তাতে দুঃখ নাই,
কিন্তু কেন সাথে নাহি রও?
ভয়ে দুঃখে অভিভূত প্রাণ,
নাহি বুঝি তোমার বিধান
জানি শুধু পিতা তুমি হও।

নিবেদন ও প্রার্থনা—প্রভু পরমেশ্বর আমরা দেখিতেছি,—তোমার রাজ্যে দুর্ব্বল এবং সবল উভয়েই জয়লাভ করিতেছে। সবল যে—সে নিজ বলে অপরকে পরাস্ত করিয়া থাকে,—সে কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা না করিয়া নিজেই জয়যুক্ত হয়। কিন্তু দুর্ব্বল যে জয় লাভ করে, তাহার জয় লাভের প্রণালী অন্যরূপ। সে কাঁদিয়া—নির্ভর করিয়াই জয় লাভ করে,—সন্তান কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাতার প্রবল প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া দেয়,—একান্ত নির্ভরের সহিত মায়ের মুখের দিকে তাকাইয়া তাহাকে পরাস্ত করিয়া থাকে। ভিক্ষুক দাতার দ্বারে পড়িয়া কাঁদিতে থাকে। দাতা তাহার প্রার্থনায় উদাসীন। মনে মনে সংকল্প করিতেছেন, এ ভিক্ষুকটাকে কিছুই দেওয়া হইবে না। যতই তিনি তাহার প্রার্থনা-বাক্য শ্রবণে বধির হইতেছেন, সে কিন্তু ততই চীৎকার ধ্বনি চড়াইয়া ধরিতেছে। তাহার ক্লান্তি নাই, ক্রমাগত কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিজের অভাব বিবৃত করিয়া কত কি বলিতেছে। ক্রমে দাতা আর নিজ সংকল্প রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন না। ভিক্ষুককে কিছু দিয়া বিদায় করিতে বাধ্য হইলেন। এই ভাবে দুর্ব্বল সবলের উপর জয় লাভ করিয়া থাকে। হে মহান্ পরমেশ্বর! আমরা দুর্ব্বল আমাদের এমন শক্তি নাই যে, বলদ্বারা তোমাকে আকর্ষণ করিয়া কাছে আনি, তোমার উপর জয়যুক্ত হই। কিন্তু আমাদের যে কাঁদিবার প্রবৃত্তিও হইতেছে না। দুর্ব্বলের বল যে ক্রন্দন নিরুপায়ের উপায় যে প্রার্থনা, তাহাও যে অবলম্বন করিতে আমাদের তেমন প্রবৃত্তি হইতেছে না। হে দীনদয়াল! কবে আমাদের এ দুর্ম্মতি ঘুচিবে, কবে আমরা আপনাদিগকে নিরুপায় জানিয়া উপায় হীনের গতি তোমাকে আশ্রয় করিব? একবারে আত্ম-বলের ভরসা পরিত্যাগ করিয়া আমরা তোমারই শরণাগত হইব। হে পিতা! আমাদিগের প্রাণে শুভ বুদ্ধির উদ্রেক কর, যেন তোমার দ্বার পরিত্যাগ করিতে আমাদের ইচ্ছা না হয়। যেন তোমার করুণার অপেক্ষা করিতে আমাদের সহিষ্ণুতার অভাব না হয়।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

মাতার ব্যবহার—দুরন্ত ছেলেকে নিয়া মাতা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেছেন, সন্তান কিছুতেই মাকে ধরা দিবে না, ক্রমাগত এদিক্ ওদিক্ করিয়া বেড়াইতেছে, আর ছুটিতেছে। মাতা তাহার পিছনে ছুটিয়া ছুটিয়া ক্লান্ত হইতেছেন; সন্তানও ধরা দেয় না মাও ক্ষান্ত হন না। ক্ষান্ত হওয়া মায়ের স্বভাব নয়। সন্তান যতই ছুটিয়া যাইতেছে, ধূলি, মাটি গায় মাখিতেছে, মা ততই ব্যস্ত সমস্ত হইতেছেন, যেন বিপদ তাঁহারই। সে খাইতে চাহিতেছে না, কোন মতেই খাইবে না। ধর পাকড় করিয়া যদি বা কোনক্রমে আনিয়া বসাইলেন বটে; কিন্তু সে কিছুতেই খাইবে না। ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে তবু তাহার সে বোধ নাই। সে দুষ্ট বুদ্ধির এরূপ বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে ও দুরন্তপনা করিবার জন্য এত ব্যস্ত যে তাহার ক্ষুধাবোধ পর্য্যন্ত

নাই। মা কত গল্প করিতেছেন, কত কথা বলিতেছেন কোন মতে সন্তান দুই গ্রাস খায় কি না তাই ভাবিতেছেন, তিনি যেন বড় বিপদগ্রস্ত। সন্তান খাইলে যেন তাঁহারই ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে। এইরূপে আমরা প্রতিনিয়ত সন্তানের সহিত মাতার সংগ্রাম দেখিতেছি। দুরন্ত ছেলেকে নিয়া মাতার যে কি কষ্টভোগ করিতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আমরা ঘরে ঘরে দেখিয়া দুষ্ট ছেলেগুলিকে কত ভৎসনা করিয়া থাকি। আমরা এখন বড় হইয়াছি কি না? বুদ্ধি হইয়াছে, জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাই এখন বালকের ব্যবহার দেখিয়া কতই কি মনে করি, কিন্তু যদি আমাদের বিদ্যা বুদ্ধির অহঙ্কারটা পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরের দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া, একবার অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে শিশু মাতার সহিত যাহা করিতেছে, আমাদের ব্যবহার পরমমাতার সহিত কি তাহাপেক্ষা অধিক পরিমাণে নিন্দনীয় হইতেছে না? পরমমাতা প্রতিনিয়ত আমাদের পশ্চাতে অমৃতপাত্র লইয়া ছুটিতেছেন। আমরা কি সেই দিকে তাকাই? আমরা কি তাঁহার আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করি? তিনি যে ডাকিয়া ডাকিয়া দুঃখিনীর বেশে বেড়াইতেছেন, যেন কতই বিপদগ্রস্ত হইয়াছেন। আমাদিগকে অমৃত দান করিলে যেন তাঁহার কতই আরাম হইবে। এ ভাবে যে প্রত্যেকের পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতেছেন কই আমরা ত বুদ্ধিমান ও সুসন্তান ছেলের মত মাকে ধরা দিতেছি না। তাঁহার অভয় ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার জন্য ত প্রস্তুত হইতেছি না। তিনি ক্লান্ত হইবেন না নিশ্চয়, ক্লান্ত হওয়া বা ত্যক্ত হওয়া তাঁহার স্বভাব নয়। কিন্তু আমরা ত আর তাঁহাকে সুসন্তানের ন্যায় ধরা দিলাম না? তবে আর বুদ্ধিমান হইয়াছি বলিয়া গৌরব করিবার কারণ কি? দুষ্ট বালকও মাতার অধীন হয় না, তাঁহাকে ধরা দেয় না, আমরাও সেইরূপ এবং তাহাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরমমাতার অবাধ্য হইতেছি। দুরন্ত বালকের সঙ্গে আমাদের তবে আর প্রভেদ কই? পরমমাতা আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আর দুরন্ত ছেলের মত তাঁহার সহিত অবাধ্যতা না করি। সুসন্তানের উচ্চ অধিকার আমরা যেন প্রাপ্ত হই।

জ্ঞান ও ভক্তি—সুন্দর ফুলটী আপন সৌন্দর্য্যের জ্যোতি বিস্তার করিয়া বাগানে শোভা পাইতেছিল। দর্শকের দৃষ্টি যেমন সেইদিকে পড়িল, অমনি সে শোভা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইল। দর্শক ছুটিয়া যাইয়া সে ফুলটী গ্রহণ করিল। কিন্তু হায় সে ফুলের বাহ্যরূপের অনুরূপ সৌরভ ছিল না। দর্শক যেমন আগ্রহের সহিত তাহার শোভা দেখিয়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে নাসিকার নিকট ধরিয়া যখন সুগন্ধি লাভে বঞ্চিত হইল, তখন আর তাহার প্রতি সেরূপ অনুরাগ রহিল না। ফুল যেমন বাহিরের সৌন্দর্য্যে প্রশংসনীয় হইয়াও গন্ধবিহীনতায় লোকের তেমন অনুরাগ পাইল না। তেমনি ধর্ম্মও যদি বাহিরের চাকচিক্যে লোকনয়ন তৃপ্তিকর হয়, কিন্তু প্রাণে ধারণ করিয়া প্রাণ শীতল করিবার মত উপযুক্ততা লাভ না করে, তবে সে ধর্ম্ম লোককে আকর্ষণ করিতে পারিলেও চিরদিন কাছে রাখিতে পারে না। বাহিরের শোভা মানুষকে আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু অধিকক্ষণ কাছে রাখিতে সমর্থ হয় না। কারণ একমাত্র চক্ষুর পরিতৃপ্তিতেই মানব তুষ্ট নয়, কিন্তু প্রাণে ধারণ করিয়াও সে আরাম পাইতে চায়। ধর্ম্মমত সুন্দর হইলে দেখিতে ভাল লাগে, লোকের নিকট বলিতে ভাল লাগে, কিন্তু তাহাতে এমন কিছু থাকা আবশ্যক যাহাতে প্রাণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে। আমাদের ধর্ম্ম যদি এরূপ হয় যে লোকের নিকট প্রশংসা পায়, কিন্তু লোককে আকর্ষণপূর্ব্বক নিজ আশ্রয়ে রাখিয়া তৃপ্ত করিতে পারে না, তাহা হইলে এ ধর্ম্ম মানবের পক্ষে চির আশ্রয়ের স্থান হইবে না। সুতরাং আমাদের ভাবা উচিত কিরূপ হইলে ইহাতে বাহিরের শোভা এবং প্রাণতৃপ্তিকর আয়োজন একত্রে বাস করিতে পারে।

ফুলের পক্ষে বাহিরের সৌন্দর্য্য যেমন ধর্ম্মের পক্ষে জ্ঞান তেমনি। ফুল বাহিরের বর্ণ-চাকচিক্য এবং গঠনের চমৎকারিত্ব দ্বারা লোককে আকর্ষণ করিয়াও যেমন সুগন্ধির অভাবে চির আদরের পাত্র হয় না, তেমনি ধর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা পরিষ্কৃত, পরিমার্জ্জিত হইলেও ভক্তির সমাবেশ ভিন্ন লোকের প্রাণের আরামদায়ক হয় না। জ্ঞান ধর্ম্মের বাহ্য আবরণকে নিখুঁত করিয়া লোকের নিকট উপস্থিত করে, বাহির হইতে দেখিয়ামাত্র লোক সেই দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু যখন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুগন্ধিস্বরূপ ভক্তির সুমিষ্ট আস্বাদ তাহাতে না পায় তখন আর তাহাকে তেমন আদর করিতে পারে না। তখন মতে ধর্ম্ম আদরের পাত্র হইলেও প্রাণে ধারণ করিয়া কেহই পরিতৃপ্ত হয় না। সেই ধর্ম্মই মানবের প্রকৃত কল্যাণ করিতে সমর্থ হইবে, যাহা জ্ঞান ও ভক্তির উপকরণে গঠিত। যাহা দেখিতে সুন্দর এবং যাহার সঙ্গ লাভে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। জ্ঞান আর ভক্তির এইরূপ মিলনেই ধর্ম্ম পবিত্র ও হৃদয়ারামকারী হইয়া থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞান বা ভক্তি কাহারও বিরোধী নহে। ব্রাহ্মগণ যদি এই উভয়কে একস্থানে মিলাইয়া জগতকে দেখাইতে পারেন, যে ইহা যেমন জ্ঞান-প্রধান এবং জ্ঞানের প্রখর-জ্যোতিতে উজ্জ্বল, তেমনি ভক্তির সুস্নিগ্ধ বারি সিঞ্চনে পরিপুষ্ট, প্রাণ জুড়াইবার ধন। তবেই লোকে ইহা গ্রহণ করিবে এবং গ্রহণ করিয়া ইহার নিকট চিরমুগ্ধ থাকিবে।

সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধির সহিত যেমন জ্ঞান আর ভক্তির তুলনা হয়, যেমন দেখা যায় শোভা নিষ্প্রয়োজনীয় নয়, কারণ শোভা না থাকিলে কাহারও সে দিকে আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। আবার সৌরভ ও তেমনি বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সে দিকে যাইয়াও সুগন্ধির অভাবে মানুষ অধিক সময় তাহাতে আবদ্ধ থাকে না। তেমনি শরীরের অস্থি সমূহ এবং তদুপরি স্থাপিত মাংসাদির সহিতও জ্ঞান ও ভক্তির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ দৃষ্টান্তেও দেখা যাইবে জ্ঞান ভক্তির সম্মিলন ভিন্ন ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন হয় না। দেখা যাইবে জ্ঞান ভিত্তিরূপে এবং ভক্তি শোভন গৃহের ন্যায় একত্রে বাস করিলেই ধর্ম্ম কল্যাণকর হয়।

ভূধর শব্দে কেন পর্ব্বতকে বুঝায়, তাহার হেতু যেমন সহজ

বুঝা যায় না, মনে হয় পাহাড় আবার পৃথিবীকে ধারণ করে কিরূপে? বরং ডুবাইয়া দেয়। কিন্তু প্রকৃত কথা অবগত হইলে আর সে সন্দেহ থাকে না, তখন দেখা যায় পৃথিবীর অস্থি পঞ্জরের মত হইয়া আছে বলিয়াই পর্ব্বতকে ভূধর বলা সঙ্গত। তেমনি সহসা মনে হয় যে জ্ঞান আবার ভক্তির কি সাহায্য করে? ভক্তির ভিত্তি স্বরূপ হইয়া জ্ঞান অবস্থিতি করিতেছে একথা গ্রাহ্য নয়। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে! মূলে জ্ঞান না থাকিলে, ভক্তির আশ্রয় স্বরূপ যিনি তাঁহার পরিচয় জ্ঞান প্রদান না করিলে ভক্তি কোন রূপেই দাঁড়াইতে পারে না। জ্ঞান যখন ভক্তির আশ্রয় দেখাইয়া দেয়, তাঁহার অনন্ত মহিমা এবং শোভা সম্পদের পরিচয় দেয়, তখনই ভক্তি সেই দিকে ধাবিত হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক আপন সুখ শান্তি, আশা ভরসা স্থাপন পূর্ব্বক কৃতার্থ হইতে থাকে। শরীরের অস্থি সমূহ মূল অবলম্বন হইয়াই যেমন মাংসাদির গঠন শরীরকে শোভাসম্পন্ন করে, মূলে অস্থি সকল না থাকিলে গঠনের এমন চমৎকারিত্ব যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনি জ্ঞান মূলে না থাকিলে ভক্তি এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াইতে পারে না। এভাবে দেখিলে জ্ঞানপথ ও ভক্তিপথের বিরোধ আর থাকে না। উভয় পথের পথিকগণের বিবাদও থাকে না। একটীকে ছাড়িয়া যখন অন্যে কার্য্যকর নয়, তখন উভয়ের তারতম্য করা কখনই প্রার্থনীয় হইতে পারে না।

অভিমান—মানবজীবনের শত্রুগণের মধ্যে কোন একটীকে বড় আর কোন একটিকে ছোট বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার উপায় না থাকিলেও এক কারণে অভিমানকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর বলিয়া মনে হয়! কারণ অন্যান্য শত্রু (ক্রোধ লোভ প্রভৃতি) দিগকে ধরিতে পারা যায়। বুঝা যায় যে ক্রোধান্বিত হইয়াছি, কিম্বা লোভ-পরবশ হইয়াছি। কিন্তু অভিমান শত্রু হইয়াও এমন ভাবে অন্তরে প্রবিষ্ট হয় যে সে যেন কতই মিত্র কতই উপকারী। তাহাকে চিনিয়া উঠা ভারি কঠিন কার্য্য। এমন মোহন বেশে অন্তরে দেখা দেয় তাহাকে সহসা কিছুতেই চেনা যায় না। অধিকাংশ সময় অভিমান ন্যায়পরতার আকার ধারণ করিয়াই লোককে আক্রমণ করে। অন্যায়ের শাসন রূপ-পরিগ্রহ করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, তখন একবারও মনে করিতে দেয় না যে আমার যে ন্যায়পরতা এত জাগিয়া উঠিল তাহার মূলে আমার অভিমানের উপর আক্রমণ। অভিমান যদি আঘাত না পাইত, তবে এরূপ ন্যায়পরতার সমাদর করিতে প্রবৃত্তি হইত না। এইরূপে মানুষ অধিকাংশ স্থলে অভিমানের প্ররোচনায় অন্যের প্রতি অযথোচিত আচরণ করিতে থাকে। অভিমানের এই অপ্রচ্ছন্ন ভাবই বিশেষ আশঙ্কার হেতু। কারণ শত্রু বলিয়া যদি কাহাকেও জানা যায়, তবে আর আদর করিয়া তাহাকে প্রাণে স্থান দিতে কেহই ইচ্ছা করে না। শত্রুর সহিত বন্ধুতা করিতে যদি কেহ প্রস্তুত হয়, তাহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে সে আর আত্মকল্যাণ চায় না। কিন্তু আত্মকল্যাণার্থী সেরূপ কাজ কখনই করেন না। এজন্য শত্রুকে চিনিতে পারিবার শক্তি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু অধিকাংশ সময় মানুষ এই অভিমানের সঞ্চার হইলেও বুঝিতে পারে না যে অভিমানী হইয়াছি। অভিমান মানবের যে কি ক্ষতি করে তাহার বর্ণনা হয় না। এক ব্যক্তি সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া একটী বিশেষ কার্য্যকে আপন পরিত্রাণের জন্য গ্রহণ করিল এবং তাহার বিশ্বাসও ছিল এই কার্য্য দ্বারাই তাহার পরিত্রাণের বিশেষ সহায়তা হইবে। কিন্তু দেখ অভিমান আসিয়া তাহার যে এমন পরিত্রাণপ্রদ কার্য্য তাহা হইতেই তাহাকে বিচ্যুত করিয়া ফেলিল। সে লোকের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া অভিমানের পরামর্শ শুনিয়া সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং মঙ্গলকর কার্য্যই ছাড়িয়া দিল। প্রচ্ছন্নরূপী অভিমানকে বুঝিতে না পারিয়া মানুষ যখন জীবনের অতি মহৎ অকল্যাণ সাধন করে, তখন প্রত্যেক পরিত্রাণার্থীর এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। বিশেষতঃ যাঁহারা বিশেষ বিশেষ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই সকল কার্য্য যাঁহাদের পরিত্রাণের বিশেষ সহায়তার হেতু, তাঁহাদের সর্ব্বদাই সজাগ থাকা আবশ্যক যেন অভিমানের যুক্তি শুনিয়া কর্ত্তব্যের অবহেলা না করিতে হয়। কাহারও নিকট অবনত হইলে বা নিজ বুদ্ধি বিবেচনার নিন্দা হইলে কিম্বা পরাজয় হইলে, তাহাতে পরিত্রাণের কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু পরিত্রাণের হেতু যাহা তাহা পরিত্যাগ করিলে যে ক্ষতি হয়, তাহার সংশোধন নাই। সুতরাং অভিমানকে সন্তুষ্ট করিবার প্রবৃত্তি বিলুপ্ত হউক। কর্ত্তব্য সাধনের দিকেই আমাদের মনে প্রবল গতি হউক।

পারিবারিক অনুষ্ঠান ও আচার্য্য—আমরা ইতিপূর্ব্বে পারিবারিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তত্ত্ব কৌমুদীর কয়েক সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি। সম্প্রতি পারিবারিক অনুষ্ঠান এবং আচার্য্য সম্বন্ধে আমরা একখানা পত্র পাইয়াছি। তাহারি কোন কোন অংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

"অনুষ্ঠান বাহুল্য হিন্দু সমাজের অনুকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমরা যেন হিন্দু সমাজের সঙ্গে টক্কোর দিয়া অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই, আমরা একথা বলিতেছি না। যতদিন সংসারক্ষেত্র জীবের আবাসভূমি থাকিবে, ততদিন বিবাহ থাকিবে, জন্ম থাকিবে, মৃত্যু থাকিবে সুতরাং এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠানও থাকিবে। কিন্তু অর্থহীন "হাতেখড়ি" "আইবুড়োভাত" "ভাইফোঁটা" প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলির অসারতা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। অনুষ্ঠানের আড়ম্বর যেখানে, ধর্ম্মের গভীরতা ও প্রাণশূন্যতা সেখানে। এ কথার প্রমাণের জন্য বহুদূরে যাইতে হইবে না, আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজই ইহার প্রমাণ। কথায় কথায় এত অনুষ্ঠান বুঝি জগতের কোন ধর্ম্মে নাই,—আবার প্রাণহীন এমন অসার ধর্ম্মও বুঝি জগতে আর নাই! এই জন্যই যাঁহারা বলেন যে, ধর্ম্মে আস্থাবান লোকেই অনুষ্ঠানপ্রিয় হইবেন, তাঁহাদের কথা আমরা মানিতে পারি না। বরং একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যাঁহারা যত ধর্ম্মে উন্নত হইয়া উঠিয়াছেন, বাহিরের অনুষ্ঠান তাঁহাদের জীবন হইতে তত বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন কি হিন্দু সাধক ভক্ত প্রভৃতিকে বাহ্যানুষ্ঠানাদি করিতে কম দেখা যায়। ব্রাহ্মের অনুষ্ঠানের

মূল ব্রহ্ম পূজা। বৃথা আমোদ বৃদ্ধির জন্য কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের সৃষ্টি হওয়া উচিত নয়।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান বাহুল্যের ভিতর দিয়া আর একটী অমঙ্গলজনক বিধি ব্রাহ্মসমাজ জাগিয়া উঠিতেছে। সেটী "আচার্য্য বা পৌরোহিত্য ভাব।" অনুষ্ঠান করিতে হইলেই পুরোহিত ডাকা হিন্দু সমাজের অভ্যাস। সে অভ্যাস ব্রাহ্ম-সমাজ ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। "আচার্য্য" কথাটার মধ্যে "গুরু এবং পুরোহিত" উভয় ভাবই বর্ত্তমান। উড়িষ্যাতে একটী ব্রাহ্ম-অনুষ্ঠান হইবে,—কলিকাতায় আচার্য্যের জন্য নিমন্ত্রণ আসিল, আচার্য্য না পাইলে অনুষ্ঠান বন্ধ হইল, ইহার মধ্যে প্রাচীন পৌরহিত্য ভাব বর্ত্তমান আছে বৈকি? পরম পিতার সঙ্গে সকলেরই সমান সম্বন্ধ। সকলেই তাঁহাকে পূজা করিতে পারি,—তবে এ ভাব কেন?"

পত্র প্রেরক মহাশয় যখন একবারে অনুষ্ঠান উঠিয়া যাউক এমন ইচ্ছা করেন না, বা উঠিয়া যাওয়া প্রার্থনীয় মনে করেন না, তখন সে বিষয়ে আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু কি কি অনুষ্ঠান সমাজে থাকিবে, তাহার বিচার করা কিছু কঠিন ব্যাপার। কারণ একজনের নিকট যে অনুষ্ঠানটী অর্থযুক্ত অন্যের নিকট তাহা অর্থহীন। একজন জন্মোপলক্ষে কোন অনুষ্ঠান করিবার প্রয়োজন দেখেন না। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষারম্ভের সময় উপাসনাদি করিয়া শিক্ষাকার্য্যে শিশুকে প্রবৃত্ত করা বিশেষ আবশ্যক মনে করেন। সুতরাং এ বিষয়ের বিচার ভার প্রত্যেকের স্বাধীন বিবেনার উপর থাকিলেই ভাল হয়। পত্র প্রেরক অন্যত্র বলিতেছেন যে, "অনুষ্ঠানের আড়ম্বর যেখানে ধর্ম্মের গভীরতা ও প্রাণশূন্যতা সেখানে।" অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাহিরের ধুমধামের সহিত আমাদের সহানুভূতি না থাকিলেও একথা কখনই স্বীকার করা উচিত নয়, যে বেশী পরিমাণে অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্মে অগভীরতা ও প্রাণশূন্যতা থাকিবে। ধর্ম্মভাব বিহীন হইয়া যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহাতেই প্রাণশূন্যতা ও গভীরতার অভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ ব্যক্তি যদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন, তাহা কেন ধর্ম্মের গভীরতা ও প্রাণশূন্য হইবে। যিনি অনুরাগী ও ভক্ত তাঁহার পক্ষে যখন ঈশ্বর স্মরণ মনন ভিন্ন কোন কাজ করাই সম্ভব নয়, তখন পরিবারের বিশেষ বিশেষ ঘটনা কেন ঈশ্বরোপাসনাবিহীন হইয়া সম্পন্ন হইবে? ভক্ত অনুরাগী কোন কাজই ঈশ্বরোপাসনাবিহীন হইয়া করিবেন না, এরূপ হওয়াই ত স্বাভাবিক। পত্র প্রেরক হিন্দু সমাজের অনুষ্ঠানের আড়ম্বর ও ধর্ম্মের গভীরতার অভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে না যে অনুষ্ঠানই ধর্ম্মের প্রাণশূন্যতা বা গভীরতার অভাবের কারণ। বরং ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মপ্রবণ অবস্থায় যে সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল। ধর্ম্মের প্রাণহীনতার অবস্থায়ও সেই অনুষ্ঠানগুলি থাকিয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রাণ চলিয়া গিয়াছে। যদি এমন হইত যে প্রাণহীনতার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানগুলি নূতন সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে পত্রপ্রেরকের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইত, বাস্তবিক ধর্ম্ম প্রবণতা এবং অনুষ্ঠানপ্রিয়তা এক সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যখন ঘটনাক্রমে ধর্ম্মের প্রাণ চলিয়া যায়, তখন ধর্ম্মের বাহিরের আবরণ স্বরূপ অনুষ্ঠানগুলিই পড়িয়া থাকে। লোকে তখন সেই সকল অনুষ্ঠান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকে। আমাদের দেখা উচিত, ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া যাইতেছে কি না। কিরূপ লোকের গৃহে অনুষ্ঠানের সংখ্যা বাড়িতেছে? যদি এমন মনে হয় যে যাঁহারা উপাসনার প্রতি উদাসীন। তাঁহাদের গৃহেই অনুষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি পড়া উচিত। ধর্ম্মহীন হইয়া যাওয়া সর্ব্বপ্রকারেই অপ্রার্থনীয়। অনুষ্ঠানাদি যদি সেরূপ ভাবে হয় তাহাও অবশ্যই প্রার্থনীয় নহে।

বৃথা আমোদ প্রমোদ বা আড়ম্বর কোনক্রমেই প্রার্থনীয় না হইলেও আমাদের দেখা উচিত যে যখন সংসারকে ধর্ম্মক্ষেত্র করিতে হইবে, তখন বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন আছে কি না; যদি এমন হইত যে সংসার কেবল কয়েকটী বিজ্ঞ, চিন্তাশীল, ধীর প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের আবাসস্থান, তাহা। হইলে বোধ হয় আমোদ প্রমোদাদির ব্যবস্থা না থাকিলেও চলিত। কিন্তু যখন প্রত্যেক পরিবারকেই বালকবালিকাদির সহিত বাস করিতে হইবে, তখন সেই সকল বালকবালিকাদিগকে যদি কোন প্রকার বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ করিবার অবকাশ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই সকল বালকবালিকারা কিরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট হইবে? তাহারা গৃহে আমোদ না পাইলে পারিবারিক অনুষ্ঠানাদিতে আমোদ সম্ভোগ করিতে না পাইলে স্থানান্তরে সে আমোদস্পৃহা চরিতার্থ করিবেই করিবে। সুতরাং গৃহকে সর্ব্ব প্রকার আমোদহীনরূপে পরিণত করা কখনই প্রার্থনীয় নহে। এজন্য ধর্ম্মকে প্রধানরূপে পরিবারে স্থান দিয়া, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে বালকবালিকারা বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিতে পারে, পারিবারিক অনুষ্ঠানে সেরূপ ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রার্থনীয়। উদাসীনের ধর্ম্ম আর গৃহীর ধর্ম্ম সকল বিষয়ে একরূপ হয় না। ব্যক্তি বিশেষের ধর্ম্ম আর সামাজিক ধর্ম্মও সর্ব্বাংশে এক প্রকার হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। বৃথা আমোদ যেরূপ অপ্রার্থনীয় বিশুদ্ধ আমোদ তেমনই প্রার্থনীয়।

"অনুষ্ঠান বাহুল্যের ভিতর দিয়া যে আচার্য্য ভাব জাগিয়া উঠিতেছে," পত্র প্রেরকের এই কথাও বাস্তবিক ঠিক নয়! ব্রাহ্মসমাজে যে সময় হইতে সামাজিক উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে, সেই সময় হইতেই আচার্য্যের পদ সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা যে নূতন হইল তাহা নয়। দশ জনে মিলিত হইয়া উপাসনা করিতে গেলেই এক জনকে উপাসনা করিতে হয়। সুতরাং সামাজিক উপাসনা বা সজন উপাসনার ব্যবস্থা থাকিলেই এই আচার্য্যের প্রয়োজন থাকিবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে সর্ব্বদা কোন এক ব্যক্তি বা শ্রেণী বিশেষই এ কার্য্য সম্পন্ন করেন, অন্য উপযুক্ত ব্যক্তি থাকিতেও তাঁহাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহা হইলেই এই রীতি অকল্যাণকর হইয়া পড়ে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে সেরূপ কিছুই দেখিতেছি না। পত্র প্রেরকের কথা সত্য হইলে অর্থাৎ যদি কোন স্থানে এমন ঘটিয়া থাকে যে বিশেষ কোন

ব্যক্তি আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন না আর অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিল,তবে ইহা নিতান্ত পরিতাপের কারণ— ব্রাহ্মগণের বিশেষ দুর্গতির পরিচায়ক। ব্রাহ্মগণ যদি আপন গৃহের অনুষ্ঠানে ভিন্ন স্থান হইতে সমাগত আচার্য্যের অভাবে তাহা সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হন, তাহা অপেক্ষা নিন্দা ও পরিতাপের ব্যাপার আর কি আছে? যদি ব্রাহ্মগণ আপনাদের গৃহে নিয়মিতরূপে পারিবারিক উপাসনার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে, এরূপ দৃশ্য কখনই দেখিতে হয় না যে বাহির হইতে কেহ উপাসনার জন্য না আসিলে, তাঁহার গৃহের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল না। যাঁহারা কখনও পাঁচ জনকে লইয়া সজন উপাসনা করেন না, তাঁহাদের পক্ষেই হঠাৎ সজন উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করিতে অসুবিধা বোধ হয়। যেন কথা বাহির হয় না। ব্রাহ্ম-পরিবার সকলে যদি নিয়মিত রূপে পারিবারিক উপাসনা হইতে থাকে, তাহা হইলে পত্রপ্রেরকের আশঙ্কা এবং অভি-যোগ তিরোহিত হইতে পারে। আমরা ব্রাহ্মগণকে কার্য্যতঃ এরূপ আচার্য্য ও পৌরহিত্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য উপযুক্ত হইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। তাহা হইলে আর দূষিত পৌরহিত্য—যাহা অশেষ অকল্যাণের কারণ, তাহা আর ব্রাহ্মসমাজে স্থান প্রাপ্ত হইবে না।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

আমাদের উদ্দেশ্য ও অভাব।

যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের ও ব্রাহ্মধর্ম্মের বিগত ত্রিশ বৎসর হইতে ইহার উন্নতি ও পরিবর্ত্তন পর্য্যালোচনা করিয়া আসি-তেছেন তাঁহারা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে নিরাশ না হইয়া বরং উৎসাহিত হয়েন। ১৭৮৮ শকে প্রথমে যখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সূত্রপাত হয়, তখন কয়েকটী পরিবার লইয়াই সমাজ গঠিত হইল। বিশ্বাসী ব্রাহ্ম পরিবারের সংখ্যা তখন অতি অল্পই ছিল। আজ সেই ক্ষুদ্র দল হইতে কত ব্রাহ্ম পরিবার এবং বিশ্বাসী, উৎসাহী কৃতবিদ্য, নরনারী এই সমাজকে অলঙ্কৃত করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিলে তাঁহাদের মনে যে কত আনন্দ হয় তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। কে জানিত যে ছয়টী ব্রাহ্মপরিবারের দৃষ্টান্তে আজ শত শত পরিবার ব্রাহ্মসমাজের ক্রোড়ে আসিয়া প্রবেশ করিবেন। তবে কি আমাদের নিরা-শার কোন কারণ আছে? ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাবী উন্নতির বিষয়ে কি এখন কাহারও মনে সন্দেহ আছে? আমরা সত্যের জয় এবং ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার প্রতি অবিশ্বাসী না হইলে আর সে সন্দেহ করিতে পারি না।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের যে আধ্যাত্মিক অবস্থা ছিল এখন তদপেক্ষা উন্নত অবস্থা হইয়াছে, তদ্বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। কি কি বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে এবং কি কি বিষয়ে আমাদের অভাব হইয়াছে তাহা আলোচনা করা যাউক।

১ম। আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবল হই-য়াছে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, কেহ বিশ্বাস সম্বন্ধে নিজের মনের ভাব খুলিয়া বলিতে সাহস করিতেন না। মানব-আত্মার উন্নতির পক্ষে এরূপ বিঘ্নকারী শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। ধর্ম্ম-পিপাসু ও সত্য জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যদি নিজের মনের সংশয় ফুটিয়া বলিতে না পারে, মনের ভাবকে যদি অবস্থার প্রতিকূলতার জন্য চাপিয়া রাখিতে হয়, তাহাতেই সমস্ত কুসংস্কার, অবিশ্বাস, অন্ধবিশ্বাস ও নাস্তিকতার জন্ম হয়। স্বাধীন চিন্তাই ধর্ম্মের জীবন। আমরা চিরকাল এই সত্য প্রচার করিয়া আসিতেছি। যদিও সময়ে সময়ে স্বাধীন চিন্তা আমাদিগকে কুপথে লইয়া যাইতে পারে, তথাপি আমরা তাহাতে ভয় করিব না। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও সত্যকে লাভ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া স্বাধীন চিন্তার পথ অবলম্বন করে, সে কখন বিপথগামী হইবে না, আমাদের বিশ্বাস। এই স্রোতটী যাহাতে ব্রাহ্মসমাজে অপ্রতিহত ভাবে প্রবাহিত থাকে, সকলেরই ইহা অন্তরের ইচ্ছা হওয়া উচিত। তাহা না হইলে আমাদের মধ্যে পুনর্ব্বার অসত্য ও অনিষ্টকর মত সকল প্রবেশ করিবে। এই স্বাধীন চিন্তার প্রভা-বেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি এবং উন্নতি। আমাদের ধর্ম্মবন্ধুরা ভীত হইয়াছেন, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বুঝি পুনর্ব্বার গুরুবাদ প্রবেশ করিতেছে। তাঁহাদের সে আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। যে গুরুবাদ ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ অভ্যুদিত হইয়াছেন, তাহাকে তিনি পুনর্ব্বার আদর করিয়া সমাজে আহ্বান করি-বেন না। কিন্তু আমরা যদিও গুরুবাদ সমাজে প্রবেশ করিতে দিব না, সাধুভক্তি যেন উড়িয়া না যায়। উন্নত চরিত্র ব্যক্তি-দিগের দৃষ্টান্ত ও উপদেশ আমাদের আত্মার মঙ্গলের পথে সহকারী। ইহা সকলেই বিশ্বাস করিবেন, সেই সকল ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করা ধর্ম্মপথের পথিকদিগের আত্মোন্নতির পক্ষে এবং হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা বৃত্তিকে চরিতার্থ করিবার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। এই সত্যটী যেন আমরা বিস্মৃত না হই। যেখানে সাধু ভক্তির দৃষ্টান্ত অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করে এবং স্বাধীন চিন্তার পথ অবরুদ্ধ করে, সেইখানেই ভয়ের কারণ। নতুবা সাধুসঙ্গ যথার্থই পান্থধাম। পথিক শ্রান্ত হইলে তথায় বিশ্রাম করিতে পারে, পথভ্রান্ত হইলে সেই পান্থ-নিবাসীগণকে পথ জিজ্ঞাসা করিতে পারে।

২য়। সুশিক্ষিত যুবকদিগের এবং স্ত্রীজাতির মধ্যেও নীতির আদর বৃদ্ধি হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপন কাল হইতে ৩৫ বৎসরের ইতিহাস এক প্রকার ঘটনা শূন্য বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু এই ২৫ বৎসর ঘটনা-পূর্ণ। প্রথম ৩৫ বৎসর কলিকাতাতে কয়েকজন প্রাচীন লোকের মধ্যেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন আমাদের যুবকদিগের মধ্যে এবং স্ত্রীজাতির হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য বদ্ধমূল হইতেছে।

৩য়। ব্রাহ্মসমাজকে এখন আর আমরা কেবল উপাসনার স্থান মনে করি না। ইহাকে আমাদের পৃথিবীর শান্তি নিকেতন মনে করি। আমাদের গৃহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবেশ করিয়াছে। আমরা সকলেই চেষ্টা ও আশা করিতেছি যে ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের গৃহধর্ম্ম হইবে। যদিও আমাদের আশানুরূপ ফল হইতেছে না, কিন্তু ২৫ বৎসরে যাহা হইয়াছে,তাহা কি নিরাশার বিষয়? যদি প্রতি ব্রাহ্ম পরিবারে একজন বিশ্বাসী লোকও আমরা রাখিয়া যাইতে

পারি, তাহা হইলেও আমরা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবন্ত মনে করিব।

৪র্থ। আমাদের মত সম্বন্ধে অনেক উন্নতি হইয়াছে। এক সময়ে ব্রাহ্মেরা বেদকে অভ্রান্ত মনে করিতেন, পুনর্জন্ম মানিতেন, জাতিভেদ স্বীকার করিতেন, পৌত্তলিকানুষ্ঠান করিতেন। এখন সেই সকল ভ্রান্ত মত ও কপট ব্যবহার আর ব্রাহ্ম সমাজে দৃষ্ট হয় না। আমাদের মধ্যে মতের বিশুদ্ধতা ও অনুষ্ঠানের বিশুদ্ধতার প্রতি এরূপ দৃষ্টি পড়িয়াছে যে আমরা কোন প্রকার পৌত্তলিক অনুষ্ঠানকারীকে আর ব্রাহ্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

এক্ষণে আমাদের অভাবগুলি আলোচনা করা যাউক। আমরা কি জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। যদি প্রত্যেকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের কোন্ কোন্ বিষয়ে অভাব আছে তাহা বুঝিতে পারিব। যদি আমরা একটী বিশুদ্ধ মতপূর্ণ একটী সমাজ গঠন করিবার জন্য এই সমাজে আসিয়া থাকি, তাহা হইলে সে বিষয়ে আমাদের যত্ন ক্রমে ক্রমে সফল হইবার আশা করিতে পারি। দ্বিতীয়তঃ যদি কেবল কতকগুলি সামাজিক কুরীতি নিবারণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকে, তাহাও সিদ্ধ হইবার উপায় অবলম্বিত হইতেছে সন্দেহ নাই। এই দুটী নিতান্ত বাঞ্ছনীয় সংস্কার কার্য্য। কিন্তু তাহাই ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য নহে। আত্মার পরিত্রাণ আমাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল এবং প্রথম দুইটী সেই কার্য্যের সহায় মাত্র। আত্মার পরিত্রাণ ধর্ম্ম সমাজের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং তদ্দ্বারাই ধর্ম্মসমাজের বিশেষত্ব জানিতে পারা যায়। সে কার্য্যের প্রতি যাহাতে আরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় আমাদের যত্ন তৎপ্রতিই ধাবিত হওয়া আবশ্যক। আমাদের সকল "সভার" দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক সভ্যের হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা হওয়া আবশ্যক যে আমরা পরস্পরে ধর্ম্মপথের সহযাত্রী হইয়া আরও অধিকতর প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মুক্তিধামের দিকে কিসে অগ্রসর হইতে পারি। আমাদের উদ্দেশ্য এক মুক্তি; কিন্তু উপায় ত্রিবিধ; প্রথমতঃ বিশুদ্ধমত, দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ সামাজিক নিয়ম; তৃতীয়তঃ বিশুদ্ধ উপাসনা। এই তিনটীর একটী পরিত্যাগ করিলে আমাদের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধতা হইতে পারে না। আমরা এই তিনটী উপায়কেই আমাদের আত্মার মুক্তিপথের সহায় মনে করি।

এক্ষণে আমরা কিরূপে এই উপায়গুলির সদ্ব্যবহার করিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারি তাহাই আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়াছে। এস্থলে আমরা কয়েকটী সদুপায় উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

আমাদের মধ্যে এখন যে সংস্কারের ভাব প্রবল আছে তাহাকে বাধা দিয়া যদি কেহ সমাজকে আধ্যাত্মিক অবস্থায় লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার যত্ন বিফল হইবে। সংস্কার আমাদের প্রার্থনীয় বিষয়। কেবল সেই সংস্কার কার্য্যের সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের আরও ঘনিষ্টতা হওয়া আবশ্যক।

যাঁহারা নিয়ম ও সংস্কার বড় ভাল বাসেন না, তাঁহারা আপনাদের প্রিয় আধ্যাত্মিক বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেই আকুল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে সংস্কার ও উপাসনা উভয়ই যুগপৎ চলিবে; কিন্তু সংস্কারকেরা যদি আধ্যাত্মিক বিষয় গুলির প্রতি উদাসীন হন, তাহা হইলে কেবল একাঙ্গ সাধন হইবে। অপর পক্ষেও তাহাই বলা যাইতে পারে।

এই উভয় দল পরস্পর সদ্ভাবে মিলিত হইয়া এবং পরস্পরের অধিকার বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে। যুবকেরা যেন মনে না করেন যে তাঁহাদের সংস্কার বাসনা চরিতার্থ হইলেই সকল কার্য্য শেষ হইল। ব্রাহ্ম সমাজের আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ অবরুদ্ধ না হয়, তাহাদের তাহা প্রধান লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। উন্নত ভ্রাতাদিগকে বিশ্বাস করিয়া তাহারা চলিবেন এবং যাঁহারা কিছু আধ্যাত্মিক ধন সঞ্চয় করিয়াছেন, তাঁহারা যুবকদিগকে স্নেহ ও বিশ্বাস করিয়া আপনাদের উন্নতির পরিচয় দিবেন। কেহ তাঁহাদের কার্য্যকে বাধা দিবেন না। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ যে গুরু দায়িত্বভার স্কন্ধে লইয়াছেন তাহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। আমরা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৌরহিত্য, জাতিভেদ প্রভৃতি সমস্ত কুসংস্কার তাড়াইয়া প্রত্যেক আত্মার ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতেছি। এই কার্য্যে যদি সফল না হইতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পরে যাঁহারা চেষ্টা করিবেন তাহাদের পথ আমরা অবরুদ্ধ করিব। অভ্রান্ত শাস্ত্র ও গুরু ভিন্ন আত্মার পরিত্রাণ হইতে পারে এ চেষ্টা ভারতবর্ষে আর কখন কেহ করিয়াছেন কি না বলা যায় না এবং পৃথিবীর অন্য কোন স্থানেও এরূপ চেষ্টা হয় নাই। প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহিত সমবেত চেষ্টার সামঞ্জস্য করা অতিশয় গুরুতর ও অভিনব ব্যাপার। সকলের জ্ঞান সমান নহে; সকলের ধর্ম্মভাব সমান নহে। ধর্ম্মসমাজে বহুদর্শিতার প্রয়োজন নাই এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত। বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাস্ত্রে যেমন সুপণ্ডিতদিগকে শ্রদ্ধা করিতে হয়, বিশ্বাস করিতে হয়, ধর্ম্মসমাজেও সেইরূপ। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকগণ যদি অগ্রণীদিগকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা অবিলম্বেই তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।

বিশেষ ভাব ও বিশেষ কাজ।

জীব-তত্ত্বের একটী অখণ্ডনীয় নিয়ম এই যে, প্রাণীজগতে যে সকল জীব উচ্চতর শ্রেণীভুক্ত তাহাদের দৈহিক বিকাশ অধিকতর সময়-সাপেক্ষ। উর্ণনাভ জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই জাল বুনিতে থাকে, এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই জীবনের পূর্ণতা লাভ করিয়া মরিয়া যায়। কত অসংখ্য অসংখ্য কীট জন্মগ্রহণ করিবামাত্রই আপন আপন জীবন রক্ষার্থ আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হয় এবং অল্প কালের মধ্যেই জীবন-লীলা শেষ করিয়া থাকে। পক্ষীজাতির বিষয়ে অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পক্ষীশাবকগণ জন্মিয়া সাধারণতঃ মাসাধিক কাল মাতৃক্রোড়ে অসহায় অবস্থায় থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পক্ষীমাতা শাবকগণকে আহারান্বেষণ ইত্যাদী তাহার জীবনরক্ষোপযোগী কার্য্য শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। কিন্তু মানব জাতির কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, মানবের শারীরিক ও মানসিক পরিপক্কতা জন্মিতে অনেক কালবিলম্ব হইয়া থাকে। জন্মাবধি পাঁচ বৎসরকাল পর্য্যন্ত ত মানব অসহায় শৈশবাবস্থাতেই থাকে। তৎপরেও প্রায় ১৫ | ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতা মাতা প্রভৃতির সাহায্য শিক্ষা ও যত্ন না পাইলে সন্তানগণ কখনই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু এই আত্মরক্ষায় উপযুক্ত হইলেও মানব সম্পূর্ণরূপে সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া জীবনের উন্নতি সাধন করিতে পারে না। জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করিতে গেলে মানুষকে পদে পদে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে জ্ঞান, ধর্ম্ম, সামাজিকতা প্রভৃতি বিষয়ে পরিপক্কতা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে মানুষের অধিক সময় লাগে। সাধারণ ভাবে যেমন সমস্ত জীব জগতে আমরা এই নিয়মের কার্য্য দেখিতে পাই, জীব শ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতির মধ্যে তেমনি বিশেষ ভাবে এই নিয়মের কার্য্য লক্ষিত হয়। মনুষ্যজাতির মধ্যে যাহারা অতি সামান্য আয়োজনে পরিবর্দ্ধিত হয়,—যাহারা মনুষ্যজীবনের অতি নিম্ন সোপানে অবস্থিত থাকিতেই ইচ্ছা করে,—যাহাদের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা তাহাদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশের শেষ সীমায় উপনীত হয়। অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের জীবনের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং অতি ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে তাহাদের জীবন আবদ্ধ থাকে। এই জন্যই পণ্ডিতবর এমার্সন এক স্থানে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তির জীবন এখনও কোন সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহার সম্বন্ধে আমার আশা আছে, কিন্তু যাহার জীবনের কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে আর আমার আশা নাই। একথা বলিবার গূঢ় উদ্দেশ্য এই যে, অধিক শক্তি, সারবত্তা ও মহত্ত্ব লইয়া যে সকল লোক সংসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়,—যে সকল পুরুষ মনুষ্য জীবনের উচ্চতর সোপানে উপস্থিত হইতে বিশেষ আশাযুক্ত, তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক পরিকতা জন্মিতে অনেক কাল বিলম্ব হয়, তাঁহাদের জীবনের প্রকৃত কার্য্যও অনেক বিলম্বে আরম্ভ হইয়া থাকে। তাঁহারা প্রথম অবস্থায় যে সকল কাজ করিয়া আপনাদের অসাধারণ শক্তির পরিচয় দেন, তাহা কেবল তাঁহাদের জীবনের বিশেষ ভাব লাভ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া মাত্র। যতদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা আপন আপন জীবনের বিশেষ ভাব, বিশেষ অবস্থা লাভ করিতে সমর্থ না হন, তত দিন তাঁহাদের জীবনে চাঞ্চল্য ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যে অবস্থায় জীবনের সকল বিভাগের উন্নতির স্রোত খুলিয়া যায়, জীবনের অব্যক্ত আদর্শ প্রকাশিত হয়, সে সময়েই বাস্তবিক জীবনের প্রকৃত বিকাশ হইয়া থাকে। প্রত্যেক মানবের জীবনেই একটী বিশেষ ভাব আছে। যখন এই বিশেষ ভাব জীবনে প্রকাশিত হয়,—যখন এই বিশেষ ভাবের সম্পূর্ণ অনুগত হইয়া মানব সংসারে আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিতে থাকে, তখনই তাহার জীবনের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়। ইতি পূর্ব্বে মানুষ যে সকল কাজ করে, তাহাতে যে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন হয় না, তাহা নয়, কিন্তু সে সকল কার্য্যে মানুষের জীবনের গূঢ় ভাব ব্যক্ত হয় না। কবিত্বই যাঁহার জীবনের বিশেষত্ব তিনি যদি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়া রাজনীতিতেই আপনার জীবন ঢালিয়া দেন, তবে তাঁহার কার্য্য দ্বারা রাজনৈতিক কল্যাণ না হইতে পারে এমত নয়, কিন্তু তাঁহার জীবনের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ফুটিয়া উঠে না। সেবাই যাঁহার জীবনের বিশেষত্ব তিনি যদি তাহা উপেক্ষা করিয়া দর্শন শাস্ত্রে উন্নতি লাভ করিবার জন্য সমস্ত জীবন তাহাতে ব্যয় করেন, তবে তাঁহার জীবন কখনই উত্তরোত্তর উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু জীবনের বিশেষত্বের মধ্য দিয়া যিনি জগতের সমস্ত ব্যাপারে যোগদান করেন, জগতের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হন, তাঁহার দ্বারাই জগতের প্রকৃত কল্যাণ হয় এবং তিনি নিজেও মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। অনেক সময় সুতীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক দৃষ্টির অভাবে মানুষ আপনাকে চিনিতে পারে না, আপন জীবনের অব্যক্ত বিশেষত্বের আভাস পায় না। সুতরাং মানুষ নানাভাবে সংসারের কাজে হস্তক্ষেপ করে এবং আপনার শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিতে গিয়া জীবনের বিশেষ ভাবকে নষ্ট করিয়া ফেলে।

যাহা জীবনের প্রকৃত আদর্শ তাহার খোঁজ না পাইয়া কাল্পনিক আদর্শানুসারে জীবন চালাইতে গিয়া মানুষ আপনার আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটায়। এই জন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, কত লোক মতের পর মত পরিবর্ত্তন করিতেছে, ভাবের পর ভাব পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু তাহাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না। জ্ঞান প্রেম ও শক্তির কোন উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। এই সকল লোক যদি একবার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সুতীক্ষ্ণ আত্ম-দৃষ্টির সহিত আপনাদের প্রকৃত অবস্থা দেখিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে বুঝিতে পারে যে এখনও তাহাদের জীবনের মর্ম্মস্থানে হাত পড়ে নাই,—এখনও তাঁহাদের জীবনের বিশেষত্ব প্রকাশিত হয় নাই। সংসারে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে কার না ইচ্ছা হয়? বিশেষ বিশেষ শক্তিশালী ব্যক্তিগণ আপনাদের জীবনের বিশেষ ভাব দ্বারা পরিচালিত না হইয়াও সংসারের নিকট সম্মান ও সুখ্যাতি লাভ করিতে না পারেন এমনও নয়, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের জীবনের প্রকৃত কল্যাণ কিছুই হয় না এবং তাঁহাদের কার্য্য দ্বারা কোন স্থায়ী ফল উৎপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে যাঁহারা শান্ত ও সহিষ্ণুভাবে জগতের সমস্ত ঘটনা ও সমস্ত তত্ত্বের ভিতরে জীবনের আদর্শ অন্বেষণ করিতে করিতে যখন তাহা লাভ করিতে সমর্থ হন, তখনই তাঁহারা সেই আদর্শ ধরিয়া অল্পে অল্পে জীবন-পথে চলিতে থাকেন। তাঁহাদের মহত্ত্ব ও দেবভাবের পরিচয় পৃথিবীর লোক না পাইতে পারে—দেশের ইতিহাসে, কবিগণের সঙ্গীতে তাঁহাদের জীবনের সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব গীত না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের নিত্য সহচর বন্ধুগণ ও পরমাত্মীয় ব্যক্তিগণের হৃদয়ে তাঁহাদের সিংহাসন চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাঁহাদের পবিত্র স্মৃতি সেই সকল হৃদয় হইতে কখনই উঠিয়া যায় না। এই শ্রেণীর লোকেরা জনসমাজের নেতা বলিয়া পূজিত হন না বটে, কিন্তু যাঁহারা জন সমাজের নেতা বলিয়া গৃহীত ও

পরিচিত হন, সেই সকল লোকের জীবন এই সকল ব্যক্তিগণের দ্বারাই গঠিত হইয়া থাকে। দিব্যজ্ঞানালোক পাইয়া যাঁহাদের মোহান্ধকার ঘুচিয়াছে, দিব্য প্রেমালোক পাইয়া যাঁহাদের চিত্ত-বিকার দূরীভূত হইয়াছে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি লাভ করিয়া যাঁহারা অসার হইতে সারকে, অনিত্য হইতে নিত্যকে এবং অমঙ্গল হইতে মঙ্গলকে চিনিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই উপরোক্ত সারবান, আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিগণকে চিনিতে পারেন—তাঁহারাই সেই সকল লোকের সম্মান করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন।

উদ্ধৃত।

সত্যের লক্ষণ।

সত্যে কোন ভেজ থাকিতে পারে না। ভ্রমের সহিত সত্যের কোন সম্বন্ধ নাই। ঐশী ব্যবস্থা সমুদায়ই সত্যে পরিপূর্ণ। সত্যের এক অর্থ উত্তমতা; ইহা দ্বারা মানবের সমূহ মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। ভ্রমেতেই মনুষ্যকুল দিন দিন অসৎ হইয়া পড়ে। এ নিমিত্ত ইহার প্রকৃত অর্থ জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। সত্যান্বেষণ না করিলে অজ্ঞানতার করাল গ্রাস কেহই এড়াইতে পারিবে না। ইহা অন্বেষণ করা সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য। যাহারা সরল মনে ইহার অন্বেষণ করে, তাহারা উদ্দেশ পায়। নৈতিক সত্য সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, সত্যের কতকগুলি লক্ষণ আছে, যদ্দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যান্বেষু এই লক্ষণগুলি দ্বারা প্রকৃত ধর্ম্মের তথ্য বুঝিতে পারিবে।

১। সত্য এক। কতকগুলি অসংলগ্ন সত্য দ্বারা তালি দেওয়া নয়। সত্য গোটা। প্রকৃত ধর্ম্মের সহিত ইহার অখণ্ড সম্বন্ধ স্থাপিত আছে। যদিও প্রাকৃতিক ও নৈতিক জগৎ বিভিন্ন, তথাচ উভয় জগতের সত্যের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। আবার এই সত্য গুলির সঙ্গে প্রকৃত ধর্ম্মের নিকট সম্বন্ধ আছে। জাগতিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত সত্যগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। সকল দেশে ও সকল জাতির মধ্যে সত্য এক। সত্যের কোন বৈলক্ষণ্য নাই। য়ুরোপে যে সত্যের আদর, ভারতেও তাহারই আদর। ইংরাজ যাহা সত্য বলিয়া থাকেন, ভারতবাসী ও চীনও তাহা সত্য বলেন। গণিত, জ্যোতির্বি শাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার যে সত্যের য়ুরোপে আদর, ভারতেও তাহারই আদর। নৈতিক সত্যের বিষয়েও এই একই কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু যদি এক প্রকার নীতিশিক্ষা এ দেশেও অন্য প্রকার শিক্ষা অন্য দেশে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, দুইয়ের মধ্যে একটি ভ্রমসঙ্কুল। এ কথা স্বীকার্য্য যে, সমস্ত সত্যই এক। সত্য সকল পরস্পর সাহায্য-সাপেক্ষ, যাহা সত্য, তাহার সঙ্গে অপর সত্যের মেল থাকে।

২। সত্য যুক্তিসঙ্গত। সত্য আপনার প্রতিবাদ আপনি কখন করিতে পারে না। যদি দুইটি শিক্ষা পরস্পর বিরোধী হয়, তবে একটি নিশ্চয়ই অলীক, সন্দেহ নাই। একজন যাহা সত্য বলে, অন্য জন তাহা অপলাপ করিতে পারিবে না। এক দেশের সত্য অপর দেশীয় সত্যের শত্রুতাচরণ করিতে পারে না। ভ্রমের একটি ধ্রুব লক্ষণই বিরোধভাব। যদি কোন সাক্ষী কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে তাহার কথার আদ্যোপান্ত মেল থাকিবে। কিন্তু যদি তাহার কথায় অসংলগ্নতা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তবে নিশ্চয় জানা যাইবে যে, তাহার কথার একভাগ সত্য, অপরভাগ মিথ্যা। প্রকৃত ধর্ম্মের সত্যের সঙ্গে জাগতিক সত্যের কদাচ অমেল থাকিতে পারে না। কারণ, সত্যের সম্বন্ধ কিছুতেই বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। যাহা ধর্ম্মে সত্য বলিয়া বিবেচিত, তাহা বিজ্ঞান এবং কারবারেও গ্রহণীয়; যদি কেহ বলে যে, ধর্ম্মের সত্যের সঙ্গে কারবারের সত্যের কোন মেল নাই, তবে সে আপনাকে প্রতারণা করিতেছে। কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি যেমন পরস্পর বিরোধী নয়, সত্য গুলিও তেমনি।

৩। সত্য সাধারণ গুণ। সত্যগুণ সকলেরই থাকিতে পারে। যদি কেহ বলে যে, অমুক সত্য কেবল অমুক শ্রেণীর লোকের পক্ষে সুবিধাজনক, তবে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, তাহার মধ্যে কোন গোলযোগ আছে। সত্য সকলেরই পক্ষে খাটিতে পারে। যাহা সকলের পক্ষে খাটিতে পারে না, তাহা অলীক। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু ও বৃষ্টি সকলেরই উপকারার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু কেহই বলিবে না যে, এগুলি কেবল শ্রেণী বিশেষের কল্যাণকর। গণিতশাস্ত্র, পদার্থ বিদ্যা ও জ্যোতিঃশাস্ত্র সকলেই ইচ্ছা করিলে শিখিতে পারে। এ বিদ্যাগুলি শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া হইতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম্মের সত্য গুলিও সকলেরই ব্যবহারোপযোগী। তাহারা সমভাবে সকলের কাজে আসিতে পারে। তবে, সত্যের এই একটি লক্ষণ যে, তাহা সকলেরই পক্ষে সুবিধাজনক। যদি কোন শাস্ত্র বা ধর্ম্ম শ্রেণী বা দেশবিশেষের একচেটিয়া হয়, তবে তাহা কোন ক্রমে সত্য হইতে পারে না—তাহা ভ্রম-বিমিশ্রিত। সত্য ধর্ম্ম সর্ব্বজনীন—জগতের সকল লোকের পক্ষে খাটিতে পারে।

৪। সত্য কল্যাণকর। মানবজাতির মঙ্গল সাধনার্থ সত্যের উৎপত্তি। কিন্তু ভ্রম অনিষ্টকর। সুরাসেবন অস্বাস্থ্য জনক প্রমাণ হওয়াতে জ্ঞানী মাত্রেই বলিয়া থাকেন যে, তাহা * ব্যবহার করা উচিত নয়। যাহারা তাহা * ব্যবহার করিতেছে, তাহাদের সমূহ ক্ষতি সকলেই দেখিতে পাইতেছে। * এখানে সুরার সহিত ভ্রমের তুলনা দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে, সুখাদ্য, নির্ম্মল জল বিশুদ্ধ বায়ু, আলো প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর। এ গুলি সকলের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত। সত্যের সঙ্গে এ গুলির তুলনা খাটিতে পারে। সত্য দ্বারা ব্যক্তি মাত্রেরই শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। সত্যের কার্য্য সকলের মঙ্গল সাধন করা। মিথ্যা আপাততঃ মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু শেষে যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করিয়া থাকে। যাহা মনুষ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, তাহাই অলীক, কিন্তু যাহা তাহার পক্ষে কল্যাণকর, তাহাই সত্য। সত্যের এইটি বিশেষ লক্ষণ।

চীন দেশে একটী সত্য পাওয়া গেলে, তাহা দ্বারা ভারতবর্ষের মঙ্গল হইতে পারে। যে সত্য দ্বারা ইংলণ্ড আশীর্ব্বাদ ভোগ করিতেছে, তাহা দ্বারা ভারতবর্ষও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইতে

পারে। যে নীতি ও ধর্ম্মশিক্ষা গুণে ইংলণ্ডবাসীগণ উপকৃত হইতেছে, তাহারই গুণে ভারতের লোকেরও মঙ্গল দর্শাইতে পারে, সত্য দ্বারা পাপের গতি হ্রাস হয়। পাপই ভ্রম। পাপ যাবতীয় অমঙ্গলের উৎপাদক।

৫। সত্য সকলই সহ্য করিতে পারে। ইহার কারণ এই যে, তাহা বলবান ও আপনার ক্ষমতা জানিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকে। অসৎ লোক কোন মন্দ দ্রব্য বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলে তাড়াতাড়ি করে। কিন্তু ভাল দ্রব্য—বিক্রেতা তাহার দ্রব্য বিক্রয়ার্থ তত তাড়াতাড়ি করে না। সে জানে যে, তাহার জিনিস পত্র বিক্রীত হইবেই হইবে। একজন আপনার দ্রব্য পরীক্ষা করিতে দেয় না, কিন্তু অন্য জন পরীক্ষা করিতে ক্রেতাকে ডাকিয়া আনে। যাহারা অপরের মত শুনিয়া তাহাকে তাড়না করে, বা তাহার প্রতি রাগ প্রকাশ করে বা অধীর হইয়া উঠে, তাহারা মিথ্যার পৃষ্ঠপূরক। পক্ষান্তরে যাহারা সত্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া আছে, তাহারা ধৈর্য্য পূর্ব্বক অপেক্ষা করিয়া থাকে। সত্য পরীক্ষা ডাকিয়া আনে। সত্যের ভয় নাই। সত্য বিজয়ী। সত্য আলো অন্বেষণ করে, কিন্তু মিথ্যা অন্ধকার ভাল বাসে। সত্য পরীক্ষা করিবার এই একটী লক্ষণ। বিজ্ঞান ও বিদ্যা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে, দিন দিন কতই নূতন নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে। মানব প্রকৃতির পক্ষেও এই একই নিয়ম খাটিতে পারে। সর্ব্বপ্রথমে মনুষ্য সহজ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে, ক্রমশঃ কঠিন কঠিন বিষয়ে শিক্ষিত হইতে থাকে। সত্য যতই আলোচনা করা যায়, ততই তাহার পূর্ণ জ্যোতিঃপ্রকাশ পায়। সত্যের এই একটী লক্ষণ। ভ্রম পরীক্ষকের নিকট আসিতে চায় না। ভ্রম যতই পরীক্ষা করিয়া দেখা যায়, ততই দূষণীয় হইয়া পড়ে। অনেক সময় লোকে মনে করে, যে মত প্রাচীনতম, তাহাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু এ প্রকার বিবেচনা বড়ই দোষাবহ। সত্য বর্দ্ধনশীল। সত্য সর্ব্বদা জয় করিয়া থাকে। সত্য পাওয়া গেলেই তাহা গ্রাহ্য করা উচিত।"

"সত্যের লক্ষণ" নামক উপরোক্ত প্রবন্ধটী আমরা কোন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক বিতরিত হইতে দেখিয়াছিলাম। উক্ত প্রবন্ধটী এমন উদার যে আমরা আমাদিগের পাঠকগণের পাঠের জন্য মুদ্রিত করা বিশেষ প্রয়োজনীয় মনে করিলাম। সকল প্রকার সংকীর্ণতা ঘুচিয়া গিয়া লোকের মন উদার সত্য গ্রহণের কেমন উপযুক্ত হইয়াছে এই প্রবন্ধটী দ্বারা তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় যখন এরূপ উদার সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তখনই সত্যের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইবে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক
মহাশয়-সমীপেষু।

"তত্ত্বকৌমুদীর" গতবারের সংখ্যায় প্রকাশিত "ব্রহ্মবিদ্যালয়"-শীর্ষক প্রাপ্ত প্রবন্ধটী (প্রবন্ধটী প্রেরিত পত্রের স্তম্ভে বাহির হওয়া উচিত ছিল) সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে।

১। ধর্ম্মশিক্ষা দুই প্রকারে দেওয়া যায়—(১) যুক্তি ও বিচার-নিরপেক্ষভাবে (dogmatically) কেবল মত শিক্ষা, (২) যুক্তি ও বিচারের সহিত মত শিক্ষা। দ্বিতীয় প্রকারের শিক্ষাই ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এরূপ শিক্ষাতে ভিন্ন ভিন্ন মত, ব্যাখ্যা ও যুক্তির আলোচনা অপরিহার্য্য, এবং কেবল অপরিহার্য্য নহে, আবশ্যক। এতদ্দ্বারাই চিন্তা ও বিচারশক্তির বিকাশ হয়। চিন্তা ও বিচারশক্তিকে বিকশিত করিয়া স্বাধীনভাবে সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ করা—ইহাই এরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মবিদ্যালয়ে, বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে, এরূপ শিক্ষা দেওয়াই আবশ্যক। জড়বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ব্রহ্মবিদ্যা প্রভৃতি যে সকল বিদ্যার সঙ্গে যুক্তি ও বিচারের সম্বন্ধ আছে, সে সমস্তই এই প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, এবং কেবল এই প্রণালীতেই শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে।

২। প্রবন্ধ-লেখকের ইচ্ছা যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে কেবল এরূপ পুস্তকই পড়ান হয় যাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। এরূপ পুস্তক ২।৪ খানার নাম করিলে ভাল হইত। প্রবন্ধ-লেখক "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ২য় ভাগ" ও "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"কে সর্ব্ববাদী-সম্মত নয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; আমি ত জানি আমাদের নির্দ্দিষ্ট কোন পুস্তকই সর্ব্ববাদী-সম্মত নহে। সর্ব্ববাদীসম্মত পুস্তক খুঁজিয়া পাইলাম না। পাওয়া বড় সম্ভবও নহে। কোন্ পুস্তক সর্ব্ববাদীসম্মত তাহা কিরূপে জানা যাইবে? আমি এই বুঝি যে পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য-বিরোধী মত না থাকিলেই হইল। মূল বিষয়ে ঐক্য থাকিলে অবান্তর মত, যুক্তি ও ব্যাখ্যার ভিন্নতায় ও অনৈক্যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

৩। "ধর্ম্মশিক্ষা" ও "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ১ম ভাগ এবং "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র মধ্যে অনৈক্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখক যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটী অতি গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন। প্রথমতঃ, লেখক বলিয়াছেন—"ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সহজ জ্ঞানকে অনেক স্থানে অজ্ঞানতার নামান্তর মাত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সহজজ্ঞান সম্বন্ধে উক্ত পুস্তকে বিশেষ অনাস্থাই প্রকাশিত হইয়াছে।" এখন দেখা যাক্ ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে কি বলা হইয়াছে। পুস্তকের মুখবন্ধে দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই সহজ জ্ঞানের প্রচলিত অসন্তোষকর ব্যাখ্যার দোষ প্রদর্শন করিয়া তৎপর বলা হইয়াছে—"আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যে বিশ্বাস করি। কিন্তু মনে করি যে এই সকল যে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, ইহা বলিলেই ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ইহা দেখান আবশ্যক যে এই সকল সত্য অস্বীকার করিতে গেলে আমাদিগকে স্ববিরোধিতা (self-contradiction) দোষে দোষী হইতে হয়, অথবা দেখাইতে হইবে যে এই সকল সত্য জ্ঞানের ভিত্তিরূপে অবস্থিত, ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কোন জ্ঞানই সম্ভব নহে। এরূপ অকাট্য প্রমাণ দ্বারা এই সকল সত্যের অনতিক্রমনীয়তা না দেখাইয়া ইহাদিগকে আত্মপ্রত্যয়ই বল,

আর সহজজ্ঞানলব্ধ স্বাভাবিক সত্যই বল, কিছুতেই সন্দেহ-পীড়িত জ্ঞান-পিপাসু আত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। এই পুস্তকে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মূলীভূত মূলতত্ত্ব সমূহের মৌলিকতা ও অনতিক্রমনীয়তা একটু বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।" তৎপর পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায়েই উপরোক্ত প্রণালীতে কতক গুলি মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এখন পাঠক বিচার করিবেন প্রবন্ধ লেখকের উপরোক্ত দোষারোপ কত দূর সত্য-মূলক। অনেকে যে-কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসকে "সহজ জ্ঞান" বলিয়া চালাইয়া দেন, এই ভ্রমের বিষয় বলিতে গিয়া "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র ৪৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে—"আশা করি এই সমুদায় তত্ত্ব জানার পর পাঠক আর 'সহজ জ্ঞান' কথাটা লইয়া বাড়াবাড়ি করিবেন না। 'সহজ জ্ঞান' অনেক স্থলেই অজ্ঞানতার নামান্তর মাত্র"। এই উক্তির অর্থ কি, পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। প্রবন্ধ-লেখক বোধ হয় ইহা পড়িয়াই এই মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছেন যে, "ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সহজ জ্ঞানকে অনেক স্থানে অজ্ঞানতার নামান্তর মাত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে"!! ব্রহ্মজিজ্ঞাসার "অনেক স্থানে" দূরে থাক্, এক স্থানেও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মূলতত্ত্ব সমূহকে অজ্ঞানতার নামান্তরমাত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহা লেখক দেখাইয়া দিতে পারিলে তাঁহার নিকট একান্ত বাধিত হইব। দ্বিতীয়তঃ লেখক বলিয়াছেন—"ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ১ম ভাগে সৃষ্টি-কৌশল দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হইয়াছে—ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় তাহাতে দোষারোপ করা হইয়াছে।" এই "দোষারোপ"টা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোথায় আছে, আমি খুজিয়া পাইলাম না। যদি কোথাও কিছু বলা হইয়া থাকে, তাহা এই মর্ম্মেই বলা হইয়া থাকিবে যে সৃষ্টিকৌশলের যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অসীমতা ও একত্ব সপ্রমাণ হয় না, এই যুক্তি অসম্পূর্ণ। রাজনারায়ণ বাবুও "ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা"য় এই কথা বলিয়াছেন। দর্শনবিৎ মাত্রই ইহা জানেন। "ধর্ম্মশিক্ষা" ও "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ১ম ভাগে গভীর দার্শনিক আলোচনা তাদৃশ নাই, এই পুস্তকদ্বয় সাধারণ পাঠকের উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে; হয়ত এই জন্যই এই পুস্তকদ্বয়ে এই কথার উল্লেখ নাই। তৃতীয়তঃ, প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন, —"ধর্ম্মশিক্ষায় মনুষ্যের আত্মাকে সীমাবিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় ইহার বিরোধীমত ব্যক্ত হইয়াছে এবং আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে।" ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোন্ স্থানে মনুষ্যের আত্মাকে—মনুষ্যের জ্ঞান, প্রীতি ও শক্তিকে —অসীম বলা হইয়াছে, ইহা দেখাইয়া দিলে বাধিত হইতাম। আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব সম্বন্ধে "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"র ১২৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে,—"প্রত্যেকের মন ভিন্ন ভিন্ন, এক মনের অনুভব আর এক মনের অনুভব নহে, এক মনের স্মৃতি আর এক মনের স্মৃতি নহে, এক মনের কার্য্য আর এক মনের কার্য্য নহে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জগতের এই অসংখ্য বিচিত্রতা অস্বীকার করা আমাদের অভিপ্রায় নহে; ইহা অস্বীকার করা কেবল নিতান্ত নির্ব্বোধ বা অন্ধ লোকের পক্ষেই সম্ভব।" তৎপরে, এই ভিন্নতার মধ্যেও যে একত্ব আছে,—ঈশ্বর সকলের প্রাণস্বরূপ হইয়া যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ ঘটাইতেছেন, এই সত্যের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যা দেখিয়াই বোধ হয় প্রবন্ধ-লেখকের উপরোক্ত ভ্রম হইয়াছে। চতুর্থতঃ, প্রবন্ধ-লেখক বলিয়াছেন,— "ধর্ম্মশিক্ষাদি পুস্তকে দ্বৈতবাদের মতই সমর্থিত হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় তাহার পরিবর্ত্তে প্রকারান্তরে অদ্বৈতবাদের মতকেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে এবং দ্বৈতাদ্বৈত নামক নূতন মতের সৃষ্টি করা হইয়াছে।" ইহাও প্রবন্ধ-লেখকের নিজের কথা। যাহা বিষয় ও সসীমকে মায়া-কল্পিত বলিয়া ব্যাখ্যা করে এবং কেবল বিষয়ী ও অসীমকেই সত্যবলে, যাহা বিষয় ও বিষয়ী এবং সসীম ও অসীমের প্রভেদ অস্বীকার করে, সংক্ষেপতঃ যাহা জগতের দ্বৈতভাবকে ভ্রম-মূলক বলে, তাহাকেই অদ্বৈতবাদ বলা যায়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় এই অদ্বৈতবাদকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা দূরে থাক্, বরং প্রত্যেক অধ্যায়েই বিবিধ প্রকারে ইহার ভ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং "দ্বৈতাদ্বৈত-বিবেক" নামক তৃতীয়াধ্যায়ে এই সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে। এই অধ্যায় হইতে (১৩২ পৃ) একটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি,— "প্রচলিত অদ্বৈতবাদ, যাহা জ্ঞানের চিরন্তন দ্বৈতভাব স্বীকার করে না, ইহাকেও প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মবাদ বলা যাইতে পারে না। এই অদ্বৈতবাদ ব্রহ্মকে নির্ব্বিষয় বিষয়ী, অনিত্যের সহিত সম্বন্ধ-রহিত নিত্যবস্তু এবং সসীমের সহিত সম্বন্ধ-রহিত অসীম বলিয়া ব্যাখ্যা করে। ইহা মায়াবাদে অন্ধ হইয়া বিষয়, পরিবর্ত্তন ও সীমার প্রকৃতত্ত্ব অস্বীকার করে। প্রচলিত অদ্বৈতবাদ এই সমুদায়ের প্রকৃতত্ত্ব অস্বীকার করিতে গিয়া ইহার ব্রহ্মকেও অর্থহীন করিয়া ফেলে। যিনি বিষয়, ঘটনা ও সসীমের সহিত নির্লিপ্ত, অর্থাৎ যাঁহার সহিত বিষয়, ঘটনা ও সসীমের কোন অপরিহার্য্য অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই, এরূপ ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলার কোন অর্থই নাই। ব্রহ্ম বলিতে আমরা এমন একটী মহান্ বস্তুকে বুঝি যিনি বিষয়, ঘটনা ও সসীমের সহিত অচ্ছেদ্য যোগে আবদ্ধ, অথচ যিনি বিষয়, ঘটনা ও সসীম হইতে ভিন্ন (distinguishable)।" উক্ত "অচ্ছেদ্য যোগে"র যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে,—ব্রহ্মের সহিত জগৎ ও জীবের প্রভেদ সত্ত্বেও জগৎ ও জীব যে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে, এই সত্যের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, এই ব্যাখ্যাকেই প্রবন্ধ লেখক "অদ্বৈত মতকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান" বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকিবেন। তারপর প্রবন্ধ-লেখক যে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় "দ্বৈতাদ্বৈত নামক নূতন মতের সৃষ্টি করা হইয়াছে," তাহাও যথার্থ নহে। এই মত ও এই নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সৃষ্ট হয় নাই। ভারতবর্ষে অনেককাল অবধি এই মত ও নাম প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মসমাজেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-লেখকের পূর্ব্বেই শ্রদ্ধাস্পদ বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়দ্বয় এই মত প্রচার করিয়াছেন, এবং এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ই এই কথার উল্লেখ আছে। তবে ভিন্ন ভিন্ন লেখকের ব্যাখ্যা ও যুক্তিপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমার এই বিষয়ে কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল না, নিতান্ত বাধ্য হইয়া লিখিলাম। প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের প্রতি বিনীত

নিবেদন, এই যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংশোধন ও উপকার করাই যদি তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কমিটির সমক্ষে তাঁহার মন্তব্য উপস্থিত করিলেই ভাল হয়। তাহাতে বক্তব্য বিষয়ের সমুচিত বিচার না হইলে পরে প্রকাশ্য পত্রে আলোচনা করিতে পারেন। আর যদি কোন পুস্তক বা মত বিশেষের প্রকাশ্য আলোচনাই তাঁহার অভিপ্রায় হয়, তবে প্রকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে তাহাতেই প্রবৃত্ত হউন্। আর একটী কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। তাহা এই যে আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ তত্ব অবগত না হইয়া এবং সমুদায় দিক না দেখিয়া লিখিলে বার বারই উপরোক্ত প্রকার গুরুতর ভ্রম হইবার সম্ভাবনা।

অনুগত
শ্রীসীতানাথ দত্ত
ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপে—

মহাশয়,

সম্প্রতি ডেলিনিউস পত্রে অবগত হওয়া গেল, ইউনাইটেড-ষ্টেটের অন্তর্গত নিভাস্কোসিয়াতে রেভারেণ্ড এ ডবলিউ ক্রফট ফরেষ্ট, সকল প্রকার খ্রীষ্ট সম্প্রদায়দিগকে সদ্‌ভাবে মিলিত করিবার নিমিত্ত 'খ্রীষ্টীয়ান ইউনিটি লিগ' নামে একটি সভা সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, সন্তোষের বিষয় যে সে সভাতে ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে লইবার চেষ্টা হইতেছে, সেই সভার সভ্যদিগকে এই ভাবে অঙ্গীকার করিতে হইবে যে কেহ বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবেন না ও সকল ধর্ম্মের মধ্য হইতে সত্য গ্রহণ করিবেন। আমরা রেভারেণ্ড ক্রফট ফরেষ্টের এই সদিচ্ছার সহিত সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি। ঈশ্বর করুন তাঁহার এই সুভ সংকল্প ও শুভ চেষ্টা সফল হউক।

পূর্ব্বে পৃথিবীর আর কয়েকটি স্থানে ঐরূপ সভা সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিছু দিন তাহার কার্য্য চলিয়া এক্ষণে তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার কার্য্য অনেকের অন্তরে জীবিত আছে। বোধ, হয় এই রূপ উদার সভার প্রথম সংস্থাপক বরাহনগর নিবাসী বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বরাহনগরে 'সাধারণ ধর্ম্ম সভা' নামে এক নূতন ধর্ম্ম সভা প্রতিষ্ঠিত করেন, এই সাধারণ ধর্ম্ম সভাতে সকল ধর্ম্মের সর্ব্ববাদী-সম্মত সাধারণ সত্য তত্ব সকল বিবৃত হইত, যাহাতে সকলে ভ্রাতৃভাবে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে পারেন, যাহাতে সকল নরনারী একতা-সূত্রে মিলিত হইতে পারেন, তাহাই উক্ত সভার উদ্দেশ্য ছিল, এই উদ্দেশ্য তিনি অনেকটা সফল করিয়াছিলেন। এই সভায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টীয়ান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা স্ব স্ব ধর্ম্মের সাধারণ অমূল্য সত্য সকল অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করিতেন। কেহ কোন সম্প্রদায়কে আক্রমণ বা কোন প্রকার মতের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন কি কোন ধর্ম্মের নিন্দা করিতে পারিতেন না। এই সভার অধিবেশনে, মৌলবী সাহেব মুসলমান ধর্ম্মের সার বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন, পাদরি সাহেব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মতত্বের উপদেশ দিতেন, ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতেন, এই সভার প্রতি অধিবেশনেই বহু সংখ্যক মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান, হিন্দু যখন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব বিস্মৃত হইয়া সভাস্থলে সমবেত হইতেন, তখন সভা এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিত। এই সাধারণ ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছু দিন পরে বিলাতে ঐরূপ একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নববিধান ধর্ম্ম প্রচার করেন, কেশব বাবু সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগকে একত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ধার্ম্মিকদিগকে গ্রহণ করিতে সম্মত ছিলেন না। লোকের অভাবে কএক বৎসর পরে সাধারণ ধর্ম্মসভা সত্তাহীন হইয়াছে। ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে কত ভীষণ লোম হর্ষণ কাণ্ড হইয়াছে, এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের শরীরের রক্তে নিজ বিদ্বেষানল নির্ব্বাপিত করিয়াছেন; এখন আর সে দিন নাই, জগৎ যেরূপ দিন দিন উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে নিশ্চয়ই আশা করা যাইতে পারে যে এই উদার ধর্ম্মমত এক সময়ে ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে।

কাশীপুর
৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৯০।

শ্রীপঞ্চানন শিরোরত্ন

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্ম-ছাত্রীনিবাস—ব্রাহ্ম-বালিকাদিগের জন্য একটী বোর্ডিং স্কুল বা বিদ্যালয় সহ ছাত্রীনিবাস স্থাপনার্থ কয়েক বৎসর ধরিয়া আন্দোলন চলিতেছে। বর্ষে বর্ষে মাঘোৎসবের সময় নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ সমবেত হইয়া ইহার আবশ্যকতা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। গত মাঘোৎসবে ব্রাহ্মসাধারণ এ বিষয়টী সত্বর কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে একান্ত অনুরোধ করেন। বিশেষতঃ মফস্বলে অনেক সামান্য অবস্থার ব্রাহ্মগণ একা একা পরিবার লইয়া দূরে দূরে বাস করিয়া থাকেন, বয়স্থা কন্যাগণকে লইয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইয়া থাকেন এবং উপায়াভাবে তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন না, ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের সমূহ অকল্যাণের সম্ভাবনা।

কার্য্যনির্ব্বাহক সভা উপরি উক্ত বিষয়গুলি বিশেষরূপে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া একটী ব্রাহ্ম-বালিকা-বিদ্যালয় ও তৎসঙ্গে ছাত্রীনিবাস স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন। ব্রাহ্ম বালিকাদিগের জন্য ইতিপূর্ব্বে একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু ছাত্রীনিবাস স্থাপিত না হইলে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মদিগের অসুবিধা দূর হইতেছে না। এই অনুষ্ঠানটী নিতান্ত আবশ্যক হইলেও একটী গুরুতর ব্যাপার। ইহা যেরূপ ব্যয়সাধ্য, সেইরূপ দায়িত্বপূর্ণ। যাহা হউক সমাজের একটী মহৎ অভাব মোচন হইবে এই ভাবিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এ বিষয়েরও উদ্যোগী হইয়াছেন। আগামী ১লা অক্টোবর হইতে ব্রাহ্মছাত্রী-নিবাসের কার্য্যারম্ভ হইবে এরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বিদ্যালয়ের বেতন সমেত মাসিক ১১।৹ টাকা করিয়া প্রত্যেক বালিকার জন্য গ্রহণ করা হইবে। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসাধারণের, বিশেষতঃ মফস্বলবাসী ব্রাহ্মগণের সাহানুভূতি ও সহায়তা নিতান্ত আবশ্যক। আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ এই

কার্য্যে উপযুক্তরূপ সহায়তা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের একটী প্রধান অভাব মোচনের সহায়তা করিবেন। ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের নিকট ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তত্ত্ব করিলে সবিশেষ অবগত হওয়া যাইবে।

ব্রাহ্মসংখ্যা গণনা—ব্রাহ্মগণ নানা স্থানে বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। এ অবস্থায় তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় সংবাদ যুক্ত একটি তালিকা কাছে থাকিলে অনেক সময় বিশেষ উপকার হইবার সম্ভাবনা। দূরে দূরে থাকিয়াও পরস্পরের সহিত কোনও রূপ যোগ রাখিতে হইলে এই উপায় দ্বারা অনেক সাহায্য হইতে পারে। এই সকল উদ্দেশ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ১৮৮০ সনের নবেম্বর মাসে এক বার ব্রাহ্ম-সংখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে নানা কারণে ব্রাহ্মগণ এই কার্য্যে যথোচিত রূপে সাহায্য না করায় গণনা কার্য্য আশানুরূপ হয় নাই। ১০|১১ বৎসর চলিয়া গেল, এজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এবৎসর পুনরায় ব্রাহ্মসংখ্যা গণনা করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। আগামী ১৫ই অক্টোবর (৩০এ আশ্বিন) ব্রাহ্মগণের সংখ্যা গণনার দিন স্থির হইয়াছে এবং এ নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজ সকলে সংখ্যা গ্রহণের ফারমও প্রেরিত হইয়াছে। আশা করি ব্রাহ্মগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত সময়ে ফারম পূর্ণ করিয়া পাঠাইবেন। এমন অনেক স্থান আছে যেথানে ব্রাহ্মগণ অবস্থিতি করিতেছেন অথচ সে সকল স্থানে ব্রাহ্মসমাজ নাই। এরূপ স্থলে যদি উক্ত ফারম না যায়, তবে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের কার্য্যালয়ে পত্র লিখিলেই ফারম পাইতে পারিবেন। এই গণনায় আদিব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজস্থ ব্রাহ্মগণের সংখ্যাও গ্রহণ করা বিশেষ প্রার্থনীয়। যদি এই সময়ে ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখাস্থ ব্রাহ্মগণ সমবেত ভাবে এই কার্য্যে সহায়তা করেন, তাহা হইলেই কার্য্যটী সুন্দর রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। আশা করি ব্রাহ্মমাত্রেই এই কার্য্যে সাহায্য করিতে বিশেষ যত্ন করিবেন।

শ্রাদ্ধ—আমরা গতবারে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের পরলোকগমনের সংবাদ প্রদান করিয়াছি। গত ২২এ ভাদ্র শনিবার তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশেষ ভাবে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার সন্তানগণ ও সহধর্ম্মিনীর প্রাণে সান্ত্বনা আনয়ন করুন। এবং তাঁহাকে অনন্ত কুশলে রক্ষা করুন এই প্রার্থনা।

নামকরণ—গত ২৫এ ভাদ্র মঙ্গলবার শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যার নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। কন্যার নাম "পুণ্যলতা" রাখা হইয়াছে। উপেন্দ্র বাবু এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ের ছাত্র ও ছাত্রীগণকে মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্বারা জলযোগ করাইয়াছিলেন।

অপ্রিয় সংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রচারক পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পদত্যাগ পত্র পাইয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিশেষভাবে তাঁহার পত্র প্রতিগ্রহণের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনক্রমেই তাঁহার পত্র প্রত্যাহার করিলেন না। এজন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অঘোর বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত সকল প্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, সে সংবাদ তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশের জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, অনাবশ্যক বোধে সে পত্র তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত হইল না।

তত্ত্বকৌমুদীর মূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মার্চ্চ হইতে এপ্রিল—১৮৯০।

নাম	স্থান	টাকা
বাবু সীতানাথ দত্ত,	কলিকাতা	২॥০
„ বিহারীলাল গুহ,	ঐ	২৸০
„ যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	ঐ	৩৵৫
„ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,	ঐ	৩৲
শ্রীমতী যোগেন্দ্র মোহিনী চট্টোপাধ্যায়,	কালনা	১৲
সম্পাদক পঞ্চসার জ্ঞানদায়িনী সভা		৩।০
বাবু গোবিন্দচন্দ্র মিত্র,	সাড়েয়া গ্রাম	৬৲
সম্পাদক ব্রাহ্মসমাজ,	নোয়াখালি	২৸৶০
শ্রীমতী শান্তমণি দাসী;	হাওড়া	৩৲
বাবু গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার		৪৸৶০
সম্পাদক পূর্ব্বপাড়া ব্রাহ্মসমাজ		১৲
বাবু ভোলানাথ সরকার,	মানভূম	১॥০
বাবু দুর্গাকুমার বসু,	শ্রীহট্ট	৩৲
বাবু জয়নারায়ণ সরকার,	রঘুনাথপুর	৬৲
„ রাধাগোবিন্দ রায়,	করচমারিয়া	১৩৲
„ রজনীকান্ত বর্দ্ধন,	শ্রীহট্ট	৩৲
শ্রীমতী চঞ্চলা ঘোষ,	সুখচর	৩৲
বাবু কৈলাসচন্দ্র প্রধান,	বামনঘাটি	১॥০
„ হেমচন্দ্র দাস,	হাওড়া	৩৸৶০
„ শিবচন্দ্র দেব,	কোন্নগর	৩৲
„ দ্বারকানাথ ঘোষ,	কলিকাতা	১৲
সম্পাদক মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ		৩৲
বাবু ত্রিপুরাচরণ রায়,	রাঁচি	৩৲
„ বটকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,	কলিকাতা	১।০
„ উপেন্দ্রনাথ সাহু,	ধানকুড়িয়া	৩৲
„ কালীপ্রসন্ন বসু,	কলিকাতা	২॥০
„ রাজকুমার সেন,	চৌদ্দগ্রাম	৩৲
„ গোলোকচন্দ্র দত্ত,	খান্দারঘাট	৬৲
„ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,	মকিমপুর	৭।০

(ক্রমশঃ)

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৩রা আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ৫ঠা আশ্বিন প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
১২শ সংখ্যা।

১৬ই আশ্বিন বুধবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥•
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵•

মরিব কঠিন তব মুষ্টির মাঝার।

কাড়িয়া নিয়াছ দেব যদি একবার
এ হৃদয়, কভু যেন ছাড়িও না আর।
যদি কেহ নিতে চায়, লইতে না দিও তায়,
ধরিতে ছুঁইতে নাহি দিও অধিকার।
দাসত্ব শৃঙ্খল দিয়া বেঁধেছ বিদ্রোহি হিয়া
চূর্ণ করিয়াছ যদি এত অহঙ্কার,
তবে কাছে কাছে থাক, সদা চোখে চোখে রাখ,
সতত বন্দীর মত কর ব্যবহার।
কলুষ-বারণ পদে রাখ চির নিরাপদে
কত ভয় বিপদেতে পূর্ণ এ সংসার;
পাপ পঙ্কে নামি নামি মরিতে চাহি না আমি
মরিব কঠিন তব মুষ্টির মাঝার।

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর—আমরা তোমার অপর সন্তানের দোষ ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া যেরূপ তীব্র সমালোচনার সহিত তাহার নিন্দা করি—যেরূপ ঘৃণার সহিত তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে ব্যস্ত হই এবং তাহাকে যাদৃশ কঠোর শাসনে শাসিত করিবার জন্য ব্যস্ত হই—তুমি যদি তাহার তুলনায় অতি সামান্যরূপেও আমাদের দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়া বিরক্ত হইতে এবং আমাদিগকে ঘৃণার সহিত পরিত্যাগ করিতে, তাহা হইলে আর আমাদের কোন আশা ভরসাই থাকিত না। আমাদের অপরাধ শত শত—মানুষ আর তাহার কয়টীর সংবাদ রাখে? তোমার সর্ব্বদর্শী দৃষ্টির নিকটে আমাদের যে সকল অপরাধের সংবাদ নিয়ত যাইতেছে, তুমি যদি সেই পরিমাণে আমাদিগের উপর বিরক্ত হও তবে কি আর আমাদের রক্ষা থাকে। তুমি শাসন না কর এমন নয়, কিন্তু পরিত্যাগ করিবার কোন লক্ষণই সেই শাসনের ভিতর থাকে না। তুমি চির-আশ্রয় হইয়াই আমাদিগকে শাসন করিতেছ এবং নিরন্তর কুশল সাধনই তোমার শাসনের একমাত্র উদ্দেশ্য। প্রভু! তুমি পবিত্র স্বরূপ হইয়াও যখন আমাদের অপরাধের জন্য কখনই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা কর না বা আমাদের প্রতি তোমার ঘৃণা প্রকাশ কর না, তখন আমরা কে যে এমন স্পর্দ্ধার সহিত অপরের দোষের সমালোচনা করিতেছি এবং কঠোর মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক তাহার বিচারক হইয়া অযথা আস্ফালন করিতেছি। কোন অপরাধীর অপরাধের কথা উল্লেখ করিয়া আমরা যেরূপ আচরণ করিয়া থাকি, তাহা নিরন্তর অপরাধযুক্ত এই দুর্ব্বলদিগের পক্ষে কোন রূপেই শোভা পায় না। পরমেশ্বর তুমি আমাদিগকে আত্মদৃষ্টিপরায়ণ কর, এবং নিজের দোষ দুর্ব্বলতার জন্য আমরা তোমার নিকট যেরূপ ক্ষমা চাহিয়া থাকি—অপরের দোষ দুর্ব্বলতা দেখিয়াও যেন আমরা সর্ব্বদা স্নেহ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার মঙ্গলপ্রার্থী হইয়া ক্ষমাশীল হইতে পারি। তাহা হইলে আমরা তোমার আশীর্ব্বাদ লাভের উপযুক্ত হইব। তোমার প্রেমময় সহবাসে থাকিবার উপযুক্ততা লাভ করিব। প্রভু তুমি আমাদিগকে সুমতি প্রদান কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সৎসঙ্গ—যে রমণীয় পুষ্পোদ্যান নিরন্তর নানা পুষ্পাগত সুরভিতে পরিপূর্ণ—যেখানকার আকাশ সুগন্ধযুক্ত বায়ু সঞ্চালনে নিরন্তর আমোদিত, এমন সুগন্ধি পরিপূর্ণ স্থানে যাহার নিত্য বাস, সে সৌরভ যে সর্ব্বদাই তাহার নাসিকাকে তৃপ্ত করে এমন নয়। তাহার নাসিকা কিছুকাল পরে আর সে সৌরভ আঘ্রাণে সমর্থ হয় না। তখন সেই সৌরভ থাকা না থাকা তাহার পক্ষে দুই সমান হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সেই উদ্যানের পার্শ্ব দিয়া হঠাৎ গমন করে, উদ্যানের চিত্তমুগ্ধকর সৌরভের আঘ্রাণে সে কেমন পুলকিত হয়? উদ্যানবাসীকে সে কতই সুখী মনে করে—তাহার অবস্থা পাইতে কতই আকাঙ্ক্ষা করে। এইরূপ নিরন্তর সাধুসঙ্গে যাহার বাস সে ব্যক্তিও কিছুদিন পরে তাহার সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য সর্ব্বদা তেমন অনুভব করিতে পারে না। তাহার নিকট সে সকল পুরাতন হইয়া যায়। সৎসঙ্গের প্রভাব তাহার চরিত্রের উপর অলক্ষিতভাবে কেমন কার্য্য করে তাহাও সে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু সেই সৎসঙ্গে নবাগত ব্যক্তির কত আনন্দ? সে সেই স্থানকে কেমন

প্রার্থনীয় মনে করে। তাহাতে অবস্থিতি করিতে পারিলে আপনাকে কিরূপ কৃতার্থ বোধ করে। আবার যদি সেই উদ্যানবাসীকে ঘটনাক্রমে দুর্গন্ধময় স্থানে যাইতে হয়, তখন তাহার কিরূপ যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বস্থানে যাইবার জন্য সে কেমন ব্যাকুল হয়? যতক্ষণ উক্ত দুর্গন্ধময় স্থান পরিত্যাগ করিতে না পারে, তাহার যেন মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হয় এবং যেমন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব-আবাসে সমাগত হয়, অমনি তাহার প্রাণ আপনাপনি বলিয়া উঠে আঃ বাঁচিলাম। তেমনি নিরন্তর সৎসঙ্গে বাসের মাধুর্য্য প্রাণে সর্ব্বদা অনুভূত না হইলেও তাহা কত কল্যাণকর—তাহা অজ্ঞাতসারে প্রাণের কিরূপ স্বাস্থ্য সম্পাদন করে, তাহা ঘটনাক্রমে অসৎসঙ্গে উপস্থিত হইলে বুঝিতে পারা যায়। তখন প্রাণ যেন ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠে হায়! এ কোথায় আসিলাম। সে তখন যেন মৃত্যু যন্ত্রণানুভব করে। আবার সেই সৎসঙ্গে যাইবার জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশের সহিত এবং যতক্ষণ তাহা না পায় ততক্ষণ অস্থির হইয়া সময় কাটায়। সঙ্গ আমাদের সবই সহ্য করিতে শিক্ষা প্রদান করে। সুসঙ্গ আমাদিগকে সুশিক্ষা দেয়, কুসঙ্গ আমাদিগকে কুশিক্ষা দেয়। সর্ব্বদা বাসের জন্য তাহার ইষ্টানিষ্ট প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতে না পারিলেও স্থানচ্যুতিতে বুঝা যায় কাহার কি প্রভাব। এজন্য সৎসঙ্গ প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের প্রাণকে বিশেষ শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ না হইলেও তাহাই আমাদের কল্যাণের এক মাত্র উপায়। তাহার প্রভাব প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রাণে অনুভূত না হইলেও তাহা আমাদিগকে অজ্ঞাতসারে স্বাস্থ্য ও কল্যাণের দিকে লইয়া যায়। সুতরাং সুসঙ্গে বাস করিবার সুবিধা পাওয়া প্রত্যেক আত্মার পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের কারণ। এরূপ সুবিধা লাভের জন্য আমাদের সকলেরই ব্যস্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র—কোন গ্রন্থবিশেষকে অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করিলে মানবাত্মার সমূহ অকল্যাণ হয়। তদ্দ্বারা আত্মাকে সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ করে। তাহাকে বিচার-বিমুখ করিয়া, অসত্য জ্ঞানে সত্য গ্রহণে বিমুখ করে। আবার সত্য জ্ঞানে অসত্যকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করে। আপন অবলম্বিত গ্রন্থ ভিন্ন আর কোথাও যে সত্য থাকিতে পারে এ জ্ঞান তাহার থাকে না, সুতরাং জ্ঞানার্জ্জনের ও সত্য গ্রহণের উৎকৃষ্ট পন্থা হইতে সে বিচ্যুত হয়। ঈশ্বরের সত্য উন্মুক্ত বাতাসের ন্যায় সর্ব্বত্র অবাধে বিচরণ করিতেছে। চক্ষুষ্মান লোকে তাহা অতি সহজেই গ্রহণ করিতে পারে। আর অনুদার শাস্ত্র বিশেষে আবদ্ধ ব্যক্তি আপন চক্ষু সেই শাস্ত্রাবরণে অবরুদ্ধ করিয়া কিছুই জানিতে পারে না—দিবালোকে প্রকাশিত বস্তু সকলের ন্যায় উজ্জ্বল সত্য সমূহও দেখিতে পায় না। অথবা দেখিয়াও শাস্ত্রানুরোধে তাহা গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। সে মনে করে সত্য যাহা কিছু তাহার অবলম্বিত গ্রন্থেই আছে। তদতিরিক্ত গ্রহণযোগ্য বা আত্মার কল্যাণকর সত্য আর কোথাও থাকিতে পারে না। এজন্য সে সত্য অনুসন্ধানে বিমুখ হয়, এবং যদি বা কখনও অন্য কোন সত্যের সন্ধান পায় তাহাও গ্রহণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না। এই প্রকারে আত্মার অন্নপান স্বরূপ সত্য লাভে সে বঞ্চিত হইয়া প্রকৃত কল্যাণের পথ হইতে আপনাকে দূরে নিক্ষেপ করে। কোন একখানি গ্রন্থকে অভ্রান্ত শাস্ত্ররূপে গ্রহণ করিলে এরূপ বহু অনিষ্ট ঘটিলেও মানবজীবনে এমন সময় উপস্থিত হয়, যখন শাস্ত্র তাহাকে সুপথে রক্ষা করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। মানব যখন অনুকূল অবস্থাতে অবস্থিত থাকে, তখন সে প্রাণের প্রবল ক্ষুধায় এবং আত্মোন্নতির প্রবল বাসনায় চতুর্দ্দিক হইতে কল্যাণকর সত্য সকল গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। যখন প্রাণে সংগ্রহ করিবার শক্তি প্রবল থাকে, তখন সে বিবেকরূপ পথ দ্বারা প্রাণে নিরন্তর ঈশ্বর প্রকাশিত সত্য সকল লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু অবস্থা যখন প্রতিকূল হয়; যখন সংসার পথে চলিতে চলিতে আত্মার ধর্ম্ম ক্ষুধা মন্দ হইতে থাকে; সত্য-নির্ব্বাচন শক্তি ও গন্তব্য পথে চলিবার উপযুক্ত কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ শক্তি হ্রাস হইতে থাকে, আত্মজ্ঞান যখন জীবন পথে চলিতে কোন আলোক প্রদান করে না; তখন শাস্ত্র মানবকে অনেক পরিমাণে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে সক্ষম করে, জীবনের সুদিন আনয়নের পক্ষে সাহায্য করে। উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি যখন কেবল আত্মতুষ্টির জন্য ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ভদ্রাভদ্র বিচার না করিয়া যাহা সম্মুখে পায়, তৃপ্তিকর হইলেই গ্রহণ করিতে থাকে, তখন সেই হীন দশাপন্ন ব্যক্তি—সেই উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তি শাস্ত্রের শাসনে অনেক পরিমাণে প্রকৃত পথে চলিতে বাধ্য হয় এবং তাহা সেই দুস্থের পক্ষে বিশেষ কল্যাণ আনয়ন করে। যাহার ক্ষুধা প্রবল এবং প্রাণ সুস্থ তাহার জন্য শাস্ত্র বিশেষের প্রয়োজন নাই, কারণ সুস্থ শরীর যেমন সকল প্রকার খাদ্য হইতেই আপনার পরিপোষণকারী বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, সুস্থ আত্মাও তেমনি সর্ব্বত্র হইতে আপন কল্যাণকর সত্য গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু রুগ্ন শরীর সেরূপ নয়; সে কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু হইতেই সার সংগ্রহ করিতে পারে। কিন্তু উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট সকল বস্তু হইতে আত্ম-কল্যাণকর সার বস্তু গ্রহণ করিবার শক্তি তাহার নাই। আত্মাও রুগ্ন অবস্থায় সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারে না। তাহার যাহা ভাল লাগে সে তাহারই অনুসরণ করে। সুতরাং অসুস্থ আত্মা এবং উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিকে সুস্থ ও সুনিয়মিত করিবার পক্ষে শাস্ত্র বিশেষ কল্যাণকর। সে অবস্থায় যখন সংগ্রহ করিবার—চতুর্দ্দিক হইতে আহরণ করিবার শক্তি না থাকে তখন কোন একখানি গ্রন্থও অনেক কার্য্য করিয়া থাকে। এজন্য অভ্রান্ত শাস্ত্রের দোষ পরিহার পূর্ব্বক উদার ধর্ম্ম নিয়ম সকল সঙ্কলন করিতে আমাদের যত্নবান্ হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। তাহা অসুস্থ ও উচ্ছৃঙ্খল আত্মাকে সুপথে রক্ষা করিবার এক বিশেষ উপায়।

কর্ম্ম—ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে ভক্তি করা তাঁহার অর্চনা করা এবং জ্ঞানানুশীলন দ্বারা তাঁহার তত্ত্ব অবগত হওয়া যেমন ব্রাহ্মের অবশ্য কর্ত্তব্য—মূল লক্ষ্য; তাঁহার ইচ্ছা পালন করিবার জন্য কর্ম্মশীল হওয়াও তেমনি ব্রাহ্মের অবশ্য কর্ত্তব্য এবং বিশেষ লক্ষ্য। একমাত্র জ্ঞানচর্চা বা ভক্তি-

পথানুসরণ ব্রাহ্মধর্ম্মের আদর্শ নয়। জ্ঞান, ভক্তির সহিত কেবল তাঁহার ধ্যান ধারণা,শ্রবণ কীর্ত্তনেও ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণতা নয়। কিন্তু তাঁহাতে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য এই উভয়ের সম্মিলনেই ধর্ম্মের সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণতা। এজন্য কর্ম্মকে আমরা কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে পারি না। আত্মার পূর্ণ বিকাশের জন্য যেমন জ্ঞান প্রীতির উন্নতি করিতে হইবে; তেমনি তাহার ইচ্ছার বিকাশের জন্য বিশেষভাবে মনোযোগী হইতে হইবে। সুতরাং কর্ম্ম ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য্য। কিন্তু কর্ম্মশীল হইবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেক বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। যেস্থলে মানুষ নিজ পরিবার পরিজনের জন্য খাটে, সেখানে যেমন বিষয় বাসনার আসক্তি প্রবল হইয়া, কর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনকে ভুলিয়া মানুষ নিজ ইচ্ছারই চরিতার্থতা করিতে থাকে,তেমন আবার পরের জন্য খাটিতে যাইয়াও মানুষ অহঙ্কারী হইয়া থাকে। অপরের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া সেবার প্রকৃত উদ্দেশ্য যে আত্ম-কল্যাণ-সাধন—নিজ আত্মার একটী বিশেষ অঙ্গের পরিপুষ্টি সাধন, তাহা বিস্মৃত হইয়া পরের উপকার করিতেছি মনে করিয়া নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরবের কথাই মনে আসে। সে অবস্থায় মানুষ অহঙ্কারী হইয়া অপরকে তুচ্ছ করিতে থাকে। আপনার মহত্ত্বই অধিক পরিমাণে অনুভব করিয়া, ঈশ্বরের ইচ্ছাধীনতা হইতে বিচ্যুত হয়। এরূপ অবস্থায় মানুষের বরং কর্ম্ম না করা ভাল। কিন্তু অহঙ্কারের সহিত অন্যের হিতসাধন কখনই প্রার্থনীয় নয়। তাহাতে আত্মার যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতিপূরণ আর কিছুতেই হয় না। আত্মার বিশেষ একটী লক্ষ্য যে ঈশ্বরে প্রীতি স্থাপন, অহঙ্কার তাহাতেই বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। নিজের যে দীনতা অনুভব ভিন্ন ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ সম্ভবে না, তাঁহাকে সার ও সকল শক্তির মূলাধার বলিয়া অনুভব করিবার সম্ভাবনা থাকে না, অহঙ্কার সেই দীনতানুভবের প্রধান অন্তরায়। এজন্য কর্ম্ম করিবার সময় প্রত্যেক লোকের এই ভাবা উচিত, আমি যে কার্য্য করিতেছি তাহা অন্যের উপকারের জন্য নয়, কিন্তু আত্ম-কল্যাণ সাধনের জন্য। কর্ম্ম না করিলে আত্মা পূর্ণাঙ্গ সাধন করিতেই সমর্থ হয় না—আত্মার বিকাশই হয় না। সুতরাং নিজের কল্যাণ সাধনই সেবার প্রধান উদ্দেশ্য। ধর্ম্মসাধনের অন্যান্য অঙ্গ যেমন আত্মার কল্যাণার্থ, ইহাও তেমনই একটী বিশেষ আত্ম-কল্যাণকর ব্যাপার; সুতরাং পরোপকারের ভাব মনে আসিতে দেওয়া কোনক্রমেই উচিত নয়। পরোপকার মানুষ ইচ্ছা হইলে করিতে পারে আবার নাও করিতে পারে। কিন্তু যখন আত্মার কল্যাণের জন্য কর্ম্মশীল হওয়া একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় ব্যাপার,তখন এরূপ অনিশ্চিতভাবে কর্ম্মের অনুসরণ করা কখনই উচিত নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনই কর্ম্ম-সাধনের মূল-সূত্র হওয়া উচিত। তাহা হইলে আর গৌরব করিবার বা পরোপকার করিলাম বলিয়া অহঙ্কৃত হইবার উপায় থাকে না। দাসের যেমন প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অহঙ্কৃত হওয়া উচিত নয়; কিন্তু আত্ম-প্রসাদই তাহার পুরস্কার ও সন্তোষের হেতু, তেমনই সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া পিতার ইচ্ছা পালন করিলাম বলিয়াই মনের সান্ত্বনা হওয়া উচিত। তাঁহার ইচ্ছা পালন করাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সুতরাং সে লক্ষ্য সাধনে আমাদের মনোযোগের ত্রুটী হওয়া কখনই প্রার্থনীয় নয়। এজন্য সর্ব্বদাই কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কেবলই ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালন, আত্ম-কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্যেই করিতে হইবে। তবে আর আমরা যে একবার কাজ গ্রহণ করি, আবার সামান্য কারণেই তাহা পরিত্যাগ করি, অবস্থা যতক্ষণ অনুকূল থাকে, লোকের সাহায্যে সহানুভূতি পাওয়া যায়, লোকের প্রশংসাধ্বনি কর্ণে সুমধুর ধারা বর্ষণ করিতে থাকে, ততক্ষণ বেশ উৎসাহের সহিত কার্য্য করিতে থাকি; কিন্তু তাহার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটিলে আর সেরূপ উৎসাহ থাকে না কাজে মন থাকে না, কথায় কথায় সেবাব্রত পরিত্যাগ করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে থাকি; এরূপ চাঞ্চল্য আর আসিতে পারে না। যে কার্য্যের উপর নিজের কল্যাণ নির্ভর করিতেছে—না করিলে নিজেরই বিশেষ ক্ষতি হইবে, তাহার প্রতি আর এরূপ অনাস্থা এবং অস্থিরতা প্রদর্শন করিতে হয় না। পরের উপকারের ভাবও মনে আসিতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য ঈশ্বরের ইচ্ছা-পালন এবং তাহা আত্ম-কল্যাণ সাধনের একটী প্রধান উপায়, এইরূপ হওয়া উচিত।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

মুক্তি।

হিন্দু শাস্ত্রকারেরা বলেন যে জীবাত্মা বার বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় কর্ম্মফল ভোগ করে। পরে যখন তাহার পরমাত্মার সহিত যোগ হয়, তখন সে মুক্তি লাভ করে, তখন হইতে তাহার সংসারে যাতায়াত শেষ হয়, আর তাহাকে জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইতে হয় না।

আমরা এই পুনর্জ্জন্মের মত সত্য বলিয়া স্বীকার করি না বটে, কিন্তু আমরা 'মুক্তি' বলিতে যাহা বুঝি তাহার মধ্যে ইহার অনুরূপ একটী ভাব আছে। সাধক-জীবনে এই কর্ম্মফল ভোগের ভাব, এই সংসারে যাতায়াতের ভাব কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন পরমাত্মার সহিত স্থায়ী যোগ নিবদ্ধ না হয়, ততদিন মানুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে না, তত দিন তাহার ধর্ম্মজীবন মৃত্যুর হস্ত এড়াইতে পারে না। যখন সেই পরম দেবতা প্রথমে মানবাত্মার সমক্ষে আত্মস্বরূপ প্রকাশিত করেন, তখন সে সেই অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া এমন মুগ্ধ হয় যে অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য সে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, সাংসারিক জীবন সম্বন্ধে তাহার মৃত্যু হয় এবং পর লোকের আভাস পাইয়া তাহার জীবন কৃতার্থ হয়। কিন্তু এভাব অধিক দিন থাকে না। কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য তাহাকে আবার সংসারে আসিতে হয়। সেই কর্ম্মফল কি? পূর্ব্ব সঞ্চিত পাপ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত চাই, নতুবা স্থায়ী ঈশ্বর দর্শন অসম্ভব। পাপী কাতর প্রাণে ডাকিলে পরমেশ্বর তাহাকে দেখা দেন এ কথা যেমন সত্য, পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হইলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না, এ কথাও তেমনই সত্য।

গত জীবনের মন্দ অভ্যাস সকল এক দিনেই যাইবার নহে। যখন প্রথম ব্রহ্মদর্শন লাভ হয়, তখন হইতে পাপের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ হয় মাত্র, সংগ্রাম শেষ হইতে বহু দিন লাগে। কখনও পাপের জয় কখনও দেবভাবের জয়, এইরূপে বহুকাল ধরিয়া মানবাত্মার মধ্যে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতে থাকে। যাহারা এই সংগ্রামে কখন লিপ্ত হয় নাই তাহারা জানে না ইহা কিরূপ ভয়ানক। ইহা মধ্যে মধ্যে প্রাণকে একেবারে ক্ষত বিক্ষত ও নিস্তেজ করিয়া ফেলে। পাপাসুর মায়াবী রাক্ষসের ন্যায় অবিশ্বাস, নৈরাশ্য, সাংসারিকতা, স্বার্থপরতা, আলস্য প্রভৃতি নানা আকার ধারণপূর্ব্বক মানবাত্মাকে কর-কবলিত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। বিশ্বাস-সূর্য্যকে অন্ধ-তমসাবৃত করিয়া, আশা-প্রদীপকে নির্ব্বাপিত করিয়া, মানবের মহাশত্রু তাহাকে বন্দী করিবার জন্য বিবিধ মায়াজাল বিস্তার করিতে থাকে। কখন কখন দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর সাধককে ঘোর আধ্যাত্মিক অন্ধকারে কাটাইতে হয়। এ অবস্থায় পূর্ব্ব সঞ্চিত বিশ্বাসের ক্ষীণালোক, পূর্ব্বদৃষ্ট ব্রহ্ম-জ্যোতির এক আধটুকু আভাস, পূর্ব্বাস্বাদিত অমৃত রসের স্মৃতিই মানবাত্মার একমাত্র অবলম্বন-রূপে তাহাকে রক্ষা করিতে থাকে। প্রকৃত ব্রহ্মদর্শনের এমনই আশ্চর্য্য শক্তি যে উহা এই দীর্ঘকালব্যাপী ঘোর অন্ধ-কারের মধ্যেও মানুষকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে।

উপরে যে অন্ধকারের অবস্থার কথা বলা হইল ইহাই সাধকের সংসারে পুনর্জন্মের অবস্থা। এই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে যখন সংগ্রাম নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠে, মানুষের শক্তিতে যখন আর কুলায় না, তখন সাধক অনন্যগতি হইয়া আবার বিশ্বাসে ভর করিয়া পরমেশ্বরের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দেন। এরূপ হইবার কারণ আছে। প্রথম প্রথম একদিকে মন্দ অভ্যাস সকল অত্যন্ত প্রবল থাকে, অপর দিকে নির্ভরের ভাব ক্ষীণ থাকে; অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষ নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিয়া পাপের সহিত সংগ্রাম করিতে যায়। কিন্তু এ সংগ্রামে দৈববল ভিন্ন, ঐশী শক্তি ভিন্ন জয় লাভ অসম্ভব; এবং ঐশী শক্তি লাভ করিতে হইলে নিজের অসারতা পরিষ্কার রূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। এই জন্য সাধক যখন নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া সেই অনন্ত শক্তির উপর একান্ত মনে নির্ভর করেন, তখন আবার তাঁহার প্রাণে ব্রহ্মজ্যোতি প্রকা-শিত হয়, অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের অন্ধকার কাটিয়া যায় এবং তিনি দৈববলে বলী হইয়া সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হন। সংসার সম্বন্ধে আবার তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তিনি শরীরী হইয়াও পরলোকের আস্বাদ প্রাপ্ত হন। এই দ্বিতীয় বারের ব্রহ্মদর্শন প্রথমবারের অপেক্ষা উজ্জ্বলতর, মধুরতর ও অধিকতর প্রাণপ্রদ বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু দুই একবারেই কিছু স্থায়ী ব্রহ্মযোগ সংঘটিত হয় না। মন্দ অভ্যাসের বল পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষীণতর হয় বটে, কিন্তু দুই একবারেই পাপ নির্ম্মূল হয় না। কিছু দিন স্বর্গীয় ভাবের মধ্যে থাকিতে থাকিতে আবার অতর্কিতভাবে মন শিথিল হইতে থাকে, অহঙ্কার, অপ্রেম প্রভৃতি সূক্ষ্ম পাপ সকল জীবাত্মাকে ভুলাইয়া আবার সংসারে লইয়া আসে। এইরূপে যতদিন না জীবাত্মা ব্রহ্মের সহিত স্থায়ী যোগে বদ্ধ হইতে পারে, ততদিন তাহার সংসারে যাতায়াত শেষ হয় না, এবং সংসারে যাতায়াত যতদিন না শেষ হয়, ততদিন আধ্যাত্মিক মৃত্যুর হস্ত এড়াইতে পারা যায় না। এই ব্রহ্মযোগই মুক্তির একমাত্র সোপান। যখন জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে চির-যোগে নিবদ্ধ হয়, যখন জ্ঞানযোগে জীবাত্মা অন্তরে বাহিরে প্রতি মুহূর্ত্তে ব্রহ্মদর্শন লাভ করে, প্রেমযোগে যোগী হইয়া যখন সে তাহার প্রাণের অবিভক্ত অনুরাগ পরমাত্মার চরণে সমর্পণ করে এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা যখন তাহার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন হয়, তখন সংসার সম্বন্ধে জীবাত্মার চিরদিনের জন্য মৃত্যু হয়, তাহার নিকট ইহকাল পরকাল এক হইয়া যায় এবং সে সশরীরে স্বর্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

ব্রাহ্মসমাজের আশা কি ?

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মসমাজের স্বপক্ষ ও বিপক্ষ সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের, বিষয়ে চিন্তা করিতে গিয়া নানারূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন। বিরোধীগণের মধ্যে প্রায় অনেকেই দ্বেষপরবশ হইয়া অনেক কথা প্রচার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিচারহীন হইয়া ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে পক্ষপাত পূর্ণ মত সকল প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন না। ব্রাহ্মসমাজ জন্মা-বধি এরূপ লোক দ্বারা নিপীড়িত হইয়া আসিতেছেন—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শির্ষ স্থানীয় লোকেরা ব্রাহ্মসমাজের বিনাশ সাধন করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত বন্ধু, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি দেখিলে যাঁহাদের প্রাণে বিশেষ আনন্দ জন্মে, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য যাঁহারা সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে ত্রুটি করেননা, এমন সকল লোক ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলেন তাহা অপ্রিয় হইলেও শ্রোতব্য। ইহারা ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা কথা বলেন, কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ গুরুতর কথা এই যে, এদেশে ব্রাহ্মসমাজের কাজ (mission) শেষ হই-য়াছে, ব্রাহ্মসমাজের আর বিশেষ কোন কাজ নাই, সুতরাং আর কোন আশাও নাই। ব্রাহ্মসমাজের আর কোন আশা আছে কিনা, এ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে গিয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, এই প্রবন্ধে সে বিষয়ের আলো-চনা করিব। যাঁহারা চিন্তাপূর্ণ মনে ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়াছেন—ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয়ে যাঁহারা বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, আমরা আশা করি, তাঁহারা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছেন যে, ধর্ম্মভূমি ভারতভূমির ধর্ম্ম সংস্কারের জন্যই ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থান। যে দেশে মহাত্মা শাক্যসিংহ, নানক, কবির ও চৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিশ্বাস, প্রেম ও ভক্তি প্রভৃতির তত্ত্ব প্রচার করিয়া নিরাকার সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নশীল হইয়াছিলেন। সেই পুণ্য ভূমি ভারতবর্ষ বিমল ব্রহ্মজ্ঞান হারা-ইয়া পৌত্তলিকতা, অসার বাহ্যাড়ম্বর ও ধর্ম্মের নামে নানাবিধ

কুক্রিয়ার লীলাভূমি হইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় সকল সম্প্রদায়েরই ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের প্রচারিত নির্ম্মল সত্যের সহিত নানা প্রকার অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার মিশ্রিত হইয়া ধর্ম্মের শক্তি-স্রোত রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত মঠ সমূহের দণ্ডীগণ ও উপরোক্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের প্রবর্ত্তিত পন্থাশ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নির্জ্জন গিরিগহ্বরে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সকল সাধু সন্ন্যাসী, ফকির ও যোগীগণই ভারতবর্ষের ধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়াছিলেন। এই উদাসীন সম্প্রদায় যেন নাস্তিকতা ও দুর্নীতির ভয়ে ভারত সমাজের আধ্যাত্মিকতাকে লইয়া নির্জ্জন গিরিগহ্বরে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই উদাসীন সম্প্রদায় অলক্ষিতভাবে ভারতবর্ষের গৃহস্থাশ্রমের ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিতে সাধ্যানুসারে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু বহু বৎসর ধরিয়া পৌত্তলিকতা ও নানা প্রকার অসার লোকাচারের পূজা করিতে করিতে নরনারীর জ্ঞান বুদ্ধি ও ধারণাশক্তি নিতান্ত জড়ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, নরনারীর চিত্ত অসার বাহ্য বিষয়েই নিমজ্জিত হইয়াছিল। ঘাতের পরেই প্রতিঘাত হয়। অমঙ্গল যখন শেষ সীমায় উপনীত হয় তখনই মঙ্গলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই সময়ে পরাক্রমশালী সুসভ্য ইংরেজ-জাতি এদেশের রাজ্য ভার গ্রহণ করিলেন এবং ইংরেজ রাজত্বের কয়েক বৎসর পরেই মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিলেন। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের জীবনচরিতকে উপন্যাস বলিয়া মনে হয়। অতি বাল্যকাল হইতে তিনি যে অসাধারণ শক্তি ও মহত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে প্রত্যয় হয় না। তিনি শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানরূপ সত্যালোক লইয়া ঘোর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মোহ নিদ্রাভিভূত ভারতবাসীকে জাগাইয়া তুলিলেন। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার প্রধান কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি যে উন্নত আদর্শে ব্রাহ্মসমাজ গঠন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজ আজ ৬১ বৎসর কাল সেই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অল্পে অল্পে আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিতেছেন। ইদানীং তাঁহার প্রতি দেশের শিক্ষিত লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং নানা সম্প্রদায়ের শির্ষ স্থানীয় লোকেরা তাঁহার মহত্ব ও অসাধারণত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ বাহিরের লোকের ন্যায় তাঁহার মহত্ব গ্রহণ করেন না। তিনি আপন জীবনে মনুষ্যত্বের যে উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজ সেই উন্নত আদর্শানুসারে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গঠন করাকেই,তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ রক্ষা করিবার একটী প্রশস্ত উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন। যাঁহারা একাগ্রচিত্তে শ্রদ্ধা ও গভীর চিন্তাশীলতার সহিত তাঁহার জীবন অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, তিনি ধর্ম্ম-জীবন লাভ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বুঝিয়া বিবিধ উপায়ে তৎসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বহু শাস্ত্রাধ্যয়ন, সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক উন্নতি সাধন ও বিবিধ উপায়ে নরনারীর সেবা করা এ সমস্তই তিনি ধর্ম্মের আনুসঙ্গিক ব্যাপার বলিয়া জ্ঞান করিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ধর্ম্মজীবন উন্নত না হইলে বুদ্ধি বিদ্যা ও সেবার ভাব ইহার কোনটীই যথার্থভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। একদিকে যেমন তিনি সত্যে প্রীতি স্থাপন করিয়া শরীর মন হৃদয় সমর্পণ করিয়া সাধন করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে তেমনই উদার সত্যনিষ্ঠাকে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

মহাত্মা রামমোহন রায়ের এই উন্নত আদর্শ—এই সার্ব্বভৌমিক ভাব ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, একথা আমরা বলিতেছি না। কিন্তু ইহাই ব্রাহ্মসমাজের প্রধান লক্ষ্য এবং এই ভাব ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধমূল না হইলে ব্রাহ্মসমাজ যে এক দিন অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় এদেশে এক অতি সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়া থাকিবে তাহার সংশয় নাই। পূর্ণতার দিকেই জনসমাজের গতি। অপূর্ণতার সাগরে ভাসিয়াও মানুষ পূর্ণতার কোলে ঝাঁপ দিতে চায়। যাহা আছে তাহা লইয়া মানুষ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না—যত পায় তত চায় ইহাই মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি। এই অতৃপ্তিই মানবের অনন্ত উন্নতির মূল, এই অতৃপ্তিই মানবের অনন্ত আকাঙ্ক্ষার গূঢ় কারণ। পরিমিত পদার্থে তৃপ্তি নাই বলিয়াই মানুষ আপনা হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে স্বদেশে এবং স্বদেশ হইতে জগতে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া থাকে। জগৎ অপেক্ষা অধিকতর প্রশান্ত ও মহৎ ভাব মানুষ কল্পনায় ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই বিশ্বজনীন ভাবে প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া পূর্ণতার আভাস প্রাপ্ত হয়।

এরূপ উদার ভাব জীবনে না আসিলে মানব-চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি—ধর্ম্মসমাজের সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠব সম্পন্ন হয় না। শিক্ষা, সভ্যতা ও বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই অসাম্প্রদায়িক উদার ভাব—এই উন্নত আদর্শ পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে উপস্থিত হইতেছে। যে সমাজ এই উন্নত আদর্শানুসারে আপন কর্ত্তব্য সাধন করিবে তাহার দ্বারাই জগতের কল্যাণ সাধিত হইবে—সেই সমাজ ধন জন শক্তি বলে অতি সামান্য হইলেও জ্ঞান, পুণ্য ও ধর্ম্মবলে জগতের শির্ষস্থানীয় থাকিয়া চিরকাল প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে জগতের মঙ্গল সাধন করিবে। মহাকবি গেটে (Goethe) বলিয়াছেন,—

"Let us conceive of the whole group of civilised nations as being for intellectual and spiritual purposes, one great confederation, bound to a joint action and working towards a common result ; a confederation whose members have a due knowledge both of one another and of the heart, out of which they all proceed. This was the ideal of Goethe, and it is an ideal which will impose itself upon the thoughts of our modern societies more and more.,

"Matthew Arnold"

ইহার ভাবার্থ এই—"সমস্ত সুসভ্যজাতি সকলকে সমষ্টিভাবে দেখিলে এই অনুভব হয় যে, ইহারা যেন মানসিক ও আধ্যাত্মিক

কল্যাণ সাধন জন্য পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ হইয়া সম ফলের জন্য খাটিতেছে। সমস্ত সুসভ্য জাতি লইয়া এই যে বিরাট সমিতি সংগঠিত হইতেছে, ইহার সভ্যগণ ভূতকালের যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা হইতে ইঁহাদের স্বীয় স্বীয় জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং পরস্পরের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধেও ইঁহাদের বিলক্ষণ জ্ঞান আছে।" মহাকবি গেটের এই উন্নত আদর্শ আধুনিক সমাজ সকলের উপর ক্রমশঃ আপন আধিপত্য বিস্তার করিবে।

সর্ব্বাগ্রে মহাত্মা রামমোহন রায় ও তৎপরে বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে এই উন্নত ভাব প্রচারিত হইয়াছে। মৃতপ্রায় ভারতবর্ষে যে জাতীয় জীবনের সামান্যরূপ সঞ্চার দেখা যাইতেছে—জাতীয় সমিতিতে যে একতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণের চেষ্টাতে ইহারও সূত্রপাত হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ রাজনৈতিক কোলাহল হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিয়াও দেশের ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির জন্য, দেশের লোকের আস্তিকতা বৃদ্ধির জন্য নিরন্তর খাটিতেছেন। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম যাহাতে জাতীয় ধর্ম্ম হয়—ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা—বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ভুক্ত নরনারীগণ যাহাতে ব্রাহ্ম ধর্ম্মরূপ রজ্জুতে প্রাণে প্রাণে গ্রথিত হন, তজ্জন্য ব্রাহ্মসমাজ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পাঞ্জাব ও মধ্য ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র আপনারা প্রচারকদিগকে প্রেরণ করিয়া এই কল্যাণকর ভাব প্রচারের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। "এক ঈশ্বর পিতা, আর সমস্ত নর-নারী ভাই ভগিনী" এই উদার মত আজ কাল দুর্ভাগ্যবশতঃ অনেকের নিকট উপহাসের বিষয় হইয়াছে, কিন্তু এই উদার মতই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ। এই মত ব্রাহ্মসমাজ চিরকাল প্রচার করিবেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বিশেষত্ব রক্ষা করিয়া সমাজ সংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অপরাপর জন হিতকর ও দেশহিতকর কার্য্যে যোগ দেন, তবে আর ব্রাহ্মসমাজের বিপদ নাই। জাতিভেদের মূলোচ্ছেদ, নারীজাতিকে উচ্চ শিক্ষা দান ও ঈশ্বরদত্ত স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিতে দেওয়া, বিবাহার্থিনী বিধবা রমণীগণের বিবাহ দেওয়া, বাল্যবিবাহ দূর করা, পাশ্চাত্য স্বাধীন ভাব ও কর্ম্মশীলতা গ্রহণ করা এ সকল ত আধ্যাত্মিকতার আনুসঙ্গিক ভাব, এ সকল ত প্রত্যেক ব্রাহ্মের জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়। কিন্তু ব্রাহ্মকে স্মরণে রাখিতে হইবে যে, এ সকল ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখ্যভাব নহে। ধর্ম্ম লাভ করা ও ধর্ম্ম প্রচার করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হইলে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তি জন্মিলে মানুষ কখনই সমাজ সংস্কার না করিয়া থাকিতে পারে না। জীবনের পরীক্ষা কার্য্যে, ঈশ্বর-প্রীতির প্রমাণ ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য-সাধনে। বাস্তবিক সমাজ সংস্কারের সহিত ধর্ম্মজীবনের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। যেমন লণ্ডন যাত্রীর পক্ষে সুয়েজখাল দেখিতে যাইবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ও অর্থব্যয় করিতে হয় না, তেমনি মুক্তি-প্রার্থী অমৃত নিকেতন-যাত্রীর পক্ষে সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করিবার জন্য স্বতন্ত্র আয়োজন করিতে হয় না। প্রকৃতরূপে সাধনশীলতা অবলম্বন করিয়া যদি ব্রাহ্মসমাজ জীবন দ্বারা (Personal influence) ও বাহিরের উপায়ে (by institution) এদেশের ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিবার জন্য, নরনারীর বহির্ম্মুখী ভাবকে অন্তর্ম্মুখী করিবার জন্য একাগ্র-চিত্তে প্রবৃত্ত হন, তবে আর ব্রাহ্মসমাজের নিরাশার কারণ নাই। ভারতবাসী হিন্দুগণ থিয়োসফিষ্টই হউন, আর পুনরু-ত্থানকারী দলভুক্তই হউন, নির্ম্মল চরিত্র, বিমল জ্ঞানজ্যোতি, বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিবার শক্তি এবং সামাজিক পবিত্রতা ও উদারতা ভিন্ন কখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন না। যখনই মানুষ শান্তভাবে আপন জীবনের প্রতি দৃষ্টি করে, আত্মার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখনই প্রাণে আগুণ জ্বলিয়া উঠে, সে আগুণ যাঁহার হৃদয়ে একবার জ্বলিয়া উঠিয়াছে, তিনিই ব্রাহ্মসমাজের মর্য্যাদা অনুভব করিতে শিখিয়াছেন, তিনিই ব্রাহ্মসমাজের এদেশে আশা কি, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রেমস্বরূপ।

প্রাপ্ত

এই প্রকাণ্ড বিশ্বসৃষ্টি বিশ্বেশ্বরেরই প্রেম প্রকাশ। প্রেমেই ইহার আবির্ভাব, প্রেমেই ইহার স্থিতি। প্রেমই ইহাকে এই চিত্তরঞ্জন, বিচিত্র, সুন্দর ও নিত্য নূতন ভাবে অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে! সৃষ্টির ভিতরে বাহিরে এক প্রেমেরই অনন্তমুখী স্রোত প্রবাহমান। এই প্রেমে মাতিয়া, প্রেমগানে বিভোর হইয়াই প্রেমিক সাধু মানব জন্ম সার্থক করেন। এ দৃশ্য যে দেখে তারও জন্ম সার্থক হয়; কিন্তু ইহা জগতে অতি দুর্লভ। প্রাণে-শ্বরের গাঢ় প্রেম-জ্যোতি পূর্ণ অপূর্ব্ব দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হয়, কেবল সেই ভাগ্যবান্ পুরুষই ঐ প্রেমালোকে তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া আপনাকে তন্ময় দেখিতে পায়। এই জগৎ সংসার মোহের ঘন তিমিরে আচ্ছন্ন। মোহান্ধ জীব কিরূপেই বা এই প্রেমলীলা সন্দর্শন করিবে। জীব মোহের ঘোরে অসারকে সার মনে করে, অবস্তুকে বস্তু জ্ঞান করে, অধিক কি আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না। তাই সে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডটা নিংড়াইয়াও ব্রহ্মাণ্ডপতির বিন্দুমাত্র প্রেম প্রাপ্ত হয় না এবং এই জগৎকে একটী অমঙ্গল ও অকল্যাণের আকর মনে করে; প্রতিপদেই অপ্রেমের ব্যাপার দেখিতে পায়। সে দেখে অকস্মাৎ শতসহস্র নরনারী মহামারীরূপ মহারাক্ষসীর করাল গ্রাসে অকালে নিপ-তিত হইয়া, জীবনের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দেয়। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে শত শত গ্রাম জনপদ মনুষ্যাদি জীবজন্তু সহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। প্রচণ্ড হুতাশন লোল জিহ্বা বিস্তার করিয়া কত কত নগরী ভস্মসাৎ করে। কত পরিবারকে পথের কাঙ্গাল করে। ভূমিকম্পে জনপ্রাণী সহ কত দেশ বিনষ্ট হয়, যুদ্ধ বিবাদে লক্ষ লক্ষ লোক হত হইয়া আপনাদের রক্তে ধরাবক্ষে রক্ত-নদীর সৃষ্টি করে। নিত্যনূতন রোগের অবিশ্রান্ত আক্রমণে প্রাণিপুঞ্জ অস্থির। মৃত্যুর আক্রমণে কত পরিবার প্রতি দিন হাহাকার করে। আহারাভাবে কত লোক ক্ষুধার জ্বালায় ছট্ ফট্ করে, দুর্ব্বলের উপর সবল

অত্যাচার করিয়া অবাধে নিষ্কৃতি পায়। অথচ জগৎকর্ত্তা ইহার কোন প্রতিবিধানই করেন না। সুতরাং কি করিয়াই বা সে তাঁহার প্রেমস্বরূপে বিশ্বাস করিতে পারে। প্রতি মুহূর্ত্তেই সে তাঁহার প্রেমের অভাব দেখিতে পায় এবং এই মোহের কোয়াসা শীঘ্র দূর না হইলে পরিণামে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, যে এই রাজ্যের রাজার হয় শক্তির অভাব; না হয় তিনি একটী স্বেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর দানব সদৃশ। আহা! মানব অন্তরে যে প্রেমটুকু খেলা করে, মানব-স্রষ্টার অন্তরে নাকি সেই প্রেমটুকু পর্য্যন্তও নাই। এই রূপে সে তাঁহার পূর্ণ মঙ্গলত্বে অবিশ্বাসী হইতে গিয়া, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তায়ও সন্দিহান্ হয় এবং অজ্ঞাতসারে অপর একটী বিরুদ্ধ শক্তির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মজ্ঞান-বিচ্যুত হয়।

হায়, মোহের কি আশ্চর্য্য শোচনীয় পরিণাম! অপরের কথা দূরে থাক্, অতি সূক্ষ্মদর্শী চিন্তাশীল ব্যক্তিগণও ইহার প্রভাবে সম্পূর্ণ দিশাহারা হয়! এই স্থূল সত্যটী উপলব্ধি করিতে পারে না, যে শুধু ক্রিয়া প্রেমেরও পরিচায়ক নহে অপ্রেমেরও বার্ত্তা বহন করে না—কর্ত্তার অভিপ্রায়েই প্রেম বা অপ্রেম প্রকাশ পায়। যদি শুধু কার্য্যই প্রেম বা অপ্রেমের নিদর্শন হইত, তাহা হইলে কত স্বার্থপর সংকীর্ণচেতা তোষামোদকারী, কত প্রবঞ্চক চূড়ামণি, কত ছদ্মবেশী প্রেমিক সাধুরূপী আততায়ী, আত্মহারা প্রেমিক বা নিঃস্বার্থ ভালবাসার জীবন্ত প্রস্রবণ কিংবা প্রেমব্রতে উৎসর্গীকৃতজীবন প্রেমিক শীরোমণিরূপে মানবসমাজরূপ বিরাট পুরুষের হৃদয়-সিংহাসনে আসীন হইয়া শ্রদ্ধা, অনুরাগ ও প্রীতিপুষ্পে অহরহ পূজিত ও অর্চ্চিত হইতে পারিত, আর জগতের অশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা কত সরল প্রেমিক, ঈশা, মুষা, গৌর নিত্যানন্দাদি মহাজনগণ অবিমিশ্র ঘৃণার আস্পদ হইতেন। কিন্তু আনন্দের বিষয় যে মানব-সমাজ এত ভ্রান্ত নহে। তবে যদি হৃদয়ই প্রেম বা অপ্রেমের আধার হইল, যদি অভিপ্রায়েই প্রেম বা অপ্রেম লুক্কায়িত বা প্রকাশিত থাকে, যদি প্রকৃতি অধ্যয়ন করিয়াই শত্রু মিত্র, প্রেমিক অপ্রেমিককে চিনিয়া লইতে হয়, তবে সৃষ্টি রচনা সন্দর্শন করিয়া স্রষ্টার প্রেমাপ্রেমের বিচার করিবার ও তদানুসঙ্গিকরূপে তাঁহার শক্তিমত্তায় সন্দিহান হইবারই বা পথ রহিল কোথায়? জগৎ তাঁহার অনন্তমুখী লীলার অপূর্ব্ব তরঙ্গমালা, এখানে তাঁহার লীলারই প্রকাশ, এখানে কেবল তাঁহার ক্রিয়া কলাপই নয়ন গোচর হয়। তিনি জগৎরূপ যবণিকার অন্তরালে লুক্কায়িত। তাঁহার প্রকৃতি অধ্যয়ন করা দূরে থাক, ব্রহ্মাণ্ডময় অন্বেষণ করিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয় না! তবে কি জীব তাঁহার দর্শন পাইবে না! তবে কি সাধুভক্তের সাক্ষী কিছুই প্রামাণ্য নহে? যতদিন মোহ থাকিবে ততদিন এই দশাই ঘটিবে।

যদি ভগবদ্‌কৃপায় এই বহির্মুখী দৃষ্টি তদীয় দৃষ্টিবানে বিদ্ধ হয়। তাহা হইলেই মোহের অন্ধকার চিরদিনের মত দূরে পলায়ন করে। তখন জীব তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া একেবারে মোহিত হইয়া যায়। সে দেখে এক প্রেম-জ্যোতি তাঁহার অন্ধকার জদয় কুটীর রূপের আভায় আলো করিয়া তাহার সহিত অপূর্ব্ব অতি সুমিষ্ট ব্যবহার করিতেছেন। তখন সে আর স্থির থাকিতে পারে না। তৃণাদপি সুনীচ হইয়া ব্যাকুলভাবে মিনতি করিয়া বলে প্রভো ঢের হইয়াছে। অবিশ্বাসী নারকি কি করিয়া তোমার প্রেমভাগী হইবে। তাহার আপন বলিতে আর কিছুই থাকে না। ভিতরে বাহিরে তাহার সখাই বিরাজিত। ঘটে ঘটে তাঁহারই প্রকাশ। প্রাণে প্রাণে তাঁহারই লীলা। তিনি কত ভাবে জীবকে প্রতি মুহূর্ত্তে মনের সাধে সাজাইতেছেন। সে এই মধুর প্রেমলীলা প্রেমোৎফুল্ল নয়নে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে থাকে, আর দেখিতে দেখিতে প্রেমের বন্যায় একেবারে ভাসিয়া যায় এবং ঐ প্রেম স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া, প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া গাহিতে থাকে, তুমিই প্রাণ, তুমিই শক্তি, তুমিই পথ, তুমিই মুক্তি, জীবে কেন এ আসক্তি হে অদ্বিতীয় প্রেমিক সুজন।"

স্বর্গগত নবীনচন্দ্র রায়, তাঁহার সংক্ষিপ্ত ধর্ম্ম-কার্য্য ও তদুপরি সংক্ষিপ্ত উপদেশ।*

প্রাপ্ত।

স্বর্গ-প্রাপ্ত সংসার সন্ন্যাসী নবীনচন্দ্র আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন—তথা গিয়াছেন যেখানে তাঁহার জন্মস্থান। স্বর্গ তাঁহার জন্মভূমি, স্বর্গ তাঁহার মাতৃভূমি। পবিত্রতার আধার, দয়ার আধার, পরম-পিতা পরম মাতা পরমেশ্বর যাঁহার আকাঙ্ক্ষা এই যে তাঁহার পুত্র পুত্রী সত্যপথে এবং ন্যায় পথে চলিয়া জীবনের শত প্ররোচনা পূর্ণ পাপ তাপ শোক রোগ পূর্ণপ্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে। তবেই তাহাদের কল্যাণ। তবেই তাহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি উজ্জ্বল হইবে। অন্যায়ের প্রতি বিরাগ ও ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ হইবে। ন্যায়ানুরাগ ও অন্যায়-বিরাগ ব্যতীত নরনারীর রক্ষা নাই—পাপতাপ রোগ শোক দুঃখ আসিয়া জীবনকে দুঃখময়, পাপতাপময় করিবে। জীবনের শুধু বিরতিতে মুক্তি নাই রতিতে মুক্তি। অর্থাৎ অন্যায়, অসাধু কার্য্য হইতে একমাত্র বিরতিতেও কোন ফল নাই। ন্যায় সাধু কার্য্য সাধন করিতে হইবে। আর সাধু সৎকার্য্য সাধনই জীবনের উদ্দেশ্য। সাধু সৎকার্য্য সাধন জন্য স্বার্থত্যাগ প্রয়োজনীয়—দেখিতেছ পথে রোগী পড়িয়া রহিয়াছে, তুমি ক্রোড়ে করিয়া তাহাকে আপন গৃহে লইয়া যাইয়া আরোগ্যের উপায় দেখিবে। কলঙ্কিনী পথপার্শ্বে রোদন করিতেছে, অশ্রুজলে হৃদয় ভাসিয়া যাইতেছে, লজ্জায় প্রাণের বেদনা প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেছে না—কোলে করিয়া গৃহে লইয়া যাইয়া রোগ নিরাকরণের চেষ্টা পাইবে। স্বর্গগত নবীনচন্দ্র জীবনাকাশের সম্মুখে এই উজ্জ্বল বর্ত্তিকা উচ্চে ধরিয়া পাপ তাপ দুঃখান্ধকারময় পৃথিবী পথে চলিয়াছিলেন। সে বর্ত্তিকার আলো চন্দ্রের আলোর ন্যায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়াছিল—দূর দূর পর্য্যন্ত, সে আলো অন্ধকার বিদূরিত করিয়া নরনারী যুবক যুবতীর প্রাণে সচ্চিন্তা, সচ্চেষ্টার

* শ্রীযুক্ত বাবু শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজগৃহে পরলোকগত নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে এই উপদেশটী প্রদান করেন।

বর্ত্তিকা জ্বালিয়া ছিল। এ কি সামান্য উপকার, সাধারণ সাধন। যে নর, যে নারী, যে দুঃখী, যে পাপী, যে তাপী, যে শোকী তাঁহার আলয়ে আসিয়াছে, তাঁহাকে আশ্রয় চাহিতে হয় নাই—তিনি অযাচিতভাবে তাহাদিগকে হৃদয়ে স্থান দিয়া তাহাদের পাপ তাপ শোক দগ্ধ প্রাণে শান্তি, করুণাময়ের করুণাবারি সিঞ্চিত করিতেন।

তিনি সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় বাগাড়ম্বর ছিল না। সাধারণতঃ তিনি কোন শাস্ত্রীয় শ্লোক অবলম্বন করিয়া গম্ভীর স্বরে এমন সুন্দর সুললিত সহজ ভাষায় উহা ব্যাখ্যাত করিতেন যে, তরুণ বয়স্ক বালক বালিকাও অনায়াসে তাহা বুঝিতে পারিত। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। তিনি গ্রন্থ লিখিয়া সহজ গম্য প্রমাণ দ্বারা ঋগ্বেদাদি ও যে একেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করে, তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছিলেন। উপনিষদ ধর্ম্মতত্ত্বের খনি, সে খনি খনন করিয়া তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া তিনি যে ধর্ম্মতত্ত্ব—মনিমালা উপনিষদ তত্ত্বান্বেষীগণের গলে দুলিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা অতি অমূল্য রত্ন। যাঁহারা উপনিষদে ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপ বিষদরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, দেখিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করুন।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজ মন্দির—যেখানে এখন বসিয়া আছি, এই মন্দির তাঁহার নির্ম্মিত। সেই অধর্ম্ম অসত্য-ধর্ম্মতমসাচ্ছন্ন সময়ে স্বর্গ প্রাপ্ত নবীনচন্দ্রের হৃদয়ে যে ধর্ম্মাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল, সে অগ্নি তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিল,—তাই তিনি যখন এদেশে কেহ ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত শুনে নাই, তখন তিনি এই সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আজ যে আমরা এমন একটী সুন্দর মন্দির পাইয়াছি, এ কেবল তাঁহারই চেষ্টায়। লজ্জার বিষয় যে এত বৎসর গত হইল অর্থ সংগ্রহ করিয়া জমি ক্রয় পূর্ব্বক যে প্রচারক নিবাস স্থাপন হইবে, আজ পর্য্যন্ত তদুদ্দেশে কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। একটি ব্রাহ্ম-বালক-বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহারও দুরবস্থা। আমি প্রস্তাব করিতেছি এখানে একটি ব্রাহ্ম বিদ্যালয় ও একটি ব্রাহ্ম পুস্তকালয় স্থাপিত হউক। তাহার জন্য সর্দ্দার দয়াল সিংহ মহাশয় ৫০০ শত মুদ্রা দিতে প্রতিশ্রুত। কিন্তু আমাদিগের অকর্ম্মণ্যতায় ব্রাহ্ম পুস্তকালয় স্থাপন করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই।

আমার বিনীত প্রার্থনা এই পুস্তকালয় ও বিদ্যালয় নবীন বাবুর নামের সহিত সংযুক্ত হউক। তাঁহার নামে বৃত্তি মেডেল পুস্তকাদি বৎসর বৎসর দেওয়া উচিত।

স্বর্গগত নবীনচন্দ্র স্বয়ং যেমন ধার্ম্মিক নিঃস্বার্থ প্রাণ ছিলেন যে কয়েকটী পুত্র, কন্যা তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সে পথে চালিত করুন, যে পথে তিনি স্বয়ং চলিতেন।

পরম পিতা পরমেশ্বর, তুমি যে তোমার পরম ভক্ত নবীন চন্দ্রকে সংসারের পাপ তাপ শোক দুঃখ হইতে আপন ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছ, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তিনি যে আদর্শ আমাদের নয়নের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরকালই সমোজ্জল ভাবে আমাদের হৃদয়ে প্রাণে তোমার করুণা জাগরুক রাখিবে। সে মহদৃষ্টান্ত যেন কখনও ভুলি না—ভুলিলে আমরা যে কেবল তাঁহারই সমীপে অকৃতজ্ঞতা অপরাধে অপরাধী হইব, তাহা নহে; দয়াময় তোমার নিকটেও অপরাধী হইব।

সংসারে সন্ন্যাসী ছিলে দয়াময় পিতা ক্রোড়ে
তুলিয়া নিলেন জানি। ধরণীর পাপ তাপ
শোক দুঃখ ধূলি মাঝে শ্রান্ত শিশু প্রায়
চাহনা রহিতে আর। দয়ার জননী যিনি
তাঁহার কোমল কোলে লয়েছ আশ্রয়।
নিয়াছেন দয়াময়ী মাতা তুলিয়া তোমারে।
বুকে দিয়াছেন স্থান, স্নেহ স্তন দানে
তাপিত পরাণেরে করেছেন সুশীতল।
ক্ষীণশক্তি-দেহে দিয়াছেন বল।
বিশ্বজননীর মধু-স্তন পিয়ে লভিয়াছ বল,
গাইছ তাঁহার দয়াময় নাম।
তরে পাপী তাপী শোকী দুঃখী যে নামের গুণে
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত ধরিয়া দাঁড়ায়। হেন নাম গাইয়া
নাজানি সংসার সন্ন্যাসী কত সুখ পাও।
হেথায় নরেরে নাহি কিছে পার;আভাস দিতে তাহার।
দয়াময় তব চরণে এই ভিক্ষা চাই।
সংসার সন্ন্যাসী হারায়ে সবাই,
বড়ই বেদনা প্রাণে পেতেছি আমরা
সে পথে চলিতে, যে পথে সন্ন্যাসী চলিতেন হেথা।
পঁহুছিতে যেন পারি সে স্বরগে
পঁহুছিয়াছেন সন্ন্যাসী যথায়।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মহাশয়,

গত ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীর "ব্রহ্মবিদ্যালয়" শীর্ষক প্রাপ্ত প্রবন্ধের উত্তরে ১লা আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে উক্ত বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয়ের একখানি দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু পত্রখানি দীর্ঘ হইলেও মূল বিষয়ের প্রতিবাদ তাহাতে বড় একটা দেখিলাম না। বরং ইহাই স্বীকার করা হইয়াছে যে স্কুলের পাঠ্য পুস্তক সকল সর্ব্ববাদী-সম্মত নয়। এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে পাঠ্য পুস্তক গুলির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য-বিরোধী মত না থাকিলেই হইল। এখন জিজ্ঞাস্য এই পাঠ্য গ্রন্থ সকল যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের বিরোধী না হইল, তবে তাহা সর্ব্ববাদী (ব্রাহ্মগণের) সম্মত না হইবে কেন? ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যগুলি কি তবে কতকগুলি পরস্পর বিরোধী মতের সমষ্টি? বোধ হয় সীতানাথ বাবু তাহা স্বীকার করিবেন না। কিন্তু একথাও প্রমাণ করিবার উপায় নাই যে দ্বৈতবাদ এবং দ্বৈতাদ্বৈতবাদ উভয়ই এক কিম্বা এই দুই মতে কোন প্রভেদ নাই। অথবা এই দুই মতে যে পার্থক্য, তাহা শুধু যুক্তি ও ব্যাখ্যাগত পার্থক্য। এরূপ বলিলেও চলিবে না।

যখন এই দুই মতে বিশেষ প্রভেদ আছে তখন আর পাঠ্যগ্রন্থ সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের একতা কিরূপে থাকিল? সীতানাথ বাবু শিক্ষার যে প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমার কোন মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও পরস্পর বিরোধী বিষয় আলোচনা করিয়া সকল সময়ই কিন্তু একটী মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু মীমাংসাও যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়, তবেই বিশেষ ক্ষতির কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থ সকলের প্রত্যেক খানিই কি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আলোচনা দ্বারা প্রত্যেক তত্ত্ব সম্বন্ধে শেষে এক মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে। যদি সকল গ্রন্থেই এইরূপ একতা থাকে, তাহা হইলে আর সর্ব্ববাদীসম্মত না হইবে কেন?

দুই চারি খানি সর্ব্ববাদীসম্মত গ্রন্থের নাম করিতে উক্ত প্রাপ্ত-প্রবন্ধ লেখক যদি অসমর্থই হন,আর সেরূপ পুস্তক যদি বাস্তবিকই না থাকে,তাহাতেও উক্ত বিদ্যালয়ের পাঠ্য নির্ব্বাচক কমিটি দোষমুক্ত হইতেছেন না। কারণ তাঁহারা শিক্ষার অন্যরূপ ব্যবস্থা অতি সহজেই করিতে পারিতেন। যখন তাঁহারা জানেন ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যগুলি সর্ব্ববাদী সম্মত, তখন তাঁহারা পরস্পর বিরোধী মতাক্রান্ত গ্রন্থ পাঠ্যের জন্য নির্দ্দেশ না করিয়া, সেই সকল মূল সত্যের পরিপোষক যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা অক্লেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। কিম্বা সেইরূপ বিষয় সকল সংকলন পূর্ব্বক শিক্ষা দিতে পারিতেন। পরস্পর বিরোধী পুস্তক না পড়াইয়া একখানা গ্রন্থ পড়াইলেও কার্য্য চলিতে পারিত, তাহাহইলে আর এরূপ আত্মবিরোধীতার দোষে দোষী হইতে হইত না।

সীতানাথ বাবু এই পত্রে প্রাপ্ত-প্রবন্ধ-লেখকের অনেকগুলি ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার পত্র পাঠ করিয়াও প্রাপ্তপ্রবন্ধ লেখকের ভ্রম ঘুচিতেছে না। কারণ সহজজ্ঞান সম্বন্ধে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় যে অনাস্থা প্রকাশ পাইয়াছে,তাহা সীতানাথ বাবুর প্রতিবাদ পাঠ করিয়াও বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচের কারণ দেখা যাইতেছে না। সীতানাথ বাবু তাঁহার পুস্তকের যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা দ্বারাও যে সহজজ্ঞানের প্রতি আস্থা প্রকাশ পাইতেছে এমন বুঝিবার সুবিধা হয় নাই। পাঠকগণ কি সীতানাথ বাবুর উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিয়া সহজ জ্ঞানে তাঁহার আস্থা আছে বলিয়া বুঝিতেছেন? তিনি বলিতেছেন "আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যে বিশ্বাস করি"। আত্ম-প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যে বিশ্বাস করেন যদি তাহা আর দশটী প্রমাণ দ্বারা সুসিদ্ধ হয়,নতুবা নহে। ইহাদ্বারা কি আত্ম-প্রত্যয়ের উপর আস্থা প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে? সহজজ্ঞানকে যে অজ্ঞানতার নাম মাত্র বলা হইয়াছে, তাহাও সীতানাথ বাবুর উদ্ধৃত অংশ দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূলতত্ব সমুহকে তিনি যে কোন স্থানে অজ্ঞানতার নামান্তর মাত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কথা উক্ত প্রাপ্ত প্রবন্ধে কোথাও বলা হয় নাই। "সহজ জ্ঞান"কে অজ্ঞানতার নামান্তর নামে উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়াই লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সীতানাথ বাবুর এরূপ নূতন কথা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আত্ম প্রত্যয়ে আস্থাবান হওয়া, আর আত্ম প্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য যদি অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে সেই সত্যে বিশ্বাসী হওয়া কিছু এক কথা নয়। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় সহজজ্ঞানের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে, বলিলে বোধ হয় কোন ভুল করা হয় না।

সৃষ্টিকৌশলের দ্বারা স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় যে দোষারোপ করা হইয়াছে, তাহা সীতানাথ বাবু উক্ত পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা পড়িলেও বুঝা যায়। সীতানাথ বাবু নিজ পত্রেই ধর্ম্মজিজ্ঞাসা হইতে উদ্ধৃত করিতেছেন যে "সৃষ্টি-কৌশলের যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অসীমতা ও একত্ব সপ্রমাণ হয় না এই যুক্তি অসম্পূর্ণ"। দোষারোপ করা আর কাহাকে বলে? সীতানাথ বাবু উক্ত প্রমাণে দোষারোপ করিয়া ভাল করিয়াছেন কি মন্দ করিয়াছেন, উক্ত প্রাপ্ত প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। সুতরাং সীতানাথ বাবু আত্ম-সমর্থনের প্রয়াস না পাইলেও পারিতেন এবং ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকায় এই কথা আছে এসকল না বলিলেও চলিত।

প্রাপ্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছিল যে "ধর্ম্ম শিক্ষায় মনুষ্যের আত্মাকে সীমা বিশিষ্ট বলা হইয়াছে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় ইহার বিরোধী মত ব্যক্ত হইয়াছে এবং আত্মার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইয়াছে। "সীতানাথ বাবু ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন, মনুষ্যের জ্ঞান, প্রীতি ও শক্তিকে কোন স্থানে অসীম বলা হইয়াছে, ইহা দেখাইয়াদিলে বাধিত হইলাম" জ্ঞান, প্রীতি, শক্তিকে সীতানাথ বাবু মনুষ্যের আত্মার লক্ষণ রূপে কোন স্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন কি না, তাহা জানি না। কিন্তু তিনি জ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই জ্ঞানকেই একমাত্র বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ৬৯ পৃষ্ঠায় লেখা আছে,—"আদত খাটি বস্তু হচ্ছে জ্ঞান, আমরা ইহাকে অনেক স্থলে আত্মা বলিয়াছি, ইহাকে আত্মা বলিলেই যথেষ্ট হয়।" অন্যত্র এই জ্ঞানের দুইটী দিকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,তাহার একটী বিষয় ও অপরটী বিষয়ী। কিম্বা জ্ঞাত ও জ্ঞাতা। কিন্তু বিষয় আর বিষয়ী যেরূপই নাম দেওয়াহউক না কেন,উহা "একই জ্ঞানবস্তুর দুইটী অচ্ছেদ্য দিক মাত্র।" আবার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ২৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে,"আমরা ক্রমে দেখাইব,—এখন বলিলে পাঠক সে কথা হয়ত ভাল বুঝিতে পারিবেন না—যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা যে জগৎটাকে লইয়া লুফালুফি করিতেছে, তাহা নহে; যাহাকে আমরা ব্যক্তিগত জ্ঞান বলি, তাহা একান্ত ব্যক্তিগত নহে। ব্যক্তিগত জীবনে তাহার প্রকাশ সীমাবদ্ধ হইলেও মূলে তাহা সীমাবদ্ধ নহে।" আবার ব্রহ্মজিজ্ঞাসার ১২১ ও ১২২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে; "একটী রহস্য আমরা ভেদ করিতে পারি নাই। এই নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় পূর্ণ পুরুষ পূর্ণ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কিরূপে নিজের মধ্যে অসীম পরিবর্ত্তন প্রবাহ উৎপাদন করেন, কিরূপেই বা আপনায় পূর্ণ জ্ঞানের কিয়দংশ জীবের অপূর্ণ জ্ঞানরূপে প্রকাশ করেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি না।" সীতানাথ বাবু নিজেই

যখন বলিতেছেন যে "কিরূপেই বা আপনার পূর্ণ জ্ঞানের কিয়দংশ জীবের অপূর্ণ জ্ঞানরূপে প্রকাশ করেন।" ইহা বুঝিতে পারেন না, তখন তিনি যাহা বুঝিতে পারিয়াছেন অর্থাৎ "ভিন্ন ভিন্ন আত্মা যে জগৎটাকে লইয়া লুকালুকি করিতেছে ,তাহা নহে" এবং "মূলে তাহা (জ্ঞান বা আত্মা) সীমাবদ্ধ নহে" এই কথাকেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মত বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। সুতরাং সীতানাথ বাবু প্রাপ্ত প্রবন্ধ লেখকের যে ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার বিশেষ কোন হেতু দেখা যাইতেছে না।

উপরে যে যে স্থল উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নাই। তাহার দুই দিকই বলুন আর যাই বলুন, মূল বস্তু এক জ্ঞান ভিন্ন দুই নহে। ইহারই নাম অদ্বৈতবাদ। সীতানাথ বাবু ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মুখবন্ধেও বলিয়াছেন "প্রচলিত প্রকৃতিবাদের ন্যায় প্রচলিত দ্বৈতবাদ যাহা জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র পৃথক বলিয়া বিশ্বাস করে"। ইহাদ্বারাও অদ্বৈতবাদের অর্থ বুঝা যাইতেছে। সুতরাং যদি বলা যায় যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় অদ্বৈতবাদের মতকেই প্রকারান্তরে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে কি দোষ হয়? শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়দ্বয় দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচার করিয়া থাকিলেও ব্রাহ্মসমাজের লোকে ইহার সংবাদ বেশী জানে না। এবং ইহাকে তাঁহারা আপনাদের একটী মত বলিয়াও গ্রহণ করেন নাই তাহাতেই ইহাকে নূতন বলা হইয়াছে। যাহা হউক নূতন হইলেই কিছু দোষের হয় না। সুতরাং এ মতকে নূতন বলাতে বোধ হয় কোন অপকারের সম্ভাবনা নাই।

ঐ বিদ্যালয়ের অহিত হউক এমন ভাব উক্ত প্রাপ্ত প্রবন্ধ দ্বারা কি প্রকাশ পাইতেছে? অমঙ্গল হউক এরূপ ইচ্ছা থাকিলে বোধ হয় প্রবন্ধ লিখিবার কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইত না। এরূপ স্থলে অর্থাৎ যখন পাঠ্য পুস্তকের নাম প্রকাশ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তাহাতে পরস্পর অনৈক্য ও বিরোধীতা যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহা দেখাইয়া দিলে, বিদ্যালয়ের কি ক্ষতি হইতে পারে? উক্ত বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণের সহিত এ বিষয়ে যে এক বারে আলোচনা হয় নাই,এমনও নহে। তাহাতে প্রতিকার না হওয়াতেই আলোচনার জন্য পত্রিকার সাহায্য লওয়া হইয়াছে। এ সকল বিষয়ে ঔদাসীন্যই বরং অমঙ্গলকর। আলোচনায় সেরূপ ক্ষতির কি সম্ভাবনা আছে? আমরা মনে করি যাঁহারা উক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন, তাঁহাদিগেরই ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের অনৈক্যের জন্য বেশী অসুবিধানুভব হইবার কথা। উক্ত প্রাপ্ত প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়া তাঁহাদের কাজের বিঘ্ন না হইয়া বরং সুবিধাই হইবে।

সীতানাথ বাবু প্রাপ্ত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কোন পুস্তক বা মত বিশেষের সমালোচনার ইচ্ছা কিরূপে অনুভব করিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। উক্ত প্রবন্ধে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে কোন্ কোন্ বিষয়ে অনৈক্য আছে,তাহারই উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাকে কি সমালোচনা বলে। উক্ত প্রবন্ধে কোন মতেরই স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলা হয় নাই। প্রশংসা বা নিন্দা করা হয় নাই, সুতরাং সমালোচনার ভাব তাহাতে কিরূপে দেখিতে পাইলেন।

১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীর প্রাপ্ত প্রবন্ধ লেখক।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়,

স্বর্গীয়া ব্রহ্মময়ী দেবী ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশেষ হিতৈষিনী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে ব্রাহ্মমাত্রকেই অশ্রুপাত করিতে হইয়াছিল। ব্রাহ্মবালিকাদের শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দেখাইয়া, এবং তজ্জন্য অকাতরে অর্থদান করিয়া তিনি ব্রাহ্মসমাজকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিনায়ক দিগকে অনুরোধ করি তাঁহারা যে ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মময়ী বিদ্যালয় নামে অভিহিত করুন। 'ব্রহ্মময়ী' ও 'ব্রাহ্মিকা' এই দুই শব্দের ধাতুগত অর্থ একই। আর বিদ্যালয়টী চিরস্থায়ী করিবার জন্য ব্রাহ্মমাত্রেই আয়ের উপর টাকায় অন্ততঃ আধ পয়সা করিয়া দান করুন। ৫০ জন ব্রাহ্ম এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলে, আমি এ প্রকারে অর্থদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।*

নিবেদক,
শ্রীনাথ দত্ত।

শ্রদ্ধাস্পদ
শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

১লা আশ্বিনের তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশিত "আমাদের উদ্দেশ্য এবং অভাব" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। আপনি যুবক এবং বয়স্ক ব্রাহ্মদিগকে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া স্বীয় স্বীয় আয়ত্তাধীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বাস্তবিকও এই উভয় দল সকল প্রকার অসদ্ভাব পরিহার করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইলে ব্রাহ্মসমাজের নির্জীব

* শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দত্ত মহাশয় তাঁহার পত্রে যে দুইটী প্রস্তাব করিয়াছেন তাহার প্রথমটী সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে,—পরলোকগতা শ্রদ্ধেয়া ব্রহ্মময়ী দেবীর নাম চিরস্মৃতিপথারূঢ় করিবার জন্য ব্রাহ্মগণ যদি স্বতন্ত্রভাবে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিশেষ ভাবে এরূপ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, ইহা বোধহয় প্রার্থনীয় নহে। শ্রীনাথ বাবুর ২য় প্রস্তাবের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। ব্রাহ্ম সাধারণ ইচ্ছা করিলে অতি সহজে এই উপায়ে বিদ্যালয়ের সহায়তা করিতে পারেন। তাঁহাদের একটী প্রধান অভাব এই বিদ্যালয় দ্বারা পূর্ণ হইবে বলিয়া যখন আশা করা যায়, তখন প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই এই বিদ্যালয়ের সহায়তা করা যে বিশেষ কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ কি? তাহা হইলে স্কুলটী অনায়াসে স্থায়ী হইয়া সকলের কল্যাণে আসিতে পারে। সম্প্রতি যে ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেও যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হইবে। শ্রীনাথ বাবুর প্রস্তাবানুসারে যদি ব্রাহ্মগণ অর্থ সাহায্য করেন, তদ্দ্বারা এই উভয় কার্য্যই সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে। এজন্য আমরা ব্রাহ্মবন্ধুগণকে শ্রীনাথ বাবুর প্রস্তাব সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতে অনুরোধ করিতেছি। তঃ সঃ

ভাব দূর হইবে না। যে দিন যুবকদিগের উৎসাহ এবং অনুরাগ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হইবে সে দিন ব্রাহ্মসমাজে নবজীবন আবির্ভূত হইবে। যাঁহারা এই উভয় দলকে সদ্ভাবে মিলাইতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের মহোপকার সাধন করিবেন। আশা করি বয়স্ক ব্রাহ্মগণ এবিষয়ে মনোযোগী হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ব্রাহ্ম যুবকদিগকে ভালবাসা এবং স্নেহের সহিত আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন।

আপনার প্রবন্ধের দুই একটী কথা সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার আছে। আপনার এবং তত্ত্বকৌমুদীর পাঠক দিগের অবগতির জন্য তাহা লিখিতেছি।

১। আপনি লিখিয়াছেন "যুবকেরা যেন মনে না করেন যে তাঁহাদের সংস্কার-বাসনা চরিতার্থ হইলেই সকল কার্য্য শেষ হইল।" আপনি প্রধানতঃ যুবকদিগকেই সংস্কারের পক্ষপাতী মনে করিতেছেন। যুবকদিগের মনে সংস্কার-বাসনা প্রবল রহিয়াছে ইহাই আপনার ধারণা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা ঠিক নয়—যুবকদিগের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহারা অনেক বয়স্ক ব্রাহ্ম অপেক্ষা রক্ষণশীল। পক্ষান্তরে বয়স্ক ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও এমন লোক আছেন, যাঁহারা সংস্কার বিষয়ে অত্যন্ত উদার মত পোষণ করেন। সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মিরারে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ চন্দ মহাশয় স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, আমি জানি আমার অনেক যুবক বন্ধু স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে তেমন উদার এবং উন্নত মত পোষণ করেন না। জাতিভেদ, বাল্যবিবাহ, ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক বয়স্ক ব্রাহ্ম অতি উদার এবং উচ্চ মত পোষণ করেন। যুবক বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে এক দল লোক আছেন যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজে 'বিশুদ্ধ মত' এবং বিশুদ্ধ সামাজিক নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিতে সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন।

২। যে সকল যুবক সংস্কারের পক্ষপাতী তাঁহারা কখনই তাঁহাদের সংস্কার-বাসনা চরিতার্থ হইলেই সকল কার্য্য শেষ হইল মনে করেন না। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন ব্রাহ্মসমাজে সংস্কার ও উপাসনা যুগপৎ চলিবে। সংস্কার-স্পৃহা নিবিয়া গেলে উপাসনা ম্লান হইবে, পক্ষান্তরে উপাসনা পরিত্যাগ করিলে সংস্কার বাসনা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। এই দুই ভাবকেই ব্রাহ্মসমাজে জাগ্রত রাখিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন 'যুবকগণ কেবল সংস্কার নিয়াই ব্যস্ত' সংস্কারের পরিপোষক কোন নিয়ম প্রণালী পাশ করিতে হইলে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া উৎসাহের সহিত তাহাতে যোগ দেন। কিন্তু সাধন ভজনে তাহাদের অনুরাগ নাই।' স্থলবিশেষে তাঁহাদের এমত ঠিক হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাঁহারা যে এ প্রকার মত পোষণ করিয়া যুবকদিগের প্রতি অবিচার করেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যুবকদিগের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ধর্ম্মের অনুরোধে পার্থিব স্বার্থ যথেষ্ট পরিত্যাগ করিয়াছেন। সাধন ভজনে অগ্রসর না হইলেও যুবকগণ সাধারণতঃ উপাসনাহীন অথবা উপাসনায় তাঁহাদের অনুরাগ নাই, একথা বলা নিতান্তই অসঙ্গত। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় সংস্কারের পক্ষপাতীদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষণশীল ব্রাহ্মগণ একটুকু উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনের কিছুকাল পূর্ব্বে অথবা স্থাপন সময়ে এ ভাব একটুকু অধিক পরিমাণে জন্মিয়াছিল। যাহা হউক রক্ষণশীল এবং উদার নৈতিক ব্রাহ্মদিগের মধ্যে এ প্রকার ভাব থাকা কোনরূপেই প্রার্থনীয় নয়। সত্যের অনুসরণ করিবার জন্যই সকলে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়াছেন—সত্যের অনুরোধেই সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার এবং কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে। সুতরাং উদার নৈতিক ব্রাহ্মগণ সত্যের অনুরোধেই সংস্কারের পক্ষপাতী। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন বিশুদ্ধমত এবং বিশুদ্ধ সামাজিক নিয়ম এবং বিশুদ্ধ উপাসনা আত্মার মুক্তি পথের সহায়।

৩। আপনি লিখিয়াছেন "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকগণ যদি অগ্রণীদিগকে অগ্রাহ্য করেন, তাঁহারা অবিলম্বেই তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিবেন।" এ সমাজের অধিকাংশ যুবকই হিন্দু সমাজ হইতে আসিয়াছেন। ধর্ম্মের অনুরোধে তাঁহারা পিতা মাতার অকৃত্রিম স্নেহ মমতা, ভাই ভগিনীর সরল ভালবাসা এবং আত্মীয় স্বজনের নিঃস্বার্থ সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজে তাঁহারা অভিভাবক বিহীন অবস্থায় রহিয়াছেন। এখানে যদি বয়স্ক ব্রাহ্মগণ যুবকদিগের সুখ দুঃখে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন, তাঁহাদের ঐহিক এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করেন এবং রোগে শোকে আত্মীয় অথবা অভিভাবকের ন্যায় যুবকদিগকে স্নেহ মমতা দ্বারা পরিপোষণ করেন, তাহা হইলে যুবকগণ আপনাপনি তাঁহাদের নিকট মস্তক অবনত করিবে, শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সহিত তাঁহাদের উপদেশ শুনিবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অনেক স্থানে বয়স্ক ব্রাহ্মগণ যুবকদিগের জন্য এতটুকু করিতে প্রস্তুত আছেন এরূপ বোধ হয় না। দেখিতে পাওয়া যায়, অনেক যুবক জীবনের অনেক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য-সাধনে জীবন মন সমর্পণ করিবেন এরূপ সংকল্প হৃদয়ে পোষণ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে সহানুভূতি, সুবিধা এবং শিক্ষার অভাবে তাঁহাদের জীবনের সেই মহৎ ভাব এবং সাধুসংকল্পগুলি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মসমাজে যুবকদিগের সমবেত শক্তি প্রয়োগ হইতে পারে এমন কোন কার্য্যক্ষেত্র আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার শিক্ষা যুবকগণ পাইতেছেন না। একাকী যে কাজ আরম্ভ করিতে সাহস হয় না, পাঁচজন ধর্ম্মবন্ধু মিলিয়া সেই কাজের অনুষ্ঠান করিলে তাহা নিতান্ত সহজ বলিয়া মনে হয়। বয়স্ক ব্রাহ্মগণ এদিকে মনোযোগ প্রদান করিলে ব্রাহ্মসমাজের যুবকদিগকে সাধুকার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারেন। তাঁহারা যুবকদিগের সঙ্গে সদ্ভাবে মিশিয়া নানা প্রকার সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, এবং জীবনে নিঃস্বার্থপরতা এবং আধ্যাত্মিকতার পরিচয় প্রদান করিতে পারিলে, যুবকগণ কখনই তাঁহাদিগকে অবহেলা করিবেন না। পরন্তু তাঁহাদের সংসর্গে অবস্থান করিয়া সাধুতা এবং মহত্ত্ব লাভ করিয়া কৃতার্থ এবং ধন্য হইবেন।

ব্রাহ্ম পল্লী
ময়মনসিংহ
৮ই আশ্বিন

একান্ত অনুগত
দ্বারকানাথ সরকার।

পত্রপ্রেরকগণের প্রতি নিবেদন।

আমরা নানাস্থান হইতে অনেক গুলি পত্র তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশের জন্য পাইয়াছি। স্থানাভাবে তাহার অধিকাংশই এবার প্রকাশিত হইতে পারিল না। পত্রপ্রেরকগণ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

ব্রাহ্মবালিকা-ছাত্রী-নিবাস—আমরা গতবারে জানাইয়াছিলাম যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা কলিকাতায় একটী ছাত্রী-নিবাস স্থাপন করিবার প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তদনুসারে ১৬ই আশ্বিন ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনে ছাত্রীনিবাস সংস্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে উক্ত দিবস প্রাতঃকালে উপাসনা হইয়াছিল। সম্প্রতি ছয়টী ছাত্রী লইয়া ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু আশা করা যায়, মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ আপনাপন আত্মীয়াদিগকে এই ছাত্রী-

বিশ্বাসে রাখিতে কখনই পরাঙ্মুখ হইবেন না। মফস্বলস্থ ব্রাহ্মগণের সুবিধার জন্যই যখন ছাত্রীনিবাস প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন তাঁহারা যে এই কার্য্যে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—গত ১২ই আশ্বিন (২৭এ সেপ্টেম্বর) অপরাহ্ণে সিটি কলেজ হলে,মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় মহাশয়ের পরলোক গমনের দিন উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উদ্যোগে একটী সভা হইয়াছিল। এই সভায় শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, বি এল, এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ মহাশয় প্রধানতঃ বক্তৃতা করেন। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক জনের উপর বক্তৃতা করিবার ভারার্পণ করা হইয়াছিল, ঘটনা ক্রমে তাঁহারা সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রথমোক্ত বক্তাদ্বয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে, সভাপতিমহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় অনারেবল জষ্টিশ ডাঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কেহ কেহ আনুসঙ্গিকরূপে কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। সভাগৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্থানাভাবে অনেককে চলিয়া যাইতে হইয়াছিল। রামমোহন রায়ের প্রতি যে লোকের দিন দিন শ্রদ্ধার ভাব বাড়িতেছে ইহা একটী বিশেষ শুভলক্ষণ। এ সময় রাজার স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলে, অতি সহজেই তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন সংস্থাপিত হইতে পারে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ এ জন্য যে কমিটি গঠিত হইয়াছে তাঁহারা সত্বর হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

সাহায্য প্রার্থনা—আমরা কিছু দিন পূর্ব্বে খাসিয়াস্থ ব্রাহ্মগণের একখানা প্রার্থনা-পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন যে স্থানে স্থানে খাসিয়াগণের জন্য উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণ করা অতি আবশ্যক হইয়াছে। গৃহাভাবে অনেক স্থানের কার্য্য ভাল চলিতেছে না। খাসিয়াগণের গৃহ যে প্রণালীতে নির্ম্মিত হয়, তাহাতে অধিক সংখ্যক লোক একত্রে কোন কাজ করিতে পারা যায় না। এজন্য আমাদিগের খাসিয়াস্থ বন্ধুগণ বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী (যিনি খাসিয়াদিগের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন) মহাশয়ের নিকট সর্ব্বদাই তাহাদের উপাসনা গৃহের অভাব জানাইয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। চেরাপুঞ্জি ও মৌসমাই নামক স্থানদ্বয়েরই গৃহাভাবে বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ব্রাহ্মগণ যদি অর্থ সাহায্য না করেন তবে সেই দরিদ্র খাসিয়াগণের দ্বারা গৃহ প্রস্তুতের কোন সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। সুতরাং আমরা আমাদের পাঠক ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী সকলের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে তাঁহারা এই শুভকার্য্যের জন্য কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া খাসিয়ায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করুন। এরূপ কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিলে অর্থের যে সার্থকতা হইবে সে বিষয়ে আর কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আশা করি অর্থাভাবে খাসিয়াগণের উপাসনা-গৃহ নির্ম্মাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে না। ইতিপূর্ব্বে যে প্রার্থনাপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল তদ্দৃষ্টে কেহ কেহ উক্ত কার্য্যের সাহায্যার্থ টাকা পাঠাইয়াছেন। এ জন্য আমরা তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সমালোচনা।

বন প্রসূন—শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত। এই পুস্তকের মধ্যে "কেন আছি," ও "আমি কার?" নামক দুইটী প্রবন্ধ আছে। দুইটী প্রবন্ধেই লেখকের চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। চিন্তাশীল মানবের মনে সচরাচর যে সকল চিন্তার উদ্রেক হয় তাহার মধ্যে বিশেষ ঐক্য থাকে। তাহার কারণ মানবের মন একই রূপে গঠিত। এই প্রবন্ধ দুটীও সেই রূপ ধরণের। এ জন্য এই দুইটী প্রবন্ধে নূতন বিশেষ কিছু না থাকিলেও পাঠকের পক্ষে উপকারে আসিবার সম্ভাবনা আছে।

আহার বিজ্ঞান—শ্রীরসিকলাল ঘোষ প্রণীত। রসিক বাবু পুস্তকের প্রবন্ধেই লিখিতেছেন "আজ কাল নিরামিষ ভোজন লইয়া ইউরোপে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে। সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের চিকিৎসকগণই বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ, মনুষ্যের স্বাভাবিক আহার কি তাহা অবধারণ করিতে বিশেষ যত্ন পাইতেছেন।" সুতরাং বিষয়টী যেরূপ গুরুতর তাহাতে এরূপ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার সুমীমাংসার সম্ভাবনা নাই। রসিক বাবু প্রথমতঃ আমাদের আহার্য্য পদার্থে কি কি যৌগিক পদার্থ থাকে, তাহার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। তৎপরে আমিষ কি নিরামিষ আমাদের আহার্য্য তাহারি বিচার করিয়াছেন। আমিষ ভোজনে "শরীর পোষণ ও রক্ষণোপযোগী উপাদান গুলি অতি সহজে সমীকরণোপযুক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়" একথা সকলেই জানেন। তাহার সপক্ষে পুস্তক লিখিবার আবশ্যক হয় না। আমিষ না খাইয়া নিরামিষ ভোজন দ্বারাও যে শরীর রক্ষা হইতে পারে রসিক বাবু সংক্ষেপে তাহাই দেখাইয়াছেন। পুস্তকখানির উপরে "প্রথম স্তবক" লেখা আছে, আশা করি "দ্বিতীয় স্তবকে" এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনা থাকিবে।

সাকারোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান—শ্রীতারকচন্দ্র ঘোষ বি এ, কর্ত্তৃক প্রণীত। লেখক পুস্তকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন যে ঈশ্বরকে না পাইলে আমাদের চলে না। এই মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে প্রচলিত সাকার উপাসনা কতদূর উপযোগী তাহাই আলোচনা করা এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। পুস্তক লিখিতে তিনি শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। পুস্তকের স্থানে স্থানে যে বিদ্রূপ আছে তাহা না থাকিলেই ভাল হইত। অন্যান্য বিষয়ে পুস্তকখানি বেশ হইয়াছে। গ্রন্থকার শাস্ত্রাদি হইতে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া নিজের পক্ষ উত্তমরূপে সমর্থন করিয়াছেন।

হরিদাসের ধর্ম্মকথা—পুস্তকখানি যেরূপ ভাষায় ও যেরূপ কথোপকথনচ্ছলে লেখা হইয়াছে। তাহাতে বুঝা যায় যে পুস্তকখানি সাধারণ লোকের জন্য লিখিত হইয়াছে। লেখকের উদ্দেশ্য সাধারণ লোককে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যগুলি বুঝাইয়া দেওয়া। এরূপ ধরণের পুস্তক যত প্রচারিত হয়, ততই ভাল। কারণ শিক্ষিত লোকেরা আপনাদের জ্ঞানানুশীলন দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সকল অতি সহজেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু অশিক্ষিত লোকের পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্ম বুঝা তত সহজ নয়। কিন্তু লেখক যাহাদের জন্য পুস্তক লিখিয়াছেন কয়েক স্থানে বিষয় নির্ব্বাচন তাহাদের উপযোগী হয় নাই। কেবল যুক্তি মার্গ অবলম্বন করিলে তাহারা কখনই বুঝিতে পারিবে না। লেখক যদি "আমি কি" "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূল শক্তি" প্রভৃতি কথার অবতারণা না করিতেন তাহা হইলে ভাল হইত। মোটের উপর পুস্তক খানি ভাল হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্ম সাধারণের সংখ্যা গণনার ফারম ব্রাহ্মসমাজ সকলে প্রেরিত হইয়াছে। আগামী ১৫ই অক্টোবরের মধ্যেই এই সংখ্যা গণনা কার্য্য শেষ হওয়া উচিত। সুতরাং যাঁহারা এ পর্য্যন্ত উক্ত ফারম প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা যেন অবিলম্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে (২১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা) চাহিয়া পাঠান। এবং সকলেই একটু উদ্যোগী হইয়া উক্ত দিবসের মধ্যে আপনাদের সংখ্যা পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়া দেন। সকলের মনোযোগ ভিন্ন এ কার্য্য কখনই সুসিদ্ধ হইবে না।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২১এ আশ্বিন মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ২২এ আশ্বিন প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
১৩শ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক শুক্রবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

প্রার্থনা।

রচিলে আসন যদি এহৃদে তোমার,
তবে কেন জননী গো লুকালে আবার?
কলঙ্কিত প্রাণলয়ে, আছিনু মুমূর্ষু হয়ে,
গভীর বিষাদ পঙ্কে, আতঙ্কে ঘৃণার;
স্নেহের অঞ্চল দিয়া, মুছাইয়া দিলে হিয়া,
কোলেতে লইলে তুলে চুম্বি বারবার;
প্রসাদ অমিয় দানে, বাঁচাইলে শুষ্ক প্রাণে,
প্রকাশি প্রেমের জ্যোতি ঘুচালে আঁধার;
আবার কি দোষে গো মা, হারাইনু আজি তোমা,
গুটাইলে কেন আজ হস্ত করুণার।
আর বার দয়া করে, এস মা প্রাণের ঘরে,
বিঘ্ন ব্যবধান যত হ'ক ছারখার;
তোমার কোলেতে উঠে, পিয়ে প্রেম সুধালুটে,
হৃদয়ের তৃষ্ণা যত মিটুক আমার।

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে শুভদাতা কল্যাণময় পরমেশ্বর! তোমার রাজ্যে চিরদিন অপ্রেম ও অসত্য প্রবল থাকিতে পারিবে না জানি, এবং ইহাও জানি যে তুমিই একমাত্র এ রাজ্যের রাজাও প্রতিপালক। অকল্যাণকর যাহা তাহাকে তুমি কখনই প্রবল হইতে দিবে না। পরিশেষে তোমারই, জয় হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মধ্যে তোমার বিরোধী যে সকল ভাব এখনও প্রবল রূপে আধিপত্য করিতেছে, তাহা যে চির দিন থাকিবে না, এবং তোমার যে সকল সন্তান তোমার সত্য মঙ্গল ভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতেছে, তাহাদিগের শক্তি সামর্থ্য যে বেশী দিন তোমার বিরুদ্ধে কার্য্যকরী হইবে না, তাহাতে সংশয়ের কারণ নাই। কিন্তু প্রভু আমাদের দুর্ব্বল ও অবিশ্বাসী প্রাণ এসকল জানিয়াও বেশী সময় তোমার কল্যাণকর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে পারে না। অপ্রেম ও অসত্যের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমরা নির্ভরশীলতার সঙ্গে যে অপেক্ষা করিব এবং তোমার কার্য্য তুমিই সম্পন্ন করিবেই করিবে জানিয়া যে নিশ্চিন্ত থাকিব, এমন ভাব আমাদের প্রাণে প্রবল হইতেছে না। আমরা আমাদের সামান্য জ্ঞান ও সামান্য শক্তি লইয়াই এই গুরুতর কার্য্য সাধনে অগ্রসর হই, তাইতে আমাদিগকে পদে পদে অন্ধকার দেখিতে হয়। অকৃতকার্য্য হইয়া পদে পদে আমাদিগকে নিরাশ হইয়া পড়িতে হয়। আমরা কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণই সাধন করি। প্রভু সুমতি প্রদান কর। আমরা তোমার উপর নির্ভরশীল হইয়া যাহাতে তোমার কৃপার অপেক্ষা করিতে পারি এবং তোমার প্রদর্শিত পথে চলিতে সক্ষম হই, তুমি আমাদিগকে এরূপ শুভমতি প্রদান কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

ভাবুকতা ও বিশুদ্ধমত—ভাব-প্রধান ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধমতের পক্ষপাতীগণকে সচরাচর এরূপ বলিয়া থাকেন যে তোমার সেই বিশুদ্ধ মত দ্বারা আমার কি হইবে? যদি তাহাতে আমার আত্মার পিপাসা নিবৃত্ত না হইল। আমি পিপাসিত প্রাণ, পিপাসার জ্বালায় আমি অস্থির। যাহাতে পিপাসার শান্তি হয় তাহা পাওয়াই আমার বিশেষ প্রয়োজন। যাতে আরাম পাই তাহা লইয়াই আমাকে তুষ্ট হইতে হইবে। তোমার বিশুদ্ধ মত শুষ্ক বালুকারাশির মত, উহা আমার পিপাসার শান্তি করে না। আমি চাই জলাশয় তুমি দেখাইয়া দেও বালুকাময় স্থান। শুষ্ক বালুকা চিবাইয়া ত আর আমার পিপাসার শান্তি হইবে না। আমি নিকটে যে জল পাইতেছি, তাহা দুর্গন্ধময় ও অপরিষ্কার যেরূপই হউক না কেন তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তদ্দ্বারাই আমার পিপাসার শান্তি হইবে। তোমার বালুকা আমার প্রাণ তৃপ্ত করিবার পক্ষে কোন সাহায্যই করে না। তোমার বিশুদ্ধ মত লইয়া তুমি থাক, আমি যাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় তাহারই অনুসরণ করি। আপাততঃ দেখিতে গেলে ভাব-প্রধান ব্যক্তির এই কথা বেশ সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। কারণ যাহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না তাহা লইয়া সে কি করিবে। কিন্তু বিবেচক ব্যক্তি যখন দেখেন যে ঐ অপরিষ্কৃত জল যদিও আপাততঃ প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতে পারে বটে এবং উহা পান করিলে পিপাসারও শান্তি হয় বটে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অন্তবিধ কষ্টকর

পীড়ার হেতু-ভূত হইয়া বিশেষ কষ্ট দেয়। তৃষিত জল পানে যে তৃপ্তিটুকু পাওয়া যাইতে পারে, শরীরকে অসুস্থ করিয়া তাহাই আবার কত অধিক পরিমাণে কষ্ট প্রদানের হেতু-স্বরূপ হয়। তখন সে পিপাসার কষ্টকে সামান্য মনে করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত সেই বালুকাময় স্থানের দিকেই যায়, কারণ সে জানে যে যদি সহিষ্ণুতার সহিত পরিশ্রমপূর্ব্বক সেই বালুকারাশির নিম্ন প্রদেশ-প্রবাহিত সলিলরাশি আবিষ্কার করিতে পারি, যদি ধৈর্য্য ধরিয়া বালুকার ভিতর হইতে বিমল সলিল বাহির করিতে পারি, তাহা হইলে সেই বিমল সলিলপানে প্রাণে যে আরাম আসিবে, তাহাতে আর কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। এনিমিত্ত সুবোধ বিবেচক সাধক সহিষ্ণুতার সহিত সেই বিশুদ্ধ মত হইতেই প্রাণের আরামদায়ক সলিল আবিষ্কারের প্রয়াসী হন। প্রাণের ব্যাকুলতায় যে কোন বস্তু দ্বারা সেই ব্যাকুলতাকে নিবৃত্ত করিতে যাওয়া সুবুদ্ধির কার্য্য নয়। কিন্তু উপযুক্ত বিবেচনা ও সহিষ্ণুতার সহিত সেই বস্তুর জন্যই অপেক্ষা করা উচিত এবং সেই বস্তুর অন্বেষণার্থই পরিশ্রম করা উচিত, যাহাতে প্রাণ আরাম পাইবে ও সুস্থ হইবে। আরাম অনেক জিনিষে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্য ও আরাম এই উভয় সকল বস্তু হইতেই পাওয়া যায় না। একমাত্র আরাম প্রয়াসীকে কখনই সুবিবেচক নাম দেওয়া যাইতে পারে না। কিন্তু আরাম ও স্বাস্থ্য যাহার লক্ষ্য সেই বাস্তবিক সুবিবেচক। শুধু প্রাণের আবেগে চালিত না হইয়া পিপাসা এবং জ্ঞানের উপযুক্ত যুক্তি শুনিয়াই চলা উচিত।

প্রকৃত ভক্ত—মহর্ষি বাল্মিকি সীতার চরিত্রে যে অতুলনীয় সতীত্বের ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, অনুরাগের ঐকান্তিকতার প্রকাশক যে সকল ঘটনায় সীতা সতী সমাজের আদর্শ স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন; তাঁহার মধ্যে দুইটী চিত্রের প্রতি সর্ব্বাগ্রে আমাদের দৃষ্টি পতিত হয়। এক—তাঁহার অশোকবনে অবস্থিতির সময়ের ব্যবহার। অপর তাঁহার বাল্মীকির বনে রাম কর্ত্তৃক পরিত্যক্তাবস্থার ব্যবহার। প্রথমোক্ত সময়ে যে সকল নির্যাতন ও প্রলোভন দ্বারা তাঁহার মনকে পরিবর্ত্তন করিবার জন্য যাদৃশ কৌশল অবলম্বনের কথা বর্ণিত আছে, তাহা রামায়ণ পাঠকের অবিদিত নাই। সীতা তাহাতে অবিচলিত। তাঁহার অন্যদিকে দৃষ্টি নাই অন্য কথা ভাবিবার অবসর নাই। রামের প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি নাই। বাল্মিকির বনেও সীতার সেই ভাব। রামগত-প্রাণ হইয়াই তিনি তখন জীবন ধারণ করিতেছিলেন। কিন্তু সীতাজীবনের এই দুইটী ঘটনার মধ্যে ২য় স্থলেই তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য্য ও সতীত্বের মনোহারিণী মূর্ত্তি বিশেষ ভাবে প্রতিভাত হইতেছে। কারণ প্রথম স্থলে সীতা যে রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার নিজেরই অনেক পরিমাণে দোষ লক্ষিত হয়। তিনি নিজেই লোভ দ্বারা পরিচালিত হইয়া রামকে স্বর্ণ মৃগের অনুসরণে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই তিনি রাম হারা হইয়াছিলেন। সুতরাং এ অবস্থায় নিজ অবিবেচনার জন্য সর্ব্বদাই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইয়া রামের প্রতি প্রবল অনুরাগ প্রকাশ পাওয়া অতি স্বাভাবিক। এরূপ অবস্থায় তাহার মন স্বতঃই রামের প্রতি ধাবিত ও অনুরক্ত হইবার জন্য ব্যস্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। এসময় অন্য চিন্তা মনে আশা কখনই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু দ্বিতীয় স্থলে সীতা জানেন তাঁহার কোনই অপরাধ নাই, অথচ অকারণে তিনি রামকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলেন। এরূপ স্থলে স্বভাবতঃ মানুষের প্রাণে অভিমান উপস্থিত হইয়া থাকে এবং উপেক্ষিত হইয়া প্রিয়জনের প্রতিও মনের অনুরাগের ন্যূনতা হইতে পারে। কিন্তু সীতা এখনও সম্পূর্ণরূপে রাম চিন্তাতেই নিমগ্না—নিয়ত তাঁহার অনুধ্যান তাঁহার মঙ্গলকামনা ভিন্ন অন্যভাব তাহার মনে নাই। তাঁহার প্রাণ তখনও সম্পূর্ণরূপে রাম কর্ত্তৃকই অধিকৃত। সুতরাং এখানেই বাস্তবিক অনুরাগীর অবস্থা প্রকাশ পাইতেছে। যে অনুরাগ উপেক্ষা ও আদর সকল অবস্থায় সমভাবে অবস্থিতি করে, তাহাই প্রকৃত অনুরাগ নামে অভিহিত হওয়া উচিত। উপেক্ষা পাইয়াও যাহার প্রাণ প্রেমের পাত্র হইতে বিচ্যুত হয় না বা তাহার বিরুদ্ধ চিন্তা মনে স্থান দেয় না সেই বাস্তবিক অনুরাগী। সীতার জীবনে যেরূপ হইয়াছিল, ভক্ত সাধক সম্বন্ধে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ভক্ত সাধক যখন নিজ দোষে ঈশ্বর হইতে দূরে পড়েন; যখন লোভ ও সংসারাসক্তি আসিয়া সাধককে ঈশ্বর হইতে দূরে লইয়া যায়, সাধক যদি বুঝিতে সক্ষম হন, যে তাঁহার নিজ দোষেই তিনি ঈশ্বর হইতে দূরে পড়িতেছেন এবং তখন যদি মনে হয় ঈশ্বরই যেন সাধককে অন্বেষণ করিতেছেন, সাধকের প্রতি তাঁহার স্নেহ প্রকাশের কোন অংশেই ত্রুটী হইতেছে না সেই অবস্থায় সাধকের অনুরাগ ঈশ্বরের প্রতি ধাবিত হওয়া এবং তাহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। কিন্তু যখন সংসারের বিপদরাশি চারিদিক হইতে এককালে আসিতে থাকে; বিপদের ঘনান্ধকার যখন সাধককে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে—সাধক ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না, কেন তাঁহার প্রতি এরূপ কঠোর শাসন আসিতেছে, তাঁহার প্রিয়তম তাঁহার জন্য এমন কঠিন নিগ্রহ সকল কেন প্রেরণ করিতেছেন। তিনি নিজের অপরাধ খুজিয়া না পান, অথচ দেখেন অনাহূত ভাবে নিয়ত বিপদের উপর বিপদ রাশি আসিয়া তাঁহাকে যেন তাঁহার প্রিয়তমের বিরাগ প্রদর্শন করিতেছে। তখনও যে প্রেমিক তাঁহার প্রিয়তমের প্রতি প্রবল অনুরাগের সহিত তাঁহার জন্যই ব্যাকুল থাকেন এবং ধনজন এবং অপর সকল প্রিয় পদার্থকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই আত্ম-সমর্পণ করিতে সমর্থ হন, তিনিই বাস্তবিক তাঁহার অনুরাগী ও প্রেমিক ভক্ত। সুবিধার সময় অনুকূল অবস্থার সময়, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা এবং যখন তাঁহার প্রদত্ত আনুকূল্য নিয়ত পাইয়া তাঁহাকে সদয় ও সহায়রূপে অনুভব করিবার সুবিধা থাকে, তখন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া, বিশেষ কঠিন বা একটা গুরুতর ব্যাপার নয়। কিন্তু বিপদ দুঃখরাশি যখন চারিদিক হইতে একসঙ্গে উপস্থিত হইয়া সাধকের প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং সেরূপ বিপদ দুঃখ ঘটিবার কোন হেতু অনুভব করিতে সমর্থ না হইয়াও যদি তাঁহাকেই প্রাণারাম রূপে গ্রহণ করিতে দৃঢ়সংকল্প থাকে ও তাঁহাকেই যথাসর্ব্বস্ব জানিয়া তাঁহাতেই অনুরক্তি থাকে, তাহা হইলেই সেই সাধকে প্রকৃত অনুরাগীর

অবস্থা প্রকাশ পায়। তিনিই বাস্তবিক ভক্ত নামে খ্যাত হইবার উপযুক্ত। আমরা বিপদ সম্পদ সকল অবস্থায় যাহাতে সেই প্রিয়তমের প্রতি অনুরক্ত থাকিয়া তাঁহার বিশ্বাসী ও অনুরাগী সন্তান হইতে পারি,সে জন্যই ব্যাকুল হই। সম্পদেও তিনি সম্বল বিপদেও তিনিই সম্বল। সকল অবস্থাতে তাঁহাকেই অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি আমাদের প্রবল হউক।

আমরা কি চাই।—ভাবুকতা ও ক্রিয়াশীলতাতে যে বিরোধ দেখা যায় সেটা বাহিরের। প্রকৃতপক্ষে উহাদের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য দেখা যায় না। মেঘ ঘন হইলে যেমন বৃষ্টি হয়, ভাব ঘন হইলেই তেমনি সেবা আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। বৃষ্টি হইতে রবিকর সহযোগে আবার যেমন বাষ্প উঠিয়া মেঘ জন্মে, সেবা হইতে তেমন ঈশ্বর-কৃপা সংযোগে প্রীতি উঠিয়া ভাব জন্মে। আপনার লোকের সেবায় কাহার না ভাবোদয় হয়। ভাব ও সেবা আসল হইলে দুইটীকেই এক যায়গায় থাকিতে হইবে। যদি নকল হয়, তবেই দুয়ে বিরোধ,নকল ভাব নিষ্ফল, কেননা তাহা কেবল ভাবেই শেষ, নকল সেবা কেবল ভৃত্যের বোঝা বহা মাত্র, তাহা কেবল সেবাতেই শেষ। মেঘ হইতে বৃষ্টি নামিয়া আবার বাষ্প হইয়া মেঘে যেমন ফিরিয়া যায়, ভাব হইতে সেবা বাহির হইয়া আবার যদি ভাবে গিয়া মিলিত হয়, তবে আত্মার স্বাস্থ্য বজায় থাকে।

এক সময়ে আমাদের দেশে ক্রিয়া কাণ্ডের ছড়াছড়ি হইয়া পড়িয়াছিল। বৈষয়িক লোক ক্রিয়াকর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে ভগবানকে ডাকিবে সেই জন্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া কলাপের সৃষ্টি। কালে সেই ক্রিয়া কলাপ দশকর্ম্মে পরিণত হয়; এবং লোকে ভগবানকে ডাকারূপ শাঁস ভুলিয়া অনুষ্ঠানরূপ খোসা লইয়াই পরিতৃপ্ত হয়। সাধকেরা তখন ক্রিয়া কলাপের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিলেন এবং কর্ম্মসূত্রের মত প্রচারিত হইল। তাঁহারা বলিলেন কর্ম্মের ফল অবসম্ভাবী স্বর্গ ও নরক। কর্ম্মে মুক্তি নাস্তি। কেবল পুনঃ পুনঃ জন্ম লাভই সার, আর জ্ঞান ভক্তিতেই মুক্তি। কিন্তু সাধকেরা যে কর্ম্মের সঙ্গে মুক্তির বিরোধ দেখাইলেন তাহা নিরীশ্বর অথবা ঈশ্বরের প্রতি উদাসীনতা সমন্বিত কর্ম্ম, ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম নহে। শেষোক্তরূপ কর্ম্ম যে ভক্তি বা মুক্তির অনুকূল ইহা সকল শাস্ত্রকারেরাই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

আমরা কোন্‌টা চাই। বৈষ্ণবের নিষ্ফল ভাবুকতা না খৃষ্টানের শুষ্ক ক্রিয়া কলাপ। ইহাদের কোনটাই আমরা চাই না। আমরা চাই ভাবুকতা মিশ্র সেবা। যে ভাবুকতায় সেবার প্রবৃত্তি জন্মায় না, তাহাও যেমন পরিহার্য্য; যে ক্রিয়াকলাপে প্রাণ শুকাইয়া যায়, তাহাও তেমনই দূষনীয়। ব্রাহ্মসমাজ খৃষ্টীয়ান বা বৈষ্ণব সমাজ হউক ইহা প্রার্থনীয় নহে। এই উভয় ভাবের মিলনই আমাদের সমাজের ভবিষ্যৎ আশা। আমাদের কাজ যত বাড়ে বাড়ুক না, তাহাতে দুঃখ নাই। কিন্তু গোড়ার কথাটা যেন ভুলিয়া না যাই। কার জন্য কাজ তাহা ভুলিয়া কাজ করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

বশীকরণ।—আমাদের দেশের লোকে বিশ্বাস করে যে এমন মন্ত্র আছে যাহা দ্বারা মানুষ মানুষকে বশীভূত করিতে পারে। যে সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত তথায় যে এই মন্ত্রের বহুল প্রচার হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? পূর্ব্বে কুসংস্কার বলিয়া অনেকে এই মন্ত্র উড়াইয়া দিতেন, এখন আর তাহার যো নাই। ইউরোপের পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া এ বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ঘুমন্ত অবস্থায় যে ঘুম পাড়ায় সে ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর আপন ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিতে পারে।

অধ্যাত্ম রাজ্যে, বিশেষতঃ উহার যে বিভাগে আমাদের বাস তথায় এই বশীকরণ মন্ত্রের মত কিছুর বড় প্রয়োজন। আমাদের দুষ্ট মন কিছুতেই শিষ্ট হইতে বা পোষ মানিতে সম্মত নহে। কতই উহাকে ভুলান গেল, উহাকে বশ করিতে কতই জপ তপ-আদি কৌশল করা গেল, সকলই ব্যর্থ হইল। সে যেমন দুর্ব্বিনীত ও অশিষ্ট ছিল এখনও তেমনই আছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন দেবতার ও রাজার কাজ! স্বর্গের রাজা ভিন্ন এই দুষ্ট মনকে আর কে দমন করিবে? তিনিই উপায় ও ভরসা। সহজে আমরা বশীভূত হইব না। আমাদের বড় তেজ ও অহঙ্কার। আমাদের এক পাও চলিবার শক্তি নাই, অথচ আমরা দর্প করিয়া বেড়াই, যে ব্রহ্মাণ্ড জয় করিতে পারি। এই স্বাধীনতা গর্ব্বিত প্রাণের একমাত্র ঔষধ প্রিয়-দেবতার মোহন মন্ত্র। সংসারে কেমন তিনি মন্ত্র পড়িয়া দিয়াছেন, আর সব লোক আমার আমার বলিয়া অজ্ঞান হইয়া রহিয়াছে।

বিরাট পর্ব্বে বর্ণিত আছে যে উত্তর-সারথি অর্জ্জুন সম্মোহনাস্ত্র প্রয়োগ করতঃ বিনাযুদ্ধে কৌরব সেনা জয় করেন। আমাদের চিত্ত বশীভূত করিবার জন্য সেইরূপ অস্ত্রের প্রয়োজন। ভগবানের বশীকরণ মন্ত্র ভিন্ন কিরূপে আমরা স্বাধীনতা-ব্যাধি হইতে মুক্তি পাই। বৎস যেমন গাভীর, সন্তান যেমন জননীর ও মন্ত্র-মুগ্ধ ব্যক্তি যেমন মন্ত্র-প্রয়োগকারীর বশীভূত হইয়া, বিবশ হয়, যতদিন না আমরা তেমন হইতে পারিতেছি, ততদিন আমাদের মনের সাধ আর মিটিতেছে না। কলের পুতুলের মত যখন ভগবানের হাতে থাকিব তখনই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। তখন তাঁহার কথাই কানে যাবে, অন্য কথা যাবে না, তাঁহার ইচ্ছার আধিপত্যই বজায় থাকিবে, অন্য ইচ্ছার ক্ষমতা থাকিবে না; আর যে আনুগত্য ও অনুসরণ প্রভৃতির অভাবে এখন দিবানিশি বিলাপ ও রোদন করি, তখন তাহা স্বভাবসিদ্ধ ও সহজ হইয়া পড়িবে।

সাধুতার প্রতি অন্ধতা—(১) গুণের প্রতি আসক্তি জন্মিলেই গুণীর প্রতি আস্থা হয়। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য। আমি বহু চেষ্টা করিয়া যে গুণ আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না, কাহারও জীবনে যদি তাহা সিদ্ধ দেখি, তাহা হইলে মন সহজেই তাহার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ভগবানের প্রতি ভক্তি বড় দুর্লভ পদার্থ। এক বিন্দু খাঁটি ভক্তি লাভ করিতে পারিলে পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ নষ্ট হয়। এমন ভক্তি পাওয়া ও পাইয়া রাখা অতীব কঠিন। যদি কাহারও জীবনে এই অমূল্য ভক্তি দেখি তবে আপনা হইতে মস্তক তাঁহার নিকট প্রণত হইবে। (২) আমরা যে আদর্শ লইয়া চলি। ঠিক আদর্শ অনুসারে চলিতে পারি না।

বলিয়া সেই আদর্শ জীবনে ফুটিয়া উঠে না। যদি কাহারও জীবনে আমার আদর্শ মূর্ত্তিমান দেখি, তাহা হইলে সেই আদর্শের শক্তি দশ গুণ বাড়িয়া উঠে। আমাদের ভিতরে যে সাধুতার পিপাসা আছে, মূর্ত্তিমান সাধুতা দেখিলে সেই পিপাসা সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হয়। ঈশ্বর মাঝে মাঝে প্রকাশিত হন, বলিয়া আমাদের বিফল চেষ্টায় নিরাশা আসিতে পারে না, সাধুদিগের সিদ্ধ জীবনে আমাদের অসিদ্ধ আদর্শের সিদ্ধত্ব দেখিয়া আমাদের ভবিষ্যতের আশা সুদৃঢ় হয়। সাধুতার প্রতি আদর সুতরাং স্বাভাবিক ও আত্মার কল্যাণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। সকল রাজ্যেই এ কথা খাটে, কবিকুলশ্রেষ্ঠ সেক্ষপিয়র বা কালিদাসের প্রতি যদি আমি অনাস্থা দেখাই, তাহা হইলে কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তিরা আমার কাব্যরসাভিজ্ঞতাতে সন্দিহান হইবেন। ঈশা চৈতন্যাদি ভক্ত মণ্ডলীর প্রতি অনাস্থা দেখাইলে ভক্তগণ তেমনই আমাদের ভক্তি বিষয়ে সন্দেহ করিবেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সতর্ক হওয়া উচিত। যদি দেখি প্রাণে গুণ বা সাধুতার প্রতি ঔদাসীন্য আসিয়া পড়িতেছে, তখনই বুঝিতে হইবে আত্মায় কোন না ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে। সাধুতা সাধুর নিজস্ব নহে, ভগবানের বিভূতিবিশেষ মাত্র। প্রেম ও জ্ঞান যেমন এক সাধুতাও তেমনই এক। এক না হইলে চেনা যাইত না, তুলনাও সম্ভব হইত না। আধার গুণে পরিমাণের কম বেশী হয়, কিন্তু বস্তুটা এক। সাধুতার প্রতি অন্ধতা বা অনাদরে আত্মার সমূহ অনিষ্ট। কি মৃত কি জীবিত, যেখানে যে কোন ব্যক্তিতে সাধুতা দেখা যাইবে, সেখানেই শির নোয়াইব। সে শির নোয়ান মানুষের কাছে নহে, মানুষের মধ্যে যে পূর্ণ পুরুষের প্রকাশ তাহার নিকটে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

নববিধান ও ধর্ম্মতত্ত্ব।

১৬ই আশ্বিনের ধর্ম্মতত্ত্বে "নববিধান তত্ত্ব" নামক প্রবন্ধে নববিধানের মত অতি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। নববিধান এবং বিশেষ বিধান সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা করিয়াছি সুতরাং এ বিষয়ে অধিক কিছু না বলিলেও চলিতে পারে। কিন্তু উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন কথার আলোচনা দ্বারা নববিধান ও ব্রাহ্মধর্ম্মে কি প্রভেদ আছে তাহা অনুভূত হইবার সুবিধা হইবে মনে করিয়া, আমরা উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ব্রাহ্মসমাজ আত্মার অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস করেন এবং ইহা ব্রাহ্মগণের একটী মূল মতের মধ্যে পরিগণিত। নববিধান সমাজও আত্মার অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস করেন। কিন্তু নববিধান সমাজ আত্মার অনন্ত উন্নতি স্বীকার করিলেও উক্ত প্রবন্ধে নববিধানের মূল মত সম্বন্ধে এক স্থানে লিখিত হইয়াছে যে, "নববিধানে সমুদয় বিধানের সমন্বয় ও সমুদায় ধর্ম্মভাবের পূর্ণতা," এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে আত্মাকে যদি অনন্ত উন্নতিশীল বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, তাহা হইলে মানিতে হয়, আত্মার পরিপোষণকারী ধর্ম্মও সেইরূপ অনন্ত উন্নতিশীল হইবে। যে ধর্ম্মভাব আত্মার অন্ন জল রূপে তাহাকে পরিপোষণ করিবে, তাহা যদি কোন এক অবস্থায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, যদি তাহাতে আর নূতন নূতন ভাব ও সত্য সমূহের সমাবেশ না হইল, তবে তাহা অনন্ত-উন্নতিশীল অনন্ত ক্ষুধাবিশিষ্ট আত্মার পরিপোষণ কিরূপে করিবে? আত্মার অনন্ত উন্নশীলতার অর্থ এই যে, তাহা দিন দিন নূতন নূতন সত্যান্ন লাভ করিতে থাকিবে এবং নূতন নূতন সত্য লাভ করিয়া ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া তাহার অধিকারী হইবে এবং ক্রমাগত উন্নত আদর্শ প্রাপ্ত হইয়া অনন্ত স্বরূপের দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। যদি একথা সত্য হয়, তাহা হইলে সেই আত্মার অবলম্বিত ধর্ম্মের কোন সময়েই এমন অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে না, যখন বলা যাইতে পারে যে, ইহাই "সমুদায় ধর্ম্মভাবের পূর্ণতা।" পূর্ণতা শব্দ যেমন আত্মার কোন অবস্থায় প্রযুক্ত হইতে পারে না তেমনি আত্মার অন্নপান-যোজনাকারী,—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না যে ইহাই তাহার পূর্ণতা। কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় আপনার ধর্ম্মকে পূর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইলেই প্রমাণিত হয় যে, তাহারা আর নূতন সত্য পাইবার আশা করে না। নূতন সত্য আরও যে থাকিতে পারে, তাহাও তাহারা মনে করিতে পারে না। সে ধর্ম্ম আর অনন্ত উন্নতিশীল আত্মার উপযোগী নহে। যাহার আদর্শ ক্ষুদ্র যে আপনার উন্নতির কোন সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারে সেই বলিতে পারে আমি পূর্ণ ধর্ম্ম পাইয়াছি। কিন্তু অনন্ত উন্নতিশীলের পক্ষে কোন অবস্থাই পূর্ণতার ব্যঞ্জক হইতে পারে না। পূর্ণতা শব্দ ব্যবহার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে আর নূতন তত্ত্ব বা নূতন সত্য অনুভব করিবার বা লাভ করিবার সম্ভাবনা তাহারা স্বীকার করে না। সুতরাং তাহারা অনন্ত সত্য ও তত্ত্বের খনি ঈশ্বরকে আর আপনাদের চালক ও পালক রূপে দেখিতে পায় না। ব্রাহ্মধর্ম্ম এরূপ কোন অবস্থারই নির্দ্দেশ করিতে পারিবে না যে ইহাই আমাদের পূর্ণতার অবস্থা। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্ত উন্নতিশীল আত্মার উপযোগী ধর্ম্ম। আত্মা যেমন নিরন্তর উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিয়া পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বরের দিকে যাইবে, তাহার অবলম্বিত ধর্ম্মও সেই সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিয়া, নিত্য নূতন সত্যের সমাবেশে সেই অনন্ত উন্নতিশীল আত্মার উপযোগী হইবে। এ ধর্ম্ম এমন প্রকৃতি বিশিষ্ট যে সকল সময়েই নূতন সত্য গ্রহণোপযোগী। ইহার গঠন প্রণালীতেই সেই অনন্ত উন্নতিশীলতা বিদ্যমান আছে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কিন্তু সকল অবস্থাতেই ইহার গতি সেই এক পূর্ণতার দিকে। সুতরাং নববিধানে যখন সকল ধর্ম্মভাবের পূর্ণতা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা বিশ্বাস করিতেছেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তাঁহাদের বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায় যেমন আপনাপন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মকে সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেন, নববিধান সমাজ ও সেই পথেরই পশ্চাতানুসরণ করিতেছেন। ইহা দ্বারা তাঁহা-

দের অবলম্বিত ধর্ম্মের আদর্শ যে হীন হইয়া গেল, তাহা বুঝিবার ইচ্ছা বা সুবিধা তাঁহাদের নাই। নববিধানকে যাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের নামান্তর বলিয়া উল্লেখ করেন, এখন তাঁহারা হয়ত তাঁহাদিগের সে ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের এরূপ কোন সংকীর্ণ সীমা নির্দ্দেশ হইতে পারে আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না।

উক্ত প্রবন্ধে অন্যত্র লিখিত হইয়াছে, "কি করিলে প্রকৃত রূপে বিধান গ্রহণ ও স্বীকার হয়?" উত্তরে বলা হইয়াছে,—বিধাতার নির্দ্দিষ্ট বিধানের অঙ্গীভূত সমুদায় বিধি ব্যবস্থা ও বিধান প্রবর্ত্তকের সহিত তাঁহার চিহ্নিত দলকে গ্রহণ ও মান্য করা। তাহা হইলে বিধান গৃহীত ও স্বীকৃত হয়?" অন্যত্র বলা হইয়াছে "ঈশ্বর ও দল এবং ধর্ম্মবিধি এই সমুদায়কে লইয়া বিধান। দল ও বিধি ছাড়িয়া একাকী ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে গেলে বিধান গ্রহণ হয় না। পরোক্ষ ঈশ্বরবাদী হইতে পারে। নববিধান সম্বন্ধেও এই কথা। যে স্থানে দলচ্যুতি, স্বতন্ত্রতা, বিচ্ছিন্নতা, বিধি অগ্রাহ্য সে স্থানে নববিধান নাই। নববিধানের ঈশ্বর নাই, নববিধান প্রবর্ত্তক নাই"। আবার অন্যত্র বলা হইয়াছে "নববিধান পূর্ব্বতন বিধান সকলের ন্যায় মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করেন না। এই বিধানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবার সকলেরই অধিকার আছে"—এখন পাঠকগণ বিচার করুন এই দুই উক্তির সামঞ্জস্য কোথায়? যদি কেহ বিধান প্রবর্ত্তক ও তাঁহার চিহ্নিত দলকে অগ্রাহ্য করে সেখানে কিন্তু নববিধানের ঈশ্বর নাই। তবে আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবার সকলেরই অধিকার আছে এরূপ বলিবার অবসর থাকিল কোথায়? ব্রাহ্মধর্ম্ম উচ্চৈস্বরে সকলকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন "যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি" কিন্তু এখন নববিধানের মুখপাত্র বলিতেছেন যে বিধান প্রবর্ত্তককে অমান্য করিলে শুধু তাহা নয় তাঁহার চিহ্নিত দলকে অগ্রাহ্য করিলেও নববিধান গ্রহণ করা হইবে না। সে স্থানে নববিধানের ঈশ্বর থাকিবেন না। যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আলোক পাইয়া —মধ্যবর্ত্তীতার চিররুদ্ধ কারাগার হইতে উন্মুক্ত হইয়া ডাক ছাড়িয়া বলিয়াছিলেন "যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি" স্বাধীনতার পবিত্র বায়ুস্পর্শে যাঁহারা নবজীবনের মধুর আস্বাদ পাইয়াছিলেন। যাঁহারা সকল প্রকার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইয়া সাক্ষাৎ ভাবে ঈশ্বরের সম্মুখীন হইবার জন্য নরনারীদিগকে সুসমাচার শ্রবণ করাইয়াছিলেন, তাঁহাদের হস্তপদ কেন আবার এমন কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করা হইতেছে? ব্রাহ্মগণ মধ্যবর্ত্তীতার নিগড় উন্মুক্ত হইয়াও কেন আবার সেই শৃঙ্খলে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিতেছেন? নববিধানী বন্ধুগণ স্থির ভাবে বিচার করুন তাঁহাদের দশা কি হইতেছে? খৃষ্টান প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তীবাদীগণ একজনকে স্বীকার ও বিশ্বাস করিলেই সেই সেই ধর্ম্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া আশ্বস্ত হইতে পারেন। কিন্তু নববিধান গ্রহণ করিতে হইলে একজনকে স্বীকার করিলে চলিবে না; কিন্তু তাঁহার চিহ্নিত দলকেও মান্য এবং গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার পরও কি তাঁহারা বলিবেন যে তাঁহারা বাস্তবিক মধ্যবর্ত্তী অস্বীকার করেন। খৃষ্টান প্রভৃতির যে স্বাধীনতাটুকু আছে অর্থাৎ একজনকে স্বীকার করিলেই তাঁহারা নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু নববিধানবাদিগণের সেই স্বাধীনতাটুকুও রহিল না। তাঁহাদিগকে বিধান প্রবর্ত্তকের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চিহ্নিত দলকেও গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা যদি ঘটনাক্রমে সেই দলের কাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হন তাহা হইলে আর নববিধান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এইরূপে বিবেক ও স্বাধীন কর্ত্তব্য জ্ঞানের হাত পা বাঁধিয়া যদি নববিধানী বন্ধুগণ মনে করেন তাঁহারা স্বাধীন ও মধ্যবর্ত্তীতা অস্বীকার করেন, তবে সে কথার আর কোন প্রতিকার নাই। নববিধান গ্রহণ করিয়াও যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম অনুভব করিতে চেষ্টা করুন; এবং তাঁহাদের হস্ত পদ কেমন কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ হইতেছে তাহাও অনুভব করুন। মানুষ একজন লোককেই সকল সময়ে সম্যকরূপে গ্রহণ করিতে বা মান্য করিতে পারে না। একটী চিহ্নিত দলকে কিরূপে গ্রহণ ও মান্য করিবে, তাহা আমরা বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না। এবং এরূপ দলও এক ব্যক্তিকে মান্য করিতে গেলে স্বাধীনতা কতদূর বজায় থাকিবে তাহাও বুঝিতেছি না।

বিধান প্রকাশের যে রীতি উক্ত প্রবন্ধে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাদ্বারাও বুঝিতে পারা যাইবে যে নববিধান সমাজ এই মধ্যবর্ত্তীতারই পোষকতা করিতেছেন—উক্ত প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। "দেবভাবসম্পন্ন বিশেষ চিহ্নিত ব্যক্তির আত্মাতে বিধানের আলোক প্রকাশ পায়। পরে তাহা হইতে অন্য বিশ্বাসী আত্মাতে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ প্রথমতঃ একজন বিশেষ প্রভাবশালী ঈশ্বরগতপ্রাণ বিশ্বাসী মৌলিক বিধান তত্ত্ব সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবান হইতে লাভ করেন। পরে তৎসহযোগে অপর চিহ্নিত বিশ্বাসী তদ্বিষয়ে অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁহারা * * * জগতে তাহা প্রচার করেন। সুতরাং সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রত্যেক আত্মাই যে ঈশ্বর হইতে সত্য পাইতে পারে তাহা আর বাস্তবিক স্বীকৃত হইতেছে না। একজন বিশেষ ব্যক্তি বিধানের সত্য পাইবেন, তাহার নিকট হইতে অন্য কয়েক জন তাহা লাভ করিবেন, পরে তাঁহাদিগের নিকট হইতে অন্যান্যেরা সেই সত্য পাইবেন। নববিধান প্রচারকগণ এক জনকেই মধ্যবর্ত্তী করিয়া সন্তুষ্ট হইতেছেন না। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও মধ্যবর্ত্তীতার অংশ গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে মধ্যবর্ত্তীবাদ প্রচারিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাও নববিধানের মধ্যবর্ত্তীতা আরও বিপজ্জনক। কারণ সে সকল স্থানে এক হাত হইয়াই সকলের নিকট সত্য আসিবার ব্যবস্থা আছে। এখানে হাতের পর হাত ঘুরিয়া তবে সত্যের আলোক সাধারণের নিকট উপস্থিত হইবার ব্যবস্থা। বোধ হয় এরূপ পরিষ্কার রূপে সাধারণ মানব মণ্ডলীর সহিত ঈশ্বরের দূরত্ব ঘোষণা আর কেহ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা নববিধানবাদী সাধারণ লোকের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা অনুভব করুন, তাঁহাদের জন্য কেমন সুন্দর ব্যবস্থা হইতেছে। নববিধানবাদিগণ না প্রত্যাদেশের মতে বিশ্বাস করেন? যদি প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বরের নিকট হইতে আদেশবাণী শুনিবার

অধিকারী তাহা হইলে আর এরূপ নানা হাত ঘুরিয়াসত্যালোক প্রকাশের মত কিরূপে সমর্থিত হইতে পারে। নববিধানবাদী বন্ধুগণ স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া দেখুন যে, যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রত্যেক আত্মাকে সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের নিকটে যাইতে আদেশ করিতেছেন এবং প্রত্যেক আত্মাই সত্যের খনি পরমেশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে সত্যালোক পাইবার অধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, নববিধানের মত তাহাতে কিরূপ বিকৃতি ঘটাইতেছে এবং তাহার সহিত এই নববিধানবাদের পার্থক্য কোথায়। যে যে স্থানে মানবাত্মার হাত পা এরূপে বাঁধিবার চেষ্টা হইয়াছে সেই সেই স্থানেই আত্মার কল্যাণের পথে কি মহান্ অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে এবং মানবের কি প্রকার দুর্গতি ঘটিয়াছে তদ্বিষয়েও একবার আলোচনা করুন। তাহার পরেও যদি এইরূপে স্বভাবদত্ত অধিকার হইতে (সত্যসাক্ষাৎভাবে লাভের অধিকার এই সুমহৎ অধিকার হইতে) বঞ্চিত হইবার বাসনা প্রবল হয়,তাহাতে অন্যের কিছু বলিবার থাকিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের এমন উদার সত্য যাঁহারা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা যে কেন আবার অধীনতার এমন সংকীর্ণ পথাশ্রয় করিতে ইচ্ছুক হইলেন, এ রহস্য বুঝিয়া উঠা অতিশয় কঠিন ব্যাপার। আশা করি অতঃপর কেহ আর ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধানের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই এরূপ ভাব পোষণ করিবেন না।

আচার্য্যের উপদেশ। *

একদিন আগ্রানগরে তাজমহল দেখিতে গিয়া নদীর ধারে দেখিতে পাইলাম যে একজন ইংরাজ তাঁহার কুকুরের চারি পা ধরিয়া জোরে নদীতে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার লাঠিখানাও সেই সঙ্গে জলে ফেলিয়া দিতেছেন;—কুকুর সাঁতার দিয়া সেই লাঠি মুখে করিয়া যাই উপরে উঠিয়াছে, অমনি আবার তাহাকে ধরিয়া জোরে নদীতে ফেলিয়া দিলেন এবং লাঠিও জলে ফেলিলেন। কুকুর আবার যত্নপূর্ব্বক সেই লাঠি মুখে করিয়া আনিল—যেই তীরে উঠিল অমনি পুনরায় তাহাকে এবং লাঠিকে ফেলিয়া দেওয়া হইল। বার বার এইরূপ করিতে দেখিয়া আমার বড় কষ্ট হইল—ভাবিলাম যদি এ লোকটা ইহার প্রভু তবে কেন এ বেচারাকে এত কষ্ট দিতেছে। নিকটের একজন লোককে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, যে কুকুরকে শক্ত করিবার জন্য এবং আজ্ঞাবাহী করিবার জন্য তাহার প্রভু তাহাকে বারম্বার এরূপ করিতেছে; তৎপরে তাজ দেখিতে গেলাম—তাজ দেখিতে দেখিতে বারম্বার আমার সেই ইংরাজের ঐ প্রকার ব্যবহারের কথা মনে হইতে লাগিল—আমার মনে হইল যে ভগবানও আমাদের সঙ্গে ঠিক এরূপ ব্যবহার করেন। আমাদের হৃদয়কে বলবান করিবার জন্যই তিনি আমাদিগকে সংসারে বিপদের স্রোতে ফেলিয়া দেন—আমাদের মনকে তাঁর উপযুক্ত করে নেওয়া,তাঁর অনুগত এবং তাঁহার প্রতি স্থির বিশ্বাসী করিবার জন্যই তিনি আমাদিগকে পরীক্ষার প্রবল স্রোতে ফেলিয়া দেন পরিবারের মধ্যে একটি পুত্র বা কন্যার মৃত্যু হইল শোকের সাগরে সকলে ভাসিতে লাগিল—সকলের চক্ষে জলধারা বহিল—সেই বিপদের মধ্যেই হয়ত এক আশ্চর্য্য শিক্ষা দিলেন, জীবনের অসারতা উত্তমরূপে দেখাইয়া দিয়া, মনের লুক্কায়িত অহমিকা চূর্ণ করিয়া পরকালের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে শিক্ষা দিলেন। এমন দেখা গিয়াছে যে মৃত্যুতে মানুষকে আশ্চর্য্য শিক্ষা দিয়াছে—এমন দেখা গিয়াছে যে মা লিখিয়াছেন "আমার সন্তানের মৃত্যুতে আমার ভাল হইয়াছে—ভগবান আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিয়াছেন।" নিজ জীবনে দেখিয়াছি যে যখনই মনে অহঙ্কার হইয়াছে—যখনি তাঁর শক্তির মহিমা গান না করিয়া হয়ত নিজ গৌরব ভাবিয়াছি, অমনি এক ভীষণ পরীক্ষা আসিয়া সব অহঙ্কার চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। হয়ত কাহারও অনেক দিনের চেষ্টায় কোন একটা পাপ দূর করিতে পারিয়া মনে একটু নিরাপদের ভাব আসিল, ভরসা হইল, ভাবিলেন—আমি বলশালী হইয়াছি—হঠাৎ একদিন কোথা হইতে এক সংগ্রাম আসিয়া তাহাকে আবার সেই পাপে ফেলিয়া দিল। পৃথিবীর বিশ্বাসী যাঁহারা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে পরীক্ষা ও বিপদ উপস্থিত হয় কেবল বিশ্বাসী ও সবল করিবার জন্য। ঠিক এইরূপ সমাজের উপর যখন কোন ভয়ানক পরীক্ষা আসে আমাদের চৈতন্য করিয়া দিবার জন্য। যখন দেখি উপাসনা আর ভাল লাগিতেছে না—মানুষ অসার হইয়া যাইতেছে—মানুষ সত্যকে রাখিতে পারিতেছে না—ভগবানের মুখ দেখিতে পাইতেছে না, তখনই এক পরীক্ষা আসিয়া সকলের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া দেয়। সমাজের অঙ্গে অস্ত্র প্রয়োগ হয়। বাহিরের উপাসনা লইয়া,ধর্ম্মের মড়া কোলে করিয়া সকলে ব্যস্ত হইয়াছে অমনি এক পরীক্ষা উপস্থিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি হইল। প্রকৃত ভক্ত যিনি তিনি বিপদের ভিতর দিয়াই ভগবানের করুণা অনুভব করেন। একজন ভক্তকে বলিতে শুনিয়াছি "হে প্রভু! তুমি যে আমাকে কষ্ট দিলে, এতে বুঝিলাম যে আমার প্রতি তোমার বড় কৃপা—নহিলে আমার এমন সৌভাগ্য কেন হইবে, যে তোমার জন্য একটু কষ্ট সহ্য করিতে সুবিধা পাইলাম।" প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্মই এই—প্রেম চায় ক্লেশ পাইতে—ক্লেশেই আরাম পায়—সুখ, কোমলতা এ সকল চায় না। কুকুরের বল বৃদ্ধির জন্য তাঁর প্রভু যেমন তাকে জলে ফেলে দেন, ভগবানও সেইরূপ তাঁর সন্তান বিশ্বাসী হইবে, শক্তিশালী হইবে তাই বিপদের তরঙ্গে ফেলে দেন; সে উঠে আসুক—ওর জোর বাড়ুক এই তাঁর ইচ্ছা।

আর এক প্রকারে ভগবান পরীক্ষা করিয়া থাকেন। যখন মানুষ পাপ হইতে মুখ ফিরাইয়া পরিত্রাণের দিকে যায়, তখন মনে হয় এক লাফে সে পাপ থেকে পুণ্যে উঠিবে—কারণ পাপের হলাহল পান করে সে বড় যন্ত্রণা পেয়েছে—পাপের আগুনে তার প্রাণ জ্বলেছে, তাই একবার সত্যের স্বাদ পাইলেই তার ইচ্ছা হয় একদিনে এক প্রার্থনায় পৃথিবীর নরককুণ্ড হইতে স্বর্গরাজ্যে উঠিয়া যাইবে, কিন্তু তা হয় না—সময়ে সময়ে পৃথিবীর পাপতাপে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখে। সে আবার ক্রন্দন করে—আবার ভগবানকে ডেকে একটু বল পায়,কিন্তু আবার পুরাতন

* শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়-প্রদত্ত একটী উপদেশের সারাংশ।

পাপে পড়ে যায়। এইরূপে অনেকে নিরাশ হইয়া যান—মনে করেন, তবে বুঝি প্রার্থনায় কিছুই হবে না, তবে বুঝি তিনি পাপীকে পরিত্যাগ করিলেন; অথবা বুঝি বা পরিত্রাণের এই পথ নয়। এইরূপ নানা প্রকার সংশয় হয়, কিন্তু বুঝিতে পারেন না যে ভগবান পরীক্ষা করিয়া থাকেন। একবার পাপে লিপ্ত হইলে সহজেই উদ্ধার হওয়া যায় না—তাই প্রভু ভাল করিয়া বুঝাইতেছেন, পাপে সর্ব্বনাশ হয়। এইটী বুঝিতে পারিলেই পাপী দুটী হস্ত যোড় করিয়া বলে—আমার খুব শাস্তি হয়েছে, প্রভুগো তোমার সাধু পরিবারে যখন বসিতে যাই, তখন আমার পাপ সবলে বাধা দেয়, আমার কাল-শত্রুরা তোমার নাম করিতে দেয় না—আমাকে শান্তি দেয় না; প্রভু! বুঝেছি ভালর জন্যই সাজা দাও—খুব শাস্তি দাও আমাকে—এ অধমকে ছেড় না, আমি তোমার দ্বারে পড়ে রহিলাম।

আবার শুনা গিয়াছে ভগবান পাপীকে তাঁর দ্বারে দাঁড় করিয়া রাখেন;—এরূপ শুনা গিয়াছে যে পূর্ব্বে ঋষিদের নিকট ধর্ম্মোপদেশ পাইতে হইলে তাঁহারা অনেকবার দ্বারে অপেক্ষা করাইয়া রাখিতেন। ভগবানও ব্যাকুলতা বৃদ্ধির জন্য পাপীকে তাঁর দ্বারে দাঁড় করাইয়া রাখেন শীঘ্র দ্বার খোলেন না। মানুষ ইচ্ছা করে এক দিনের প্রার্থনায় প্রেমিক হইয়া যায়, কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হয় না; মানুষ প্রেম দৃষ্টিকে জ্যোতিহীন করিয়া ফেলিয়াছে—সে চায় মাকে দেখিতে কিন্তু তিনি তা দেন না।—তিনি পাপীকে দাঁড় করাইয়া রাখেন,—কত সংগ্রাম করিতে হয় তবে দ্বার খুলেন। কেন তিনি এরূপ করেন?—তিনি কি একেবারে তাঁর দ্বার খুলে সব পাপীদিগকে ভিতরে নিতে পারেন না? তাতো পারেন;—তবে কেন এরূপ বিধান করেন? এই জন্য যে পাপী তার মিষ্ট মুখ তাঁর পবিত্র সহবাসের মূল্য ভাল করে বুঝিতে পারিবে। পাপী যে দেবভোগ্য অমৃতের মূল্য ভুলে গিয়ে পাপের হলাহল পান করিয়াছে, তাই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখেন। প্রাণের ব্যাকুলতা যখন এমন হয় যে আর প্রাণ বাঁচে না, তখনই তিনি দ্বার খুলে দিয়ে কোলে নেন।

যেমন একটি শিশু সমস্ত দিন খেলা করিয়া বেড়াইতেছে—মা কতবার তাহাকে ডাকিয়াছেন সে তাহা শুনে নাই—ধুলো খেলায় মত্ত হইয়া সমস্ত দিন কাটাইয়া বৈকালে গৃহে ফিরিয়া মাকে ডাকিয়া পাইল না—মা আজ লুকাইলেন, মা দেখা দিলেন না—অন্য দিন সে দেখিত মা দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকেন তাহাকে কোলে করিয়া চুম্বন করেন, কত আদর করেন—কিন্তু আজ সে মা মা করিয়া ডাকিয়া সারা-পাইল না—সে এ ঘরে ও ঘরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মা মা করিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে মা লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছেন—আজ সে বুঝুক মার মূল্য কত। ঠিক সেইরূপ জগৎ জননী প্রেমভাণ্ড লইয়া পাপীকে আয় আয় করিয়া ডাকিলেন পাপী তখন সে ডাক শুনিল না। সংসারে ধুলো খেলায় মত্ত রহিল। কিন্তু পরে যেই মুখ ফিরাইল অমনি মা সরিয়া গেলেন—কাছে থাকিয়াও লুকাইলেন—যেন বলিলেন পাপী তোর শিক্ষা হোক, তুই বোঝ তোর ধুলো খেলা বেশী আরাম দেয়, না আমার সহবাস বেশী শান্তি প্রদান করে? তখন পাপী আর সহিতে পারে না, কাঁদিয়া বলে মাগো তোমার ঐ মুখ না দেখিলে আমার প্রাণ বাঁচে না—আমি আর সব সইতে পারি—ঘোর দরিদ্রতার যন্ত্রনা, লোকের বিদ্বেষ, পৃথিবীর ক্লেশ সব সইতে পারি—কিন্তু প্রাণের জ্বালার সময় তোমার ঐ প্রেম মুখ না দেখিলে পারিব না। কিন্তু দুর্ব্বল যারা তারা মনে করে মা বুঝি আর দেখা দেবেন না—আর বুঝি কোলে নেবেন না; মাকে ডেকে ডেকে এ পথ ও পথ খুজে খুজে যখন পাইল না, তখন অবিশ্বাসী উঠিয়া দাঁড়াইল পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া "কে কোথা আছ সহজ উপায় বলিতে পার?" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। হায় হায় পাপী বুঝিলে না—মা কেন এরূপ করিতেছেন—তুমি অবিশ্বাসী হইয়া ফিরিলে? ঐ দেখ শিশু যখন এঘর ওঘর খুজে খুজে ডেকে ডেকে মাকে পাইল না—তখন মাগো! বলে কেঁদে গড়িয়ে পড়িল, অমনি মা ছুটে এসে কোলে নিয়ে চুম্বন করে বলিলেন, "বাপ ধন এস কেঁদনা, তুমি যে আমার কথা শুন নি—যখন ডাকলাম তখন যে শোন নি" এইরূপে তাকে সান্ত্বনা দেন। ঠিক এইরূপ জগৎ জননী ও তাঁর পাপীসন্তানকে শিক্ষা দেন—এই তাঁর লীলা। একবার বিশ্বাসী হইয়া তাঁর উপর নির্ভর করিয়া থাকি, তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে তাঁর চরণে স্থান দিবেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

শিলং।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর (রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিনে) মৌথার ব্রাহ্মসমাজে সাপ্তাহিক উপাসনার পরে বাবু থম সিং (Thom Singh) নামক একজন খাসিয়া যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ উপাসনা হয়, পরে তাঁহাকে দীক্ষিত করা হয়। এবং উপদেশ দেওয়া যায়। তৎপরে "রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত" সম্বন্ধে খাসিয়া ভাষায় বক্তৃতা হইয়াছিল। গৃহ লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠান প্রণালী দেখিয়া অনেকেই বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। দীক্ষিত যুবকের নিবাস চেরাপুঞ্জি, বয়স ২৩ বৎসর। ইনি খুব উৎসাহী এবং ধর্ম্মানুরাগী। এরূপ ভাবে দীক্ষা খাসিয়াদের মধ্যে এই নূতন। দীক্ষার সময় যে তিনি প্রতিজ্ঞাপত্র সকলের সমক্ষে পাঠ করিয়াছিলেন তাহার অনুবাদ এই:—

প্রতিজ্ঞাপত্র।

অদ্য ঈশ্বর ও ধর্ম্মবন্ধুগণের সমক্ষে প্রকাশ করিতেছি যে আমি নিম্নলিখিত নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি;—

১। আমি বিশ্বাস করি যে একমাত্র সত্যস্বরূপ, পূর্ণস্বরূপ, অপরিবর্ত্তনীয়, অনন্তস্বরূপ অদ্বিতীয় পরমেশ্বর আছেন।

২। আমি বিশ্বাস করি যে প্রতিদিন কেবল একমাত্র তাঁহার উপাসনা করা উচিত। আমি কখনই পৌত্তলিকতা এবং অন্যান্য উপদেবতা সম্বন্ধীয় কোনও ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দিব না।

৩। আমি বিশ্বাস করি যে মানবাত্মা অবিনশ্বর এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে অনন্তকাল তাহা সত্য এবং পবিত্রতাতে উন্নতি লাভ করিতে থাকিবে।

৪। আমি নিশ্চিতভাবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে নিজে

ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সকল অনুষ্ঠান করিব এবং পরিবারের যে সকল লোক এবং যে সকল বন্ধুর উপরে আমার ক্ষমতা আছে, তাহাদিগকে এই পথে চালিত করিতে চেষ্টা করিব।

৫। মনুষ্যের মধ্যে আমি কাহাকে উচ্চ বা নীচ জাতি বলিয়া গণনা করিব না; কিন্তু আমার বিবেচনায়, ন্যায়বান্ ব্যক্তিকেই আমি উচ্চ ও প্রধান বলিয়া গণনা করিব।

৬। আমি যথাসাধ্য আপনার দেহ ও আত্মাকে পবিত্র করিতে চেষ্টা করিব, কারণ হার যেমন শরীরের প্রধান অলঙ্কার, সেইরূপ সত্য ও পবিত্রতা আত্মার প্রধান অলঙ্কারস্বরূপ। যে কার্য্য আপনাকে এবং জনসমাজকে কলঙ্কিত করে, তাহা হইতে বিরত থাকিব।

৭। সর্ব্বপ্রকার মাদক খাদ্য ও পানীয় হইতে বিরত থাকিব, কারণ তাহা দ্বারা দেহ ও আত্মা কলুষিত হয়।

৮। ঈশ্বর নিজে লিখিয়াছেন বা মানবের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন এরূপ কোনও অভ্রান্ত পুস্তক আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না; সকলই বুদ্ধিমান্ ও গভীর চিন্তাশীল লোকের দ্বারা লিখিত। কোনও অভ্রান্ত গুরু এবং মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনও মধ্যবর্ত্তী আছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না।

উক্ত ২৭এ সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে রামমোহন রায়ের মৃত্যু-দিন উপলক্ষে শিলং ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ ভাবে উপাসনা হয় এবং পরদিন (২৮এ রবিবার) "রাজা রামমোহন রায়ের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষা" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

মেদিনীপুর।

গত ১২ই আশ্বিন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যুদিন উপলক্ষে, সকাল বেলা এখানকার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা হয়। উপাসনার পর, রাজার জীবনের কতকগুলি কথার উল্লেখ করিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল—"ঈশ্বরকে প্রীতিকরা এবং তাঁর প্রিয়-কার্য্য সাধন করা" এই দুইটী সত্যের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাজা স্বীয় জীবনে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটী উপদেশ দেওয়া হয়। বৈকালে—এখানকার সাধারণ পুস্তকালয় গৃহে [রাজার স্মরণার্থ একটী সভা হয়। এই সভায় এখানকার সুযোগ্য সবজজ বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু তারক গোপাল ঘোষ বিএ, অতি সুললিত ভাষায় একটী বক্তৃতা করেন।

ঢাকা।

গত ২৭এ সেপ্টেম্বর রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু দিন উপলক্ষে ঢাকা ছাত্র-সমাজের এক বিশেষ অধিবেশন হয়। বাবু জগবন্ধু লাহা এম,এ, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, ছাত্রসমাজের অন্যতম সভ্য বাবু রমণীকান্ত দাস একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বাবু জ্যোতীন্দ্রপ্রসাদ মিশ্র বি,এ, অক্ষয় বাবুর উপাসক সম্প্রদায় হইতে তাঁহার আক্ষেপ উক্তি পাঠ করেন। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস এবং বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন, সভাপতি মহাশয় অতি সুন্দররূপে সভার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য সকলেরই প্রীতিজনক হইয়াছিল। এই উপলক্ষে পরদিন ছাত্রদের একটী উদ্যান সম্মিলন হয়। তাহাতেও রাজার বিষয়ে কিছু বলা হয়।

এখানে নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে শারদীয় ব্রহ্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

৩রা অক্টোবর শুক্রবার রাত্রিতে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়, "যাঁহাদের জীবনে সংগ্রাম আছে, তাঁহারাই শক্তি পূজার প্রয়োজন মনে করেন" এই বিষয়ে উপদেশ হয়। বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন।

৪ঠা শনিবার প্রাতে—মন্দিরে উপাসনা হয়। এই বেলায় বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে সদা-লাপ এবং সংকীর্ত্তন হয়, রাত্রে "এত গোল করে কাহারা" এই বিষয়ে বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় একটী বক্তৃতা করেন। রবি-বারে প্রাতে উপাসনা হয়। এ বেলা কালীপ্রসন্ন বাবু উপা-সনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। "আমরা আনন্দ স্বরূপ হইতে উৎপন্ন এবং তাঁহাতেই জীবিত" এই বিষয় লইয়া উপদেশ হয়। অপরাহ্নে উপাখ্যান এবং জীবনচরিত পাঠ ও আলোচনা হয়। তৎপর সংকীর্ত্তন হইয়া পুনরায় রাত্রিতে উপাসনা হয়। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনা করেন, "কেন আমরা ঈশ্বরকে চাই" এই বিষয় উপদেশ হয়।

জলপাইগুড়ি।

গত ২৭এ সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মর-ণার্থ সভা করিবার জন্য, বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। সহরের সকল ভদ্রলোকই সভায় উপস্থিত হইয়া রাজার প্রতি সম্মান দেখাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য অতি অল্প লোক সভায় উপস্থিত হওয়াতে, বক্তৃতা হয় নাই। উপাসনা এবং রাজার জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া কার্য্য শেষ হয়।

মানিকদহ।

গত ২৭এ সেপ্টেম্বর শনিবার মানিকদহ স্কুল গৃহে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ আশা দল কর্ত্তৃক একটী সভা আহুত হয়। স্থানীয় ভদ্রলোক এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গ সভা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় এক সুদীর্ঘ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। গায়কদিগের সুললিত গানে এবং বক্তামহাশয়দিগের সুন্দর বক্তৃতায় বিধাতার কৃপায় সভার কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ।

নামকরণ—গত ২৮এ আশ্বিন সোমবার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-গোবিন্দ গুপ্ত মহাশয়ের কন্যার নামকরণ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় এই নামকরণ উপলক্ষে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। কন্যার নাম লীলা রাখা হইয়াছে।

ব্রাহ্ম সম্মিলনী সভা—ঢাকা নগরে শ্রীযুক্ত বাবু রজনী-কান্ত ঘোষ, বাবু শশিভূষণ দত্ত, বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়গণের উদ্যোগে আগামী ২৫এ ও ২৬এ অক্টোবর (৯ই ও ১০ই কার্ত্তিক) একটী ব্রাহ্ম সম্মিলনী সভা হইবে। তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সাধন, উপাসনা-প্রণালী, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার, পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ, সামাজিক শাসন, ব্রাহ্ম-বালক-বালিকা, ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রণালী এবং "অনাথ ব্রাহ্ম-পরিবার দিগের সংস্থান প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হইবে। উপস্থিত ব্যক্তিগণের প্রস্তাবানুসারে অপরাপর বিষয় সকলেরও আলোচনা হইতে পারিবে। মধ্যে মধ্যে এ প্রকার সম্মিলন দ্বারা ব্রাহ্মগণের মধ্যে একতা ও কার্য্যসাধনোপযোগী শক্তি লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে। আশা করি পূর্ব্ব বাঙ্গালার ব্রাহ্মগণ এই সময়ে ঢাকায় উপস্থিত হইয়া সম্মিলনের উদ্দেশ্য সুসাধনে বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

প্রচার—সম্প্রতি পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মান্দ্রাজ নগরে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার নিকট হইতে তথাকার কার্য্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ পত্র পাওয়া গিয়াছে।

"৪ঠা অক্টোবর শনিবার—রাত্রে এখানকার সমাজের সভ্য ও অনুরাগী ব্যক্তিদিগকে আমার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হয়। তদনুসারে অনেকে উপস্থিত হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা হয়।

৫ই অক্টোবর রবিবার—অদ্য সায়ংকালীন উপাসনার সময়ে আমি ইংরাজীতে উপদেশ দিলাম। উপদেশের বিষয় এই,— লোকে বলে ব্রাহ্মেরা বহুল পরিমাণে প্রাচীন শাস্ত্র হইতে বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া স্বীয় স্বীয় মত স্থাপন করেন না কেন? আমি বলি, যদি জানিতাম লোকের কাজ কেবল শাস্ত্রীয় বচনের অপেক্ষায় আট্‌কাইয়া আছে, তাহা হইলে না হয় শাস্ত্র-সিন্ধু মন্থন করিয়া বহুল বচনরাশি উদ্ধৃত করিতাম, কিন্তু সত্য কথা এই শাস্ত্রীয় বচনের অভাবে ত কাজ বন্ধ থাকিতেছে না, লোক-ভয়ের জন্যই বন্ধ থাকিতেছে। লোকে দোহাই দিবার সময় শাস্ত্রের দোহাই দেয়, কিন্তু কাজ করিবার সময় লোকাচারের অনুরোধেই কাজ করে। লোক ভয় হইতে মানুষকে উদ্ধার করিতে না পারিলে কাজে অগ্রসর হওয়া হইবে না। এই ভয় নিবারণ করে কে? সত্য স্বরূপ চিরজাগ্রত ঈশ্বরে একমাত্র প্রকৃত বিশ্বাসই এই ভয় নিবারণ করিতে পারে।

৬ই অক্টোবর সোমবার—আজও সায়ংকালে অনেক লোক আসিয়াছিলেন। সঙ্গতের আলোচনার ন্যায় ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল। প্রধানতঃ পুনর্জ্জন্ম, পরকাল ও প্রার্থনার আবশ্যকতা বিষয়ে আলাপ হয়।

৭ই অক্টোবর মঙ্গলবার—অদ্য সায়ংকালে সমাজ মন্দিরে ভারত কিরূপ ধর্ম্ম চায়? এই বিষয়ে ইংরাজী বক্তৃতা হইয়াছিল। সমাজ গৃহে বেশী লোক ধরে না, তথাপি বোধ হয় ১৫০।২০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন, বক্তৃতাতে স্থূলতঃ এই কথা বলা হয় যে, নবজীবনপ্রাপ্ত ভারতে যে ধর্ম্ম স্থান প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে সার্ব্বভৌমিকতা, (Universality) যুক্তিযুক্ততা (Rationality) লোক হিতৈষিতা (Philanthrophy) সাধুভক্তি (Reverence) স্বাধীনতা (Freedom of throught and action) এই সকল গুণ থাকা আবশ্যক। ইহা বলিয়া দেখান হইল যে ব্রাহ্মসমাজ হইতে যে ধর্ম্ম প্রচার করা যাইতেছে, তাহাতে ঐ সকল লক্ষণ বিদ্যমান আছে।

আগামী কল্য সমাজে ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ হইবার কথা আছে। পরে যেমন যেমন কাজ হইবে তাহার সংবাদ দিব,—"

মান্দ্রাজ সমাজের বিশেষ বিবরণ আপনারা অবগত নহেন। এখানে সমাজের একটী সুন্দর বাড়ী আছে, তাহা ট্রষ্টিদিগের হস্তে ন্যস্ত। সমাজের অধীনে একটী Ragged school (দরিদ্র বিদ্যালয়) আছে, তাহাতে দুই শতের অধিক ছাত্র ছাত্রী পড়িয়া থাকে। বালকই সব, দশটী মাত্র বালিকা। প্রার্থনা করিয়া স্কুল খোলা হয় ও বন্ধ হয়। রবিবার প্রাতে সমাজের কোন কোন সভ্য রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয় করিয়া থাকেন। তামিল ভাষায় ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ না থাকাতে ইহারা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইতে পারিতেছেন না।

সমাজের একটী পুস্তকালয় আছে, তাহাতে প্রায় ৫০০ শত ধর্ম্মগ্রন্থ আছে। একটী ক্ষুদ্র ছাপাখানা আছে. তাহাতে ইহাদের মাসিক পত্র (Fellow-worker) ছাপা হয়। একটী "অনাথ-নিবাস" (Orphan Asulum) স্থাপনের জন্য ইহাঁদের ইচ্ছা আছে। সে জন্য ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার ৩য় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ—১৮৯০।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনাবধি কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন প্রতি বুধবারে হইয়া আসিতেছে। এই বৎসরের প্রারম্ভ হইতে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন করা গিয়াছিল। কিন্তু এ কয়েক মাসের কার্য্যে পূর্ব্বরীতি পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা দেখা গেল না। এজন্য বিগত আগষ্ট মাসের প্রথম হইতে আবার পূর্ব্বের ন্যায় প্রতি সপ্তাহে অধিবেশন হইতেছে। এই তিন মাসের মধ্যে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার ৯টী নিয়মিত এবং ৪টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সভ্য-পদত্যাগ করায়, অধ্যক্ষ সভার এক বিশেষ অধিবেশনে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার স্থানে নিযুক্ত হইয়াছেন।

সমাজ মন্দিরের চূড়া—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইবার কিছু কাল পরে কলিকাতায় একটী উপাসনা মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। তাহার জন্য যে দেনা হইয়াছিল, তাহাও শোধ হইয়া গিয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সুযোগ্য ধনাধ্যক্ষ বাবু গুরুচরণ মহলানবিস মহাশয়ের চেষ্টায় মন্দিরের বারেন্দা ও চূড়া নির্ম্মিত হইবার উদ্যোগ হইয়াছিল। কিন্তু চূড়ার প্লান তখন স্থিরীকৃত না হওয়ায় তখন বারেন্দা প্রস্তুত হয়। সম্প্রতি উক্ত চূড়া নির্ম্মাণের প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য তাঁহারই উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। এই জন্য আমাদের ঋণ করিতে হইবে না। পূর্ব্বে যাঁহারা মন্দিরের জন্য দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রদত্ত টাকায় এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারিবে।

প্রচার—এবার বিশেষ দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতে হইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্য সন্তোষজনক হয় নাই। বিগত ত্রৈমাসিক রিপোর্ট-পাঠে সকলেই অবগত হইয়াছিলেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার কার্য্য ভালরূপ চলিতেছে না। প্রচার কার্য্য যাহাতে ভালরূপে চলে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত প্রথমে প্রচারক মহাশয়দিগকে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় উপস্থিত হইয়া উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই সভায় উপস্থিত না হওয়ায় তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য পত্র লিখিয়া অনুরোধ করেন। দুঃখের বিষয় এই যে একজন প্রচারক ব্যতীত কেহই তাহার উত্তর দেন নাই। এই কারণে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এখনও প্রচার প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু করিতে সমর্থ হন নাই। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে সমস্ত অবগত হওয়া যাইবে।

এই বৎসরের প্রথমেই বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাকে অবগত করেন যে তিনি জুলাই মাস পর্য্যন্ত কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইবেন না এবং সেই সঙ্গে জুলাই মাস পর্য্যন্ত ছুটীর প্রার্থনা করেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে ছুটী দেন। বিগত আগষ্ট মাসের প্রথমে তাঁহার বন্দোবস্তমত তাঁহাকে তাঁহার কার্য্যস্থানে যাইবার জন্য অনুরোধ করা হয়, তাহাতে তিনি আবার এক বৎসরের ছুটী প্রার্থনা

করেন। এবারও কার্য্যনির্ব্বাহক সভা যত দিন না অন্য কোন প্রকার ব্যবস্থা হয়, তাঁহাকে সেই সময় পর্য্যন্ত ছুটী দিয়াছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণে জ্ঞাপন করা হইয়াছিল যে পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার কার্য্য-বিবরণ দেন নাই। এবারও তিনি তাঁহার কোনও কার্য্যবিবরণ দেন নাই। সম্প্রতি তিনি আগামী কার্ত্তিক মাস হইতে ১ বৎসরের ছুটী চাহিয়াছেন। বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অসুস্থ অবস্থায় কলিকাতায় অবস্থান করিয়া আলোচনা দ্বারা প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন।

বাবু অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় বিগত ৬ই আগষ্ট তারিখে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সহিত সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় এক পত্র লেখেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নানা উপায়ে তাঁহার এই সংকল্প পরিত্যাগ করাইবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শে নাই। এই অবস্থায় কার্য্যনির্ব্বাহক সভা দুঃখের সহিত বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখের অধিবেশনে তাঁহার প্রচারক পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস—এই কয়েক মাস তিনি পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কার্য্য বিবরণ না পাওয়াতে আমরা তাহার বিশেষ বিবরণ দিতে পারিলাম না। সম্প্রতি তিনি ঢাকায় অবস্থিত করিতেছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—এই কয়েক মাস প্রধানতঃ কলিকাতাতেই কার্য্য করিয়াছেন। এখানে থাকিয়া তত্ত্ব-কৌমুদীর সম্পাদকের কার্য্য করেন, ব্রাহ্ম বালিকা-শিক্ষালয়ের জন্য বিশেষভাবে পরিশ্রম করেন, উপাসক মণ্ডলীর সামাজিক উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং ছাত্রসমাজে কয়েকটী বক্তৃতা করেন। মধ্যে একবার বরিশাল গমন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তিনি মান্দ্রাজ যাত্রা করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় প্রধানতঃ ঢাকায় থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে পারিবারিক উপাসনা, সামাজিক উপাসনা ও প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী এখন শিলংএ অবস্থান করিতেছেন। খাসিয়ায় এখন অত্যন্ত বৃষ্টি হইতেছে এজন্য অন্যান্য স্থানে গমনাগমনের সুবিধা হয় নাই। তাঁহার পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় শেলাপুঞ্জ,নংড়ি,চেরাপুঞ্জা, মোসমাই, শিলং প্রভৃতি স্থানের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে। নীলমণি বাবু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেছেন, তদ্দ্বারা স্থানীয় লোকের অনেক উপকার হইতেছে। বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারি,লক্ষ্মণ প্রসাদ জি, বাবু মনোরঞ্জন গুহ,বাবু কালীমোহন দাস, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বাবু কৈলাস চন্দ্র সেন, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি মহাশয়গণও নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করিয়াছেন।

উপাসক-মণ্ডলী—এই তিন মাস নিয়মিত ভাবে উপামণ্ডলীর কার্য্য চলিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, বাবু কৃষ্ণ কুমার মিত্র এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্তমহাশয়, উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন।

সঙ্গত সভা—সঙ্গতসভার জুলাই মাসে ৪টী, আগষ্ট মাসে ৪টী ও সেপ্টেম্বর মাসে ৪টী অধিবেশন হয়। প্রত্যেক মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সভ্যগণ উপস্থিত হইয়া উপাসনা ও তৎপরে আলোচনা করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচনা হইয়াছিল—"পরস্পর সহানুভূতি," "Take care of your heart for it is the fountain of life," "ভক্তি," "উপাসনা," "কৃতজ্ঞতা," "ঈশ্বর উপলব্ধি" ইত্যাদি।

ব্রহ্ম-বিদ্যালয়—জুলাই মাসের ৬ই ও ১৩ই ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা হয়। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় সিনিয়ার ক্লাস, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী জুনিয়ার ক্লাস ও বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রাইমারি ক্লাসের পরীক্ষা গ্রহণ করেন। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ২৬; তন্মধ্যে ৫ জন সিনিয়ার কোর্স, ১৫ জন জুনিয়ার কোর্স, ও ৬ জন প্রাইমারি কোর্সের পরীক্ষা দেন। সিনিয়ার কোর্সের একজন, ও জুনিয়ার কোর্সের ৭ জন অতিরিক্ত, অবশিষ্ট ১৯ জন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রী। জুনিয়ার ও প্রাইমারি ক্লাসের পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। ২১ জনের মধ্যে জুনিয়ার ক্লাসের এক জন অতিরিক্ত পরীক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ, অপর সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

২০এ জুলাই বিদ্যালয়ের নববর্ষারম্ভ হয়। নববর্ষের জন্য শ্রেণী, শিক্ষক ও পাঠ্যের নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে। নানা কারণে ইংরেজি ও বাঙ্গালা পাঠ্য ও শ্রেণী স্বতন্ত্র রাখা আবশ্যক বোধ হওয়াতে সিনিয়ার ও জুনিয়ার নামক দুটী ইংরেজী শ্রেণী, এবং সিনিয়ার, জুনিয়ার ও প্রাইমারি নামক তিনটী বাঙ্গালা শ্রেণী খোলা হইয়াছে। পাঠ্য পুস্তকের তালিকা সমাজের পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছে। বাবু সীতানাথ দত্ত, বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় ও বাবু মোহিনীমোহন রায় এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য করিতেছেন। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়ও কিছুদিন কার্য্য করিয়াছিলেন।

ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা—ইংরেজি সিনিয়ার ক্লাসের ছাত্রসংখ্যা ১৯; ইংরেজি জুনিয়ার ক্লাসের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ১১; বাঙ্গালা সিনিয়ার ক্লাসের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ১৪; বাঙ্গালা জুনিয়ার ক্লাসের ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ১২; বাঙ্গালা প্রাইমারি ক্লাসের ছাত্রী সংখ্যা ৫। এই তিন মাসের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সব-কমিটির দুটী অধিবেশন হইয়াছে। প্রথম অধিবেশনে প্রধানতঃ নববর্ষের জন্য পাঠ্য নির্দ্ধারিত হয়, এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধানতঃ পূর্ব্বাধিবেশনের নির্দ্ধারিত পাঠ্য সম্বন্ধে কতক পরিবর্ত্তন করা হয় ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা হয়।

রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়—গত গ্রীষ্মের ছুটীর পর হইতে নৈতিক বিদ্যালয় নিয়মিতরূপে চলিতেছে। ছাত্রসংখ্যা দিন দিনই বাড়িতেছে। এখন বালকবালিকা সংখ্যা প্রায় ৬০ জন।

মিসন কমিটী—বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। কার্য্য নির্ব্বাহক সভা তাঁহার আবেদন মিশন কমিটির বিবেচনার জন্য অর্পণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্ম-মিসন প্রেস—ইহার কার্য্য নিয়মিতভাবে চলিতেছে। এই তিন মাসে ৯৬৬॥৶০ টাকার কাজ হইয়াছে এবং ৬২০।/০ আদায় হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৬৮৫৶১০ খরচ হইয়াছে।

ছাত্রসমাজ—গ্রীষ্মের বন্ধের পর হইতে ইহার কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। ইতিমধ্যে ৮টী বক্তৃতা হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী "Social Reconstruction of Modern India," "Social Influece of Women," "Martyrs of Fath এবং "Self-made man" বিষয়ে বক্তৃতা করেন এবং বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় "How to develop manhood" "Brahmo Samaj and Social Reform," "Brahmojnan (ব্রহ্মজ্ঞান) in Ancient India" এবং Last day of Raja Ram Mohan Roy"বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এই আটটী অধিবেশন ব্যতীত দুইটী সাম্বৎ সমিতিও হইয়াছিল।

পুস্তকালয়—অনেক দিনের পরে পুস্তকালয়ের কতক পরিমাণে সুব্যবস্থা করা হইয়াছে। সম্প্রতি একজন Librarian নিযুক্ত করা হইয়াছে; এবং পুস্তকালয়ের সঙ্গে একটী Reading Room ও খোলা হইয়াছে। প্রায় ৮০ খানি সংবাদ পত্র পাঠের জন্য প্রস্তুত থাকে। সম্প্রতি অধ্যাপক নিউম্যান প্রদত্ত ১৩ খানি ভাল ভাল পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই দুই পত্রিকার কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিয়াছে। তত্ত্বকৌমুদীর আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়, কিন্তু মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থা আজিও ভাল হইতেছে না। মেসেঞ্জারের আর্থিক অবস্থা ভাল করিবার জন্য এক সবকমিটি আছে; কমিটির সভ্যগণ নানা প্রকারে ইহার উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বাবু হীরালাল হালদার মহাশয় প্রায় ৩বৎসর কাল মেসেঞ্জারের সম্পাদন কার্য্যের বিশেষ সহায়তা করিতেছিলেন। তিনি সম্প্রতি কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা পরিত্যাগ করাতে উক্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়—বিগত জুলাই মাসে এই বিদ্যালয়ে ৪৯ জন ছাত্র ও ছাত্রী ছিল। এক্ষণে ৬৪ জন এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইতেছে। ইহার মধ্যে ১৫ জন বালক, অবশিষ্ট বালিকা। দূরস্থ বালকবালিকাদিগের যাতায়াতের জন্য ভাড়াটিয়া গাড়ীর বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বালকবালিকাদিগের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হইয়াছিল। পরীক্ষার ফল বেশ সন্তোষজনক হইয়াছে। পূর্ব্বে শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী ৬ জন ছিলেন, আরও একজন নূতন শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। জুলাই আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব্ব-স্থিত ৪৩৷৷১২৷৷ সহিত বালক বালিকাদিগের বেতন,মাসিক চাঁদা,ও এককালীন দান লইয়া ৮১৮৷৷/১২৷৷ টাকা আয় হইয়াছিল। সর্ব্বশুদ্ধ ৪২৫৫/০ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। অবশিষ্ট ৩৯৩৷৵১২৷৷ হস্তে আছে।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা অধ্যক্ষ সভার অনুরোধ অনুসারে এই বিদ্যালয় পরিচালন জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন।

I. The Brahmo-Balika-Sikshalaya belongs with its all properties to the Sadharan Brahmo Samaj, which will be responsible for all its liabilities.

II. The entire management of the Brahmo-Balika-Sikshalaya including the appointment, suspension and dismissal of teachers and the framing of regulations for the School shall be vested in a committee (appointed every two years by the Executive Committee) subject to the general control of the Executive Committee.

III. A quarterly report of the school shall be sent to the Secretary, Sadharan Brahmo Samaj and an abstract of it will be published in the report of the Executive Committee.

IV. Unless for any especial reason the Brahmo-Balika-Sikshalaya Committee will meet at least once every month, when a monthly return showing the number of pupils, the average attendance, the progress of studies, the monthly income and expenditure of the previous month will be submitted to it.

V. The quarterly balance sheet of the school will be duly audited by an auditor appointed by the Executive Committee.

ব্রাহ্ম-বালিকা-ছাত্রীনিবাস—কয়েক বৎসর হইতে দেখা যাইতেছে যে মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুদিগের কন্যাগণের সুশিক্ষার বিশেষ বিঘ্ন হইতেছে। কলিকাতা ভিন্ন অন্য কোনও স্থানে ব্রাহ্মবালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা নাই বলিলেও হয়। এজন্য মফস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদের কন্যাদিগকে কলিকাতায় প্রেরণ করিয়া থাকেন। কলিকাতায় যে সকল ব্রাহ্মেরা বাস করেন, তাঁহাদের অনেকের কাছে মফস্বলস্থ বন্ধুরা কন্যাদিগকে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে অনেক সময়ে এরূপ সুবিধা ঘটিয়া উঠা বড় কঠিন হয়! এজন্য গত জুলাই মাসে কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা পত্র লিখিয়া কলিকাতায় একটী ছাত্রীনিবাস স্থাপন সম্বন্ধে মফঃস্বলস্থ বন্ধুদিগের সাহায্য চাহিয়া পাঠান। কয়েক জন বন্ধুর নিকট হইতে আশা পাইয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা স্থির করিয়াছেন, আগামী ১লা নভেম্বর হইতে ১৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাহিরের অংশের উপরের ঘরে একটী ছাত্রীনিবাস খুলিবেন। মফস্বলস্থ বন্ধুদিগের নিকটহইতে উৎসাহ পাইলে ইহা সুচারুরূপে চলিবে আশা করা যায়। ইহার কার্য্য সম্পাদন-ভার এক সবকমিটীর উপর অর্পিত হইয়াছে।

দান—আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্থায়ী প্রচার ফণ্ডে এককালীন ৪০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি। রেঙ্গুনের ব্যারিষ্টার মিঃ পি সি সেন মহাশয় ব্রাহ্মবালক বালিকাদিগের ভোজ দিবার জন্য ১০০৲ টাকা পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে দান করিয়াছেন। এই দানের জন্য আমরা তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।

ব্রাহ্ম-সংখ্যা গণনা—১৮৮০ সালে একবার ব্রাহ্মসংখ্যা গণনা করা হয়। তাহার পর আর ব্রাহ্মগণের সংখ্যা গ্রহণ করা হয় নাই। এজন্য কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা এইবার যাহাতে আবার সংখ্যা গণনা করা হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মফঃস্বলে গণনা-পত্র (Form) প্রেরিত হইয়াছে। আগামী ১৫ই অক্টোবর তারিখের মধ্যে যাহাতে গণনা হয় তাহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ সভা—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার উদ্যোগে বিগত ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে সিটি কলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এক সভা হয়। এই সভায় শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় সভাপতি হন এবং বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম,এ, বি,এল, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র বি,এ, মিঃ মেঞ্জামিন্ এট্‌কিন্, পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন, ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু,এবং অনরেবল জস্‌টিস্ ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বক্তৃতা করেন।

নূতন সমাজ-মন্দির—সম্প্রতি কোচবিহার ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

মৃত্যু—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক বিতরণে তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একজন প্রাচীন ও ধার্ম্মিকবন্ধু হারাইয়াছেন।

দাতব্যবিভাগ—এই তিন মাসে ছয়টী নিরাশ্রয় পরিবার নয়টী ছাত্র, ২টী অন্ধকে নিয়মিতরূপে সাহায্য করা হইয়াছে। ২টী ছাত্র ও আর একটী মহিলাকেও এক কালীন সাহায্য করা হইয়াছে এবং টাঙ্গাইল অঞ্চলে বিষম বন্যা হওয়ায় বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয়ের পত্রানুসারে তাঁহার নিকট ১৫ টাকা পাঠান হইয়াছে। তিনি জানাইয়াছেন এই টাকা দ্বারা কয়েকটী বিধবার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। গত তিন মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব এই;—

আয়		ব্যয়	
বার্ষিক চাঁদা আদায়	১৭৲	মাসিক দান	৬০৲
মাসিক চাঁদা আদায়	৩৲	এক কালীন দান	৩৪৲
এক কালীন চাঁদা আয়	২৫৸০	বিবিধ ব্যয়	/১৫
শ্রাদ্ধোপলক্ষে প্রাপ্তি	২৪৲		
শুভ কর্ম্মের দান প্রাপ্তি	৪৲		১০১/১৫
		হস্তে স্থিত	১৩৮৵০
	৭৫৸০		
পূর্ব্বকার স্থিত	১৬৩৵১৫		২৩৯৵১৫
	২৩৯৵১৫		

স্থায়ী প্রচার ফণ্ড—গত তিন মাসে ৪০০৲ টাকা আয় হইয়াছে, পূর্ব্ব স্থিত ২৩৬৬।৶১৫। মোট ২৭৬৬।৶১৫। এই টাকার অধিকাংশ প্রচারক ভবন নির্ম্মাণার্থ ব্যয় হইয়াছে। অবশিষ্ট ধার দেওয়া হইবে।

পুস্তক প্রচার কমিটি ও আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় কমিটির বিশেষ কোন কাজ হয় নাই।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড

আয়			ব্যয়	
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের চাঁদা			প্রচার ব্যয়	৫৪৬৶১০
প্রাপ্তি		২৯২৶০	কর্ম্মচারীর বেতন	১৪৬৲১৫
বার্ষিক চাঁদা	২২১৸৶০		ডাকমাশুল	২১৷৶১৫
মাসিক চাঁদা	৫৪৸০		পাথেয় হিঃ	৮৯৲
এককালীন দান	১৲		প্রচারক গৃহ হিঃ	১১১৵১০
শুভ কর্ম্মের দান	১৫৲		কমিশন হিঃ	।৶০
	২৯২৶০		দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন	১০৮৸০
প্রচার ফণ্ড		৩৫৩৷৵০	মুদ্রাঙ্কণ হিঃ	২৭।০
বার্ষিক চাঁদা	২২৲		বিবিধ হিঃ	৬৬৷৶৫
মাসিক „	২৯৭৷০			
এককালীন	৩৪৵০			১১১৭।/১৫
	৩৫৩৷৵০		হাওলাত শোধ	২০৲
পাথেয়, হিঃ		৬৪৲		১১৩৭।/১৫
প্রচারক গৃহ হিঃ (বাটী ভাড়া)		১০৮৲	স্থিত	১৭৯।৶০
সিটী কলেজ হইতে দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দিবার জন্য প্রাপ্ত		১০৮৸০	মোট	১৩১৬৷১৫
কর্ম্মচারীর বেতন হিঃ তত্ত্বকৌমুদী ও পুস্তকের ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত		৪৫৲		
		৯৭১৸৴০		
গচ্ছিত হিঃ		৬৫৲		
হাওলাত হিঃ		১০১৲		
		১১৩৭৸/০		
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত		১৭৯৶১৫		
মোট		১৩১৬৷১৫		

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

আয়			ব্যয়	
বাকী মূল্য আদায়		৮০৷/১০	অপরের পুস্তক বিক্রয়ের মূল্য শোধ	১৩৵০
নগদ বিক্রয়		১১৭৵১৫	কমিশন	৮৷/১৫
সমাজের	৮৫৷৶৫		পুস্তকের ডাকমাশুল	৩৷১০
অপরের	৩১৶১০		ডাকমাশুল (পত্রের)	৶০
	১১৭৵১৫		কর্ম্মচারীর বেতন	২১
কমিশন		৩৸১০	পুস্তক খরিদ	২৪৮৲
পুস্তকের ডাকমাশুল		৩৶১০	কাগজ খরিদ	৬৷০
সুদ		১০৲	বিবিধ হিঃ	১৷১০
ফেরত জমা		১৭৯৷১৫		৩০৩।৶১৫
		৩৯৪৸/০	গচ্ছিত শোধ	।১০
				৩০৩৷৫
জের		৩৯৪৸/০	জের	৩০৩৷৫
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত		২৭৮০।৫	স্থিত	২৮৭১/০
মোট		৩১৭৪৷/৫	মোট	৩১৭৪৷/৫

তত্ত্বকৌমুদী।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	৩০২৶৫	কমিশন হিঃ	১৸/০
নগদ বিক্রয়	।০	ডাকমাশুল	৮৸৫
		কর্ম্মচারীর বেতন	২৪৲
	৩০২।৶৫	মুদ্রাঙ্কণ	৮১৲
গত ত্রৈমাসিকের স্থিত	১৩৭৯।/১৫	কাগজ	৩৭৸০
		বিবিধ হিঃ	৫৷৫
মোট	১৬৮১৷/০		১৫৮।/১০
		স্থিতি	১৫২৩।৶১০
		মোট	১৬৮১৷/০

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

আয়		ব্যয়	
মূল্য প্রাপ্তি	৩২৬৸/১০	ডাকমাশুল	১৩৬।/৫
হাওলাত	১৫৲	বিবিধ	২৬৵০
গচ্ছিত	১০৲	কাগজ	৫৮৷০
		কর্ম্মচারীর বেতন	৩৫৲
	৩৫১৸/১০	মুদ্রাঙ্কণ	১১২৷০
পূর্ব্বস্থিত	২২৩৸৶৫		
			৩৬৮৷৶৫
	৫৭৫ ১৫	স্থিত	২০৬।/১০
			৫৭৫।১৫

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

ভ্রমসংশোধন।

গতবারে "ব্রাহ্মসমাজের আশা" শীর্ষক প্রবন্ধে মুদ্রাকরের প্রমাদ বশতঃ একটী ভুল হইয়াছে। মেথিউ আরনল্ডের লিখা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহার ষষ্ঠ পংক্তিতে Pastএর স্থানে heart হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

অধ্যক্ষ সভা-গঠনসম্বন্ধীয় ২য় নিয়ম অনুসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের নাম ধাম আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিবরণ সকল অনুগ্রহপূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করেন। ঐ তারিখের পর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৫ই অক্টোবর, ১৮৯০।

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

ব্রাহ্ম সাধারণের সংখ্যা গণনার ফারম ব্রাহ্মসাধারণের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। যাঁহারা এখনও উক্ত ফারম প্রাপ্ত হন নাই তাঁহারা যেন অবিলম্বে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে (২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা) চাহিয়া পাঠান। ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে সকলকে ফারম পূর্ণ করিয়া পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল। যাঁহারা উক্ত সময় মধ্যে পাঠান নাই। তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যত শীঘ্র সম্ভব উক্ত ফারম পূর্ণ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। সকলের মনোযোগ ভিন্ন এ কার্য্য কখনই সুসিদ্ধ হইবে না।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২রা কার্ত্তিক মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ২রা কার্ত্তিক প্রকাশিত।

তত্ত্ব-কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
১৪শ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক শনিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

আবাহন।

তোমারি উদ্দেশে পিতা আছি যে বসিয়া,
হৃদয়ে আসন পাতি, প্রেমাশ্রু সিঞ্চিয়া;
হীনতা কলঙ্ক রেখা
ভালে নাহি যায় দেখা,
ও পদ পূজার ফুলে শোভিছে এ হিয়া;
আশ্বাস তরঙ্গে ঘন,
ভাসিতেছি অনুক্ষণ,
আনমনে চেয়ে আছি তোমার লাগিয়া;
শ্রদ্ধা জ্ঞান ভক্তি চয়,
বিকসিত সমুদয়,
বিকসিত প্রেম-তৃষ্ণা হৃদয় ভরিয়া।
পিতা গো তোমার তরে,
এত আয়োজন করে,
কত কাল রব বল চরণে চাহিয়া?
এস গো হৃদয় ঘরে,
শান্তি লভি চির তরে,
প্রেম ভক্তি মাখা ফুলে ওপদ পূজিয়া।

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে করুণাময় পিতা! বিপদের মেঘ যখন চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলে, প্রাণ যখন গন্তব্য পথে চলিতে এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে নিজ উপার্জ্জিত শিক্ষার আলোক এবং বন্ধুগণের প্রদত্ত উপদেশ হইতে কোনই সাহায্য পায় না, ঘোরতর সঙ্কটের অবস্থায় যখন চারিদিক শূন্য মনে হয়, এবং সহায় সম্বল শূন্য হইয়া প্রাণ যখন পথ পাইবার জন্য একান্ত আকুল হইয়া কাঁদিতে থাকে, তখন হে বিপদ-ভঞ্জন প্রভু তুমি ভিন্ন এমন কে আছে, যে সেই ঘোর দুর্দ্দিনে তাহাকে পথ দেখাইয়া সুপথে লইয়া যায়, এমন কে আছে যে একটী সান্ত্বনার বাক্য বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দেয়—তাহাকে জীবনের পথে চলিতে সাহায্য করে। কিন্তু প্রভু যদি সে অবস্থায় তোমার আলোকের এক কণাও সে দেখিতে না পায়, তুমিও যদি তখন তাহার নিকট লুকাইয়া থাক, তোমার প্রসন্ন মুখের একটী কথাও যদি সে শুনিতে না পায়, তখন তাহার দশা কি হয়? কে সেই ঘোর দুরবস্থা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া হস্ত ধরিয়া তুলিতে সাহায্য করে? দীন দয়াল পিতা আমরা নিজ অপরাধেই এরূপ দুর্দ্দিন আনয়ন করিয়া থাকি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের প্রকৃতি ত তোমার অজ্ঞাত নাই। আমরা যে সহজ-দুর্ব্বল এবং কুবাসনার বশীভূত হইতে সর্ব্বদাই ইচ্ছুক, তাহা ত তুমি জান। তবে আমাদিগকে আর কেন এমন সঙ্কটের মধ্যে একাকী ছাড়িয়া দেও। আমরা কি একাকী এই প্রলোভন পূর্ণ সংসারে নির্ব্বিঘ্নে চলিবার উপযুক্ততা লাভ করিয়াছি? এখনও আমাদের পক্ষে সেদিন বহুদূরবর্ত্তী রহিয়াছে। তবে আর আমাদিগকে কেন এমন পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া দেও। এস প্রভু, আমাদের এই ক্ষীণ প্রাণের ভার তুমি গ্রহণ কর। পড়ে পড়ে আমরা যে একবারে হতাশ হয়ে যাই। কুল কিনারা না পাইয়া একেবারে যে হাল ছাড়িয়া দি এমন দুর্ব্বলদিগকে আর পরীক্ষা করিয়া কি হইবে। ইহাদের ভার তুমি ভিন্ন আর কেহ বহন করিতে পারিবে না। আর কেহ এ কার্য্য সাধনে উপযুক্ত নয়। তবে তুমিই যে আমাদিগের সকল সময়ের একমাত্র বন্ধু তাহা আমাদিগকে ভাল করিয়া জানিতে দেও এবং সর্ব্বতোভাবে তোমারই উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেও।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আমাদের লক্ষ্য—অপরিচিত পথে চলিবার সময় উজ্জ্বল দিবালোকেও মানুষ দিক্‌হারা হইয়া থাকে। কারণ যে সূর্য্য তাহাদের দিক নিরূপণের এক মাত্র উপায়, তাহাকে নিয়ত এক স্থানে অবস্থিতি করিতে দেখা যায় না। সূর্য্যকে আমরা নানা সময়ে নানা স্থানে অবস্থিত দেখিতে পাই বলিয়া, সূর্য্য হইতে বাস্তবিক সকল সময় দিক্ নিরূপণের সহায়তা পাওয়া যায় না। আবার ঘোর অন্ধকার রাত্রিতেও মানুষ অতি সহজে দিক্ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, যদি তাহার ধ্রুব নক্ষত্রের সহিত পরিচয় থাকে। ধ্রুব নক্ষত্রকে স্থান পরিত্যাগ করিতে দেখা যায় না। সকল সময়ই আমরা তাহাকে একই স্থানে অবস্থিতি করিতে

দেখিয়া থাকি। এজন্য ধ্রুব নক্ষত্রকে চিনিয়া রাখিলে অতি সহজেই মানুষ দিক্ নিরূপণ করিয়া যথা গন্তব্য পথে গমন করিতে পারে। সুতরাং পথিকের পক্ষে দিক্ নিরূপণের সাহায্যার্থ সর্ব্বদাই কোন স্থির লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া চলিতে হয়। যাহা সময় সময় পরিবর্ত্তিত হয়—স্থানচ্যুত হয়, এমন কিছুকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে গেলে প্রতিপদেই লোককে দিক্ হারা হইয়া বিপথগামী হইতে হয়। এজন্য যাহা স্থির, অটল, কোন অবস্থাতেই পরিবর্ত্তিত হয় না, তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এরূপ স্থির লক্ষ্যের অভাবে মানুষকে যে দিক্ হারা হইয়া বিপথগামী হইতে হয়, তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। উজ্জ্বল দিবালোকে—যে অবস্থায় মানুষ সব দেখিতে পায় তখনও যে দিক্ হারা হইয়া যায় এবং রাত্রির অন্ধকারেও যে দিক্ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় তাহার আর কোন কারণ নাই। সে কেবল সূর্য্যের স্থানচ্যুতি এবং ধ্রুব নক্ষত্রের নিয়ত এক স্থানে অবস্থিতি হয় বলিয়া। সুতরাং মানব আত্মা যে পথে অনন্ত কাল চলিবে, যে পথে চলিতে তাহার ভুল ভ্রান্তি হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সে পথে চলিবার পক্ষে লক্ষ্য এমন স্থির ও অটল হওয়া উচিত, যে যাহা কোন প্রকারেই পরিবর্ত্তিত হইবে না। সকল সময় সকল অবস্থাতেই সম্মুখে থাকিয়া যাহা আমাদিগের পথ প্রদর্শন করিতে উপযুক্ত সাহায্য করিতে সক্ষম একমাত্র তাহাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ যে তোমার জীবন পথের লক্ষ্য আর কিছুই হইতে পারে না, এক মাত্র ঈশ্বরই তোমার অনন্ত কালের লক্ষ্য। কারণ আর যাহা কিছুকে লক্ষ্য করিবে সে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইবে। আর সমস্তই অস্থির, ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল। নিরন্তর সঙ্গে থাকিয়া পথ প্রদর্শন করিবে—উপযুক্ত দিকে লইয়া যাইবে এমন শক্তি আর কাহারও নাই। মানুষ দুর্ব্বল ও ভ্রান্ত তাহার নিজের পথ স্থির করিয়া লওয়াই কঠিন। সুতরাং সে আর তোমার লক্ষ্য কিরূপে হইবে। কোন গ্রন্থও লক্ষ্য হইতে পারে না, কারণ তাহার লিখিত বিষয়ে অনেক সময় সত্যের সহিত অসত্য মিশ্রিত থাকে। সুতরাং সেই পুস্তকের প্রতি বিশেষ নির্ভর করিতে হইলে সত্যাসত্য উভয়ের প্রতি নির্ভর করিতে হয় এবং সত্যাসত্য উভয়েরই নির্দ্দেশে চলিতে হয়। আবার তাহার ভাষা সকল সময় একার্থ প্রকাশ করে না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আপনাপন রুচির সহিত তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং প্রতিপদেই বিপথগামী হইতে হয়। আবার যতই উদার ও প্রশস্ত ভাবে সে গ্রন্থ লিখিত হউক না কেন তাহা কখনই চির উন্নতিশীল আত্মার পথ প্রদর্শক হইতে পারে না। তদতিরিক্ত এমন বহু বিষয় থাকিয়া যায়, যাহা মানবের কল্যাণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ নিমিত্ত কোন গ্রন্থও নিরন্তর পথ প্রদর্শন করিতে উপযুক্তরূপে সাহায্য করিতে পারে না।

দিবালোক যেমন সকল সময় পথ চলিবার পক্ষে উপযুক্ত সাহায্য করে না, আমাদিগের পক্ষে শিক্ষার আলোকও সেইরূপ সকল সময় প্রকৃত ভাবে আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করে না। তাহা অনেক সময় আমাদিগকে অকারণ অভিমানী করিয়া সুপথ না দেখাইয়া বিপথেই লইয়া যায়। এজন্য আমাদের লক্ষ্য তাহাই হওয়া উচিত, যাহাতে দুর্ব্বলতা নাই, অজ্ঞানতা নাই, কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই এবং যাহা আমাদের নিত্য সঙ্গী। সেই ধ্রুব-জ্যোতি পরমেশ্বরই অনন্ত উন্নতিশীল, আত্মার একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ, কারণ তাঁহাতে পরিবর্ত্তন নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথে চলিতে কোনরূপ ভ্রম হইবারও সম্ভাবনা নাই এবং কোন বিপদের আশঙ্কাও নাই। তিনিই সকল সত্য ও কল্যাণের আশ্রয় সুতরাং তাঁহাকে আদর্শ ও লক্ষ্য করিলে কোন সময়ই মানবকে আত্মার কল্যাণকর সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে হয় না। সুতরাং সেই ধ্রুব-জ্যোতিকেই আমাদের গন্তব্য পথের আদর্শ করা উচিত।

ব্রাহ্ম বালকদিগের শিক্ষা—ব্রাহ্ম বালকগণ বর্ত্তমান সময়ের ধর্ম্ম-শিক্ষা-শূন্য বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া এবং নীতি সম্বন্ধে অতি হীন বালকদিগের সহিত মিশিয়া ব্রাহ্মসমাজের আশার স্থান না হইয়া, যে দিন দিন নিরাশা ও আশঙ্কার হেতু হইতেছে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আরও আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ব্রাহ্মবন্ধুগণ সে বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ প্রদান করিতেছেন না। এইরূপ উদাসীন ভাবে চলিলে প্রত্যেক ব্রাহ্মকেই শেষে পরিতাপ করিতে হইবে এবং নিজ পরিবারের আশাস্থল বালকদিগের অশেষ দুর্গতি দেখিয়া শোক করিতে হইবে। এবিষয়ে আমরা সম্প্রতি শিলং হইতে এক খানি পত্র পাইয়াছি। পত্র খানা নিম্নে প্রকাশিত হইল। ব্রাহ্মগণ এরূপ গুরুতর বিষয়ে যাহাতে আর উদাসীন না থাকেন সে জন্য আমরা সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা বালকদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য ইতিপূর্ব্বে মনোযোগী হইয়াছিলেন, আজ কাল সে বিষয়ে বড় একটা কিছু শুনিতে পাই না। আশা করি তাঁহারা বিশেষ উদ্যোগের সহিত এই সাধারণ-কল্যাণকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন। প্রাপ্ত পত্র খানা এই—

"শুনিয়া সুখী হইলাম, যাহাতে ব্রাহ্ম বালিকারা আদর্শ শিক্ষা পাইতে পারে, তজ্জন্য "ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়" নামে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃত্বাধীনে একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই সংবাদটী ব্রাহ্ম সাধারণের নিকট, বিশেষতঃ মফস্বলবাসী ব্রাহ্মদিগের নিকট কত দূর সুখকর এবং আশাজনক তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে বলিতে কি, এতদিনে বালিকাদের শিক্ষা লাভের একটী সুন্দর উপায় উদ্ঘাটিত হইল। আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ স্ব স্ব মেয়েদিগকে তথায় পাঠাইয়া এবং যথোপযুক্ত আর্থিক সাহায্য দ্বারা বিদ্যালয়ের পুষ্টি সাধনে যত্নবান হইবেন।

ব্রাহ্ম মেয়েদের শিক্ষার সুবিধা হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্ম ছেলেদের জন্য কি করা হইল? ব্রাহ্ম ছেলেরা যে নানা প্রকার দুর্নীতি পরায়ণ ছেলেদের সহিত মিশিয়া, দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে, ধর্ম্মের প্রতি শৈথিল্য ভাব প্রদর্শন করিতেছে, ইহা ব্রাহ্ম সাধারণ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতেছেন কি? বলিতে দুঃখ হয়, মিথ্যা কথা, প্রতারণা, ধর্ম্মের প্রতি বীতানুরাগ,

আজ কাল অনেক ব্রাহ্ম বালকদের মধ্যে দেখিতে পাই। আমি এমন ছেলেও দেখিয়াছি, যাহার পিতামাতা হিন্দু সমাজ হইতে নানা নিগ্রহ, অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের এবং সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রাণের সার বস্তু বলিয়া মনে করেন, তাঁহার পুত্র নিয়ত ব্রাহ্মধর্ম্ম বিরুদ্ধ কার্য্যে রত। এমন কি ভিন্ন ধর্ম্ম সমাজের বালকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের এবং ধর্ম্মের মিছামিছি কুৎসা প্রকাশ করিতেও ক্রটী করেন না! এই সকল কুভাব কেন হইল এবং কোথা হইতে আসিল? ইহা কি দুর্নীতি পরায়ণ বালকদিগের সহিত মিশিতে দেওয়ার ফল নহে? ছেলেরা যাহা দেখে, তাহাই শিখে। কত বড় বড় লোকের পতন হইতে দেখা যায়, আর ইহারা ত কোমল মতি বালক! নানা প্রলোভন পরীক্ষায় ইহারা যে ঠিক থাকিবে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ব্রাহ্ম বালিকাদের শিক্ষার জন্য যে প্রকার একটী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, ব্রাহ্ম ছেলেদের জন্যও যদি সেই প্রকার একটী সদুপায় না করা যায়, তবে ইহাদের পরিণাম যে কি হইবে, ভাবিতেও প্রাণ কেঁপে উঠে।

ব্রাহ্মসমাজনেতৃগণ সমীপে আমার বিনীত প্রার্থনা, তাঁহারা "ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের" মত আর একটী "ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয়" সংস্থাপন করুন। যে পর্য্যন্ত তাহারা নিজ নিজ মত ও বিশ্বাস ঠিক রাখিয়া চলিতে না পারিবে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এরূপ শঙ্কটপূর্ণ সংসর্গে মিশিতে দেওয়া কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

কোমল ও কঠোর ভাব

আমরা এক এক সময় অনুভব করি যে আমাদের নিত্য আশ্রয় মহান্ পরমেশ্বর যেন আমাদিগকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত। তিনি তখন মায়ের মত আদরের সহিত যেন আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল। আমাদের প্রাণের গতি যাহাতে তাঁহার দিকে হয়, যাহাতে প্রবল তৃষ্ণা উপস্থিত হইয়া, আমরা সহজে তাঁহার দিকে যাইতে পারি, তিনি যেন সে সকল আয়োজন নিজ হস্তে যোজনা করিতে থাকেন। তখন তাঁহার প্রকাশ অনুভব করা সাধকের পক্ষে খুব সহজ-সাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু আবার এমন এক এক সময় আসিয়া থাকে যখন দেখা যায় আমাদের এমন যে চির অনুকূল স্নেহময়ী জননী তিনিও যেন কিছু কঠিন হইয়াছেন। সন্তান তাঁহাকে কাতর প্রাণে ডাকিতেছে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য কত না ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে, কত কাতর প্রার্থনা তাহার প্রাণ হইতে উত্থিত হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই যেন তিনি তাহার নিকট প্রকাশিত হইতেছেন না। সে যতই আকুল হউক না কেন, তাঁহার কঠোর ভাব যেন কিছুতেই যাইতেছে না। তিনি তখন যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া সন্তানকে পরীক্ষা করিতে থাকেন। তাহার আগ্রহ কতদূর, তাহার পিপাসা কত প্রবল, তাহার পরীক্ষা করিতে থাকেন। আমরা ঈশ্বরে এই দুই ভাবেরই প্রকাশ দেখিয়া থাকি। এক তাঁহার স্নেহময় ভাব—তাঁহার করুণা-মিশ্র অনুকূল ভাব। আর তাঁহার শাসন ও মহত্ব সূচক কঠোরভাব। এই দুই ভাবের সম্মিলনেই বাস্তবিক আমাদের কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। তিনি যদি প্রথমেই সন্তানের নিকট মহান্ ভাবের পরিচয় দেন, সন্তান তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। তাঁহার সেই তেজস্বীতা এবং প্রভাব দেখিয়া সাধক কখনই সেই দিকে আকৃষ্ট হয় না। তাহার প্রাণ তখন কোমল ও অতি ক্ষুদ্র। এ জন্য সে মহান্ উগ্রভাব গ্রহণ করিতে পারে না, শুধু তাহা নয় তাহার প্রাণ সে ভাবে আকৃষ্টই হয় না এবং আরাম অনুভব করে না। তখন তাহার প্রাণ সুস্নিগ্ধ ব্যবহার পাইবার জন্য আকুল। কিন্তু তাঁহার সেই স্নেহময় ভাবে প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া যখন আত্মা অতি আরাম লাভ করিতে থাকে এবং সেই মধুময় ভাব অনুভব করিয়া তাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া সেই ভাবেই বিভোর হইতে থাকে, তখন স্বভাবতঃ তাহার প্রাণ আয়াস-সাধ্য সাধন অবলম্বন করিতে বিমুখ হয় এবং সে এক প্রকার বিলাসীর ন্যায় অলস হইয়া পড়ে। প্রাণে দুর্ব্বলতা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইতে থাকে। কিন্তু শুধু আরামের সহিত বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করাই ত আর আমাদের জীবনের লক্ষ্য নয়। অলস হইয়া দুর্ব্বলের ন্যায় জীবন যাপন করাই ত আর আমাদের জীবনের পক্ষে একমাত্র কল্যাণকর নয়। কিন্তু সক্ষমের ন্যায় আমাদিগকে চলিতে হইবে এবং সম্মুখস্থ প্রবল শত্রুর সহিত কঠোর সংগ্রাম করিতে হইবে। নানা প্রলোভন হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে হইবে। এ জন্য আমাদের বল পাওয়া আবশ্যক। এজন্য আমাদের কল্যাণময়ী মাতা আমাদিগকে উপযুক্ত শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে তখন তিনি যেন কিছু কঠোর ভাব গ্রহণ করেন। তখন আর ডাকিতে ডাকিতেই যেন আর তাঁহার প্রকাশ অনুভব করিতে দেন না। তিনি আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কিসে হইবে জানেন। তিনি জানেন তাঁহার সন্তানকে প্রথমেই যদি কঠিন আয়াসকর সাধনের মধ্যে ফেলিয়া দেন—তাহার সহিত কঠোর ব্যবহার করেন, তাহা হইলে সে আর তাঁহার দিকে যাইতে চাহিবে না। সে তাহার প্রাণের আরাম যাহাতে পাওয়া যায় সেই দিকেই ছুটিবে—পাপের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সেই দিকেই যাইবে এবং মৃত্যুর শরণাপন্ন হইতে থাকিবে। এজন্য তিনি প্রথমে অতি স্নেহের সহিত তাহাকে আকর্ষণ করিতে থাকেন এবং এক বার আপনার মোহন রূপে মুগ্ধ করিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া, পরে তাহার আকাঙ্ক্ষা যাহাতে প্রবল হয় এবং সে যাহাতে তাঁহার মূল্য বুঝিতে পারে, জীবন পথে পরে যে সকল সংগ্রামে পড়িতে হইবে তাহার উপযুক্ত বল লাভ করিতে সমর্থ হয়, এজন্য তাহাকে প্রস্তুত করিতে থাকেন। কারণ শুধু সুন্দরভাবে বিভোর হইয়া থাকাই তাঁহার সন্তানের একমাত্র কল্যাণকর নয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত বল প্রাপ্ত হওয়া এবং সম্যকরূপে সুস্থ হওয়াই যে তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় তাহা তিনি জানেন। এজন্য সাধক চির দিন তাঁহাকে কোমল, ও সহজে প্রকাশবান বলিয়া অনুভব করে,

না। তাহাকে সেই পরমাত্মার স্নেহময় দর্শন পাইবার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়, বিশেষ আয়াসসাধ্য সাধন অবলম্বন করিতে হয়। এই দুই ভাবের সম্মিলনেই, সাধক বাস্তবিক কল্যাণের দিকে যাইয়া থাকে। যদি প্রথমেই তাঁহার মহতো মহান্ ভাব অনুভব করিতে হইত এবং সে জন্য যেরূপ পরিশ্রম আবশ্যক যদি সাধককে প্রথম উদ্যমেই সেই সাধন অবলম্বন করিতে হইত,তাহা হইলে অতি সহজে নিরাশা আসিয়া প্রাণকে অধিকার করিয়া ফেলিত এবং তাহাকে সাধন বিমুখ করিয়া অতি হীন অবস্থার দিকে লইয়া যাইত। এজন্য তিনি প্রথমে সন্তানকে আকৃষ্ট করিতে থাকেন। তাঁহার সুধাময় ভাবে প্রাণকে মুগ্ধ করিতে থাকেন। কিন্তু সেভাবে চির দিন চলিলে সবল হইবার উপায় নাই, অথচ বল প্রাপ্ত হওয়া, সক্ষম হওয়া প্রত্যেকের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। এজন্য তিনি যেন তাঁহার প্রেমময় দর্শন হইতে তাঁহার সাধককে কিছু কালের জন্য বঞ্চিত করেন এবং তাহার আগ্রহ বাড়াইবার জন্য তাহার শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাহাকে পরীক্ষার অবস্থায় রাখিয়াদেন। তাহাতেই তাহার প্রাণে শক্তির সঞ্চার হয় এবং সে ক্রমশঃ কুশলের দিকে যাইতে থাকে। আমাদের মধ্যে অনেকের পক্ষেই এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে যে এখন যেন আমাদের পরমমাতাকে ডাকিয়া আর দেখা পাই না। তাঁহার যে প্রসন্নতা এক সময় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি এখন যেন তাহা আর অনুভব করিতে পারি না। এ অবস্থায় আমাদের মত দুর্ব্বল দিগের প্রাণে অবিশ্বাস ও নিরাশা আসিতে পারে। কিন্তু আমাদের জননী আমাদিগকে উপযুক্ত শক্তি দিবার জন্য এবং তাঁহার জন্য আমাদিগের প্রাণের আগ্রহ কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই এরূপ করিতেছেন। সুতরাং নিরাশ হওয়া আমাদের উচিত নয়। কিন্তু সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহার করুণার প্রত্যাশী হইয়া অপেক্ষা করাই উচিত। তাহা হইলেই আমরা তাঁহার প্রকাশ প্রাণে দেখিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিব এবং উপযুক্ত বল লাভ করিয়া সংসার পথে নির্ব্বিঘ্নে চলিতে সমর্থ হইব।

বিবেকের শাসন।

দুর্গন্ধময় স্থানের গলিত বস্তু সকলের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশ সকল শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যাহাতে শরীরের অনিষ্ট না ঘটায়, অস্বাস্থ্যের মূল বীজ স্বরূপ সেই বিষাক্ত বস্তু সকল যাহাতে শরীরে সঞ্চিত হইয়া শরীর নাশের কারণ না হয় এই উদ্দেশ্যে আমাদিগকে নাসিকা প্রদত্ত হইয়াছে। দুর্গন্ধময় স্থানে গমন করিতেই নাসিকা আমাদিগকে সে স্থানে অবস্থিতি করিতে নিষেধ করিয়া থাকে। কিন্তু এই প্রহরীর নিষেধ বাক্য না শুনিয়াও যদি আমরা সেই কু স্থানে কিছু কাল বাস করি, তাহা হইলে দেখা যায়, সেই অনুকূল জাগ্রত প্রহরী যেন ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে। আর তাহার সেরূপ সতেজ নিষেধ ধ্বনি করিবার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না; তখন দুর্গন্ধময় স্থানে বাসের কষ্টও আর থাকে না। সুতরাং অচিরে শরীর ভগ্ন হইয়া তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হয়। শরীর সম্বন্ধে যেরূপ দুর্গন্ধ হইতে—দূষিত পদার্থের সঞ্চার হইতে রক্ষা করিবার জন্য নাসিকার কার্য্য দৃষ্ট হয়। সে যেমন প্রহরী স্বরূপে থাকিয়া সে স্থানে বাসের অনৌচিত্য ঘোষণা করিয়া আমাদিগকে সতর্ক করিতে থাকে, তেমনি আত্মা সম্বন্ধেও দেখিতে পাই যে কুস্থানে—অপবিত্র সহবাসে বাস করিতে উদ্যত হইলে এবং অপবিত্র কিছু গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে আমাদের আত্মার নিয়ত জাগ্রত প্রহরী বিবেকও বিশেষ ভাবে সেই মন্দানুষ্ঠান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য আমাদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে। নিষেধ করিতে থাকে। কিন্তু যদি আমরা তাহার নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া অকল্যাণের পথে যাইতে থাকি এবং সেই নিষেধ বাক্যের প্রতি যদি অধিক পরিমাণে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকি, তাহা হইলে আমাদিগের সেই কল্যাণেচ্ছু প্রহরীর নিষেধ বাক্য আর শুনিতে পাওয়া যায় না। সে যে তাহার কার্য্য হইতে ক্ষান্ত হয় এমন নয়। কিন্তু বধিরতা আসিয়া তাহার বাক্য শ্রবণে আমাদিগকে অক্ষম করে। এজন্য দেখা যায় পাপাসক্ত—নিয়ত পাপাভ্যাসে অভ্যস্ত ব্যক্তিদিগের প্রাণে বিবেকের কঠোর দংশনও যেন নিস্তেজ হইয়া যায়। পাপ করিয়া সে ব্যক্তি আর কোন কষ্টই অনুভব করে না। অপবিত্রতার সহিত সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক তাহার সঙ্গে বাস করিতে সে আর কষ্ট অনুভব করে না। তাহার পক্ষে ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক প্রহরীর কার্য্য অবরুদ্ধ হইয়া যাওয়ায় অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়। নাসিকার নিষেধ বাক্য অগ্রাহ্য করিলে যেমন শারীরিক ব্যাধি আসিয়া তাহাকে নানা প্রকারে কষ্ট দেয় ও শিক্ষা প্রদান করে। তেমনি আত্মার প্রহরী বিবেকের বাণি অগ্রাহ্য করিবার অপরাধে আত্মায় অতি কঠিন রোগ সকল উপস্থিত হইয়া তাহাকে বিষম যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে থাকে। তখন আত্মা সেই বিষম যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে পুনরায় সুপথে ফিরিবার জন্য কত না আগ্রহ প্রকাশ করে। সে সময়ের তীব্র যাতনায় তাহার প্রাণ কত না ক্লেশ সহ্য করিতে থাকে। সে অবস্থা কত যাতনাদায়ক, যখন প্রাণ সুপথে ফিরিয়া আসিতে চায় এবং স্বাস্থ্য লাভের জন্য আকুল হয়, অথচ প্রাচীন দুষ্ট অভ্যাসে তাহাকে এমন হীন ও অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছে যে ফিরিতে হইলে, যাদৃশ পরিশ্রম করা আবশ্যক এবং যে সকল উপায় গ্রহণ করা আবশ্যক, প্রকৃষ্ট রীতি অনুসারে তাহার অনুসরণ করিতে সে সমর্থ হয় না। বহু যন্ত্রণা ভোগ করিয়া করিয়া তবে অতি ক্ষীণতর ভাবে সে কুশলের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। বিবেক রূপ প্রহরীর কথা অগ্রাহ্য করিলে তাহার দণ্ড স্বরূপ এ সকল অবস্থা ভোগ করিতে হইবেই হইবে। এজন্য আত্ম-কল্যাণপ্রার্থী আত্মার পক্ষে বিবেক-বাণীর অনুসরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহার কথা অমান্য করিলে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে এবং সে যন্ত্রণা ভোগ কিছু সামান্য নয়। সুতরাং প্রথম হইতেই সতর্ক হইয়া বিবেকের আদেশে চলিতে থাকিলে, আর কোন ভয়ের আশঙ্কা থাকে না। প্রহার খাইয়া শান্ত হওয়া দুষ্ট বালকের লক্ষণ। দুষ্ট যাহারা তাহারাই প্রথম প্রথম পিতা মাতার শাসন বাক্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, শেষে যখন গুরুতর প্রহার প্রাপ্ত হয়, তখন বাধ্য হইয়া ফিরিয়া আসে।

এবং পিতামাতার বশীভূত সন্তান হইতে চেষ্টা করে। কিন্তু সুসন্তানের আচরণ সেরূপ নয়। সে প্রথম হইতেই পিতামাতার বশীভূত থাকিয়া সুপথের পথিক হয়। তাহারই বাস্তবিক কল্যাণ হয় এবং রোগের কঠোর যন্ত্রণা তাহাকে আর সহ্য করিতে হয় না। রোগের যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ভাল হওয়াপেক্ষা প্রথম হইতেই কি সুপথে চলিতে চেষ্টা করা ভাল নয়? বিবেকের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিলে, প্রত্যেকের পক্ষেই সুস্থতার সহিত জীবন যাপন করা সম্ভবে। সুতরাং আমাদের নিত্য সহচর কল্যাণদায়ক বিবেকের কথা প্রতিপালনের দিকে যেন প্রবল আগ্রহ থাকে। তাহা হইলে আর রোগের ভীষণ ভ্রুকুটীর ভয় থাকিবে না। স্বাস্থ্যের বিমল শান্তি পাইয়া আমরা পরম সুখে দিনাতিপাত করিতে সমর্থ হইব।

ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ।

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ব্রাহ্মসমাজের শত্রু মিত্র উভয় পক্ষ হইতেই ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনেক নৈরাশ্যের কথা শুনা যায়। ব্রাহ্মসমাজের শত্রুগণ ত বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই ইহার মৃত্যুসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা ত এরূপ করিবেনই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহার সপক্ষগণও ইহার ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে নিরাশ হইতেছেন। তাঁহাদের এই নৈরাশ্য সম্পূর্ণ অমূলকও নহে। শুদ্ধ বর্ত্তমান দেখিয়া বিচার করিলে ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে এক সময়ে যে অগ্নিময় ভাব দেখা গিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে তাহা শীতলতা প্রাপ্ত হইতেছে, ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে গভীর আধ্যাত্মিক জীবন লাভের জন্য তেমন চেষ্টা নাই, নববিধানভুক্ত ভ্রাতৃগণ পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের বল ক্ষয় করিতেছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগেরও পরস্পরের মধ্যে আশানুরূপ একহৃদয়তা নাই, প্রচার কার্য্যের অবস্থা খুব সন্তোষজনক নহে। বিশবৎসর পূর্ব্বের তুলনায় এখন অতি অল্প লোকই প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছেন। এক সময়ে যাঁহারা ব্রাহ্ম ছিলেন তাঁহাদেরও অনেকের উৎসাহ শীতল হইয়া আসিতেছে, ইহার উপর বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজে তেমন প্রতিভাশালী নেতাও নাই, যিনি জলন্ত উপদেশ ও দৃষ্টান্তদ্বারা অপরের নির্ব্বাপিতপ্রায় উৎসাহানলকে উদ্দীপিত করিতে পারেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে অদূরদর্শী জনসাধারণের অন্তঃকরণে ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হইবে ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। লোকে সাধারণতঃ বাহির দেখিয়াই বিচার করে। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে তাহার অন্যথা করিবে কেন?

কিন্তু বাস্তবিক কি ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যৎ আকাশ নৈরাশ্য মেঘে আচ্ছন্ন? যথার্থই কি ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না? যাঁহারা চিন্তাশীল লোক, যাঁহারা সমাজতত্ত্ব মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে জানেন, তাঁহারা কখনই এরূপ কথা বলিবেন না। একজন চিন্তাশীল ফরাসি লেখক বলিয়াছেন যে, যে ধর্ম্ম যত উদার, যে ধর্ম্ম কোন বিশেষ সাময়িক বা সামাজিক ভাব হইতে যত মুক্ত এবং মানব প্রকৃতির উপর যত অধিক পরিমাণে গঠিত, সেই ধর্ম্ম তত অধিক পরিমাণে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। তিনি বলেন এই কারণেই প্রাচীন পৌত্তলিক ধর্ম্ম সকলের তত প্রচার হয় নাই এবং এই কারণেই খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া পৃথিবীতে জয় লাভ করিতেছে। জগতের ধর্ম্মের ইতিহাস মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিলে এই কথার যাথার্থ্য সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। য়িহুদিগণ একেশ্বরবাদী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্ম তাঁহাদের জাতীয় ভাবের সহিত ওতপ্রোত ভাবে মিশ্রিত ছিল বলিয়া উহা জগতের ধর্ম্ম হইল না। সেণ্ট পল যদি খৃষ্ট ধর্ম্মকে উদার ভিত্তির উপর স্থাপিত না করিতেন, তবে খৃষ্ট ধর্ম্মেরও ঐরূপ অবস্থা হইত। বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার কারণ এই যে উহা জাতিভেদ প্রভৃতি সামাজিক বিশেষ ভাবকে অতিক্রম করিয়া মানব-প্রকৃতিনিহিত পরোপকার (মৈত্রী), ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি সাধারণ ভাবের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। মহাত্মা চৈতন্যের ধর্ম্মেও এক কালে এই উদার, বিশ্বজনীন ভাব ছিল বলিয়াই মুসলমানেরা পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এই যে পুরাতন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও নব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, এই যে ধর্ম্ম-বিপ্লব ইহা একদিনে সংঘটিত হয় না, এবং ইহার জন্য জনসাধারণের মন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত ফরাসি লেখক বলেন, ধর্ম্ম-বিপ্লব সংঘটিত হইবার পূর্ব্বে সামাজিক অবস্থা ও লোকের চিন্তার গতি এরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হওয়া আবশ্যক যাহাতে লোকে নূতন ধর্ম্মের ভাব গ্রহণ করিতে পারে। এই জন্যই দেখা যায় যে এক শতাব্দীতে যে সকল ভাব জন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিল না, দুই এক শতাব্দী পরে তাহা সহজে লোকের মন অধিকার করিল। সকল ধর্ম্মবিপ্লবের, সকল ধর্ম্ম সংস্কারের ইতিহাস এইরূপ। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ, চৈতন্য, লুথার প্রভৃতি প্রত্যেক ধর্ম্ম সংস্কারকের অভ্যুদয়কালের ইতিহাস আলোচনা করিলেই পদে পদে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।

ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে এই প্রবন্ধে যাহা বলা হইল, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহা কতদূর সংলগ্ন হয় এবং তাহা হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে, আমরা আগামী বারে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বনফুল।

(১)

১। "আমি" স্বার্থ, প্রেমের কেন্দ্র নহে; প্রিয়বস্তুই প্রেমের কেন্দ্র।

২। দুইটী বিভিন্ন বর্ণ মিলিয়া যেমন এক বর্ণ হয়, তেমনি প্রেমে দুইটী আত্মার হরিহর সংযোগ হয়। প্রেমে ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিত হয়, এবং এক প্রাণ অন্য প্রাণকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করে।

৩। প্রেমে বিয়োগে যোগ এবং ভেদে অভেদ জন্মায়।

৪। যে প্রেম-নদীর উৎস প্রেমস্বরূপের চরণ, তাহা কখনও শুষ্ক হয় না। নদী সমূহের ন্যায় লক্ষ্য-ভূমির দিকেই তাহার গতি।

৫। সেবা, মঙ্গল-সাধনই প্রেমের জপমালা।

৬। প্রেমেই মুক্তি। যিনি প্রেমিক বা প্রেমের পাত্র তাঁহার নরক নাই, বিনাশ নাই। প্রেমহীন জীবন মরুর ন্যায়। বন্ধুহীন ব্যক্তি অতীব দয়ার পাত্র।

৭। প্রেমিকের চক্ষে পর্ণ-কুটীরও রাজ-প্রাসাদ, এবং রাজ-প্রাসাদও পর্ণকুটীর।

৮। প্রেমই প্রেমিকের আহার বিহার, অন্ন জল, ধ্যান উপাসনা।

৯। যে হৃদয়ে প্রেমের প্রতিধ্বনি শুনা যায় না, যে হৃদয়-তন্ত্রী প্রেম-কম্পিত হয় না, যাহার প্রাণ হইতে প্রেম-ঝঙ্কার উত্থিত হয় না, সে আত্মা মরু অপেক্ষাও শুষ্ক, হিংস্র জন্তু অপেক্ষাও ভীষণ, এবং বিজন কান্তার অপেক্ষাও ভয়াবহ।

১০। প্রেম প্রথমে সূচিকার ন্যায় সূক্ষ্ম অদৃশ্য আকারে হৃদয়ে প্রবেশ করে, কিন্তু বারেক প্রবেশ লাভ করিলে উহা হৃদয়কে দখল করিয়া বসে। অবশেষে ফালরূপে হৃদয়কে প্রশস্ত ও বিস্ফারিত করিয়া বাহির হয়।

১১। যাহার সন্তান হয় নাই, সে নারী বাৎসল্য প্রেম কি প্রকারে বুঝিবে? সেইরূপ তুমি আমি ভক্ত ও প্রেমিকের প্রাণের কথা বুঝিব কি প্রকারে?

"সেই প্রেম যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিশাল।"

১২। ইন্দ্রধনু যেমন সপ্ত বর্ণে রঞ্জিত, প্রেমিকের আত্মাও তেমনি দয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিনয়, উদারতা, সহিষ্ণুতা, এবং সহানুভূতি এই সপ্ত গুণে সুশোভিত।

১৩। যিনি প্রকৃতরূপে অপরকে ভালবাসিতে পারেন, তিনিই আপনাকে যথার্থরূপে ভালবাসিতে জানেন। যিনি প্রকৃতরূপে আপনাকে ভালবাসেন না, তিনি অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে পারেন না।

১৪। মিলনের সময় অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ প্রেমের তুফানে ডুবিয়া যায়, অনন্ত আকাশ পর্য্যন্ত প্রেম-মগ্ন হয়, আত্মা দেশ কালকে ছাড়াইয়া উঠে।

১৫। মনুষ্যের সঙ্গ হইতে যেমন মানব চরিত্রের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, তেমনি মানুষ কি ভালবাসে জানিলেই, তাহার আত্মার নাড়ী বুঝা যায়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বাঁকুড়া।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় এখানকার ছাত্র সমাজের উৎসব নিম্নলিখিত প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

৩রা কার্ত্তিক রবিবার প্রাতে উৎসব আরম্ভ-সূচক উদ্বোধন এবং উপাসনা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী উপাসনার কার্য্য করেন। উপাসনার পর তিনি ছাত্রদের দায়িত্ব এবং ছাত্র সমাজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেন।

৪ঠা কার্ত্তিক সোমবার প্রাতে উপাসনা, মৃগাঙ্ক বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। বৈকালে—আলোচনা, বিষয় "বাল্য-বিবাহের অপকারিতা।"

৫ই কার্ত্তিক মঙ্গলবার—প্রাতে উপাসনা মৃগাঙ্ক বাবু উপাসনার কার্য্য করেন।

৬ই কার্ত্তিক বুধবার—বৈকালে "কানন সম্মিলন" এবং "প্রীতি-ভোজন।" সহর হইতে দূরস্থিত কোন বনে এই সম্মিলন হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। উপদেশ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। প্রীতি-ভোজন বিশেষ আনন্দ জনক হইয়াছিল।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

গত ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীর "ব্রহ্মবিদ্যালয়" শীর্ষক প্রাপ্ত প্রবন্ধ-লেখক আমার ১লা আশ্বিনের পত্রের উত্তরে গত বারের পত্রিকায় একখানি সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। প্রবন্ধ-লেখক যখন বিষয়টীকে নিতান্ত গুরুতর মনে করিতেছেন এবং আপনি ও এই বিষয়ে সুদীর্ঘ পত্র প্রকাশে অপ্রস্তুত নহেন, তখন উক্ত পত্রের উত্তর দানে আমার কোন আপত্তি নাই।

আমি বলিয়াছিলাম যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকগুলির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সম্বন্ধে একতা থাকিলেই হইল, ব্যাখ্যা ও যুক্তি-প্রণালী এবং অবান্তর মত সম্বন্ধে অনৈক্য থাকিলে ক্ষতি নাই। ইহার উত্তরে প্রবন্ধ লেখক বলিতেছেন, "পাঠ্য গ্রন্থ সকল যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের বিরোধী না হইল, তবে তাহা সর্ব্ববাদী (ব্রাহ্মগণের) সম্মত না হইবে কেন?" মূল সত্য বিষয়ে একতা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে অবান্তর মত সম্বন্ধে বহুল অনৈক্য দেখিয়াও প্রবন্ধ-লেখক কিরূপে এই কথা বলিলেন বুঝিতে পারিলাম না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বর, পরকাল, উপাসনা, মনুষ্যগুরু ও শাস্ত্রের ভ্রান্ততা, ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ এই কয়েকটীকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য বলিয়া স্বীকার করেন। এই সকল মূল সত্যে একতা সত্ত্বেও মহাপুরুষ, আদেশ, বিধান, উপাসনা-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে বহুল অনৈক্য বর্ত্তমান। সমাজ মধ্যে যে অনৈক্য, পুস্তকে সেই অনৈক্যই প্রতিফলিত। সুতরাং কোন পুস্তক ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য-বিরোধী না হইলেই তাহা যে সর্ব্ববাদী-সম্মত হইবে তাহা বলা যায় না।

উক্ত পত্রের দ্বিতীয় কথা এই যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক গুলির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সম্বন্ধেও একতা নাই। পত্র-প্রেরক বলিতেছেন "যখন এই দুই মতে (দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদে) বিশেষ প্রভেদ আছে, তখন পাঠ্যগ্রন্থ সকলে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল-সত্যের একতা কিরূপে থাকিল?" জিজ্ঞাসা

করি দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এই দুয়ের কোন্‌টা ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মূল সত্য? আমি জানি কোনটাই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য নহে। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোকই হয়ত দ্বৈত-বাদী, কিন্তু তাহাতেই কিছু দ্বৈতবাদকে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য বলা যায় না। যদি ব্রাহ্মমাত্রই দ্বৈতবাদী হইতেন, তথাপি দ্বৈতবাদ ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য হইত না। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য গুলি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত; দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এই সমস্ত দার্শনিক মত। ধর্ম্ম ও দর্শনে যোগ আছে বটে, কিন্তু সেই যোগের পরিমাণ ও প্রণালী সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এক মত নাই। যদি কোন দিন এক মত হয়, তথাপি সেই মত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইবে না, কেননা ব্রাহ্মসমাজ একটী ধর্ম্ম-সমাজ, ইহা একটী দার্শনিক সমাজ নহে; ইহার একতা ধর্ম্মের একতা, দার্শনিক মতের একতা নহে। ধর্ম্ম-মত ও দার্শনিক মতের প্রভেদ না দেখাতেই পত্র-প্রেরক উপরোক্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সম্বন্ধে উপরোক্ত পুস্তক সমূহের মধ্যে কোন অনৈক্য নাই; দার্শনিক মতে অনেক অনৈক্য আছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সমূহ ব্রাহ্ম-সমাজ চিরদিনই অবিচলিত ভাবে ধরিয়া থাকিবেন; কিন্তু দার্শনিকমত সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ব্রাহ্ম সমাজের প্রাচীন নেতাদিগের প্রচারিত এবং এখনও অধিকাংশ ব্রাহ্মের গৃহীত দার্শনিক মত যে ইদানিং পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে,—পূর্ব্বকার ও ইদানিন্তন ধর্ম্মবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সমূহে যে বিশেষ পার্থক্য আছে, তাহা আমি নগেন্দ্র বাবুর ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা ২য় ভাগ সমালোচনা করিতে গিয়া কতক দেখাইয়াছি। এই পরিবর্ত্তন তিন সমাজ মধ্যেই দেখা যাইতেছে, এবং ইহা এখনও অল্প সংখ্যক লোকের মধ্যে আবদ্ধ বটে, কিন্তু এই অল্প সংখ্যক লোকই আবার দার্শনিক আলোচনায় ও দার্শনিক মত প্রচারে বিশেষ আগ্রহশীল। সুতরাং আমার বিশ্বাস এই যে এক কালে এই পরিবর্ত্তন ব্রাহ্মসমাজ-ব্যাপী হইবে। তখনও ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলসত্য অবিচলিত থাকিবে।

পত্র-প্রেরক জিজ্ঞাসা করিয়াছেন উক্ত পুস্তক সমূহ ভিন্ন ভিন্ন মতের আলোচনা দ্বারা প্রত্যেক বিষয়ে একই মীমাংসায় উপ-নীত হইয়াছে কিনা? ইহার উত্তর এই যে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য সম্বন্ধে সমুদায় পুস্তকের মীমাংসাই এক; অবান্তর মত ও দার্শনিক মত সম্বন্ধীয় মীমাংসা ঠিক এক নহে। শিক্ষকদিগের মধ্যেই এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ একতা নাই। ছাত্র ছাত্রী-দিগের মতের একতা সাধন সম্পূর্ণরূপে শিক্ষকদিগের আয়ত্ত নহে, কিন্তু শিক্ষকদিগের মধ্যে যতই একতা আসিবে, ততই শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে ঐকমত্য সাধিত হইবে ইহাই সম্ভবপর। এস্থলে ইহা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে শিক্ষকগণ আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক বিষয়ের আলোচনার জন্য নিয়মিতরূপে মিলিত হইয়া থাকেন।

আমি পত্র-প্রেরক মহাশয়কে ২।৪ খানি সর্ব্ববাদী সম্মত পুস্তকের নাম করিতে বলিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিয়া-ছেন এরূপ পুস্তক যদি নাই থাকে, শিক্ষকগণ বক্তৃতাদ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্য ব্যাখ্যা করেন না কেন? ইহার প্রথম উত্তর এই যে কেবল বক্তৃতা দ্বারা ভাল শিক্ষা হয় না; পরীক্ষা দ্বারা এই প্রণালীর অসম্পূর্ণতা দেখা গিয়াছে। দ্বিতীয় উত্তর এই যে এই প্রণালীতেও পত্র-প্রেরকের অভিপ্রেত ঐকমত্য বজায় থাকিবে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্য যুক্তিদ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গেলেই কোন না কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে হইবে। এবং মূল মত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনিবার্য্যরূপে অনেক অবা-ন্তর মত ও উচ্চারণ করিতে হইবে। এই সকল দার্শনিক মত ও অবান্তর মত যে সকল স্থলে সর্ব্ববাদীসম্মত হইবে তাহার কোন আশা নাই। সুতরাং পত্র-প্রেরকের প্রস্তাবে কোন যুক্তিযুক্ততা দেখিতে পাইলাম না। একখানা পুস্তক পড়াইয়া মত বিরোধ পরিহারের যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাও কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। আমি ত এমন একখানা পুস্তক দেখি না, যাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সমুদায় মূল সত্য গভীর যুক্তির সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। আর এরূপ পুস্তক থাকিলেও তাহা সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উপযুক্ত হইত না।

আমার পূর্ব্ব পত্রে আমি প্রবন্ধ-লেখকের কতকগুলি গুরুতর ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছিলাম। প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন, আমার পত্র পাঠে তাঁহার ভ্রম ঘুচে নাই। আমার এই পত্র পাঠেও যে তাঁহার ভ্রম ঘুচিবে, আমার এরূপ আশা হয় না। আত্মপ্রত্যয়, যুক্তি, অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমার কোন ঐক আছে বলিয়া বোধ হয় না, এরূপ স্থলে একে অন্যের ভাষা বুঝাই অসম্ভব; ঐকমত্য ত দূরের কথা। যাহা হউক বাধ্য হইয়া আমাকে ২।৪টী কথা বলিতে হই-তেছে। আমি পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় আত্ম-প্রত্যয় সম্বন্ধে অনাস্থা প্রকাশ হওয়া দূরে থাক্, উক্ত পুস্তকের প্রত্যেক অধ্যায়েই কতিপয় আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আমি ত জানি ব্রহ্মজিজ্ঞাসা লেখক ঘোর আত্মপ্রত্যয়বাদী; কিন্তু প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার পত্রে দ্বিতীয়বার দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-লেখক আত্মপ্রত্যয় মানেন না। তিনি বলিয়াছেন—"আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যে (ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-লেখক) বিশ্বাস করেন যদি তাহা আর দশটী প্রমাণ দ্বারা সুসিদ্ধ হয়, নতুবা নহে।" আমি এই কথাগুলি পড়িয়া অবাক্ হইলাম। "আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ" অথচ "আর দশটী প্রমাণ-সাপেক্ষ", এরূপ সত্যের উল্লেখ ব্রহ্মজিজ্ঞাসার কোন্ স্থানে আছে আমি খুঁজিয়া পাইলাম না, আর পাইবার কথাও নয়। যে সত্য আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারা সিদ্ধ, আত্মপ্রত্যয়ই যাহার প্রমাণ, তাহাকে আবার "আর দশটী প্রমাণ-সাপেক্ষ" মনে করিবেন, এরূপ বুদ্ধিভ্রংশ ঈশ্বর কৃপায় ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-লেখকের এখনও ঘটে নাই, কখনও ঘটিবে কি না ভগবান জানেন। যে সত্য আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ, যাহা মূলতত্ত্ব, তাহার প্রমাণান্তর নিষ্প্রয়োজন, প্রমাণান্তর অসম্ভব। কিন্তু কোন্ তত্ত্ব আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ? কোন্ তত্ত্ব তাহা নয়, ইহা দেখাইবার একটী প্রণালী চাই, নতুবা অন্ধবিশ্বাসীগণ যে কোন তত্ত্বকে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ মূলতত্ত্ব বলিয়া চালাইয়া দিতে পারেন, এবং সন্দেহবাদীগণ অন্ধবিশ্বাসের সঙ্গে মূলতত্ত্ব সমূহকেও অগ্রাহ্য করিতে পারেন। সংক্ষেপতঃ, আত্মপ্রত্যয়

সিদ্ধ সত্যের এমন কতকগুলি লক্ষণ নির্দ্দেশ করা চাই, যদ্দ্বারা ইহাকে যুক্তি-ঘটিত ও অন্ধবিশ্বাস-ঘটিত তত্ত্ব হইতে প্রভেদ করা যাইতে পারে। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সমুদায় দার্শনিক পুস্তকেই এরূপ কতকগুলি লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মূলতত্ত্ব সমূহে এই সকল লক্ষণ প্রয়োগ করিয়া দেখান হইয়াছে যে এই সকল তত্ত্ব মূলতত্ত্ব। আমার বোধ হয় এই লক্ষণ প্রয়োগকেই পত্র-প্রেরক "আর দশটী প্রমাণ" বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। যদি তাহাই হয়, তবে তিনি ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-লেখকদিগের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়বাদী খুঁজিয়া পাইবেন না। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মতে আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্যের লক্ষণ চুটী—(১) এই সকল সত্য অস্বীকার করিতে গেলে আমাদিগকে স্ববিরোধিতা (self-contradiction) দোষে দোষী হইতে হয়, (২) এই সকল সত্য জ্ঞানের ভিত্তিরূপে অবস্থিত, ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া কোন জ্ঞানই সম্ভব নহে। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধর্ম্মবিজ্ঞান লেখকগণ যাহাকে "স্বতঃসিদ্ধতা" ও "মৌলিকতা" বলিয়াছেন, উপরোক্ত লক্ষণ দুটী তাহারই রূপান্তর মাত্র। কোন তত্ত্বে এই লক্ষণদ্বয় প্রয়োগ করিয়া দেখানকে কিছু উক্ত তত্ত্বের প্রমাণ বলা যায় না, ব্যাখ্যা মাত্র বলা যায়। এ সম্বন্ধে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। "আত্মজ্ঞান সমুদয় বিষয় জ্ঞানের নিত্যসঙ্গী" এই মূলতত্ত্ব উপরোক্ত লক্ষণ-প্রয়োগ দ্বারা ব্যাখ্যা করিয়া তৎপর বলা হইয়াছে—"এই সত্য স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং আমরা ইহার ব্যাখ্যা মাত্র করিলাম, ইহাকে প্রমাণ করিবার কোন প্রয়াসই পাইলাম না। যে সত্য সমুদায় সত্যের মূল, সমুদায় সত্যের প্রমাণস্থল, তাহাঁকে আবার কোন্ মূলের উপর কোন্ প্রমাণের উপর দাঁড় করান যাইবে?" (৬ পৃষ্ঠা।) এখন পাঠকেরা বুঝিবেন, পত্র-প্রেরক যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা কত দূর সত্য। "সহজ জ্ঞান" অনেক স্থলেই অজ্ঞানতার নামান্তর মাত্র" এই কথা কি কথা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, তাহা আমার পূর্ব্ব-পত্রে বলিয়াছি। এই অতি সহজ কথাটার অর্থ ব্যাখ্যা করা আমি আবশ্যক বোধ করি নাই; কিন্তু দেখিতেছি পত্র-প্রেরক ইহাকে তাঁহার অভিযোগের একটী প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। এই কথাটার অর্থ এই যে অনেক স্থলে লোকে যাহাকে সহজজ্ঞান-সিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া মনে করে, তাহা বাস্তবিক সহজ জ্ঞান-সিদ্ধ তত্ত্ব নহে, তাহা অনেক স্থলেই অজ্ঞানতা-প্রসূত ভ্রম মাত্র। এই কথায় প্রকৃত সহজ জ্ঞানের উপর কিরূপে অনাস্থা প্রকাশ পাইয়াছে, আমি কোন প্রকারে বুঝিতে পারি না। এই কথাতে যদি ভাষাগত দোষও থাকে, তথাপি আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে পুস্তকের সর্ব্বত্র যেরূপ নির্ভর ও বিশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতে এই কথা দ্বারা পাঠক-দিগের মনে কোন ভ্রম হওয়া সম্ভবপর মনে করি না। পত্র প্রেরকের মনে এ সম্বন্ধে ভ্রম হইবার একমাত্র কারণ এই দেখি যে তিনি ব্যাখ্যা আর প্রমাণকে এক ভাবিয়া লইয়াছেন।

সৃষ্টি-কৌশলের যুক্তির অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে আমি পত্রে যাহা বলিয়াছিলাম তাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতে উদ্ধৃত নহে; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় এরূপ ভাবের কথা থাকিতে পারে, আমি এই মাত্র বলিয়াছিলাম। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা লেখকের এরূপ মত বটে, কিন্তু ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় এরূপ কথা আমি খুঁজিয়া পাই নাই। আমার বোধ হয় প্রবন্ধ-লেখক বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়াই বলিয়া-ছিলেন যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় এই কথা আছে।

আমি পূর্ব্ব পত্রে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রভেদ দেখাইয়াছিলাম। কি অর্থে ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় মানুষের আত্মাতে আত্মাতে ভিন্নতা স্বীকার করা হইয়াছে, তাহাও কোন কোন উদ্ধৃত অংশ দ্বারা দেখাইয়াছিলাম। ইহা সত্ত্বেও পত্র-প্রেরক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মত অদ্বৈতবাদ। এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে জ্ঞানগত, কি প্রাণগত, কি প্রেমগত, কোন প্রকার একতার কথা শুনিলেই অদ্বৈতবাদের গন্ধ পান, অথচ উপাসনার সময় ঈশ্বরকে সত্যের সত্য, প্রাণের প্রাণ, মনের মন বলিতে ছাড়েন না। দেখিতেছি পত্র-প্রেরক বোধ হয় এই শ্রেণীর লোক। মানুষ সসীম এবং মানুষে মানুষে চিন্তা, ভাব, ইচ্ছা প্রভৃতিতে ভিন্নতা আছে, ইহা স্বীকার করিয়া সকলের মধ্যে একই অখণ্ড মূল জ্ঞান, মূল প্রাণ বর্ত্তমান। ইহা বলিলেই যদি অদ্বৈতবাদ মানা হয়, তবে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-লেখক অদ্বৈতবাদী, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের কোন বিরোধ নাই; ইহা ঈশ্বরের সত্য ও অদ্বৈত স্বরূপের ব্যাখ্যা মাত্র।

পত্র-প্রেরক লিখিয়াছেন তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের সহিত এই বিষয়ে কিছু আলাপ করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতি-কার না হওয়াতেই প্রকাশ্য পত্রিকায় লিখিয়াছেন। তিনি কাহার সহিত আলাপ করিয়াছিলেন আমি জানি না। বহুদিন পূর্ব্বে আমার সঙ্গে অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে অতি সামান্য কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এই জানি। ব্রহ্মবিদ্যালয় সম্বন্ধেও ২।১টী কথা হইয়া থাকিবে। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যালয় কমিটির কোন অধিবেশনে পত্র-প্রেরক কোনও দিন উপস্থিত হন নাই এবং রীতিমত আলোচনা কিছুই করেন নাই। আমি তাঁহাকে এরূপ প্রণালী মত আলো-চনা করিতে অনুরোধ করি।

অনুগত
শ্রীসীতানাথ দত্ত
ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সম্পাদক।

ব্রাহ্মসমাজ।

প্রচার—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মান্দ্রাজ হইতে তাঁহার কার্য্যের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

"৯ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার।—অপরাহ্নে সমাজ মন্দিরে ইংরাজীতে উপাসনা ও উপদেশ হয়। উপাসনা ও প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা বিষয়ে উপদেশ দিই। উপদেশে এই বলা হয়—ঈশ্বরোপাসনা নানা কারণে কর্ত্তব্য। (১ম) দেহের জন্য অন্ন পান যেরূপ আবশ্যক, আত্মার আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ইহাও তেমনি আবশ্যক। (২য়তঃ) ইহা নিরুপম সুখের দ্বার স্বরূপ। (৩য়) ইহা ঈশ্বর-বিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

অতএব যেদিক দিয়া দেখা যাউক ইহার আবশ্যকতা প্রতীতি করা যায়। প্রর্থনা বিষয়ে বিরোধীদিগের আপত্তি খণ্ডন করিয়া উপসংহারে বলা যায়, যে প্রার্থনা সফল হইবার পক্ষে দুইটী প্রয়োজন—(১ম) যে অভাব পূরণের জন্য প্রার্থনা করা হইবে তাহা পূরণের জন্য নিজের যতটা সংগ্রাম করিবার কাজ তাহা করা চাই। অলসের প্রার্থনা অসরল প্রার্থনা। (২য়) প্রার্থনা বিষয়ে সর্ব্বদাই ঈশ্বরেচ্ছা অবগত হওয়া চাই।

১০ই অক্টোবর শুক্রবার।—এখানে Hindu Faternal Association নামে একটী সভা আছে। শিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ইহার সভ্য। ইহা Ful Masourya ন্যায়। ইঁহারা আমাকে ইঁহাদের (Lodge এ), সভাগৃহে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তদনুসারে Brotherhood বিষয়ে কিছু বলা যায়। বক্তৃতার মর্ম্ম—সাম্য শব্দ অপেক্ষা ভ্রাতৃত্ব শব্দটী স্পৃহনীয়, কারণ সাম্য বলিলেই পরস্পরের অধিকার, অধিকার গ্রহণের ইচ্ছা, ও তজ্জন্য সংগ্রাম এই সকল স্মরণ হয়। কিন্তু ভ্রাতৃভাব বলিলে পরস্পরের প্রতি প্রীতি ও পরস্পরকে সহায়তা করিবার প্রবৃত্তি—এই সকল মনে হয়। জনসমাজ আদিতে সাম্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, কিন্তু পরস্পরের সহায়তা প্রবৃত্তির উপর সুতরাং ভ্রাতৃভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই ভ্রাতৃত্বের মিষ্টতা আমরা তত দিন অনুভব করিতে পারি না, যত দিন না এক সাধারণ পিতার চরণে ভ্রাতৃত্বের সমাবেশ দেখিতে পাই।

১১ই অক্টোবর, শনিবার।—এখানে পাচিয়াপা হল্ (Patchiappa's Hall) নামক স্থানে Religion National and Universal ধর্ম্মের জাতীয়তা ও সার্ব্বভৌমিকতা বিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার মর্ম্ম এই ছিল যে, সমুদায় ধর্ম্মের মধ্যে একটা সার্ব্বভৌমিক দিক আছে, আবার একটা জাতীয় দিকও আছে। ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক দিক মানব সাধারণের সম্পত্তি—তাহা ঈশ্বর-দত্ত স্বাভাবিক ভাব। কালক্রমে বিশেষ বিশেষ জাতি মধ্যে বিশেষ বিশেষ ভ্রম ও কুসংস্কার তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। জগতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তাহাতে এই বলা যায় যে জগতে এমন এক ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে, যাহা স্বভাবে সার্ব্বভৌমিক হইবে, এবং বিশেষ বিশেষ জাতি মধ্যে বিশেষ বিশেষ জাতীয় ভাবে প্রচারিত হইবে।

১২ই অক্টোবর, রবিবার।—রাত্রে এখানকার সমাজ মন্দিরে সামাজিক উপাসনা কালে ইংরাজিতে উপদেশ দিই। হৃদয়ের পবিত্রতা না হইলে, পবিত্রস্বরূপকে জানা যায় না এই বিষয়ে উপদেশ হয়।

১৩ই অক্টোবর, সোমবার।—কোইম্বাটুর যাত্রা করা যায়। ১৪ই অক্টোবর, মঙ্গলবার।—প্রাতে কোইম্বাটুর নগরে (Coimbatore) পৌঁছি। রাত্রে উপাসনা কালে সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা বিষয়ে উপদেশ দিই।

১৫ই অক্টোবর, বুধবার।—এখানকার সমাজের দশম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যাতে উপাসনা হয়। উভয় কালেই আমাকে ইংরাজিতে উপদেশ দিতে হইয়াছিল। প্রাতঃকালে কিরূপে প্রার্থনা সফল হয়—এই বিষয়ে ও রাত্রে ভক্তদল সকলেই এক আধ্যাত্মিক পরিবার ভুক্ত লোক এই বিষয়ে উপদেশ হয়।

১৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার।—এখানকার কালেজ হলে (New life and its new demands) "নব জীবনের নব আকাঙ্ক্ষা" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

১৭ই অক্টোবর, শুক্রবার।—এখানকার সমাজের আচার্য্য নারায়ণস্বামী পিলে মহাশয়ের পৌত্র ও কোদণ্ডভেলু পিলের দ্বিতীয় কুমারের নামকরণ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে সম্পন্ন হয়। পিতামহের ইচ্ছাক্রমে বালকটীর নাম "প্রতাপচন্দ্র" রাখা হইয়াছে। আপনারা শুনিয়া বিস্মিত হইবেন, এই ব্যক্তির আর দুইটী বালকের নাম কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ।

১৮ই অক্টোবর, শনিবার।—কালেজ হলে "বঙ্গদেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার"—বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ইংরাজী শিক্ষা নিবন্ধন কত প্রকার সংস্কার কার্য্য কত দেশে চলিতেছে, তাহা নির্দ্দেশ করা বক্তৃতার উদ্দেশ্য।

১৯এ অক্টোবর, রবিবার।—আজি এখানকার সমাজের উৎসবের শেষ দিন। আজ সমাজের সভ্যগণ মিলিয়া উদ্যানযাত্রা করা যায়। সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে নদী তীরে এক প্রাচীন তীর্থ স্থানে গিয়া সমস্ত দিন উপাসনা, ধ্যান ও সৎসঙ্গে যাপন করা যায়।

২০এ অক্টোবর, সোমবার—কলেজ হলে প্রার্থনার আবশ্যকতা বিষয়ে conversational meeting আলোচনা সভা হয়। আমি একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া আলোচনা উপস্থিত করি। তৎপরে অনেকে তাহাতে যোগ দেন। এখানকার কালেজের Principal Hunter সাহেব তাহার মধ্যে একজন ছিলেন।

২১এ অক্টোবর, মঙ্গলবার—দুই জন মান্দ্রাজি বন্ধু সমভিব্যাহারে পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী কালিকট (Calicut) নগরে যাত্রা করি। কালিকট মালাবার উপকূলের একটী প্রধান সহর। এখানকার রীতি নীতি অতি বিচিত্র। এখানে শূদ্রদিগের মধ্যে, বিবাহের রীতি নাই। এখানে ভাগিনেয়গণ মাতুলের বিষয়ের অধিকারী হয়—পিতার সহিত পুত্রগণের সম্পর্ক থাকে না। এখানে কাহার কাহারও মনে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা জন্মিতেছে।

২২এ অক্টোবর, বুধবার—এখানকার একটী হল গৃহে "শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

২৩এ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—অদ্য কোইম্বাটুরে ফিরিয়া আসিয়াছি। অদ্য রাত্রেই ট্রিচিনোপলি যাত্রা করিব।

নামকরণ—গত ৭ই কার্ত্তিক মানিকদহ গ্রামে পরলোকগত হরিদাস রায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণোপলক্ষে উপাসনা হইয়াছিল। বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। বালকের নাম অমূল্যকুমার রাখা হইয়াছে।

গত ১৭ই অক্টোবর, মঙ্গলবার শিলচর নগরে শ্রীযুক্ত বাবু বসন্তকুমার রায় ও শ্রীযুক্তা ক্যাজিরমাই সিমলীর দ্বিতীয়া কন্যার

(৪র্থ সন্তান) নাম করণ সম্পন্ন হইয়াছে। বসন্ত বাবু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত কাঞ্চরমাই নাম্নী খাসিয়া রমণীর পাণি-গ্রহণ করেন এবং পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটে সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি শিলচরের জেলাধ্যক্ষ। বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা হয় এবং পরে খাসিয়া ভাষায় পিতা-মাতার দায়িত্ব সম্বন্ধে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপদেশ দেন। শিশুর জননী খাসিয়া ভাষায় প্রার্থনা করেন। এই উপলক্ষে বসন্ত বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মিশন ফণ্ডে ১৲ টাকা, খাসিয়া মিশন ফণ্ডে ১৲ টাকা এবং শিলচর ব্রাহ্মসমাজে ১৲ টাকা দান করেন।

দানপ্রাপ্তি—মানিকদহস্থ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী রায় মহাশয়ের ভাগিনেয় গত বৎসর পরলোকগত হয়। তাহার মাতা উক্ত বালকের ব্যবহৃত অলঙ্কারাদি বিক্রয়পূর্ব্বক যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহা অনেক ভাল কার্য্যের সাহায্যার্থ দান করিয়াছেন। তিনি উক্ত অর্থ হইতে আমাদের ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষা-লয়ে ২৫৲ পঁচিশ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার এই দান প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

সম্মিলন সভা—গত ৯ই, ১০ই ও ১১ই কার্ত্তিক ঢাকা নগরে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ গৃহে পূর্ব্ব বাঙ্গালাস্থ ব্রাহ্মগণের একটী সম্মিলন সভা হইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরি-শাল ফরিদপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্রাহ্মগণ উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক গুরুতর বিষয়ের আলোচনা উক্ত সভায় হইয়াছিল। আমরা এই সভার বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

উৎসব—গত ৪ঠা কার্ত্তিক হইতে ৭ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত মানিকদহস্থ শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী রায় মহাশয়ের ভবনে এবং ৮ই কার্ত্তিক হইতে ১০ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত কুমারখালি ব্রাহ্ম সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

শ্রাদ্ধ—যশোহরের পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা মনোরমা গত বৎসর ১৩ই অক্টোবর তারিখে বরাহনগরের মহিলাশ্রমে পরলোক গত হয়। এ বৎসর উক্ত তারিখে উক্ত মহিলাশ্রমে তাহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা হয়। বাবু প্রসন্ন চন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁহার কন্যার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে এই মহিলাশ্রমের কোন একটী দরিদ্র মহিলার পরিচ্ছদের নিমিত্ত ৫৲ পাঁচ টাকা দান করিয়াছেন।

সমালোচনা।

ইতি পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় চৈতন্য লাইব্রেরির অধিবেশনে "আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা" নামক একটী অতি সুন্দর ও বিজ্ঞতা-পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রবন্ধটী পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে উক্ত পুস্তকের একখানি আমরা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ গ্রন্থ প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। অবিচারে বিকৃত আর্য্যত্বের অভিমান এবং অন্ধভাবে সাহেবদিগের অনুকরণ, উভয় কার্য্য দ্বারাই বর্ত্তমান সময়ে এ দেশের অকল্যাণ ঘটিতেছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর এই বক্তৃতা পাঠে এই উভয় শ্রেণীর লোকের উপকার হইবে বলিয়া ভরসা করা যায়। এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে দ্বিজেন্দ্র বাবুর বিজ্ঞতা ও চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে এবং উপযুক্তরূপে উপহাস ও মিষ্ট ভর্ৎসনার সহিত উভয় পক্ষের দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে। আমরা উক্ত পুস্তকে "আর্য্যামি এবং সাহেবিআনার যে ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

আর্য্যামির ঔষধ—"আর্য্যামি রোগের চিকিৎসা সাম্যপন্থী মতে হইলেই ভাল হয়। সে মতের মূল মন্ত্র এই যে "সমে সাম্যং প্রয়োজয়েৎ"—সমানে সমান প্রয়োগ করিবেক। এস্থলে কেহ বলিতে পারেন যে, "কে বলে আর্য্যামি একটা রোগ বরং তাহা একটা গুরুতর রোগের মহৌষধ—তাহা সাহেবিআনা রোগের মহৌষধ!" বটে—কিন্তু সে কিরূপ ঔষধ? সে ঔষধ নিজেই একটা সংক্রা-মক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি!—তাহার বাতাসে জ্ঞানের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া যায় এবং কর্ম্মের হস্তপদ অসাড় হইয়া যায়! তবে আর তাহা সাহেবিআনাকে দমন করিবে কি প্রকারে? বরং আরো তাহা সাহেবিআনাকে খোঁচা দিয়া উস্কাইয়া তোলে। সাহেবিআনার ঔষধ স্বতন্ত্র;—ইংরাজদিগের বাহ্য আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গীর অনুকরণই সাহেবিআনা, আর ইংরাজদিগের বিজ্ঞান শিল্প, কার্য্য-নৈপুণ্য, কর্ম্মিষ্ঠতা, কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা, তেজস্বিতা, এই গুলির নাম উনবিংশ-শতাব্দীর সভ্যতা; এই উনবিংশ শতা-ব্দীর সভ্যতাই সাহেবিআনা-রোগের মহৌষধ; তা ভিন্ন আর্য্যা-মিও সাহেবিআনা রোগের ঔষধ নহে, সাহেবিআনাও আর্য্যামি-রোগের ঔষধ নহে;—আর্য্যামি-রোগের ঔষধ তবে কি? না "সমে সাম্যং প্রয়োজয়েৎ"—আর্য্যোচিত কার্য্যই আর্য্যামি-রোগের একমাত্র ঔষধ।

কেহ মনে করিবেন না যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা আকাশ হইতে পড়িয়াই আর্য্য হইয়াছিলেন; তবে কি? না পৃথিবীস্থ সমস্ত আর্য্যজাতি যেরূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছে, তাঁহারাও সেই-রূপ করিয়া আর্য্য হইয়াছিলেন; দুই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা আর্য্য পদবীতে সমুত্থান করিয়াছিলেন—কি দুই নিয়ম? না বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা যাহাকে বলেন সন্ততির নিয়ম Law of heredity এবং সঙ্গতির নিয়ম Law of adaptation। সন্ততি বা সন্তান শব্দের অর্থ সং তান—তান কি না ধারাবাহিক প্রবাহ-একটানা প্রবাহ; জীব-জন্তু সকলের আনুপূর্ব্বিক এক-টানা প্রবাহ যে একটি সার্ব্বভৌমিক মৌলিক নিয়মে নিয়মিত হয়, তাহারই নাম সন্ততির নিয়ম; সে নিয়ম এই যে, সন্তান-সন্ততিরা কোনো-না-কোনো অংশে পিতৃপুরুষদিগের অনুধর্ম্মী হইতে চায়ই চায়; এ নিয়মের মূল মন্ত্র এই যে, বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া। সঙ্গতির নিয়ম কি? না চতুর্দ্দিকের অব-স্থার সহিত সঙ্গত মাফিক চলিতে না পারিলে কোনো জীবই পৃথিবীতে টেঁকিয়া থাকিতে পারে না- ইহাই সঙ্গতির নিয়ম। চারিদিকের পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার সহিত সঙ্গত-মাফিক চলিতে গেলেই জীবের পৈতৃক গুণ-সকল অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে থাকে। এই জন্য সঙ্গতির নিয়মকে পরিবর্ত্তনের নিয়ম বা গতির নিয়ম বা উন্নতির নিয়ম বলিলে তাহার ভাবার্থের কোনো প্রকার ব্যতিক্রম হয় না। সঙ্গতির নিয়মকে সংক্ষেপে আমরা বলিব পারিবর্ত্তিক নিয়ম। এবং সন্ততির নিয়মকে সংক্ষেপে আমরা বলিব কৌলিক নিয়ম। কৌলিক নিয়মের মূল-মন্ত্র হ'চ্চে

"যেমন পিতা মাতা তেমনি সন্তান সন্ততি;" পারিবর্ত্তিক নিয়মের মূলমন্ত্র হচ্চে "যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা;" এক্ষণে ইহা বলা বাহুল্য যে কৌলিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের স্থিতি নিয়মিত হয়, এবং পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে জন-সমাজের গতি এবং উৎপত্তি নিয়মিত হয়।

বঙ্গীয় নব্য আর্য্যেরা কেবল কৌলিক নিয়মই জানেন—মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা এইটিই জানেন; তা বই এটা জানেন না যে, মহাজন যিনি—তিনি মহাজনই হইতেন না যদি পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে তিনি তাঁহার নিজের সময়ের নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত না করিতেন। দুই হাত নইলে তালি বাজে না; এই জন্য জীব-রাজ্যে স্থিতির নিয়ম এবং গতির নিয়ম দুইই সমান আবশ্যক। কৌলিক নিয়মটিই স্থিতির নিয়ম, আর, স্থিতির নিয়ম বলিয়াই—কি পশুর মধ্যে—কি বর্ব্বর জাতির মধ্যে—কি আর্য্যজাতির মধ্যে—সর্ব্বত্রই তাহা সমান-ভাবে কার্য্য করে; পায়রা'র বাচ্ছা পায়রা হয়, কাকের বাচ্ছা কাক হয়, কাফ্রীর পুত্র কাফ্রী হয়, বাঙ্গালির পুত্র বাঙ্গালি হয়, ইংরাজের পুত্র ইংরাজ হয়, জাতির ইতর-বিশেষে কৌলিক নিয়মের কার্য্যকারিতার ইতর-বিশেষ হয় না—কৌলিক নিয়ম সর্ব্বত্রই সমানভাবে কার্য্য করে; পক্ষান্তরে, পারিবর্ত্তিক নিয়মটি গতির নিয়ম—তাই তাহা গতিশীল, আর, গতিশীল বলিয়াই—তাহা সকল জাতির মধ্যে সমান-ভাবে কার্য্য করে না, প্রত্যুত যে যেমন জাতি তাহার অভ্যন্তরে তেমনি-ভাবে কার্য্য করে; জাগ্রত জাতির মধ্যে জাগ্রত ভাবে কার্য্য করে, প্রসুপ্ত জাতির মধ্যে প্রসুপ্ত ভাবে কার্য্য করে। ফলেও তাই দেখা যায় যে "যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা" এ নিয়মটি মনুষ্যের মধ্যে যেমন চক্ষুষ্মান্-ভাবে কার্য্য করে—পশুদিগের মধ্যে তাহার সিকির সিকও সে ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। গ্রীষ্মদেশের হস্তী শীতদেশে সহস্র বৎসর ধরিয়া পুরুষানুক্রমে "নৈসর্গিক দম্পতি নির্ব্বাচন (Natural selection) এবং "যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন" (Survival of the fittest) এই দুই জৈবিক নিয়মে পরিগঠিত হইতে থাকিলেও তাহার পৃষ্ঠ দেশে ঘন-লোমরাজি আবির্ভূত হয় কি না সন্দেহ; কিন্তু এক জন বাঙ্গালী ইংলণ্ডে যাইতে না যাইতেই তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে ফিন্‌ফিনে উড়ানী ঝরিয়া পড়িয়া, চার আঙ্গুল পুরু শীত বস্ত্র তাহার স্থলাভিষিক্ত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, যেমন অবস্থা তাহার তেমনি ব্যবস্থা। এ নিয়মটি পশু অপেক্ষা মনুষ্যের মধ্যে বেশী প্রবল; তেমনি তাহা বর্ব্বর-জাতি অপেক্ষা সভ্য-জাতির মধ্যে বেশী প্রবল। সুয়েজের নৈসর্গিক সেতুবন্ধ জাহাজের পথ-রোধ করে বলিয়া সেই অপরাধে সেই শত যোজন-ব্যাপী বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে রসাতলে পাঠাইয়া দেওয়া যে সে জাতির কর্ম্ম নহে। কৌলিক নিয়ম এবং পারিবর্ত্তিক নিয়ম উভয়ে যদিচ পরস্পরের প্রতিযোগী, কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে, উভয়ে পরস্পরের বিরোধী; বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক্—পতি-পত্নীর ন্যায় দোঁহে দোঁহার প্রাণপরিপোষক। পারিবর্ত্তিক নিয়মানুসারে বাঙ্গালিরা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই ইংরাজদিগের সহিত সম্ভব-মতো বিদ্যাবুদ্ধিতে টক্কর দিতে পারিতেছেন, ইহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বাঙ্গালিদিগের মধ্যে কৌলিক নিয়ম রীতিমত কার্য্য করিতেছে—প্রমাণ হইতেছে যে, তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই আর্য্য-সন্তান। নচেৎ বাঙ্গালিরা যদি কৌলিক নিয়মের গোঁড়া পক্ষপাতী হইয়া পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরে ঢুকিতে না দিতেন, তবে তাহাতে প্রমাণ হইত যে, তাঁহারা আর্য্য সন্তান হইয়াও কাফ্রীদিগের ন্যায় অসভ্য বর্ব্বর। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, কৌলিক নিয়মের অনুচিত পক্ষপাতী হইলে কৌলিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়; যে ডালে উপবেশন করা হইতেছে সেই ডালের মূলোচ্ছেদ করা হয়। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গের্দা ঠেসান্ দিয়া পায়ের উপরে পা দিয়া বসিয়া থাকিয়া এবং শুধু পূর্ব্ব পুরুষদিগের নামের দোহাই দিয়া কোন আর্য্যজাতিই আর্য্য হ'ন নাই, প্রত্যুত অন্তরের এবং বাহিরের প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াই আর্য্যেরা আর্য্য পদবীতে সমুত্থান করিয়াছেন। দুই অস্ত্রে মনুষ্য প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করে—বিজ্ঞান অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম অস্ত্রে; বিজ্ঞান-অস্ত্রে ভৌতিক প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে, এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে মানসিক প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া তাহাকে স্বীয় বশে আনয়ন করে। আমাদের দেশের পূর্ব্বতন আর্য্যেরা উভয় অস্ত্রেই প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া, আর্য্য-পদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন; নচেৎ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই ঘুম পাড়ানী মাসিপিসি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, শুদ্ধ কেবল কৌলিক নিয়মের লাঙ্গূল ধরিয়া চলিয়া, এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত কোনো আর্য্যজাতিকেই আর্য্য হইতে দেখা যায় নাই। কেহ যদি সত্য সত্যই মনে করেন যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা শুদ্ধ কেবল এক হাতে তালি বাজাইতেন, শুধু কেবল কৌলিক নিয়মেই চলিতেন—পারিবর্ত্তিক নিয়মকে ঘরের চৌকাট মাড়াইতে দিতেন না, তবে তাঁহাদের সে ভ্রমটি ঘুচাইয়া দিবার জন্য দুইটি উদাহরণ পরে পরে প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথম উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা বিজ্ঞান-অস্ত্রে কুসংস্কারের সহিত রীতিমত সংগ্রাম করিতেন। বহু পূর্ব্বে যে সময়ে আপামর সাধারণ সকল লোকেরই এইরূপ ধ্রুব-জ্ঞান ছিল যে, পৃথিবী সমতল, এবং তাহার পোষকতায় পুরাণের এটা একটা অকাট্য সিদ্ধান্ত ছিল যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেই সময়ে জ্যোতিবিৎ ভাস্করাচার্য্য ঐ প্রচলিত লৌকিক এবং পৌরাণিক মতের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে বলিলেন যে,

"সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং
মন্যন্তে খে যতো গোল স্তস্যকোর্দ্ধংকচাপাধঃ ॥"

ভূমণ্ডলে সর্ব্বত্রই লোকে স্বস্থানকে উপরিস্থিত মনে করে, যেহেতু পৃথিবী গোল, তাহার উর্দ্ধই বা কি আর অধোই বা কি? (এখানে "কু" শব্দের অর্থ পৃথিবী)

পুনশ্চ

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীংতলস্থাং
আত্মানমস্যা উপরিস্থিতং চ
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থ সংস্থা
মিথশ্চতে তির্য্যগিবা মনন্তি।
অধঃশিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থা *
শ্ছায়া মনুষ্যা ইব নীর তীরে
অনাকুলা স্তির্য্যগধঃস্থিতাশ্চ
তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র ॥"

"যিনি যেস্থানে থাকেন, তিনি পৃথিবীকে তলস্থ এবং আপনাকে তাহার উপরিস্থ মনে করেন; যাঁহারা পরস্পর হইতে পৃথিবীর চতুর্থাংশ দূরে অবস্থান করেন, তাঁহারা পরস্পরকে তাড়্চা ভাবে (অর্থাৎ কাত হইয়া পড়া ভাবে) অবস্থিত বলিয়া মনে করেন। পৃথিবীর উল্টা পিটে জলাশয়ের তীরস্থ ব্যক্তির জল-বিন্যস্ত প্রতিবিম্বের ন্যায় মনুষ্যেরা অধোমস্তক, কিন্তু আমরা যেরূপ ভাবে এখানে অবস্থিতি করিতেছি, উপরি-উক্ত অধঃস্থিত এবং তির্য্যক্‌স্থিত ব্যক্তিরা ঠিক সেইরূপ অনাকুল

* "কুদলান্তরস্থা"—কু শব্দে পৃথিবী; পৃথিবীর দলান্তরস্থ" অর্থাৎ ছোলার যেমন দুইটি দল আছে, তেমনি ভূগোলকে দুইটি দলে বিভক্ত মনে করা যাইতে পারে—একটি দল তাহার উপরিস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড; আর একটী দল তাহার নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ড নিম্নস্থিত অর্দ্ধ খণ্ডের ভূপৃষ্ঠে যাহারা বাস করে তাহারাই "কুদলান্তরস্থ"।

ভাবে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছে।" ভাস্করাচার্য্যের স্বহস্ত রচিত এই শ্লোকটি পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের কিরূপ মনে হয়? এইরূপ কি মনে হয় যে, তিনি লৌকিক এবং পৌরাণিক মত শিরোধার্য্য করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন—না উল্টা আরো এইরূপ মনে হয় যে, তিনি প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন? পৃথিবীশুদ্ধ লোক যেখানে এক বাক্যে বলিতেছে যে, পৃথিবী ত্রিকোণ, সেখানে তিনি একাকী শুদ্ধ কেবল বৈজ্ঞানিক প্রমাণের বলে—কেহ যাহা চক্ষে দেখে নাই, কর্ণে শোনে নাই এইরূপ একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইলেন; অসংকুচিত চিত্তে অম্লান বদনে বলিলেন যে, "পৃথিবী গোল"—ইহা কি যে সে লোকের কাজ? ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য। এইরূপ আর্য্যোচিত কার্য্যের পরিবর্ত্তে তিনি যদি আর্য্যামি করিতেন, তিনি যদি বলিতেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক্—পুরাণ যাহা বলিয়াছে তাহাই ঠিক্—সকলে যাহা একবাক্যে বলে তাহাই ঠিক্—পৃথিবী ত্রিকোণ ইহাই ঠিক্, তবে আমাদের দেশের পুরাতন জ্যোতিষের আর্য্যতাই বা কোথায় থাকিত, প্রামাণিকতাই বা কোথায় থাকিত? তাহা হইলে আজিকের এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে সে জ্যোতিষকে কেই বা পুছিত আর কেই বা তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত?

দ্বিতীয় উদাহরণ। এ উদাহরণ দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা ধর্ম্ম অস্ত্রে লোকাচারের অনুমোদিত কুরীতির সহিত সংগ্রাম করিতেন। অতীব পুরাকালে—বেণ রাজার আমলে—আমাদের দেশে রাক্ষস-বিবাহ প্রভৃতি কতক গুলা অসভ্য বিবাহ-পদ্ধতি লোক-সমাজে প্রচলিত ছিল। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা সেই সকল পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া—উঠিয়া-পড়িয়া-লাগিয়া সেগুলিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া—তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মবিবাহের সুসভ্য পদ্ধতি জনসমাজে চালাইয়া দিলেন; ইহারই নাম আর্য্যোচিত কার্য্য; তাহা না করিয়া তাঁহারা যদি আর্য্যামি করিতেন লোকাচারের জোয়ালে ঘাড় পাতিয়া দিয়া বলিতেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" আর্য্য পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহাই ঠিক—রাক্ষস বিবাহই ঠিক্" তবে আজকের এই হিন্দু-সমাজের আর্য্যত্বই বা কোথায় থাকিত—ভদ্রত্বই বা কোথায় থাকিত! এই দুই দৃষ্টান্তই যথেষ্ট; ইহাতেই এক আঁচড়ে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা লৌকিক কুসংস্কার এবং কুরীতির বিরুদ্ধে বিজ্ঞান-অস্ত্রে এবং ধর্ম্ম-অস্ত্রে সংগ্রাম করিয়া—সত্য এবং মঙ্গলের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া—নিক্তির ওজনে উচিত মূল্য প্রদান করিয়া—আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু নব্য আর্য্যেরা কি করিয়াছেন? তাঁহারা কি লৌকিক অথবা পৌরাণিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটিও বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন? দেশের কোনও প্রকার লোক-প্রচলিত কুরীতির বিরুদ্ধে আলস্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একটিবারও উঠিয়া দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছেন? তাহা দূরে থাকুক—আদুরে ছেলেরা যেমন অষ্ট-প্রহর যার তার নিকট হইতে আদর ভিক্ষা করে, তাঁহারা তেমনি ভদ্রাভদ্র সকল প্রকার প্রচলিত লোকাচারের স্বপক্ষে অলীক বাচালতা করিয়া ভদ্রাভদ্র সকল শ্রেণীস্থ বঙ্গজনেরই আদর ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন এবং সেই ভিক্ষার ধনে আপনাদের আর্য্য-গরিমার ভাণ্ডার দিন দিন স্ফীত করিয়া তুলিতেছেন! এইরূপে যাঁহারা সিকি পয়সা দিয়া লাখ টাকা মূল্যের আর্য্যকীর্ত্তি ক্রয় করেন, তাঁহাদিগকে আমরা শুধু এই কথাটী বলিয়াই এ যাত্রা ক্ষান্ত হইতে চাই যে, **সস্তার তিন অবস্থা!** এই সকল নব্য আর্য্যদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য ইহার অধিক যদিচ আর কিছুই নাই, কিন্তু উঁহাদের প্রতি মনু ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পুরাতন আর্য্যদিগের বাৎসল্য-পূর্ণ উপদেশ এখনো-পর্য্যন্ত আকাশে প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাহা এই যে, "সত্যসত্যই যদি তোমরা আর্য্য হইতে চাও, তবে পূর্ব্বে আমরা যাহা করিতাম তাহাই কর; লৌকিক এবং পৌরাণিক ভ্রান্ত মতের বিরুদ্ধে জ্ঞান-ধর্ম্মের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত কর; তোমাদের মধ্যে রামমোহন রায়ের ন্যায় প্রকৃত আর্য্যদিগের জন্মগ্রহণ যেন নিষ্ফল না হয়। আর্য্যামি করিলে কিছুই হইবে না! নিশ্চিন্ত জানিও যে আর্য্যামি একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি, আর, তাহার একমাত্র ঔষধ আর্য্যোচিত কার্য্য।"

সাহেবিআনার ঔষধ—"ইতিপূর্ব্বে বারবার বলিয়াছি যে আর্য্যামি এবং সাহেবিআনা উভয় রোগেরই পক্ষে সাম্য-পন্থা চিকিৎসাই সবিশেষ ফলপ্রদ। "সমে সাম্যং প্রয়োজয়েৎ"—সাহেবিয়ানার ভিতরেই সাহেবিআনার ঔষধ জাগিতেছে, এখন তাহাকে বাহির করিয়া লইতে জানিলে হয়! সাহেবদিগের আকার প্রকার ভাব-ভঙ্গী প্রভৃতি বাহ্য আবরণের ভিতরে বিজ্ঞান তেজস্বিতা আত্মনির্ভর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা কার্য্য-নৈপুণ্য কর্ম্মিষ্ঠতা এই সার পদার্থগুলি জাগিতেছে; সেগুলিকে এক কথায় ব্যক্ত করিতে হইলে, তাহার নাম ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা; এইটিই হ'চ্চে সাহেবী উপকরণ-গুলির মাতৃক সত্ত্ব কিম্বা mother tincture; এই মাতৃক সত্ত্বটি জলে গুলিয়া গুলিয়া তাহার তেজ কমানো চাই—নহিলে তাহা বাঙ্গালিদিগের সেবনোপযোগী হওয়া দুষ্কর। এই ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যেরূপ মহত্ত্ব এবং তেজস্বিতা তাহাতে পরানুকরণের নীচত্ব তাহার ত্রিসীমায় অগ্রসর হইতে সাহসী হয় না; তাহার সাক্ষী—ইংরাজেরা জর্ম্মানদিগের নিকট হইতে দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান আহার করিতে কিছু মাত্র সংকোচ করিবে না, কিন্তু জর্ম্মানদিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী, রকম সকম, আপনাদের মধ্যে চালাইতে কিছুতেই সম্মত হইবে না। জর্ম্মনেরা ইংরাজ-দিগের নিকট হইতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের রীতি পদ্ধতি আহার করিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইবে না, কিন্তু ইংরাজদিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গী কখনই আপনাদের মধ্যে প্রচলিত করিতে চাহিবে না। ইউরোপের সর্ব্বত্রই এইরূপ। বাঙ্গালিরা যদি ইউরোপীয়দিগের আকার প্রকার ভাবভঙ্গীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া শুদ্ধ কেবল ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাটি তাহাদের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন এবং সংগ্রহ করিয়া তাহাকে আপনাদের দেশের ছাঁচে ঢালিয়া আপনাদের মতো করিয়া গড়িয়া ল'ন, তবে তাঁহারা সাহেবিআনা রোগ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া একটা জাতির মতো জাতি হ'ন। তাই আমরা বলি যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাই সাহেবিআনা রোগের মহৌষধ।"

বিজ্ঞাপন।

অধ্যক্ষ সভা-গঠনসম্বন্ধীয় ২য় নিয়ম অনুসারে জ্ঞাপন করা যাইতেছে যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যে সকল সভ্য আগামী বৎসরের অধ্যক্ষ সভার সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০এ নবেম্বরের মধ্যে তাঁহাদের নাম ধাম আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক প্রভৃতি বিবরণ সকল অনুগ্রহপূর্ব্বক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করেন। ঐ তারিখের পর কাহারও নাম গৃহীত হইবে না।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৫ই অক্টোবর, ১৮৯০।

আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়
সহকারী সম্পাদক।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ২০এ কার্ত্তিক মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ২০এ কার্ত্তিক প্রকাশিত।

তত্ত্ব কৌমুদী

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
১৫শ সংখ্যা।

১লা অগ্রহায়ণ রবিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

স্মৃতির দংশন।

বর্ত্তমান মোর কাছে
স্বচ্ছ মুকুরের মত ;
আতঙ্কের প্রতিমূর্ত্তি
বিস্মৃত অতীত ছায়া,
পড়ি সে মুকুর পরে
নিশিদিন অবিরত,
মর্ম্মভেদী প্রতিচ্ছায়ে
ভরিছে ভবিষ্য কায়া ;
অঝোরে ঝরিছে আঁখি,
পল অনুপলে হায়
উঠিতেছি ডুবিতেছি,
ভয়ে জড়সড় প্রাণ,
দুদিকে মরণ সিন্ধু,
বিন্দু জীবনের প্রায়
মাঝখানে একা আমি
অবসাদে ম্রিয়মান ;
দাও দেব মুছে দাও
অতীত স্মৃতির কালি,
স্বচ্ছ বর্ত্তমানে, তার
পড়ুক বিমল ছায়া,
হরষে উল্লাসে আমি
জীবন-বর্ত্তিকা জ্বালি
ছুটিগো ভবিষ্য পানে
হেরি স্বচ্ছ প্রতিচ্ছায়া।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উদারতা—একজন সাধু কোন সময়ে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে "আমি বিস্তৃত মাঠের মধ্যে একটী বাটী প্রস্তুত করিয়াছি। কিন্তু তাহার চারিদিক্ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া লই নাই। এইরূপ করাতে আমার বিশেষ লাভ হইয়াছে। যদি আমি প্রাচীর দ্বারা আমার বাটীটী ঘেরিয়া লইতাম, তাহা হইলে সেই প্রাচীর মধ্যস্থ স্থানই আমার অধিকারে থাকিত। বাহিরের স্থানের সহিত আমার কোন সংস্রব থাকিত না। কিন্তু প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন না করায় এই হইয়াছে যে, যেন সমস্ত মাঠই আমার অধিকারের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে, আমি যেন সমস্ত প্রান্তরেরই অধিকারী হইয়া পড়িয়াছি"। এই কথাটী হইতে আমরা বিশেষ শিক্ষা পাইতে পারি। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে এই কথার প্রয়োগ হইতে পারে। যাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থকে আপনাদের আদর্শ করিয়াছেন, অর্থাৎ বিশাল সত্য রাজ্যে যাঁহারা একখানি গ্রন্থ আশ্রয় করিয়া ঐ গ্রন্থরূপ প্রাচীর দ্বারা আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদিগকে সত্য রাজ্যের অনন্ত সম্পত্তি লাভের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, একটী সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হইয়াছেন। সেই গ্রন্থরূপী প্রাচীরের বাহিরে যাইবার অধিকার তাঁহাদের নাই। যাহারা নিজ দোষে এমন বিশাল সত্য-রাজির অধিকার হইতে চ্যুত হইয়া, সংকীর্ণতার অতি ক্ষুদ্র প্রাচীরে আপনাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখে। তাহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ। সত্যের নিত্য আশ্রয় পরমেশ্বর কত ভাবে কত উপায়ে সত্যের প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু তাহারা সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে প্রস্তুত নয়। গ্রন্থ বা বিশেষ ব্যক্তি তাহাদিগকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং আত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য বিধাতার হস্ত হইতে নিয়ত যে অন্নপান আসিতেছে, তাহারা তাহার সন্ধান না পাইয়া ক্ষুধায় কাতর, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ থাকিয়া যায়। উন্নতির হেতুভূত উদার সত্যের সংস্রব হইতে তাহারা আপনাদিগকে দূরে রাখে। সুতরাং তাহাদের যাদৃশ উন্নতি হওয়া উচিত, তাহা কখনই হয় না। পৃথিবীর উপধর্ম্ম সকলের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এইরূপ কোন না কোন সংকীর্ণ গ্রন্থ বা ব্যক্তিতে আবদ্ধ। সুতরাং তাহারা একদেশদর্শী এবং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইতে বঞ্চিত। সূর্য্যোদয়ে যখন দিক সকল প্রকাশিত, তখনও তাহারা আপন গৃহস্থিত প্রদীপের আলোক লইয়াই তুষ্ট। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্য রাজ্যে কোনরূপ প্রাচীর দেন নাই। সূর্য্যের আলো যেমন আকাশের সর্ব্বত্র গমন করিয়া থাকে, সত্যের খনি পরমেশ্বর হইতেও সেইরূপ সত্য-রশ্মি আসিয়া যাহাতে

মানবাত্মায় সংক্রামিত হইতে পারে, ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থা ও উদ্দেশ্য সেইরূপ উদার ও কল্যাণপ্রদ। এখানে আবার যাঁহারা প্রাচীর দিয়া সত্যের আলো-প্রবেশ-পথ অবরুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহাদের সাবধান হওয়া উচিত। অবিবেচনার আমরা যেন আমাদের এই অতি মহৎ এবং উচ্চ অধিকার হইতে বঞ্চিত না হই। সংকীর্ণতার সীমায় আবদ্ধ হইয়া যেন আবার অবরুদ্ধ গৃহের দূষিত বায়ুর সেবায় অসুস্থ হইয়া না পড়ি। এজন্য সকলেরই বিশেষ ভাবে যত্নশীল হইতে হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগকে উদার সত্য রাজ্যের সহিত পরিচিত হইবার এবং চিরদিন সেই সত্য রাজ্যের অধিকারী থাকিবার অধিকার ও সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। আমরা যেন অবিবেচনায় বা স্বার্থানুরোধে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত না হই।

ব্রাহ্ম-বালক-বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা—আমরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্তৃক নব প্রতিষ্ঠিত ছাত্রনিবাসের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট হইতে একখানা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্র খানা নিম্নে মুদ্রিত হইল। পত্রের লিখিত বিষয়ের প্রতি ব্রাহ্ম বন্ধুগণকে মনোযোগ প্রদান করিতে আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি। এই সকল গুরুতর বিষয়ে অধিক দিন ব্রাহ্মগণের ঔদাসীন্য থাকিলে, পরিশেষে বিশেষ শোক করিতে হইবে। আশা করি ব্রাহ্মগণ প্রস্তাবিত বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। পত্র খানা এই—

"মাঘোৎসবের সময় যখন মফস্বলস্থ ব্রাহ্ম বন্ধুগণ কলিকাতায় উপস্থিত হন, তখন প্রায় প্রতি বৎসরই আলোচনার সময় তাঁহারা মফস্বলের ব্রাহ্ম-বালক-বালিকাগণের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে অনুরোধ করিয়া থাকেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের তাদৃশ অর্থ বল নাই, অথচ এই কার্য্যটা বহু ব্যয়সাধ্য। এজন্য এতকাল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে, ততই এ কার্য্যের প্রয়োজনীয়তা অধিকতররূপে অনুভূত হইতেছে। এজন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা বিগত মে মাসে ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয় নামে একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহাতে শিক্ষার্থী প্রায় ৭০টী হইয়াছে। কিন্তু ইহা দ্বারা মফস্বলের ব্রাহ্ম বালিকাদিগের অভাব মোচনের সম্ভাবনা নাই। এজন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গত অক্টোবর মাস হইতে ৬টী বালিকা লইয়া একটী ব্রাহ্ম-ছাত্রী-নিবাস খুলিয়াছেন। [illegible] নবেম্বর মাসে উক্ত ছাত্রীনিবাসে আর তিনটী বালিকা নবপ্রবিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অন্ততঃ ২০৷২২টী বালিকা না পাইলে ছাত্রী নিবাসের ব্যয় কখনই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা ঋণ করিয়া এবং ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এখন যদি মফস্বলের ব্রাহ্মবন্ধুগণ স্বীয় স্বীয় কন্যা এবং আত্মীয়াদিগকে ছাত্রী নিবাসে প্রেরণ করিয়া সাহায্য না করেন, তবে কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া হয় ত এ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। যদি তাহাই হয় তবে তাহার পরিণাম ফল কি হইবে, তাহা একবার নিবিষ্টচিত্তে ব্রাহ্মগণের চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। প্রথমতঃ শীঘ্র আর ছাত্রী নিবাস পুনরায় স্থাপনের আশা থাকিবে না। তাহা হইলে অনেক গরিব ব্রাহ্মের কন্যাগণ অশিক্ষিত থাকিয়া যাইবে। ব্রাহ্মসমাজে যে প্রণালীতে বিবাহসম্বন্ধ নির্দ্ধারিত হইতেছে, তাহাতে অশিক্ষিতা মেয়েদিগের বিবাহ সংঘটন হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আবার এই অবস্থায় যদি কেহ অভিভাবকহীন হইয়া পড়ে, তবে তাহার জীবিকা নির্ব্বাহেরই বা কি উপায় হইবে? এইরূপ অশিক্ষিতার সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের কত অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহাও একবার সকলের বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এই সমস্ত অনিষ্টাশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যেই কার্য্যনির্ব্বাহক সভা এই ছাত্রীনিবাস স্থাপন করিয়াছেন। পুরা বেতন দান করিতে সমর্থ এমন ২০৷২২টী বালিকা পাওয়া গেলে তৎসঙ্গে কিছু কম বেতনে আরও কয়েকটী গরিব ব্রাহ্মের কন্যাকে এই বোর্ডিংয়ে রাখিয়া শিক্ষা দিবার ইচ্ছাও তাঁহাদিগের আছে। কারণ সকলেই এত অধিক ব্যয় বহন করিতে সমর্থ নহেন। এখন যে সকল ব্রাহ্ম অধিক বেতন দিয়া অন্যত্র স্বীয় স্বীয় কন্যা ও আত্মীয়াদিগকে রাখিয়াছেন, তাঁহারা যদি তাহাদিগকে এখানে প্রেরণ করেন, তাহা হইলেই কার্য্যনির্ব্বাহক সভার উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়ে ধর্ম্ম ও নীতিমূলক শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ছাত্রী নিবাসেও উপাসনা ও নীতিবিষয়ক উপদেশাদির বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটী কমিটির হস্তে বোর্ডিংয়ের তত্ত্বাবধান ভার অর্পণ করিয়াছেন। কমিটী ইহার যত প্রকার সুব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহার জন্য যত্নবান রহিয়াছেন। ছাত্রী নিবাসের প্রত্যেক ছাত্রীর মাসিক বেতন ৯৷৹ টাকা করা হইয়াছে, স্কুলের বেতন, পরিচ্ছদ ও কাগজ কলম ইত্যাদি স্বতন্ত্র দিতে হইবে। সকলের পক্ষে এরূপ অধিক বেতন দিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা প্রদান করা যে বিশেষ কঠিন, এমন কি অনেকের পক্ষে অসম্ভব, আমরা তাহা জানি। এজন্য কমিটি ইচ্ছা করেন অল্প বেতনেও অবস্থা বিশেষে বালিকাদিগকে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ২০৷২২টী মেয়ের পূর্ণ বেতন না পাইলে তাহাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যাঁহারা সক্ষম তাঁহারা যদি এখানে আপনাদের আত্মীয়াদিগকে প্রেরণ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের নিজ নিজ আত্মীয়াদিগের শিক্ষারও ব্যবস্থা হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর গরিব ব্রাহ্মদিগের ও ব্রাহ্মসমাজেরও সাহায্য করা হইবে। ব্রাহ্মসমাজের নিজের যখন কোন ছাত্রী-নিবাস ছিল না, তখন তাঁহারা অন্যত্র কন্যাদিগকে রাখিয়া শিক্ষা না দিয়া পারিতেন না। কিন্তু এখন যখন তাঁহাদের মনোমত ব্যবস্থানুরূপ শিক্ষার উপায় হইতেছে, তখন অন্যত্র বালিকাদিগকে না রাখাই উচিত। গবর্ণমেণ্ট যখন প্রথম বোর্ডিং স্থাপন করেন, তখন ব্রাহ্মকন্যাদিগের দ্বারাই বোর্ডিংয়ের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, এজন্য ব্রাহ্মবালিকাদিগের জন্য কতকটা সুবিধাজনক ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল। কিন্তু যতই অন্য শ্রেণীর বালিকার সংখ্যা

বৃদ্ধি হইবে ততই সেই সকল সুবিধা কমিয়া যাইবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষা সেখানে কখনই হইতে পারিবে না। ব্রাহ্মসমাজ যত দিন ব্রাহ্মবালক-বালিকাদিগের শিক্ষার ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে না পারিবেন, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত কল্যাণের আশা করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্ম-বালক-বালিকাগণ কেবল উচ্চ শিক্ষা লাভ করিলেই যে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সফল হইবে তাহা নয়। ইতিমধ্যেই কত ব্রাহ্ম-বালককে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হইতে দেখা যাইতেছে। কেন এরূপ হইতেছে? কেবল স্কুলের নানা প্রকার দুর্নীতিপরায়ণ বালকের সঙ্গে মিশিয়াই এরূপ হইতেছে। যদি ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিত তবে কখনই এরূপ হইত না। সুতরাং ব্রাহ্মদিগের যদি একটুকও ভবিষ্যতের কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবে যাহাতে ব্রাহ্মবালক-বালিকাদিগের শিক্ষার ভার নিজেরা গ্রহণ করিতে পারেন, তজ্জন্য যত্নবান হউন। আমাদের শীলংস্থ ভ্রাতা ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়' এবং ব্রাহ্মছাত্রী-নিবাস হইয়াছে বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দের বিষয় বটে, কিন্তু এখনও উক্ত বিদ্যালয় এবং ছাত্রী নিবাসের স্থায়িত্বের আশা কোথায়? যতদিন সমস্ত ব্রাহ্মের সহানুভূতি পাওয়া না যাইবে ততদিন ইহার স্থায়িত্বের আশা করা যাইতে পারে না। ব্রাহ্মবালক এবং বালিকাদিগের শিক্ষার ভার ব্রাহ্ম সমাজের হস্তে গ্রহণ করিতে হইলে ইহার জন্য "শিক্ষা ফণ্ড" নামে একটী স্বতন্ত্র ফণ্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। যত ব্রাহ্ম আছেন, সকলের এই ফণ্ডে আয় অনুসারে চাঁদা দেওয়া আবশ্যক, নতুবা একার্য্য কখনই হইতে পারিবে না, ততদিন ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ নাই।"

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ

কি চাই?

আফ্রিকা মহাদেশের অসভ্য হটেণ্টট জাতি যখন উপাস্য দেবমূর্ত্তির সমীপে প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হয়, তখন প্রতিমূর্ত্তিকে সজোরে প্রহার করিতে আরম্ভ করে। অসভ্য আফ্রিকা দেশে যাহা ঘটিতেছে, সুসভ্য ইউরোপ এবং আসিয়াও তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। আমাদের দেশে আমরা কি দেখিতে পাই? অত্যন্ত শোকের অবস্থায় লোকে মনের খেদে উপাস্য দেবতাকে অভিসম্পাত করিয়া থাকে। অর্থাভিলাষী বণিক আপন দোষে নির্ধন হইয়া ঈশ্বরের উপর সমস্ত দোষারোপ করিয়া থাকে। এইরূপ বহুসংখ্যক লোক আত্ম-মনোরথ চরিতার্থ হইল না বলিয়া ঈশ্বরকে তিরস্কার করিতেও ক্রটী করে না। এমন কি কোন কোন স্বার্থপর স্বার্থান্ধ হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গলভাবেও অবিশ্বাস করিয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজে কি এই শ্রেণীর লোক নাই? অবশ্য তাঁহারা অসভ্য হটেণ্টট কিংবা জ্ঞান বিবর্জ্জিত নরনারীদিগের মত উপাস্য দেবতাকে প্রহার কিংবা অভিসম্পাত করেন না। কিন্তু এমন পুরুষ-রমণী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হইলে বড়ই বিরক্ত হন। এই বিরক্তির অর্থ কি? আমরা যদি বহিরাবরণ উন্মুক্ত করিয়া একবার অন্তর রাজ্যে প্রবেশ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব, এ বিরক্তি আপনার নির্ব্বুদ্ধিতা কিংবা শক্তির অভাব জনিত নহে। এ বিরক্তি ঈশ্বরের প্রতি। তাঁহাদের প্রাণে যেন এ ভাবই খেলে, যে তাহাদের যেন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার সকল আয়োজনই আছে এবং তাহা পাইবার জন্য যেন শক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহারও করা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইল না। অর্থাৎ তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও ক্রটি নাই, একমাত্র কোন দুর্লক্ষ্য শক্তির প্রতিরোধ বশতঃ যেন তাহাদের বাসনা সুসিদ্ধ হইল না। তাই সে শক্তির প্রতিকূলতা বশতঃ তাঁহারা বাসনাতৃপ্তি-প্রসূত সুখ হইতে বঞ্চিত হইলেন। এজন্য সেই শক্তির প্রতি তাঁহাদের বিরক্তি জন্মিয়া যাইতেছে। বাস্তবিক হটেণ্টটদিগের প্রহার এবং সুসভ্য পুরুষ-রমণীর অভিসম্পাত এই বিরক্তিরই বাহিরের প্রকাশ মাত্র। কিন্তু যদি হটেণ্টট জাতি উক্ত আচরণে হাস্যাস্পদ হয়, তাহা হইল যাঁহারা বাসনা অতৃপ্তি জন্য বিরক্ত হন, তাঁহারা হাস্যাস্পদ হইবেন না কেন? আমাদের অনেক বাসনা পরম ব্রহ্মের ইচ্ছার সহিত মিলে না, তাই তাহা পরিপূর্ণ হয় না। অনেক সময়ই আমরা ভোগ-লালসা দ্বারা পরিচালিত হইয়া বাসনা করিয়া থাকি, গভীর জ্ঞানালোক লাভ করিয়া বাসনা নিয়মিত করি না, তাই অনেক সময় ব্যর্থ হই। কিন্তু এজন্য আমরাই সম্পূর্ণ দোষী। পরম ব্রহ্মের ভক্ত সন্তান সর্ব্বদাই ঈশ্বরের ইচ্ছা জানিবার জন্য ব্যাকুল হয়েন। যখন তাঁহার ইচ্ছা জানিতে পারেন, তখন তিনি সে ইচ্ছা পরিপূর্ণ করিবার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হন না। যে প্রাণ পরিত্যাগ সচরাচর লোকের নিকট ভয়াবহ ও বিরক্তিজনক, প্রকৃত বিশ্বাসীর নিকট তাহাই মঙ্গল-প্রসূ বলিয়া অনুমিত হয়। সুতরাং প্রকৃত বিশ্বাসীর মনে কখনও বিরক্তির উদয় হয় না। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই চরিতার্থ হয়। অর্থাৎ তাঁহার মন এরূপ সংযত হইয়াছে যে তিনি ভোগের আশায় কোন বাসনাকে মনে স্থান দেন না। ব্রহ্ম-ইচ্ছা পূর্ণ করাই তাঁহার একমাত্র বাসনা। সুতরাং বেন্থাম প্রমুখ নীতি শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদিগের মত কেবল স্নায়বীয় সূত্রের উত্তেজনা জনিত সুখ লাভ এবং দুঃখ বর্জ্জনের জন্য ব্যস্ত হন না। তিনি অনন্ত ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবার জন্যই ব্যগ্র। তাঁহার মনে কখনও বিরক্তি নাই, তিনি চির সন্তুষ্ট। প্রত্যেক ব্রাহ্ম ভাই এবং ব্রাহ্মিকা ভগিনীর কি এই অবস্থা লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়া কর্ত্তব্য নহে? তাহা না করিয়া যাঁহারা অস্থায়ী ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ-ভোগ করিতেছেন তাঁহারা শোকাতীত হইতে পারিতেছেন না। তাঁহারা কখন অনুরক্ত কখন বিরক্ত। তাঁহারা কখন সুখী, কখন দুঃখী। তাহারা কখন আনন্দ সাগরে ভাসিয়া যান, কখন শোকের উচ্চ তরঙ্গের আরোহণে একদিকে প্রবাহিত হন। কখন সম্পদের কোলাহলে প্রমত্ত, কখন বিপদের গভীর তিমিরে নিমগ্ন। কখন বিশ্বাসের সুরম্য শৃঙ্গোপরি বিরাজ করেন, কখন অবিশ্বাসের তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে নিপতিত হন। এরূপ জীবন যাপন

বিড়ম্বনা। কখনই ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকার অভিলষনীয় নহে। আমরা চাই নিত্যানন্দ, চিরতৃপ্তি, স্থায়ী সুখ, পরম শান্তি।

সংসার ও ধর্ম্ম।

ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষভাবে এই কথা প্রচার করিয়াছেন যে সংসারই ধর্ম্মসাধন-ক্ষেত্র। ধর্ম্ম সাধনের জন্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হইবে না। কিন্তু এই পিতা মাতা ভাই ভগ্নী প্রভৃতি সকলের সঙ্গে থাকিয়াই ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের সাধন করিতে হইবে এবং তাহা করা যাইতে পারে, এবং ইহার সঙ্গে এমন কথাও প্রচারিত হইয়াছিল যে সংসার ছাড়িয়া যাওয়া ধর্ম্ম নয় বরং তাহাতে ঈশ্বরেচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। এ কথা এদেশীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রের পক্ষে নূতন না হইলেও বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে নূতন এবং অসম্ভব ব্যাপার বলিয়াই গণনীয় হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম অতি তেজের সহিত নর নারীকে এই সংসার-ক্ষেত্রকেই ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম ইহা সম্ভব বলিয়া সাগ্রহে এই নির্দ্দেশের অনুগামী হইয়া সংসারকে ধর্ম্ম সাধনের ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতে সপ্রতিজ্ঞ হইয়া, উদ্দেশ্য সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। কিন্তু যতদিন তাঁহারা সংখ্যায় কম ছিলেন, পরিবারে সন্তান সন্ততির সংখ্যা কম ছিল, নানা কারণে বাহিরের ঝঞ্ঝাট কম ছিল, বেশী গোলমালে তাঁহাদিগকে যাইতে হয় নাই, সংসারের উপদ্রব দুঃখ দারিদ্র্যের সহিত অধিক সংসৃষ্ট হইতে হয় নাই, ততদিন তাঁহারা উক্ত বাক্যকে জীবনে পরিণত করা অনেক পরিমাণে সহজসাধ্য মনে করিতেছিলেন। তত দিন এমন প্রশ্ন উঠে নাই বা এমন সন্দেহ হয় নাই, যে সংসারকে ধর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিণত করা অসম্ভব বা সাধ্যের অতীত। কিন্তু যত দিন যাইতেছে ততই যেন ব্রাহ্মগণের নিকট এই প্রশ্নটীর মীমাংসা করা কঠিন বোধ হইতেছে। জীবন সংগ্রামে পরিবার পরিজন লইয়া বিব্রত হইয়া এবং বার বার পরাস্ত হইয়া এখন যেন অজ্ঞাতসারে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মগণের নিকট এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে, যে সংসারকে ধর্ম্মসাধন ক্ষেত্রে পরিণত করা যায় কি না? দিন দিন জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যেরূপ কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে লোকের প্রাণে এই প্রশ্ন উঠা অতি সহজ যে সংসারে থাকিয়া বুঝি বাস্তবিক ধর্ম্মজীবন যাপন করা যায় না, ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইলে বুঝি বনে না গেলে চলিবে না। যুক্তি এবং হেতুবাদ প্রদর্শন করিয়া অতি সহজেই প্রদর্শন করা যাইতে পারে যে সংসারই ধর্ম্মসাধন ক্ষেত্র। এখানে থাকিয়াই ধর্ম্মসাধন করিতে হইবে। ধর্ম্ম যখন সকলের জন্য প্রয়োজনীয়, তখন ধর্ম্মলাভের জন্য সকলেই বনে গেলে বন আর বন থাকে কোথায়? এবং ঈশ্বরের এমন সুন্দর সৃষ্টির উদ্দেশ্যই বা কি থাকে? এরূপে যুক্তি দ্বারা কথাটী সহজে বুঝাইতে পারিলেও কার্য্যতঃ ইহার কাঠিন্য দিন দিনই অনুভূত হইতেছে। ব্রাহ্মগণ যেন জীবন সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া হাল ছাড়িয়া দিবার আয়োজন করিতেছেন। কিন্তু ব্রাহ্মগণ যদি এই সংগ্রামে পরাস্ত হন, যদি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মগণকে বলিতে হয় সংসার ধর্ম্মসাধন ক্ষেত্র হয় না সংসারে ধর্ম্মের স্থান হয় না। যদি জীবনের পরীক্ষায় তাঁহারা প্রদর্শন করেন যে, তাঁহারা ধর্ম্মকে সংসারে ষোল আনারূপে স্থান দিতে পারিলেন না, তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষত্বই চলিয়া গেল এবং ইহার মহৎ উদ্দেশ্য যাহা দ্বারা মানব চির কল্যাণের দিকে যাইবে, তাহার আত্মার পূর্ণ বিকাশের সূত্রপাত হইবে, তাহারই পথ অবরুদ্ধ হইয়া গেল। বনে বা পর্ব্বত গুহায় দুই চারি জন ঈশ্বর প্রেমিক আত্মানুভূত শান্তির সহিত বাস করিলে, তাহাতে লোকসমাজের কি হইল? ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য যে সর্ব্ব-সাধারণের কল্যাণ সাধন করা তাহার কি হইল? সুতরাং যাহা সর্ব্বজনের জন্য কল্যাণকর নয়, এমন উদাসীনতার পক্ষপাতী মত কখনই সত্য বা শ্রদ্ধেয় নয়। এজন্য অনুসন্ধান করিতে হইবে যে কেন সংসার এবং ধর্ম্ম এক হইতেছে না। বিরোধের স্থল কোথায়? ইহা কি চিরবিরোধী দুইটী বিষয় যে কোনরূপেই এই দুই ভাবের মিলন সম্ভব নয়, অথবা সংসার ও ধর্ম্মের কোনরূপ সামঞ্জস্য আছে। যদি এমন প্রমাণিত হইত যে কোন কালে, কোন দেশে সংসার আর ধর্ম্ম একত্রে মিলিত হইয়া লোকজীবনে তাহা প্রকাশিত হয় নাই। এমন কি ব্রাহ্ম জীবনেও যদি এমন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া না যাইত, যে সংসার আর ধর্ম্ম মিলিত হয় না, এই দুইয়ের মিলনের স্থান নাই, তাহা হইলে এমন কথা বলিবার সুবিধা থাকিত যে ধর্ম্ম ও সংসার একত্রে সাধন করা যায় না। সুতরাং এ কথা সত্য নয় যে ধর্ম্ম ও সংসারের মিলনের সম্ভাবনা নাই এবং সেরূপ কোন সূত্র নাই যাহাতে এই উভয়কে একত্রে আবদ্ধ করিতে পারে। তবে যে প্রশ্ন উঠিতেছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাইব, যে বাস্তবিক সংসার ও ধর্ম্মে একটা নিত্য বিরোধী ভাব যে আছে তাহা নয়। কিন্তু মানুষ নিজ স্বার্থপরতা ও অবিবেচনা দ্বারাই সংসার ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ ঘটায়। ধর্ম্ম আর সংসার যে এক হয় না, তাহার কারণ প্রকৃতিগত বিরোধী ভাব নয়, কিন্তু মানবের স্বার্থপরতা ও ধর্ম্ম ও সংসারকে এক করিতে হইলে যে পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা করিবার প্রবৃত্তির অভাব। সংসারকে ধর্ম্মক্ষেত্র করিতে হইলে প্রবৃত্তির দমন করা বিশেষভাবে আবশ্যক। প্রবৃত্তির পরামর্শ শুনিতে গেলে তাহার আপাতঃ মধুর মোহন বাক্য যাহা অতি সহজে প্রাণকে আকর্ষণ করে, তাহার বাক্য শ্রবণ করিতে গেলে এই কঠিন এবং আত্মার একান্ত প্রয়োজনীয় সাধনায় সিদ্ধ হওয়া যায় না। সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে দূরে যাইয়া তাহার হাত এড়াইরা যাইবার যে বাসনা সেত এক প্রকার স্বার্থপর ও অলসের আকাঙ্ক্ষা। কারণ প্রবৃত্তির বিষয়ীভূত বস্তু কাছে না থাকিলে কে আর আকর্ষণ করে, সংগ্রামই কাহার সঙ্গে করিতে হয়। সুতরাং সেরূপ নিরাপদ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার আকাঙ্ক্ষা অলস ও সংগ্রাম বিমুখের আকাঙ্ক্ষা। তাহাতে প্রাণকে প্রকৃত বল দেয় না এবং কল্যাণের দিকে যাইতে সাহায্য করে না। সুতরাং অলসের মত সুখ-প্রয়াসী হইবার বাসনা আমাদিগের মন হইতে বিলুপ্ত হউক। স্বার্থের মোহমন্ত্র শ্রবণ হইতে আমাদের

কর্ণ বধির হউক তাহা হইলেই দেখা যাইবে সংসার ও ধর্ম্মের মিলনের স্থান অতি সুন্দরভাবে বর্ত্তমান। ব্রাহ্মগণ যদি মনে করিয়া থাকেন সুখ শয্যায় শয়ন করিয়া এই মহৎ সাধনে সিদ্ধ হইবেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে বিষম ভ্রান্তি হইয়াছে। সুখ-শয্যায় শয়ন করিয়া বা অলসের চির-প্রার্থিত জড় ভাবাপন্ন হইয়া কোন দিন কেহ এই মহৎ লক্ষ্য সাধনে সিদ্ধমনোরথ হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মগণ কি তাহা পারিবেন? এমন অসম্ভব চিন্তা মনে স্থান দেওয়াতেও প্রত্যবায় আছে। ব্রাহ্ম! আলস্যের সুখপ্রদ-ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইবার জন্ত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের এমন উচ্চ ও মহৎ সত্যালোক তোমাকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু অতি কঠোর এবং কল্যাণকর ব্রত পালনের জন্য তোমার নিকট এই মহান্ লক্ষ্য উপস্থিত করা হইয়াছে। ঈশ্বরের এই মহান্ ইচ্ছা পালনে যিনি যে পরিমাণে আত্মসামর্থ্য নিয়োগ করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে ধন্য ও কৃতার্থ হইবেন। ঈশ্বরের এই পবিত্র নির্দ্দেশকে অগ্রাহ্য করা এবং পার্থিব-সুখ-ভোগেচ্ছায় তাঁহার প্রদর্শিত কল্যাণের পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া কখনই আমাদের কর্ত্তব্য নয়। ব্রাহ্ম তোমাকে এই কঠোর সাধনায় সিদ্ধ হইতেই হইবে। এবং জীবন দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে যে সংসার ও ধর্ম্মে কোন নিত্য বিরোধী ভাব নাই এবং এই দুইয়ের মিলন দ্বারাই জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

অকিঞ্চনের প্রার্থনা।

(প্রাপ্ত)

হে দীনবন্ধু! আমার যে কিছুই ভাল লাগিতেছে না। তোমার অমৃতময় স্পর্শ আমার মৃতপ্রায় প্রাণকে একটু অনুভব করাও।

আমার চক্ষু চারিদিক শূন্য দেখিতেছে; সংসার নীরস বোধ হইতেছে; অন্ধকারময় প্রাণের ভিতর হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে। প্রভো, তোমার প্রকাশ-জ্যোতিঃ এক কণিকা প্রাণে সঞ্চার কর।

আমার ভিতরে বাহিরে আগুণ জ্বলিতেছে। হৃদয়ের যন্ত্রণা কাহাকে কহিব? অন্তর্যামি, কবে শীতল করিবে?

সংসারের এত কোলাহল আর আমার ভাল লাগিতেছে না। প্রাণ তোমারই জন্য কাঁদিতেছে। সারাৎসার, আর কত দিন লুকাইয়া থাকিবে?

অসার আত্মীয়তার স্তোত্রে আর প্রাণ ভুলে না। অসার প্রণয়ের মিষ্ট কথায় আর হৃদয় তৃপ্ত হয় না। হে হৃদয় নাথ, কবে শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিবে? কতদিনে তোমার প্রেমবাণী শুনিব?

হে নিত্যবস্তু, অনিত্য বিষয়-বিলাস পুরাতন হইল। আহার নিদ্রা, আমোদ, হাস্য ও মোহের কোলাহল করিতে করিতে এই ক্ষুদ্র জীবন অবসান হইয়া আসিল। হে সার বস্তু, হে নিত্য অবলম্বন, কবে তোমাকে চিনিব? হে আনন্দ-স্বরূপ, কবে তোমাতে হৃদয় মজিবে?

অন্তর্যামি, প্রাণ যাহার জন্য পিপাসিত তাহা তুমিই জান। ভিন্ন ভিন্ন লোকে ভিন্ন ভিন্ন পথ দেখায়। কোন কথাই প্রাণে লাগে না। হে আলোক এই ঘোর অন্ধকারে তুমি আমাকে পথ দেখাইয়া দাও।

আমি জ্ঞানী পণ্ডিতগণের সঙ্গে মিশিয়াছি; তাঁহাদের যুক্তি ও বিচার শুনিয়াছি; তাঁহাদের ন্যায় ও দর্শনের গম্ভীর তত্ত্ব কথা শুনিয়াছি। সে সকলে আমার প্রাণের পিপাসা দূর হইল না। হে দর্শন বিজ্ঞানের অতীত, আমি নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব-গ্রন্থের পাতা কাটিয়া কটিয়া তন্ন তন্ন করিয়া তোমার তত্ত্ব পাঠ করিয়াছি। আমার প্রাণের অন্ধকার ঘুচিল না।

মৃদঙ্গ করতাল সম্বলিত সংকীর্ত্তনে আমার হৃদয় ভিজিল না। আমি ভক্তি শাস্ত্রের সপ্তম স্বর্গের কথা শুনিয়াছি। অনেককে ভাবে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে ও সংজ্ঞাহীন হইতে দেখিয়াছি। এ সকলে আমার প্রাণ আকৃষ্ট হইল না। অন্ধকারময় রাজ্যের কল্পনার উচ্ছ্বাস আমার প্রাণকে মিষ্ট করিতে পারিল না।

আমি কর্ম্মীদিগের সঙ্গে মিশিয়াছি। তোমাবিহীন অসার সমাজ-সংস্কার ও অহঙ্কার পূর্ণ কার্য্যকোলাহলে আমার প্রাণ সায় দিল না।

হে আঁখির আলোক, তোমার জ্যোতিতে আমার নয়ন মার্জ্জিত কর, তোমার জীবন্ত, প্রাণপ্রদ প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়া যাই।

হে প্রেম-পূর্ণচন্দ্র, তোমার নির্ম্মল প্রেমকিরণ আমার এই হৃদয়-সরোবরে প্রতিভাত কর। আমার হৃদয়ে ক্ষুদ্র প্রেমলহরী নাচিয়া উঠুক, আমি আপনাকে হারাইয়া জন্মেরমত তোমাতে মজিয়া যাই।

হে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্তা, তুমি বল, আমি এই ক্ষুদ্র দেহ মন ও হৃদয়কে তোমার কোন্ কাজে লাগাইব? আমি অনেক ভাল কাজ করিলাম, কিন্তু হৃদয় পরিতৃপ্ত হইল না। আর যে এই শুষ্ক ভূতের বোঝা টানিতে পারি না নাথ! কবে তোমার কথা শুনিয়া, তোমার জগতের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইব?

হে অনন্ত পবিত্রতার খনি, যেখানে অনুরাগী বৈরাগীদের ব্যাকুল আত্মা দীন ভাবে তোমাকে ডাকিতেছেন; যেখানে প্রেমিক ভক্তগণের মুখে সরল প্রেমের ভাব খেলা করিতেছে, তুমি এ অন্ধকে হাত ধরিয়া সেইখানে লইয়া যাও। তাঁহাদের পুণ্যের বাতাস গায়ে লাগিলে আমি পবিত্র হইব।

হে সাধনের অতীত, আমার এই অকিঞ্চিৎকর অসার সাধন তোমাকে ধরিতে পারিল না। আমার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঘুরিয়া পড়িল; রাশি রাশি বাক্য বাতাসে উড়িয়া গেল। আমার প্রাণের অন্ধকার ঘুচিল না, পাপের যন্ত্রণা গেল না; মন আমার বশীভূত হইল না। আমার সকলই ব্যর্থ হইল। হে অগতির গতি, এখন নিরাশ্রয় হইয়া আমি তোমারই দ্বারের ভিকারী হইতেছি। এখন তোমারই করুণা ভরসা। হে দয়াল এ দীন হীনে মুখ তুলে চাও।

হে প্রভো, সংসারে আমার সুখ নাই। তোমারও পথ যেন কুয়াসায় আচ্ছন্ন করিয়াছে। আমি তোমাহারা হইয়া, শূন্য প্রাণে, পথের ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছি। হে দয়াল আমার

জীবনের সন্ধ্যা যে আগত প্রায়। আমার আকুল নয়ন এই বিস্তৃত সাগরের তীরে তোমাকে অন্বেষণ করিতেছে। এই বিজন প্রাণে, হে চির অবলম্বন, একটীবার তুমি সাড়া দেও। এই মৃতকে একটু স্পর্শ কর, তোমার চরণ ধরিয়া বাঁচিয়া যাই।

পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব।

আজ আমরা গভীর শোক সহকারে আমাদের পাঠকবর্গকে ব্রাহ্মসাধারণের শ্রদ্ধেয় এবং সুপরিচিত শিবচন্দ্র দেবমহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ প্রদান করিতেছি। তিনি যেমন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন এমন আর দ্বিতীয় কেহ আছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সময়, শরীর, বুদ্ধি এবং অর্থ প্রভৃতি সাহায্য করিবার যে সকল আয়োজন সচরাচর দৃষ্ট হয়,তাহার সমস্তই প্রয়োগ করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিতে তিনি নিয়ত প্রস্তুত ছিলেন। ধর্ম্মসমাজের পক্ষে মানুষকে যদি কোনরূপে অভিভাবক শব্দে অভিহিত করা অসঙ্গত না হয়, তবে এই শিবচন্দ্র দেব মহাশয়কে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অভিভাবক শব্দে অভিহিত করিতে আমাদের কোন সংকোচ হইতেছে না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন সময়ে যাঁহারা বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং পরিশ্রম করিয়াছিলেন,শিবচন্দ্র বাবু তাহার মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সেই বৃদ্ধাবস্থায় তিনি যেরূপ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিতেন, তাহাতে যুবকগণকেও লজ্জিত হইতে হইত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বাস্তবিকই তাঁহার পরলোকগমনে একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারা হইলেন। তাঁহার জীবন অতি সুন্দর ও সুমিষ্ট ছিল। তিনি ছোট বড় সকলেরই সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করিতেন যে তাহাতে সকলকেই মুগ্ধ হইতে হইত। নীতি সম্বন্ধে তিনি একজন আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। সময়ের অপব্যবহার তিনি কখনও করিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই যথাসময়ে সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেন। অর্থসম্বন্ধে তাঁহার ব্যবহার সকলের পক্ষে বিশেষ অনুকরণীয়। তিনি যে সকল সৎকার্য্যে নিয়মিতরূপে অর্থ সাহায্য করিতেন, সে অর্থ কখনও তাঁহার নিকট চাহিয়া পাঠাইতে হয় নাই। তিনি সর্ব্বদাই নিজ হইতে আপন দেয় দাতব্য যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতেন।

অনেক দিন হইতে তিনি পেটের অসুখে পীড়িত ছিলেন। চিকিৎসার গুণে একবার সুস্থও হইয়াছিলেন। বিগত শ্রাবণ মাস হইতে কলিকাতাতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। কিছু দিন হইল হঠাৎ তাঁহার আমাশা রোগ দেখা দেয়। নানাপ্রকার চিকিৎসা হইল,রোগেরও অনেক উপশম হইল। কিন্তু স্বভাবতঃ দুর্ব্বল শরীর এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল যে আর সারিয়া উঠিতে পারিলেন না। দুর্ব্বলতাই তাঁহার কাল হইল।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মৃত্যুর কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই কিন্তু বড় দুর্ব্বলতা বোধ করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। কোন জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, নীরবে জীবাত্মা ক্ষণভঙ্গুর দেহকে পরিত্যাগ করিবার আয়োজন করিতে লাগিল। নীরবে তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। কোন প্রকার দেহবিকার দেখা গেল না। গত ২৭এ কার্ত্তিক বুধবার প্রাতঃকালে অতি সহজে তাঁহার আত্মা শরীর ছাড়িয়া মহাপ্রস্থান করিল।

শিবচন্দ্র বাবুর ধর্ম্মশীল ও কর্ম্মশীল জীবনের স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত নিম্নে প্রকাশিত হইল। এই বিবরণে তাঁহার অনেক সৎকার্য্যের উল্লেখ তিনি করেন নাই। তিনি রোগ শয্যাতে অতি দুর্ব্বল অবস্থাতেও নিয়মিত উপাসনা করিতে কখনই বিমুখ হন নাই। তিনি যে কিরূপ দানশীল ছিলেন তাহার বিবরণ এই বৃত্তান্তে নাই। যে কেহ কোন অভাবে পড়িয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ যথাসাধ্য সেই অভাব মোচন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কত দীন দুঃখীকে যে তিনি গোপনে অর্থদান করিতেন, তাহা নিকটস্থ আত্মীয় স্বজনেরাও টের পাইতেন না। সাধারণ হিতকর সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। কত দীন দুঃখী আজ তাঁহার অভাবে পিতৃহীন হইল, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

তাঁহার শরীর অতি কৃশ ছিল। চেহারা দেখিয়া মনে হইত, হাড় কয়েক খানা চামড়া দিয়া যেন আচ্ছাদন করিয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু এমন দুর্ব্বল শরীরের মধ্যে কি তেজীয়ান আত্মা বাস করিত! কোন বাধা কোন বিঘ্ন তাঁহাকে সৎ সঙ্কল্প হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। দুর্ব্বল শরীর লইয়া তিনি যেমন পরিশ্রম করিতেন, কোন বলিষ্ঠ যুবকও তেমন খাটিতে সমর্থ হইবেন না। শারীরিক বল যে তুচ্ছ পদার্থ, মনের বলই যে প্রকৃত বল, তাহা তিনি বেশ দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার যেমন বিনয় দেখিয়াছি,এমন বিনয় অতি অল্প লোকের দৃষ্ট হয়। অশীতি বর্ষ প্রায় পূর্ণ হইয়াছিল, তথাপি একজন বালকের কথার প্রতিও কত সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

শিবচন্দ্র বাবুর স্বলিখিত জীবন বৃত্তান্তের সার এইরূপ—

"আমার পিতার নাম বাবু ব্রজকিশোর দেব। শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটির অন্তর্গত জনাকীর্ণ কোন্নগর সহরে তিনি এক জন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন।

আমি তাঁহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র। ১৭৩৩ শকের ৬ই শ্রাবণ, ১৮১১ সনের ২০এ জুলাই কোন্নগরে আমার জন্ম হয়। তখন কোন্নগরে কোন বিদ্যালয় ছিল না। সুতরাং বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য বাল্যকালে কোন বিদ্যালয়ে পাঠ করি নাই। আমার শিক্ষার জন্য পিতা ঠাকুর একজন গুরু মহাশয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অতি সামান্য রকম বাঙ্গালা লেখা পড়া ও অঙ্ক শিখিয়াছিলাম।

যখন আমার বয়স ১০ বৎসর, তখন গৃহে সামান্য রকম ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করি। আমার আত্মীয় বাবু মদনমোহন মিত্র আমাকে পড়াইতেন। তাঁহার নিকট বানান, পাঠ ও শব্দার্থ মুখস্থ করিতাম।

১১ বৎসর বয়সের সময় আমি মাতৃহারা হই। তার পর দুই বৎসর কাল বৃথা নষ্ট করি। তখন শুনিলাম কলিকাতায় ভাল ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। সেখানে পড়িতে আমার খুব ইচ্ছা হইল। আমার পিতা আমাকে খুব ভাল বাসিতেন, কিন্তু তাঁহার রাগ বেশী ছিল, তাই ভয়ে মনের কথা তাঁহার নিকট বলিতে সাহসী হইতাম না।

মুখে বলিতে সাহসী না হইয়া বাবু উমাচরণ দেবের দ্বারা আমাকে কলিকাতায় কোন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য পিতার নিকট এক দরখাস্ত লিখাইলাম। একদিন দুপ্রহরে পিতা ঘুমাইয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে সর্ব্বদাই একটা বাক্স থাকিত, সেই বাক্সের উপর দরখাস্ত খানা রাখিয়া দিলাম। তিনি জাগিয়া আমার পত্র পড়িলেন এবং আমাকে ডাকিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করিলেন।

১৩ বৎসর বয়সের সময় ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আমি কলিকাতা যাই। আমি হাটখোলার বাবু রামনারায়ণ ঘোষের বাড়ীতে বাস করি এবং রীড সাহেবের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হই। সেখানে ৮ মাস ছিলাম। সেখানকার পাঠে সন্তুষ্ট না হইয়া আমি পিতার নিকট হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হইবার অভিলাষ জানাইলাম। ১৪ বৎসর বয়সের সময় ১৮২৫ সনের ১লা আগষ্ট আমি বেতন দিয়া হিন্দু কলেজের ৭ম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম।

হিন্দু কলেজে ৬ বৎসর ৫ মাস কাল অধ্যয়ন করি। শেষ দুই বৎসর কাল প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করিয়াছিলাম এবং মাসে ১৬৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতাম।

কালেজের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়া ১৮৩১ সনের ২০এ ডিসেম্বর কালেজ পরিত্যাগ করি এবং মাসে ৩০৲ টাকা বেতনে গ্রেট ট্রিগ্নো মেট্রিক্যাল সার্ব্বে অব ইণ্ডিয়ার কম্পিউটার নিযুক্ত হই। আমার বেতন শীঘ্রই ৪০৲ টাকা হইয়াছিল। ১৮৩৮ সনের ২০এ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত আমি গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। তারপর বোর্ড অব রেভিনিউ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া বালেশ্বরের ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হই। এই কাজ পাওয়ার পূর্ব্বে আমি সার্ব্বে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হই।

বালেশ্বরে ৬ বৎসরাধিক কাজ করিয়াছিলাম। আমার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৪৪ সনের ৯ই জানুয়ারী আমাকে ৩য় বিভাগ হইতে ২য় বিভাগে উন্নীত করেন।

১৮৪৪ সনের মে মাসে আমি মেদিনীপুর বদলী হইয়া যাই। এখানে সেটল্‌মেণ্ট ও বাটোয়ারা প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম।

১৮৫০ সনের জানুয়ারী মাসে ২৪শ পরগণায় বদলী হই। এখানে পঞ্চান্ন গ্রাম ও অন্যান্য খাস মহলের রাজস্ব আদায়, খাজানার মোকদ্দমা, সাধারণ কার্য্যের জন্য যে ভূমি গ্রহণ করা হয়, তাহার মূল্য নিরুপণ কার্য্যে নিযুক্ত হই। এই সময় বেলেঘাটা হইতে চিৎপুরের নিকট গঙ্গা পর্য্যন্ত এক খাল কাটাইবার প্রস্তাব হয় এবং আমি তাহার জন্য ভূমি গ্রহণ কার্য্যে নিযুক্ত হই।

১৮৫৭ সনে একদিন রেলে যাইতেছি, সেই গাড়ীতে কয়েক জন ইংরেজ ছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কথা আরম্ভ হয়। কথা বার্ত্তার পর ইংরেজেরা মনে করিলেন,যে আমি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসন্তুষ্ট ও বিদ্রোহীদেরসঙ্গে সহানুভূতি করি। ইংরেজেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করাতে,গবর্ণমেণ্ট আমার কৈফিয়ৎ তলব করেন। যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার যথাযথ বর্ণনা করাতে এবং আমার চরিত্রের সার্টিফিকেট দেওয়াতে, গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যে আমার কথায় গবর্ণমেণ্টের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, কিন্তু আমাকে সতর্ক করিয়া দিয়াই গবর্ণমেণ্ট নিরস্ত হইলেন।

১৮৫৮ সনের ২৯এ নবেম্বর রেলওয়ে কমিশনার এনশ্লি সাহেবের অধীনে পূর্ব্ববঙ্গ রেলওয়ের জন্য ভূমি গ্রহণ কার্য্যে নিযুক্ত হই। ১৮৬০ সনে এই কার্য্য শেষ করিয়া ৩ মাসের অনুগ্রহ বিদায় পাই। এই সময় বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের সহিত স্বাস্থ্যলাভের জন্য উত্তর পশ্চিমে গমন করি। বিদায়ের পর আবার ২৪শ পরগণায় যাই। ১৮৫৯ সনের ১০ই ডিসেম্বর ১ম শ্রেণীর ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত হই। ১৮৬০ সনের ২৪এ মার্চ্চ গর্ণমেণ্ট আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করেন এবং আসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা দেন। ঐ বৎসর ১৯এ সেপ্টেম্বর নিজ কার্য্য ছাড়া কলিকাতার ডেপুটী কালেক্টরের কার্য্যে নিযুক্ত হই, সুতরাং একদিন আলিপুর ও একদিন কলিকাতায় কাজ করিতে হইত।

স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে ১৮৬৩ সনের ১লা জানুয়ারী আমি রাজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করি এবং মাসিক ৩৩০॥ আনা পেনসন প্রাপ্ত হই।

১৮৬৫ সনে শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর কমিশনার নিযুক্ত হই, কিন্তু শরীর রুগ্ন হওয়াতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করি।

১৮৭১ সনের ৪ঠা জুলাই শ্রীরামপুরের সবরেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হইয়া ১৮৭২ সনের এপ্রিল মাসে ঐ কার্য্য ত্যাগ করি।

১৮৭২ সনের ৪ঠা জুন, ১৮৭২ সনের ৩ আইনানুসারে রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হই এবং ১৮৮৭ সনের ডিসেম্বর মাসে ঐ পদত্যাগ করি।

১৮৭৭ সনে মহারাণী যখন ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন, তখন ছোটলাট বাহাদুর আমাকে সার্টিফিকেট অব অনার প্রদান করেন।

১৮২৬ সনে ১৫ বৎসর বয়সে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী গোপাল নগরের বাবু বৈদ্যনাথ ঘোষের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত আমার বিবাহ হয়। তখন আমার স্ত্রীর বয়স ৯ বৎসর ছিল। এই বাল্য-বিবাহ আমার ও আমার স্ত্রীর পিতা কর্ত্তৃক স্থিরীকৃত হইয়াছিল, আমার কোন মতামত গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি যে, এই বিবাহ আমার কখনও কষ্টের কারণ হয় নাই। বরং আমি এমন প্রেমাস্পদা স্ত্রী পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করিয়াছি। তাঁহার স্বাভাবিক সদ্বুদ্ধি, ধর্ম্ম-প্রবণতা ও আমার প্রতি অনুরাগের প্রশংসা করিয়া শেষ করিতে পারি না। এই বিবাহে আমার ছয় কন্যা ও এক পুত্র হইয়াছে।

আমার পিতৃগৃহ অত্যন্ত ছোট ছিল সুতরাং সকলে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিত না। আমি পুরাতন বাটীর সংলগ্ন এক খণ্ড ভূমি পিতার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া এক বাটী নির্ম্মাণ করি। ১২৭৫ সন হইতে ঐ বাটীতে বাস করিতেছি।

আমি এনড্রু কোমের ও অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া শিশুপালন নামক গ্রন্থ লিখি। ১৮৫৭ সনে তাহার প্রথম ভাগ এবং ১৮৬২ সনে দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৬৭ সনে অধ্যাত্ম্য বিজ্ঞান নামক প্রেত তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশ করি।

১৮৫০ সনে আমি মেদিনীপুর হইতে ২৪শ পরগণায় বদলী হই। তখন সপ্তাহের ছয়দিন খিদিরপুর অথবা আলিপুরে থাকিতাম, শনিবার কোন্নগরে যাইতাম। আবার সোমবার ফিরিয়া আসিতাম। এই সময় আমার জন্মভূমি কোন্নগরের অবস্থা উন্নত করিতে বড়ই আকাঙ্ক্ষা হয়! ১২৫৯ সনের ২৯এ আষাঢ় আমি এক প্রকাশ্য সভায় সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া "কোন্নগর হিতৈষিনী" নামে এক সভা স্থাপন করি (১) কোন্নগরের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা ও স্থানীয় লোকের উপকার করা, (২) ধর্ম্ম ও জাতির উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া গ্রামের অশ্লীল ও দূষিত আচার ব্যবহার রহিত করা, (৩) দুঃখীকে সাহায্য করা ও (৪) আপোষে বিবাদ মীমাংসা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। সভা ৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া স্থানীয় লোকের যথোচিত সাহায্য না পাওয়াতে ১৮৫৩ সনে উঠিয়া যায়। এই সভা অনেক স্থানে রাস্তা সংস্কার, পুল নির্ম্মাণ, দরিদ্রের সাহায্য, স্কুল গৃহ নির্ম্মাণের জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন। এই সভা কোন্নগরে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করাতে আমি একখণ্ড ভূমি দান করি। ১৮৫৪ সনের ১লা মে স্কুল খোলা হয়।

লর্ড হার্ডিঞ্জের আদেশানুসারে কোন্নগরে একটি বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৫৬ সনে ঐ বিদ্যালয় উঠিয়া যায়। আমার ও বন্ধুদের চেষ্টায় ১৮৫৮ সনে একটী বাঙ্গালা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়।

সাধারণ পাঠাগারের দ্বারা শিক্ষার সাহায্য হয়, এই ধারণা হওয়াতে আমি চাঁদা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই। এই চাঁদা দ্বারা ইংরেজী বিদ্যালয়টী দ্বিতল করিয়া তাহাতে পাঠের জন্য পুস্তক রাখা হয়। ১৮৫৮ সনের ১লা এপ্রিল এই পাঠাগার খোলা হয়। এখানে বহু সংখ্যক ইংরেজী বাঙ্গালা ও প্রাচীন গ্রন্থ আছে।

ছাত্রাবস্থাতেই আমি স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করি। আমি স্বয়ং সর্ব্ব প্রথমে আমার স্ত্রীকে সাধ্যমত শিক্ষাদিতে আরম্ভ করি। পণ্ডিত রাখিয়া আমার কন্যাদিগকে, শিক্ষিত করি, একটি কন্যাকে বেথুন স্কুলে পাঠাইয়াছিলাম।

১৮৫৮ সনে আমি গভর্ণমেণ্টকে এই মর্ম্মে এক পত্র লিখি, যে গবর্ণমেণ্ট যদি কোন্নগরে বালিকা বিদ্যালয় গৃহের জন্য ৫ শত টাকা দেন, তবে আমিও ৫ শত টাকা দিতে প্রস্তুত আছি। এবং গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৪৫ টাকা সাহায্য করিলে স্থানীয় লোকের নিকট হইতে ১৫ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দিতে পারি। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে, আমি ১৮৬০ সনের ১২ই এপ্রিল নিজ ভবনে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করি এবং একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করি। ইহার পর নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়ের জন্য এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি।

১৮৫৪ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল খোলা হয়। তখন কোন্নগরে ষ্টেসন ছিল না। কোন্নগর বাসীদের ৩ মাইল দূরবর্ত্তী বালী বা শ্রীরামপুর যাইতে হইত। আমি রেল কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট কোন্নগরে ষ্টেসন স্থাপন করিতে অনুরোধ করি। অনেক আন্দোলনের পর কর্ত্তৃপক্ষগণ ১৮৫৬ সনে ষ্টেসন স্থাপন করেন।

পোষ্টাফিস না থাকাতে লোকের বড় অসুবিধা হইত, বালী বা শ্রীরামপুর না গেলে চিঠি পাওয়া যাইত না। ১৮৫৮ সনে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে কোন্নগরে পোষ্টাফিস স্থাপন করিতে অনুরোধ করি এবং ক্ষতি হইলে তাহা পূরণ করিতে অঙ্গীকার করি ঐ বৎসরই কোন্নগরে পোষ্টাফিস স্থাপিত হয়।

হিতৈষিনী সভা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হোমিওপ্যাথি মতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। হোমিওপ্যাথি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের জন্য ১৮৬৮ সনে এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করি। সভার অনুমতি অনুসারে চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। কিন্তু পর বৎসর তাহা বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সুখের বিষয় এই কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ সেই সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ বিতরণ করিয়া আসিতেছেন।

১৮৭৫ সনে খুব মেলেরিয়া জ্বর হয়। আমার ও বন্ধুবর্গের যত্নে গবর্ণমেণ্ট এক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। আমারই এক গৃহে এই চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়, ১৮৮১ সনে গবর্ণমেণ্ট ইহা বন্ধ করিয়া দেন। আমার স্ত্রীর ব্যয়ে আমার ভবনে হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অদ্য পর্য্যন্ত চলিতেছে।

আমি শাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করি এবং বিবাহের পর সস্ত্রীক গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন কালী পূজা করিতাম। যখন আমি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি, তখন সুবিখ্যাত ডিরোজিও সাহেব সে শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। কলেজে ও কলেজের বাহিরে তাঁহার সহিত সর্ব্বদাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইত। কিয়ৎকালের পর আমার আর হিন্দু ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিল না, আমি একেশ্বরবাদী হইলাম। কিন্তু তখন বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে অক্ষম হইয়া, বাহিরে হিন্দু ধর্ম্মানুযায়ী ক্রিয়া কলাপ নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম। ১৮৪৪ সন পর্য্যন্ত এইরূপে কাটিয়া গেল, আমি বালেশ্বর হইতে মেদিনীপুরে বদলী হইলাম। এখানে এক দিন একখণ্ড তত্ত্ববোধিনী পাইয়া তাহা পাঠ করিলাম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মত অবগত হইয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। আমি সেই দিন হইতে পত্রিকার গ্রাহক হইলাম ও পত্রিকার উপদেশানুযায়ী পরমব্রহ্মের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। ১৮৪৬ সনে মেদিনীপুরে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করি এবং আমি যতকাল তথায় ছিলাম ততকাল সমাজ জীবিত ছিল। তার পর মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক বাবু রাজনারায়ণ বসু সমাজ পুনর্জীবিত করেন এবং সমাজকে মহা শক্তিশালী করিয়া তুলেন।

২৪শ পরগণায় আসিবার পর আমি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করি এবং আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হই। ঈশ্বরের কৃপায় আমি পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমার স্ত্রী প্রাণের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন এবং কার্য্যে সে ধর্ম্মের আদেশ পালন করেন। আমার সন্তানগণও ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস করেন।

১৮৬৩ সনে রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ঐ বৎসর ২৮এ মে নিজ গৃহে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করি। প্রথমতঃ প্রতি পক্ষে তার পর প্রতি সপ্তাহে একবার সামাজিক উপাসনা

হইত। সমাজ প্রতিষ্ঠার দিন বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সমাজ প্রথমতঃ আদি সমাজের অঙ্গীভূত ছিল—তারপর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করেন। কিন্তু এ সমাজ চিরকালই স্বাধীনভাবে উভয় সমাজের নেতাদিগকে উৎসবের সময় আচার্য্যের কার্য্য করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি চিরদিনই আমার অত্যন্ত ভক্তি আছে। সমাজের জন্য মন্দির নির্ম্মাণার্থ নদীতীরে আমি একখণ্ড ভূমি দান করি। ৩ সহস্রাধিক টাকা ব্যয়ে মন্দির নির্ম্মিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সনে মন্দির প্রবেশ হয়—বাবু আনন্দ মোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকড়ি দেব, সত্যপ্রিয় দেব তাহার ট্রুষ্টি নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রচারক বা আচার্য্যের বাসের জন্য ও সমাজের নিকট একটী বাড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে।

যে সকল ঘটনায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় তাহা সকলেই জানেন। আমি ইহার সংস্থাপনের জন্য অনেক পরিশ্রম করিয়াছি। প্রথম হইতে ১৮৭৯ পর্য্যন্ত আমি এই সমাজের সম্পাদক ছিলাম। ১৮৮০ সনে আমি সভাপতি নিযুক্ত হই কিন্তু আমি আপনাকে এ কাজের নিতান্ত অনুপযুক্ত মনে করিতাম। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুদের একান্ত অনুরোধে একাজ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হই। ক্রমাগত ৫ বৎসর এই কাজে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। মধ্যে এক বৎসরের পর ১৮৮৭ সনে আবার সভাপতি হই, ১৮৮৮ সনে আমি অবসর গ্রহণ করি।

আমার ধর্ম্ম বিশ্বাস বিশেষতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে পুত্রের বিবাহ দেওয়াতে কোন্নগরের গোঁড়া হিন্দুগণ আমাকে সমাজচ্যুত করিয়াছেন। তাঁহারা আমাকে অপমানিত করিতে ও সুবিধা পাইলে নিপীড়ন করিতে ইতস্ততঃ করেন না। কিন্তু আমি তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত নই। তাঁহারা যে এরূপ আচরণ করিবেন, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতাম এবং সেজন্য প্রস্তুত ছিলাম। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সদ্বুদ্ধি দিন।

যদিও স্বভাবতঃ আমি দুর্ব্বল তথাপি মিতাচার ও মিতাভ্যাসের জন্য ঈশ্বরের কৃপায় দীর্ঘ জীবন যাপন করিয়াছি। আমি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম আলোচনা করিয়া তদনুসারে চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমার আহার সামগ্রী অতি সামান্য রকম। ডাল, ভাত, তরকারী, মাছ, দুধ ও রুটি ভিন্ন আর কিছু খাই না। আমি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠি, প্রথম রাত্রেই নিদ্রা যাই। এই নিয়ম চিরদিন পালন করিয়াছি। প্রাতঃকালে এক পেয়ালা চা, কাফি বা কোকো পান করিয়া ভ্রমণ করি এবং ডমবেল ও ফ্লেশ ব্রস লইয়া ব্যায়াম করি। এখন প্রাতঃকালে দুধ ভিন্ন আর কোন তরল দ্রব্য পান করি না। কিছু না খাইয়া খালি পেটে কখনও বাড়ীর বাহির হই না।

আমার প্রাত্যহিক কার্য্যের তালিকা এই—বৎসরের সকল ঋতুতেই ৫টার সময় নিদ্রা হইতে উঠি। প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ বা সংবাদ পত্র পাঠ করি। ৬॥ বা ৭টার সময় এক পোয়া দুধ ও একখানা এরোরুট বিস্কিট খাই। তারপর ভ্রমণ করিতে যাই। ফিরিয়া আসিয়া সাংসারিক বা সাধারণ কার্য্য নির্ব্বাহ করি। ১০টার সময় ঈষদুষ্ণ জলে শরীর প্রক্ষালন করি ও মাথায় ঠাণ্ডা জল দি। স্নানের সময় ফ্লেশ ব্রস ব্যবহার করিয়া থাকি। দুর্ব্বলতা বশতঃ এখন আর ডমবেল লইয়া ব্যায়াম করিতে পারি না। স্নানের পর পারিবারিক উপাসনা করি। ১১টার সময় ডাল, ভাত, তরকারী, মাছ, একটু মিঠাইর সহিত এক পোয়া দুধ খাই। আহারের ৩।৪ ঘণ্টা পরে জল খাই। তারপর আধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া পাঠ করি বা কোন কাজ করি। ৭টার সময় ৩।৪ খানা ছোট রুটী অথবা কয়েক টুকুরা পাঁউরুটী, মাছের তরকারী, এক পোয়া দুধ ও কিছু মিঠাই খাই। তারপর পরিজনবর্গ বা বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করিয়া রাত্রি ৯টার সময় নিদ্রা যাই। এখন (১৮৮৮ সনের জুলাই) আমার বয়স ৭৭ হইয়াছে। যদিও কখনও কখনও শরীর বিকল হইয়া যায়, তথাপি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দি যে এখনও এক রকম সুস্থ শরীরে আছি। দুর্ব্বলতাই এখন আমার প্রধান পীড়া।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

বজ্রযোগিনী।

নিম্নলিখিত প্রণালীতে বজ্রযোগিনীর অন্তর্গত পূর্ব্বপাড়া উপাসনা সমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১৩ই কার্ত্তিক অতি প্রত্যূষে [illegible] হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করেন। অপরাহ্নে, বরিশালের প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি কি? এই বিষয়ে বক্তৃতা করেন। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও কর্ত্তৃত্বই ব্রাহ্মধর্ম্মের-ভিত্তি এবং ব্রহ্মের এই স্বরূপ স্বীকার করিলে তাঁহার অন্যান্য স্বরূপ এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের মতই বিশ্বাস স্বীকার করিতে হয়। তিনি ইহা সুন্দররূপে বুঝাইয়া দেন। বক্তৃতান্তে কীর্ত্তন হয়। পরে বাবু আনন্দচন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করেন। ১৪ই কার্ত্তিক বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া কীর্ত্তন করা হয়, এবং বাবু রামকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে, তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনা করেন। উক্ত দিবস বৈকালে শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের বক্তৃতা করিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহার শরীর অসুস্থ হওয়াতে শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় "ধর্ম্মসাধন" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পরে অত্যন্ত জমাট কীর্ত্তন ও উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করিয়াছিলেন। রাত্রিতে স্থানীয় বিক্রমপুর প্রচার সভার অধিবেশন হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় সভায় অধিক লোক উপস্থিত হন নাই। কিন্তু শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, বিপিন বিহারী চক্রবর্ত্তী ও রেবতীমোহন সেন ও আরও দুই জন বন্ধু অনুগ্রহ পূর্ব্বক সভার কার্য্যে যোগদান করিয়া আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। ১৫ই কার্ত্তিক প্রাতে কীর্ত্তন ও উপাসনা হইয়া কার্য্য শেষ হয়। শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষালের বাড়ীতে এই উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

মাননীয় তত্ত্ব-কৌমুদী সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন—

গত ১৬ই কার্ত্তিকের তত্ত্ব-কৌমুদীতে সীতানাথ বাবুর আর একখানি দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক সকলের মধ্যে অনৈক্য আছে এবং একটী বিদ্যালয়ে এরূপ পরস্পর বিরোধী মতের পুস্তক পড়ান উচিত নয়, মনে করিয়া তাহা প্রদর্শন করাতে যে এরূপ তর্কজালের মধ্যে পড়িতে হইবে আমার সে জ্ঞান ছিল না। কারণ অনৈক্য যে আছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সীতানাথ বাবু এবার যেমন স্পষ্টতঃ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা করিলে আর এত লেখালেখি করিতে হইত না। সীতানাথ বাবু এবার পাঠ্য পুস্তক সকলের অনৈক্যের কথা স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন যে সে অনৈক্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতে নয়, কিন্তু দার্শনিক মতে। অনৈক্য ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত কি দার্শনিক মত সম্বন্ধে আছে তাহা বিচার্য্য নয়। কিন্তু বিচার্য্য বিষয় এই যে এরূপ পরস্পর বিরোধী মতের পুস্তক একটী বিদ্যালয়ে পড়ান উচিত কি না? তাহাদ্বারা শিক্ষার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় কি না? যখন কোন একটী সমাজের নামে বিদ্যালয়টী চলিতেছে, তখন আমার বিবেচনায় তাহাতে পাঠ্য পুস্তকগুলির বিষয় সকলের একতা থাকা একান্ত প্রার্থনীয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতই হউক, আর দার্শনিক মতই হউক কোন একটী সমাজের পক্ষে এক বিষয়ে নানামতবাদী হওয়া কখনই উচিত নয়। সে সমাজের লোকদিগের মধ্যে যদি মতের অনৈক্যও থাকে, তথাপি এমন ভাবে একটী সমাজের পক্ষে সে অনৈক্যের পরিচয় দেওয়া উচিত নয়। ব্রাহ্মগণের মধ্যে সকলের মতের ঐক্য নাই সুতরাং একটী বিদ্যালয়েও সেই অনৈক্যজ্ঞাপক পুস্তক পড়াইবার যুক্তিযুক্ততা বোধগম্য হইতেছে না।

দ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মত না বলিয়া দার্শনিক মত নামে অভিহিত করিলেও ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কোন একটী দার্শনিক মতে বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত হওয়া আবশ্যক। সকলের এক মত হইবে, সে আশা অবশ্যই করা উচিত নয়। কিন্তু সকল সময় যেমন অধিকাংশের ভাবে আমরা পরিচিত হই এবং কার্য্য করি এখানেও তাহাই হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যে দুইটী মতকে সীতানাথ বাবু দার্শনিক মত বলিয়া অনৈক্য থাকিলেও ক্ষতি নাই মনে করিতেছেন, বাস্তবিক তাহা দার্শনিক মত হইলেও এই দার্শনিক মতের সহিত ধর্ম্মের যেরূপ ঘনিষ্ট যোগ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাতে এই উভয় মত সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার মীমাংসা না থাকিলে ধর্ম্মসমাজের কার্য্য কোন রূপেই চলিতে পারে না। কারণ সীতানাথ বাবু নিজেই বলিতেছেন "ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সত্য যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে গেলেই কোন না কোন দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে হইবে" সুতরাং ধর্ম্ম শিক্ষার পক্ষে দার্শনিক মত যখন উপেক্ষার বিষয় নয় এবং তাহা অগ্রাহ্য করিলে যখন কার্য্য চলে না, তখন তাহা কেন একটী মূল মত মধ্যে পরিগণিত হইবে না? আবার সীতানাথ বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের যে কয়েকটী মূল সত্যের কথা তাঁহার পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে এই দার্শনিক মতকে অগ্রাহ্য করিলে সেই মূল সত্যই দাঁড়ায় না। তিনি "ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধকে ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী মূল সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি ঈশ্বর ও আত্মায় কোনরূপ পার্থক্য না থাকে, যদি আত্মা ও পরমাত্মা একই বস্তু হয়, তাহা হইলে ত তাহাদের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকিবার কথা আসে না। দুই ভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুতেই সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে—সম্বন্ধ আছে কিনা সে বিচার হইতে পারে। কিন্তু একই বস্তুর যদি ভিন্ন ভিন্ন দুইটী নাম দেওয়া হয়, তাহা হইলে ত আর সম্বন্ধ থাকা না থাকার কথা আসে না। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দার্শনিক মতকে এক প্রকার মূল মতের মধ্যে গণ্য করিয়াছেন যে আত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। অন্যথা সাক্ষাৎ বা অসাক্ষাৎ সম্বন্ধ কথাটার কোন অর্থই থাকে না। যখন দার্শনিক মতের সহিত ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল সত্যের এরূপ ঘনিষ্ট অকাট্য যোগ আছে, তখন তাহাকে দার্শনিক মত বা অবান্তর মত বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এই দ্বৈতবাদকে ব্রাহ্মসমাজে চিরদিনই আপনাদের একটী মূল মত বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। তাহা না হইলে আরাধনার সময় তুমি বলিয়া সম্বোধন করিবার, প্রার্থনার সময় তুমি বলিয়া প্রার্থনা করিবার কোন হেতুই থাকে না। দ্বৈতবাদী ভিন্ন অদ্বৈতবাদীর পক্ষে আরাধনা প্রার্থনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যে মনে করে সে নিজেই ঈশ্বর সে আবার কাহার আরাধনা করিবে? এবং কাহার নিকট প্রার্থনা করিবে? তাহার নিকট পাপ পুণ্যের কোন অর্থ নাই। পরিত্রাণ বা আত্মার উন্নতি, ও অবনতির কোন অর্থ নাই।

আমার পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম, যদি সর্ব্ববাদীসম্মত পুস্তক না থাকে, তবে শিক্ষকগণ বক্তৃতা দ্বারা শিক্ষা দিতে পারেন। তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে "কেবল বক্তৃতাদ্বারা ভাল শিক্ষা হয় না..." এসম্বন্ধে সাকারোপাসকগণের একটী কথা মনে পড়িতেছে, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে ঈশ্বর নিরাকার তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাধারণ লোকে তাহা বুঝিতে পারে না; সুতরাং সাকারোপাসনার ব্যবস্থাই কল্যাণকর। বক্তৃতাদ্বারা ভাল শিক্ষা হয় না, সুতরাং পরস্পর অনৈক্য এবং বিরোধী মতের পুস্তকই পড়াইতে হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত সেইরূপ। বাস্তবিক চেষ্টা করিলে একবিধ শিক্ষা দেওয়া যায় না, এরূপ কথার কোন মূল্য নাই। যদি সেরূপ একবিধ শিক্ষা দিবার সম্ভাবনা না থাকে তবে এ কার্য্যের চেষ্টা করিবার কি প্রয়োজন আছে? কতকগুলি পরস্পর বিরোধী মত বা তর্কপ্রণালী শিক্ষা দেওয়া ত আর বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু যাহাতে শিক্ষার্থী ধর্ম্ম বিশ্বাস পাইতে পারে, ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইতে পারে, তাহাই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। সে বিষয়ে যাহাতে সাহায্য হয় তাহা করিলেই ভাল দেখায় না? নতুবা যে সকল মতে নিজেরাই ঐক্য হইতে পারেন নাই, সেই সকল জটিল মতের গোলযোগে বালকদিগকে জড়াইতে যাওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে।

হয় না বরং নিজেরাই না হয় এক মত হইতে চেষ্টা করুন, তাহার পর অন্যকে শিক্ষা প্রদান করিবেন। এখন ধর্ম্মভাবোদ্দিপক শিক্ষা দিলেই ভাল হয় না?

সীতানাথ বাবুর অন্যান্য কথার উত্তর প্রদান করিয়া আমার কোন লাভ নাই। তাঁহার সঙ্গে যে আমার মতের ঐক্য হইবে না, এ কথায় তাঁহার সহিত আমার মতের ঐক্য আছে। সহজ জ্ঞান ও প্রত্যেক বিষয় জ্ঞানের সহিত আমি আছি এই জ্ঞানকে যখন তিনি এক করিয়া লইয়াছেন এবং এই আত্ম-জ্ঞানে তিনি বিশ্বাসী বলিয়া সহজ জ্ঞানেও আস্থাবান বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তখন আর তাঁহার সহিত এ বিষয়ে কোন কথা না বলাই ভাল। আমার কথা পত্রে যথেষ্ট বলিয়াছি, ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের কমিটিতে যাইয়া আবার কি বলিব? তাঁহারা যদি আবশ্যক বোধ করেন, তাহা হইলে আমার পত্র পাঠ করিয়াই যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন করিতে পারিবেন। আমার কমিটির নিকট যাইবার প্রয়োজন দেখি না। সীতানাথ বাবু ভিন্নও ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অন্য লোক আছেন বলিয়া আমি জানি; এ জন্যই আমার পূর্ব্ব পত্রে লিখিয়াছিলাম যে ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণের সহিত আমার এ বিষয়ে আলাপ হইয়াছে। ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এরূপ পরস্পর বিরোধীমতাক্রান্ত পুস্তক একটী বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে আর নির্ব্বাচন না করেন, আমার এই শেষ অনুরোধ। এ বিষয়ে আমার আর কিছু বলিবার নাই।

অনুগত,

১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীর প্রাপ্তপ্রবন্ধ লেখক।

ব্রাহ্মসমাজ।

দানপ্রাপ্তি—পরলোকগত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের কন্যাগণ যে শ্রাদ্ধ করিয়াছেন তদুপলক্ষে শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী ঘোষ (শ্রীযুক্ত বাবু দুকড়ি ঘোষ মহাশয়ের স্ত্রী) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ২০৲, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ডে ১০৲, দাতব্য বিভাগে ২০৲, ব্রাহ্ম বালিকা-বোর্ডিংএ ১০৲ এবং ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়ে ১০৲; এবং শ্রীযুক্তা কৈলাসকামিনী ঘোষ (৺ গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ১০৲ দান করিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত এই দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

নামকরণ—১১ই আশ্বিন রবিবার কুমিল্লা ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক বাবু অক্ষয়কুমার সেনের চতুর্থ পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্ম-পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হয়। বালকের জ্যেষ্ঠতাত বাবু জয়শঙ্কর সেন, বালকের নাম "ধর্ম্মদাস" রাখেন। অক্ষয় বাবু এতদুপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲ একটাকা দান করিয়াছেন।

প্রচার—পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মান্দ্রাজ হইতে তাঁহার কার্য্যের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন।

২৩এ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—আমি কলিকট নগর হইতে কোইম্বাটুরে ফিরিয়া আসি। সেখানে কয়েক ঘণ্টা মাত্র ছিলাম, তাহার মধ্যে সেখানকার ব্রাহ্মদিগের সহিত বিশেষ উপাসনা হয়, উপাসনাকালে ইংরাজীতে উপদেশ দিয়াছিলাম এবং একজন তামিল ভাষাতে অনুবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন।

সে দিন রাত্রে সেখান হইতে যাত্রা করিয়া পর দিন ট্রিচিনোপলি নগরে উপস্থিত হই। ট্রিচিনোপলিতে কোন ব্রাহ্ম সমাজ নাই। কিন্তু আর্য্যতত্ত্ব বিদ্যাশালা—হিন্দু Theological School আছে। তাহার সভ্যগণ আমাকে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই সকল স্থানে এক দিকে হিন্দু ধর্ম্মের যেরূপ প্রতাপ, অন্য দিকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের তেমনি জয়। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুগণ এতই ঘৃণিত ও পদদলিত যে তাহারা দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। আপনারা শুনিয়া অবাক হইবেন এই ট্রিচিনোপলি সহরে ৮০,০০০ লোকের মধ্যে প্রায় ১৯,০০০ খ্রীষ্টান। রোমানকাথলিক অনেক। এখানকার খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে জাতিভেদ আছে। এই প্রদেশে কোন কোন ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টানেরা পৈতা রাখে। রোমানকাথলিক গির্জাতে ব্রাহ্মণ খ্রীষ্টানের স্বতন্ত্র বেঞ্চ, শূদ্র খ্রীষ্টানের স্বতন্ত্র বেঞ্চ। এখানকার হিন্দুগণ যেমন মধ্যে মধ্যে ধুমধাম করিয়া ঠাকুর বাহির করে, রোমানকাথলিকগণও জাঁকজমক করিয়া যীশু, মেরী, যোসেফ প্রভৃতির মূর্ত্তি বাহির করিয়া থাকে। এখানে হিন্দুরা যত দেবদেবীর পূজা দেয়, তন্মধ্যে মেরী আত্তা নামে এক দেবী আছে। ঠিক আমাদের দেশের ওলাবিবীর ন্যায়। মেরী আত্তার অর্থ মেরী মাতা। এই দেবীর উৎপত্তি বিবরণ কেহ দিতে পারে না। অনুমানে বোধ হয় যীশুর জননী মেরী, মেরী আত্তা রূপে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু যীশুর জননী শান্তির মূর্ত্তি। মেরী আত্তা ভয়ঙ্করী। এ প্রদেশে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের খুব আধিপত্য।

২৫এ অক্টোবর, শনিবার—এখানকার ন্যাশনাল স্কুল গৃহে, "বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্ম শিক্ষা" এই বিষয়ে ইংরাজীতে বক্তৃতা হয়। এখানকার ডিষ্ট্রীক্ট মুন্সেফ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং স্থানীয় শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিদিগের অনেকে সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

২৬এ অক্টোবর, রবিবার—ট্রিচিনোপলি হইতে যাত্রা করিয়া ২৭এ অক্টোবর আমরা বাঙ্গালোর নগরে উপস্থিত হই। ট্রিচিনোপলি হইতে তাঞ্জোর কম্বকোনম প্রভৃতি স্থানে যাইবার ইচ্ছা ছিল। বিশেষ কারণে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করিতে হইল।

২৭এ অক্টোবর, সোমবার—বাঙ্গালোরে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্য বিষয়ে আলোচনা হয়।

২৮এ অক্টোবর, মঙ্গলবার—এখানকার স্কুল গৃহে "ভারতে ধর্ম্মবিপ্লব ও তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দায়িত্ব" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়।

২৯এ অক্টোবর, বুধবার—ইংরাজীতে উপাসনা ও "উপাসনা ও প্রার্থনার আবশ্যকতা" বিষয়ে ইংরাজীতে উপদেশ।

৩০এ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—আবার মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিয়াছি।

৩১এ অক্টোবর, শুক্রবার—মান্দ্রাজের উপাসনা মন্দিরে ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য ও কার্য্য বিষয়ে কথোপকথন সভা হয়। উক্ত

সভাতে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্যের বিষয় বিশদরূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি।

বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী শিলচর হইতে তথাকার উৎসবের নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠাইয়াছেন।

৮ই অক্টোবর, বুধবার—প্রাতে বাবু ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে উপাসনা হয়। ঢাকাস্থ শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয় উপাসনা করেন।

৯ই বৃহস্পতিবার—প্রাতে সমাজে উপাসনা করি। উপদেশের বিষয় "ঈশ্বরই জীবনের দৃঢ় ভিত্তি।" মধ্যাহ্নে বাবু বসন্তকুমার রায়ের বাসায় খাসিয়া ভাষায় উপাসনা করি। পরে আলোচনা হয়। রাত্রে বাবু রাইমোহন ভট্টের বাসায় কালী নারায়ণ বাবু উপাসনা করেন।

১০ই অক্টোবর, শুক্রবার—প্রাতে বাবু মদনমোহন দত্তের বাসায় উপাসনা করি। উপদেশের বিষয় "বিশ্বাসই ধর্ম্মরাজ্যে মূল ধন।" সন্ধ্যার পরে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। বাজারে অনেক লোক একত্রিত হইলে "ধর্ম্মের আবশ্যকতা এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্মই সত্য ধর্ম্ম" এই বিষয়ে কিছু বলি। কিছু দূর গিয়া আর এক স্থানে কালীনারায়ণ বাবু কিছু বলেন।

১১ই অক্টোবর, শনিবার—প্রাতে বাবু জগৎ চন্দ্র দাসের বাসায় উপাসনা করি।' সন্ধ্যার পরে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট স্কুল গৃহে "ধর্ম্মের প্রাণ" এই বিষয়ে বক্তৃতা করি।

১২ই অক্টোবর, রবিবার—উৎসবের বিশেষ দিন। বাড়ী বাড়ী গিয়া উষা কীর্ত্তন করা হয়। পরে সমাজে উপাসনা করি। উপদেশের বিষয়—"দীনতা"। অপরাহ্ণে "উপাসনার আবশ্যকতা" বিষয়ে আলোচনা ও কীর্ত্তন। রাত্রে কালীনারায়ণ বাবু উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। ৩ জন খাসিয়া রমণী উপস্থিত ছিলেন, আমি "আত্মার ক্ষুধা" বিষয়ে খাসিয়া ভাষায় উপদেশ দিই।

১৩ই অক্টোবর, সোমবার—প্রাতে বাবু গোবিন্দনারায়ণ গুপ্তের বাসায় উপাসনা করি। উপদেশের বিষয়—"ব্যাকুলতাই ঈশ্বর লাভের উপায় দেখাইয়া দেয়।" বৈকালে বক্তৃতার কথা ছিল, বৃষ্টির জন্ত হইল না। দেখা সাক্ষাৎ করা যায়।

১৪ই অক্টোবর, মঙ্গলবার—প্রাতে বাবু জগৎ চন্দ্র দাসের বাসায় উপাসনা করি। উপদেশের বিষয়—"পরমাত্মা ও জীবাত্মার বিবাহ।" রাত্রে বাবু বসন্তকুমার রায়ের বাসায় তাঁহার কন্যার নামকরণ হয়। বাঙ্গালাতে উপাসনা করি। "পিতামাতার দায়িত্ব" সম্বন্ধে খাসিয়া ভাষায় উপদেশ দেওয়া হয়। বলা আবশ্যক বসন্ত বাবুর পত্নী একজন খাসিয়া রমণী।

১৫ই অক্টোবর, বুধবার—প্রাতে সমাজে উপাসনা হয়। মধ্যাহ্নে বাবু শারদাচরণ নন্দীর বাসায় কালীনারায়ণ বাবু উপাসনা করেন। স্ত্রীলোকদিগকে আমি "ক্রিয়া কলাপ কিছু নয়, বিশ্বাস ও ভক্তিই ধর্ম্মের সার" এই বিষয়ে উপদেশ দিই। রাত্রে বাবু জগৎ চন্দ্র দাসের বাসায় কালীনারায়ণ বাবু উপাসনা করেন।

১৬ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার—প্রাতে শারদা বাবু সমাজে উপাসনা করেন। রাত্রে গভর্ণমেণ্ট স্কুল গৃহে "রামমোহন রায় এবং একেশ্বরবাদ" এই বিষয়ে বক্তৃতা করি।

১৭ই অক্টোবর, শুক্রবার—প্রাতে সমাজে উপাসনা করি। রাত্রে সমাজের অবস্থার বিষয় আলোচনা করিবার জন্ত এক সভা হয়। তাহাতে প্রার্থনা করি।

১৮ই অক্টোবর, শনিবার—অপরাহ্ণে বাবু জগৎ চন্দ্র দাসের গৃহে মহিলাদের উৎসব হয়। কালীনারায়ণ বাবু উপাসনা করেন। আমি উপদেশ দিই। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—সমস্ত মানবজাতি একটী শরীর; নারীজাতি সেই শরীরের অর্দ্ধেক। জ্ঞান ও ধর্ম্ম সেই শরীরের প্রাণ। অর্দ্ধেক শরীর যদি পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যায়, তবে অপরার্দ্ধের যেমন কোনও কায ভালরূপে হয় না, সেইরূপ নারীজাতি যদি জ্ঞান ও ধর্ম্মে বঞ্চিত থাকে, তবে কেবল মাত্র পুরুষের দ্বারা সমাজের উন্নতি হয় না। পরে ধর্ম্মের সার কি তাহা বুঝান হয়।

১৯এ অক্টোবর, রবিবার—প্রাতে বাবু জগৎ চন্দ্র দাসের বাসায় উপাসনা করি।

শোক সংবাদ—গভীর শোক সহকারে আমাদের পাঠকবর্গকে জানাইতে হইল যে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অকৃত্রিম বন্ধু, কোন্নগর নিবাসী শিবচন্দ্র দেব মহাশয়, প্রায় অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমে আমাশয় রোগে গত বুধবার প্রাতঃকালে কলিকাতা নগরে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। শিবচন্দ্র বাবুর স্বলিখিত জীবনচরিতের সারাংশ আমরা অন্যত্র প্রকাশ করিলাম। শিবচন্দ্র বাবু ব্রাহ্ম সমাজ সকলের বিশেষভাবে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ হিতৈষী ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে আমরা একজন অভিভাবক ও সহায় হারা হইলাম। তাঁহার মত লোকের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হওয়া যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে কত ক্ষতিজনক তাহার বর্ণনা হয় না। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছারই জয় হউক। তাঁহার ইচ্ছা হইল তাই তিনি আপন প্রিয় সন্তানকে ডাকিয়া লইলেন। আমাদের আপত্তি করিবার কি আছে। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমে পরিবর্দ্ধিত করিয়া অনন্তকুশলের সহিত রক্ষা করুন এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারে শান্তি প্রদান করুন এই প্রার্থনা। তাঁহার যে বিশেষ কোন কঠিন ব্যারাম হইয়াছিল তাঁহার অতি ঘনিষ্ট আত্মীয়গণও তাহা বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্মগণ সে বিষয়ে বেশী সংবাদ জানিতেন না। তাঁহার পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন। তৎপর তাঁহাকে নিমতলায় লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে আবার প্রার্থনা হইলে তাঁহার দেহ দাহকার্য্য সমাধা করা হয়। অতি অল্প সময়ের সংবাদেই বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম তাঁহার শবের সহিত নিমতলায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস তাঁহার সম্মানার্থ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয় এবং বিদ্যালয় ও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন বন্ধ করা হইয়াছিল। তৎপর দিবসে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক বিশেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

"Resolved that this meeting deems it a sacred duty to place on record its sense of the profound loss the S. B. Samaj has suffered by the death of Babu Shib Chandra Deb, who was one of those that by their strenuous labours helped to found the S. B. Samaj, was its first Secretary and for many years its President, serving it in these capacities, notwithstanding the infirmities of old age, with an earnestness and devotion unapproached even by those of its members who are in the prime of life, and continuing his earnest interest and exertions in its behalf to the close of his long and most worthy earthly career; whose life was an example of unostentatious piety and unflagging efforts for the welfare of his countrymen, and in whom was realised with a degree of success seldom met with among his contemporaries that ideal of a harmony of godliness with fidelity to secular duties which has been always cherished by the Brahmo Samaj.

"Resolved also that this meeting expresses its sincere condolence with the bereaved family of our venerable departed brother, and that a copy of the above Resolution be sent to them."

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৫ই অগ্রহায়ণ মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে ৬ই অগ্রহায়ণ প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
১৬শ সংখ্যা।

১৬ই অগ্রহায়ণ সোমবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥•
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

হৃদয়ের নদী।

হৃদয়ের ক্ষুদ্র নদী মোর
ছুটিছে অনন্ত-মনে সাগর-সঙ্গমে,
দেখো দেব বাধা যেন তায়
দিতে নারে মোহময় স্থাবর জঙ্গমে;
পথে তার কত বাধা আছে,
অনন্ত হৃদয়ে আছে রাক্ষসী সাহারা।
তৃষিত পাষাণ যত, তারে
চারিধারে হাহাকারে অন্বেষিছে তারা।
ওই দেখ শুখাতে তাহায়,
ছুটিয়া আসিছে তপ্ত রবির কিরণ,
কে তাঁহারে স্নেহে ঢেকে রবে,
এ বিপদে কে করে গো স্নেহ বরিষণ।
লও দেব ডেকে লও তারে,
দেখাও মহান্ তব বারিধি প্রেমের,
সিন্ধু-প্রাণে মিশাইয়া প্রাণ
মিটুক বাসনা তার অতৃপ্ত প্রাণের।

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে জ্ঞানদাতা পিতা! আমরা অজ্ঞ, আমাদের দৃষ্টি নানা প্রকার আবরণে আবৃত; তাই প্রকৃত তত্ত্ব আমরা অতি অল্পই বুঝিতে পারি। আমরা যাহা কিছু চারিদিকে দেখিতেছি সে সমস্তই স্থূল। আমরা চারিদিকের স্থূল পদার্থ সকল দ্বারাই বেষ্টিত। সুতরাং এই সকল স্থূল পদার্থের অতীত জ্ঞানময় সত্তার অস্তিত্ব আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের আত্মা নিজে চৈতন্যময় হইয়াও চারিদিকের অচেতন জড় পদার্থ দ্বারা এরূপ বশীভূত হইয়া আছে, যে আমরা কিছুতেই এ সকল বাহিরের আবরণ অতিক্রম করিতে পারিতেছি না। আমরা যে পরিমাণে পার্থিব ধন রত্নের উপর নির্ভর করি এবং তাহার অভাবে ক্লিষ্ট হই, সে পরিমাণে তোমার উপর নির্ভর করিতে পারি না এবং তোমার অভাবে আমাদের সেরূপ কষ্ট হয় না। বাহিরের অবলম্বনকেই আমরা অতি সহজে আশ্রয় করিতে চাই, আমাদের শারীরিক প্রয়োজন যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহাকেই অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করি। প্রাণের পরিপোষণকারী কিছু পাইবার জন্য তেমন ব্যগ্র হই না এবং তাহার অভাবে আমাদের তেমন কোন ক্ষতি হইল বলিয়া কষ্টানুভব হয় না। আমাদের অজ্ঞানতায় সর্ব্বদাই আমাদিগের এই গূঢ় অবিশ্বাসের পরিচয় প্রকাশ পাইয়া থাকে। জ্ঞানময় ও চৈতন্যময় যে তুমি তোমাকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় জ্ঞান করিতে পারি না এবং তোমার অভাব আমাদের নিকট তেমন অধিক কষ্টকর জ্ঞান হয় না। প্রভু পরমেশ্বর! আমাদিগের অজ্ঞানতা তুমি দূর না করিলে এবং এই স্থূল পদার্থের প্রতিই যে আমাদের অধিক নির্ভর ও মমতা, তাহা দূর করিয়া জ্ঞানময় ও চৈতন্যময় তোমার প্রতি আস্থা ও নির্ভরের ভাব বৃদ্ধি না করিলে, আমাদের আর কোন গতি নাই। শারীরিক প্রয়োজনকে অধিকতম মনে হয় বলিয়াই, আমরা আত্মার প্রতি বেশী পরিমাণে উদাসীন হই। সুতরাং প্রকৃত কল্যাণ হইতে আমরা অনেক দূরে থাকিতে বাধ্য হইতেছি। হে পিতা তুমি কৃপা কর অজ্ঞানতা দূর কর। প্রকৃত দৃষ্টি খুলিয়া দেও, আমাদের অভাব জানিতে এবং তাহা মোচনের উপায় অবলম্বন করিতে আমাদিগকে সক্ষম কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বিলাসিতা ও পরিচ্ছন্নতা—বর্ত্তমান সময় ঘোর বিলাসিতার সময়। পরিমিত ভাব রক্ষা করা বড় কঠিন, অনেকে পরিচ্ছন্নতার নাম দিয়া ঘোর বিলাসী হইতেছেন। পরিচ্ছন্নতা প্রশংসনীয়, ইহাতে শরীর মনের কল্যাণ হয়। কিন্তু বিলাসিতা নিন্দার কারণ, ইহাতে আত্মার অধোগতি হয়। এ দুইকে পৃথক করা খুব কঠিন না হইলেও বাছিয়া লওয়া খুব সহজ নয়। সুখপ্রিয়তা নানা আকারে প্রাণের ভিতর বাস করে, বিলাসিতা তাহারই প্রকাশ। ইহাতে মানুষকে পশু-প্রকৃতিবিশিষ্ট করে, অপব্যয়ী করে এবং প্রদর্শনের ইচ্ছাকে প্রবল করে—পরিচ্ছন্নতা আত্মাকে শান্ত করে, মিতব্যয়ী করে এবং বাহিরে প্রদর্শনের ইচ্ছা একবারেই চলিয়া যায়। প্রত্যেক লোকের আত্মানুসন্ধান দ্বারা এই সব লক্ষণ নিজের মধ্যে আছে কি না, তাহা বুঝিয়া লওয়া উচিত। প্রত্যেকেই পরিচ্ছন্ন হইবেন, কিন্তু বিলাসী

হইবেন না। ইহাদিগকে পুণ্য এবং পাপের ন্যায় গ্রহণ করিবেন দরিদ্র ব্রাহ্মদের খুব সাবধান হওয়া উচিত; শেষে যেন অপব্যয়ে আত্ম-বিনাশ না করেন। ব্রাহ্মের গৃহ দেব গৃহ হইবে, কিন্তু ভোগ বিলাসের বৈঠকখানা হইবে না, ইহা ঋষিদের রমণীয় আশ্রম হইবে, কিন্তু ধনীর ভোগ বিলাসের আলয় হইবে না। পরিচ্ছন্নতায় ঈশ্বর বিরাজ করেন; বিলাসিতা হইতে যেন ঈশ্বর দূরে অবস্থিতি করেন।

উদারতা—প্রকৃত উদারতা অতি মহৎ বস্তু। ইহাতে আত্মার প্রশস্ততা বৃদ্ধি করে, অসাম্প্রদায়িক ভাবে সত্য গ্রহণে সক্ষম করে, ইহা মানব আত্মার একটী অতি সুন্দর ভূষণ। কিন্তু ইহা রক্ষা করা বড় কঠিন ব্যাপার। কারণ নিজের মত ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়া অন্যের কথা শুনা এবং অপক্ষপাতে সত্যকে আদর করা খুব সহজ কথা নয়। একরূপ উদারতা আছে, তাহাকে উদারতা না বলিয়া উদাসীনতা বলা যায়। কোন মতেই আস্থা নাই, নিজের একটা দৃঢ় বিশ্বাস নাই, বলিতে কি ঈশ্বরের প্রতিই উদাসীনতা। তবে কোন সম্প্রদায়ের সহিত যোগ আছে বটে। ইহাদের উদারতা দেখান সহজ, কিন্তু যাহাকে বলে ধর্ম্মে গোঁড়া এরূপ লোকের উদার হওয়া বড়ই কঠিন। তাহাদের বিশ্বাস প্রশংসনীয় কিন্তু মন যেন সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহারা অন্যের সঙ্গে মিলিতে এবং কথা শুনিতেই পাপ মনে করে। আমরা মনে করি ইহাও প্রকৃত বিশ্বাস নয়। কেন না ইহার মূলে এই ভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, যে পাছে আমার বিশ্বাস টলিয়া যায়। যে বিশ্বাস এরূপ সহজেই টলে, তাহাকে প্রকৃত বিশ্বাস বলা যায় না। প্রত্যেক ব্রাহ্ম প্রকৃত বিশ্বাসী হইবেন, ব্রাহ্ম ধর্ম্মে গোঁড়া হইবেন, কিন্তু তাহারই সঙ্গে উদারও হইবেন। অনেক ব্রাহ্ম যে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইয়া উদারতা দেখান, তাহা প্রকৃত উদারতা নয়। তাহা জীবন হীনতারই বা অবিশ্বাসেরই পরিচয় দেয়। বিশ্বাসী হউন, নিজের স্থানে নিজে দৃঢ় হইয়া উদার হউন, ইহাই প্রার্থনীয়।

ব্রাহ্মসমিতি—বিগত বৎসর জাতীয় মহাসম্মিলন উপলক্ষে বোম্বাই নগরে একেশ্বরবাদীগণেরও একটী সম্মিলন সভা হইয়াছিল। তাহাতে পরলোকগত নবীনচন্দ্র রায় মহাশয় উক্ত সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তাঁহাকে এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই ইহলোক ত্যাগ করিতে হইল। বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা নগরে জাতীয় সমিতির যে অধিবেশন হইবে, সে সময়ে নানাস্থান হইতে সমাগত একেশ্বরবাদীগণেরও সম্মিলন সভা হইবে। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় পরলোকগত হওয়ায় উক্ত সভাধিবেশন সম্বন্ধীয় পূর্ব্বাহ্নিক অনুষ্ঠানের জন্য যাহা করা আবশ্যক তাহার কিছুই সম্পন্ন হয় নাই। এরূপ সুযোগে একেশ্বরবাদীগণের সম্মিলন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। অথচ পুনরায় সভার অধিবেশন না হইলে সম্পাদক নিযুক্ত হইবারও কোন উপায় নাই। এজন্য আমরা ব্রাহ্মগণকে উক্ত সভায় উপস্থিত হইবার জন্য এবং তাহাতে কি কি বিষয় আলোচিত হওয়া প্রয়োজন, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। কি কি বিষয়ের আলোচনা উক্ত সভায় হইবে, সে সম্বন্ধে যদি প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজ চিন্তা করিয়া আপনাদিগের মন্তব্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উক্ত সভায় অতি সহজেই সে সকল বিষয় আলোচিত হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত গত বৎসর যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, অথচ কার্য্যতঃ বিশেষ কিছু হইয়া উঠে নাই, সে সমস্ত বিষয়েরও পুনরালোচনা হইতে পারে। ব্রাহ্ম বন্ধুগণকে এ বিষয়ে এখন হইতে বিশেষ মনোযোগী হইবার জন্য আমরা অনুরোধ করিতেছি।

বিদেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্ম বন্ধুগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য—বিশেষতঃ যাঁহারা কোন প্রতিকূলতায় জাতীয় সমিতিতে প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, অথচ ব্রাহ্মসমিতিতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের এখানে অবস্থিতি প্রভৃতির সুবিধা করিয়া দিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটী কমিটির উপর ভারার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষ হইতে আমরা বিদেশস্থ বন্ধুগণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি। জাতীয় সমিতির জন্য না হইলেও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মগণের মধ্যে একতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে এবং ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়তার জন্যও ব্রাহ্মগণের এরূপ সম্মিলনে উপস্থিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। আশা করি ব্রাহ্ম বন্ধুগণ এই সুযোগে উক্ত সভায় উপস্থিত হইতে বিশেষ যত্ন করিবেন।

ব্রাহ্মসমাজে নবপ্রবিষ্টযুবকগণ—ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহ হইতে বাবু দ্বারকানাথ সরকার মহাশয় তত্ত্বকৌমুদীতে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা দ্বারা তিনি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মসমাজে নবাগত যুবকগণের প্রতি অধিক বয়স্কদিগের তেমন দৃষ্টি নাই এবং তাহাদিগের জীবন গঠনের পক্ষে—সাধু-বাসনা পূর্ণ হইবার পক্ষে যাদৃশ সাহায্য প্রাচীনদিগের করা আবশ্যক, তাহা ত করা হয়ই না বরং তাহাদিগকে নিরুৎসাহী হইবার পক্ষেই যেন সহায়তা করা হয়। সম্প্রতি কালীকচ্ছ হইতে আর একখানা পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে যুবকগণের সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের অধিক বয়স্কগণ যে উদাসীন, তাহাদিগকে যে প্রীতি প্রদানে অপ্রস্তুত, এরূপ অভিযোগ আরোপিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম যুবকগণের প্রতি বাস্তবিকই প্রাচীনগণের স্নেহের অভাব কিম্বা তাহাদের সহিত কোনরূপ বিরোধাত্মক ভাব না থাকিলেও তাহাদিগের জন্য যাদৃশ যত্ন প্রয়োগ করা উচিত, তদনুরূপ যত্ন চেষ্টার ত্রুটী যে আছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যত্ন চেষ্টার ত্রুটী থাকায় অনেক স্থলে বিশেষ ক্ষতিও হইতেছে। এজন্য ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণের যাহা করা উচিত, সে বিষয়ে অনেক পরিমাণে শিথিলতাও দৃষ্ট হয়। এই শিথিলতার জন্য উভয় শ্রেণীস্থ লোকেরই দোষ আছে, যুবকদিগের যাদৃশ আগ্রহ থাকিলে প্রবীণদিগের সহানুভূতি এবং স্নেহ তাঁহাদিগের প্রতি সহজে যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনেক পরিমাণে ত্রুটী লক্ষিত হয়। আমরা আশা করি যুবকগণ এবং প্রবীণগণ সম্মিলিত হইয়া যাহাতে সমাজের কার্য্যে নিযুক্ত

হইতে পারেন, এমন কোন সদুপায় সত্বর অবলম্বিত হইবে। ছাত্র সমাজের সভ্যগণ চেষ্টা করিলে এরূপ সম্মিলন স্থান অতি সহজেই করিতে পারেন। তাঁহাদের সামাজিক সম্মিলনের ন্যায় অন্য একটী ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা স্থল থাকা আবশ্যক। এবং এই উভয় স্থলেই যদি প্রবীণগণ যোগ দেন, তাহা হইলে অনেক পরিমাণে পরস্পরের প্রতি উদাসীনতা বিদূরিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে দুইবল একত্রিত হইয়া কার্য্য করিবার সুবিধা হইতে পারে। ব্রাহ্ম যুবকগণের মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইবার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত পত্রখানা হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। পত্রখানা এই—

"উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অভাব বৃদ্ধি হয়। দিন দিন ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি হইতেছে, আর ইহার নানা বিভাগে নানাপ্রকার অভাবও দৃষ্ট হইতেছে। অভাব অনুভূতি যেমন অবশ্যম্ভাবী, অভাব পূরণের জন্য যত্ন ও চেষ্টাও তেমনি অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজ যে এই সম্বন্ধে কিছুই করিতেছেন না, আমরা কখনও বলিব না। তবে সকল সময় সকল বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারিতেছেন না, তাহাতে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে। কতকগুলি বিষয় আছে যাহাতে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। তাহার প্রতি উপেক্ষা করিলে সমাজের গতি অবরুদ্ধ হয়। এতদিন ব্রাহ্ম বালিকাদিগের শিক্ষা লাভের একটী বিশেষ অভাব ছিল, সম্প্রতি একটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; আশা করি তাহা স্থায়ী হইলে একটী বিশেষ অভাব পূর্ণ হইবে। কিন্তু আর একটী গুরুতর অভাব আছে, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের ভাবী উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এমন কি বালিকা শিক্ষালয় হইতেও তাহার প্রয়োজনীয়তা অধিক। ব্রাহ্মবালিকাদিগের শিক্ষার জন্য আপন আপন গৃহ আছে, পিতা মাতা সুশিক্ষা দিতে ইচ্ছা করিলে অনেকটা দিতে পারেন। কিন্তু বৎসর বৎসর যে সকল যুবক স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংসারের সুখ বিসর্জ্জন দিয়া, ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতেছে, তাহাদের ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষার জন্য ব্রাহ্মসমাজ কি করিতেছেন? ছাত্রসমাজ আছে স্বীকার করি, কিন্তু ছাত্রসমাজের ভাসা ভাসা শিক্ষাতে স্থায়ী ফল কিছুই হয় না। ছাত্রসমাজ আকর্ষণ করিতে পারে, রক্ষা করিতে পারে না। ধর্ম্ম জীবন লাভ আপনার যত্ন ও চেষ্টা ভিন্ন হইতে পারে না বিশ্বাস করি, কিন্তু ইহাও শিক্ষা সাপেক্ষ। যুবকদিগকে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া, শেষে আঁধারে ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে। যুবকগণ অনন্ত আশা, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করে, দুই দিন পরে নিরাশ হইয়া কেহ কেহ ফিরিয়া যায়। যাহারা থাকে তাহারাও অনেকে অবসন্ন ও উৎসাহ উদ্যম হীন হইয়া জীবন যাপন করে। এইরূপে কয় দিন চলিতে পারে? যখন বিষম দিন আসে, তখন মৃত সঞ্জীবনী ব্রহ্মশক্তি ভিন্ন কিসে রক্ষা করিবে? একদিকে ধর্ম্ম শিক্ষার বিশেষ সুবিধা নাই, অপর দিকে যুবকগণ কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হন, সেই সম্বন্ধে অধিক না বলাই ভাল। যাঁহারা স্নেহের ক্রোড়ে লালিত পালিত, আদরের ক্রোড়ে বর্দ্ধিত, অভাব কি পদার্থ তাহা জানে না, তাহাদিগকে অনেক সময়ই লাঞ্ছনা অবমাননা সহ করিতে হয়। অনেকের মুখেই শুনা যায়, যাহারা সাহায্যের প্রার্থী হইয়া ব্রাহ্মসমাজে আসে, তাহাদের না আসাই ভাল। আমিও বলি না আসাই ভাল। আর দরিদ্র ব্রাহ্মসমাজ হইতে কি সাহায্যই বা আশা করিতে পারে? দুই একজন লোক পদ গৌরব লাভের জন্য অথবা অন্য স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য আসিতে পারে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের যুবকগণের আশা করিবার কিছুই নাই। বরং সাংসারিক যে ক্ষতি হয় ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ হইতে পারে না। তবে সহানুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। অপরিণত বয়স্ক যুবকদের দশ জনের স্নেহ মমতা লাভের জন্য বাসনা কোনরূপ দূষণীয় নহে, সকলেই কিছু আর শুকদেব হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, সকলেই কিছু একদিনে সাধু ধার্ম্মিক হইতে পারে না। যুবকদিগের কথা দূরে থাকুক, প্রবীণ ব্রাহ্মদের মধ্যেও অনেককেই সাংসারিক যাতনায় ক্লিষ্ট হইয়া ধর্ম্মভাবে শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। যুবকদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, নিরাশায় পড়িয়া যখন নির্ভরের ভাব হ্রাস হয়, শুষ্কতায় যখন হৃদয় কঠোর হয়, তখন তাহাদের নির্ব্বাণমুখ আলো কে জ্বালিয়া দেয়? তাহাদিগকে মাণিক দিবে বলিয়া আহ্বান করিয়া শেষে কি উপল খণ্ড দিয়া বিদায় দিবে? যত্নের অভাবে, আদরের অভাবে এমন কি একটুকু সহানুভূতির অভাবে কত যুবক ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্ট হইয়া কক্ষভ্রষ্ট নক্ষত্রের ন্যায় জীবনকে এক অনন্ত দুঃখ কাহিনীপূর্ণ করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজেরও লাভ হইতেছে না, দেশেরও অশেষ ক্ষতি হইতেছে। যুবকদের কি একটা সম্মিলন ক্ষেত্র করা যাইতে পারে না? বক্তৃতা উপদেশের বিশেষ দরকার নাই, ব্রাহ্মবন্ধু সভার পরিণতি দেখিলাম। প্রবীণ ব্রাহ্মদের মধ্যে সহৃদয় কয়েক জন লোক যদি ব্রাহ্ম যুবকদের সহিত মিশিয়া তাহাদের মনের ভাব প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জানিতে চেষ্টা করেন, নিরাশা ও অভাবের সময় যদি স্নেহের হস্ত প্রসারণ করেন, এবং আপনার কনিষ্ঠ ভাই এবং আপনার পুত্রের ন্যায় ধর্ম্ম সাধন ও চরিত্র গঠনের পথ দেখাইয়া দেন, তাহাতে যে সুফল হইবে, এমন আর কিছুতেই নয়। ইহাতে আর্থিক সাহায্যের দরকার হইবে না। সুধু একটু প্রেম বিতরণ, একটু স্নেহ দান, একটু সময় ব্যয়। ইহাতে আর একটী লাভ এই হইবে, যুবকগণও পরস্পরকে জানিতে পারিবে, এবং এক যোগে কাজ করিতে শিখিবে। বর্ত্তমান সময়ে যুবকগণের বৃদ্ধদের প্রতি অশ্রদ্ধা, বৃদ্ধগণের যুবকদের প্রতি হতাদর ও ঘৃণা অনেকটা অজ্ঞতা জনিত। আমরা আশা করি ব্রাহ্মসমাজ এই সম্বন্ধে একটুকু বিশেষ মনোযোগী হইবেন।"

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ

সাধনে নিষ্ঠা।

ধর্ম্মসাধন আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের জন্য। আত্মার শক্তি সকল বিকাশ হওয়া এক মুহূর্ত্তের কাজ নয়। আবার বিকাশের পথে যদি কণ্টক পড়িয়া থাকে, তবে ত তাহা কত

কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তাহা বলাই যায় না। যদি সেই সকল কণ্টক উন্মোচন করিয়া পথে অগ্রসর হইতে কেহ ইচ্ছুক হন, তবে তাহার সাধনে নিষ্ঠা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন, কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে সাধনে নিষ্ঠাবান্ লোক অতি বিরল দেখা যায়।

সাধনে নিষ্ঠা কি? যে সাধনের পথ অবলম্বন করিয়াছ, তাহার ফল না পাওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে বিশেষ দৃঢ়তা, একাগ্রতা এবং সহিষ্ণুতার সহিত অবলম্বন করিয়া থাকাই সাধনে নিষ্ঠা। নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিরা হঠাৎ কোন একটা সাধন ধরেনও না, আবার যাহা ধরেন তাহা হঠাৎ ছাড়েনও না। তাঁহারা যে সাধন অবলম্বন করেন, তাহা নিত্য নিয়মিত রূপে সাধন করিতে থাকেন, দেখা যায় হাজার কাজ নষ্ট হইলেও সাধনের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহা করা আবশ্যক তাহা করিবেনই করিবেন। কোন অনিবার্য্য কারণ ঘটিলে সময় স্থির না রাখিতে পারিলেও সাধনের নিয়ম রক্ষা করেন। যে সাধন অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক বিচার করিয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত বটে। কিন্তু যাহা ধরিবেন, তাহাতে নিষ্ঠা না থাকিলে কখনই তাহাতে সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না।

সাধনে নিষ্ঠা কিসে হয়, সাধন পথ ধরিবার সময় যদি তাহাকে ঈশ্বর-প্রদ পথ বলিয়া বুঝা যায়, যদি তাহাতে জীবন্ত ভাব দেখা যায়, এবং নিজের বিবেক বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলেই তাহাতে নিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা। শুধু বিবেক বিরুদ্ধ নয় বলিয়া কোন সাধন অবলম্বন করিলে, তাহাতে তেমন একটা নিষ্ঠা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাতে একাগ্রতা এবং সহিষ্ণুতা বেশী সময় থাকিতেও পারে না। যদি তাহা ঈশ্বর-প্রদত্ত পরিত্রাণের পথ বলিয়া বিশ্বাস হয় এবং তাহাতে জীবন্ত ভাব দেখা যায়; তাহা হইলেই স্থিরতর নিষ্ঠার সহিত সাধনে তিষ্ঠিয়া থাকা যায়।

সাধনে নিত্য পরিত্রাণের পথ পরিষ্কার দেখা চাই এবং জীবন্ত ভাব পাওয়া চাই। যদি কখন সে পথে অন্ধকার দেখা যায়, তবে ইহা ঈশ্বর-প্রদত্ত পরিত্রাণের পথ এই বিশ্বাস থাকিলেই সাধনে টিকিয়া থাকা যায়। নতুবা সাধনে নিষ্ঠা রক্ষা করা সহজ নয়। অনেক লোক দুদিন বেশ নিয়মমত সময়মত স্বীয় আরাধ্য দেবতার আরাধনা করেন, আবার দেখা যায় উপাসনায় আর সেরূপ অনুরাগ নাই। এইরূপ সাধনে নিষ্ঠা বিহীন হইয়া কেহই ধর্ম্মপথে পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতে পারেন না। শেষে তাঁহারা সাধনেরই নানা দোষ দেখাইয়া পশ্চাৎপদ হন, বলিয়া বেড়ান কৈ ইঁহারা ত নিত্য সাধনে বেশ নিষ্ঠাবান্, তবে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না কেন? যে সাধনে নিয়ম রক্ষা আছে, কিন্তু জীবন্ত ভাব নাই তাহাতে ফল দেখা যায় না। তবে নিষ্ঠাবলে সরল সাধক নিশ্চয়ই ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইবেন ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রাচীন সাধকদিগের নিষ্ঠা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়, যদি বর্ত্তমান সময়ে তাহার সিকি নিষ্ঠাও থাকে, তবেও লোকে সহজে পরিত্রাণের পথে চলিয়া যাইতে পারে। চৈতন্য, বুদ্ধ প্রভৃতির কথা সকলেই জানেন, তাঁহাদের মত লোকদেরও যখন এত নিষ্ঠার প্রয়োজন হইয়াছিল, তখন আমার তোমার কত নিষ্ঠার প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্রাহ্ম কি ঈশ্বর প্রদত্ত পরিত্রাণের পথ, ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী প্রাপ্ত হন নাই? যদি পাইয়া থাকেন, তবে তাহাতে নিষ্ঠাবান্ হওয়া সকলেরই উচিত। তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার হইবে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার হইবে। ব্রাহ্মের ব্রহ্মসাধনে নিষ্ঠা নাই ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় কি? ঈশ্বর প্রত্যেক ব্রাহ্মকে নিষ্ঠাবান্ করুন।

ধর্ম্মক্ষুধা।

যখন দেখিতে পাওয়া যায় কোন ব্যক্তির ক্ষুধা হ্রাস হইতেছে, আহারে রুচি নাই, কোনও প্রকারে কর্ত্তব্যজ্ঞানে জোর করিয়া জিহ্বার রুচিকর বস্তুসকল সংগ্রহ পূর্ব্বক খাদ্য বস্তু গলাধঃকরণ করিতে হয়, আহার্য্যবস্তু সকল যথানিয়মে জীর্ণ হয় না, তখন অতি সহজেই বিবেচক লোকে সে ব্যক্তির ভবিষ্যৎ ব্যাধির সম্ভাবনা দেখিয়া শঙ্কিত হন। এবং পূর্ব্ব হইতেই যাহাতে অগ্নিমান্দ্য দূর হইয়া আহারে রুচি জন্মে তন্নিমিত্ত যথোচিত উপায় সকল গ্রহণ করিতে থাকেন। আহারে অরুচি এবং অক্ষুধা শারীরিক ব্যাধির একটী সুনিশ্চিত পূর্ব্বলক্ষণ। এই পূর্ব্বলক্ষণ দেখিয়াও যদি কেহ সতর্ক না হয় এবং উপযুক্তরূপ ঔষধি সেবন না করে, তাহার শরীর রক্ষা পাওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হইয়া থাকে। শরীর সম্বন্ধে যেমন অক্ষুধা—আহারে অপ্রবৃত্তি একটী গুরুতর রোগাগমনের পূর্ব্বলক্ষণ। তেমনি ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধেও দেখা যায় যে যখনই মানুষ ঈশ্বরোপাসনা, ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ও তাঁহার নাম-কীর্ত্তন শ্রবণে অমনোযোগী ও শিথিল হইতে থাকে, ঈশ্বরোপাসনায় মন সহজে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না; এবং তাহা তৃপ্তিকর হয় না, তাহার পরেই সেই ব্যক্তিতে নানা প্রকার কঠিন, অতি উৎকট ব্যাধির সঞ্চার হইতে থাকে। আধ্যাত্মিক ব্যাধির পূর্ব্বলক্ষণ ধর্ম্মপ্রসঙ্গে অপ্রবৃত্তি, আত্মার অন্ন-পানস্বরূপ ঈশ্বরোপাসনায় অরুচি। সুস্থ দেহের পক্ষে যেমন তৃপ্তিকর আহারে তৃপ্তি হওয়া স্বাভাবিক। সুস্থ আত্মার পক্ষে তাহার অন্নপানরূপ ঈশ্বরোপাসনা অতি আরামদায়ক, অতি তৃপ্তিজনক হওয়াও স্বাভাবিক। তখন মানুষকে ঈশ্বরোপাসনার জন্য কোনরূপ অনুরোধ করিতে হয় না—বাহিরের নানাপ্রকার মনাকর্ষক আয়োজন করিতে হয় না। তখন সে প্রাণের ব্যাকুলতায় ঈশ্বরোপাসনার জন্য ব্যস্ত হয়। তখন সুন্দর সংগীত সুদৃশ্য রমণীয় স্থানের অনুসন্ধানে প্রাণ বিশেষ ব্যস্ত হয় না। কিন্তু ক্ষুধাতুর যেমন আহার্য্য কিছু পাইলেই লোলুপ হইয়া তাহা গ্রহণ করে এবং পরিতৃপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিও তেমনি আপন প্রাণের আবেগে ঈশ্বরের নাম স্মরণ মনন এবং তাঁহার আরাধনা ও ধ্যানে মগ্ন হইয়া যায়, সংসার তাহাকে কোন প্রলোভনে ফেলিতে পারে না।

আত্মায় যখন অক্ষুধার সঞ্চার হইতে থাকে, তখন প্রাণ ঈশ্বরোপাসনা করিয়া আর তৃপ্তি পায় না। তখন স্বভাবতঃই মানুষ এমন সকল সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়, যাহাতে আর উপাসনা করিবার অবসর হয় না। এমন সকল কার্য্যেব্যাপৃত হইতে থাকে, যে যেন সেই কার্য্যের অনুরোধেই সে উপাসনা করিতে পারিতেছে না। এই প্রকার বহু লক্ষণ প্রকাশ পায় যাহা

দ্বারা সহজেই চিন্তাশীল, বিবেচক, আত্মদর্শী ব্যক্তিগণ অনুভব করিতে পারেন যে আত্মায় অক্ষুধার সঞ্চার হইতেছে। এই সকল সুযোগ অন্বেষণ এবং কার্য্য বাহুল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক উপাসনায় অনুপস্থিত হইবার প্রবৃত্তি অনেক সময় অজ্ঞাতসারে মনে উপস্থিত হইতে থাকে। কারণ যে ব্যক্তি উপাসনাতে এক সময় প্রাণের আগ্রহে নিযুক্ত হইত, তাহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য জ্ঞানে অন্য কার্য্য হইতে বিরত হইত, সে সহসা একবারে উপাসনাবিহীন হইয়া থাকাকে প্রার্থনীয় মনে করিতে পারে না এবং সেরূপ ভাবে আপনার নিকট এবং লোকের নিকট পরিচিত হইতে কষ্টানুভব করে। আন্তরিক অক্ষুধা তখন তাহাকে কার্য্য বাহুল্য এবং অন্য কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া কোন-রূপে মনকে প্রবোধ দিবার প্রবৃত্তি প্রদান করে।

অক্ষুধা অতি মারাত্মক অবস্থার পরিচায়ক, কারণ শরীরই হউক বা আত্মাই হউক, তাহার পরিপোষণকারী কিছু সর্ব্বদাই তাহাতে সংক্রামিত হওয়া আবশ্যক এবং সংগ্রহকারী শক্তির প্রাবল্যেই জীবন নিরাপদ হয়—উন্নতির পথ উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু সেই পথ যদি অবরুদ্ধ হয়, যাহা দ্বারা জীবন রক্ষা পাইবে—পরিপুষ্ট হইবে, তাহা হইলে আর তাহার জীবনাশা কোথায়? বল সঞ্চারেরই বা সম্ভাবনা কোথায় থাকে? এজন্য অক্ষুধা অতি মারাত্মক অবস্থার জ্ঞাপক।

প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন অক্ষুধা তাহার বিনাশ বা কঠিন ব্যাধির পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশক। কোন সমাজের পক্ষেও যদি দেখা যায়, সমাজস্থ জনগণ অতিসামান্য কারণে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ঈশ্বরোপাসনা প্রভৃতি আত্মকল্যাণকর ব্যাপার হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই যেন তৃপ্তি বোধ করেন এবং নানা প্রকার সুযোগ খুঁজিয়া এসকল প্রয়োজনীয় ব্যাপারে অনুপস্থিত থাকিবার জন্য ব্যস্ত হন, তাহা হইলে সেই সমাজ যে অচিরে বিষম রোগে রুগ্ন হইবে এবং দুর্গতির বিষম যন্ত্রণা ভোগে রত হইবে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। এরূপ অবস্থায় কল্যাণাকাজ্ক্ষী আত্মদৃষ্টি পরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে অতি সত্বর হইয়া সেই সকল কল্যাণকর বিষয়ে অতৃপ্তি এবং অক্ষুধার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এবং যেমন কোন স্থানের বায়ু দূষিত হইলে, দুর্গন্ধ-নিবারক, বায়ু-পরিষ্কারক বস্তু সকল চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া রাখিতে হয় এবং যাহা হইতে দুর্গন্ধ কিম্বা বিষের উৎপত্তি হয়, এমন বস্তু সকল দূরে নিক্ষেপ করিতে হয়, তেমনি প্রতিক্রিয়াকারী আয়োজন সকল সমাজ মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করা কর্ত্তব্য।

যখন দেখা যায় উপাসনার প্রতি লোকের অনুরাগের হ্রাস হইতেছে। যাহারা আগ্রহের সঙ্গে উপাসনায় উপস্থিত হইবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে অন্য দশটী অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উপাসনার জন্য দশ জনে যেখানে মিশিয়াছেন ধর্ম্মসাধনে ব্যাপৃত হইয়াছেন কিম্বা সৎপ্রসঙ্গে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, এমন স্থলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইতেন এবং সেরূপ স্থলে যাইবার সুযোগ পাওয়াকে সৌভাগ্যের কারণ মনে করিতেন, কোন কষ্টকে এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পক্ষে কষ্ট মনে হইত না; তাঁহারা যদি সামান্য অসুবিধা ঘটিলেই উপাসনায় অনুপস্থিত হইতেছেন, বা অনুপস্থিত থাকিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছেন, তাহা হইলে আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া এমন সকল অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, যাহাতে অতি ত্বরায় সেই মারাত্মক অক্ষুধায় হ্রাস হয় এবং আকৃষ্ট হইবার জন্য মনের ব্যস্ততা হয়। সুগায়কের সুন্দর সংগীতের যদি কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে, তবে তাহা এরূপ অবস্থাতেই বিশেষ প্রয়োজনীয়। বান্ধবগণের সৎভাবের পরিচায়ক ব্যবহার সেই সকল অক্ষুধা-গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর। ধর্ম্মবন্ধুগণ যেমন এইরূপ দুঃসময়ে সহায়তা করিতে পারেন, অন্য প্রকারের কোন আয়োজনই সেরূপ উপকারে আসে না। রমণীয় স্থানে গমন, উৎসাহের সহিত ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন প্রভৃতি দ্বারাও এই সকল মারাত্মক অবস্থার প্রতিকার হইতে পারে।

আমাদের সমাজ মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে কি না, যাহারা উপাসনায় উপস্থিত হওয়াকে, ঈশ্বর-প্রসঙ্গে উপস্থিত হওয়াকে অনাবশ্যক বোধ করিতেছেন এবং অনুপস্থিত থাকাতে কোন ক্ষতির কারণ মনে না করিয়া বরং সামান্য সুযোগ পাইলেই তাহা হইতে দূরে থাকিতেছেন এবং দূরে থকিয়া বিশেষ কোন কষ্টানুভব করিতেছেন না, তাহা হইলে আমাদের আর স্থির থাকা উচিত নয়। এরূপ অক্ষুধার বৃদ্ধি হইতে থাকিলে অতি সত্বর দেখিতে পাওয়া যাইবে, সমাজ মধ্যে অতি উৎকট ব্যাধি সকল উপস্থিত হইতেছে এবং সমাজকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া দুর্দ্দশার চরমসীমায় লইয়া যাইতেছে। আমাদের সমাজ শিশু-সমাজ; এই অবস্থাতেই যদি অক্ষুধার প্রাবল্য হয়, তাহা হইলে ইহার উন্নতির আশা যেমন অল্প, তেমন ইহার শক্তিশালী হইবার আশাও কম। এজন্য অনুসন্ধান করা উচিত, কি হইলে ধর্ম্মক্ষুধার বৃদ্ধি হয়, সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মানুশীলনে, সৎপ্রসঙ্গে, সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয়। এবং ঈশ্বর-নিষ্ঠা বর্দ্ধিত হয়। এ সকলের অভাবে কোন সমাজই কার্য্যক্ষম হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসম্মিলনের সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ।

(প্রাপ্ত)

মঙ্গলময়ের কৃপায় বিগত ৯ই, ১০ই ও ১১ই কার্ত্তিক ঢাকা নগরে পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে পূর্ব্ববাঙ্গালাবাসী ব্রাহ্মসাধারণের একটী সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা ময়মনসিংহ ও বরিশালস্থ ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে এপ্রকার একটি সম্মিলনের আবশ্যকতা ইতিপূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল। ঈশ্বর-অনুগ্রহে এ বৎসর উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। "পূর্ব্ববাঙ্গালার ব্রাহ্মগণের সম্ভাব বৃদ্ধি এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ ও উন্নতির জন্য সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহের আলোচনা ও মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত সম্মিলনী আহূত হয়।

৭ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার হইতে ময়মনসিংহ, কুমিল্লা প্রভৃতি

স্থানের ব্রাহ্মগণ ঢাকায় উপস্থিত হইতে থাকেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বাদল জন্য অন্যান্য স্থানের ব্রাহ্মগণ যথা সময়ে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাই শনিবারে যে কার্য্য হইবার কথা ছিল, তাহা রবিবারে আরম্ভ হয়, সম্মিলনিতে কলিকাতা, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, মাণিকদহ, চৌদ্দগ্রাম কিশোরগঞ্জ, নোয়াখালী বিক্রমপুর ও পারজোয়ারের ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় চল্লিশ জন ব্রাহ্ম আগমন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত নওগাঁ, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, বাগেরহাট, পিরিজপুর, টাঙ্গাইল, মালদহ, প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মগণ সহানুভূতি সূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন, বস্তুতঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা জগদীশ্বরের কৃপায় এ বারের অধিবেশনের উদ্দেশ্য আশাতীত ফলপ্রদ হইয়াছে।

স্থানান্তর হইতে সমাগত ব্রাহ্মগণ একত্রিত হইয়া শুক্রবার রাত্রিতে সম্মিলনীর কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করেন।

৯ই কার্ত্তিক শনিবার প্রত্যূষে ৬॥ ঘটিকার সময় উপাসনা হইয়া কার্য্য আরম্ভ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় সর্ব্বসম্মতি ক্রমে সভাপতি মনোনীত হইলেন। শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় সম্মিলনীর উদ্দেশ্য সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। তৎপর সম্মিলনীর নিম্নলিখিত আলোচ্য বিষয় সমূহ সুশৃঙ্খলরূপে সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটী কমিটি গঠিত হয়।

(১) ব্রাহ্মবালক-বালিকা। (২) উপায়হীন ব্রাহ্ম-পরিবার-সংস্থান। (৩) পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার। (৪) পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার। (৫) সাধন ও উপাসনা। (৬) ব্রাহ্ম-বিবাহ। (৭) সামাজিক-শাসন।

সবকমিটী সমূহ স্বীয় স্বীয় বিবেচ্য বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া সম্মিলনীর অধিবেশনে উপস্থিত করিবেন এই স্থিরীকৃত হয়। অতঃপর শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু লাহা এম, এ, (ঢাকা) সম্মিলনীর সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ (ঢাকা) সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া শনিবারের অধিবেশন শেষ হয়।

১০ই কার্ত্তিক রবিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র দাস (প্রচারক) উপাসনার কার্য্য করেন, শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন সেন বি, এ, (ফরিদপুর) সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতি মনোনীত হইলেন।

১। অতঃপর ব্রাহ্মবালক-বালিকা সম্বন্ধীয় সব কমিটীর রিপোর্ট আলোচিত হইয়া নিম্ন লিখিত ভাবে পরিগৃহীত হয়। (১) সন্তানদিগের নিকট অভিভাবকগণ কোন ব্যক্তির সমালোচনা করিবেন না অথবা এরূপ কোন বিষয় আলোচনা করিবেন না যাহা তাঁহারা বুঝিতে অপারগ। যতদূর সম্ভব বালক বালিকাদিগের নিকট অভিভাবকেরা সাংসারিক বিষয় আলাপ করিবেন না এবং ১২ বৎসর বয়স না হওয়াপর্য্যন্ত পারিবারিক বা সামাজিক উপাসনায় যোগ দিবার জন্য বাধ্য করিবেন না। কিন্তু ১২ বৎসর বয়সের পর বালক বালিকাদিগকে পূর্ব্বোক্ত উপাসনাতে যোগ দেওয়াইতে যত্ন করিবেন। শ্রদ্ধেয় নমস্য কোন ব্যক্তি বাটীতে আসিলে পিতা মাতা তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে সন্তানদিগকে বাধ্য করিবেন। বালক বালিকাদিগের মধ্যে নীতি ও ধর্ম্মভাব উদ্দীপন করিবার জন্য অভিভাবকেরা তাহাদিগকে লইয়া সহজ কথায় উপাসনাদি করিবেন। সন্তানদিগকে যখন যে আদেশ প্রদান করা হইবে, তখন তাহারা যাহাতে ঐ আদেশ প্রতিপালন করে, তাহাই করিতে হইবে (২) পিতা মাতা বা অভিভাবক সন্তানের কর্ত্তব্যের একটী নিয়মাবলী করিয়া দিবেন এবং যাহাতে ঐ নিয়ম কার্য্যে পরিণত হয় তজ্রূপ চেষ্টা করিবেন। (৩) সন্তানদিগের প্রতি সমদৃষ্টির অভাব যাহাতে না ঘটে তৎপ্রতি পিতামাতা বা অভিভাবকগণ দৃষ্টি রাখিবেন। (৪) বালক বালিকারা যখন যে বস্তুর জন্য আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিবে, অভিভাবক তাহা দেওয়া উচিত মনে না করিলে কখনই দিবেন না। (৫) কঠোর শাস্তি দেওয়া উচিত নহে। কখন কোন বিষয়ে পিতা মাতা সন্তানদিগকে ফাঁকি দিবেন না; মন্দ বালক বালিকার সঙ্গে যাহাতে মিলিত হইতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। (৬) সন্তানগণ দৈনিক পাঠ প্রভৃতি কি প্রকার অভ্যাস করে, তাহার প্রতি অভিভাবকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। (৭) যাহাতে সন্তানেরা প্রতিদিন কোনরূপে শরীর সঞ্চালন করিতে পারে, পিতা মাতা তাহার বন্দোবস্ত করিবেন। (৮) ছেলে মেয়েরা যাহাতে কোন নিষ্ঠুর কার্য্যে যোগদান না করে, তৎপ্রতি পিতা মাতা দৃষ্টি রাখিবেন; এবং দয়ার কার্য্য শিক্ষা দিবেন।

(২) অনাথ ব্রাহ্মপরিবার-সংস্থান সম্বন্ধীয় সব কমিটীর রিপোর্ট আলোচনা করিয়া সম্মিলনী স্থির করিলেন যে নিম্ন লিখিত প্রণালীটী (Scheme) বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্যে পরিণত করিবার ভার নিম্নলিখিত সবকমিটীর উপর অর্পিত হউক। শ্রীযুক্ত বাবু তারক বন্ধু চক্রবর্ত্তী বি, এ (ঢাকা) গুরুচরণ মহলানবিস (কলিকাতা) গুরুদয়াল সিংহ, (কুমিল্লা) শ্রীনাথ চন্দ (ময়মনসিংহ) নবকুমার সমদ্দার (ঢাকা) রজনীকান্ত ঘোষ বি, এ (ঢাকা) শশীভূষণ দত্ত এম, এ (ঢাকা) সম্পাদক।

একটী জয়েণ্টষ্টক কোম্পানী সংগঠিত হইয়া, প্রত্যেককে ৫৲ পাঁচ টাকা প্রদান দ্বারা অংশীশ্রেণী ভুক্ত হইতে হইবে। এই প্রকারে যে টাকা সংগৃহীত হইবে, তাহা মূলধনরূপে রাখিয়া এক এক জন অংশীদারের মৃত্যুতে অবশিষ্ট অংশীদারগণের প্রত্যেককে ১৲ একটাকা করিয়া দিতে হইবে। এই সংগৃহীত টাকা হইতে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে টাকা দেওয়া হইবে। যথা ৫০০ অংশীদার লইয়া কার্য্য আরম্ভ হইলে তাহাদের অংশী-শ্রেণীভুক্ত হওয়ার কালে প্রদত্ত টাকার সমষ্টি ২৫০০ টাকা মূলধন থাকিবে এবং একজন অংশীদারের মৃত্যু হইলে অবশিষ্ট অংশীদারগণ ১৲ করিয়া ৪৯৯৲ দিবেন। এই টাকা হইতে মৃত ব্যক্তির পরিবারকে ৩০০ টাকা দেওয়া হইবে। অবশিষ্ট টাকা দুর্ঘটনার প্রতিবিধান (Emergensy margin) জন্য মধ্যে মধ্যে মূলধনে যোগ করিয়া লওয়া যাইবে, এবং অংশীদারের বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইবে। অর্থাৎ কোন সময়েও ৫০০ শতের কম অংশীদার না হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ৫০০ শত অংশীদার না হইলে কার্য্যারম্ভ করা যাইবে না। এবং ৫০০ শত অংশীদার

জুটিবার পূর্ব্বে কেহ পরলোকগত হইলে তাহার পরিবারকে গচ্ছিত ৫৲ পাঁচ টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। মৃতব্যক্তির পরিবারকে টাকা দেওয়ার সময় কার্য্যাদির ব্যয় স্বরূপ ২৲ টাকা কাটিয়া রাখিয়া কোম্পানি অবশিষ্ট টাকা দিবেন। পূর্ব্বাহ্নের কার্য্য এখানেই স্থগিত থাকে।

৩। পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ সবকমিটির রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত তিনটী প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইল।

(১) ধর্ম্ম প্রচার বিশেষতঃ সামাজিক ও নৈতিক বিষয় সমূহের বিশেষ ভাবে আলোচনা করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের এক খানা পত্রিকা প্রকাশ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। (২) এই পত্রিকা খানা পাক্ষিক এক পয়সা মূল্যের হইবে ও ঢাকা হইতে প্রকাশিত হইবে। তৎপক্ষে মাসিক আনুমানিক দশ টাকা ব্যয় পড়িবে। পত্রিকা এক ফরমা আকারে ভূতপূর্ব্ব "মহাপাপ বাল্য বিবাহের" ন্যায় হইবে। সম্প্রতি এতৎ সাহায্যে ঢাকা কুমিল্লা ও মণিকদহ হইতে মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা সংগ্রহের উপায় হইয়াছে। মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, পাবনা, জলপাইগুড়ি, নওগাঁ ও সিলং প্রভৃতি স্থান হইতে সাহায্য পাইবার আশা করা যাইতে পারে। এই সমস্ত স্থান হইতে বা অন্য কোন উপায়ে বাকী মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা প্রাপ্তির উপায় হইলে, আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে পত্রিকা প্রকাশিত হইতে পারে, এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য অর্থাৎ সম্পাদক প্রভৃতি স্থির ও অন্যান্য বন্দোবস্ত করিবার জন্য নিম্নলিখিত স্থানীয় (local) কমিটি গঠিত হইল। শ্রীযুক্ত বাবু শশীভূষণ দত্ত এম, এ, বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বাবু জগবন্ধু লাহা এম, এ, বাবু জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদ মিত্র বি, এ, সতীশচন্দ্র ঘোষ (সম্পাদক) ইঁহারা কমিটির সভ্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে পারিবেন। (৩) পুস্তক প্রচার সম্বন্ধে কুমিল্লার বাবু গুরুদয়াল সিংহ মহাশয় ১০ ফর্ম্মা পরিমাণের কয়েক খানা পুস্তিকা বিনামূল্যে মুদ্রিত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন এবং ময়মনসিংহের বাবু শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় যে একখানা পুস্তিকা মুদ্রাঙ্কণের কাগজের মূল্য দিতে চাহিয়াছেন ও ঢাকার বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সম্মিলনীর পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল এবং এই সমস্ত প্রস্তাব যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত সবকমিটির উপর ভারার্পণ করা হইল।

৪। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ব্রাহ্মধর্ম্ম ধর্ম্ম প্রচার কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদের পর সম্মিলনী নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাব ধার্য্য করেন।

(১) ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব বাঙ্গালাতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করা হইবে, এবং ঢাকাতে একজন স্থায়ী প্রচারক রাখা হইবে। (২) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান মতে যাঁহারা বিশ্বাস করেন ও প্রচার করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদিগকেই এই সম্মিলনী প্রচারক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। (৩) সম্মিলনী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিকট আবশ্যক হইলে তাঁহাদের নিযুক্ত প্রচারক চাহিতে পারিবেন, এতদ্ভিন্ন সম্মিলনী নিজেও প্রচারক রাখিতে পারিবেন। (৪) সম্মিলনী মনে করেন যে অল্প সময়ের জন্য স্থানে স্থানে যাইয়া প্রচার করা অপেক্ষা এক স্থানে দীর্ঘ কাল থাকিয়া প্রচার করাই প্রার্থনীয়। (৫) প্রচার ফণ্ডের মাসিক সাহায্যের জন্য পূর্ব্ব বাঙ্গালার সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে অনুরোধ করা হউক। প্রচারের জন্য মাসিক অন্ততঃ ৫০ টাকা হইলে প্রচার কার্য্য চলিতে পারে। (৬) পূর্ব্ব বাঙ্গালার ব্রাহ্মদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থে তাঁহাদের মাসিক আয় হইতে টাকা প্রতি অন্যূন অর্দ্ধ পয়সা করিয়া প্রদান করিতে অনুরোধ করা হউক। (৭) উক্ত উপায়ে সংগৃহীত অর্থ লইয়া একটী প্রচার ফণ্ড (Mission Fund) করা হউক এবং বাবু শশীভূষণ দত্ত এম, এ, বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও বাবু রজনীকান্ত ঘোষ বি, এ, মহাশয়দিগকে সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা প্রদান পূর্ব্বক এই ফণ্ডের কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হউক। (৮) মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ এবং মুসলমানদিগের মধ্যে প্রচার করিবার উপযুক্ততা আছে, এমন কোন হিন্দুই হউন বা মুসলমানই হউন, তাহাকে এতদর্থে প্রচারক নিযুক্ত করিতে চেষ্টা করা হউক। (৯) অন্তঃপুরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ যে পর্য্যন্ত প্রচারিকা নিযুক্ত না করা যায়, তত দিন সেই প্রচার নিম্ন লিখিত ভাবে প্রচলিত হউক, যথা; সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে উপাসনাদি দ্বারা ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচার করা। (১০) এই প্রচার কার্য্য যাহাতে বিক্রমপুর প্রচার সভার সহিত এক যোগে করিতে পারা যায় তজ্জন্য চেষ্টা করা হউক।

এই স্থলে বক্তব্য এই যে উপস্থিত মহাশয়গণের মধ্যে প্রায় ৩০ জন ব্রাহ্ম বন্ধু মাসিক আয়ের টাকা প্রতি অর্দ্ধ পয়সা প্রচার কার্য্যের সাহায্যার্থ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং ঐ পত্রে আরও নাম স্বাক্ষরিত হইতেছে।

৫। সামাজিক শাসন সবকমিটীর রিপোর্ট আলোচনার পর সম্মিলনী নিম্নলিখিত প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(১) সম্মিলনী পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রত্যেক ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদককে অনুরোধ করুন যে প্রত্যেক স্থানের সভ্যদিগকে লইয়া তাঁহারা এক একটী সামাজিক-শাসন কমিটী গঠিত করেন।

৬। ব্রাহ্ম বিবাহ সবকমিটীর রিপোর্ট বিশেষ আলোচনার পর নিম্ন লিখিত প্রস্তাব গুলি স্থিরীকৃত হয়।

(১) কোন ব্রাহ্মেরই পরিবার প্রতিপালন সম্বন্ধে নিজের উপর নির্ভর করিতে প্রস্তুত না হইয়া বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে। (২) পুরুষানুক্রমিক অথবা দুরারোগ্য ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে বিবাহ অবৈধ; পক্ষাঘাত, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা, উন্মাদ প্রভৃতি ব্যাধি এই নিষেধ বিধির অন্তর্গত। (৩) যে পর্য্যন্ত পতি পত্নীর বিবাহের দায়িত্ব জ্ঞান ও বিবাহজনিত কর্ত্তব্যপালনের উপযোগী শক্তি সমূহ বিকশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বিবাহ হওয়া অন্যায়। (৪) পাঠ্যাবস্থাতে কোনও যুবকের বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করাই দূষণীয়। ইহাই নিয়ম। বিশেষ কারণ না থাকিলে ইহার ব্যতিক্রম প্রার্থনীয় নহে। (৫) অন্য সমাজ হইতে কোনও মহিলা ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলে, অন্ততঃ ১৷৷ দেড় বৎসরের মধ্যে বিবাহ করিতে পারিবেন না। (৬) পাত্র পাত্রী পরস্পরকে মনোনয়ন করিয়া অভিভাবকের সম্মতি গ্রহণ করিবেন অথবা অভিভাবক মনোনয়ন করিয়া পাত্র পাত্রীর সম্মতি গ্রহণ করি-

বেন। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব অভিভাবকের নিকটই উপস্থিত করা কর্ত্তব্য। (৭) বিবাহের পূর্ব্বে অভিভাবক পাত্র পাত্রী পরস্পরকে অবগত হইবার জন্য বিশেষ সাবধানতার সহিত যথেষ্ট সুযোগ দিবেন। (৮) "স্ববর্ণের মধ্যেই পুত্র কন্যাদের বিবাহ দিতে হইবে" সম্মিলনী এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী। (৯) সম্মিলনী ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের সংশোধন বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত হইবেন।

৭। ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধন ও উপাসনা প্রণালী বিষয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়া সম্মিলনীর নিকট বিধিবদ্ধ কয়েকটী প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য যে একটী সবকমিটী নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই সবকমিটীর সভ্যগণ কোন প্রকারেই এক মত (unanimous) হইতে পারেন নাই। তাঁহারা অধিকাংশের পক্ষ হইতে যে কয়েকটী প্রস্তাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা উপস্থিত করা মাত্র বিশেষ মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছিল। সভাপতি মহাশয় এই সমস্ত আধ্যাত্মিক বিষয় অধিকাংশের ভোটে মীমাংসা করিতে বিশেষ অনিচ্ছুক হইয়া এবং সেই বাদানুবাদের মধ্যে একটী মীমাংসার বিষয়ে একেবারে নিরাশ হইয়া, অবশেষে সবকমিটীকে তাঁহাদের প্রস্তাব সমূহ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সবকমিটীর পক্ষ হইতে প্রস্তাবগুলি প্রত্যাহার করিলেন। তৎপর নিম্ন লিখিত প্রস্তাব কয়েকটী স্থিরীকৃত হইল।

(১) প্রত্যেক ব্রাহ্মেরই নিজপরিবারে অথবা অন্যের সহিত সজন উপাসনা ও দৈনিক নির্জ্জন উপাসনা করা এবং সামাজিক উপাসনায় নিয়মিতরূপে যোগ দান করা একান্ত কর্ত্তব্য। (২) সামাজিক উপাসনার কালে উপাসনা শেষ না হইতে মন্দির হইতে যে উঠিয়া যাওয়া হয়, তাহা যেন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা উচিত। (৩) সম্মিলনীর নিমন্ত্রণ পত্রে যে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ ছিল তাহার মধ্যে সাধন একটী গুরুতর বিষয়। কেন এই বিষয়টী অদ্য আলোচিত হইল না সম্মিলনী তাহার কারণ নির্দ্দেশ করেন। ভবিষ্যতে এই বিষয়ের আলোচনা করা হইবে।

অতঃপর সুযোগ্য সভাপতি মহাশয় একটী বক্তৃতা করিয়া সম্মিলনীর নির্দ্ধারিত কার্য্যের উপসংহার করেন।

বিশেষ প্রস্তাব।

১। নিম্ন লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ঢাকায় সম্মিলনীর একটী স্থায়ী কমিটী (Standing Committee) গঠিত হউক।

শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত ঘোষ বি, এ, জগবন্ধু লাহা এম, এ, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ দত্ত এম, এ, সতীশচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন বসু, জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদ মিত্র বি, এ, ঢাকা; মনোরঞ্জন গুহ, দ্বিজদাস দত্ত এম, এ, কালীমোহন দাস, বরিশাল; কৃষ্ণকুমার মিত্র বি, এ, গুরুচরণ মহলানবিশ, কলিকাতা; ভুবনমোহন সেন বি, এ, ফরিদপুর; বিপিনবিহারী রায়, মাণিকদহ; গুরুদয়াল সিংহ, অক্ষয়কুমার সেন, কুমিল্লা; শ্রীনাথ চন্দ, ময়মনসিংহ; হরিনাথ দাস, বাঘেরহাট; মথুরানাথ গুহ, কিশোরগঞ্জ।

উক্ত মহোদয়দিগকে প্রয়োজন মত কমিটীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার অধিকার দেওয়া হউক।

২। স্থায়ী কমিটী পৌষ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে সম্মিলনীর কার্য্য-বিবরণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করুন।

৩। কার্য্য সৌকর্য্যার্থে সম্মিলনী যে সকল সব কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যবিবরণ এই স্থায়ী কমিটীর নিকট প্রদত্ত হউক।

৪। পূর্ব্ব বাঙ্গালা-ব্রাহ্ম-সম্মিলন প্রতি বর্ষে একবার করিয়া সম্মিলিত হউক।

৫। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন আগামী শারদীয় অবকাশের সময় ঢাকায় হইবে। তারিখ স্থায়ী কমিটীর দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৬। মফঃসলস্থ যে সকল ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাদিগের উপস্থিতি দ্বারা সম্মিলনের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাদিগকে এই সম্মিলন বিশেষ ধন্যবাদ প্রদান করুন।

৭। যাঁহারা সম্মিলন আহ্বান করিয়াছেন এবং যাঁহারা সম্মিলনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কাজ সমূহ (Sub Committee) বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন এই সম্মিলন তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।

৮। পশ্চিম বাঙ্গালার একটী যুবক পূর্ব্ব বাঙ্গালার অধিবাসী না হইয়াও সম্মিলনের সমস্ত কার্য্যবিবরণ লিখিয়া সম্মিলনের যে মহা উপকার করিয়াছেন, তজ্জন্য সম্মিলনী তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ করুন।

সভাপতি মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্মিলনের কাজ সম্পন্ন করিয়াছেন তজ্জন্য সম্মিলনী তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করুন।

অবশেষে সোমবার রাত্রি ৯টার পর উপাসনা করিয়া সম্মিলনীর কার্য্য শেষ হয়।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

খালোড়।

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে খালোড় ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

১৯এ কার্ত্তিক মঙ্গলবার—প্রাতে উদ্বোধন। বৈকালে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আলোচনা।

২০এ কার্ত্তিক বুধবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব, সকালে নামগান ও উপাসনা, বাবু অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপরে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা, বাবু রসিকলাল রায় উপাসনার কার্য্য করেন। পরে ব্যক্তিগত প্রার্থনা, পাঠ, আলোচনা, ধ্যান ও কীর্ত্তন; পরে উপাসনা, এবেলায় উপাসনা বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক সম্পন্ন করেন।

২১এ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার—প্রাতে উপাসনা বাবু অখিলচন্দ্র রায় উপাসনার কার্য্য করেন। বৈকালে নগর সংকীর্ত্তন। নগর সংকীর্ত্তনে স্থানীয় অনেক লোকে যোগ দিয়াছিলেন এবং কীর্ত্তনও খুব মধুর হইয়াছিল।

২২এ কার্ত্তিক শুক্রবার—প্রাতে উপাসনা ও আলোচনা। সমাজের উৎসবে অখিল বাবু উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

বৈকালে নীতি বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের কথা ছিল, কোন কারণ বশতঃ তাহা হইল না। রাত্রে স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তীর বাটীতে উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্ম সম্পাদক দায়ী নহেন।)

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়! নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী তত্ত্ব-কৌমুদীতে প্রকাশিত করিয়া বাধিত করিবেন।

উন্নত গুরুবাদ।

গুরুবাদ রাখা উচিত কি রহিত করা কর্ত্তব্য, অনেকের মনে এবম্বিধ প্রশ্নের উদয় হইয়াছে। ইহা অস্বীকার করা যায় না যে গুরুবাদ পৃথিবীর ভয়ানক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে, ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে উহাতে ততোধিক উপকার দর্শিয়াছে। অতএব আমরা গুরুবাদ উঠাইতে চাই না, গুরুবাদের সংস্কার চাই। ভ্রান্তিপূর্ণ বিষয়েও সত্যের ভাগ আছে। সর্ব্ব নিয়ন্তা পরমগুরু যে নিয়ম করিয়াছেন, মানবজাতি এতদিন তাহার বিস্তর অপব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহার সদ্ব্যবহার চাই। মনুষ্য ইহাতে যে ভয়ানক কৃত্রিমতা আনিয়াছে- তাহারই সংশোধন আবশ্যক। যদি গুরুবাদ রহিত করি, নিশ্চয়ই গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের মধ্যে যে পবিত্র মাধুর্য্য আছে, সংসারকে সেই মাধুর্য্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে। শিষ্য হইয়া এক ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা ভক্তি কৃতজ্ঞতা অর্পণের যে একটী সুবিধা পাই তাহা ঘুচিয়া যাইবে। অহঙ্কৃত মস্তক হেট করিবার যে সুযোগ পাইতাম, তাহা আর থাকিবে না। এ দিকে গুরুর স্নেহ বাৎসল্য হইতেও সংসার বঞ্চিত হইবে। গুরুবাদ একেবারে উঠিয়া গেলে, উক্তপ্রকার মাধুর্য্যের ভাব হ্রাস হওয়াতে পৃথিবীতে উত্তমতার ভাগ অনেক কমিয়া যাইবে। সদ্গুরুর দৃষ্টান্ত ও উপদেশে হৃদয়ে যে পবিত্র ধর্ম্মোৎসাহের সঞ্চার হয়, তাহা আর হইবে না। সত্য সত্যই পরমেশ্বর সদ্গুরুর মুখশ্রী, দৃষ্টান্ত ও বাক্যে যেমন স্ফূরিত হন ব্রহ্মাণ্ডের কুত্রাপি তেমন হন না। অতএব যিনি গুরুর নিকট সৎশিক্ষা লাভ করিয়া তাহা অস্বীকার করেন, কিম্বা গুরুকে অস্বীকার করেন, তিনি ব্রহ্মগুরুকেও অস্বীকার করেন। ঈশা একস্থলে প্রার্থনা করিতেছেন—"হে পিতঃ আমি যে কেবল ইহাদিগের জন্ম প্রার্থনা করিতেছি এমন নয়, কিন্তু অতঃপর ইহাদিগের কথায় যাঁহারা আমাকে বিশ্বাস করিবেন,তাঁহাদিগের জন্ম ও প্রার্থনা করিতেছি, হে পিতঃ যেমন তুমি আমাতে আছ এবং আমি তোমাতে আছি, সেই প্রকার উঁহারাও আমাদিগের সহ এক হউন। পৃথিবী এই বিশ্বাস করুক যে তুমিই আমাকে পাঠাইয়াছ।"

মনুষ্য ঈশ্বরের ক্ষুদ্র নমুনা। পরমেশ্বর পূর্ণ অনন্তভাবে যাহা মনুষ্য অনুপ্রমাণ তাহাই। তিনি পরম পিতা মাতা, মহাবিচারক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একাধিপতি এবং রক্ষকদিগের পরম দয়ালু মহারক্ষক; মনুষ্য ও ক্ষুদ্ররূপী পিতা মাতা, রাজা, রক্ষক এবং বিচারকর্ত্তা; সেইরূপ ঈশ্বর যেমন সত্য-আদি-পরমগুরু, তেমনি যাঁহারা তাঁহার ভক্ত শিষ্য হইয়া অন্যকে শিক্ষা দিয়া থাকেন তাঁহারাও গুরু।

কিন্তু গুরুশব্দের অর্থ কি, ইহাই প্রশ্ন। অভিধানে গুরুশব্দের "আচার্য্য, অধ্যাপক, উপদেশক, শিক্ষাদাতা, মন্ত্রোপদেষ্টা ধর্ম্মোপদেষ্টা, পুরোহিত, নিয়ামক" ইত্যাদি অর্থ প্রদান করা হইয়াছে! এখন ন্যায় সঙ্গত অর্থে কোন সাহসে গুরু অমান্য করি। আমরা শিশুশিক্ষা প্রভৃতি বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে এ "গুরুমহাশয়" এই শব্দের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। আমাদিগের শাসন কর্ত্তৃগণ গুরুট্রেনিং নর্ম্মাল স্কুল স্থাপন করিয়া একপ্রকার গুরুগিরি স্বীকার করিতেছেন। এ সমুদয় স্থলে গুরুশব্দে কোন আপত্তি নাই। যদি সামান্য শিক্ষকদিগকে গুরু বলিতে আপত্তি না হয়, ধর্ম্মোপদেষ্টাকে গুরু বলিতে কিছুই বাধা নাই। আমরা যে ঈশ্বরকে গুরু বলি, তাহাও শিক্ষক এবং ধর্ম্মোপদেষ্টা অর্থেই বলিয়া থাকি। কিন্তু ঈশ্বর আদিগুরু হইলেও প্রথমতঃ তাঁহাকে গুরু বলিতে শিক্ষা করি নাই। প্রথমতঃ মানুষকেই গুরু বলিতে বলিতে শেষে পরমেশ্বরকে মহাগুরু বলিয়া চিনিতে পরিয়াছি। যদিও ঈশ্বরই পরমপিতামাতা, তথাপি আদিতে তাঁহাকে পিতা মাতা বলিতে শিখি নাই। মানুষ পিতাকে পিতা বলিয়া, মানুষ মাতাকে মাতা বলিয়াই ঈশ্বরের অপার পিতৃ-মাতৃ বাৎসল্যের ভাব পাইয়াছি। এখন কি পৃথিবীর পিতামাতাকে পিতামাতা বলিতে ক্ষান্ত হইব? যদি হই, অনন্তস্নেহাধার জগৎ পিতামাতাকে পিতামাতা স্বরূপে চিনিতে পারি কি না সন্দেহ। পরম গুরুর কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াই যদি বলি, যাও মনুষ্য গুরু আর মানি না, আমাদিগের অকৃতজ্ঞ উদ্ধত ভাব নিশ্চিত দণ্ডনীয় হইবে। কিন্তু নম্রতার পুরস্কার অবশ্যই আছে। যদি মনুষ্য গুরুর নিকট উপযুক্তরূপ মস্তক অবনত করিতে পারি, দেখিতে পাইব পরম গুরু নিজ কৃপাগুণে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হইতেছেন। তখন বুঝিতে পারিব, আমরা ঈশ্বর হইতে কেবল মতগত ও মানসিক নয়, কিন্তু জীবনগত ব্যবহারিক, উচ্চ ও প্রত্যক্ষ শিক্ষা লাভ করিতেছি। আবার তিনি কি ধর্ম্মশিক্ষক বলিয়াই আমাদের গুরু, তিনি কি জনসমাজকে আর কোন শিক্ষা দিতে পারেন না কিম্বা দেন নাই? কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ্য শিক্ষকরূপে তিনি কি এ সমুদয়ের উন্নতিসাধনে সহায়তা করেন নাই? হে ব্রাহ্ম অল্প বিশ্বাসী হইও না, কিন্তু বিশ্বাস কর যে তাঁহার সহায়তা না থাকিলে ঐ সমুদয়ের শত শত অধ্যাপক আবিষ্কারকের মধ্যে একটীও উৎপন্ন হইতেন না—উৎপন্ন হইলেও তাঁহারা অধিক কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি যেমন নানক ও লুথরকে, সেইরূপ গ্যালিলিও এবং কলম্বসকেও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্টির ন্যায় তৎপ্রদত্ত শিক্ষাও অতি বিচিত্র এবং মনোরম্য। প্রেমময় ঈশ্বরই আমাদিগকে কথা বলিতে ও গান করিতে শিক্ষা দিয়াছেন, হাসিতে কাঁদিতে শিক্ষা দিয়াছেন, উঠিতে বসিতে চলিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি উপদেষ্টা, আচার্য্য, গুরু! মানুষকে যদি গুরু না বল, তবে ইহাঁর

কিছুই বলিতে পার না। গুরু শব্দে যে আপত্তি, ইহার প্রত্যেকটীতে সেই আপত্তি আসিতে পারে। কোন সময়ে ইহা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটী মতরূপে প্রকাশিত হয়,যে আচার্য্যের উক্তি সমুদয় যিনি বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন, তিনি পরমেশ্বরের নিকট নিরপরাধী গণ্য হইবেন না। এখন গুরুর পরিবর্ত্তে যদি আচার্য্য বল, তাহাও দেখিতেছি মনুষ্যের দোষেই দূষিত হইয়া উঠিল। ফলতঃ মনুষ্যেরই দোষ, গুরু শব্দেতে কোন দোষ কিম্বা অপবিত্রতা নাই। অর্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া শব্দ লইয়া বিসম্বাদ করা বৃথা উত্তেজনার কার্য্য।

অনাবশ্যক বিপ্লব চাই না, সংস্কার চাই। যদি গুরু শব্দে দোষ না থাকিল, তবে অবশ্য বলিতে হইবে, নির্দ্দোষ গুরুবাদও আছে। যাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের অঙ্গীয় হইবার যোগ্য। যাহা অগ্রাহ্য করিলে ব্রাহ্মধর্ম্ম অঙ্গহীন হইয়া পড়িবে। উহাতে যে অলীকতা মিশ্রিত হইয়াছে, তাহাই অপকারী। সত্যের উপকারীতা কোথায় যাইবে? ইহাও সকলে বুঝিতে পারেন যে পূর্ব্ব হইতেই গুরুকরণে ব্রাহ্মসমাজের অনভিমত নাই। আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মধর্ম্ম নামক গ্রন্থে উপনিষদের নিম্নলিখিত অনুমোদিত এবং অনুমোদনীয় শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায সম্যক প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্।"

অস্যার্থঃ। "পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান লাভার্থে আচার্য্য সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য উপস্থিত শিষ্যকে সম্যক শান্ত সমাহিত চিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায়, তাহার উপদেশ করিবেন।"

ব্যাখ্যা। "সকলের কর্ত্তব্য, মনকে সংযত করিয়া প্রশান্ত হইয়া পরব্রহ্ম বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্তির নিমিত্ত ব্রহ্মবিৎগুরুর নিকট গমন করিবেন। এবং সেই গুরুর কর্ত্তব্য যে, যে জাতীয় যে কোন শান্তব্যক্তি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন; তিনি তাঁহাকে যথাবৎ উপদেশ প্রদান করেন; তাহাতে অবহেলা না করেন।" উদ্ধৃত শ্লোকে এবং তাহার অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় আচার্য্য এবং গুরুশব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

এখন কি আকারে গুরুবাদমান্য করিলে,'উহা ব্রাহ্মধর্ম্মসম্মত হয় এবং উহাতে কোন দোষ থাকে না তাহাই বিবেচ্য।

প্রথমতঃ ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন কুসংস্কারবিহীন নৈতিক একেশ্বরবাদ, তখন ইহা প্রত্যাশা করা যায় যে ব্রাহ্মসমাজে যাঁহাদিগকে গুরু কিম্বা আচার্য্যের আসন প্রদান করা হইবে, তাঁহাদিগের নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি ভ্রান্তি ও দোষ বিবর্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। যে আরব সমাজে মহম্মদ উদ্ভূত হন, তাহাতে এইগুলি তত দোষাবহ বিবেচিত হয় না সুতরাং মহম্মদের জীবন ঐ সকল নির্দ্দিষ্ট ভ্রান্তি ও অন্যায়াচরণে দূষিত হইলেও তিনি আরবসমাজে ঈশ্বরপ্রেরিত ধর্ম্মশিক্ষক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজেও তিনি ধর্ম্মগুরু বলিয়া সম্মানিত হইবার যোগ্য। যেহেতু স্বর্গীয় নির্ব্বাচনের পবিত্র মুদ্রাঙ্কণ তাহাতে আছে। শ্রীকৃষ্ণ আর এক ব্যক্তি যিনি নির্দ্দিষ্ট নানা ভ্রান্তি ও দোষবিবর্জ্জিত নহেন, অথচ অনেক ব্রাহ্ম যাহাকে ব্রাহ্মসমাজে যোগাচার্য্যের আসন প্রদান করিতে চাহেন। ঈশ্বর যে তাঁহাকে ধর্ম্মগুরু নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন তাঁহার জীবনে এইরূপ মুদ্রাঙ্কণের তেমন কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে হইবে ধর্ম্মশিক্ষকেরা নির্দ্দিষ্ট পাপ ও ভ্রান্তিবিবর্জ্জিত হউন বা না হউন, অথবা একেবারেই ভ্রান্তি ও পাপবিবর্জ্জিত হউন, আমরা বিবেক এবং বিচারশক্তির সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য। গুরুভক্তিতে অন্ধ হইয়া আমরা যেন কখন অবিচারে এবং না বুঝিয়া গুরুবাক্য গ্রহণ না করি। বিবেক ও বিচারশক্তিকে কোন কোন ব্রাহ্ম কেবল ঐহিক মনে করেন। কিন্তু যাহা সত্যাসত্য ন্যায়ান্যায় নির্দ্ধারণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্য অবিনাশী।

তৃতীয়তঃ আমাদিগের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে গুরু এবং ধর্ম্মশিক্ষকেরাও মানুষ সুতরাং কখনই অভ্রান্ত এবং নিষ্পাপ নহেন। অতএব তাঁহাদিগের সম্বন্ধে বিচারশক্তির চালনা আবশ্যক হইলেও উহার অনুচিতও অতিরিক্ত চালনা অতি নিন্দনীয়। নিষ্পাপ এবং অভ্রান্ত মনুষ্য নাই জানিয়াও যদি কেহ কোন গুরুস্থানীয় ব্যক্তির পদে পদে কঠিনভাবে বিচার করেন এবং প্রার্থনা দ্বারা ও প্রকারান্তরে সংশোধন চেষ্টা না করিয়া সামান্য সামান্য দোষ বর্ত্তাইয়া উপরিস্থ সম্মানিত ব্যক্তিকে সাক্ষাৎভাবে নাকাল করিতে চেষ্টা করেন কিম্বা অন্ধভক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া গুরুচরিত্রের অসমর্থণীয় বিষয়গুলিও সমর্থন করিবার নিমিত্ত কুতর্কের আশ্রয় লওয়া পাপ মনে না করেন, উভয়েতেই পরমেশ্বর প্রদত্ত বিচারশক্তির অপব্যবহার ও অবমাননা হয়। ফলতঃ শিষ্যের ন্যায়সঙ্গত বিচারশক্তি পরিচালনার উপর গুরুশিষ্য উভয়েরই নির্ব্বিঘ্নতা এবং সমাজেরও ধর্ম্মোন্নতি নির্ভর করে।

কেহই অভ্রান্ত ও নিষ্পাপ নহেন। ইহাতে যেমন মনুষ্যের অপূর্ণতা ব্যক্ত হইতেছে, আবার ধর্ম্মবিষয়ক সত্যশিক্ষা ও ভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণের সাধনা ঈশ্বর কৃপায় যাহার যে পরিমাণে হওয়া উচিত এবং আবশ্যক কিম্বা কোন কালে হইতে পারে, তাহা কাহারও নাই এ অর্থেও মানুষ অপূর্ণ। এই পৃথিবীতে কোন মানুষই আদর্শ মানুষ হইতে পারেন নাই। ঐশী ধর্ম্মের অর্থাৎ প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের অফুরন্ত সত্য সকল নিয়ত শিক্ষা করিয়াও তিনি নিঃশেষিত করিতে পারেন না। অতএব যিনিই হউন না কেন, কোন গুরু কিম্বা ধর্ম্মশিক্ষককেই পূর্ণজ্ঞ বা পূর্ণশিক্ষিত, পূর্ণভক্ত বা সাধু বলিতে পারি না। মুসলমানেরা মহম্মদকে শেষ পয়গম্বর মনে করেন, যেন ধর্ম্মশিক্ষা মহম্মদেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; এবং কোরাণ হদিস্ প্রভৃতি পাঠে যাহা জানা যাইতে পারে, তাহার পর আর কাহারও কিছু জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। এই বিশ্বাসেই মহম্মদের সাক্ষাৎ শিষ্য খলিফা ওমর সেকেন্দরিয়ার পুস্তকালয় ধ্বংস করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি এই বুঝিয়া আজ্ঞা প্রচার করেন যে যদি উক্ত পুস্তকালয়ের পুস্তকাবলীতে কোরাণের বিরোধী কিম্বা অতিরিক্ত কোন শিক্ষা থাকে, তবে উহা অনাবশ্যক; অর্থাৎ কোরাণ অভ্রান্ত ও পূর্ণ। খ্রীষ্টানেরাও যে বাইবল ও বাইবেল লোক শিক্ষকদিগকে অন্ধভাবে মান্য করেন, তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে আদি ব্রাহ্মসমাজ বলিতেন কিম্বা এখনও বলেন, ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রই প্রচুর। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ বলেন তাঁহাদিগের নববিধানই পৃথিবীর পূর্ণ—অতএব শেষ বিধান এবং অনেকের মতে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিবৃত সত্য সমূহই ঈশ্বরীয় সত্যের ভাণ্ডার নিঃশেষিত করিয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাঁহারা বিধানবাদী তাঁহাদিগের মতে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধান নয় (?) কিন্তু পৃথিবীর শেষ বিধান। আবার অনেকে মত প্রকাশ করিয়া থাকেন, ধর্ম্ম বিষয়ে নূতন কিছুই জানিবার নাই—প্রাচীনেরা বিশেষতঃ দেশীয় প্রাচীনেরা ধর্ম্ম বিষয়ে নূতনত্ব অসম্ভব করিয়াছেন। এজন্যও এই শ্রেণীর অনেক ব্যক্তি সামাজিক উপাসনায় উপস্থিত থাকা কিম্বা আনুসঙ্গিক বক্তৃতা শ্রবণ করা অত্যন্ত অনাবশ্যক বোধ করেন। ইহা সান্ত্বনার বিষয় বটে, যে সমুদয় গুরুবাদ-বিরোধীরাই এই প্রকার নন, কিন্তু ইঁহারা যে গুরু অস্বীকার করিবেন তাহাতে বিচিত্র কি? বোধকরি স্বয়ং পরমেশ্বরকেও ইহারা এখন পূর্ণ মাত্রায় গুরু বলিতে প্রস্তুত নহেন, যেহেতু তাঁহার সত্যের ভাণ্ডার শূন্য হওয়াতে তাঁহার নূতন শিক্ষা দিবার কিছুই নাই। এখন ইহারা নিজেই নিজের গুরু এবং পরিত্রাণ কর্ত্তা! হায় অহঙ্কারের কি শোচনীয় পতন! বলা বাহুল্য এই সম্প্রদায়ের লোকদিগের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত অনিষ্ট হইতেছে। এখন দেখা যাইতেছে কোন বিশেষ মনুষ্যোতে অন্যায়রূপে অভাবাত্মক ও ভাবাত্মক পূর্ণতা আরোপিত হইতে পারে। কাহাকেও নিষ্পাপ ও অভ্রান্ত ভাবিলে অভাবাত্মক পূর্ণতা আরোপ করা হয়, আর কাহাকেও প্রেমভক্তি বিনয়াদিতে পূর্ণ ও ধর্ম্ম বিষয়ক সত্যের পূর্ণ অধিকারী মনে করিলে ভাবাত্মক পূর্ণতা আরোপ করা হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান তাঁহাদিগের গুরুদিগকে ভাবাত্মক অভাবাত্মক উভয়বিধ পূর্ণতাই আরোপ করিয়াছেন। ভাবাত্মক পূর্ণতার মধ্যে শেষোক্তটী শ্রেণী কিম্বা ব্যক্তি বিশেষকে আরোপ করাই ব্রাহ্মসমাজের রোগ এবং ইহারই বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্রাহ্মের সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য।

চতুর্থতঃ। বিবেচ্য এই অবস্থা বিশেষে গুরুত্যাগী হওয়া যায় কি না। বৈষ্ণব মতে গুরুত্যাগী হওয়া মহাপাপ। ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন বিভাগের মতও এক প্রকার তাহাই। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত, মহম্মদ যদি একেশ্বরবাদ পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিক ব্যবহার আরম্ভ করিতেন, শিষ্যদিগের কি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হইত না? সেইরূপ ব্রাহ্ম পরিচালকদিগের মধ্যে যদি কেহ গর্হিত কার্য্য করিয়া বসেন, তিনি অনুতপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত থাকিবেন, ইহাতে বাধা কি? কখনও পরিত্যক্ত হইতে হইবে না এই বোধে গোঁসাই মোহন্তগণ নিশ্চিন্ত মনে কতই পাপাচরণ করিতেছে।

পঞ্চমতঃ ব্রাহ্ম মনেও কল্পনা করিতে পারেন না যে ধর্ম্মশিক্ষক অথবা আচার্য্যকে ঈশ্বর-সমতুল্য বোধ করিতে হইবে কিম্বা কোনরূপ উপাস্য বোধে পূজা করিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণের পক্ষে যেমন শূদ্রাদি যাজন নিষিদ্ধ (অর্থাৎ যেমন গুরুনির্ব্বাচনে তেমনি শিষ্যনির্ব্বাচনেও জাতিভেদ) আবার শূদ্রাদিরও অন্য কোনরূপ ধর্ম্মাচরণ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, কেবল ব্রাহ্মণ সেবাতে আত্মসমর্পণ করিলেই তাহারা পারলৌকিক সদ্গতি লাভে সমর্থ হইতে পারে। এই জন্যই লোকপ্রিয় গায়ক দাশরথি গান করিতেছেন:—"মন মানসে সদায় ভজ দ্বিজচরণ পঙ্কজ, দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ। হইলে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি জানেন বিধি, এ রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণেরি পদরজ।" ভূদেব ব্রাহ্মণের প্রতিশব্দ। লোকে ব্রাহ্মণকে দেবতা সম্বোধন করিয়া থাকে। হিন্দুধর্ম্মে গুরুপূজা ও গুরুর নিকট ছাগাদি পশু বলিদানের ব্যবহার আছে। গুরু-ব্রহ্ম ইহা একটী হিন্দুপ্রবাদ। গুরু শ্রীকৃষ্ণে অভেদজ্ঞান বৈষ্ণব শাস্ত্রের আদেশ। যীশুখৃষ্ট, বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য্য, ব্যাস, কপিল, দুর্ব্বাসা ইঁহারা ঈশ্বরাবতার কিম্বা উপাস্য দেবতা বিশেষের অবতার বলিয়া সম্মানিত। এই প্রকার ঈশ্বরাবমাননা লেশমাত্র অনুমোদনসহ মনে আসিবামাত্র ব্রাহ্ম যদি নিজকে কলঙ্কিত বোধ করিয়া উপযুক্ত অনুতাপ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রস্তুত না হন, তাহা হইলে তিনি যথার্থ ভক্তিপ্রয়াসী ব্রাহ্ম নহেন। "ঈশ্বরের ষোল আনা ঈশ্বরকে দাও, মনুষ্যের ষোল আনা মানুষকে দাও।"

ষষ্ঠতঃ সাবধান হইতে হইবে যেন আমরা যোগ্যতা না দেখিয়া কেবল বংশানুক্রমে গুরু মনোনীত না করি। হিন্দুজাতিতে গুরু বংশানুক্রমিক হইয়াছেন। ইহাও এক প্রকার জাতিভেদ, এবং যে প্রণালীতে অনেকাংশে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাতে তাহার আভাস পাওয়া যায়। কোন প্রসিদ্ধ ইংরেজ সিভিলিয়ন এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিভিউতে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এ স্থলে অনুবাদিত হইতেছে:—"ভূতপূর্ব্ব আমেরিক রাজপ্রতিনিধি মিঃ লোয়েল আমাদিগকে বলিয়াছেন;—'প্রজাতন্ত্রের একটী সুবিধা এই যে উহাতে উপযুক্ত হইলে যে কোন ব্যক্তিকে কয়লার খনি হইতে সর্ব্বোচ্চ পদবিতে তুলিয়া দিতে পারে।' কিন্তু সমাজ এবং গবর্ণমেণ্টের সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষে কয়লাওয়ালার আদবেই উঠিবার প্রবৃত্তি নাই। প্রত্যেক ব্যবসা এমন কি চুরি পর্য্যন্ত বংশগত। জাতিভেদের নিয়মে যে কোন ব্যক্তিকে তাহার পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে বাধ্য করে।" জাতিভেদের মাহাত্ম্যে যেখানে চৌর্য্যবৃত্তি পর্য্যন্ত পৈতৃক দাবিতে পরিণত হয়, সেখানে গুরুগিরি কেন না হইবে? যাহা হউক বংশানুক্রমিক গুরু প্রথা অন্যায় হইলেও গুরুবংশের প্রতি অনুরাগ ও প্রেমদৃষ্টি স্বাভাবিক। মৃত বন্ধুর চিহ্ন দেখিলে কাহার না হৃদয়ের প্রেমভাব জাগিয়া উঠে। সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্মবন্ধু বলা যায়, গুরুও সেইরূপ ধর্ম্মবন্ধুই। তবে কি না উপরিস্থ বলিয়া তাঁহাকে কেবল ভাল বাসিলে হইবে না, ভক্তিও করিতে হইবে। হিন্দু গুরুতে উপরিস্থ বন্ধুর স্নেহ ভাব বিলক্ষণ দেখা যায়। যিনি গুরুপ্রেমিক তিনি গুরুর সন্তানকেও ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারেন না। এই সমুদয় স্বাভাবিক ভাবের মহিমাতেই পৃথিবী অশেষ দুর্গতি হইতে রক্ষা পাইতেছে। যে ঈশ্বর "লোকভঙ্গ নিবারণার্থে সেতু স্বরূপ হইয়া সমুদয় ধারণ করিতেছেন সংসারে প্রেমের বৈচিত্র্য তাঁহারই বিধান।" কিন্তু দেখিতে হইবে গুরু

বংশের সম্মান করিতে যাইয়া আমরা যেন উপযুক্তের অত্যাধিক-দাবি কখনই বিস্মৃত না হই। কেন না ইহাতে যে কেবল উপযুক্তের প্রতি অন্যায় করা হইল তাহা নয়। কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর প্রতি অত্যাচার হইল। ব্রাহ্মসমাজের আদি শাখায় উপবীতধারী ব্রাহ্মণ ব্যতীত কেহই বেদী অধিকার করিতে পারেন না। ইহাকে জাতিভেদের দৌরাত্ম্য ভিন্ন আর কি বলা যায়। ইহাতে যে গুরুবংশ-প্রেমের অনুরোধ আছে তাহাও নহে।

সপ্তমতঃ আমাদিগের উদ্দেশ্য উপযুক্ত লোককে আচার্য্য মনোনীত করা; যাহাতে তাহা না হইতে দেয়, তাহাই অন্যায়। কেবল উপবীতধারী ব্রাহ্মণকে আচার্য্য মনোনীত করিবার নিয়ম থাকিলে এই উদ্দেশ্য সাধনে যেমন বাধা জন্মে, আবার ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে আচার্য্য মনোনীত করিলে উহাতে ততোধিক বাধা-জন্মিবার সম্ভাবনা। একদিকে জাতিভেদজনিত বৈষম্যের অত্যাচার, অন্যদিকে অনুচিত সাম্যবাদের অত্যাচার। কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মসমাজে নিয়ম আছে, পারগতা থাকুক, আর নাই থাকুক, সকলকেই পর্য্যায়ক্রমে সাপ্তাহিক উপাসনা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। ইহাদিগের ভয় পাছে ব্রাহ্মসমাজে পৌরহিত্য আইসে। ইহাঁদিগের জানা উচিত যদি পৌরহিত্য আইসে এই আকারে আসিলেও মহাভয়ের কারণ। Division of labour অর্থাৎ কার্য্যবিভাগ সংসারের পক্ষে কি প্রকার সুবিধাজনক হইয়াছে আমাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। সকলেই সকল কার্য্যের উপযুক্ত নহে। যিনি যে কার্য্যের উপযুক্ত কিম্বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত তাঁহাকে সেই কার্য্যে দেও। ব্রাহ্মসমাজ অতি সুশৃঙ্খলভাবে চলিবে। যে সাধারণতন্ত্র উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিবার চেষ্টা না করে; তাহা ঈশ্বরের নির্ব্বাচনকে অমান্য করে। হে ব্রাহ্ম প্রার্থনাশীল হইয়া বিনম্রভাবে উপযুক্তের অনুসন্ধান লও। এইমাত্র আমেরিকার প্রতিনিধির যে বাক্যটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে অনুধাবন করা বিধেয়। (ক্রমশঃ)

ঢাকা

নিবেদক
শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু

ব্রাহ্মসমাজ।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—আমাদের পাঠকগণ অবগত আছেন যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রায় দুই মাস হইল মান্দ্রাজ প্রদেশে গমন পূর্ব্বক উৎসাহের সহিত ধর্ম্ম প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে কলিকাতার দিকে আসিতেছিলেন। ইতিমধ্যে গত ১০ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার কোকনদ নামক স্থান হইতে তিনি টেলিগ্রাফ দ্বারা সংবাদ পাঠান যে গুরুতর রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। প্রবল জ্বর এবং কামলা রোগও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিল। তিনি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে পীড়ার অবস্থা জানাইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে টেলিগ্রাফ যোগে তাঁহাকে চিকিৎসার ব্যবস্থা জানান হয়। তাহার পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার স্ত্রী, বড় কন্যা এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিপিন বিহারী সরকার এম, বি, ও আমাদের সহকারী সম্পাদক বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয় তাঁহার নিকট প্রেরিত হন। এদিকে টেলিগ্রাফ যোগে তাঁহার চিকিৎসায় ব্যবস্থা চলিতে থাকে। আনন্দের বিষয় যে মঙ্গলময়ের কৃপায় ক্রমেই তাঁহার আরোগ্যের সংবাদ আসিতেছে। দিন দিন তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। করুণাময় পরমেশ্বর তাঁহার ভৃত্যকে সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত করিয়া তাঁহার সেবার উপযুক্ত করুন এই প্রার্থনা।

নামকরণ—গত ১১ই অগ্রহায়ণ বুধবার বাবু গোপালচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্রের নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছিল। বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। বালকের নাম বিনয়েন্দ্র রাখা হইয়াছে। উক্ত দিবস সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক সমাজের জন্ম দিন। এই উপলক্ষে গোপাল বাবুর ভবনে ব্রহ্মোৎসব হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে গোপাল বাবু তাঁহার পুত্রের নামকরণ এবং পারিবারিক উৎসবোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ৪৲ চারি টাকা দান করিয়াছেন।

বিশেষ উপাসনা—গত ৮ই অগ্রহায়ণ পিরোজপুর ব্রাহ্মসমাজে সামাজিক উপাসনার পর আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের আত্মার জন্য বিশেষ প্রার্থনাদি হইয়াছিল।

দান প্রাপ্তি—কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে পরলোক গত শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পঞ্চম কন্যা শ্রীমতী ক্ষেমদা মিত্র (বাবু উপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের স্ত্রী) পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাঃ ব্রাঃ সমাজের দাতব্য ফণ্ডে ৫০৲ প্রচার ফণ্ডে ১০৲ এবং ব্রাহ্ম বালিকা ছাত্রীনিবাসে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উৎসব—গত ৪ঠা হইতে ৮ই অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত পাবনা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় তথায় গমন করিয়াছিলেন। উৎসবের এ কয় দিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় মন্দিরে উপাসনা হয়। বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কৈলাসচন্দ্র বাগছী, রামলাল সাহা এবং বরদাকান্ত বসু উপাসনার কার্য্য করেন। হেরম্ব বাবু টাউন হলে "ধর্ম্ম জীবনে পরিণত" বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করেন। কুমারখালি কুষ্টিয়া অজুদিয়া হইতে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ যাইয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

আবেদন পত্র।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত পিরোজপুর মহকুমাতে পাঁচ বৎসরাধিক কাল হইল পরম করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এবং তাঁহারই কৃপায় ইহার অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হইতেছে। এ স্থানটী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পক্ষে অতি সুন্দর। গত বৈশাখ মাসে ব্রাহ্ম সমাজের জন্য ব্যবহৃত গৃহখানি অন্যান্য গৃহের সঙ্গে পুড়িয়া গিয়াছে। আজ কাল কোন এক বন্ধুর বাসগৃহে সমাজের কাজ চলিতেছে। কিন্তু এ ভাবে বেশী দিন চলিবার সম্ভাবনা নাই। তাই সভ্যগণ সমাজের জন্য একখণ্ড ভূমি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সমস্ত মূল্য এখন পর্য্যন্ত পরিশোধ করা হয় নাই; তার পর মন্দিরের জন্য একখানা টিনের ঘর প্রস্তুত করিবার আয়োজন করিতেছেন। এই সকল ব্যয় সঙ্কুলন করিতে প্রায় ১০০০৲ টাকার প্রয়োজন, সদাশয় দানশীল ব্যক্তিগণের নিকট নিবেদন, যে ভগবানের নামে প্রচার উদ্দেশ্যে তাঁহারা এই কার্য্যে যথোচিত সাহায্য করেন। সকলে মিলিয়া সাহায্য না করিলে একার্য্য সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। পত্র বা মনিঅর্ডার আমার নামে পাঠাইতে হইবে। ইতি।

পিরোজপুর—বরিশাল।

নিবেদক
শ্রীমন্মথনাথ দাস
সম্পাদক, ব্রাহ্মসমাজ।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১৩শ ভাগ।
১৭শ সংখ্যা।

১লা পৌষ সোমবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷•
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৶•

মহাপ্রাণ।

ছুটিতে জীবন-পথে
শুখায়ে গিয়াছে হিয়া,
দিশাহারা কেন তাহে
—মরি পথ হারাইয়া?
কেন এত হাহাকার,
কেন অবসন্ন প্রাণ,
আঁখি ভরা অশ্রু কেন
দীর্ঘশ্বাস অবিরাম।
ক্ষুদ্র আশা-নিরাশায়
এত ভয় কেন তবে
এসেছি আঁধার হতে
আঁধারেই যেতে হবে;
আশা আলোকের তরে
কেন প্রাণে হা হুতাশ,
আঁধারে, আলোকে সম
আছ ত মা স্বপ্রকাশ!
না হয় বঞ্চিত হব
পৃথিবীর কণা-স্নেহে,
লভিব বিরাম আমি
ও অনন্ত স্নেহ-গেহে;
না হয় করিবে মৃত্যু
হিয়া মোর চুরমার,
লভিব ও পদ্ম-স্পর্শে
মহাপ্রাণ দেবতার।

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে প্রেমময় পিতা! তোমার স্নেহ অসীম এবং চির-সহিষ্ণু। তাই আমাদের নিরাশ হইবার পথ বন্ধ হইয়াছে। আমাদিগের সহস্র ত্রুটী—তোমার বিরুদ্ধে সহস্র অপরাধের কথা যখন অনুভব করি, যখন দেখিতে পাই, উঠিয়া দাঁড়াইতে পারি এমন শক্তি আমাদের কিছুই নাই, প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে জয় যুক্ত হইবার সামর্থ্য কিছুই নাই, তখন অতি সহজেই আমাদের প্রাণে নিরাশার উদয় হইতে পারে। আমরা যে অনেক সময় নিরাশ না হই, তাহাও নয়। কিন্তু তুমি নিরাশ হইতে দেও না। তোমার অনন্ত প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া, অনন্ত সহিষ্ণুতার সংবাদ প্রদান করিয়া, আবার উঠিয়া দাঁড়াইতে আমাদিগকে ইঙ্গিত কর এবং নব উৎসাহে তোমার রাজ্যে অগ্রসর হইবার জন্য—প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য আবার উৎসাহিত কর। আমাদিগের প্রতি তাকাইলে যেমন সহজেই নিরাশ হইতে হয়, তোমার দিকে তাকাইলে তেমনি প্রাণে নব বল ও উৎসাহের স্রোত প্রবাহিত হয়। তবে হে করুণাময় প্রভু, যখন বার বার পরীক্ষায় দেখিতেছি, আমাদের সারবত্তা কিছুই নাই—আমাদের বলে কিছুই হয় না, তখন কেন আর সেই অসার ও ক্ষীণ শক্তির উপর নির্ভর করিতে যাই। তোমাকেই সার জানিয়া, তোমাকেই জীবনের চালক ও প্রতিপালক জানিয়া, যাহাতে সর্ব্বতোভাবে তোমার দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারি, আমাদিগকে এমন অবস্থায় লইয়া যাও। বিঘ্নহরণ প্রভু, তোমার মঙ্গলময়ী শক্তিতে আর কেন অবিশ্বাস করি; এরূপ অবিশ্বাসের প্রতিফল অনেক ভোগ করিয়াছি। এখন সুমতি দেও, সুসন্তান হইয়া তোমাকেই একমাত্র জীবনের সম্বল জানিয়া এবং তোমার উপর নির্ভর করিয়া আমরা জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইতে থাকি। তোমার জয় ধ্বনি করিতেই যেন আমাদের উৎসাহ থাকে। তোমার গৌরব ঘোষণা করিতেই যেন আমাদের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। নিজ গৌরব ও জয়-ঘোষণা করিতে যাইয়া বহু দুর্গতি ভোগ করিয়াছি—সেরূপ দুর্গতি হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

সেবার মূল-মন্ত্র—পীড়ার অবস্থায় মাতাপিতা সন্তানের পরিচর্য্যা করেন, স্বামী স্ত্রীর এবং স্ত্রী স্বামীর রোগে শুশ্রূষা করিয়া থাকেন—ভাই ভগ্নীর এবং ভগ্নী ভ্রাতার পীড়ায় সেবা করিয়া থাকেন। আবার চিকিৎসালয়ে বেতন-গ্রাহী পরিচারক পরিচারিকাগণও রোগীর পরিচর্য্যার জন্য পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

এই উভয় স্থলেই রোগীর পরিচর্য্যা হয়। রোগীর রোগ-যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য উভয় স্থলেই যত্ন করা হয়। কিন্তু এই উভয় স্থানে কার্য্যগত একতা থাকিলেও পরিচর্য্যাকারীগণের প্রাণের ভাবে বহু প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যেরও তারতম্য কিছু না হয় এমন নহে। প্রথম স্থানে মানুষ সেবা করিতে পারিলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করে, খাটিবার সুবিধা পাওয়াকে যেন আরামের কারণ মনে করে—খাটিতে পারিলেই আপনাকে সুখী বোধ করে। আর দ্বিতীয় স্থানে কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে, প্রভুর মনস্তুষ্টি কিম্বা বিরাগের প্রতি লক্ষ্য হইতেই লোকে কার্য্য করিয়া থাকে। সেখানে কার্য্য করিয়া সুখী হইবার প্রয়াস নাই। প্রথম স্থানে অনুরোধ উপরোধ করিবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আগ্রহে সোৎসুক চিত্তে মানুষ খাটিবার জন্য ব্যস্ত হয়, আর দ্বিতীয় স্থানে অনুরোধ উপরোধ ভয় বা বিরক্তির আশঙ্কাতেই লোকে কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। এই উভয় স্থানে কার্য্যগত সাম্য থাকিলেও যেমন উভয় কার্য্যকারকের মনোগত ভাবের ভিন্নতা লক্ষিত হয় সুতরাং কার্য্যেরও ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়, তেমনি মানুষ যখন ঈশ্বর-প্রেমে উত্তেজিত থাকে—তাঁহার ভাবে ভাবুক ও তাঁহার সাক্ষাৎ-প্রভাবে জীবন্ত অনুরাগ বিশিষ্ট থাকে, তখনকার তাহার সমাজের পরিচর্য্যা ও অপরের সেবা আর নির্জীব প্রেম ও অনুরাগবিহীন ভাবে কেবল না করিলে নয়—নিয়ম রক্ষা বা লোকের বিরাগ ভয়ে সমাজের সেবা ও সমাজের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইবার মধ্যে বহু প্রভেদ। বাহির হইতে দেখিতে নিয়ম মত যখনকার যাহা তাহা হইয়া যায়। কিন্তু উভয় স্থানে পরিচর্য্যাকারীর প্রাণের ভাবের মধ্যে বহু প্রভেদ থাকে। সুতরাং কার্য্যেও বহু প্রভেদ লক্ষিত হয়। এক স্থানে মানুষ খাটিয়া আরাম পায় তাহার অভাবে কষ্টানুভব করে, অন্যত্র খাটিতে হইলেই কষ্টানুভব হয়, কোন প্রকারে পরিশ্রমের মধ্যে যাইতে না হইলেই সুবিধানুভব হয়। এক স্থানে কার্য্য করিবার সুযোগ অন্বেষণ, অন্যত্র কার্য্য হইতে দূরে থাকিবার জন্য ব্যগ্রতা।

মানুষের প্রাণ এই সরস ও সজীব ভাবে পূর্ণ থাকিলেই, তবে অপরের জন্য প্রাণ দিয়া খাটিতে পারে। অন্যথা যাহারা সেবাব্রত গ্রহণ করিতে যায়, তাহাদিগের সে ব্রত গ্রহণ করা কেবলই বিড়ম্বনার কারণ হয়। মন সদা ত্যক্ত বিরক্ত হয়, লোকের সমালোচনা অসহ্য হইয়া পড়ে। কেহ কোন রূপ ত্রুটীর কথা উল্লেখ করিলে, তাহার ভাল উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষ সন্দেহ হয় এবং এরূপ স্থলে আত্মীয়তায় অনাত্মীয়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং যাঁহারা পরিশ্রম করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করেন, পরসেবার ব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিতে সমুৎসুক, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে রসস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রীতিতে প্রাণকে সরস করিতে যত্নবান্ হওয়া উচিত। তাঁহার জীবন্ত প্রভাবে প্রাণকে সজীব করিতে প্রয়াসী হওয়া উচিত। মাতা পিতা যে প্রেমের টানে সন্তানের জন্য যে কোন পরিশ্রমকে কষ্টের কারণ মনে না করিয়া, আরামের হেতু বলিয়া মনে করেন, সেই প্রেম ঈশ্বরে উপস্থিত হইলেই লোক পরের সেবা করিতে পারে এবং সেবা করিয়া আনন্দিত হইতে পারে। আমরা যে ভাবে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহাতে এমন মনে হয় না যে তাঁহার প্রেমই আমাদের সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণ—তাঁহার উত্তেজনাই তাঁহার প্রিয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার কারণ। এই নিমিত্তই আমরা যে পরিশ্রম করি, তাহাদ্বারা প্রাণ পরিতৃপ্ত না হইয়া—আরাম না পাইয়া বিরক্ত ও অহঙ্কারী হয় এবং লোকের প্রশংসা ধ্বনি শ্রবণ-লালসায় মন ব্যগ্র হয়। এরূপ ভাবে অধিক দিন কেহই কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্যশীল থাকিতে পারে না এবং তাহা দ্বারা তাহার কল্যাণ বা পরিত্রাণের পথ প্রশস্ত হয় না। সুতরাং প্রত্যেক কর্ম্মীর এইটী দেখা উচিত কোন্ ভাবে তিনি কার্য্য করিতেছেন। ঈশ্বর-প্রেম তাঁহার কার্য্যের পরিচালক কিম্বা অন্য কিছু। অন্য কোন পরিচালক এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিবে না। তাহাতে দিন দিন প্রাণ শুষ্কতা প্রাপ্ত হইবে। শেষে আর সেবাব্রতে মতি থাকিবে না। এজন্য প্রেমময়ের উত্তেজনা তাঁহার অনুরাগের উন্মত্ততা যাহাতে প্রাণে সঞ্চারিত হয়, প্রত্যেক সেবকের সে জন্য অগ্রে প্রয়াসী হওয়া কর্ত্তব্য।

নিয়ম ও নিষ্ঠা—মানুষ দুই প্রকারে আপনার ইষ্টদেবতার পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে। নিয়মাধীন হইয়া—পূজা অর্চ্চনা না করিলে ক্ষতি হইবে, পাপের সঞ্চার হইবে এবং ইহ পরলোকে অশেষ দুর্গতি হইবে, এই ভাবে এক প্রকারের পূজা অর্চ্চনায় লোকে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অন্য প্রকারে অনুরাগের অধীন হইয়া, ইষ্টদেবতার পূজায় প্রাণের আরাম পাওয়া যায়, পূজা না করিয়া থাকা যায় না, যেমন ক্ষুধাতুর আহার না করিয়া থাকিতে পারে না, সেই ভাবে প্রাণের আগ্রহে লোকে ইষ্টদেবতার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। মানুষের প্রাণে যখন ধর্ম্ম-ক্ষুধা প্রবল থাকে, তখন আর নিয়মাধীনতা স্বীকার করিতে হয় না—বিশেষ বাঁধা বাঁধি করিয়া কাহাকেও পূজায় প্রবৃত্ত করিতে হয় না। কিন্তু ক্ষুধার যখন অভাব হয়—ঈশ্বরানুরাগ যখন ম্লান হইয়া যায় তখন নিয়মেও মানুষকে অনেক সাহায্য করে। আমরা মুসলমান্ সমাজে দেখিতে পাই, তাঁহাদিগকে দিনের মধ্যে পাঁচ বার নমাজ করিতেই হয়। না করিলে তাঁহারা প্রত্যবায়ভাগী বলিয়া আপনাদিগকে মনে করেন। হিন্দুসমাজে দেখিতে পাই, যাঁহারা দীক্ষিত হইয়া মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইষ্টদেবতার পূজা না করিয়া জল গ্রহণ করেন না—সেরূপ ভাবে জল গ্রহণ করাকে তাঁহারা অত্যন্ত অপরাধের কারণ মনে করেন। এরূপ নিয়মাধীনতার সহিত যদি অনুরাগের মিলন হয়, তবে তাহা অতি সুন্দর এবং প্রাণের অতি মঙ্গলজনক হয়। কিন্তু অনুরাগ মানুষের প্রাণে সকল সময় সমভাবে থাকে না। অনুরাগহীনতার অবস্থায় নিয়মে অনেক পরিমাণে রক্ষা করে। কারণ ঈশ্বরের নাম গ্রহণ না করা অপেক্ষা নিয়মাধীন হইয়া গ্রহণ করিলেও তাহাতে উপকারের সম্ভাবনা আছে—তাহাতে ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিবার পথ পরিষ্কৃত থাকে। যাঁহারা অনুরাগের সহিত ঈশ্বরারাধনা করাকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং অনুরাগবিহীন অবস্থায় শুধু নিয়মাধীকার পূর্ব্বক তাঁহার পূজা অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হওয়াকে

প্রার্থনীয় মনে না করেন, তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা অতি সুন্দর। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য অতি মহৎ হইলেও তাঁহাদিগকে অনেক সময় বিপদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়। অনেক সময় ঈশ্বরোপাসনা হইতে বঞ্চিত থাকিতে হয়। কারণ সকল সময়ই যে প্রাণে অনুরাগ প্রবল থাকে তাহা নয়। তখন সংসারের অন্য বহুবিধ প্রয়োজন আসিয়া তাঁহাকে উপাসনাবিহীন করিয়া ফেলে। যাঁহারা মনে করেন, অনুরাগের সহিতই পূজা করিব, নতুবা করিব না, তাঁহাদিগকে অনেক সময় ঈশ্বর পূজার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মোপাসনা অনুরাগ মূলক হয় তাহাই সর্ব্বাংশে বাঞ্ছনীয়। তাহাই আত্মার কল্যাণকর তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুরাগ নাই সুতরাং উপাসনা করিব না, এরূপ ভাব পোষণ করা কখনই মঙ্গলজনক নয়। ঈশ্বরের নাম এমন বস্তু যাহার স্পর্শে লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হয়—সে নাম এমন বস্তু যাহার প্রভাবে অসম্ভব সম্ভব হয়। অগ্নি সংযোগে যেমন মলিন বস্তু পরিষ্কৃত হইবেই হইবে। ঈশ্বরের নাম গ্রহণেও সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবেই যাইবে। এজন্য অনুরাগের সহিতই পূজা অর্চনা করিব এমন লক্ষ্য হওয়া বিশেষ প্রার্থনীয় হইলেও, যখন অনুরাগ না থাকিবে তখন ঈশ্বরোপাসনা করিব না এমন সিদ্ধান্ত করা কখনই কর্ত্তব্য নয়। তবে ভাবহীন ও অর্থবোধহীন ভাবে কতকগুলি বাক্য উচ্চারণ করিয়াই উপাসনা হইল, এমন মনে করা উচিত নয়। কিন্তু যাহাতে ভাব ও ভক্তির সহিত পূজায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতে পারে, সেরূপ চেষ্টা করিতে হইবে। নিয়ম পূর্ব্বক উপাসনায় প্রবৃত্ত হইবার ব্যবস্থা প্রত্যেকের জন্য অতি আবশ্যক। ভাব নাই বা অনুরাগ নাই, সুতরাং উপাসনা করিয়া কি হইবে, এরূপ উক্তি করা ব্রাহ্মের পক্ষে শোভা পায় না। উপাসনাহীন জীবন যাপন করাও ব্রাহ্মের পক্ষে নিতান্ত দুঃখজনক ব্যাপার। ব্রহ্মের উপাসনা নাই, অথচ ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইবার আশা অতি বিড়ম্বনার কারণ। আমরা আশা করি ব্রাহ্মগণ উপাসনাহীনতার অপরাধ হইতে আপনাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে উন্মুক্ত রাখিবেন।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

কাহার কথা শুনিব ?

বাড়ীতে উৎসব। গৃহস্থ বসিয়া ভাবিতেছেন, কিরূপ আয়োজন করিলে উৎসব সুসম্পন্ন হইবে। গৃহস্থের সে বিষয়ে বুদ্ধি অতি অল্প। গ্রামের অনতিদূরে তাহার এক জন বন্ধু বাস করেন, তাঁহার বিষয় বুদ্ধি অতি প্রবল। এজন্য গৃহস্থ তাঁহারই নিকট যাইয়া তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। তিনি গৃহস্থকে তাঁহার যথাশক্তি সুপরামর্শ প্রদান করিলেন। গৃহস্থ তাঁহার পরামর্শ মতে চলাতে নির্ব্বিবাদে ব্যাপার নিষ্পন্ন হইয়া গেল। গৃহস্থ পরম আনন্দ লাভ করিলেন। এই ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ না করিলে অনভিজ্ঞ গৃহস্থকে অতিশয় বিপদাপন্ন হইতে হইত। কাজে অনেক বাধা বিঘ্ন ঘটিত, লোক-নিন্দার একশেষ হইত। আমরা যে দৃষ্টান্তটী প্রদান করিলাম সংসারের অনেক কার্য্যে মানুষকে এইরূপে অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরা অহর্নিশি এইরূপ স্বেচ্ছা পূর্ব্বক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-বিনাশের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। বর্ণিত গৃহস্থের আত্ম-শক্তির উপর বড়ই অনাস্থা ছিল, তাই যাহার শক্তির উপর তাহার আস্থা ছিল তাহাকেই সে নেতা করিয়াছিল। ঐইরূপ অপরের নেতৃত্ব স্বীকার করা গৃহস্থের পক্ষে অন্যায় হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কিন্তু কাহাকে জীবনের নেতা করিব ? উল্লিখিত চিত্রটী বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে যিনি বুদ্ধিতে এবং জ্ঞানে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যিনি সর্ব্বাবস্থাতে আমার ইষ্টকামনা করেন এবং ইষ্ট সাধনে যত্নবান্, তাঁহাকেই আমার নেতা করিতে পারি। কিন্তু এরূপ নেতার হাতে আত্মারভার সমর্পণ করিলেও আমি নিরাপদ নাই। কারণ সাংসারিক ব্যাপারে সম্যকরূপে অন্যের উপর নির্ভর করিতে পারিলেও অধ্যাত্মরাজ্যে সেরূপ নির্ভর করা সম্ভবেনা, জ্ঞানে এবং বুদ্ধিতে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও কেহই পূর্ণজ্ঞানী নহেন। এরূপ অবস্থায় অতি সহজেই তাঁহার ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে; তিনি পূর্ণ প্রেমিক না হইলে সর্ব্বাবস্থাতে এবং সর্ব্ব সময়ে আমার ইষ্ট কামনা এবং ইষ্ট সাধন করিবেন কিনা তাহারও নিশ্চয়তা নাই। তিনি আমা অপেক্ষা বেশী আলো পাইয়াছেন, কিন্তু এমন অনেক বিষয় থাকিতে পারে যাহা তাঁহারও নিকট নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময়। সুতরাং তিনিও চলিতে চলিতে পড়িয়া যাইতে পারেন। কাজেই তিনি আমার জীবনের নেতা হইতে পারেন না। এক মাত্র যিনি পূর্ণজ্ঞানী পূর্ণ প্রেমিক এবং পূর্ণ পবিত্র তাঁহার নেতৃত্বই মঙ্গল প্রসূ। যদি আমরা এরূপ ব্যক্তির সত্তা পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে আর কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এরূপ লোকের অস্তিত্ব সংসারে পাইবার উপায় নাই। কিন্তু মানুষ এরূপ অজ্ঞ অনুপযুক্ত মানুষের হাতে আত্ম সমর্পণ করিতেও ভীত হয় না। অথচ ঈশ্বরের হাতে আত্ম সমর্পণ করিতে ভয় পায়। ইহা কি প্রমাণ করিতেছে ? যদিও তাঁহারা মুখে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তবুও তাঁহারা কার্য্যতঃ নাস্তিক। প্রকৃত আস্তিক যিনি তিনি সংসারের কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধেও ঈশ্বরের উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু আত্মবুদ্ধির প্রতি অবিশ্বাস না জন্মিলে—আত্মশক্তির উপর অনাস্থা না হইলে, কেহই সম্পূর্ণরূপে অন্যের উপর নির্ভর করিতে পারে না। গৃহস্থের দৃষ্টান্তে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। এজন্য আমরা কতদূর করিতে পারি না পারি, সে জ্ঞান আমাদের থাকা আবশ্যক। আমরা কতদূর দুর্ব্বল সে জ্ঞান জন্মিলে অতি সহজেই পরমেশ্বরেতে নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়। তাহা হইলেই তাঁহার উপদেশ পাইবার সুবিধা হয়। যাঁহারা ঠেকিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন সূর্য্যের জগৎভরা আলো থাকিতে জোনাকি পোকার আলোর সাহায্য লইয়া চলিতে চেষ্টা করা নিরাপদ নহে। তাই তাঁহারা আপন বুদ্ধির উপর অনাস্থা স্থাপন করিয়া ব্রহ্মের উপদেশের ভিখারী হইয়া

থাকেন, এবং আহারে বিহারে শয়নে বসনে দৈনন্দিন প্রত্যেক ঘটনাতে ব্রহ্ম-উপদেশ বুঝিবার জন্য প্রয়াস পান। কিন্তু অনেক সময় আমাদিগের স্বার্থপরতার উক্তি, ব্রহ্ম-উপদেশ বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান না হইলে কুসংস্কার প্রবেশ করিতে পারে। ব্রাহ্মসমাজে সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। আমরা ব্রহ্মের উপদেশ বুঝিতেই প্রয়াস পাইব। কিন্তু স্বার্থত্যাগী বৈরাগী না হইলে এ উপদেশ বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম-উপদেশ বুঝিবার জন্য একদিকে যেমন আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস করিতে হইবে, অন্য দিকে স্বার্থত্যাগী হইয়া কেবল জীবের হিতসাধন জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তিই ব্রহ্মকে গুরু করিয়া জীবন-পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন। আমাদিগকে ব্রহ্মের হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহারই কথা শুনিয়া চলিতে হইবে। মানবের অন্য উপদেষ্টা কিম্বা গুরুর কথায় চলা নিরাপদ নহে।

ঈশ্বরের স্বরূপ।

ঈশ্বরের স্বরূপ কি, তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে। তাঁহার অনন্ত স্বরূপ ও তৎসাধন সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুই চারিটী কথা বলাই এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

তাঁহার বিষয় জানিতে গিয়া বেদ বেদান্ত, জ্ঞান বুদ্ধি পরাস্ত মানিয়াছে। পুরাকালের ঋষি মুনিগণ "হায়রান্" হইয়া বলিয়াছেন "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" দেশ কালে আবদ্ধ মনুষ্যের জ্ঞান এই বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিয়া বিচার-বলে স্থূল ভাবে তাঁহার স্বরূপের বিষয় সিদ্ধান্ত করিতে সমর্থ হয় বটে, কিন্তু তাহাতে মানব আত্মার সত্য-পিপাসা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। দূর হইতে পরোক্ষ ভাবে অকূল সমুদ্রের একটী ভাব পাওয়া এক, এবং অতল গভীরতার মধ্যে ডুবিয়া, বা সমুদ্রযাত্রা করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে তত্ত্ববিষয় জ্ঞান লাভ করা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা।

সমুদ্রের জ্ঞান দুই প্রকার লোকের পক্ষে সম্ভব। কোন ব্যক্তি সমুদ্রোপকূলবাসী হইলে বা সমুদ্রগমন করিলে, তদ্বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। অন্য আর কোন উপায় নাই। সেইরূপ দুই শ্রেণীর লোক প্রকৃত রূপে ব্রহ্ম-জ্ঞান বা ব্রহ্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় আর এক শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে সাধন-সিদ্ধ বলা যাইতে পারে। কেহ বা ঈশ্বর-প্রসাদে সেই দেবদুর্লভ স্বরূপ-তত্ত্ব সহজে ও অনায়াসে বুঝিয়া উঠেন, কেহ বা বহু যত্ন ও আয়াস সহকারে সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করেন। প্রথম শ্রেণীর বিষয় এস্থলে কিছু বলিব না।

এই প্রকৃত জ্ঞানের মাহাত্ম্য সংস্কৃত ভাষাতে কীর্ত্তিত হইয়াছে,—

> "অশ্বমেধ সহস্রানি বাজপেয়শতানি চ।
> ব্রহ্মজ্ঞানং সমং পুণ্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥"

অর্থাৎ প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বরূপ-তত্ত্বে প্রবিষ্ট হইলে, যে পুণ্য লাভ হয়, সহস্র অশ্বমেধ বা শত বাজপেয়-যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাহার ষোড়শাংশের একাংশও পুণ্য সঞ্চয় হয় না।

সাধারণতঃ মনুষ্য জড় প্রাচীরের মধ্যেই "ঈশ্বর, ঈশ্বর" করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই চন্দ্র সূর্য্যের আলোক ঘনান্ধকারময়। কোটী সূর্য্যও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি স্বপ্রকাশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে তাঁহার স্বরূপ অনন্ত। তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে ধর্ম্ম সাধন প্রয়োজন। মনুষ্য অনন্ত কাল তাঁহার স্বরূপরাজ্যে ভ্রমণ করিলেও, তাহার শেষ হইবে না। সূর্য্যালোকের রাজ্য অতিক্রম করিয়া অন্ধকারের রাজ্যের মধ্য দিয়া স্বরূপ-কাননে প্রবেশ করিতে হয়। দিবালোক অপসৃত হইলে সন্ধ্যা কেশপাশ বিস্তার করিয়া নভোমণ্ডলে দেখা দিলে, ক্রমে তাঁহার কেশপুঞ্জের মধ্য হইতে এক একটী করিয়া যেমন তারকা ফুটিতে থাকে, তেমনি আলোকের রাজ্য ছাড়িয়া জ্ঞান-দ্বারদ্বয় অবরুদ্ধ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিলেই, এক একটী করিয়া তাঁহার স্বরূপ-নক্ষত্র ফুটিয়া সেই তমোরাশির মধ্যে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি-স্রোত ঢালিয়া দেয়, "গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।" এই অন্ধকারের পর পারে নির্জ্জনতা মূর্ত্তিমতী হইয়া বিরাজিত। ক্রমে এই নির্জ্জনতার মধ্যে সজনতা অনুভব হয়! এই অনুভূতি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যতই এইরূপ উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রদেশে উঠা যায়, ততই যেন আত্মার দৃষ্টি-ব্যাপিকা রেখা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই প্রকারে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপ জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। এই সজনতানুভূতির অবস্থা উত্তীর্ণ হইলে পর প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে। সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবস্থায় উপনীত না হইলে সুর্ব্ব সংশয় নষ্ট ও হৃদয় গ্রন্থী সমূহ ছিন্ন হয় না। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানের আরম্ভ। ইহার উন্নতির শেষ নাই। অর্থাৎ স্বর্গ সাতটী বা দশটী নহে, উহা অনন্ত।

আত্মার উপর "তিনি নাই নহে" রূপ প্রথম বর্ণ পড়ে। এই ভূমির (Ground Colour) উপর সাধন-তুলিকা "তিনি আছেন," "তিনি সত্য" এইরূপ এক একটী করিয়া অরূপ রূপ আঁকিতে থাকে। এই প্রকারে যতই দিব্য জ্ঞানের উন্নতি হইতে থাকে, বা সাধন-তুলিকা লিখিত চিত্রের বর্ণ ফুটিতে থাকে, ততই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতররূপে এক একটী স্বরূপ আত্মার নিকট প্রকাশিত হয়। এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে যতই কল্পনা-তুলিকা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ আঁকা হয়, ততই তাঁহার সত্য স্বরূপ হইতে দূরে যাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা অধিক হয়। অতএব তাঁহার স্বরূপ যতটুকু প্রত্যক্ষ বা অসংশয় ভাবে বুঝা যায়, তাহাই অবলম্বন করিতে হয়। তাহা না করিলে সত্য দেবতাকে অসত্যের আকারে ভজনা করা হয়। ইহা এক প্রকার পৌত্তলিকতা মাত্র।

সকল ব্যক্তির প্রকৃতি একরূপ নহে। অতএব একই স্বরূপ সাধন প্রত্যেকের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সুতরাং যাঁহার আত্মা যে স্বরূপটী চিন্তা করিতে ভালবাসেন, বা করিলে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করেন, তাঁহার পক্ষে সেইটীই প্রথমে অবলম্বন করা বিধেয়।

যে সাধক যে স্বরূপ সাধন করেন, তাঁহার জীবনও সেই ভাবাপন্ন হয়। কারণ যাহার প্রকৃতিতে যে ভাব প্রবল, সে সেই ভাবটী স্বভাবতঃ ভালবাসে। এবং তাহার মধ্যে সেই ভাব ঘুমন্ত ভাবে রহিলেও, সেই ভাবোদ্রেককারী ঈশ্বর-স্বরূপ সর্ব্বদা সাধন করিতে করিতে সেই স্বরূপের বর্ণ তাহার জীবনে লাগিয়া যায়। এই জন্য আত্মার প্রকৃতি অনুসারে স্বরূপ সাধন করিলে সাধনে বিশেষ সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

যাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি বর্ণনা দ্বারা ব্রহ্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন না। পারসিক্ কবি সাদী বলিয়াছেন যে, একজন ধর্ম্মাত্মা সাধু পৃষ্ট হইলে বলিতেন, "আমি যে কাননে যাই তথাকার ফল বড়ই সুমিষ্ট। কাননে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মনে করি যে, বন্ধুদিগের জন্য সেই ফল আনিব। কাননে প্রবেশ করিয়া সেই উদ্দেশ্যে বৃক্ষের তলে যাইয়া ফল কাপড়ে বাঁধি বটে, কিন্তু তাহার আস্বাদনে বিভোর হইয়া অচেতন ভাবে ধরা-পৃষ্ঠে পড়িয়া যাই, অমনি বস্ত্র হইতে ফলগুলি স্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়, আমার আর কিছুই স্মরণ থাকে না।" যাঁহারা প্রত্যক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান-রূপ ফল ভক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা ইঙ্গিতে ভাবের আভাষমাত্র প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু যে তাহা নিজে আস্বাদন করে নাই, সে তাহা বুঝিবে কিরূপে? সেই কারণেই আমরা কোন ব্যক্তির নিকট হইতে আত্মার ক্ষুধাপিপাসার শান্তিকারী প্রকৃত স্বরূপতত্ত্ব জানিতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, মনুষ্যমাত্রেই কালে এই জ্ঞান লাভ করিবে এবং তাঁহাকে জানিবে। কোন ব্যক্তি কাহাকেঁ এই জ্ঞান দিতে পারে না। তিনি যাঁহাকে উহা জানান, তিনিই জানেন।

"যিস্‌মে তু জানায়া, ওহি জন জানে।"

আত্মার পিপাসা-শান্তির বারি প্রকৃত স্বরূপ-তত্ত্ব কোন পুস্তক বা মনুষ্যের নিকট হইতে লাভ করা যায় না। মানব আত্মার অন্তরতম প্রদেশ হইতে প্রবাহিত, হৃদয়-গুহা-ভ্যন্তর হইতে নির্ঝরিত যে জ্ঞান-স্রোত, তাহার এক অঞ্জলী পান না করিলে কিছুতেই আত্মার এই গভীর তৃষ্ণা দূর হয় না।

ব্রহ্মের যে স্বরূপ আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিলেও তাহা মিলিবে না। তাঁহার যে স্বরূপ আত্মার মধ্যে বিরাজিত, তাহা সর্ব্বত্র প্রকাশমান থাকে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, যাহা অন্তরে নাই, তাহা বাহিরেও নাই, এবং যাহা আত্মাতে আছে, তাহা সর্ব্বত্রই আছে।

তাঁহার একটী মাত্র স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা, তাঁহাতে উপনীত হইবার সোপান। তাঁহার কোন স্বরূপের বিন্দুমাত্র আয়ত্ত করিতে পারিলে বুঝা যায় যে, বিন্দুর ক্রোড়ে অনন্ত শয়ান।

হে স্বপ্রকাশ! আমরা আশাপথ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছি। তুমি স্বয়ং গুরু হইয়া প্রাণের মধ্যে আসিয়া আপনার স্বরূপ-তত্ত্ব ও নাম-মাহাত্ম্য বিবৃত কর।

উদ্ধারার্থে উৎকণ্ঠা আবশ্যক।

(১)

প্রাপ্ত।

মন, তুমি ঈশ্বরের অনুগ্রহে সম্প্রতি চেতনা পাইয়া কিছু উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিতেছ, "উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে?" এ উৎকণ্ঠা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তুমি যে এতদিন এরূপ ভাবে উৎকণ্ঠিত হও নাই, এক্ষণেও যতদূর উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত, ততদূর নহ এবং যাঁহারা ঈশ্বরের পরিচারক, তাঁহারা যে তোমার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন না, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। যাহা কিছু বিবেচনা কর না কেন, তোমার উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত; এ বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রকাশ করা কোন মতে উচিত নহে। আত্মা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা ও পরিত্রাণ সম্বন্ধে ঔদাসীন্য, উভয়ই নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য এবং মনের পাপিষ্ঠতার লক্ষণ। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অমনোযোগ অপেক্ষা তোমার উন্মত্তবৎ ব্যগ্রতা অযৌক্তিক ও আশ্চর্য্য জনক নহে। পার্থিব জীবন অনিশ্চিত। কখন মরিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। স্বর্গ বা নরক যেমন নিকটে, মৃত্যুও তেমনি নিকটে। অতএব "উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে?" এই প্রশ্নটী তোমার জিজ্ঞাসা করা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তোমার জীবন কেবল অনিশ্চিত নহে, তুমি পাপী। অতএব পরিত্রাণ পাইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া কি অন্যায়? তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়াছ; তাঁহার বিদ্রোহী হইয়াছ, শত্রুর ন্যায় তাঁহার সহিত ব্যবহার করিয়াছ। যদি তাঁহার একটী মাত্র আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমার অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইবে।

একটী মাত্র পাপ করিলেও তুমি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থার দণ্ড এড়াইতে পারিবে না। দুঃখের বিষয় এই, একটী বা দুইটী পাপ নয়, অসংখ্য পাপে তুমি পাপী। তোমার জীবনই পাপময়। ঈশ্বর-বিরুদ্ধে যাহা কিছু করিয়াছ, বিবেচনা করিলে দেখিতে পাইবে, সে সমস্ত কার্য্যই পাপ-কলঙ্কিত। তোমার পাপ ঈশ্বর হইতে প্রতিফল পাইবার প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি বাস্তবিকই সর্ব্বশক্তিমানের নিকট শাস্তি পাইবার উপযুক্ত।

বিনষ্ট হইলে কি কি হারাইতে হইবে, তাহা বিবেচনা কর। অমর আত্মাবিশিষ্ট মনুষ্যের যাহা যাহা প্রিয়, বিনষ্ট হইলে, তুমি সে সকলি হারাইবে। স্বর্গের সম্ভ্রম, সুখ ও প্রতাপ; হিতাহিত জ্ঞানবিশিষ্ট মনুষ্যের জীবন স্বরূপ ঈশ্বরের অনুগ্রহ; প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী হইবার জন্য যাহা আবশ্যক এবং অধমদিগের শেষ অবলম্বন যে প্রত্যাশা, সে সকলে তুমি বঞ্চিত হইবে। "নরক" এই কঠোর কথাতে যাহা যাহা আছে, তাহা তোমাকে ভুগিতে হইবে। "বস্তুতঃ মনুষ্য যদি সমুদয় জগৎ লাভ করিয়াও আপন প্রাণ হারায়, তবে তাহাতে কি ফল দর্শিবে?" একটী আত্মা বিনষ্ট হইলে, যে দুঃখ হয়, তাহা পৃথিবীর সমস্ত লোকের চক্ষের জলে, কাতরোক্তি বা ভয়ঙ্কর দুঃখ ভোগে কিছুতেই দূর হয় না। এই ভয়ঙ্কর দুঃখে পড়িয়াই তুমি বলিতেছ, "পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্তে আমাকে কি করিতে হইবে?"

আত্মার অধঃপতন কচিৎ ঘটনা নহে, সচরাচরই ঘটিতেছে। অতএব পরিত্রাণ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হওয়া তোমার পক্ষে যুক্তিযুক্ত বটে। আত্মার অধোগতি অতি শোচনীয় দুর্ঘটনা। ইহা বৎসরে না শতাব্দীর মধ্যে যদি একবার মাত্র ঘটিত, সুতরাং তোমার প্রতি না ঘটিতেও পারে, এমন যদি মনে কর তথাচ এ সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণেও ঔদাসীন্য প্রকাশ করা তোমার দোষ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, এ দুর্ঘটনা নিত্যই ঘটিতেছে। অতএব তোমার আরো অধিক মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। নরকে যাওয়া কঠিন নহে, স্বর্গে যাওয়াই কঠিন। বিনাশের পথে অনেক লোক গমন করে, কিন্তু জীবনের পথে অতি অল্প লোক যায়। নরক মুখ বিস্তার করিয়া অসংখ্য লোককে গ্রাস করিতেছে। নরক তোমাকেও গ্রাস করিতে পারে। ইহা ভয়ের কারণ বটে। অতএব "পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে?" এই প্রশ্নটী যেরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেইরূপ উৎকণ্ঠিত থাকা তোমার কর্ত্তব্য ও যুক্তিসঙ্গত কার্য্য।

পরিত্রাণ সম্ভবপর, নহিলে এ সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হওয়াতে তোমার কোন লাভ ছিল না। যাহা পাইবার নয়, তৎসম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হইতে উৎসাহ দেওয়া নিষ্ঠুরতার কার্য্য। কিন্তু তোমার নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। তুমি পরিত্রাণ পাইতে পার। পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত তুমি নিমন্ত্রিত। ঈশ্বর তোমাকে পরিত্রাণ দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। পরিত্রাণ পাইবার তোমার যে সুবিধা, সুযোগ সাহায্য ও উৎসাহের প্রয়োজন, সে সকলই নিকটে রহিয়াছে। এই মহা আশীর্ব্বাদ তুমি ইচ্ছা করিলেই লাভ করিতে পার। অতএব যে আশীর্ব্বাদ তোমার নিকট রহিয়াছে, তাহা যদি না পাও, তাহা হইলে সে তোমার নিজের দোষ। অতএব যাহা পাইবার নয় এমন কোন বস্তুর নিমিত্ত তুমি উৎকণ্ঠিত নও, ইহা জানিও।

অসংখ্য লোক পরিত্রাণ পাইয়াছে, তবে তুমি না পাইবে কেন? অযুত অযুত লোক পরিত্রাণ পাইয়াছে এবং অসংখ্য লোক পরিত্রাণের পথ দিয়া যাইতেছে। সকলকেই পরিত্রাণ করিবার জন্য পিতা ঈশ্বর দণ্ডায়মান। অতএব কেন পরিত্রাণ পাইবে না?

আবার পরিত্রাণ অতি মহা আশীর্ব্বাদ। পরিত্রাণ পাইলে দয়া ও গৌরব রাজ্যের মহাধনের অধিকারী হওয়া যায়। পাপ, মৃত্যু ও নরকের কর্ত্তৃত্ব হইতে রক্ষিত হইয়া ক্ষমা, শান্তি, স্বর্গ এবং পবিত্রতা লাভ করা যায়।

এই সমস্ত মহা আশীর্ব্বাদ আমরা একদিন বা দুই দিনের নিমিত্ত পাই না, অনন্ত কালের নিমিত্ত লাভ করিয়া থাকি। এই আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে দিবার নিমিত্ত ঈশ্বর অনন্তকাল হইতে প্রস্তুত আছেন। আমরা অনন্তকাল এই আশীর্ব্বাদ ভোগ করিয়া সুখী হইব। আহা! পরিত্রাণ অতি লোভনীয় বস্তু। ইহার সহিত পৃথিবীর কোন বস্তুর তুলনাই হইতে পারে না; মনুষ্য যে সমস্ত উৎকৃষ্ট বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে, ইহার সহিত সেই সকল বস্তুর তুলনা করিলেও নিতান্ত সামান্য, নগণ্য এবং ঘৃণার্হ বোধ হয়। ধর্ম্মেতে অবস্থিত পরিত্রাণ ও তৎসহিত অনন্তকাল স্থায়ী প্রতাপের সহিত যদি জাগতিক ধন, উচ্চপদ, যশঃ বা সম্ভ্রম তুলাদণ্ডে ওজন হয়, তাহা হইলে এই সকল তুলাদণ্ডের সামান্য ধূলিকণা মাত্র হইয়া যায়। অতএব সুখী হইবার নিমিত্ত যাহাদের কিঞ্চিন্মাত্র ও ইচ্ছা আছে, তাহারা নিশ্চয়ই বলিবে, "পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে।"

এই আশীর্ব্বাদ পাইবার জন্য যে অবস্থায় পড়িয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে কতক অংশে অনুকূল এবং কতক অংশ প্রতিকূল। ঈশ্বরের প্রেম, এবং পরমাত্মার শক্তি অসীম। ঈশ্বর তোমাকে পরিত্রাণ করিতে ইচ্ছুক এবং পরিত্রাণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ধর্ম্ম তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন। সকলই প্রস্তুত, তোমার পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ঈশ্বর অনুগ্রহ প্রদান করিতে প্রস্তুত। আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, তোমার অন্তঃকরণ ভ্রষ্ট; যে দেহে তুমি বাস করিতেছ, সেই দেহের সমস্ত বস্তু যেন একযোগ হইয়া তোমাকে পরিত্রাণে মনোযোগ করিতে দিতেছে না, বরং অবহেলা করিতে প্রবৃত্তি দিতেছে। পাপ তোমার চক্ষু অন্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত। পৃথিবীর অন্যান্য জাগতিক বিষয় তোমার অন্তঃকরণ এরূপ পূর্ণ করিয়া রাখে যে, "ধার্ম্মিকের পরিত্রাণ কচিৎ হয়।" তাই বলিয়া এই জগৎ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম অলম্বন বা মঠে বাস করা উচিত নহে। এই পরীক্ষাপূর্ণ ও বিপদ সঙ্কুল জগতে থাকিয়াই আত্মার পরিত্রাণ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

এখানে শারীরিক অভাব সম্বন্ধে চিন্তা করিতে করিতে অচৈতন্য হইয়া আত্মা পরিত্রাণ বিস্মৃত হইয়া যাইতে পারে। জগতের দৃশ্য ও অল্পকালস্থায়ী বিষয় সকলে মন এরূপ আকৃষ্ট হইতে পারে যে, অদৃশ্য ও অনন্তকাল স্থায়ী বিষয়ে মনোযোগ হয় না। ওঃ! জগতের বিষয়েই উপযুক্ত ভাবে মনোযোগ করা কত কঠিন। ইহার পর উভয় লোকের বিষয় এক সময়েই উপযুক্ত পরিমাণে মনোযোগী হওয়া আরো কঠিন। এই সকল ভাবিয়া তোমার বাস্তবিকই উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত।

পরিত্রাণ সম্বন্ধে নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হওয়া, তবে পৃথিবীর মধ্যে সকল বিষয় অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত। নিজ আত্মার অনন্ত সুখ সম্বন্ধে যে অমনোযোগী, সে নির্ব্বোধ এবং পশুতুল্য। সর্ব্বদা সে পর্ব্বতের পার্শ্বে বেড়াইতেছে, পা সরিয়া গেলেই নিম্নের অতলস্পর্শ গহ্বরে পতিত হইতে পারে; তথাচ রক্ষা পাইবার জন্য কিছুমাত্র উৎকণ্ঠিত নহে। আঃ! কি ভয়ঙ্কর সাংঘাতিক ঔদাসীন্য! আনন্দের সহিত উৎকণ্ঠাকে অন্তঃকরণে স্থান দাও। তোমার উৎকণ্ঠিত থাকা আবশ্যক। কেননা এই বিষয়ে উৎকণ্ঠিত না থাকিলে কখনই পরিত্রাণ পাইবে না, কেহ পায়ও নাই। পরিত্রাণ মহা আশীর্ব্বাদ, ইহা পাইবার জন্য যদি উৎণ্ঠিত না হও, তাহা হইলে প্রাপ্ত হওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব। পরিত্রাণ পাওয়াই তোমার উদ্দেশ্য, এই উদ্দেশ্যেই ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি পরিত্রাণ না পাইলে, তবে কেন ঈশ্বরের সৃষ্ট-রাজ্যে বাস করিতেছ, তাহা বুঝিয়া উঠা দুঃসাধ্য। ঈশ্বর তোমাকে

যে সমস্ত বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার লক্ষ্য তুমি অনন্তকাল স্থায়ী। তুমি যদি অনন্তকালের নিমিত্ত সৃষ্ট না হইতে, তাহা হইলে তোমার ইচ্ছাও মনোবৃত্তিনিচয় কখন অনন্ত কালের প্রতি চাহিয়া থাকিত না। অতএব অনন্ত পরিত্রাণ লাভ করাই তোমার জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। পৃথিবীতে যাহা কিছু উপার্জ্জন কর না কেন, যদি এই পরিত্রাণ লাভ করিতে না পার, তাহা হইলে জীবনের উদ্দেশ্যই ত সাধিত হইল না। সমস্ত বিশ্বরাজ্যের ধন উপার্জ্জন করিতে পার, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইতে পার, সাহিত্য সংসারের কুবের হইতে পার, বিজ্ঞান বা শিল্প সম্বন্ধে কোন আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা পৃথিবীতে যশলাভ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পার, কিন্তু আত্মার পরিত্রাণ যদি হারাও, তবে জীবন বৃথা ব্যয়িত হইল। পৃথিবীতে ধনবান বণিক, মহাযোদ্ধা, দর্শন শাস্ত্রে ও উত্তম উত্তম কবিতা রচনায় পারদর্শী হইয়া যশঃ সৌরভে সমস্ত পৃথিবী আমোদিত করিতে পার, কিন্তু পরিত্রাণ যদি হারাও তাহাতে কোন লাভ নাই। বরং ধর্ম্মে বিশ্বাসদ্বারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হইয়াছে এমন একজন দরিদ্রের অবস্থা তোমাপেক্ষা শতগুণে ভাল। সে অল্প মাত্র জ্ঞান পাইয়া অন্নাভাবে বা বস্ত্রাভাবে সমস্ত জীবন যাপন করিতে পারে, কাঁদিবার জন্য তাহার একজন না থাকিতে পারে; তথাপি পরিত্রাণের পথে যাইয়া সে তোমাপেক্ষা উত্তম ও লোভনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান অপেক্ষা স্বর্গের সর্ব্ব নিকৃষ্ট স্থানও বাঞ্ছনীয়। অতএব "পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আমাকে কি করিতে হইবে?" এই প্রশ্নের যতদিন সদুত্তর না পাও, স্থির থাকিও না। আর কেহ যেন এই বিষয় হইতে তোমায় হরণ না করে। যতদিন পরিত্রাণ বাঞ্ছা করিতেছ, ততদিন বিশ্বরাজ্যের মধ্যে যাহা মনোহর, তাহা তোমার চক্ষু দর্শন করিতেছে। তুমি ধ্যান করিতেছ এবং আশা করিতেছ; যদি কোন বাচাল বা অজ্ঞান বন্ধু তোমাকে অধিক চিন্তাযুক্ত হইতে নিষেধ করে, তাহা হইলে অতলস্পর্শ গহ্বর দেখাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, নরক যন্ত্রণা এড়াইবার নিমিত্ত কেহ কি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যগ্র হইতে পারে? স্বর্গের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা কর, কেহ কি ইহার অপূর্ব্ব প্রতাপ ভোগ করিবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যগ্র হইতে পারে? অনন্তকালের দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা কর, অনন্ত জীবন লাভ করিবার জন্য কেহ কি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যগ্র হইতে পারে? স্বর্গ রাজ্য ভোগ করিবার জন্য কেহ কি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যগ্র হইতে পারে?

চেতনা-প্রাপ্ত ও উৎকণ্ঠিত পাপি! তোমার বর্ত্তমান অবস্থা তুচ্ছ করিও না। তুমি অনেক দিন পর্য্যন্ত পাপ নিদ্রায় নিদ্রিত এবং মৃতবৎ ছিলে। সম্প্রতি সেই নিদ্রা হইতে উঠিয়া জীবনের অন্বেষণ করিতেছ, এখন হয় উঠিয়া আপন পথে অগ্রসর হইবে, নয় যাহারা পরিত্রাণের নিমিত্ত অতি অল্প মাত্রও উৎকণ্ঠিত নয় তাহাদিগের ন্যায় আবার আরো গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইবে। তোমার পরিবর্ত্তন সাধনার্থ পরমেশ্বর কার্য্য করিতেছেন। এক্ষণে তুমি হয় তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে, নয় তাঁহার কার্য্যে প্রতিরোধ জন্মাইয়া তাঁহার পরামর্শ অবহেলা করিবে। সুতরাং তিনি তোমার হৃদয়ে স্থান পাইবেন না। ঈশ্বর নিজের নিকটে রাখিবার জন্য তোমাকে প্রেমডোরে বাঁধিয়াছেন; অতএব তাহাতে বাধা দিও না। যে ডোরে বাঁধিয়া ঈশ্বর তোমাকে টানিতেছেন, তাহা ছিঁড়িবার চেষ্টা করিও না। পরিত্রাণ তোমার নিকটে রহিয়াছে, তুমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিরোধ করিয়া বা অনবধানতা দেখাইয়া ঈশ্বরেচ্ছার প্রতিরোধ করিতে পার বটে। অতএব বিনয় করি, নিজ অবস্থা সম্বন্ধে অমনোযোগী হইও না। যদি কোন একটী বিষয়েও তোমার বিশ্বাস হইয়া থাকে বা কোন ধর্ম্মভাব মনে জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রতি কখন ঔদাসীন্য দেখাইও না। এক্ষণে যে অবস্থায় আছ, সেই অবস্থায় অনেক দিন থাকিতে পারিবে না। হয় অতি শীঘ্র মনোপরিবর্ত্তন করিবে, না হয় ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসী হইয়া উঠিবে। বসন্তকালের ফুলের কুঁড়ির ন্যায় তোমার বিশ্বাস হয় অতি শীঘ্র ফল পুষ্পে পরিণত হইবে, না হয় ভূমিতে নষ্ট হইয়া যাইবে। বর্ত্তমান ব্যগ্রভাব যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে এই সমস্ত ধর্ম্মভাব একেবারে দূর হইয়া যাইবে; যদি ইহা একবারে দূর হইয়া যায়, তাহা হইলে আবার ফিরিয়া পাওয়া বিশেষ কঠিন হইবে। পাপের বিষয়ে চৈতন্য জন্মিলে ও ধর্ম্মভাব উদিত হইলে, তাহার প্রতি লঘু ভাবে দৃষ্টি করা অত্যন্ত বিপজ্জনক। মনের সাধু ভাব যদি রক্ষা করিতে চাও, তাহা হইলে, ধর্ম্মের নিয়ম রক্ষা কর। ধর্ম্মভাব যে মন হইতে দূরে যাইতে পারে, তাহা স্বীকার কর। পতনের সম্ভাবনা নাই, ইহা মনে করিও না। স্বার্থপরতা, মনে স্থান দিও না। সচরাচর লোকের ভক্তিভাব অল্পকাল মাত্র স্থায়ী হইয়া থাকে। সুতরাং পরিত্রাণ সম্বন্ধে অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছ বলিয়া তোমার পরিত্রাণ নিশ্চয়, ইহা ভাবিও না। যাহারা আপনাদের কোন কার্য্যের উপর নির্ভর করে, তাহারা নিশ্চয়ই লজ্জিত হইবে। কিন্তু যাহারা সভয়ে ও সকম্পে নিজ নিজ পরিত্রাণ সাধন করে, তাহারা দণ্ডায়মান থাকিবে।

তুমি আবার নিজ পরিত্রাণ সম্বন্ধে অচৈতন্য হইতে পার, ইহা ভাবিয়া ভীত হও। নিতান্ত মর্ম্মভেদী দুঃখে কাতর হইয়া বল, "ওঃ আমি বিশ্বাসঘাতক হইতে পারি; পরিত্রাণ সম্বন্ধে আমার অন্তঃকরণ এখন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে বটে, কিন্তু এভাব যাইলে আমি আবার অচৈতন্য হইতে পারি; আমার আত্মা এক্ষণে যদিও স্বর্গরাজ্য হইতে অধিক দূরে নাই বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু ইহা স্বর্গের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিতে পারে এবং ঈশ্বরের পথেও আর না চলিতে পারে; আমার আত্মীয়গণ ও উপদেশক আমাকে বিপথগামী দেখিয়া বলিতে পারেন, 'তুমি উত্তমরূপে দৌড়িতেছিলে, কে তোমাকে বাধা দিল?' এইরূপ হইলে কি ভয়ঙ্কর পরিবর্ত্তন হইবে! ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করুন, যেন আমার মন হইতে ধর্ম্মভাব দূর না হয়।" মন এই ভাবে প্রার্থনা করিতে থাক।

প্রেরিত পত্র।

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্ত সম্পাদক দায়ী নহেন।)

উন্নত গুরুবাদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টমতঃ। দেখিতে হইবে কতকগুলি ভড়ং বুজরুকির চমকে আমরা কাহাকেও গুরু মনোনীত না করিয়া ফেলি। ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও এই ভাব দেখা দিয়াছিল যে ব্রাহ্ম গৈরিকধারী দেখিলেই বিশেষ ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। ইহারাও এবম্বিধ ভক্তি পাইয়া অহঙ্কৃত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের বক্ষ ছিন্ন ভিন্ন করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন এবং এখনও আছেন।

নবমতঃ। কর্ণে মন্ত্রদান প্রণালীকে দূষণীয় মনে করা কর্ত্তব্য। ইহাকে গুরুগিরির একটী ভড়ং বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। নবজীবনের হেতু বলিয়া যে মন্ত্রেতে গুরু শিষ্যের বিশ্বাস, প্রকাশ্যে ঘোষণা না করিয়া তাহা নির্দ্দিষ্ট প্রণালীক্রমে গোপন করিবার চেষ্টা পাওয়া হয়। মন্ত্র অথবা মত পূর্ব্বেই প্রকাশ করিলে উহা বিচারপূর্ব্বক গ্রহণ করা যায় এবং উহা লইয়া বৈধ আন্দোলনও চলিতে পারে। কিন্তু মন্ত্র গ্রহণ প্রণালী বিচার ও বিবেকরোধক উহাতে সে সুবিধা প্রদান করে না। ইহা অতীব গর্হিত এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ যে না বুঝিয়া কেহ কোন মত গ্রহণ করিয়া বসিবে। আমাদিগের দেশে দ্রব্যগুণ এবং মন্ত্রগুণের ব্যতিক্রম আশঙ্কায় মন্ত্রৌষধি দুইই গোপন করিবার নিয়ম আছে। এবং আমরা যেমন আজ কাল patent ঔষধের ব্যবসা দেখিতে পাই, মন্ত্রদানও প্রাচীনকাল হইতে একটী ব্যবসাতে পরিণত হইয়াছে। পেটেণ্ট ঔষধে বরং বহুলোকের উপকার হইয়াছে, গুপ্তমন্ত্রের ব্যবসাতে ধনোপার্জ্জন ও মানমর্য্যাদা বজায় রাখা সম্বন্ধে মন্ত্রদাতাদিগের যে কিঞ্চিৎ উপকার হইতেছে, তদ্ভিন্ন আর কাহার কতদূর কি হইতেছে তাহা আমরা না দেখিতেছি এমন নয়। আবার বিশ্বাসের দিকে এই বলা যাইতে পারে যে মন্ত্রকে বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট বোধ করাও যেমন fetishism, প্রকাশ করিলে সেই শক্তি চলিয়া যাইবে এ বিশ্বাসও তদ্রূপ fetishism, গুপ্তমন্ত্র গ্রহণ করিয়াই ব্রাহ্মণ কুমার দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হন। দেশীয় ওঝা গুপ্তমন্ত্র গুপ্তপ্রণালী শিক্ষা দিয়া শিষ্য লাভ করিয়া থাকে। ফ্রিমেসন ও থিওসফির দল ইহাতেই পরিপুষ্ট হইতেছে। গোপনীয় মত সমুদয় এক প্রকার নীতিবিরুদ্ধ ঔৎসুক্য জন্মায়, ইহাতেই চঞ্চলমতি লোকেরা সত্যাসত্য বিবেচনাহীন হইয়া যে কোন দলভুক্ত হইয়া থাকে। যে সমুদয় ব্রাহ্মেরা দেব সমাজ ও যোগসমাজে যোগ দান করিতেছেন, তাঁহারা কিরূপে উহাতে প্রবেশ করিতেছেন কিম্বা করিয়াছেন বিচার করিয়া দেখিবেন। কর্ণে মন্ত্র দান প্রণালী এবং গ্রন্থাদি অপ্রকাশ রাখা স্থিতিশীল কুটীল ধর্ম্মের লক্ষণ। সরল সাহসিক প্রচারক ধর্ম্মের পদ্ধতি ইহা নহে। ঈশার উপদেশ এই :—"যাহা তোমাদিগকে একান্তে বলিয়াছি, তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর।" আলো জ্বালিয়া কেহই ঢাকিয়া রাখে না, তোমাদিগের আলো সেইরূপ দীপ্তিদান করুক যাহাতে সকলে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পায়।"

দশমতঃ ধর্ম্মোপদেশকদিগের ঐহিক ক্ষমতা হস্তে লওয়া ভাল বোধ হয় না। ক্ষমতা হইলেই তাহার দায়িত্ব আছে। রাজকার্য্য ও ধর্ম্মোপদেশকের কার্য্য দুইটী গুরুতর বিষয় এক জনের দ্বারা ভাল চলিবার সম্ভাবনা অল্প। আর ক্ষমতা হস্তে লইলে অনেকের ভয়ের কারণ হইতে হয়। যাহারা ক্ষমতার উপাসক এমন সমুদয় তোষামোদকারী লোকেরা ধর্ম্মের আবরণ লইতে আরম্ভ করে। অতি অল্প লোকেই ক্ষমতাহীন নিরীহ সাধুতার মর্য্যাদা জানে; এজন্যও ধর্ম্মের সহিত অলৌকিক ঘটনার সংযোগ করা হইয়াছে। কিন্তু ধনমান ক্ষমতার চমক কমিয়া গিয়া লোকের চক্ষু যাহাতে অবিমিশ্র সাধুতার দিকে আকৃষ্ট হয়, ধর্ম্ম গুরুর তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক। ইহার রাজ্য বাহিরে নয় কিন্তু অন্তরে। লোকে আচার্য্যকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিবে, তাঁহারাও ঈশ্বরের নামে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, ইহাই উত্তম। কেহ বলিতে পারেন, যাহারা সাধু তাঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতার উপযুক্ত। কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীর অবস্থা জানিয়াই তাঁহার সুধীর পুত্রের মুখ দিয়া এই কথা বাহির করিয়াছিলেন, "আমার রাজ্য এ পৃথিবীর নহে।" ধর্ম্মোপদেশক যে কোন দেশে সাধুতার আদর্শ হইবেন; লোকে জানুক যে ক্ষমতা পরিচালন অপেক্ষাও ইহার কার্য্য উচ্চতর এবং অধিক পবিত্র। ইনি সমাজের শাসনকর্ত্তা নহেন, কিন্তু মুরব্বি এবং অভিভাবক। ধর্ম্মোপদেশকদিগের হস্তে ঐহিক ক্ষমতা থাকাতে তাহার অনেক অসদ্ব্যবহারও হইয়াছে। এসিয়া এবং য়ুরোপ ইহার প্রচুর সাক্ষ্য দিবে। প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইতে য়ুরোপে উহা উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু এসিয়াতে ইহার দৌরাত্ম্য এখনও আছে। ফলত প্রখর পাপ বোধ এবং অনুতাপ জন্মাইয়া মনুষ্যের মন ফিরানই ধর্ম্ম গুরুর কার্য্য, দুষ্ট দমনের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ থাকা আবশ্যক। গুরু যিনি, তিনি গুরুই থাকুন, যিনি রাজা তিনি রাজাই থাকুন; রাজা গুরু হওয়াতে যেমন পৃথিবীর অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে, আবার গুরু রাজা হওয়াতেও পৃথিবীর কম অনিষ্ট হয় নাই।

একাদশতঃ। গুরু কিম্বা আচার্য্যের নিকট (Confession) অর্থাৎ পাপ স্বীকারের রীতি প্রচলিত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহাতে গুরুকে কতক পরিমাণে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ঈশ্বরই পরম গুরু হৃদয় বন্ধু। যাঁহার নিকট পাপের কষ্ট সহিতে না পারিয়া বারম্বার প্রাণ খুলিয়া দিতে পারি। স্বয়ং অন্তর্যামী হইয়াও আমাদিগের পাপী মনকে সাক্ষাৎ ভাবে ভাই ভগিনী হইতে ঢাকিয়াছেন। ইহা তাঁহারই নিয়ম যে, ভাই ভগিনীরা আমাদিগের অনেক পাপ দুর্ব্বলতা জানিতে পাইবেন না। সুতরাং আমরা স্বীয় মনানলে দগ্ধ হই, ইহাই উত্তম,—ইহাই স্বাভাবিক; তদ্বিপরীত যাহা তাহা স্বভাববিরুদ্ধ যাহা স্বভাববিরুদ্ধ তাহা গর্হিত। আবার মনুষ্যের নিকট পাপ স্বীকার করিব বলিয়াও যদি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট পাপটী কিম্বা উহার সর্ব্বাপেক্ষা উৎকট অংশটী গোপন করি, তাহা

হইলে এক প্রকার কপটতা হয়। আর কেমন করিয়াই বা তুমি উহা অন্যের নিকট প্রকাশ করিবে? যাহা নিজের মনে উদয় হইবামাত্র হয় ত লজ্জিত না হইয়া পার না, তাহা অন্যের নিকট সপ্তাহে সপ্তাহে প্রকাশ করিয়া কি তুমি একেবারে নির্লজ্জ হইয়া উঠিবে না? সুতরাং পাপস্বীকার প্রণালীতে উভয় সঙ্কট। মনুষ্যকে পাপ জানাইলে কি হয়? এই হয় যে, যে অনুতাপ কষ্টকর হইয়া উঠিতে ছিল এবং শীঘ্রই ফলদায়ক হইত, তাহাতে বাধা জন্মে। ইহাও দেখা যায় যে পাপ প্রবৃত্তি আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়। যাঁহার নিকট পাপ স্বীকৃত হয়, তিনিও যেন নিজেকে তত নির্বিঘ্ন মনে না করেন। রোমীয় খৃষ্ট সমাজে পাপস্বীকার-প্রণালী অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজেও ইহা প্রবেশ করিয়াছে। কোন কোন স্থানে সঙ্গত সভার কার্য্য এই প্রণালীতেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যাহা মনুষ্যকে বলিবার যোগ্য তাহা মনুষ্যকে বল; যাহা কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রকাশিত থাকিবার যোগ্য, তাহা কোন মনুষ্যকে বলিও না। সাংসারিক দুঃখনির্যাতনও অনেক সময়ে চাপিয়া গেলেই ফললাভ করিবে, কিন্তু প্রকাশ করিলে অধিকতর সঙ্কটাপন্ন হইবে। পাপই হউক, দুঃখই হউক, পূর্ণ পরিত্রাতা ঈশ্বর ভিন্ন কেহই জীবন্মুক্তি দিতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় রোমীয় পাদ্রিগণ absolution অর্থাৎ পাপ ক্ষমা এবং মুক্তিরও কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

গুরুকরণ সম্বন্ধে মহর্ষি ফ্রানসিসের রচিত ভক্ত জীবনী হইতে কতক অংশ এস্থলে অনুবাদিত হইতেছে:—"হে বন্ধু যদি ভক্তির জীবন পথে চলিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে পরিচালনা করিতে পারেন, এমন কোন সাধু ব্যক্তির অনুসন্ধান লওয়া তোমার পক্ষে অতিশয় লাভজনক হইবে।" "বিশ্বস্ত বন্ধু একটী প্রবল রক্ষাহেতু, যিনি তেমন একটী বন্ধু পাইয়াছেন তিনি একটী ভাণ্ডার পাইয়াছেন।" "বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনের ঔষধিস্বরূপ।" "হে প্রিয় যদি তুমি উত্তম পরিচালনার অধীন হইয়া ভক্তির যাত্রায় বাহির হইতে মনস্থ করিয়া থাক, অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্তে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যে তিনি তোমাকে তাঁহার পসন্দমত একটী উপযুক্ত পরিচালক জুটাইয়া দেন, সন্দেহ করিও না, তিনি তোমাকে একটী জ্ঞানী এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি প্রদান করিবেন।" "ফলত যাঁহাকে আধ্যাত্মিক পরিচালকরূপে মনোনীত করিয়াছ, তুমি তাঁহাকে একটী স্বর্গীয় দূতের ন্যায় দেখিবে। অর্থাৎ যখন তুমি তাঁহাকে লাভ করিলে, সামান্য মনুষ্যের প্রতি যে ভাবে দৃষ্টি কর কিম্বা বিশ্বাস কর, তাঁহার জ্ঞানবত্তা ও তাঁহাতে সে ভাবে করিও না। তুমি পরমেশ্বরের পানে তাকাইবে; তিনি তোমার সহায়তা করিবেন এবং তোমার আবশ্যকীয় বিষয় এই ব্যক্তির চিত্তে ও মুখে প্রদান করিয়া ইহার মধ্য দিয়া তোমার নিকট কথা বলিবেন।" "তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ সরলচিত্তে ও বিশ্বস্তভাবে ব্যবহার করিবে।" "ইহাতে বিপন্নাবস্থায় তুমি শান্তি এবং বল পাইবে, সম্পদে নিয়ম এবং সীমাতে আবদ্ধ থাকিবে।" "তোমার মনোনীত ধর্ম্মগুরুকে ভক্তিমিশ্রিত অন্তঃকরণের বিশ্বাস প্রদান কর; সইরূপ সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে, শিশু যেরূপ পিতাকে বিশ্বাস করে। সেইরূপ ভক্তির সহিত তাঁহাতে নির্ভর করিবে, পুত্র যেমন মাতার উপর নির্ভর করে। অধিক কি, এই প্রকার বন্ধুতা দৃঢ় এবং সত্যতাপূর্ণ, অত্যন্ত পবিত্র, দিব্যভাব যুক্ত, ও আধ্যাত্মিক হওয়া আবশ্যক।" "এই প্রকার লক্ষ্য রাখিয়া সহস্র কেন দশ সহস্রের মধ্যে একটী লোক মনোনীত করিও, কেন না যত মনে করা যায় এই কার্য্যের উপযুক্ত তদপেক্ষায়ও অল্পতর সংখ্যক রহিয়াছে। জ্ঞানেতে, প্রেমেতে সদ্বিবেচনাতে ইহাঁর পূর্ণ হওয়া চাই, তিনের একটীর অভাব হইলে বিপদ আছে।" এই অনুবাদে প্রবন্ধের আপত্তিজনক অংশ সমুদয় পরিত্যক্ত হইল।

১৬ই শ্রাবণের তত্ত্বকৌমুদীতে গুরু শিষ্য বিষয়ে অনেক সারবান কথা আছে, বাহুল্য বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত করিলাম না। আবশ্যক বোধ হইলে যে কেহ উপরকার কয়েক পঁক্তির সহিত উহা মিলাইয়া দেখিলে উপস্থিত বিষয়ে অনেক পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। অনুবাদিত কয়েক পঁক্তিতে কেবল গুরুশিষ্যের ব্যক্তিগত ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তত্ত্বকৌমুদীতে ধর্ম্মোপদেশক অথবা আচার্য্যের প্রতি একটী সমাজ কি ভাব রক্ষা করিবেন, তাহাও বলা হইয়াছে।

নানা ধর্ম্মবলম্বীরা গুরুকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদান করিয়াছেন। ইহারা যেমন একদিক দেখিয়াছিলেন, তেমনি গুরুবিরোধীও কেবল একদিক দেখিতেছেন। ধীরতার সহিত বিষয়টীর দুইদিক দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে প্রকৃত সত্য মধ্যপথ আশ্রয় করিয়া আছে। ধর্ম্ম শিক্ষকদিগকে যে ভক্তিও বাধ্যতা প্রদান করা আবশ্যক, তাহা আমরা ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন যুবক দলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও না বুঝিতে পারি এমন নয়। বলা বাহুল্য ইহাঁদিগের সমতলকারী বিশৃঙ্খল ভাব সমস্ত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই আছে। ইহাঁরা অতিরিক্ত স্বাধীনতা গ্রহণপূর্ব্বক অপরিপক্কাবস্থাতেই অমিতাচারী পুত্রের ন্যায় উপরিস্থদিগের শিক্ষাও শাসনাধীনতা-রূপ পিত্রালয় পরিত্যাগ করিলেন। আশা ছিল যে স্বতন্ত্রভাবে নানা সদনুষ্ঠান দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের সাহায্য করিবেন, কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসকে পরিচালক মনোনীত করাতে অধিক কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। যদি ইহাঁদিগের ধারণা থাকিত, যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এমন অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন, যাঁহাদিগের নিকট ইহাঁরা শিক্ষালাভ করিতে পারেন কিম্বা ইহাঁরাই যে ধর্ম্মসম্বন্ধে পূর্ণশিক্ষা লাভ করিয়াছেন এমন নহে, প্রত্যুত ইহাঁদিগেরও শিখিবার এবং সংশোধিত হইবার অনেক আছে, তাহা হইলে অবশ্য সহিষ্ণুতার সহিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আশ্রয় করিয়া থাকিতেন। এই প্রকার সহিষ্ণুতাই যথার্থ প্রেমের লক্ষণ। যেখানে তাঁহারা সেই শিক্ষা পাইয়াছেন, যাহাকে জীবনাস্ত্র বলিলে হয়, সামান্য মতভেদ উপলক্ষ করিয়া তাঁহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও হয়, শিক্ষা গ্রহণ করুন, না হয় শিক্ষা প্রদান করুন; সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের দ্বার তাঁহাদিগের জন্য উন্মুক্ত আছে। যাঁহারা এখন উত্তম শিষ্য হইবেন, তাঁহারা শেষে উত্তম শিক্ষক হইবেন। কিন্তু শীঘ্র গুরু হইতে না পারিলেই চলিয়া যাওয়া

চঞ্চলতার কার্য্য। মহাত্মা কবির বলিয়াছেন, "গুরু সহস্র সহস্র জুটিল শিষ্য একটীও দেখি না।" ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা কতকটা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে, যেন সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে চাহেন। কবে আমরা সত্যেতে এবং ঈশ্বরাধীনতায় সম্মিলিত হইব? হে ব্রাহ্ম, "উৎকৃষ্ট আচার্য্যের নিকট যাইয়া জ্ঞানলাভ কর, পণ্ডিতেরা ধর্ম্মপথকে শাণিত ক্ষুর-ধারের ন্যায় দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন।"

ঢাকা, নিবেদক
শ্রীকালীপ্রসন্ন বসু।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত "তত্ত্বকৌমুদী" সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—*

১লা অগ্রহায়ণের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রহ্মবিদ্যালয়" শীর্ষক প্রাপ্ত প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় আর একখানা পত্র লিখিয়াছেন। পত্রের শেষ পংক্তি পড়িয়া বোধ হইল, বর্ত্তমান বিষয়ে এই পত্রই তাঁহার শেষ পত্র। তিনি যদি আর না লেখেন, অথবা লিখিলেও কোন নূতন যুক্তি না আনেন, এবং আমার মতের কোন ভ্রান্ত বর্ণনা বা ব্যাখ্যা না দেন, তবে আমারও এই পত্রই শেষ পত্র।

মতভেদ অবান্তরিকই হউক আর দার্শনিকই হউক, পরস্পর বিরোধী মতাক্রান্ত পুস্তক পড়ান সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় এই পত্রেও বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন। আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম, এখনও বলি যে বৈজ্ঞানিক শিক্ষায়—যে শিক্ষায় যুক্তিদ্বারা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সত্য ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যুক্তিদ্বারা ধর্ম্ম-বিরোধী ভ্রান্ত মতের খণ্ডন করিতে হইবে,—সেই শিক্ষায় পরস্পর বিরোধী মতের আলোচনা অপরিহার্য্য। আর যদি ধর্ম্ম-বিরোধী দার্শনিক মতের আলোচনা অপরিহার্য্য হইল, তবে ধর্ম্মের সহায় অথচ পরস্পর-বিরোধী দার্শনিক মতের আলোচনায়ই বা ক্ষতি কি? তবে প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের ধারণা এই যে কতকগুলি দার্শনিক মত, যথা অদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ইত্যাদি, ব্রাহ্মধর্ম্মের সহায় নহে, বিরোধী। এখন কথা এই, দার্শনিক আলোচনা ব্যতীত এই বিষয় কিরূপে স্থির হইবে? আর এই আলোচনা কে করে? আলোচ্য পত্রের প্রথম কয়েক পংক্তি পাঠে বোধ হয়, লেখক মহাশয় "তর্কজালের মধ্যে পড়িতে" নিতান্ত অনিচ্ছুক। অনিচ্ছুক হইলে চলিবে কেন? অধিকাংশের ভোটের দ্বারা কতকগুলি দার্শনিক মতকে ব্রাহ্মসমাজের মত বলিয়া পরিচিত করা, আর অপর কতকগুলিকে ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া প্রচার করা,—এই গুরুতর কার্য্য কি তর্ক ছাড়া সম্পন্ন হইতে পারে? আর যদি প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের ধারণাই সত্য হয়, তাহা হইলেও বলি, ঐ সকল ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী মতকে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আর দশটা অব্রাহ্ম মতের ন্যায় আলোচনা করিতেই বা ক্ষতি কি? এই সকল মত যে ভ্রান্ত এবং এই সমুদায়ের উপর যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, তাহা আলোচনা দ্বারা যেমন বুঝা যাইবে, আর কিছুতেই তেমন বুঝা যাইবে না।

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় কয়েক পংক্তির মধ্যেই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অদ্বৈতবাদীর পক্ষে আরাধনা, প্রার্থনা, পাপপুণ্য, পরিত্রাণ ইত্যাদির কোন অর্থই নাই, আর ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ২ | ৪ কথায় এরূপ গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিবার সাধ্য আমার নাই, অথচ প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়ের যুক্তির উত্তরে কিছু না বলিয়াও আমি পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিতেছি না, তাই কিছু বলি। অদ্বৈতবাদীরা এক অখণ্ড চৈতন্যের মধ্যেই ব্যষ্টি ও সমষ্টি, উপহিত ও শুদ্ধ চৈতন্যের যে প্রভেদ করেন এবং আরাধনা প্রভৃতির সপক্ষে যাহা বলেন, প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় সেই সকল কথার খবর লইয়াছেন কি না জানি না। যাহা হউক যে মত অদ্বৈত ভাবের ভিতর দ্বৈতভাব দেখে না, যে মত জীব ও ব্রহ্মের অনন্ত প্রভেদ দেখে না, আমি সেই মতাবলম্বী নহি, সুতরাং প্রবন্ধ-লেখক ইহার বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার উত্তর দেওয়া আমার কার্য্য নহে। তবে তিনি দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সে বিষয়ে ২ | ১টী কথা বলিব। ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ লোক আপনাদিগকে দ্বৈতবাদী মনে করেন, ইহা ঠিক, কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি এবং আরো কোন কোন দর্শনালোচক ব্রাহ্ম দেখিতে পাইতেছেন যে, ব্রাহ্মসমাজের মত খাঁটি দ্বৈতবাদও নহে, খাঁটি অদ্বৈতবাদও নহে, ইহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। ঈশ্বরকে "তুমি" বলাতে জীব ও ব্রহ্মে প্রভেদ (distinction) বুঝায় সত্য, কিন্তু "তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, তুমি প্রাণ স্বরূপ," ইহা বলাতে প্রভেদের মধ্যেও আবার প্রাণগত একতা বুঝায়, পার্থক্য (division বা separation) এর অভাব বুঝায়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় দেখাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে যে, যেমন দ্বৈতভাব ব্যতীত উপাসনা হয় না, তেমনি অদ্বৈতভাব ব্যতীতও উপাসনা হয় না; দ্বৈতাদ্বৈতভাবই উপাসনার প্রকৃত ভিত্তি। প্রবন্ধ-লেখক বলেন জীব ও ব্রহ্মে পার্থক্য না থাকিলে তাঁহাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধের কোন অর্থ থাকে না। আমার ত বোধ হয় বরং পার্থক্য থাকিলেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অর্থহীন। পার্থক্যের অর্থ পরস্পরের বাহিরে থাকা। ঈশ্বর যদি আত্মার বাহিরেই রহিলেন, তবে আর তাঁহাকে আত্মার আত্মা, অন্তরবাসী, অন্তর্যামী, হৃদয়দর্শী, বিবেকরূপী বলিব কিরূপে? এই সকল স্বরূপ পার্থক্যের অভাবই প্রকাশ করে। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মকে খাঁটি দ্বৈতবাদের উপর দাঁড় করাইবার চেষ্টা নিষ্ফল। খাঁটি দ্বৈতবাদে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, আরাধনা, প্রার্থনা, বিবেকবাণী প্রভৃতি সমুদায়ই অসম্ভব।

"যে সকল মতে নিজেরা ঐক্য হইতে পারেন নাই, সেই সকল কুটিল মতের গোলযোগে বালকদিগকে জড়াইতে যাওয়া, কথনই কর্ত্তব্য মনে হয় না।" এই কথার উত্তর এই—(১) ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সিনিয়ার ক্লাসের ছাত্রগণ বালক নহে; (২) শিক্ষকদিগের সাধারণ একতার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে অনৈক্য দর্শনে শিক্ষার্থীদিগের ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; শিক্ষকেরা কিছু শিক্ষার্থীদিগকে তাঁহাদের মতের অন্ধানুসরণ

* ব্রহ্ম-বিদ্যালয় সম্বন্ধে বাবু সীতানাথ দত্ত এবং ১৬ই ভাদ্রের তত্ত্বকৌমুদীর প্রাপ্ত প্রবন্ধ লেখকের সহিত যে তর্ক চলিতেছে, আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহার মূল বিষয়ের মীমাংসা একরূপ হইয়া গিয়াছে। এখন অবান্তরিক বিষয়ের তর্ক চলিতেছে। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর পত্র প্রকাশ করিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে ১৬ই ভাদ্রের প্রাপ্তপ্রবন্ধ লেখকের শেষ উত্তর দিবার অধিকার আছে। অতঃপর তাঁহার উত্তর ভিন্ন এ সম্বন্ধে অন্য পত্র প্রকাশিত হইবে না। তঃ সঃ

করিতে উপদেশ দেন না, স্বাধীনভাবে বিচার করিতেই উপদেশ দেন; (৩) সিনিয়ার ক্লাসের শিক্ষকদ্বয়ের মধ্যে আলোচ্য দার্শনিক মতে বিশেষ ঐক্য আছে; (৪) সাধারণতঃ শিক্ষকদের মধ্যে যে অনৈক্য, তাহাও অতি অল্প, সমবেত আলোচনা দ্বারা ক্রমশঃই ঐকমত্য স্থাপিত হইতেছে।

আমি আত্মপ্রত্যয় সম্বন্ধে আমার শেষ পত্রে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহার কোন উত্তর না দিয়া প্রবন্ধ-লেখক তাহার পত্রের শেষভাগে আমার উপর এক অতি অদ্ভুত মত আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—"সহজজ্ঞান ও প্রত্যেক বিষয়-জ্ঞানের সহিত আমি আছি এই জ্ঞানকে যখন তিনি এক করিয়া লইয়াছেন,......তখন আর তাঁহার সহিত এ বিষয়ে কোন কথা না বলাই ভাল।" আমার মত সম্বন্ধে প্রবন্ধ-লেখকের এরূপ গুরুতর ভ্রম হইবার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। "আত্মজ্ঞান বিষয়-জ্ঞানের নিত্যসঙ্গী" এই সত্যকে আমি সহজজ্ঞানের সহিত "এক করিয়া" লই নাই, এই সত্যকে একটী সহজজ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ সত্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় আরো কতিপয় আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ সত্যের ব্যাখ্যা আছে; উপরোক্ত সত্য ব্যাখ্যার অব্যবহিত পরেই আর একটী মূল তত্ত্বের ব্যাখ্যা আছে, সুতরাং আমি উপরোক্ত একটীমাত্র সত্যকে ও সহজ জ্ঞানকে "এক করিয়া" লইয়াছি, এরূপ অদ্ভুত ভ্রমের জন্য আমি দায়ী নই, প্রবন্ধ লেখক মহাশয়ই দায়ী।

অনুগত
শ্রীসীতানাথ দত্ত।

ব্রাহ্মসমাজ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধীনস্থ ব্রহ্মবিদ্যালয়ের সংশ্রবে বিগত জুলাই মাসে যে পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত ছাত্র ও ছাত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন—

সিনিয়ার কোর্স।

উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের নাম।	স্থান।	কলেজ বা কর্ম্মস্থান।
১। শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায়,	কলিকাতা,	মিট্রপলিট্যান্ ইনষ্টিটিউশন।
২। শ্রীমোহিনীমোহন রায়,	ঐ	শিয়ালদহ ছোট আদালত।

জুনিয়ার কোর্স।

উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণের নাম।	স্থান।	অভিভাবকের নাম।
১। শ্রীমতী প্রেমকুসুম সেন,	কলিকাতা,	বাবু চণ্ডীচরণ সেন।
২। শ্রীপ্রিয়দর্শন হালদার,	ঐ,	বাবু কেদারনাথ রায়।
৩। শ্রীমতী প্রফুল্লবালা বসু,	ঐ,	বাবু হরনাথ বসু।
৪ { শ্রীসাধুচরণ দে,	ঐ,	... ...
শ্রীপ্যারীলাল ঘোষ,	মেদিনীপুর,	বাবু তারকগোপাল ঘোষ।
৫। শ্রীমতী ইন্দুমতী মৈত্র,	কলিকাতা,	শ্রীমতী জগত্তারিণী মৈত্র।
৬ { শ্রীসুধীর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,	বগুড়া,	বাবু শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীমতী কুসুমকুমারী বসু,	বাঁকুড়া,	বাবু হরকান্ত বসু।
৭। শ্রীমতী গিরিবালা বিশ্বাস,	কলিকাতা,	বাবু দ্বিজদাস বিশ্বাস।
৮। শ্রীভূপতি রক্ষিত,	গয়া,	বাবু গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত।
৯। শ্রীঅন্নদাচরণ সেন,	বরিশাল,	বাবু মনোরঞ্জন গুহ।
১০। শ্রীহীরালাল ঘোষ,	কলিকাতা,	বাবু কালীপ্রসন্ন বসু।
১১। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি রক্ষিত,	গয়া,	বাবু গোবিন্দচন্দ্র রক্ষিত।
১২। শ্রীবিপিনকৃষ্ণ রক্ষিত,	ঐ,	ঐ।

প্রাইমারি কোর্স।

উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগের নাম।	স্থান।	অভিভাবকের নাম।
১। শ্রীকালীমোহন ঘোষাল,	কলিকাতা,	বাবু কালীচন্দ্র ঘোষাল।
২। শ্রীশশধর হালদার,	ঐ,	বাবু কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩। শ্রীমতী সরোজিনী ঘোষ,	ঐ,	বাবু চন্দ্রকুমার ঘোষ (গয়া)।
৪। শ্রীমতী বিনয়কুমারী বাগ্‌চি,	পাবনা,	বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগ্‌চি।
৫। শ্রীমতী সরলাবালা গঙ্গোপাধ্যায়,	কলিকাতা,	বাবু মথুরামোহন গঙ্গোপাধ্যায়।
৬। শ্রীমতী সৌদামিনী বন্দ্যোপাধ্যায়,	কলিকাতা,	বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (লাহোর)।

সর্ব্বশুদ্ধ ২৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন; সিনিয়ার কোর্সে ৩ জন ও জুনিয়ার কোর্সে ১ জন অনুত্তীর্ণ। সিনিয়ার কোর্সে ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় ও বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, জুনিয়ার কোর্সে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং প্রাইমারি কোর্সে বাবু আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায় পরীক্ষা গ্রহণ করেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—আমরা ইতিপূর্ব্বে জানাইয়াছি যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া মান্দ্রাজের অন্তর্গত কোকনদ নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন এবং তাঁহার পীড়ার অনেক পরিমাণে শান্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহার পরেই আবার তিনি অবিরাম জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে জানা গিয়াছে ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার দুর্ব্বলতা অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে এবং সামান্যরূপ জ্বর আছে। সম্ভবতঃ আর এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি এখানে ফিরিয়া আসিবেন। তাঁহার পীড়ার চিকিৎসা, তাঁহার নিকট এখান হইতে লোক পাঠাইবার এবং সংবাদাদি প্রেরণ জন্য বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে, এবং আরও অর্থের প্রয়োজন। এই সংবাদ অবগত হইয়া আগ্রা হইতে বাবু নীলমণি ধর মহাশয় ১০৲ দশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমরা এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদের সহিত কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই কার্য্যে ৫০০ পাঁচ শতেরও অধিক টাকা ব্যয় হইবে। আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ যথোপযুক্ত সাহায্য করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে ঋণমুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন।

শ্রাদ্ধ—আমাদের শ্রদ্ধাভাজন শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ পূর্ব্বে প্রদান করিয়াছি। গত ২৯শে অগ্রহায়ণ রবিবার কোন্নগরে তাঁহার আদ্য শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে শতাধিক ব্রাহ্ম এবং শিবচন্দ্র বাবুর বহু আত্মীয়গণ এই উপলক্ষে কোন্নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র ও রঙ্গপুর প্রার্থনা সমাজের সভ্য বাবু নীলকণ্ঠ মিত্র গত ২৬এ কার্ত্তিক ২৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার দুঃখিনী মাতা আজও জীবিতা আছেন। নীলকণ্ঠ বাবুই তাঁহার একমাত্র সন্তান ছিলেন। গত ২৬এ অগ্রহায়ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে; বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার জনৈক আত্মীয় বাবু গিরীন্দ্র কুমার রায় এই উপলক্ষে ছাত্র সমাজে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর পরলোকগত আত্মার সদ্গতি করুন এবং তাঁহার শোকাকুলা মাতার প্রাণে শান্তি প্রদান করুন এই প্রার্থনা।

জাতকর্ম্ম—শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের কলিকাতাস্থ বাসাবাটীতে গত ১৭ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার তাঁহার প্রথমা কন্যার জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনা করেন এবং শ্রীযুক্ত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় কন্যাটীর জন্য প্রার্থনা করেন। করুণাময় পরমেশ্বরের কৃপাতে এই অনুষ্ঠানের কয়েকদিন পূর্ব্বে শিশুটী ও তাহার পিতামাতা আসন্ন মৃত্যু হইতে আশ্চর্য্য ভাবে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন—বোলপুর হইতে বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—"পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রম অতি পবিত্র রমণীয় স্থান। সুপ্রশস্ত সুসজ্জিত প্রাসাদ, নির্ম্মল জল, বিহঙ্গ-কূজিত নানা রূপ বৃক্ষরাজি, উন্মুক্ত নীলাকাশ ও শস্পাচ্ছাদিত ও বিশাল প্রান্তর এই আশ্রমকে রমণীয় শোভায় শোভিত করিয়াছে। সংসার-তাপে উত্তপ্ত ঈশ্বর-পিপাসু সাধকেরা এই আশ্রমে আগমন করিয়া নির্জ্জনে পরমাত্মার শ্রবণ ও জ্ঞানচর্চ্চা ধর্ম্মপ্রসঙ্গাদি করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মার্থী অতিথিগণের কি শারীরিক কি আধ্যাত্মিক সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য পূজ্যপাদ মহর্ষি মহাশয় প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া আশ্রমের সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। এখানে বাহিরের কোন কোলাহল নাই, নির্জ্জনে শান্তমনে পরমেশ্বরের আরাধনার সমুদায় অনুকূলভাব বর্ত্তমান। এত দিন এই আশ্রমে ব্রহ্মোপাসনার জন্য পৃথক মন্দির না থাকায় প্রাসাদেই উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হইত। মহর্ষি মহাশয় সাধকদিগের এই অসুবিধার কথা জ্ঞাত হইয়া, শান্তিনিকেতনে লৌহময় সুপ্রশস্ত ব্রহ্ম মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ ট্রুষ্টী মহোদয়দিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। মন্দির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। গত ২২শে অগ্রহায়ণ রবিবারের অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময় এই ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে পরব্রহ্মের উপাসনা হয়। অনন্ত নীলাকাশের নিম্নে আশ্রম প্রাঙ্গণে উপাসনার জন্য সকলে একত্র হইয়াছিলেন। সুরুল, রায়পুর, বোলপুর প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী ভদ্রপল্লী হইতে ৬০।৭০ জন নানাশ্রেণীর বিশিষ্ট ভদ্রলোক আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তিভাজন আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উপাসনা করেন; এবং শ্রদ্ধেয় সুকবি ও সুগায়ক শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনুরাগ ভরে ব্রহ্মসঙ্গীত করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। উপাসনা শেষে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তিনিকেতন আশ্রমের উদ্দেশ্য এবং স্বদেশবাসী জনগণের ধর্ম্মোন্নতির জন্য ভক্তিভাজন মহর্ষি মহাশয়ের প্রাণগত যত্ন ও ভূরিপরিমাণ অর্থ ব্যয় ইত্যাদি উল্লেখ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্মার্থ এই, "যদিও বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সমুদায় স্থান ব্রহ্মসত্তাতে পরিপূর্ণ এবং আমাদের হৃদয়ই যথার্থতঃ ব্রহ্মের মন্দির, কিন্তু বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া সামাজিক ভাবে ভগবদারাধনার জন্য ব্রহ্মমন্দিরের প্রয়োজন। আমরা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করিতেছি। পরমেশ্বর আমাদের শুভ সংকল্পের সহায় হউন। তাঁহার পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া আমরা আজ যে বীজ প্রোথিত করিলাম, তাঁহার প্রসাদে কালক্রমে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া সমস্ত ভারতে বিস্তৃত হইবে। এই মন্দিরে কেবল একমাত্র নিরাকার ব্রহ্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইবে! পরমেশ্বর করুন সমগ্র ভারতভূমি এবং বঙ্গদেশের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক, দেবদেবী পূজার পরিবর্ত্তে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মের নাম ধ্বনিত হউক।"

অনন্তর ভিত্তিমূলে যে খোদিত তাম্রফলক প্রোথিত করা হয়, সত্যেন্দ্র বাবু সর্ব্বসমক্ষে তাহা পাঠ করিলেন। তাম্রফলকে এই কয়েকটী কথা দেবনাগর অক্ষরে খোদিত আছে।

"ওঁতৎসৎ। ঠক্কুরবংশাবতংসেন পরমর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্ম্মণা ধর্ম্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠাপিতমিদং ব্রহ্মমন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৭ সম্বৎ, ৪৯৯১ কল্যব্দ। অগ্রহায়ণ ২২ রবিবাসর।" পরে সকলে মন্দিরের ভিত্তি মূলে গমন করিলে তাম্রফলক, পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা এবং উক্ত ২২শে অগ্রহায়ণের দৈনিক পত্রিকা, এই অগ্রহায়ণ মাসের "তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা" একখণ্ড একটী আধারে আবদ্ধ করিয়া মন্দিরের ঈশান কোণে প্রোথিত করা হয়। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় উক্ত দ্রব্যগুলি যথাস্থানে স্থাপন করিয়া স্বহস্তে কর্ণিক দ্বারা ভিত্তি প্রস্তর গাঁথিয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে সত্যেন্দ্র বাবু পরমেশ্বরের নিকট এই শুভকার্য্যের জন্য প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ করিলেন।"

পত্র।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নার্থ ভোটিংপত্র সকল সভ্যগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। যে সকল সভ্য তাহা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা আবেদন করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয় ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, এই ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পত্র লিখিলেই ভোটিং পেপার প্রেরণ করা যাইবে। আগামী ৫ই জানুয়ারির পরে আর ভোটিংপত্র গ্রহণ করা যাইবে না।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
১৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯০। শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ। ১৮শ সংখ্যা।

১৬ই পৌষ মঙ্গলবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵১

"লয়ে যাও।"

কত মহোৎসবে তুমি
যাচিলে আমার হিয়া;
কতবার দিলে মোরে
আপনারে বিলাইয়া;
আমি ত গো প্রতিদানে
নাহি দিনু তুচ্ছ প্রাণে,
রাখিনু সহস্র ফাঁসে
আপনারে জড়াইয়া।
বলিলে গো কতবার
"আয় বাছা কোলে মার,
অসীমের প্রাণে, ক্ষুদ্র
প্রাণ দে রে মিশাইয়া।"
বলিনু কঠোর বাণী
"চাহিনা তোমারে আমি,
তুমি কেন বারে বারে
চাহ বৃথা মোর হিয়া।"
নির্দ্দয় বচন শুনি,
মর্ম্মাহত হলে তুমি,
তবুও প্রাণের টানে
রহিলে গো আলিঙ্গিয়া!
তবুও স্নেহের ভরে
আবার ডাকিছ মোরে;—
রুদ্র ত হলে না মাগো
মুখ মোর নিরখিয়া?
ঘৃণ্য কুসন্তান বলে
কদাপি গেলে না ফেলে,
আবার ডাকিছ ওই
মহোৎসব-দ্বার দিয়া?
জননী গো এত স্নেহ
আর ত করেনি কেহ,
উপেক্ষা করিয়া আর
দিব না মা তাড়াইয়া;
এইবার দিনু আমি
সঙ্কীর্ণ কবাট ভাঙ্গি',
শত দ্বার দিয়া তুমি
এস প্রাণে প্রবেশিয়া;
এই তিল তিল করে
উৎসর্গ করিনু মোরে,
লয়ে যাও মম প্রাণ
ইচ্ছা-স্রোতে ভাসাইয়া।

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে ধনেশ্বর! দীন দুঃখী, যে—দিনান্তে যাহার আহার জুটেনা, যাহার নিজের অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা নাই, সেই দুঃস্থ নিরুপায় ব্যক্তিই ধনীর দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া গমন করিয়া থাকে। সমর্থ যে তাহার ধনীর দ্বারে যাইবার প্রয়োজন কি? ধনী সেই নিরুপায় ব্যক্তিকে যদি নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দেয়, তাহাতে যে সেই ধনীর বিশেষ কোন মহত্ত্ব বা প্রশংসার বিষয় হয় তাহা নয়। বরং এক মুষ্টি অন্ন তাহাকে প্রদান করিলেই তাহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। তাহার প্রশংসার বিষয় হয়। না দিয়া বিদায় করা অতি সহজ। একটা মুখের কথাতেই সব শেষ হইয়া যায়। তাহাতে আর গৌরব কি? হে মহা ঐশ্বর্য্যবান্ আমরা যে তোমার দ্বারের ভিখারী হইয়া আসিয়াছি, আমাদের আর উপায় নাই বলিয়াই আসিয়াছি। যদি অন্য উপায় থাকিত, তবে না হয় আসিতাম না। আমরা নিরুপায় কি করি দিনান্তে এক মুষ্টি আহার না জুটিলে চলে না, অথচ নিজে অক্ষম, তাই তোমার দ্বারে আসিয়াছি। তুমি যদি ফিরাইয়া দেও আমাদের তোমার উপর কোন দাবী নাই; কিন্তু না দিলে যে তাহাতে তোমার কিছু গৌরব বাড়িবে বা প্রশংসার হেতু হইবে, তাহা নয়, বরং কৃপণ ধনী বলিয়া তোমার অখ্যাতি হইবে। তবে কেন আর এমন অখ্যাতি সঞ্চয় করিবে? আমাদিগের প্রতি তাকাও দীন দুঃখী মলিন দুর্ব্বলদিগকেই দান করা উচিত। তাহাতেই তোমার মহিমা বাড়িবে। আর কেন আমাদিগকে দ্বারে দাঁড় করাইয়া রাখিবে? শীঘ্র করিয়া এস, আমাদের একটা গতি কর। তোমার মহিমা ও

প্রেমের জয় ঘোষণা করিতে আমাদিগকে সুবিধা দেও—আমাদিগকে তোমার মহৈশ্বর্য্যের অধিকারী কর।

হে স্নেহময়ী জননি! শিশুসন্তান জানে যে মাতা ভিন্ন তাহার আর গতি নাই, অথচ সে তাঁহাকেই প্রহার করিতে থাকে, তাঁহারই নিকট আবদার করিতেছে, তাঁহারই নিকট যাচ্ঞা করিতেছে। নিজের কিছুই করিবার সাধ্য নাই, মা না দিলে কিছুই পাইবে না জানে, অথচ সেই মাকেই প্রহার করিতেছে, তাহার চুল ধরিয়া টানিতেছে কতরূপে জ্বালাতন করিতেছে—কোলে বসিয়া আছে, কোলে বসিয়াই আবার তাঁহাকে পদপ্রহার করিতেছে—কিন্তু সুমাতা যিনি তিনি কি সন্তানের এ সকলঅত্যাচার, উপদ্রব ও প্রহারে বিরক্ত হন? না তাহার মঙ্গল ভুলিয়া গিয়া তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করেন? কখনই তিনি তাহা করেন না। তিনি জানেন দুর্ব্বৃত্ত ছেলে না বুঝিয়া এসব করিতেছে। তিনি ছাড়িলে তাহার আর উপায় নাই, তিনি পরিত্যাগ করিলে নিতান্তই সে বিনাশের দিকে যাইবে, তাই তাহাকে আদর করিয়া প্রিয় বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া তাহার প্রার্থিত বস্তু তাহাকে দিয়া, তাহাকে সুস্থির করেন। হে জগন্মাতা তুমি কি পৃথিবীর মাতা হইতেও মন্দ মাতা হইবে, যে আমাদের আবদার অত্যাচার দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিবে? মা! আমরা আবদার করিতে পারি এমন জন আর কে আছে? কে আমাদের অবস্থা বুঝিয়া কুশল বিধান করিবে? আমরা ত তোমাকে প্রহার করিবই, সংসারের অবোধ শিশু হইতেও যে আমাদের অবস্থা মন্দ। তাহা ত তুমি জান, আমরা যে তোমার অবাধ্য হইব, তোমার নিকট যা খুসি চাহিব এবং না পাইলে তোমাকে বিরক্ত করিব, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু তোমার যাহা করিবার তাহা করিতে কি তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত? তাহা হইলে কি আর আমাদের উপায় থাকে। তাহা হইলে বিনাশের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার যে আর কোনই উপায় দেখি না। এ সময় বড় কাতর হয়ে পড়েছি, পৃথিবীর মন্দ মাতার মত হইও না, ভাল মায়ের মত গায়ে হাত বুলাইয়া আমাদিগকে সান্ত্বনা দেও। মিষ্ট কথায় আমাদের কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেও। আমরা তোমার প্রসন্ন মুখের সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়া বাঁচিয়া যাই।

হে আমাদিগের পরম অভিভাবক! পৃথিবীতে দুর্ম্মতি-গ্রস্ত যাহারা—যাহারা আপন কল্যাণ বুঝিতেছে না—তাহারা যে অধঃপাতের পথে যাইবে—তাহারা যে অমৃত জ্ঞানে বিষের পাত্র মুখে তুলিয়া ধরিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তাহারা ত মরিতেই চায়, তাহাই প্রার্থনীয় মনে করে। সেই অবস্থায় যদি আবার তাহার অভিভাবক তাহার প্রতি উদাসীন হন, তবে যে আর তাহার কোন ভরসাই থাকে না। তাহার রক্ষা পাইবার যে কোন সম্ভাবনাই থাকে না। এরূপ অবস্থায় সে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয়। পৃথিবীতে এমন উদাসীন অভিভাবকের অভাব নাই এবং এরূপ অবিবেচক উদাসীন অভিভাবক অনেক আছে বলিয়াই সংসারের এমন দুর্দ্দশা—হে পরম অভিভাবক আমরা যে অন্য অভিভাবকের ভরসা ছাড়িয়া দিয়াছি, পৃথিবীর আর কোন আনুকূল্য আমাদিগকে সাহায্য করিবে না জানিয়া যে একমাত্র তোমার ভরসাতেই বসিয়া আছি। আমরা দুর্ব্বৃত্ত তাহাতে সন্দেহ নাই, আমরা আত্ম-মঙ্গলে বিমুখ তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া কি তুমিও পৃথিবীর উদাসীন অভিভাবকের মত আমাদিগকে যথেচ্ছা চলিয়া যাইতে সুবিধা প্রদান করিবে? আমাদিগকে স্বেচ্ছায় চলিতে দিলে যে আমাদের আর কোন উপায় নাই। তুমি এস আমাদের হাত ধর—শাসন কর—যেরূপে হয়। তোমার সুসন্তান করিয়া লও—অনেক দুর্গতি ভোগ করিয়াছি, তোমার কথা না শুনিয়া তোমার অভিভাবকত্ব পরিহার করিয়া, অনেক শাস্তি পাইয়াছি। আর কেন, আমরা মন্দ বলিয়া তুমি আর মন্দ হইও না। আমরা নিজের প্রতি উদাসীন বলিয়া তুমি আর তোমার আশ্রিতদিগের প্রতি উদাসীন হইও না। সুমতি দিয়া এবার সুপথে লইয়া যাও, আমাদিগকে তোমার সুসন্তান কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

নিরাশার হেতু নাই—শীতপ্রধান দেশে যখন শীত ঋতুর সমাগম হয়, তখন সেই স্থানের তরুর কি দুর্দ্দশা? তাহার পূর্ব্ব-শ্রী কিছুই থাকে না, ঘোর দুরবস্থা আসিয়া তাহাকে ঘেরিয়া ফেলে। সে শুষ্ক মৃতবৎ পত্র পুষ্পহীন হইয়া স্থাণুর আকার ধারণ করে। তখন অতি সহজেই নবাগত লোকের সেই বৃক্ষকে দেখিয়া মৃত বলিয়াই ধারণা হয়। তাহার মধ্যে যে জীবনীশক্তি অবস্থিতি করিতেছে, তখন তাহার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য বিধাতার নিয়ম, যাই শীত ঋতুর অবসান হইল, অমনি দেখিতে দেখিতে তাহাতে পত্র পুষ্পের উদ্গম হইতে থাকে। এত শীঘ্র শীঘ্র তাহাতে পত্র পুষ্প সকল দেখা দেয় যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীরা তাহা ধারণাও করিতে পারে না, সেরূপ শীঘ্র শীঘ্র পত্র পুষ্পে পরিশোভিত হইবার দৃষ্টান্ত, গ্রীষ্ম প্রধান দেশে নাই। প্রবল শীতের প্রভাবে জীবনীশক্তি লুক্কায়িত ছিল বলিয়া, যেমন তাহার পত্র পুষ্প সকল বসন্তের সমাগমে অতি সত্বর বিকশিত হইয়া থাকে, মানব প্রাণেও আমরা এই দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। অজ্ঞানের অধীনতা কুসংস্কার এবং পাপ প্রবণতা যখন মানবাত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তখন তাহার বাহিরের দৃশ্য দেখিয়া অতি সহজেই তাহাকে মৃতবৎ মনে হয়। সে যে আবার সুশোভায় লোকনয়ন রঞ্জন করিবে, তাহা হইতে যে আবার পুণ্যের বিমল জ্যোতি বাহির হইয়া, মানব মন আকর্ষণ করিতে পারিবে, সে সম্ভাবনার জ্ঞানও তখন থাকে না। কিন্তু যে জীবনীশক্তি তাহাতে বাস করে, তাহা যখন আপন প্রভাব প্রকাশের সুবিধা পায়, যখন বাহিরের প্রতিকূলতারূপ হেমন্তের প্রাবল্য হ্রাস হইয়া যায়, তখন আবার সে আপন সৌন্দর্য্য চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। মানবের মধ্যে যে শক্তি লুক্কায়িত আছে, তাহাকে তুমি আর বৃথা কতকগুলি আবরণে আবৃত করিও না,

অকারণ জঞ্জাল রাশি আর তাহার উপরে জড় করিও না, সুবাতাস তাহাতে লাগিতে দেও, সুসঙ্গের হাওয়া তাহাতে লাগুক, বিধাতার কৃপাবারির প্রবেশ পথকে তুমি ইচ্ছা করিয়া আর অবরুদ্ধ করিও না, তুমিও সময়ে পত্র পুষ্পে সুশোভিত হইবে। পূর্ব্বে যে শক্তি কার্য্য করিবার সুবিধা পায় নাই এখন তাহাকে আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য করিতে দেখিয়া তুমি অবাক্ হইবে যে কি এমন মাধুর্য্য আমাতে বাস করিতেছিল! অনুকূল অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। এখনকার হীনতার জন্য নিরাশ হইয়া কি ফল? বিশ্বাস কর তোমাতে অমৃতের পিপাসা প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। অপরাধের ঘোর দুর্দ্দৈব তোমাকে চিরকাল সহ্য করিতে হইবে না। বিশ্বাস কর সুদিন আসিবে। সুবায়ু অন্তরে প্রবিষ্ট হইবার পথ খুলিয়া রাখ, পুণ্যের আলো প্রবেশের পথ ছাড়িয়া দেও, তোমার শোভা দেখিয়া তুমিই অবাক্ হইবে। অসম্ভব সম্ভব হইল বলিয়া মনে করিবে। জীবনীশক্তিকে নাশ করিবার জন্য আয়োজন করিলে কোন পৌরুষ নাই। কিন্তু তাহাকে বিকাশ করিবার আয়োজন কর। নিজে আরাম পাইবে, অন্যেও দেখিয়া তৃপ্ত হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

উদ্বোধন।

অমৃত ধামের যাত্রি! পথ পার্শ্বে এরূপ হতাশের মত পড়িয়া থাকা কি তোমার পক্ষে শোভা পায়? তুমি যে অমৃত ধামে যাইবে বলিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়াছ। পথে আসিয়া কি উদ্দেশ্যবিহীনের মত—অলসের চিরপ্রার্থিত আরামের শয্যায় শয়ান থাকা তোমার পক্ষে শোভা পায়? দেখ তোমার সঙ্গের যাত্রীগণ গমনে মনোনিবেশ করিতেছেন। আর তোমার উপেক্ষা করা উচিত নয়। তুমি ত্বরান্বিত হও! ঐ দেখ অমৃতময় পুরুষ তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, অমৃত-ভাণ্ড হাতে লইয়া তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। সুদিন উপস্থিত। আর কিছুকাল সহিষ্ণুতার সহিত গমন কর, দেখিবে তোমার জন্য কি সুন্দর এবং প্রার্থনীয় অবস্থা অপেক্ষা করিতেছে। দিনমণির শুভাগমনের আর বিলম্ব নাই। ঐ দেখ প্রভাতের আকাশ আরক্তিমচ্ছবিতে তোমার নয়নকে রঞ্জিত করিতেছে। এখন আর এমন অলসতা তোমাকে শোভা পায় না।

দেখ মেদিনী যখন গভীর অন্ধকার-বাসে আপন মুখ আবৃত করিয়া রাখে, তখনই বিহঙ্গ সকল আপন আপন বাসায় নিশ্চেষ্ট হইয়া বাস করিয়া থাকে। তখনই তাহাদিগের জড়তা শোভা পায়। কিন্তু যাই পূর্ব্ব দিক উজ্জ্বল প্রভায় রক্তিমচ্ছবিতে দেখা দেয়—দিঙ্মণ্ডল উজ্জ্বল মনোহর বেশে প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন কি আর সে নিশ্চেষ্ট—জড়প্রায় অলস থাকে? না সে অমনি উল্লাসে আনন্দ-কোলাহল করিতে করিতে আপন কার্য্যে মনোযোগী হয়। তাহার জড়তা সেই মুহূর্ত্তেই তাহাকে পরিত্যাগ করে। দেখ তোমার প্রাণ অনেক দিন পর্য্যন্ত ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। অজ্ঞানতার ঘোর অমানিশায় তুমি আচ্ছন্ন ছিলে। ঈশ্বরোপাসনার মাধুর্য্য তুমি আস্বাদন করিতে পাও নাই, আপন কল্যাণ অকল্যাণের কথা তুমি জানিতে পার নাই, মঙ্গলের নিদান ব্রাহ্মধর্ম্মের সংবাদ তুমি পাও নাই, তত দিন যে তুমি অলসের মত জড়প্রায় দিন কাটাইয়াছ, তাহার জন্য আর আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু যখন দিনমণির আগমন সংবাদ তোমার প্রাণে পৌছিয়াছে, শুভ প্রাতঃকালের নবীন কিরণের সহিত যখন তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন আর তোমার অলসের ন্যায় আরামদায়ক শয্যায় শুইয়া দিন গণনা করা শোভা পায় না। দেখ আর একটী বৎসর চলিয়া গেল—তোমার সম্মুখে সেই শুভ দিন সমাগত প্রায় যেদিনে অনেক পাপী সাধুজীবন পাইবার সুবিধা লাভ করিয়াছে—যে দিনে অনেক মৃতের প্রাণে প্রাণের সঞ্চার হইয়াছে। এখন কি আর তোমার অলসের ন্যায় দিন কাটান উচিত? প্রভাতের সমাগমে যখন সূর্য্যের উজ্জ্বল ছবি চতুর্দ্দিক্ স্বর্ণপ্রভায় উদ্ভাসিত করিয়া দর্শন দেয়, পদ্মিনী সেই প্রিয় আলোক প্রাপ্ত হইয়া যখন মুখ খুলিয়া হাসিতে থাকে, তখন কি ভ্রমর সকল অলস ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে? শীতাবসানে বনরাজি যখন কুসুমসাজে সুসজ্জিত হয়, যখন গন্ধবহ তাহার আগমন বার্ত্তা চারিদিকে বহন করিয়া লইয়া যায়, তখন কি অলিকুলকে আবার ডাকিয়া বলিতে হয়, না অনুরোধ করিতে হয় যে তোমরা সচেতন হও মধু আহরণে ব্যস্ত তোমাদের প্রিয় মধুভাণ্ডার সকল মুখ খুলিয়াছে, না তাহারা আপনা হইতেই সেই মধুর অন্বেষণে বনপানে ছুটিয়া যায়। দারুণ শীতে কুজ্ঝটিকার ভয়ে কোকিল সকল মুখ বন্ধ করিয়া একান্ত নির্জ্জনবাসে মনের ক্ষোভে দিন কাটায়, কিন্তু যেমন দক্ষিণের বাতাস ধীরে ধীরে তাহার গায় লাগিতে থাকে, অতি মৃদু ভাবে সে যখন তাহার প্রিয় বসন্তের সমাগম বার্ত্তা ঘোষণা করে তখন কি সে আর মুখ অবরুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে? না তখন তাহার সুমিষ্ট সংগীত দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিয়া কাননের নিস্তব্ধতা দূর করিয়া দেয়। যখন দারুণ গ্রীষ্মাবসানে প্রাবৃটের সুমিষ্ট জলবর্ষী নব জলধর আকাশে সমুদিত হইয়া ধরণীকে তাহার তপ্ত বক্ষ সুশীতল করিবার আশা প্রদান করে, তাহার সেই মনোহর স্নিগ্ধ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কি চাতকগণ অলস ভাবে সময় অতিবর্ত্তন করিতে থাকে? না সত্বর হইয়া প্রিয়দর্শন মেঘের পানে ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে ছুটিয়া যায়? আপন প্রিয় জনের সমাগম সম্ভাবনা স্থলে কেহই ত অলস থাকে না, তখন কেহই ত জড়প্রায় মৃত্যুর বশীভূত হইয়া দিন কাটায় না! তোমার কি চেতনা হইবে না? দেখ আর বেশী দিন নাই, যে দিনে তোমার চিরবাঞ্ছিত প্রেমময় প্রভুর মহোৎসবে সকলে একত্রে মিলিবেন, যে দিনে তোমার মত অনেক দীন হীনের মৃতপ্রাণে জীবন সঞ্চার হইবে, যে দিনে অহা মহিমাময় পরমেশ্বরের আশ্বাস বাণী জগতে প্রচারিত হইয়া, অনেক নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়াছে, অনেক শোকার্ত্তের প্রাণে সান্ত্বনা আনয়ন করিয়াছে, অনেক আত্মহিতবিমুখকে আত্মকল্যাণের জন্য ব্যগ্র করিয়াছে, যে দিনে অশেষ দুর্গতিগ্রস্ত দুঃখী দেশের আশার আলোক দেখা দিয়াছে; সেই

দিনের সহিত সাক্ষাৎ হইবার আর বড় বেশী বাকী নাই।

কিন্তু কি ভাবে তুমি সেই দিনের সহিত সাক্ষাৎ করিবে? আশা ও উদ্দেশ্যহীন ভাবে গেলে তোমার কিছুই লাভ হইবে না। জড় প্রায় অলসের ন্যায় মন্থর গতিতে গেলে হইবে না। কিন্তু ভ্রমর যেমন মধু লোভে ব্যগ্রতার সহিত যায়—চকোর যেমন সুধাকরের রশ্মিপানের জন্য ব্যাকুল প্রাণে ধায়, তোমাকেও সেইরূপ ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠার সহিত সেই দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রবল পিপাসা তোমার প্রাণকে সেই প্রকারে প্রিয়তমের জন্য ব্যাকুল করুক। অনেক উৎসব তুমি উদাসীন ভাবে অতিক্রম করিয়াছ; এবারও কি সেই উদাসীন ভাবে উৎসবে যাইবে। তাহাতে ত দুর্দ্দশা যায় নাই এবং যাইবে না। বর্ষার ধারায় দেশ প্লাবিত হইলেও প্রস্তর মণ্ডিত উন্নতমস্তক গিরিশৃঙ্গের তাহাতে কোন লাভ নাই। যে আপন দেহকে জলের প্রবেশনিবারক বস্ত্রে আবৃত করে, তাহার পক্ষে বর্ষার ধারা বর্ষিত হওয়া না হওয়া দুই সমান। তাহার গাত্র কখনই তাহাতে স্নিগ্ধ হয় না। তুমি উৎসবে যাইবে, আবার সেই মলিন মূর্ত্তি লইয়াই গৃহে ফিরিবে, যদি ব্যাকুলতায় এবং প্রবলক্ষুধায় প্রাণকে আকুল না কর, প্রবল আশা যদি তোমার প্রাণে ফুটিতে না থাকে, তবে তোমার উৎসবে যাওয়া না যাওয়া দুইই সমান। সুতরাং ব্যস্ত হও প্রাণেশ্বরকে প্রাণে স্থান দিতে ব্যগ্র হও, তবেই সিদ্ধমনোরথ হইবে।

প্রেম।

মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "Love is the fulfilling of the law" অর্থাৎ বিধিপালনই প্রেম। এই মহদ্বাক্যের তাৎপর্য্য কি?

স্রোতস্বতীগণ যেমন নানা জনপদ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে সমুদ্রবক্ষে আসিয়া প্রাণ মন ঢালিয়া দেয়, তেমনি ধর্ম্ম-নিয়ম সমূহ বিভিন্ন পথে আসিয়া শেষে প্রেমেতে পরিসমাপ্ত হয়। অনেক সরল রেখা যেমন একটী মাত্র স্থলে মিলিত হয়, তেমনি একমাত্র প্রেমই সর্ব্ব কর্ত্তব্যের সংশ্লেষ ও সম্মিলন-স্থল। সমুদ্রবারি হইতে যেমন নদনদীসমূহের কলেবর স্ফীত হয়, প্রেম হইতে তেমনি সর্ব্ব নীতি ও ধর্ম্ম পুষ্টিলাভ করে। বর্ষাকালে পৃথিবীর কোন অংশ যেমন নীরস থাকে না, মরুভূমি পর্য্যন্তও বর্ষাবারিতে স্নাত হয়, তেমনি আত্মাতে প্রেম বর্ষিত হইলে, জীবনের কোন ভাগ শুষ্ক থাকিতে পারে না, জীবনের প্রত্যেক অংশ সরস ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

শরীরের পক্ষে বারি যে প্রকার, আত্মার সম্বন্ধে প্রেম সেই প্রকার। প্রেম ব্যতীত আত্মার মলিনতা ধৌত হয় না, স্বার্থের পূতিময় দুর্গন্ধ দূর হয় না। প্রেম না থাকিলে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও মধ্যে গলৎ থাকিবেই থাকিবে। প্রেমই আত্মার নির্ম্মল জল। যে চিন্তায়, যে কার্য্যে এক বিন্দু প্রেম আছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বিশুদ্ধ হইবেই হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে "আত্মাতে নির্ম্মল হইবে," এই বিধি প্রেম ব্যতীত কিছুতেই পালন করা যাইতে পারে না।

এক একটী বিধি প্রেম-হ্রদের এক একটী উৎস। একটী নূতন হ্রদ উৎপন্ন করিতে হইলেই অনেকগুলি জীবন্ত উৎসের প্রয়োজন, কিন্তু বারিপূর্ণ হ্রদ বর্ত্তমান থাকিলে, উৎসের অভাবই বা কি, প্রয়োজনই বা কি?

"কাহাকেও কুবাক্য কহিও না" একটী বিধি, কিন্তু যে হৃদয়ে প্রেমের জীবন্ত উৎস রহিয়াছে, সেখান হইতে কুবাক্য উৎসারিত হইবে কি প্রকারে? প্রেমপূর্ণ হৃদয়-ক্ষেত্র হইতে প্রিয় ও মধুর বাণী-স্রোত ব্যতীত কিছুই নির্ঝরিত হইতে পারে না।

"লঘুতাকে বর্জ্জন কর" আর একটী বিধি, কিন্তু যে হৃদয় প্রেমের মন্দির তথায় গাম্ভীর্য্য ব্যতীত লঘুতা প্রবেশই করিতে পারে না। যাঁহার হৃদয় বিদ্যুল্লতার ন্যায় চঞ্চল এবং ধূলির ন্যায় লঘু, প্রেম-যৌবনোদগম হইবামাত্রে তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যে ও চিন্তায়, ভাবে ও বাক্যে অসংশয়িতরূপে গাম্ভীর্য্য দেখা দেয়। তাঁহার নিকট দুই দণ্ডকাল অতিবাহিত করিলে বোধ হয় যে, আমারও লঘুতা যেন তিরস্কৃত হইয়াছে, আমারও চপলতা বুঝি লজ্জিত হইয়াছে।

সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র বলিতেছেন, "মিথ্যা কথা কহিও না, অপহরণ করিও না, হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ কর, মোহে মুগ্ধ হইও না।" ধর্ম্মোপদেষ্টাগণও অবিশ্রান্ত বারম্বার আমাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ধর্ম্মসমাজ বলিতেছেন, "তোমার আত্মাতে নীতির গোলাপজল ছড়াও এবং তদ্দ্বারা সকল মলিনতা প্রক্ষালন কর," কিন্তু যে ব্যক্তির হৃদয়ে সর্ব্ব নীতি এবং ধর্ম্ম-কুসুমের ঘনীভূত সারাংশরূপ প্রেম বিদ্যমান, সেখানে উহা বাহুল্য মাত্র। প্রেমিক হাফেজ বলিয়াছেন, "যে উদ্যানে সমীরণ সথার চূর্ণ কুন্তলের সৌরভ বহন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সে উদ্যান কি তাহার দেশীয় কস্তুরি সঞ্চারের স্থল?"

অতএব, প্রকৃত প্রেম থাকিলে বিধি ও অনুশাসন বাহুল্য মাত্র, এবং প্রেমের অভাবে তৎসকলই বৃথা।

প্রেমের শুভ্র কিরণ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, সর্ব্ব সদ্‌গুণই উহার অংশীভূত। তুমি আমাকে যে সকল বিধি পালন ও অবিধি পরিত্যাগ করিতে বলিবে, তাহা পাঞ্চভৌতিক দেহের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় প্রেমিক হৃদয়ের স্বাভাবিক কার্য্য।

প্রেম ভাবুকতা নহে। উষ্ণতা যেরূপ লৌহের ক্ষণস্থায়ী গুণ, ভাবুকতা সেইরূপ হৃদয়ের ক্ষণস্থায়ী অবস্থা; কিন্তু উষ্ণতা যেরূপ অগ্নির স্থায়ী ধর্ম্ম, প্রেম প্রেমিকের হৃদয়ের সেইরূপ স্থায়ী ভাব। একমাত্র প্রাকৃতিক শক্তিই যেরূপ গতি, শব্দ, উত্তাপ, জ্যোতি, তাড়িতাদি সর্ব্ব আকার গ্রহণ করে, প্রেম ও সেইরূপ আত্মাতে অবস্থাভেদে ক্ষমা, ধৈর্য্য, সরলতাদি বহু আকার ধারণ করে। নীতি ও ধর্ম্মের সর্ব্বনিয়ম পালন করিতে হইলে আত্মার যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা প্রকৃত প্রেম।

যেখানে প্রেম, সেই খানেই সর্ব্ববিধি পালন। যেখানে তাহার অভাব, সেখানে সহস্র সহস্র বিধি থাকিতে পারে, কিন্তু একটীরও প্রকৃত পালন থাকিতে পারে না। ধর্ম্মের

নির্ঝরই শুষ্ক হইলে, তাহা হইতে জীবন-স্রোত প্রবাহিত হইবে কিরূপে?

প্রেম প্রিয়বস্তুকে চাহে। অতএব যে উপায় অবলম্বন করিলে, বা যে পথে যাইলে তাহাকে লাভ করিবে, তাহাও জানিতে চাহে। প্রেমের বেগ অনুসারে সেই উপায় অবলম্বন করিবার ও সেই পথে চলিবার ইচ্ছারও প্রবলতা ও ব্যাকুলতা জন্মিবে। ইহা দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভগবৎ প্রেম থাকিলেই ধর্ম্ম থাকিল, বা সর্ব্ববিধিপালন থাকিল। সত্যস্বরূপের প্রতি প্রেম থাকিলেই সত্যে প্রীতি ও সত্যনিষ্ঠা থাকিবেই থাকিবে।

এইরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মহর্ষি ঈশার বাক্যের মূল্য ও গভীরতা কত। তাঁহার এই ক্ষুদ্র বচনটীর মধ্যে আধ্যাত্মিক সত্যের ভাণ্ডার রহিয়াছে।

আমাদের আত্মার মধ্যে সর্ব্ববিধি রহিয়াছে, কিন্তু প্রেম নাই বলিয়া আমরা তাহার মধ্যে একটীও প্রকৃতরূপে পালন করি না।

হে বিধাতঃ! আর কত দিন আমরা কেবল তোমার বিধির কথা বলিয়াই সন্তুষ্ট রহিব? আমাদের অপ্রেম, আলস্য দূর কর, এবং আমাদিগকে তোমার বিধি সমূহ পালন করাও। আমরা প্রেমের অভাবে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি, আমাদিগকে জীবন দান কর।

উইলিয়াম কেরী।

শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশের কি অবস্থা ছিল, বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভবিষ্যতের আশার কথা শুনিয়া, মানুষ জীবন-পথে চলিয়া থাকে, অতীতের সুখ দুঃখ পূর্ণ অবস্থা বিস্মৃত হওয়াই মানুষের স্বভাব। কিন্তু অতীত সাক্ষী, ইতিহাস মানবের উন্নতি ও পতনের মূলতত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিয়া সর্ব্বদাই মানবের কল্যাণ সাধন করিতেছে, মানুষ আপনার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে যে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভিত্তি-ভূমি স্বরূপ অতীতকে একবার ভ্রমেও স্মরণ করে না। এই কারণেই অনেক স্থলে মানুষ প্রকৃত উপকারীর প্রতি নিতান্ত কৃতঘ্নের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে। আজ বঙ্গের উন্নতির অবস্থা, আজ বাঙ্গালীর সৌভাগ্যের দিন। ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে আজ বঙ্গের মুখোজ্জ্বল। বহুকাল পর্য্যন্ত পরাধীনতা, নীচতা ও কাপুরুষতার শোণিত যে বাঙ্গালীর শরীরে প্রবাহিত হইতেছিল, সেই বাঙ্গালী আজ জাতীয়-জীবনের উন্নতির জন্য বদ্ধ পরিকর হইতেছে, আজ কি ধর্ম্মজগতে, কি রাজনৈতিক জগতে, সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর জীবন্ত ভাব, সর্ব্বত্রই বাঙ্গালীর আশার কথা। কিন্তু সেই ভীষণ পলাসীর যুদ্ধের পর হইতে যখন ব্রিটিশকেতন বঙ্গদেশে উড্ডীয়মান হইল, যে দিন হইতে বঙ্গের শুধু বঙ্গের কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের এক নবযুগের আরম্ভ হইল, একবার তখনকার কথা স্মরণ করা যাউক। যাঁহারা বঙ্গদেশের ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে পলাসীর যুদ্ধের পর যখন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গের শাসন ভার গ্রহণ করিলেন, বণিক নাম পরিত্যাগ করিয়া শাসনকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইলেন, তখন শ্বেতকায় রাজপুরুষগণের অত্যাচার ও অর্থলালসায় হতভাগ্য বঙ্গবাসীর কি ভয়ানক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল! রাজপুরুষগণ আপনাদের উচ্চ পদ ও ক্ষমতার যেরূপ অপব্যবহার করিয়াছিলেন, সে সমস্ত কথা ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণের কর্ণে পৌঁছিলে তাঁহারা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিলেন যে, যে সকল ভদ্রবংশজাত ব্যক্তিগণ উচ্চ পদবীতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও আত্মমর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি না করিয়া নিতান্ত দায়িত্ব বিহীনের ন্যায় কাজ করিয়াছেন। যখন বঙ্গদেশে ইংরেজ কর্ম্মচারীগণের এইরূপ অবস্থা, যখন খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সরল নীতি ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলো এদেশে বিকীর্ণ হয় নাই, যখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রাতঃস্মরণীয় ডেভিড হেয়ার, ডাক্তার ডাফ ও বীরস্বভাব ডিরোজিও অভ্যুদিত হন নাই, দেশের সেই ঘোরতর তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বর্গের সমাচার শুনাইবার জন্য যে সকল সাধু পুরুষ বিবিধ প্রতিকূল অবস্থা, বিঘ্ন ও বিপদ অতিক্রম করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া বঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বঙ্গবাসীর আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও সামাজিক এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতি সংকল্পে অকাতরে অর্থ সামর্থ্য ব্যয় করিয়াছিলেন, এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাজনের নামোল্লেখ হইয়াছে সেই পুণ্যশ্লোক মহাত্মাই তাঁহাদের অগ্রণী। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার নাম অঙ্কিত থাকিলেও আজ আর বাঙ্গালীর মুখে তাঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী এখন জগতের সর্ব্বত্র সুসভ্যজাতি বলিয়া পরিচিত, বাঙ্গালী এখন অন্যান্য সুসভ্য জাতির ন্যায় প্রকৃত মহত্ত্ব ও সাধুতার সম্মান করিতে শিখিতেছেন, সুতরাং এই শুভক্ষণে বাঙ্গালা সাহিত্য সমাজ সংস্কার প্রভৃতি বঙ্গদেশের প্রায় সকল প্রকার সংস্কারের প্রবর্ত্তক উইলিয়ম কেরীর মনুষ্যত্ব, সাধুতা ও মহত্ত্বের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা হইলে সাধারণের নিকট তাহা অনাদৃত হইবে বলিয়া মনে করা যায় না।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নর্দাম্পটন সায়ারের অধীন পিউরী নামক পল্লীগ্রামে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সপ্তদশ দিবসে উইলিয়ম কেরী জন্মগ্রহণ করেন। এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে কেরীর পিতামহ ও পিতা পুরুষানুক্রমে গ্রাম্য ধর্ম্মালয়ের কেরাণী ও ধর্ম্মালয়ের অন্তর্গত স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্য করিয়াছেন। পাড়াগেঁয়ে স্কুলে যাহা কিছু সামান্য শিক্ষালাভ করা যাইতে পারে, কেরীর ভাগ্যে তদপেক্ষা অধিক লাভ হয় নাই। নিজ-গ্রামের স্কুলেই কেরীর বিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ হইল। তাঁহার বাল্য জীবনের বিষয় অতি অল্পই জানিতে পারা যায়। কথিত আছে, তিনি বাল্যকালে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিষয়ক গ্রন্থাদি অতি ঔৎসুক্যের সহিত পাঠ করিতেন,

প্রাণীতত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তাঁহার মনের এত আগ্রহ ছিল যে তিনি প্রাণীদিগের দৈহিক বিকাশের বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য ছেলেবেলায় ক্ষুদ্র পোকা সকল সংগ্রহ করিয়া তাঁহার ছোট ঘরখানিতে সযত্নে রক্ষা করিতেন। এই সকল তত্ত্বানুসন্ধানে সাহায্য পাইবার আশায়, তিনি চিত্র বিদ্যায় যৎকিঞ্চিৎ পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হইলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। তাঁহার ভাবী উন্নতির মূল অদম্য অধ্যবসায় বাল্যকাল হইতেই তাঁহার জীবনের ছোট খাট সকল কার্য্যে প্রকাশ পাইত। তিনি গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে খুব মিশিতেন এবং ছেলেদের সকল প্রকার খেলাতেই বিশেষ উদ্যোগী ও অগ্রণী হইয়া যোগ দিতেন। সেই বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার আকৃতি প্রকৃতিতে এমন গাম্ভীর্য্য ও মহত্ত্বের ভাব প্রকাশিত হইত যে তাহা দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় বান্ধবের মধ্যে অনেকে মনে করিতেন, তিনি ভবিষ্যতে একজন বড়লোক হইবেন। ১২ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার হাতে ডাইকের রচিত একখানি লাটিন অভিধান পড়ে। তিনি অতি আগ্রহের সহিত এই অভিধান খানির অধিকাংশ ও ইহার আদ্যাংশে ব্যাকরণের যে সকল সূত্র সন্নিবেশিত ছিল, তৎসমুদায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এতাদৃশ জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা ও জ্ঞান লাভের শক্তি থাকিলে কি হইবে, তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে কোন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে রাখিয়া উচ্চ শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহাদের এমন কোন সাধ্য ছিল না। তাঁহারা এত গরিব ছিলেন যে, ১৪ বৎসর বয়ক্রম কালেই জনৈক পাদুকা নির্ম্মাতার দোকানে কেরীকে শিক্ষানবিশ হইয়া প্রবেশ করিতে হইল। জুতার দোকানে প্রবেশ করিতে হইল বলিয়া কেরীর শিক্ষা সম্বন্ধীয় উন্নতির আশা দূর হইল বটে, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা একটুকুও হ্রাস হইল না। ক্রমশঃ

উদ্ধারার্থে উৎকণ্ঠা আবশ্যক।

(২)

(প্রাপ্ত)

মঙ্গলময়ের সাহায্যে ধর্ম্মভাব যেন স্থায়ী হয়, তন্নিমিত্ত ভক্তিভাবে ও একাগ্রতার সহিত প্রার্থনা কর। তোমার মনে যে সুভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা কেবল ঈশ্বরই স্থায়ী করিতে পারেন এবং তোমার প্রার্থনার উত্তর স্বরূপ তিনি এই কার্য্য করিবেন। মনুষ্যের অন্তঃকরণে সত্য ধার্ম্মিকতার উদয় ঈশ্বরের কার্য্যের ফল, এই মহাসত্যটী গম্ভীর ভাবে চিন্তা করা তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় নিতান্ত আবশ্যক। ইহার আবশ্যকতা যতদিন না বুঝিতে পার এবং ইহা বুঝিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিতে না পার, ততদিন ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখ। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমার মনে বিশ্বাস বা ধর্ম্মভাব কখনও স্থায়ী হইবে না। এই অনুগ্রহ তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই দেন, কারণ তাহা আমাদিগের পরিত্রাণ-সাধক। অতএব ঈশ্বর নিজশক্তি প্রকাশ না করিলে, তোমার সুভাব স্থায়ী হইবে না। সূর্য্য ব্যতিরেকে দীপ্তির প্রতীক্ষা করা যেমন নির্ব্বোধের কার্য্য, তদ্রূপ ঈশ্বর ব্যতিরেকে ধার্ম্মিকতা লাভ করিতে পারা যায় না। ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাইবার জন্য তোমার প্রার্থনা করা উচিত। প্রার্থনাই ধর্ম্মজীবন লাভের প্রথম সোপান। বাস্তবিকই ভক্তের সমস্ত গতিতে প্রার্থনা নিতান্ত আবশ্যক। হে চৈতন্য প্রাপ্ত পাপি! তোমার সর্ব্বদা প্রার্থনা করা আবশ্যক। নির্জ্জনপ্রিয় হইবার নিমিত্ত সুবিধা অন্বেষণ কর, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তাঁহার সাহায্য যাচ্ঞা কর, দিবসে প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত যদি সময় না পাও, রাত্রিতে নিদ্রা না যাইয়া প্রার্থনায় সময় যাপন কর।

তোমার সর্ব্বদা প্রার্থনাশীলতা থাকা উচিত; ইহা দ্বারা চালিত হইয়া ঘরেই থাক বা রাস্তা দিয়াই যাও, শয়ন করিয়াই থাক বা দৈবসিক কার্য্যেই ব্যস্ত থাক, সর্ব্বদা মন প্রাণ খুলিয়া ঈশ্বরের নিকট তোমার নিবেদন উপস্থিত কর। ঈশ্বরের অনুগ্রহে তোমার মনে যে ধর্ম্মভাবের উদয় হইয়াছে, যেন তাহা নষ্ট না হইয়া জীবন পরিবর্ত্তন সাধন করে, এই উদ্দেশ্যে প্রার্থনা কর। তুমি বন্ধুগণের সহিত পরামর্শ করিতে পার, উপদেশ শ্রবণ করিতে পার এবং অঙ্গীকারে বদ্ধ হইতে পার। কিন্তু যদি ঈশ্বর আপনাকে না প্রদান করেন, তবে তোমার সকলই বৃথা হইবে। দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা পরিত্রাণের পথে সবে মাত্র চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারা ঈশ্বরের উপরে অতি অল্প নির্ভর করে; কিন্তু তাঁহার দত্ত অনুগ্রহ পাইবার উপায়ের উপর অধিক নির্ভর করিয়া থাকে। যদি তুমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবার জন্য সময় না পাও, অথবা যদি মনে কর যে, সময় পাইব না, তাহা হইলে আর অগ্রসর হইবার আশা করিও না, কেন না ইহা ব্যতিরেকে কখন পরিত্রাণ পাইবে না। ধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়া পরিত্রাণের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাক। নিজ ব্যবহারে যাহা পাপজনক বলিয়া জানিতে পারিবে, তাহা ত্যাগ করণার্থ স্থিরপ্রতিজ্ঞ না হইলে এবং পাপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সতর্ক না হইলে কখন কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। যাবৎ পরমেশ্বরকে পাওয়া না যায়, তাবৎ তাঁহার অন্বেষণ কর; মন স্থির কর ও তাঁহার অভিমুখে অঞ্জলি প্রসারণ কর এবং অন্যায়কে আপন হৃদয়ে বাস করিতে দিও না। তবে নিষ্কলঙ্ক রূপে মুখ তুলিবে এবং তৈজসের ন্যায় দৃঢ় এবং নির্ভয় হইবে। ধর্ম্মের দ্বারা যে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, তাহার অর্থ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করা, ইহা এখনই তোমার জানা কর্ত্তব্য। তুমি যে পরিত্রাণ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ইহা অতি পবিত্র কার্য্য, তাহার বোধ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। স্বভাবে, কথায় এবং ব্যবহারে যে যে পাপ দেখিবে, তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্টমনে পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে যে পাপ সচরাচর দেখিতে পাইবে, তাহা এই—হিংসা, ইন্দ্রিয়ের অযথা ব্যবহার, মিথ্যাকথা, চুরি, পিতা মাতা সম্বন্ধে কর্ত্তব্য সাধন না করা প্রভৃতি। পাপ বলিয়া যাহা বুঝিয়াছ, তাহার যদি একটী মাত্র মনে স্থান পায়, তাহা হইলে তোমার বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব দূর হইয়া যাইবে। পাপ

পরিত্যাগ করিতে যদি না চাহ তবে ত পরিত্রাণের অনুসন্ধান করা হইতেছে না। তুমি মনে করিতে পার, আমার সাধু হইবার ইচ্ছা আছে, এই নিমিত্ত ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেছি, প্রার্থনা করিতেছি ও নিয়মিত রূপে উপদেশ শ্রবণ করিতেছি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ধর্ম্মপথে একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেছ না। কারণ কি? কারণ এই, তুমি সাংসারিকমনা হইয়া রহিয়াছ, এবং পাপ ও সাংসারিক আমোদ প্রমোদ অথবা কোন বিশেষ কার্য্যকে পাপজনক জানিয়াও সুখদায়ক হেতু ছাড়িতে প্রস্তুত নহ। এরূপ ভাবে কখনও পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না। অতএব সযত্নে অন্তঃকরণ নিরীক্ষণ কর; আচার ব্যবহার বিশুদ্ধভাবে পরীক্ষা কর, দেখ তোমাতে এমন কোন কিছু কি আছে, যাহা অন্যায় বলিয়া জানিলেও ছাড়িতে প্রস্তুত নহ? যদি এমন কিছু থাকে, তবে যে তুমি ধর্ম্মভাব রক্ষা করিয়া সাধু হইবে, ইহা মনে করা বৃথা। অতএব এখনই পাপ ছাড়িতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। পাপ ছাড়িবার যখনই ইচ্ছা হয়, তখনি সে ইচ্ছানুসারে কার্য্য কর। কেবল যে পাপ ছাড়িতে ইচ্ছুক হইতে হইবে, তাহা নয়, পাপ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়াও উচিত। তোমার অবস্থা এখনও বিশেষ বিপজ্জনক। একটী সামান্য পাপও যদি তোমাতে থাকে, অন্তঃকরণে কখন ধর্ম্মভাব স্থান পাইবে না। যদি কখন অযথা ক্রোধ প্রকাশ কর, তোমার আত্মার যে অমঙ্গল ঘটিবে, তাহার পূরণ করিতে বহু কষ্ট করিতে হইবে; এবং অনন্তজীবনের অন্বেষণে তোমার অনেক বিঘ্ন ঘটিবে। যদি দেখ সময়ে সময়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কোন বিশেষ পাপের উপর জয় লাভ করিতে পারিতেছ না, সে জন্য নিরুৎসাহ হইও না। সময়ে সময়ে পরীক্ষায় পড়িয়া পরাজিত হও বলিয়া সকল চেষ্টা এককালীন ত্যাগ করা উচিত নয়। এইরূপ অবস্থায় নিরুৎসাহিত না হইয়া আরো সতর্ক হওয়া শ্রেয়ঃ।

ধর্ম্মরহিত বা সাংসারিকমনা লোকদের সঙ্গ একবারে ত্যাগ করা আবশ্যক। যাহাদের সঙ্গে বেড়াইবার অভ্যাস হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইলে, সাহসী হইয়া কষ্ট সত্ত্বেও ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। কিছু কষ্ট হইলেও অধার্ম্মিকের সঙ্গ একবারে পরিত্যাগ করা উচিত। তাহাদের সঙ্গে বেড়াইলে ও সর্ব্বদা আলাপ করিলে শীঘ্রই তুমি ধর্ম্মের পথ হইতে অধর্ম্মের পথে গিয়া পড়িবে। তাহাদের লঘুভাব, ঔদাসীন্য এবং পরিত্রাণ সম্বন্ধে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ভাব তোমার সমস্ত ধর্ম্মভাবের বিনাশ সাধন করিবে। যাঁহারা ধার্ম্মিক হইয়াছেন এবং ধর্ম্ম যাঁহাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাঁহারাও ধর্ম্ম নষ্টের ভয়ে যতদূর সম্ভব অধার্ম্মিকের সঙ্গত্যাগ করেন। তবে দেখ, তোমার কত অধিক সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। তুমি সবে মাত্র ধর্ম্ম পথে পা দিয়াছ, বিশ্বাসে এখনও সবল হও নাই এবং তুমি গুরুতর পরীক্ষা সহ্য করিতে অক্ষম। তুমি আত্মার পরিত্রাণের নিমিত্ত চিন্তিত রহিয়াছ, দেখিয়া তাহারা হাস্য পরিহাস করিয়া তোমার মনকে সাংসারিক আমোদ প্রমোদের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে; অথবা যদি তাহারা চেষ্টা নাও করে, তবু তোমার বিশেষ সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। তাহাদের কথোপকথন ও আচার ব্যবহার দ্বারা তোমার নবীন ধর্ম্মভাব নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, হয় তোমাকে, মন্দ সঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইবে, নয় পরিত্রাণের আশা ছাড়িতে হইবে। যাহারা ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া থাকে, তাহাদের সঙ্গ যদি পরিত্যাগ না কর তাহা হইলে পবিত্র জীবন পাইবার আশা করা বৃথা। কেমনা মন্দ লোকের সঙ্গে বেড়াইলে মনে কখন ধর্ম্মভাব রক্ষা পাইবে না। পরিত্রাণ অপেক্ষা পৃথিবীতে আর উত্তম বস্তু কি আছে এবং পাপের সেবায় জীবন যাপন অপেক্ষা অধিক ভয়ের কারণই বা কি আছে? উপযুক্তরূপে ধর্ম্মভাব রক্ষাকরণ সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ যে সমস্ত উপায় নির্দ্দেশ করেন তাহা অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক। কালবিলম্ব না করিয়া এই সমস্ত উপায়ানুসারে একাগ্রতার সহিত কার্য্য কর। আর সুসময় হারাইও না। যত্ন করিতেও কাতর হইও না এবং ত্যাগস্বীকার করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিও না। আত্মা বিপদগ্রস্ত, এই বিপদে পড়িয়াই তুমি আত্মার মঙ্গল হারাইবে। সত্য বটে, তোমাকে পাপ হইতে উদ্ধার পাইতে হইবে, স্বর্গে যাইতে হইবে, পাপকে জয় করিয়া পরিত্রাণ লাভ করিতে হইবে; শত্রু বলবান ও অসংখ্য, ঘোর বিপদ, কিন্তু এই সকল হইতে যে উদ্ধার লাভ করিতে পারিবে না; এমন নহে। অতএব এ সময়ে আপনাকে দুর্ব্বল মনে করিয়া নিরুৎসাহিত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত নয়। তেজস্বী হইয়া যত্ন প্রকাশ করিতে থাক, সাহায্য লাভার্থ সর্ব্ব প্রকার উপযুক্ত উপায় অবলম্বন কর। ভক্তিভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ কর।

নবজাত শিশুদের ন্যায় প্রাণের পরিপুষ্টকারী অমিশ্রিত দুগ্ধের লালসা কর; যেন তাহার গুণে পরিত্রাণার্থে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও। মায়ের দুধ যেমন শিশুর পক্ষে পুষ্টিকর, ঈশ্বরের বাক্য তদ্রূপ আত্মার পুষ্টিকর খাদ্য। শিশু যেমন খাদ্য বিনা বৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত সদুক্তি সকল পাঠ বিনা ঈশ্বরের দয়া সম্বন্ধে অধিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। শিক্ষা ও ধর্ম্মভাব লাভ করিবার নিমিত্ত ইহা পাঠ কর। বিশেষ মনোযোগের সহিত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ কর, ও পাঠ করিতে করিতে ধ্যান কর। সদুপদেশ সকল প্রথমে পাঠ করিতে ভাল না লাগিলেও ক্ষান্ত হইও না। ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইবে, তত ইহা পাঠ করিতে ভাল লাগিবে। ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলে ধর্ম্ম ভাব যেরূপ রক্ষিত ও গাঢ়তর হইবার সম্ভাবনা, তেমন আর কিছুতেই নহে। ইহা পাঠ করিলে মনে ভক্তি জন্মিয়া থাকে। এখন সদুপদেষ্টাগণের অনেক কথা বুঝিতে পারিতেছ না বলিয়া ভগ্নহৃদয় হইও না।

সুবিধা হইলেই সামাজিক প্রার্থনায় উপস্থিত হওয়া উচিত। তাহাতে বিশেষ উপকার হয়। অল্প অল্প বাতাসে যেমন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হয়, তদ্রূপ যাহারা সবেমাত্র মনোপরিবর্ত্তন করিয়াছে, তাহাদিগের মনে ধর্ম্মকণা ধার্ম্মিক লোকদিগের প্রার্থনাতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ও তাহা ভক্তি পরিপূর্ণ হয়। উপাসনাস্থলে অপরের সহিত যোগ দিয়া প্রার্থনা করিবে, তথায় তোমার মঙ্গল প্রার্থনা হইবে। তোমা অপেক্ষা যাঁহারা অধিক দিন ধার্ম্মিক

হইয়াছেন, তাঁহারা কিরূপ ধর্ম্মজীবন পাইলেন ও তাঁহাদের বাসনা কি, তাহা জানিতে পারিবে এবং অনেক উত্তম শিক্ষাও লাভ করিতে পারিবে। ক্রমে ঈশ্বর ভক্তগণের সহিত প্রেমে তোমার মন মিলিয়া যাইবে।

কোন ধার্ম্মিক বন্ধুর নিকট হইতে পরামর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সদা সাধুসঙ্গ কর। তুমি যে ঈশ্বর-ভক্ত, তাহা জীবনে প্রকাশিত হউক। তুমি যে ঈশ্বর-প্রিয় কার্য্য করিতে ভাল বাস এবং ভক্ত পরিবারভুক্ত হইয়াছ, তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইও না। অনেকে গোপনে আসিয়া ঈশ্বরের সহিত মিলন করিতে চাহে। ভয় এবং অহঙ্কার বশতঃ, অথবা সাংসারিক কোন ক্ষতি সহ্য করিতে হইবে বলিয়া, তাহারা সাধারণের নিকট আপনাদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের পরিচয় দেয় না। তাহারা মনের বিশ্বাস মনে লুকাইয়া রাখে, সুতরাং উৎসাহ-বারি বিনা তাহা শীঘ্রই নষ্ট হইয়াও যায়। ধর্ম্মবন্ধুর নিকট মনের অবস্থা ব্যক্ত করা কর্ত্তব্য। যাহারা পরিত্রাণ অন্বেষণ করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মবন্ধুগণের সহিত মিশিয়া ধর্ম্মালোচনা করা অতি আবশ্যক।

তুমি হয়ত অনেক বন্ধু পাইয়াছ, উপদেশকের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছ, ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তকাদি পাঠ ও উপদেশ শ্রবণ করিতেছ, তথাপি পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিবার আবশ্যকতা নাই, এমন বিবেচনা করিও না। কোন কোন ধার্ম্মিক লোকে এইরূপ ভাবিয়া থাকেন যে বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন না করিলে কোন মঙ্গল লাভ করিবার আশা করা যায় না। যদি তাঁহারা সময়ে সময়ে উপদেশ শ্রবণ করিতে না পান, অথবা ধর্ম্মমণ্ডলীর রীতি অনুসারে যে যে অনুষ্ঠানের বিধি আছে, তাহার কোন একটীর প্রতি অমনোযোগ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই তাঁহারা অমনি দুঃখিত বিরক্ত এবং হতাশ্বাস হইয়া পড়েন। এই হেতু তাঁহাদের কোন মঙ্গল লাভ হয় না, বরং আপনাদের অবিশ্বাস ও কুসংস্কার প্রযুক্ত অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়া থাকেন। কেবল ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর। যেথানে ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে পারা যায় না, এমন অন্ধকার পূর্ণ কারাগৃহে বা নির্জ্জন প্রান্তরেও ঈশ্বর আমাদিগকে আশির্ব্বাদ করিয়া থাকেন। তোমার পরিত্রাণ সাধনপক্ষে ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রচুর, তাহা বিনা মূল্যে পাইতে পার, ইহা স্পষ্টরূপে বুঝা আবশ্যক। তুমি পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত যে যত্ন প্রকাশ করিতেছ, তজ্জন্য যে পুণ্য হইতেছে, বা পুণ্য লাভ করিবার যোগ্য হইতেছ, এমন মনে করিওনা! যদি পরিত্রাণ পাও, তবে তাহা তোমার যত্নের পুরস্কার-স্বরূপ মনে করিওনা। তুমি পরিত্রাণ অনুসন্ধান করিতেছ, সুতরাং পরিত্রাণের নিমিত্ত যে অনুগ্রহের প্রয়োজন, তাহাতে তোমার দাওয়া আছে, এরূপ কল্পনাতেও ভাবা ভুল নয়। তোমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, তোমাতে প্রচুর ধর্ম্মভাব জন্মিয়াছে, তুমি ব্যগ্র হইয়াছ, উপদেশ শ্রবণের নিমিত্ত যত্ন করিতেছ বা শ্রবণ করিয়া অশ্রুপাত করিতেছ, তোমার আংশিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং একাগ্রতার সহিত প্রার্থনা করিতেছ, বলিয়া যে ঈশ্বরের নিকট হইতে পুরস্কার লাভের দাওয়া হইতেছে, এরূপ ভাবিতে পার না। ঈশ্বরের গৌরবার্থে যে কার্য্যই কর, তৎপ্রযুক্ত তিনি তোমার পরিত্রাণ করিতে বাধ্য নহেন। তুমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের অঙ্গীকার বাক্যে বিশ্বাস না করিতেছ, ততক্ষণ তিনি তোমার পরিত্রাণ করিবেন না, ইহা যেন স্মরণে থাকে। তুমি পরিত্রাণের জন্য যতই ব্যগ্র হওনা কেন, তাঁহার দয়ার উপর তোমাকে নির্ভর করিতেই হইবে। যদি পরিত্রাণ পাও, তবে জানিও, তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার অনুগ্রহের ফল। পরিত্রাণের নিমিত্ত মনের বর্ত্তমান ব্যগ্রতা প্রযুক্ত তোমার আত্মা ঈশ্বরের প্রতি নিশ্চয় ফিরিবে, এমন মনে করিওনা। তোমার ধর্ম্মভাব সমস্ত নিস্ফল ও নষ্ট হইতেও পারে।

এই সকল ভয়ঙ্কর ঘটনাদ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে, অনেকে ধার্ম্মিক হতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু শেষে অকৃতকার্য্য হয়। ইহার কারণ কি? ঈশ্বর কি তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে অনিচ্ছুক? না, মনে ধর্ম্মভাব উপস্থিত হইয়াছে দেখিলেই তাহারা স্থির হইয়া থাকে; প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিবার নিমিত্ত যত্ন করে না। অতএব, হে মন! তুমি পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছ, এই নিমিত্তই যদি মনে কর, নিশ্চয়ই পরিত্রাণ পাইবে, তাহা হইলে ভ্রমে পতিত হইয়াছ ও তোমার অবস্থা বিপদজনক হইয়া উঠিয়াছে। তোমার বর্ত্তমান মনের অবস্থায় পরিত্রাণ লাভ সম্বন্ধে উৎসাহ পাইতে পার; কিন্তু এই উৎসাহের মূল কি? পরিত্রাণের নিমিত্ত তোমার ব্যগ্রতা ইহার মূল নহে। ঈশ্বর অনুগ্রহই তোমার উৎসাহের মূল। অতএব তুমি বর্ত্তমান মনের অবস্থায় কি সন্তুষ্ট রহিয়াছ? নিজ ব্যগ্রতা প্রযুক্ত সত্য পরায়ণতা পাইবার নিমিত্ত ঈশ্বরের উপর দাওয়া আছে, এমন কি মনে করিতেছ? তোমার বর্ত্তমান অবস্থা পরিত্রাণ সাধনার্থ যুদ্ধের অবস্থা, ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে কি না, ইহা কি চিন্তার বিষয় নহে? যদি উপযুক্ত ভাবে এই যুদ্ধে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইবে।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব—মঙ্গলময় পরমেশ্বরের শুভ আশীর্ব্বাদে আবার মাঘোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। এই শুভ সময়ে ঈশ্বরের বিশ্বাসী সন্তানগণের সম্মিলন একান্ত প্রার্থনীয়। এজন্য আমরা কার্য্যনির্ব্বাহক সভার পক্ষ হইতে সকলকে বিশেষভাবে এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছি। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে আগামী একষষ্টিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। বিশেষ প্রয়োজন হইলে এ প্রণালীর কোন কোন অংশের পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।

একষষ্টিতম মাঘোৎসবের কার্য্যপ্রণালী।

২রা মাঘ (১৪ই জানুয়ারি) বুধবার—ব্রাহ্মপরিবার এবং ছাত্রাবাস সকলে উপাসনা ও ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণার্থ প্রার্থনা।

৩রা মাঘ	১৫ই	জানুয়ারি	বৃহস্পতিবার—সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন।
৪ঠা	,, ১৬ই	,,	শুক্রবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে বাঙ্গালা বক্তৃতা।
৫ই	,, ১৭ই	,,	শনিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। অপরাহ্ণে বাহিরে প্রচার। সায়ংকালে হিন্দী বক্তৃতা।
৬ই	,, ১৮ই	,,	রবিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে শ্রমজীবিগণের উৎসব।
৭ই	,, ১৯এ	,,	সোমবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব।
৮ই	,, ২০এ	,,	মঙ্গলবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব।
৯ই	,, ২১এ	,,	বুধবার—ব্রাহ্মিকাসমাজ ও বঙ্গমহিলাসমাজের উৎসব। সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক সভা।
১০ই	,, ২২এ	,,	বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে উপাসকমণ্ডলীর উৎসব। অপরাহ্ণে নগর সংকীর্ত্তন।
১১ই	,, ২৩এ	,,	শুক্রবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব।
১২ই	,, ২৪এ	,,	শনিবার—প্রাতঃকালে উপাসনা। মধ্যাহ্নে আলোচনা। অপরাহ্ণে বালকবালিকা-সম্মিলন। সায়ংকালে ছাত্রসমাজের উৎসব।
১৩ই	,, ২৫এ	,,	রবিবার—উদ্যানসম্মিলন।

ভোটিং পত্র—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধীয় নিয়মানুসারে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের নিকট ভোটিং পত্র সকল প্রেরিত হইয়াছে। আগামী ৫ই জানুয়ারির পূর্ব্বে উক্ত ভোটিং পত্র পূর্ণ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে। তৎপর কাহারও ভোটিং পত্র গৃহীত হইবে না। আমরা আশা করি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণ একটু সত্বর হইয়া ভোটিং পত্র সকল প্রেরণ করিবেন। সকলের মনোযোগ ভিন্ন অধ্যক্ষ সভার সভ্য মনোনয়নকার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

দানপ্রাপ্তি—আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে চোরবাগান নিবাসী বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় তাঁহার পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

উৎসব—২০এ অগ্রহায়ণ শুক্রবার সন্ধ্যারপর পূর্ব্ববাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবের উদ্বোধন হইয়া শনিবার প্রাতে উপাসনা, সায়ংকালে কীর্ত্তন ও তৎপর বক্তৃতা হয়। বিষয় "মুক্তি ও তৎসাধনের উপায়"। রবিবার প্রাতে সংকীর্ত্তন ও তৎপর উপাসনা, অপরাহ্ণে প্রার্থনা আলোচনা এবং কীর্ত্তন, রাত্রিতে সামাজিক উপাসনা। সোমবার প্রাতে ও রাত্রিতে উপাসনা। মঙ্গলবার নগরকীর্ত্তন হইয়া উৎসবের কার্য্য শেষ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় বক্তৃতা করেন এবং তিনি ও শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত ঘোষ এবং শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ সেন মহাশয় উপাসনা ও আলোচনাদির কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

শ্রাদ্ধ—শ্রীমান্ রজনীকান্ত দাস নামক একটী ব্রাহ্ম যুবক, নিবাস বিক্রমপুর কাঠিয়া পড়া, গত ২রা পৌষ মঙ্গলবার তাহার বিমাতার শ্রাদ্ধ কার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতে অনেক ব্রাহ্মযুবক যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীমান্ রজনীকান্ত দাসের উপর দিয়া অনেক পরীক্ষা গিয়াছে, এমন কি প্রাণ বিনাশেরও উদ্যোগ হইয়াছিল, দয়াময় এ পরীক্ষাতে তাহার সহায় হউন। উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী মহাশয় সম্পন্ন করেন।

১লা পৌষ মাণিকদহ নিবাসী বাবু শশিভূষণ চন্দের প্রথমা কন্যার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় উপাসনার কার্য্য করেন। এতদুপলক্ষে শশি বাবু ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে।৹ দান করিয়াছেন।

গত ৭ই পৌষ রবিবার আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

নামকরণ—ধুবড়িস্থ শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ সেনের চতুর্থ পুত্রের নামকরণ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর নাম শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ রাখা হইয়াছে। উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় সম্পন্ন করিয়াছেন।

ধুবড়িস্থ শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীনাথ দাসের দ্বিতীয়া কন্যার নামকরণ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম কুমারী সুনীতি রাখা হইয়াছে। উপাসনার কার্য্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় সম্পন্ন করিয়াছেন।

২৮এ অগ্রহায়ণ নদীয়া জেলার অন্তর্গত খিসমা নিবাসী বাবু রামগোপাল বিশ্বাসের দ্বিতীয় সন্তানের (প্রথম পুত্রের) নামকরণ কার্য্য মাণিকদহ গ্রামে সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। বালকের নাম করুণাবিন্দু রাখা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে রামগোপাল বাবু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲, সাধারণ বিভাগে ১৲ এবং ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে ১৲ দান করিয়াছেন।

মানিকদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুহের ১মা কন্যার নামকরণ উপলক্ষে উপাসনা হইয়াছিল। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। কন্যার নাম সুহাসিনী রাখা হইয়াছে। কন্যার মাতা এই উপলক্ষে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে০১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

প্রচার—বাবু নীলমনি চক্রবর্ত্তী মহাশয় শিলং হইতে তাঁহার কার্য্যের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রেরণ করিয়াছেন।

২৯শে নবেম্বর শনিবারে—রাত্রে শেলাপুঞ্জিতে সঙ্গত সভা হয়। বাবু কৃষ্ণধন রায় উপাসনা করেন। পরে "পরকাল এবং পাপের শাস্তি" এই বিষয়ে আলোচনা করা যায়।

৩০শে নবেম্বর রবিবার—জেছির (Jesir) নামক পল্লীতে একটীস্থান চন্দ্রাতপ দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে তথায় উপাসনা হয়। তৎপরে ৮ জন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রকাশ্য ভাবে দীক্ষিত করা হয়। অনেক দিন হইতে ইঁহাদের সকলেরই ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে যোগ ছিল এবং ইঁহাদের সচ্চরিত্রতা এবং ধর্ম্মভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। এই ৮ জনের মধ্যে ৬ জনের বয়স ৪০ বৎসরের অধিক। সকলের স্বাক্ষরিত একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র একজন পাঠ করেন। তাহাতে তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম পদ্ধতি অনুসারে সকল অনুষ্ঠান করিতে প্রস্তুত এরূপ প্রকাশ করেন। এই প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠের পর তাঁহাদের কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু উদেশ প্রদান করি। অপরাহ্নে পুনর্ব্বার উপাসনা হয়। বাবু কৃষ্ণ (ছোট) উপাসনা করেন। আমি "সুদৃঢ় মণ্ডলী" (Congregation) এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি। তৎপরে প্রায় ৬০ জনে একত্রে মিলিত হইয়া একস্থানে প্রীতিভোজন হয়। রাত্রে "ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রণালী" কি তাহা বুঝাইয়া দিই।

১লা ডিসেম্বর সোমবার—প্রাতে রোগীদিগকে ঔষধ দেওয়া যায়। রাত্রে মৌরংখং (Mawrongkhong) ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে ভালরূপ বন্দোবস্ত করিবার জন্য তথায় গমন করি। ব্রাহ্মবন্ধু ক্সানজের মহাশয়ের (Ksanjer) বাড়ীতে সেইজন্য রাত্রে অবস্থান করি।

দীক্ষিত ব্যক্তিগণের স্থূল বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল। ওয়ান (wan), বয়স ৬৫।৭০, ইনি এখানকার একজন সম্রান্ত লোক। বেশ গম্ভীর প্রকৃতি, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্ব হইতে অনেক দিন ধরিয়া ইনি ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন।

বঃ সিং (Boh Singh), বয়স ৬০।৬২; ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সময় দণ্ডায়মান হইয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমার বয়স অনেক হইয়াছে, এই বয়সে হিন্দু খ্রীষ্টীয়ান এবং খাসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। কিন্তু এ সবে আমার কিছু হইল না।" পরে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—"এই সত্যধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম। পরমেশ্বর এই জন্য আমাকে এতদিন রাখিয়াছিলেন।"

মান সিং (Man singh) বয়স ৭০।৭৫ বৎসর। ইনি পূর্ব্বে গভীর অনুতপ্ত হৃদয়ে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। তখন আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমি ঘোর পাপী, পরমেশ্বর কি আমায় গ্রহণ করিবেন? এবারে আমি যখন জিজ্ঞসা করিলাম "কেমন আছেন?" তখন বলিলেন মাংসটা (অর্থাৎ শরীরটা) ভাল আছে, কিন্তু আত্মা ত সকল সময় তেমন থাকে না।" ইনি সর্ব্বদা ধর্ম্মকথা বলেন। আমায় বলিলেন—"এ দেশের লোক ভালই আছে, পরমেশ্বরের বড় কৃপা যে ইহাদের তেমন দরিদ্রতা নাই। কিন্তু ইহাদের আত্মা বড়ই দরিদ্র, আর্জিও পরমধন পরমেশ্বরকে চিনিল না।" আপনার পুত্র কন্যাদিগের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "যতদিন সামর্থ্য ছিল, ততদিন তাহাদিগকে পালন করিয়াছি, এখন আর তাহাদের কিছুই করিতে পারি না। এখন তাঁহাদিগকে পরমেশ্বরের হাতে দিয়াছি।" বলিলেন, আমারও কলিকাতার সমাজ দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু দরিদ্র আমি, টাকা কোথায় পাইব?

ডন (Don) বয়স ৪৫।৪৬ বৎসর। ইনি বড় সরল বিশ্বাসী। প্রথমে আমার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন বলেন যে আমি হিন্দু, খ্রীষ্টীয়ান্ এবং খাসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছি, তাহাতে আমার প্রাণ পরিতৃপ্ত হয় না। এখন যাহা শুনিলাম আমার প্রাণ ঠিক এই কথাই বলে।

জইন মাণিক (Join Manik) বয়স ৪০।৪২, বড় ধর্ম্মানুরাগী এবং ঈশ্বর-প্রেমিক। ধর্ম্মের জন্য সকল প্রকার স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি কিসে হয়, সর্ব্বদা এই চেষ্টা। ইহার গৃহে আমি দুইবার বাস করিয়াছি। পরিবারটি বড়ই সুন্দর। ইহার এক কন্যার নামকরণ ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে হইয়াছে। একদিন কতকগুলি ফুল দেখাইয়া বলিলাম— "দেখুন, ইহারা কেমন সুন্দর। ইহাদের ভিতরে পরমেশ্বরের কতই প্রেম প্রকাশিত! তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,— "সামান্য পুষ্পেরাও ভগবানের মহিমা প্রকাশ করে, তাঁহার কত কায করে; আর আমি মানুষ হইয়া কি অসার! তাঁহার কোনও কায করিতে পারি না।"

রং (Rong) বয়স ৫০।৫২ বৎসর। ইনি একজন বড় সরল ও নিরীহ প্রকৃতির লোক।

কৃষ্ণধন রায়, বয়স ২৮।২৯ বৎসর। ইনি পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন। বেশ বাঙ্গলা পড়িতে ও লিখিতে জানেন। খুব উৎসাহী, সমাজের অনেক কাজই ইনি করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণ (ছোট) বয়স ২৫।২৬ বৎসর। ইনি বড় উৎসাহী এবং দৃঢ়বিশ্বাসী। সকলেই ইহাকে শ্রদ্ধা করে। ইনি অবিবাহিত। একজন্য স্থির করিয়াছেন যে আপনার বিশ্বাস অনুসারে বিবাহ করিবার সুবিধা হইলে তবে বিবাহ করিবেন, নতুবা বিবাহ করিবেন না। প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তিকে সকলে সমাজের সহযোগী (Joint) সম্পাদক মনোনীত করিয়াছেন। জইন মাণিক, কৃষ্ণধন এবং কৃষ্ণ এই তিন জনেই অধিকাংশ সময় উপাসনাদির কার্য্য চালাইয়া থাকেন। এই ৮ জন ব্যতীত আরও ৭।৮ জন অনুষ্ঠানাদি ব্রাহ্মধর্ম্ম অনুসারে করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহাদের নাম পূর্ব্বেই সেন্সস্ ফরমে দেওয়া হইয়াছে। এখন এখানে ব্রাহ্মসমাজের ভিত্তি দৃঢ় হইল বলা যায়। তাঁহারা যে ঠিক নিয়মে চলিতে পারিবেন, তাহা বোধ হইতেছে। পূর্ব্বে এক যুবক আনুষ্ঠানিক ভাবে চলিবেন বলিয়া তাঁহাদের নিকটে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে খাসিয়া মতে বিবাহ করেন। সেইজন্য তদবধি তাঁহারা ইহাকে উপাসনা প্রভৃতি সমাজের কার্য্য করিতে দিতেছেন না।

ইহারা কয়েকটী প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ১ম, তাঁহাদের সেখানে স্থায়ী ভাবে একজন প্রচারক থাকিয়া তাঁহাদের সকল কার্য্যের নেতা হইবেন। ২য় একটী বিদ্যালয় খুলিতে হইবে, যেখানে তাঁহাদের সন্তানেরা শিক্ষালাভ করিবে। [illegible]

স্কুলে ভাল শিক্ষা হয় না এবং পুত্রগণকে সে শিক্ষা দিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। ২য় একজন তথায় থাকিয়া পীড়ার সময় তাঁহাদিগকে ঔষধাদি দিতে ও চিকিৎসাদি করিতে হইবে। কারণ চিরকাল রোগের সময় তাঁহারা ডিম ভাঙ্গাইতেন। তাহা যখন উঠিয়া গেল, তখন ঔষধ না হইলে তাঁহাদের পরিবারবর্গ কিসে প্রবোধ মানিবে? ৪র্থ একজন স্ত্রীলোককে তথায় থাকিয়া স্ত্রীলোকদের মধ্যে কার্য্য করিতে হইবে। কারণ তথায় স্ত্রীস্বাধীনতা নাই।

এখানে ন্যূনাধিক ৬ হাজার লোকের বাস। অনেক লোক অন্যান্য স্থানের খাসিয়া অপেক্ষা বেশ বুদ্ধিমান্ খুব তর্ক করিতে পারে। অন্যান্য স্থানে বৎসর বৎসর শত শত খ্রীষ্টিয়ান হইতেছে, কিন্তু এখানে আর খ্রীষ্টিয়ান হয় না। হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব এক সময়ে খুব ছিল, এখন আর তেমন নাই। নীচ শ্রেণীর বাঙ্গালীর সহিত মিশিয়া অধিকাংশ লোকে অনেক মন্দ বিষয় শিক্ষা করিয়াছে। অনেক লোকে দিবারাত্রি ঢোল বাজাইয়া গান ও যাত্রা করে। বাঙ্গালা প্রায়ই বুঝে না, তবুও পাখীর মত মুখস্থ করিয়া গান ও যাত্রা বাঙ্গালাতেই করিয়া থাকে। অজ্ঞ লোকেরা একটা কিছু হুজুগ পাইলে তাহা লইয়া আমোদ আহ্লাদ করে। সম্প্রতি নদীর ধারে পাথরের উপর একটা দাগ দেখিয়া দুই এক জন হিন্দু বলিল যে "ঈশ্বর আসিয়াছিলেন, তাঁহার পায়ের দাগ এই।" এই বলিয়া সেই স্থানে পতাকা উড়াইয়া ফুল ও কলা দিয়া পূজা ও বাদ্য বাজাইয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। অনেক অজ্ঞ লোকেও সেই দিকে ছুটিল। তাহারা বুঝে না, বিশ্বাসও করে না অথচ সঙ্গে সঙ্গে গান করিতে লাগিল।

মৌকাঢক (Mawkdok) নামক স্থানে হাজন (Hajon) নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, এক রাত্রি তাঁহার বাড়ীতে থাকা গেল।

সাহায্য প্রার্থনা।

কলিকাতা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত স্থানের মধ্যে প্রায় কোথাও রীতিমত ব্রাহ্মসমাজ নাই। খুলনা এই অঞ্চলের মধ্যস্থান; বর্ত্তমানে রেল ও ষ্টিমার দ্বারা বিভিন্ন স্থানের সহিত খুলনার অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ হইয়াছে। এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইলে, এই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে বহুতর স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের বড়ই সুবিধা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এপর্য্যন্ত কেহই এ বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। সংপ্রতি ভগবানের কৃপায়, ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী কতিপয় যুবকের যত্নে এখানে একটী ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইয়াছে। চারিশত টাকা ঋণ করিয়া একখণ্ড ভূমি ক্রয় করা গিয়াছে। উপাসনা-মন্দির ও উপাসকদিগের বসিবার আসনাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম প্রস্তুত করিতে হইবে; একজন প্রচারকের বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিতে হইবে। এই সমস্ত সম্পন্ন করিতে অন্ততঃ আড়াই হাজার, তিন হাজার টাকার প্রয়োজন। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণের বিশেষ অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াই আমরা এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছি। ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী মহাশয়গণ এই মহৎ কার্য্যে যথাভিরুচি সাহায্য করিলে বাধিত হইব!

যিনি যাহা সাহায্য করিবেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"ডি, এন্ মুখার্জি স্কোয়ার, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, খুলনা" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। নিবেদনমিতি।

বিনয়াবনত

খুলনা
২৩শে অগ্রহায়ণ
১২৯৭

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ
শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায় ডি, এস্, সি, প্রফেসার, প্রেসিডেন্সি কলেজ।
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ, প্রচারক বরিশাল ব্রাহ্মসমাজ।

সাহায্য প্রার্থনা।

বিনীত নিবেদন,

বিক্রমপুরে সোনারঙ্গ একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম, এই গ্রাম আমাদের জন্মভূমি। বিষয় কার্য্য উপলক্ষে এখানকার অনেকেই প্রায় বিদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন; কিন্তু যে কয়েকটী দরিদ্র ব্রাহ্ম সর্ব্বদা এখানে অবস্থান করেন, তাঁহাদের নিয়মিত উপাসনার জন্য একখানা নির্দ্দিষ্ট গৃহের নিতান্তই আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। উপযুক্তরূপ একখানা টীনের ঘর প্রস্তুত করিতে প্রায় ৪০০।৫০০ টাকার প্রয়োজন। এই টাকা সাধারণের আনুকূল্য ভিন্ন সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব। অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা এবং আশা ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি মাত্রই অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই শুভকার্য্যে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিয়া উপকৃত ও বাধিত করিবেন।

যিনি যাহা দিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া রঙ্গপুর কাকিনীয়া রাজবাড়ীর কবিরাজ কালীকুমার গুপ্ত মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন, ইতি

ব্রাহ্মসম্বৎ ৬১
৫ই পৌষ

নিবেদক,
শ্রী কালীকুমার গুপ্ত
শ্রী বিশ্বেশ্বর সেন
শ্রী রজনীকান্ত সেন
শ্রী রসিকচন্দ্র গুপ্ত
শ্রী জগদীশ্বর সেন
শ্রী অক্ষয় কুমার দাস

দান প্রাপ্তি স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানপ্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক চাঁদা।

বাবু হরিদাস পরামাণিক,' শিবসাগর ১॥০, বাবু বিনোদ বিহারী রায়, বনগ্রাম ॥০ বাবু উমানাথ মজুমদার, মজফরপুর ১৲ বাবু মথুরানাথ ঘোষ, থার্সিয়াঙ্গ ১৲ বাবু অবিনাশ চন্দ্র ঘোষ, দেবীগঞ্জ ১৲ বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, কোয়েটা ॥০ বাবু যদুনাথ রায়, রামপুর হাট ৬৲ বাবু পূর্ণচন্দ্র দাস, রামপুর হাট ১৲ বাবু কুঞ্জবিহারী সেন, কলিকাতা ১৲ লালা বেণীপ্রসাদ, লাহোর ২৲ বাবু অবিনাশ চন্দ্র মজুমদার, লাহোর ২৲ শ্রীমতী সুবোধকুমারী মজুমদার, লাহোর ১৲ বাবু তারণচন্দ্র দাস, লাহোর ৩৲ বাবু দক্ষিণাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা ২৲ বাবু পার্ব্বতীচরণ দাস গুপ্ত, পূর্ণিয়া ১০০৲ বাবু গোবর্দ্ধন মল্লিক, বাগআঁচড়া ॥০ বাবু অমৃতলাল মল্লিক, বাগআঁচড়া ॥০ বাবু মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক, বাগআঁচড়া ॥০ বাবু রাধানাথ মল্লিক, বাগআঁচড়া ॥০ বাবু যোগেন্দ্র লাল খাস্তগীর কলিকাতা ১৲ বাবু গুরুপ্রসাদ সেন নাটোর ২৲ বাবু উদয়রাম দাস মেসা ৪৲ বাবু বিনোদ বিহারী রায় পাবনা ২৲ বাবু প্রসন্নকুমার বসু ভাওলপুর কলেজ, পঞ্জাব ৫৲ বাবু শরৎচন্দ্র বসু টিপারা ৩৲ বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দে জগন্নাথপুর ॥০ বাবু রামগোপাল বিশ্বাস মাণিকদহ ১৲ বাবু কামাখ্যাচরণ ঘোষ কলিকাতা ১৲ বাবু ক্ষেত্রমোহন সেন বাঁকুড়া ১৲ বাবু আনন্দ চন্দ্র সেন মাহিগঞ্জ ১৲ বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ কাঁথি ॥০ বাবু বীরেশ্বর সেন বর্দ্ধমান ১॥০ বাবু কালীনারায়ণ রায় চাঁচল ১৲ বাবু গুরুগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী ময়মনসিংহ ॥০ বাবু চন্দ্রশেখর দেব কোন্নগর ১৲ বাবু বিনোদ বিহারী বসু কাল্না ৩৲ বাবু গগনচন্দ্র সেন ফরিদপুর ১৲ বাবু অনন্তদেব বন্দ্যোপাধ্যায় রামপুরহাট ১৲ বাবু বৈদ্যনাথ ত্রিপাটী রাঁচি ৩৲ বাবু নন্দকুমার মল্লিক বাঘআঁচড়া ॥০ শ্রীমতী যোগমায়া দে রঙ্গপুর ১৲ শ্রীমতী মহামায়া ঘোষ রঙ্গপুর ১৲ বাবু হরিমোহন চক্রবর্ত্তী জলপাইগুড়ি ১৲ বাবু কেদারনাথ চৌধুরী সিম্লাহিলস্ ৩৲ G. venkata swaring ভিলোর ২৲ বাবু মথুরানাথ নন্দী শিলং ৪৲ বাবু জয়কালী দত্ত নাগপুর ২৲ বাবু গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার দিনাজপুর ১৫৲ বাবু মনমোহন বিশ্বাস কলিকাতা ১৲ বাবু হরেন্দ্রকুমার সেন কলিকাতা ২৲ বাবু নীলমণি ধর আগ্রা ১৲ বাবু মহেন্দ্রনাথ সরকার সীতাপুর ১৲ বাবু প্রকাশচন্দ্র দেব শিলং ১৲ বাবু কুঞ্জবিহারী সেন কলিকাতা ॥০ শ্রীমতী সরলা রায় কলিকাতা ২৲ শ্রীমতী কৈলাস কামিনী দত্ত কলিকাতা ৩৫ বাবু কালীমোহন সেন ধুবড়ী ৬৲ বাবু শরৎকুমার সিংহ সেগঞ্জ ৩৲ বাবু জগদীশ্বর গুপ্ত কুষ্টিয়া ১০৲ শ্রীমতী রাজকুমারী মিত্র কলিকাতা ১৲ বাবু সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত নলধা ১৲ বাবু ভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হাজারিবাগ ১৲ শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী মুখোপাধ্যায় হাজারিবাগ ॥০ বাবু নবীনচন্দ্র রায় খাণ্ডোয়া ৩৲ বাবু দুর্গাপ্রসাদ রাজসাহী ২৲ বাবু উপেন্দ্রনাথ মজুমদার সইদপুর ১৲ বাবু উমাচরণ আচার্য্য ফরিদপুর ॥০ বাবু ভুবনমোহন কর দিনাজপুর ১৲ বাবু কেদারনাথ কুলভি বাঁকুড়া ৩৲ বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র কলিকাতা ১৲ বাবু আনন্দমোহন দত্ত বরিশাল ১৲ বাবু অক্ষয়কুমার সেন কুমিল্লা ২৲ বাবু সীতানাথ দত্ত কলিকাতা ২৲ বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲ বাবু মহেশচন্দ্র ভৌমিক কলিকাতা ১॥০ বাবু তারণচন্দ্র দাস লাহোর ৩৲ বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লাহোর ৩৲ বাবু বিপিনবিহারী সরকার মজফরপুর ৬৲ বাবু রামচন্দ্র ভ মজুমদার নওগাঁ ৮৲ শ্রীমতী সুশীলা মজুমদার নওগাঁ ৮৲ বাবু রোহিণীকুমার দত্ত জয়পুর ৫৲ বাবু রাজকুমার সেন চৌদ্দগ্রাম ১২৲ বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগছী পাবনা ৩৲ শ্রীমতী জগদম্বা বাগছী পাবনা ॥০ শ্রীমতী যোগমায়া চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ১৲ বাবু দ্বারকানাথ বসু দিনাজপুর ২৲ বাবু রমানাথ দাস বালেশ্বর ২৲ শ্রীমতী হেমলতা ভট্টাচার্য্য কলিকাতা ১৲ বাবু অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বোলপুর ২৲ বাবু সীতানাথ নন্দী বহরমপুর ৪৲ বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার শীল বহরমপুর ২৲ বাবু অম্বিকাচরণ সেন বহরমপুর ৩৲ বাবু চন্দ্রকুমার রায় রামপুরহাট ১॥০ শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দাসগুপ্ত পূর্ণিয়া ৩৲ বাবু রাধা- নাথ রায় সিলিগুড়ী ১৲ মুন্সী আবদুল রহমন শিলিগুড়ী ৩৲ বাবু শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বালি ১৲ লালা ঈশ্বর দাস লাহোর ॥০ বাবু মধুসূদন সরকার লাহোর ২৲ বাবু গগনচন্দ্র দাস কুষ্টিয়া ২৲ বাবু বরদাদাস বসু কলিকাতা ১২৲ বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য কলিকাতা ১৲ পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কলিকাতা ২৲ শ্রীমতী বিনোদা বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ।০ বাবু কৈলাস চন্দ্র বসু ভবানীপুর ৩৲ বাবু ক্ষেত্রনাথ চন্দ কলিকাতা ১৲ শ্রীমতী বনতোষিনী চন্দ কলিকাতা ১৲ বাবু উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সোদপুর ॥০ শ্রীমতী বামাসুন্দরী সেন কলিকাতা ১৲ শ্রীমতী ক্ষিরোদবাসিনী মিত্র কালিকাতা ॥০ বাবু রূপচাঁদ মল্লিক বাগআঁচড়া ১৲ শ্রীমতী ক্ষিরোদবাসিনী সরকার কলিকাতা ॥০ বাবু বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী ফরিদপুর ১॥০ বাবু ললিতমোহন দাস কলিকাতা ১৲ বাবু তারিণীচরণ চন্দী শিলং ১৲ বাবু রাজকুমার নন্দী শিলং ॥০ বাবু বৈকুণ্ঠনারায়ণ দাস কলিকাতা ॥০ বাবু জগদীশচন্দ্র বসু কলিকাতা ২॥০ বাবু শশিভূষণ সেন কলিকাতা ॥০ বাবু নন্দলাল মোদক কোচবিহার ॥০ বাবু প্রসাদ চন্দ্র মল্লিক কলিকাতা ॥০ বাবু মোহিনী মোহন মজুমদার কলিকাতা ॥০ বাবু জয়শঙ্কর রায় কুমিল্লা ১৲ শ্রীমতী কৈলাসকামিনী দত্ত কলিকাতা ৩/ ডাক্তার ডি বসু ময়মনসিংহ ১০৲ বাবু রাজচন্দ্র চৌধুরী শিলং ২৲ শ্রীমতী হেমন্তকুমারী চৌধুরী শিলং ২৲ বাবু উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকাতা ॥০ শ্রীমতী শৈলবালা রায় কলিকাতা ১৲ বাবু নবকুমার সমদ্দার ঢাকা ১॥০ বাবু গুরুদয়াল সিংহ কুমিল্লা ৩৲ বাবু বিপিনবিহারী বসু লক্ষ্ণৌ ৩৲ বাবু প্রসাদ দাস মল্লিক কলিকাতা ॥০ বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় কলিকাতা ১॥০ বাবু শ্যামলাল ঘোষ কলিকাতা ১৲ বাবু আশুতোষ মিত্র কলিকাতা ৬৲ বাবু কানাইলাল পাইন কলিকাতা ১৲ শ্রীমতী বিনোদা বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা ৫০ বাবু বরদাদাস বসু কলিকাতা ৫৲ বাবু চন্দ্রশেখর ঘোষাল আজমির ১৲ বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲ বাবু গিরিশচন্দ্র দেব কোন্নগর ১৲ মিঃ ডি, এন, মুখার্জি খুল্না ৮৲ বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী কলিকাতা ১৲ শ্রীমতী হরিমতী রায় চৌধুরী কলিকাতা ॥০ বাবু ছকড়ি ঘোষ কলিকাতা ৫৲

শ্রীমতী রমাসুন্দরী ঘোষ কলিকাতা ॥০ শ্রীযুক্ত সর্দ্দার দয়াল সিং লাহোর ১৫০৲ বাবু মধুসূদন সরকার লাহোর ১৲ বাবু বিপিনবিহারী সরকার মজুমদার ৩৲ বাবু ভগবতীচরণ দে লক্ষ্ণৌ ১৲ শ্রীমতী বিনোদিনী মুখোপাধ্যায় কলিকাতা ২৲ বাবু মনোরঞ্জন গুহ বরিশাল ১॥০ বাবু বৈকুণ্ঠচন্দ্র বসু বরিশাল ॥০ বাবু রজনীকান্ত তপাদার বহরমপুর ২৲ শ্রীমতী বসন্তকুমারী মুখোপাধ্যায় ধুবড়ী ১৲ বাবু অভয়চরণ দাস শিলং ॥০ বাবু রামগোপাল বকসী লাহোর ৬৲ শ্রীমতী মোক্ষদায়িনী বকসী লাহোর ৬৲ বাবু হারাণচন্দ্র মিত্র হরিনাভি ২৲ বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্র রাজসাহী ৪৲ বাবু ব্রজলাল দাস রাজসাহী ১৲ বাবু মহিমচন্দ্র রায় নাটোর ২৲ বাবু রোহিণীকুমার দত্ত জয়পুর ৫৲ বাবু হরনাথ দাস রঙ্গপুর ২৲ বাবু নন্দলাল মজুমদার রঙ্গপুর ১৲ বাবু আনন্দ চন্দ্র সেন মাহিমগঞ্জ ॥০ বাবু চন্দ্রমোহন সেন দিনাজপুর ১৲ বাবু রজনীকান্ত বসু দিনাজপুর ২৲ বাবু গুরুগোবিন্দ পাট্টাদার দিনাজপুর ৩৲ মুন্সী আবদুল রহমান সিলিগুড়ি ৩৲ বাবু মথুরানাথ ঘোষ খর্সিআঙ্গ ॥০ বাবু অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ১৲ বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় চাওসী ॥০ ডাক্তার জে, এন, মিত্র কলিকাতা ২৲ বাবু সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা ২৲ শ্রীমতী বিধুমুখী রায় চৌধুরী কলিকাতা ১৲ বাবু শ্রীনাথ গুহ ঢাকা ১৲ বাবু শ্রীশচন্দ্র দে ভবানীপুর ১॥০।

প্রচার ফণ্ডের।

বার্ষিক।

বাবু ক্ষেত্রনাথ ঘোষ কলিকাতা ২৲ বাবু এককড়ি সিংহ রায় বানীবন ৬৲ বাবু কালীনারায়ণ রায় চাঁচল ৬৲ বাবু কালীনারায়ণ রায় দোগাছিয়া ১৲ বাবু কেদারনাথ চৌধুরী শিমলাহীল ১৲ বাবু চাঁদমোহন মৈত্র হিজলাবট ৫৲ বাবু নীলমনিধর আগ্রা ৬৲ বাবু দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী কাটিহার ২৲ বাবু শরৎকুমার সিংহ সেগঞ্জ ২৲ বাবু কেদারনাথ কুলভী বাঁকুড়া ২৲ বাবু আনন্দচন্দ্র মিত্র কলিকাতা ১৲ বাবু কৈলাসচন্দ্র বাগচী পাবনা ১৲ বাবু দ্বারকানাথ বসু দিনাজপুর ৩৲ বাবু উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সোদপুর ১॥০ বাবু কালীকুমার গুপ্ত কাকিনিয়া ২৲ বাবু বঙ্কুবিহারী বসু কলিকাতা ২॥০ ডাক্তার ডি বসু ময়মনসিং ৬৲ বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় কলিকাতা ১॥০ শ্রীমতী অম্বিকা দেব কোন্নগর ৬৲ বাবু কানাইলাল সাহা তিস্তি ৫৲ বাবু অনাথবন্ধু রায় কাকিনিয়া ৬৲ বাবু মথুরানাথ ঘোষ খার্সিয়াঙ্গ ॥০ বাবু আনন্দচন্দ্র রায় আলিপুর ৭৲ বাবু অমৃতলাল মজুমদার সিরাজগঞ্জ ৫০৲।

আগামী একষষ্টিতম মাঘোৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়ের নিম্নলিখিত পুস্তক সকল ১লা মাঘ হইতে ১৩ই মাঘ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট নগদ মূল্যে বিক্রীত হইবে।

* Brahmo Year Book	1876	একত্রে এই কয় খণ্ড লইলে ৫৲ টাকায় দেওয়া যাইবে।	12
„	1877		12
„	1878		Re. 1
„	1879		„ 1
„	1880		„ 1
„	1881		„ 1-8
„	1882		„ 1

* The Gleams of the New Light ... 4
* Trust Deed of the Sadharon Brahmo Samaj Prayer Hall ... 1
* Whispers from the Inner Life ... 3
* A Discourse on the Nature and Progress of Theism ... 1
* Lecture on Man ... 1
* Roots of Faith ... 4
British Rule in India ... 2
* Thirsting after God ... 1
Principles of Brahmo Dharma ... ½
Practical Theism ... 1
Speculative Atheism ... 1
Philosophy of Bhagabatgita ... 8
* পরিবারে শিশুশিক্ষা ৵০
* ব্রহ্মচর্য্য (ভগিনী ডোরা) (জীবনালোক প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত) ... ।৵০ স্থলে ।০
ফুলের মালা ... ৲১০
* উপদেশ মালা (আচার্য্যগণের উপদেশ) ।৵০ স্থলে ।০
* প্রকৃতিচর্চ্চা ... ।০ স্থলে ৶০
* চিন্তামঞ্জরী (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৶০ „ ৵০
* চিন্তাশতক (৺ প্রমথাচরণ সেন কৃত) ৶০ „ ৵০
* প্রকৃত বিশ্বাস ... ৵০ „ ৲১০
* জাতিভেদ (২য় প্রবন্ধ)(পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৵১০
* জীবন কাব্য (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও অন্য কয়েক জনের লিখিত পদ্য) ৶০ „ ৵০
* ব্রহ্মোপাসনা প্রণালী ... ৶০ „ ৵০
* কেন আছি ? ... ... ৲১০
* সাথী ... ৲১৫ স্থলে ৲১০
* চরিত রহস্য ... ।০ স্থলে ৶০
* গৃহধর্ম্ম (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ।৵০ „ ।১০
* জীবনালোক (কাপড়ের মলাট) ।৵০ „ ।১০
* চিন্তাকণিকা (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ... ৲১০
* জীবন বিন্দু ... ॥০ স্থলে ।০
সরোজকুসুম ৵০ ৲১০
* ব্রহ্মসংগীত ১ম ভাগ ৪র্থ সং (কাগজের মলাট) ৸০
* ঐ ৫ম সংস্করণ (কাগজের মলাট) ১।০ স্থলে ১৲
* ঐ ঐ (কাপড়ের মলাট) ১॥০ „ ১।০
* ধর্ম্ম বিষয়ক প্রশ্নোত্তর (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত) ৲১০
* দীক্ষশিরায় অভিষেক ... ... ৲১০
* ধর্ম্মকুসুম ... ৵০ স্থলে ৲১০
* ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্মসমাজের পরীক্ষিত বিষয় (পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কৃত) ... ৶০ স্থলে ৵০
* জাতিভেদ ১ম প্রবন্ধ (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৲১০
* পরকাল ... (ঐ) ... ৲১০
* প্রার্থনার আবশ্যকতা ও যুক্তিযুক্ততা (ঐ) ৲১০
* সাধু দৃষ্টান্ত (জীবনালোক প্রণেতা কৃত) ... ৲১০
* সৎপ্রসঙ্গ ... ৵১০ স্থলে ৴০
* সৎসঙ্গী (জীবনালোক প্রণেতা কৃত) ।০ „ ৶০
* ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য কেন (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) ৲১০
* তত্ত্বকৌমুদী একত্রে বাঁধা প্রতি খণ্ড ... ২৲
* সাধন বিন্দু (বাবু সীতানাথ দত্ত কৃত) ।০ স্থলে ৶০
* যোগ (ঐ) ... ৲১০
* পাপীর নবজীবন লাভ ৶০
* জাতীয় সংগীত ... ৶ স্থলে ৵০
* বক্তৃতা স্তবক (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কয়েকটী বক্তৃতা) ... ।৶০ স্থলে ।১০
* পুষ্পাঞ্জলী (ঐ কৃত পদ্য) ।০ „ ৶০

* উপহার ।০ ৶০
উদ্গীথা ।০
অঞ্জলী ॥৶০
জাগ্রত জীবন ৴০
সুখ কিসে? ৴০
টম্‌কাকার কুটীর ৩য়ভাগ ১৲
ঐ ২য় ভাগ ১৲
বুদ্ধদেব চরিত ১৲
আত্মোন্নতি ৶০
প্রসাদী-ফুল ৶ স্থলে ৵০
ব্রাহ্মধর্ম্মতত্ত্ব ।৴০
ব্যথার ব্যথী ৵০
বাল্য বিবাহ (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা) ৵০
জীবন্ত ও মৃত ধর্ম্ম … … ॥০
স্বর্গের চাবি … … ৵০
শান্তি জল … … ।৵০
বাল্য জীবন … … ।০
মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবন চরিত … ৴০
আহ্বান … … ৴০
মা ও ছেলে (প্রথম ভাগ) … … ॥৵০
মা ও ছেলে (২য় ভাগ) … … ৸০
আত্ম-চিন্তা (পাপীর নব জীবন লাভ প্রণেতা কৃত) ৶০
নীতিমালা … … ৵০
উপাসনাই ধর্ম্মের প্রাণ … … ৴১০
জন হউয়ার্ড … … ।৵০
স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন (কাগজের মলাট) … ॥৵০
সঙ্গীত লতিকা (প্রথম খণ্ড) (সিন্দুরিয়াপটি পারিবারিক সমাজ হইতে প্রকাশিত) … … ॥০
আধ্যাত্ম যোগ ও প্রেমসাধন … ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর … ৴০
সঙ্গীত মঞ্জরী (বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত) … ।০
জীবন গতি নির্ণয় (বাবু চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত) ।৵০ স্থলে ৶০
মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় (পদ্য) … ৶১০
মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের জীবন চরিত (বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) … ৸০
মার্টিন লুথারের জীবন চরিত (বাব উমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত) ।০
কারাকুসুমিকা (ঐ) ।৵০
বেদীয়া বালিকা (ঐ) ৵০
ধর্ম্মসাধন প্রথম ভাগ … ।০
চিরযাত্রী (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কৃত) … ॥০
অলর্কচরিত (ঐ) … ।০
চারুদত্তের গুপ্তধনাবিষ্কার (ঐ) … ৴১০
সারধর্ম্ম (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত) … ৴১০
ধর্ম্মজিজ্ঞাসা (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) ২য় সংস্করণ ॥০
ঐ ২য় ভাগ ঐ … ॥০
বৈরাগ্য (পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন কৃত) … ৵১০
শান্তি ঐ … ৶০
ধর্ম্ম কি? (পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কৃত) … ৶১০
চিন্তাবিন্দু … ৵১০
বিবিধ সন্দর্ভ (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কৃত) ॥০
আখ্যানকুসুম … ।৴৪
বালকবন্ধু … ৴০
চিরদিন কি দুঃখে যায়? … ৵০
পুরুষকার—(মহাবীর গার্‌ফীল্ড) … ৸০
রমণীর কর্ত্তব্য … ।৵০

* এই চিহ্নিত পুস্তকগুলি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিজস্ব।

সত্যদাসের সৎপ্রসঙ্গ … ।৴০
পৌরাণিক আখ্যায়িকা … ৴০
লহরী (পদ্য) (শ্রীমতী কুমুদিনী বসু প্রণীত) … ॥০
জীবন সহায় … ৶০
মহম্মদ চরিত (বুদ্ধদেব চরিত প্রণেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র কৃত) ১৲
মহাপুরুষ জীবনী … ।০
রাজা রামমোহন রায় (বালক বালিকাদিগের জন্য) ৶১৫
লক্ষ্মীমণী চরিত … ।০
কুমুদনাথ … ৵০
রত্ন গাথা … ।০
ভক্তিলীলা … ।০
পঞ্চোপনিষৎ (তলকার, ঈশ, কঠ মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি উপনিষৎ একত্রে পকেট এডিশন) ॥০ স্থলে ।৵০
পুনর্জ্জন্ম আছে কি না? … ৴০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা (বাবু রাজনারায়ণ বসু কৃত) ॥৵০ স্থলে ॥০
সুরাপান বা বিষপান ১৲ টাকা স্থানে … ॥০
চারু নীতিপাঠ … ৶০
সক্রেটিশ … ৵০
বক্তৃতা মঞ্জরী … ৵০
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) বাবু সীতানাথ দত্ত প্রণীত) … ॥০
শ্মশান ভস্ম … ।০
প্রকৃতির শিক্ষা … ।৵০
ঐ কাপড় বাঁধা … ॥০
পুণ্যের জয় … ৵০
মেরি কার্পেণ্টার … ৶০
কৃষকবালা … ।৵০
নবযুগ … ৴০
কুমুদিনী চরিত … ।০
ছায়াময়ী পরিণয় … ॥০
সাকারোপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান … ।০
শঙ্করাচার্য্য … ৶০
ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী … ৴০
পারিবারিক ঈশ্বরোপাসনা প্রণালী … ৴০
সংগীত মুকুল … ৶১০
হরিদাসের ধর্ম্ম কথা … ৶০
সংগীত প্রবন্ধ … ৶০
বনফুল … ।৴০
ধর্ম্মাদর্শ … ৴০
দুইভাই … ৴০
স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা … ৶১০
জীবন সংকেত … ৴০
মহাত্মা রাজামোহন রায়ের জীবন চরিত ২য় সংস্করণ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত (বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত) কাপড়ের বাঁধাই … ১।০
ঐ কাগজের মলাট … ১৲
সাধু গিরীন্দ্রমোহন … ।০
শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা (কাগজের মলাট) … ॥০
ঐ (কাপড়ের মলাট) … ৸০
হিন্দুশাস্ত্র (জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ড) … ১॥০
হিমালয়ে প্রার্থনা … … ৴১০
হরি লীলা … … ।০
জাতীয় দুর্গতির মূল কোথায় … … ৶১০
বনবাসিনী … … ৴১০
সংগীতরঞ্জন … … ।০
মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল … … ৶১০
উপন্যাসমালা … … ৶১০
মানবসখা … … ।৴০
বনপ্রসূন … … ।০

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
১৯শ সংখ্যা।

১লা মাঘ মঙ্গলবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য	২॥৹
মফস্বলে	৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য	৶৹

মায়ের আহ্বান।

আঁধারে কাটিছে হায় সারা বর্ষ যার,
দেখে যা কিরণ নব তরুণ উষার;
শোকের অনলে দগ্ধ হতেছিস্ যারা,
বিরাম, সান্ত্বনা আয় লয়ে যাবি তারা;
সন্তপ্ত আঁখির ধারা ঝরিছে যাদের,
শুনে যা আশার কথা নব উৎসবের;
জীবন সংগ্রামে যারা বিক্ষত পরাণ,
লয়ে যারে নব বল, শাণিত কৃপাণ;
কণ্ঠ তালু শুষ্ক যারা রুদ্র পিপাসায়,
সুধার সাগরে তারা ডুবে যাবি আয়;
আয় রে অজ্ঞান, অন্ধ, অভাগা সন্তান,
শুনে যা মায়ের আজ আকুল আহ্বান,—
পথ ভুলে ঘুরে ঘুরে শেষ হ'ল বেলা,
আয় রে ছুটিয়া আয় ছাড়ি মায়া-খেলা;
সময় থাকিতে কাজ নে সবে রে সেরে,
মহান্ উদ্দেশে আজ যেতে হবে যে রে;
আয় ছুটে, দৃঢ় ধর, হাত দুটী মা'র,—
নির্ব্বিঘ্নে তরিয়া যাবি অকূল পাথার।

পূজার আয়োজন।

যার বর্ণমালা জ্ঞান হয় নাই, সে কিরূপে পুস্তক পড়িবে! এত বয়স পর্য্যন্ত কেবল আদ্য অক্ষরই মুখস্থ করিতেছি, আজিও ভাল করিয়া মুখস্থ হইল না, শাস্ত্র পড়িতে সাধ হয় কেন? প্রভু মূর্খলোকের কি মুক্তি হয়! তোমার আদি স্বরূপই প্রাণ এ পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ধরিতে পারিল না, সপ্তস্বরূপ ধরিবার আকাঙ্ক্ষা প্রাণে উঠে কেন? অজ্ঞান, অন্ধ, অসহায় বলিয়া আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি। আমার চিত্ত ফলকে আমি এতদিন ধরিয়া যে বিকৃত লেখা লিখিয়াছি, সে সব তুমি মুছিয়া ফেল, আর নূতন করিয়া বিশ্বাসের সোণার কালী দিয়া তোমার নাম লিখ, আর কোন পড়া এখন পড়িতে ইচ্ছা হয় না, বুদ্ধি বিবশ হইয়াছে, কেবল তোমার পড়াই পড়িতে চায়। সকল পড়া ভুলাইয়া দেও, আপত্তি করিব না, কেননা তাহা হইলে নিরুদ্বেগে তোমার পাঠ আলোচনা করিতে পারিব। এ ঘোর মূর্খকে মানুষ করিবার ভার তোমার উপর আছে, তুমি যেমন করিয়া গড়িয়া তুলিবে, আমি তেমনই হইতে সম্মত আছি। তুমি আমাকে তোমার বিদ্যায় বিদ্বান কর।

(২)

কোন উৎসবের পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইতে পারি নাই, এবারও সেই দশা, প্রভু আমাকে নূতন করিবার জন্য তুমি অনেক করিয়াছ, কিন্তু আমার পুরাতন জীবন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে বলিয়া কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন আজও ঘটিল না। তোমার ঘরে অনেক বহু মূল্য পরিচ্ছদ আছে, কিন্তু আমার যে চীরবাস সেই চীরবাসই রহিয়া গেল। তুমি আদর করিয়া তোমার প্রিয় সন্তানদিগের কত মিষ্ট মিষ্ট নাম রাখিলে, আমার যে পুরাতন নাম ছিল আজও তাহাই রহিয়াছে। আমি যে পুরাতন পাপী ছিলাম, আমি আজিও তাহাই রহিয়াছি। আমা হেন পুরাণ পাপী মুক্তির কঠিন সমস্যা পূরণ করা কেবল তোমারই সাধ্যায়ত্ত। তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। তুমি আমার গতি কর। তুমিই উৎসব, তুমিই উৎসবের আয়োজন, তুমিই উৎসবের ফল। তোমার জন্য যেমন করিয়া প্রস্তুত হওয়া উচিত, তেমনই করিয়া তুমি আমাকে প্রস্তুত করিয়া লও, তোমাকে গ্রহণ করিতে আমি চিরকালই অপ্রস্তুত, তবে কি আমার তোমাকে পাওয়া হবে না। হে প্রপন্নের গতি অপ্রস্তুতের মধ্যে প্রস্তুত হওয়ার কৌশল কিরূপ তাহা আমাকে শিক্ষা দেও। তুমি অলৌকিক বীর্য্যধারী, সকলই তোমার পক্ষে সম্ভব, নয়কে হয় করা তোমার পক্ষে কিছুই দুঃসাধ্য নহে।

(৩)

এ বৎসর আত্মাবন ভাল করিয়া আবাদ করিতে পারি নাই। উহাতে এখনও অনেক জঙ্গল আছে। যতটুকু আবাদ করিয়াছি, তাহাতে সম্বৎসরের সংস্থান হয় নাই। তোমার কৃপায় ফসল মন্দ হয় নাই!' কিন্তু উৎপাত ঘটায় [illegible] ফসল বাকী আছে। অহং নামক একটা দুর্দ্দান্ত হস্তী আ[illegible] মধ্যে আসিয়া

বড় উৎপাত করিয়াছিল, অনেক ফসল সেই দুষ্ট পায় দলন করিয়া নষ্ট করিয়াছে। অবশিষ্ট যৎসামান্য যাহা আছে, তাহাতে আমার পরিবারের কথা দূরে থাকুক, আমারই পেট ভরিবে না। প্রভু তুমি নাকি পুরাকালে একবার অদ্ভুত উপায়ে তোমার উপাসক এক জাতিকে বিনা চাষে ফসল দিয়াছিলে! এখনও, তোমাকে সেইরূপ দয়া করিতে হইবে। আমি অধিক চাই না, আমার পরিবার ও আমার সম্বৎসরের সংস্থান হইতে পারে, এমন ফসল আমাকে দেও। অন্নাভাবে অনেক দিন আমাদিগকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছে। দেখ আমাদের শরীর কিরূপ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। তোমার ঘরে এত শস্য থাকিতে, আমরা অনাহারে মরিব, তোমার ঘরে এত শস্য থাকিতে, আমরা মন্বন্তরের জ্বালায় অস্থির হইব, একি আক্ষেপের কথা। হয় তুমি স্বর্গ হইতে শস্য ফেলিয়া দেও, না হয় আমাদের আত্মা এমনই করিয়া আবাদ কর, যে অন্ন জলের কষ্ট আমাদের আর পাইতে না হয়।

(৪)

তোমাকে যে তুমি বলি সে অভ্যাসের দোষে। যত খানি আত্মীয়তা হইলে তুমি বলা যায়, তোমার সঙ্গে তত খানি আত্মীয়তা হয় নাই। যদি হইত, তবে মাঝে মাঝে সংসারের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতে যাইতাম না। বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, আজিও আত্মপর জ্ঞান হইল না; কে আপনার কে পর চিনিতে পারিলাম না। আত্মীয়তা করিতে গেলে ঘন ঘন আসা যাওয়া করিতে হয়, তোমার নিকট দিনের মধ্যে কয়বার যাওয়া আসা করি। আত্মীয়তা করিতে গেলে, সর্ব্বদা তত্ত্ব লইতে ও উপহার পাঠাইতে হয়। অতি অল্প সময়ই তোমার তত্ত্ব লই, আর উপহার এ পর্য্যন্ত পাঠাইতে পারিলাম না। বড় দুঃখী আমি, উপহার ক্রয় করি, এমন ধন আজ পর্য্যন্ত সঞ্চয় কি উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হই নাই। তোমাকে যদি আত্মীয় বলিয়া বুঝিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার পরিবারের সহিত এতদিনে খুব আত্মীয়তা হইত। তোমার ভক্তদিগের কাছে আমি ঘেঁসিতে চাহি না। পাছে আমার মাথা হেঁট করিতে হয়, সেই ভয়ে তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হই না। কল্পিত বিনয় লইয়া তোমার কাছে সাধু বলিয়া পরিচিত হইতে যাই। তুমি একবার মোহের ঘোরটা কাটিয়া দাও, তাহা হইলে আমি আত্মপর বুঝিতে পারিব। চক্ষু যদি একবার ফুটাইয়া দাও, তাহা হইলে দেখিব যে যাহাদিগকে আপনার বলি তাহারা আপনার নহে, তোমার ভক্তমণ্ডলীই আমার প্রকৃত আত্মীয় পরিবার, সংসার ও সমাজ।

(৫)

প্রভু আমি আমার উপর প্রত্যয় করি না। মধুর উপাসনা ও মধুর সঙ্গীতে যখন প্রাণ বিগলিত হয়, তখন নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সম্ভোগ করিতে পারি না। ভয় এই যে বিগলিত হইতেছি ইহা কি উপাসনা ও সঙ্গীতের মধুরতায়, না তোমার নামের গুণে হইতেছে? যদি নামের গুণেই প্রাণ গলে, তবে যখন উপাসনা মধুর ও সঙ্গীত মধুর হয় না, তখন প্রাণ গলে না কেন? পরমেশ তোমা হইতে তোমাকে পাইবার সাধন যেন কখন অধিক মধুর না হয়। তোমার নামই যেন সুগায়কের সুললিত সঙ্গীত অপেক্ষা আমার কাণে অধিক মিষ্ট লাগে। তোমার সহবাসই যেন উৎকৃষ্ট উপাসনার উৎকৃষ্টতা হইতে আমার অধিক আদরের বস্তু হয়। আত্ম-প্রতারণা হইতে আমাকে রক্ষা কর। আমি চিরদিন যেন তোমারই জন্য সত্য সত্য লালায়িত হই, আমার প্রাণে সর্ব্বাপেক্ষা যে উচ্চ স্থান, তাহা যেন তোমাকে সর্ব্বদা দিতে পারি। তোমার সৌন্দর্য্য সকল সৌন্দর্য্যের এবং তোমার মাধুরী সকল মাধুরী অপেক্ষা আমার হৃদয়ে অধিক জাগিয়া উঠুক।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

উৎসবের আয়োজন—পুরাণ কথকগণ বামনের উপনয়ন সম্বন্ধে একটী গল্প বলিয়া থাকেন। গল্পটী এই যে, বামনের পিতা কশ্যপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ। কোনও প্রকারে বামনের উপনয়ন সংস্কার করিতে সংকল্প করিয়া, চুপে চুপে তাহার আয়োজন করিতেছিলেন। এমন সময় চিরানন্দ নারদ ঋষি ঘটনাক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। কশ্যপকে চুপে চুপে উপনয়নের আয়োজন করিতে দেখিয়া তাঁহার একটা রঙ্গ করিবার ইচ্ছা হইল। তিনি যাঁহাকে পান তাঁহাকেই বামনের উপনয়নে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কশ্যপের বাটীতে উপনয়ন দিনে অসংখ্য জনতা হইতে লাগিল। কশ্যপ লোক সমাগম দেখিয়া ভারী বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং কেমন করিয়া সকলে এ সংবাদ পাইল, তাহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন নিমন্ত্রিতগণ কশ্যপের বাড়ীতে আসিয়া উৎসবের বিশেষ কোন আয়োজন না দেখিয়া, ব্যাপার কি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দেখিলেন সব নারদের কাণ্ড। তখন আর কি হইবে। যাঁহারা নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা যাঁহার যাহা ছিল তিনি তাহাই প্রদান করিতে লাগিলেন। কেহ ধন রত্ন দিলেন, কেহ ভাণ্ডারের ভার লইলেন, কেহ রন্ধন শালায় গমন করিলেন, এইরূপে উপনয়নের উৎসব অতি অপূর্ব্বরূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। আমরা মাঘোৎসবেও এই ব্যাপার দেখিতেছি। নিমন্ত্রণ কর্ত্তা, উৎসবের নিমন্ত্রণ বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন। নিমন্ত্রিতগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা সকলে অবাক্, কোথায় এ বাড়ীতে ত মহোৎসবের মত কিছু আয়োজন দেখিতেছি না। এত যে লোক আসিতেছে, ইহাদের থাকিবার, বসিবার স্থানই বা কোথায়, ইহাদের জন্য আহারীয়েরই বা ব্যবস্থা কোথায়? সকলেই অবাক্। কিন্তু যখন নিমন্ত্রণ-বার্ত্তা সকলের কাছে গিয়াছে, তখন কি সকলে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইবেন। না উৎসব হইবেই। এখানেও কিন্তু যাঁহার যাহা আছে, তাহা এই উৎসব ভাণ্ডারে জমা দিতে হইবে। কেহ একটুকু প্রেম দিবেন, কেহ একটুকু ভক্তি দিবেন, কেহ একটুকু বিশ্বাস দিবেন, এইরূপে বিন্দু বিন্দু প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস সঞ্চিত হইয়া, এমন মহা কাণ্ড উপস্থিত হইবে যে তখন সকলেই অবাক্ হইয়া দেখিবেন, [illegible] [illegible] কৃপা হয়

উৎসবপতি সেই বিন্দু বিন্দু প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ লইয়াই প্রেম, ভক্তির মহাবন্যা প্রবাহিত করিবেন, সকলের অপূর্ণ পাত্র তাহাতে পূর্ণ হইবে। ক্ষুধাতুর প্রচুর আহার পাইয়া চরিতার্থ হইবে। অসম্ভব সম্ভব হইবে। তাই বলিতেছি, যাহার যাহা আছে, তিনি তাহা লইয়াই আসুন। ভগ্নপ্রাণ জোড়া লাগিবে, নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে, শোকার্ত্ত সান্ত্বনা পাইবে। যাহার যে অভাব আছে মহোৎসবের মহাব্যাপারে তাহার সেই অভাবই চলিয়া যাইবে। কিন্তু উৎসবে আসিয়া কৃপণতা করিলে চলিবে না, উৎসবপতি যাহা চাহিবেন তাহা দিতে আপত্তি করিলে চলিবে না। তিনি সেই সামান্য কিছু কিছু লইয়াই উৎসবের মহাব্যাপার সম্পন্ন করিবেন। কৃপণ যিনি হইবেন, তিনি দিবেনও না পাইবেনও না। অল্প কিছু দিয়া যদি অনেক পাওয়া যায়, তাহাতে অপ্রস্তুত হইবেন এমন কি কেহ আছেন? না এমন কৃপণ কাহাকেও হইতে নাই। হৃদয়-দ্বার খুলিয়া দেও, তাহাতে কাহারও ক্ষতি হইবে না। সিদ্ধি-দাতা পরমেশ্বর আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রার্থনাগুলি লইয়াই মহাব্যাপার সাধন করিবেন।

উপার্জ্জিত অর্থ—দুই প্রকারে অর্থ লাভ করা যায়। এক প্রকারে শ্রম না করিয়া, আর এক প্রকারে শ্রম করিয়া। এই দুই প্রকারের অর্থে অনেক প্রভেদ। বিনা শ্রমে যে অর্থ মিলে, তাহার উপর যত্ন বা আদর হয় না। কেহ যদি পিতা পিতামহের ধন পায় অথবা কুড়াইয়া টাকা পায়, তাহা ব্যয় করিতে সে লোকের মনে কোন বাধা বোধ হয় না। সে টাকার উপর তাহার কোন দরদ থাকে না বলিয়া, সে ব্যক্তি উহা হেলায় হারায়। শ্রমলব্ধ ধন অন্য প্রকার। মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে ধন অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা খরচ করিতে স্বভাবতঃই মায়া হয়। প্রাণপণে লোকে শ্রমলব্ধ অর্থ রক্ষার চেষ্টা করে এবং সে চেষ্টা সফলও হয়, কেননা রোজগার করা টাকাই থাকে। ধর্ম্ম রাজ্যেও ঠিক সেইরূপ। লোকের মুখে শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া যে ধর্ম্ম মিলে, তাহা দুইদিন থাকে, কিন্তু সাধনার শ্রমদ্বারা যে ধর্ম্ম রোজগার হয়, তাহা চিরকাল থাকে। আমরা আমাদের জীবনের দিকে তাকাইয়া দেখি যে কত উপাসনা, কত ভাল ভাব, কত পুণ্যের ছবি প্রাণের মধ্যে আসে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে উপাসনা, সে ভাব ও সে পুণ্য থাকে না। যেমন আকাশবিহারী বিহঙ্গ মর্ত্ত্যের উদ্যানে দু মিনিটের জন্য বসে, আবার উড়িয়া যায়, ঈশ্বর-প্রেরিত ভাব ও উপাসনা তেমনই নিমেষের জন্য আমাদের প্রাণকে চমকিত করিয়া ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়া যায়। কত উৎসব আসিল, কত উৎসব গেল, কয়টা উৎসবকে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম। আবার উৎসব আসিতেছে। ঈশ্বরের দানের স্রোতের বিরাম নাই। সে দান আমাদের লইবার অবকাশ ও সুবিধার অপেক্ষা করে না। এখন আমাদের ভাবিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, কিরূপে উৎসব পক্ষীকে প্রাণপিঞ্জরে বন্দী করিয়া রাখিতে পারি। উপাসনা, ভাব ও উৎসব কি রোজগার করা যায় না। বৎসরে একদিন উৎসব না করিয়া প্রত্যহ কি উৎসব করা যায় না। এবার আসুন সকলে জাল বিস্তার করিয়া বসিয়া থাকি, যেমন করুণা-পক্ষী উড়িয়া যাইবে, অমনি তাহাকে যেন ধরিয়া ফেলি।

দশ জন কুমারী—দশ জন কুমারী প্রদীপ হাতে করিয়া বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চলিল। এই দশ জনের মধ্যে ৫ জন বুদ্ধিমতী ও ৫ জন নির্ব্বোধ। যাহারা নির্ব্বোধ তাহাদের সঙ্গে তৈল ছিল না। যাহারা বুদ্ধিমতী, তাহারা প্রদীপের সঙ্গে তৈল-পূর্ণ ভাণ্ড লইয়াছিল। বরের আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, কুমারীরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। নিশীথ সময়ে "বর আসিয়াছে, তাহাকে দেখিতে চল" বলিয়া গোল উঠিল। তখন কুমারীরা জাগ্রত হইয়া প্রদীপ জ্বালিল। নির্ব্বোধ কুমারীগণ বুদ্ধিমতী কুমারীগণকে বলিল "আমাদিগকে তৈল দাও, আমাদের প্রদীপ নিবিয়া গিয়াছে" বুদ্ধিমতী কুমারীগণ বলিল, "তাহা আমরা পারিব না, কেন না তোমাদিগকে তৈল দিলে যথেষ্ট তৈলাভাবে তোমাদের ও আমাদের উভয়ের প্রদীপই নিবিয়া যাইবে; তোমরা তৈল বিক্রেতাগণের নিকটে যাও, এবং আপনাদের আবশ্যক তৈল ক্রয় করিয়া লও," যখন নির্ব্বোধ কুমারীরা তৈল ক্রয় করিতে গেল, তখন বর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যে সকল কুমারী প্রস্তুত ছিল, তাহাদের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহান্তে বাটীর দরজা বন্ধ হইল। পরে অন্য কুমারীগণ উপস্থিত হইয়া প্রভু দরজা খুলুন, বলিয়া অনেক ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু প্রভু বলিলেন "না আমি তোমাদিগকে চিনি না" এই মধুর আখ্যায়িকা দ্বারা ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগকে অবধানতার সহিত অপেক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। অনবধানতা আত্মার প্রধান শত্রু। অনবধানতার জন্যই পাপ ও বিষয়াসক্তি প্রবেশ করিয়া প্রাণকে কলুষিত করিয়া ফেলে। কখন কোন দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া ভগবান প্রাণে প্রবেশ করিবেন, কে বলিতে পারে? যদি সাবধান হইয়া থাকি, তবে আগমন মাত্রেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। অনেক সময় এমন ঘটিয়াছে, যে ভগবান আসিয়াছেন, কিন্তু আমরা ঘুমাইয়াছিলাম বলিয়া সাক্ষাৎ হয় নাই। জাগিয়া উঠিয়া দেখিয়াছি, তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এবার উৎসবে আমরা যেন ঘুমাইয়া না থাকি, সবাই জাগিয়া সচেতনে চৈতন্যময়ের সঙ্গে অবস্থান করি, আর আমরা ঘুমাইয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হইব, এমন কাল ঘুমে যেন আমাদিগকে না ধরে। পাপের বোধ যাহাদের প্রাণে এখনও বর্ত্তমান, তাহাদের ঘুমাইবার কি অধিকার? কাহারও ঘুমাইবার অধিকার নাই। শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে জাগিয়া যে ভগবানের আগমনের প্রতীক্ষা করে, তাহাকে অতি অল্প দিনই প্রতীক্ষা করিতে হয়।

আত্মার আলস্য—আত্মার যত প্রকার আপদ আছে, তন্মধ্যে আলস্য বড় ভয়ানক। আলস্যই পাপ ও বিষয়াসক্তির জননী। আত্মা অকর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে, আর উঠিতে পারে না, উঠিবার ইচ্ছাও নাই, ইহা অতি শোচনীয় অবস্থা। আমরা

অনেক সময়ে এই অবস্থায় পড়ি, কিন্তু বুঝিতে পারি না। আলস্যের একটী গুণ এই, যে উহা অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া আত্মার লক্ষ্য ঢাকিয়া রাখে, এবং এক কল্পিত নিরাপদের ভাব আনিয়া আত্মাকে স্তোভ দেয়। প্রকৃত সাধক এই আলস্যরূপ মহা বিপদের শক্তি জানিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে উহা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। আমরা অল্পপ্রাণ, আমাদের শক্তি সামান্য। অল্পক্ষণ ঈশ্বরের সহবাসেই আমরা শ্রান্ত হইয়া পড়ি, আর সেই শ্রান্তির সময় আলস্য আসিয়া আত্মাকে গ্রাস করে। যিনি অলস আত্মা লইয়া উৎসবে প্রবেশ করিবেন, স্থায়ী ফল পাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই আলস্যরূপ মহা বিকারের শান্তির জন্য উচিত ব্যবস্থার প্রয়োজন। সে ব্যবস্থা আত্মপরীক্ষার তীব্র কশাঘাত; এবং অনুতাপের অনলে প্রবেশ। আত্মপরীক্ষা ও অনুতাপই ঈশ্বরের দান গ্রহণের জন্য আত্মাকে উপযুক্ত রূপে প্রস্তুত করে। বিলাসিতাতে আত্মা পরিপূর্ণ, কঠোর শাসন বিনা সে বিলাসিতা হইতে আত্মা কিরূপে মুক্ত হইবে?

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

ব্রহ্মোৎসব।

আজ কাল ব্রাহ্মগণ উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। সকলের মুখেই এক নবীন জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে এবং অনাস্বাদিত পূর্ব্ব আনন্দের আস্বাদন পাইবার আশায় সকলের প্রাণ উৎফুল্ল হইতেছে। যাহার যেরূপ অবস্থা সে তাহা লইয়াই উৎসাহে মত্ত হইতেছে। কেন ব্রাহ্মগণের পক্ষে এমন কি দিন আসিতেছে, এমন কি উৎসবের ব্যাপার সমুপস্থিত হইয়াছে যে তাহারা এত ব্যস্ত—এত উৎফুল্ল হইতেছে? ব্রাহ্মেরা কি এই দিনে অনেক ধন পাইবে যে তাহারা উৎসাহিত হইতেছে? বা এদিনে কি তাহাদের রাজসম্মান লাভের আশা আছে, যে তাহারা আনন্দের সহিত সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছে? কিম্বা এই দিনে কি তাহারা কোন পূর্ব্বানুষ্ঠিত সৎকার্য্যের জন্য অভিনন্দন পাইবার আশায় উৎফুল্ল হইতেছে? না, তাহা নয়। তবে কি জন্য এত উৎসাহ, কেন এত আশার জ্যোতি মুখে খেলিতেছে?—এই জন্য, যে তাহাদের অভিষেকের দিন সমাগত হইতেছে—ব্রাহ্মগণ এই শুভ সময়ে নবজীবনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। যাহারা মৃত ছিল, যাহারা আত্মকল্যাণ বোধে অক্ষম ছিল, যাহারা ঘোর অন্ধকারের দুর্দ্দিনের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ছিল, তাহারা জীবন পাইবার—নিজ কল্যাণ বুঝিবার এবং [illegible]জ্যোতি লাভের সুবিধা এই দিনে পাইয়াছে। তাহারা এক অ[illegible] আশ্চর্য্য অতি প্রশংসনীয় ও চির প্রার্থনীয় অবস্থায় যাইবার জন্য এই দিনে অভিষিক্ত হইয়াছিল। সুতরাং সেই দিনের সমাগমে যদি ব্রাহ্মগণ আনন্দ প্রকাশ না করিবে তবে কবে করিবে? রাজা রাজপদে অভিষেকের দিন স্মরণ করিয়া কি পুলকিত হন না? তাঁহার পরিবারস্থ সকলে রাজঅভিষেকের দিন স্মরণ করিয়া কি উৎসাহের সহিত তাহার আয়োজন করে না? তাহারা কি তখন অলসের মত জড় প্রায় অবস্থিতি করে? না, এরূপ অলসতা তাহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবেনা। ব্রাহ্মগণ নবজীবন লাভের দিন স্মরণ করিয়া, এই দুঃখী দেশের আশার আলোক প্রকাশের দিন স্মরণ করিয়াই উৎফুল্ল হইতেছেন।

যে দিনে আমরা অভিষিক্ত হইয়াছিলাম সেই অভিষেকের দিন আসিতেছে। এই অভিষেক কোন্ ব্রতের জন্য অভিষেক? প্রাণ-যজ্ঞের জন্য অভিষেক। ব্রহ্ম-প্রেমানলে প্রাণ আহুতি প্রদানরূপ যে যজ্ঞ আমরা সেই যজ্ঞে অভিষিক্ত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছি এবং সেই অভিষেকের দিন সমাগত বলিয়াই আনন্দিত হইতেছি। যাঁহারা এখনও এই প্রাণাহুতি প্রদান রূপ মহা যজ্ঞে অভিষিক্ত হন নাই, তাঁহারা এই বার প্রস্তুত হইতে থাকুন। এ যজ্ঞে অভিষিক্ত না হইলে ব্রহ্মোৎসবের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝা যায় না। ব্রহ্মোৎসব রূপ মহা ব্যাপারের আগা গোড়া সমস্তই প্রাণাহুতি দিবার ব্যাপার। ইহাতে অন্য কোন কার্য্য করিতে আসিলে কোনই লাভ নাই। বাহিরের আমোদ আহ্লাদেই যদি মত্ত হইবে তবে আর এখানে আসা কেন? তাহার জন্য অসংখ্য উপায় আছে—বহু পথ খোলা আছে, সে সকল পথে গমন করিলে সেরূপ আনন্দ সম্ভোগ করা যাইতে পারে। সুতরাং আমোদ প্রমোদের জন্য এই যজ্ঞে অভিষিক্ত হওয়া নয়। কিন্তু আগুন যেমন সকল প্রকার মলিনতা বিনষ্ট করিয়া, সুন্দর নির্ম্মল ছবি স্বর্ণকে প্রদান করে, তেমনি ব্রহ্মাগ্নিতে আপনাকে উৎসর্গ করিলে ব্রহ্মোৎসবও আমাদিগকে বিমল ও সুন্দর মূর্ত্তি প্রদান করিবে। তখন অতি পবিত্র অতি বিমল জ্যোতিতে আমাদিগের প্রাণ উদ্ভাসিত হইবে। পরম রমণীয় দৃশ্য আমাদের হইবে। তাহা দেখিয়া নিজে যেমন কৃতার্থ হইব, অপর দশ জনেও তেমনই পরিতৃপ্ত হইবেন। তবে এ যজ্ঞ এমন ব্যাপার, যেখানে আত্মোৎসর্গ করিতে হয় এবং পৃথিবীর পক্ষে মৃত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় জীবন ও অমূল্য ধন লাভ করিতে হয়। এ যজ্ঞে আমরা দিব আমাদের মলিন প্রাণ, পাইব অতি সুন্দর, অতি পবিত্র নির্ম্মল প্রাণ। এমন লাভের ব্যাপারেও কি উৎসাহিত হইব না? আমাদের নবজীবনে অভিষেকের দিন—সেই মহাযজ্ঞ যাহার কথা পৃথিবীর সংসারাসক্ত লোকে কল্পনাও করিতে পারে না, সেই শুভ দিনের আগমনে তবে আমরা সেই মহামহিমান্বিত মহেশ্বরেরই জয় ঘোষণা করি। তাঁহার প্রসাদ পাইবার, তাঁহার প্রেমামৃত পাইবার আশায় প্রাণকে উৎসাহিত ও আশান্বিত করি।

কি চাই?

আমরা উৎসবে কি চাহিব? [illegible]তবৎসর বঙ্গদেশের অনেক স্থান প্রবল বন্যার জলে ভাসিয়া গিয়াছিল। যে স্থানকে অতি বৃদ্ধগণও জলমগ্ন হইতে দেখেন নাই, এমন স্থান সকলও জলে প্লাবিত হইয়াছিল। তখন লোকে জলকষ্টের কথা আর ভাবিতে পারে নাই। দারুণ গ্রীষ্মে যখন খাল বিল [illegible]

হইয়া যায়, যখন এক কলসি জলের জন্য ক্রোশান্তরে দুঃখী লোকদিগকে তাহাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া যাইতে হয়, তখন আর সেই বিষম কষ্টের কথা তাহাদের মনে ছিল না। কিন্তু সেই জল প্লাবন আর নাই, তাহা যেমন প্রবল বেগে আসিয়া দেশ ভাসাইয়াছিল, তেমনি প্রবল বেগে আবার চলিয়া গিয়াছে। দুঃখী লোকের যে জলকষ্ট পূর্ব্বে ছিল আবার সেই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আবার তাহাকে পিপাসার শান্তির জন্য সেই কঠোর পরিশ্রম করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াই তবে পিপাসার শান্তি করিতে হইতেছে। সুতরাং এরূপ অস্থির, ক্ষণস্থায়ী জলোচ্ছ্বাসে বিশেষ কোন ফল নাই। তাহা কেবল অভাবের যন্ত্রণা আরও প্রবল রূপে অনুভূত হইবারই কারণ হয়। সুতরাং আমরা উৎসবে এমন ভাবোচ্ছ্বাস চাই না অথবা এমন কোন উদ্দীপনা চাই না, যাহা সেই মুহূর্ত্তের জন্য আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে—উৎসাহিত করিবে। এমন কোন আত্মবিস্মৃতিকারী চিত্তোদ্‌ভ্রান্তকারী উন্মত্ততা চাই না, যাহা কেবল সেই সময়ের জন্য প্রাণকে উত্তেজিত ও প্রমত্ত রাখে। আমরা এমন কোন উচ্ছ্বাসও চাই না, যেমন মূর্খ গৃহস্থের পক্ষে ঘটিয়াছিল—সে দুধ জ্বাল দিতেছিল, অগ্নির প্রাবল্যে যখন দুগ্ধরাশি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—সে আরও অগ্নির প্রাবল্য বৃদ্ধি করিয়া দিল। দুগ্ধ ক্রমে ক্রমে উদ্বেলিত হইয়া তাহার পাত্রের সীমা অতিক্রম করিতে লাগিল। সে মনে মনে বড়ই আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। তখনকার তাহার উৎসাহ দেখে কে? সে ভাবিল আমার সামান্য একটুকু দুধ ছিল তাহা বাড়িয়া এত হইল যে আর পাত্রে ধরে না। সে নিরতিশয় খুসী হইয়া, আনন্দের সহিত সময় কাটাইতেছে। হায় হায় এ কি হইল! কিছু কাল পরে অগ্নির তেজ হ্রাস হইয়া তাহার দুগ্ধের উচ্ছ্বাসও চলিয়া গেল। পূর্ব্বে তাহার যে দুধটুকু ছিল দেখে এখন তাহাও নাই। তখন সে একবারে মস্তকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। আমরা এমন মূর্খ গৃহস্থের মত হইতে চাই না, যে সাময়িক উৎসাহ বা ভাবের উত্তেজনা দেখিয়াই ভুলিয়া থাকিব। সেরূপ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাস যখন চলিয়া যায়, তখন প্রাণ একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। অসাড়তা আসিয়া প্রাণকে অধিকার করে। পূর্ব্বাপেক্ষাও উদাসীনতা ও দৌর্ব্বল্য আসিয়া প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। অথবা আমরা এমন ক্ষণস্থায়ী উজ্জ্বল আলোকও চাই না, যাহার অভাবে অন্ধকারের ভীষণতা আরও অধিকতর রূপে মানুষকে ভয় প্রদর্শন করে ও দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া দেয়। আমরা দেখিয়াছি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মহারাণীর রাজত্বের পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইলে যে আনন্দোৎসবে সকলে মাতিয়াছিল—প্রশস্ত প্রান্তর নানাবিধ আতস বাজিতে আলোকিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই বহু লোককে অন্ধকারে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বেড়াইতে হইয়াছিল। আমরা এমন ক্ষণস্থায়ী দিঙ্‌মণ্ডল উজ্জ্বলকারী ক্ষণপ্রভার আলোকে আলোকিত হইতে চাই না। কিন্তু তবে কি চাই? আমরা চাই নিরন্ত বহমানা স্রোতস্বতী যেমন সর্ব্বকালে দুকূলবাসী প্রাণীপুঞ্জের তৃষ্ণা নিবারণ করে—জীবন্ত উৎস সকল যেমন নিরন্ত জলধারা বর্ষণ করিয়া স্রোতস্বতীগণের দেহ পরিপুষ্ট করে, আমরা সেই রূপ চির প্রবাহিতা প্রেমনদীর সহিত সংযুক্ত হইতে চাই। আমাদের প্রাণনদী ব্রহ্ম পাদোৎস হইতে নিয়ত প্রেম ধারা পাইয়া চির জীবন্ত ও পরিপুষ্ট হইবে আমরা এই চাই। সাময়িক বন্যায় শুষ্ক মরুভূমিও প্লাবিত হইতে পারে, তাহাতে মরুভূমির কি লাভ? তাহাতে দগ্ধ প্রাণের জ্বালা ত একবারে যায় না। আমাদের প্রাণ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসে মত্ত হইবে বা প্রীতিতে বিগলিত হইবে, আমরা তাহাতেই পরিতৃপ্ত হইতে চাই না। কিন্তু চির জীবন্ত উৎসের সহিত প্রাণ সংযুক্ত হউক। যুক্ত হইয়া চিরকালের জন্য প্রাণকে পরিতৃপ্ত ও স্নিগ্ধ করুক আমরা এই চাই।

আমার ক্ষুদ্র প্রেমটুকু দশজনের সহিত মিলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় এবং আমার হৃদয়পাত্র অতিক্রান্ত হইয়া অপরকে যাইয়া স্পর্শ করে। কিন্তু আবার পর মুহূর্ত্তেই যদি আমাকে শুষ্ক ডাঙ্গায় যাইয়া পড়িতে হয়, মুহূর্ত্তের মধ্যেই যদি আমাকে সেই প্রাচীন কঠোরতার সহিত মিলিত হইতে হয়, তাহাতে আমার কি লাভ? তাহাতে আমাকে অল্প সময়ের জন্য কেবল প্রতারিত করে, সেরূপ ক্ষণকালের জন্য ভাবস্রোতে ভাসিয়া আর স্বনা পাইতে চাই না। কিন্তু প্রাণ পাত্র প্রেমজলে চির-পূর্ণ হইয়া থাকুক। তাহাই আমাকে সুখী করিবে ও সান্ত্বনা দিবে। মুহূর্ত্তের জন্য যে বৃদ্ধি তাহা বাস্তবিক আরাম দেয় না, তাহা কেবল ঘোর দারিদ্রতার কষ্টকে স্মরণ করাইয়া দেয়। সুতরাং মূর্খ গৃহস্থের মত দুগ্ধের সাময়িক উচ্ছ্বাস দেখিয়া সান্ত্বনা পাইতে বা সন্তুষ্ট হইতে চাই না। আমরা চাই এমন আলো পাইতে, যাহা চিরদিনই সঙ্গে থাকিয়া পথ প্রদর্শন করিবে। ধ্রুব নক্ষত্র যেমন চিরদিন পথিককে পথ প্রদর্শন করে, একবার উজ্জ্বল আকার ধরিয়া চক্ষুকে ধাঁধাঁ দিয়াই পলায় না। কিন্তু চির সহায়রূপে চিরস্নিগ্ধ জ্যোতি বিস্তার করিয়া পথিককে আশ্বস্ত করে ও নিয়ত পথ প্রদর্শন করে, আমরা সেইরূপ ধ্রুব-জ্যোতির পরিচয় পাইতে চাই। উৎসব আমাদিগকে যদি সেই চিরজ্যোতির সহিত মিলাইয়া দিতে পারে—যদি সেই ধ্রুবজ্যোতির পরিচয় দিতে পারে, তবেই উৎসবে যোগ দেওয়া সার্থক হইবে।

আমরা অনেক উৎসব সম্ভোগ করিয়াছি—বহু প্রার্থনীয় ও লোভনীয় অবস্থার সহিত এই উৎসবে আমরা পরিচিত হইয়াছি—এবারও আমরা কত উপাদেয় বস্তু পাইব; কিন্তু শুধু পাইলেই হইবে না, তাহাকে চিরদিনের জন্য নিজস্ব করিতে হইবে। যেন তাহা যখন প্রয়োজন তখনই আমাদের ব্যবহারে লাগাইতে পারি। যেন তাহা সর্ব্বদাই আমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত হইবার উপায়স্বরূপ হয়। অন্যথা ভাবোচ্ছ্বাসে অনেক স্বপ্ন আমরা যদি দেখি, তাহাতে কি লাভ? স্বপ্নে রাজত্ব পাওয়াও যেমন, ক্ষণকালের জন্য ভাবোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হওয়াও তেমনই। এরূপে আত্মপ্রতারিত হইতে আর চাই না। ব্রাহ্মগণ এবার উৎসবে চিরস্থায়ী কিছু পাইবার জন্য ব্যাকুল হউন। মঙ্গলময় বিধাতা যাহা প্রদান করিতে ইচ্ছুক, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রাণের দরজাখানি খুলিয়া রাখ, তিনি যেন ঘরে প্রবেশ করিতে আসিয়া বাধা প্রাপ্ত না হন।

নিশ্চয় আশা পূর্ণ হইবে। বিধাতা আমাদিগকে অধিক দিন আর এরূপ চঞ্চল ও সাময়িকভাবে উত্তেজিত রাখিবেন না। কিন্তু নিশ্চয় স্থায়ী অনুরাগ ও সরসতা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিবেনই করিবেন। আমাদের কেবল গ্রহণার্থ প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমাদের কাজ এই পর্য্যন্ত। দাতা যখন দিতে চাহিবেন, তখন যেন হস্ত গুটাইয়া না লই। তাহা হইলেই সিদ্ধমনোরথ হইতে পারিব। কারণ দাতা সর্ব্বদাই দিতে প্রস্তুত আছেন।

ঈশ্বরের ধরা।

কখনও কখনও আমরা ঈশ্বরকে ধরি, আবার কখনও কখনও ঈশ্বর আমাদিগকে ধরেন, এই দুই ধরায় অনেক প্রভেদ। আমরা যে ঈশ্বরকে ধরি, সে ধরা স্থায়ী হয় না। আমরা ধরি আবার ছাড়ি, ঈশ্বর যখন ধরেন, সে ধরা চিরদিনের মত হয়। ঈশ্বর চঞ্চল নহেন, তাঁহার প্রতিজ্ঞা অটল; তিনি যখন ধরেন, তখন আর ছাড়েন না। আমরা পরমেশ্বরের সঙ্গে পরিহাস করি। কখনও প্রেমে বিগলিত হইয়া আমরা বলি এই লও আমার প্রাণ মন, আর পরক্ষণেই নীরস হইয়া সেই দত্ত প্রাণ ফিরাইয়া লই। ঈশ্বরের ব্যবহার অন্যরূপ, তিনি যাহার হাত ধরেন, কখন তাহাকে বলেন না, যে আমি দুদিনের জন্য তোমাকে ধরিয়াছিলাম, সে দুদিন হইয়া গিয়াছে, এখন তোমাকে ছাড়িয়া দিব। তিনি পরিত্যাগ করেন না, আমরাই পরিত্যাগ করি। অসিদ্ধ ও সিদ্ধ আত্মায় আমরা এই প্রভেদ দেখি। অসিদ্ধ জীব ঈশ্বরের সঙ্গে প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করে, কখনও দেয়, কখনও বা ফিরাইয়া লয়। সিদ্ধ আত্মারা জন্মের মত ধৃত হয়েন তাঁহারা যে প্রাণ দেন, তাহা চিরদিনের মত। ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে আত্মায় ও পরমাত্মায় যে সংগ্রাম দেখা যায়, সিদ্ধির আরম্ভ হইলে সে সংগ্রাম আর থাকে না। বিরোধে আত্মা তৃপ্তি লাভ করে না, সর্ব্বদা মিলনের ভূমি অন্বেষণ করে। বার মাস ত্রিশ দিন যুদ্ধের সাজ পরিয়া সতর্ক থাকিতে কাহারও ভাল লাগে না। সবাই তাই এমন এক স্থান অন্বেষণ করে, যেখানে বিরোধ নাই এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিত্য মিলন ভোগ করে। ঈশ্বর ধরিলে সেই স্থানে আসা যায়।

ঈশ্বর-ধৃত সাধক ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন ও শ্রবণ করেন। সাধারণতঃ উপাসকেরা লোকের মুখে শুনিয়া অথবা প্রচলিত মতে চলিয়া ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে। সে বিশ্বাস অন্ধ বলিয়া তাহাতে সন্দেহ আসে না, কিন্তু ঐ বিশ্বাস জীবন্ত উপলব্ধির রাজ্যে আত্মাকে লইয়া যাইতে পারে না। যে সাধককে ঈশ্বর ধরিয়াছেন, তিনি শুনিয়া বিশ্বাস করেন না, অথবা সমাজের চলিত মতের সাহায্য লয়েন না। ঈশ্বরের ধরার গুণে তিনি তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি প্রথমে ব্রহ্মের বিরাট ও তৎপর চৈতন্যময় মূর্ত্তি দর্শন করেন। তিনি দেখেন ব্রহ্ম শক্তিরূপে ঘটে ঘটে এবং প্রাণরূপে প্রাণীতে প্রাণীতে বিরাজিত রহিয়াছেন। যেখানে অন্য লোক প্রাকৃতিক শক্তির কল্পনা করে, তিনি সেখানে বিরাটরূপী পরব্রহ্মের সত্য চিন্মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হন। লোকে যেখানে জড় দেখে, বৃক্ষ প্রস্তর মৃত্তিকা দেখে, সেখানে তিনি জড়ের আধারভূত ও প্রাণ স্বরূপ নিত্য চৈতন্য দেখেন। চন্দ্রে তিনি চৈতন্য চন্দ্র দেখেন, সূর্য্যে তিনি পুণ্য ভানুর আলোক ও উত্তাপ পান এবং উপবন-শোভি কুসুম-গন্ধে তিনি নিত্য ব্রহ্মের আঘ্রাণ প্রাপ্ত হন। কিন্তু বিরাটকে দেখিয়া সাধক তৃপ্ত হন না, তখন তিনি অন্তরে প্রবেশ করেন। সেখানে সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার মনের মালিন্য জন্মের মত চলিয়া যায়, তিনি দেখেন তাঁহার চৈতন্য অনন্ত চৈতন্যের কোলে এবং অনন্ত চৈতন্যের আশ্রিত বলিয়াই তাঁহার চৈতন্য স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

ঈশ্বর যে সাধককে ধরেন, তিনি শুধু ব্রহ্ম দর্শনে তৃপ্ত হন না, ব্রহ্ম শ্রবণের জন্য লোলুপ হইয়া উঠেন। তিনি দেখেন যে ব্রহ্ম কেবল আপনাকে প্রকাশিত করিয়া ক্ষান্ত নহেন, পূর্ণতা ও পুণ্যের দিকে অর্থাৎ আপনার সহিত মিলিত হইতে জীবকে নিরন্তর অনুরোধ করিতেছেন। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের এই যোগেচ্ছা ধর্ম্মবিধি অর্থাৎ বিবেকরূপে আত্মাতে পরিচিত হয়। মুখনিঃসৃত কথা যেমন মনের ভাব ব্যক্ত করে, ধর্ম্ম বিধিরূপী বিবেক তেমনি ব্রহ্মের অভিপ্রায় প্রকাশ করে। বিবেককে সেই জন্যই সাধকেরা ব্রহ্মবাণী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্যজ্ঞান যতদিন কর্ত্তব্যজ্ঞান থাকে, ততদিন উহা শক্তি সঞ্চার করিতে অসমর্থ হয়। কর্ত্তব্যজ্ঞান কিন্তু ব্রহ্মবাণী বলিয়া উপলব্ধি হইবামাত্র প্রাণে মৌলিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করে। সাধক এই দৈববাণী শুনিয়া চিত্তকে স্থির ও স্ববশে রাখিতে পারেন না। অনন্ত উন্নতির পথে নির্ভর ও বিশ্বাসের সহিত আপনাকে ছাড়িয়া দেন। আপনার জীবনের উপর তখন তাঁহার আপনার কর্ত্তৃত্ব থাকে না, যাঁর ধন তাঁকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন এবং আপন অজ্ঞতা ও অসারত্ব বুঝিয়া বলেন, "তুমি যে বিধি কর বিধি সেই হয় মঙ্গল বিধি গুণনিধি হে।"

মানুষ যখন ঈশ্বরকে ধরে তখন তাঁহার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত করে। সে নিজের আলোকে যে আদর্শ দেখিয়াছিল, ঈশ্বরকে সেই আদর্শ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে বলে। ঈশ্বর মানুষকে ধরিলে অন্য প্রকার ঘটে। আদর্শের ভার তখন ঈশ্বরের হাতে থাকে এবং তিনি নিত্য নূতন নূতন আদর্শ আত্মার নিকটে প্রকাশ করিয়া, উপাসককে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন। অসীম ঈশ্বর অসীম উন্নতির দিকে আত্মাকে প্রেরণ করেন। বৈরাগ্যের উপর উচ্চতর বৈরাগ্য, যোগের উপর উচ্চতর যোগের মধ্য দিয়া ঈশ্বর উপাসককে লইয়া যান। যাহা উপাসক কখন ঘটিবে বলিয়া মনে করে নাই, ঈশ্বর তাহা ঘটাইয়া দেন। ব্রহ্ম দর্শন ও ব্রহ্ম শ্রবণের পর সাধককে ব্রহ্ম ব্রহ্মযোগের রাজ্যে লইয়া যান। ব্রহ্ম সুন্দর, ব্রহ্মের বাণী বড় মিষ্ট এই পর্য্যন্ত জানিয়া আত্মা তৃপ্ত হয় না, ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইবার স্পৃহা হয়। আমি ও আমার পিতা এক, আমার ইচ্ছা ও প্রভুর ইচ্ছা এক, প্রভু যাহা জানান, তাই জানি, প্রভু যে ভাব প্রাণে দেন, সেই ভাব ভাবি, এই সকল ভাব তখন মনে আসে। দ্বৈতভাবের নির্ব্বাণ হইয়া অদ্বৈত ভাবের বিকাশ হয় এবং অদ্বৈত ভাবোদয় ক্রমে নিত্য সমাধিতে

পরিণত হয়। তখন সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্মগতপ্রাণ হয়, চক্ষু ব্রহ্ম দেখে, কর্ণ ব্রহ্ম শোনে, এবং প্রাণ সহজে ব্রহ্মের অনুবর্ত্তী হয়।

অনেক লোক নীতির মধ্য দিয়া ধর্ম্মরাজ্যে গমন করে, কিন্তু যে সকল আত্মাকে ঈশ্বর ধরেন, তাঁহারা একেবারে ধর্ম্মরাজ্যে গমন করে। তাঁহাদের প্রাণে একেবারে ধর্ম্মের আরম্ভ হয়। এ রিপু ও রিপুর সহিত পৃথক পৃথকরূপে তাঁহাদিগকে সংগ্রাম করিতে হয় না, ঈশ্বর স্পর্শে তাঁহাদের প্রাণে এরূপ তেজ সঞ্চার হয়, যে সমস্ত রিপু নিস্তেজ হইয়া যায়। তাঁহাদের চক্ষু, কর্ণ ও হৃদয় ব্রহ্মের দিকে ফিরিয়া থাকে, পার্শ্বে ও পশ্চাতে কি আছে, কি ঘটিতেছে সে দিকে তাঁহারা মনোযোগ না দিয়া, হৃদয়ের আবেগে হৃদয়নাথের দিকে উন্মত্তের মত ধাবিত হন। সাধন ভজনের জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে হয় না, প্রাণের দায়ে তাঁহারা আপনারাই সেই সাধন গ্রহণ করেন। তাঁহারা তাঁহাদের থাকেন না, ঈশ্বরের হইয়া যান বলিয়া ধর্ম্ম তাঁহাদের সহজ হইয়া যায়। প্রতি নিশ্বাসে তাঁহাদের প্রার্থনা ও প্রতি সঙ্গীতে তাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যাকুল যোগের ইচ্ছাই তাঁহাদিগকে নিত্য উপাসনায় ডুবাইয়া রাখে।

ভগবানের স্পর্শের এত গুণ। আমাদের জীবন বৃথাই গেল, এমন জীবনপ্রদ স্পর্শ আমরা আজিও অনুভব করিতে পারিলাম না। আপনাদের পরিত্রাণের ভার আমরা আপনাদের হস্তে রাখিতে চাই, পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করিয়া ভগবানকে ধরিতে চাই, নিরপেক্ষ ভাবে আপনাদিগকে ভগবানের হস্তে ছাড়িয়া দেই না, সেই জন্যই আমাদের জীবন এত হীন, নির্জীব ও নিষ্প্রভ হইয়া রহিয়াছে। ঈশ্বর করুন, আগামী উৎসবে যেন আমরা তাঁহার স্পর্শ অনুভব করিতে পারি। ঈশ্বর করুন, আগামী উৎসবে যেন আমরা তাঁহার হস্তে ধরা পড়ি। আর আমাদের পলায়ন ব্যাধির হাত হইতে জন্মের মত নিস্তার পাই। আমরা এতদিন ধরিয়া দেখিলাম যে, সে ধরা রাখিতে পারি না। এমনই আমাদের দুর্ব্বল ধরা যে ধরিতে না ধরিতে অমূল্য ঈশ্বর ধন হস্তচ্যুত হইয়া যায়। এবার ঈশ্বর তাঁহার অনন্ত হস্তে আমাদিগকে ধরুন, আর আমরা বিষয় বনে যেন ফিরিয়া যাইতে না পরি।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

ত্রিপুরা।

মঙ্গল স্বরূপ পরমেশ্বরের কৃপায় ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের সপ্তত্রিংশৎ সাম্বৎসরিক উৎসব নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ঢাকা হইতে কতিপয় ধর্ম্মবন্ধু সহ শ্রদ্ধেয় প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু মহাশয় উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবার ১০ই পৌষ বুধবার অপরাহ্ণ হইতে ১৪ই পৌষ রবিবার পর্য্যন্ত উৎসব হইয়াছে। বুধবার রাত্রিতে উৎসবের উদ্বোধন ও অপর চারিদিন প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও রাত্রিতে সামাজিক উপাসনা ও কীর্ত্তন এবং প্রায় প্রতিদিন আলোচনা ও সদালাপ হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে একদিন নগরকীর্ত্তন ও একদিন ব্রাহ্ম-সম্মিলন হইয়াছিল। আমাদের প্রিয় ব্রহ্মোৎসব অনেক সন্তপ্ত প্রাণে শান্তিবারি ঢালিয়াছে। অনেক মোহাচ্ছন্ন প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক লোক সময় সময় উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়ের সারগর্ভ উপদেশ ও উন্নত সঙ্গলাভে সকলেই বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন।

ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজের বাটীটি শ্রীশ্রীযুক্ত স্বাধীন ত্রিপুরাধিপের জমীদারী মধ্যে। এই ভূমিখণ্ড নিষ্কর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রাপ্ত হইবার জন্য ত্রিপুরার দরিদ্র ব্রহ্মোপাসকগণ বহুদিন হইতে রাজ সমীপে প্রার্থী হইয়াছিলেন। এবার মহারাজ বাহাদুর দয়া করিয়া ব্রাহ্মদিগের বহুদিনের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন। তজ্জন্য কুমিল্লাবাসী ব্রাহ্মগণ ত্রিপুরেশ্বরের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবেন।

উৎসব সমাপ্ত হইয়া গেলে, উক্ত সুসংবাদ পাওয়া যায়। অমনি ব্রাহ্মগণ পরমেশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া, একটি ইষ্টকময় ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কুমিল্লাস্থ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোককে এই মাঙ্গলিক কার্য্যোপলক্ষে সাদরে নিমন্ত্রণ করা হইল। গত ১৮ই পৌষ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীযুক্ত স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত দীনভাবে ঈশ্বরের কৃপা ভিক্ষা করিয়া সর্ব্বসমক্ষে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। তৎপর সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর ইচ্ছানুসারে সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে নগরে যাওয়া হয়। প্রায় ৩৭ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয় অমৃতলাল গুপ্ত মহাশয় কুমিল্লা নগরে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করেন, সেই দিনে তাঁহাকে কত উৎপীড়ন, কত অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। আজ ত্রিপুরা ব্রাহ্মসমাজ সে সকল স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যে স্থানে বাস করিতেন এবং যথায় ব্রহ্মোপাসনা করিতেন, ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় যাওয়া হয়। এইরূপে সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে প্রায় এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত কীর্ত্তন হইতে থাকে। কীর্ত্তনান্তে মন্ত্রী মহাশয় রাজপথে দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করেন। সে দিনকার ব্যাপারে প্রভু পরমেশ্বরের বিশেষ কৃপার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া সকলে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

গিরিধী।

গিরিধী ব্রাহ্মসাজের সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী এবং রামপুরহাট হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যার পরে উদ্বোধন কার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে উপাসনা হয়। পরে "ধর্ম্মই জাতির জীবন" এই সম্বন্ধে একটী উপদেশ হয়। মধ্যাহ্নে শাস্ত্রালাপ। সন্ধ্যারপর

উপাসনা ও কীর্ত্তন হয়। ২৬শে ডিসেম্বর প্রাতে—উপাসনা হয়। "মা বাহিরে ও ভিতরে" এই সম্বন্ধে উপদেশ হয়। শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই দুই দিনের উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। মধ্যাহ্নে—গরিব, দরিদ্র এবং আতুর লোকদিগকে বস্ত্র, চাউল এবং চিড়া দান করা হয়। সন্ধ্যার সময় নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় ব্রহ্মমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, উপাসনান্তে উৎসবের কার্য্য সমাধা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ সামন্ত মহাশয় সন্ধ্যাকালে বেদীর কার্য্য করেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসব—গত ১৬ই পৌষের তত্ত্বকৌমুদীতে একষষ্টিতম মাঘোৎসবের যে কার্য্যপ্রণালী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ১২ই মাঘ বালকবালিকা সম্মিলনের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার পরিবর্ত্তন হইয়া স্থির হইয়াছে যে ৮ই মাঘ উক্ত সম্মিলন হইবে। এতদ্ভিন্ন আর কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। এজন্য উক্ত কার্য্য প্রণালী এবার আর প্রকাশ করা গেল না।

শ্রাদ্ধ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবক সভ্য বাবু লালমোহন ঘোষাল গত ৬ই পৌষ তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং পরিবারস্থ সকলকে শোকাকুল করিয়া পরলোকগত হইয়াছেন। বিগত ২৭এ ডিসেম্বর শনিবার লালমোহনের পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ ব্রহ্মোপাসনা হয়, বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। সেই শ্রাদ্ধের সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার জীবন সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমরা তাহা হইতে কোন কোন অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। মঙ্গলময় পরমেশ্বর তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং ভাই ভগিনীদিগের প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করুন এবং তাঁহার আত্মাকে অনন্তকুশলে রক্ষা করুন।

"**পরলোকগত লালমোহন**—বিক্রমপুরের অন্তর্গত সেতকা গ্রামে লালমোহনের জন্ম হয়। অনেক দিন হইতে এই পরিবারে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভাব প্রবেশ করে। লালমোহনের যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স তখন ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মে। এই সময় তিনি প্রায় তিন মাইল দূরবর্ত্তী বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে তাঁহার এক খুল্লতাতের গৃহে থাকিয়া একটী উচ্চ ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি সমপাঠীদিগের সহিত পৌত্তলিকতা ও ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। এই সময় লালমোহনের বিশেষ উদ্যোগে পূর্ব্বপাড়াতে একটী প্রার্থনা সভা স্থাপিত হয়। বর্ত্তমান পূর্ব্বপাড়া ব্রাহ্মসমাজ তাহারই বিকাশ।

লালমোহন এ সময় প্রতি সপ্তাহে বাড়ী যাইয়া উৎসাহের সহিত জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা ব্রহ্ম সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি করিতেন। তাঁহাদের পরিবারের সকলে ব্রাহ্ম হইবেন এই চিন্তায় তাঁহার হৃদয় উৎসাহিত ও মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। এই সময় তাঁহার যে ধর্ম্মোৎসাহ ও অনুরাগ দেখা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলেও আনন্দ হয়।

ইহার কিছুদিন পরে ভগবানের কৃপায় লালমোহনের পরিবারস্থ সকলে প্রকাশ্য ভাবে ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন এবং কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। লালমোহন কিছু দিন ইংরাজী শিক্ষা করিয়া পরে ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে অধ্যয়ন করেন।

দারুণ রোগ যন্ত্রণার সময়েও তাঁহার আশ্চর্য্য সহিষ্ণুতা দেখা যাইত। তিনি পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে এবার আর তাঁহার নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু তজ্জন্য কখনও তাঁহাকে নিরাশার ভাব প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। এক দিন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা তাঁহার শিয়রে বসিয়া কাঁদিতে ছিলেন, লালমোহন তাঁহাকে বলিলেন "মা তুমি কাঁদ কেন, ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয় আমি বাঁচিব তবে ত কোন কথাই নাই। আর যদি তাঁহার ইচ্ছা অন্য রূপ হয় তাহাতেই বা ভয় কি? কে চির দিন এখানে থাকিতে আসিয়াছে, তুমি প্রার্থনা কর যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" এই সময় তিনি তাঁহার একটী ভগিনীকে নিম্ন লিখিত চিঠিখানা লেখেন।

"আমি মরিব এই কথাটি যখন চিন্তা করি, একটুকও কষ্ট হয় না, কিন্তু যখন ভাবি, আরও এক বৎসর কাল ব্যারামে ভুগিব, তখনই আমাকে অস্থির করিয়া ফেলে নিরাশায় মন আচ্ছন্ন হয়। মৃত্যু ত অতি সহজ। তাহাতে আবার ভয় কি? কিন্তু রোগ-যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। তুমি কখনও মনে স্থান দিও না, আমি মৃত্যুর জন্য চিন্তা করিয়া থাকি।"

লালমোহন দারুণ রোগ যন্ত্রার মধ্যেও যখন একটু সুস্থতা লাভ করিতেন, তখন প্রার্থনা করিতেন। সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রসন্নচিত্ত দেখা যাইত। তাঁহার রোগ যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই ভগবানে নির্ভর বাড়িতে লাগিল। তাঁহার যতক্ষণ চেতনা ছিল, ততক্ষণ বুকের উপর হাত রাখিয়া প্রার্থনার ভাবে ছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন সন্ধ্যায় সময় আবার ব্রহ্মসঙ্গীত শ্রবণ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি কোন্ গান শুনিতে চান? তিনি গদ গদ ভাবে উত্তর করিলেন "জানি তুমি মঙ্গলময়।" গান শেষ হইলে বলিলেন "বড় ভাল লাগিয়াছে আর একটি।"

রোগীর শুশ্রূষা করা লালমোহনের একটী বিশেষ গুণ ছিল। তিনি এক সময়ে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে যাইয়া রাত্রে ৩।৪ ঘণ্টা নিরাশ্রয় রোগীদিগের শুশ্রূষা করিতেন। তাঁহার এই ভয়ানক রোগ হওয়ার প্রারম্ভে অসুস্থ শরীর নিয়াও একটি পীড়িত বালকের নিকট রাত্রি ১২।১টা পর্য্যন্ত থাকিতেন।

তাঁহার হৃদয় অতি বিনীত, নিঃস্বার্থপর এবং চরিত্র অতি মধুর ছিল। যাহার সহিত তিনি একবার মিশিতেন তাহার সহিতই তাঁহার সদ্ভাব জন্মিত। অন্যের দুঃখ দেখিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। এই বিনীত ভাবের সহিত সৎসাহস মিলিয়া তাঁহার চরিত্রকে আরও সুন্দর করিয়াছিল। একদিন একজন বলিষ্ঠ ইউরোপীয় বিনা কারণে একজন দুর্ব্বল বাঙ্গালীর উপর অত্যাচার করিতে ছিল। লালমোহন ইহা দেখিতে পাইয়া আর সহ্য করিতে পারিলেন না, অমনি সাহেবের হস্ত হইতে বাবুটিকে রক্ষা করিলেন। এই উপলক্ষে সাহেবের সহিত তাঁহার বিলক্ষণ হাতাহাতি হইয়া গেল।"

নামকরণ—গত ২৬এ পৌষ জামতাড়া সবডিবিশনের ডাক্তার বাবু শশিভূষণ সরকার মহাশয়ের তৃতীয় পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। বালকের নাম সুধাংশুভূষণ রাখা হইয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৪র্থ ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণ—১৮৯০।

বিগত তিন মাসে কার্য্য নির্ব্বাহক সভা নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সময় মধ্যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভার ৯টী নিয়মিত এবং ২টী বিশেষ অধিবেশন হইয়াছে।

মাঘোৎসব—আগামী একষষ্টিতম মাঘোৎসব সুসম্পন্ন করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটী কমিটির উপর ভারার্পণ করিয়াছেন। উক্ত কমিটি তাঁহাদের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্রাহ্মসমিতি—গত বৎসরে বোম্বাই নগরে একেশ্বরবাদীগণের সম্মিলন হইয়াছিল। এবারে কলিকাতা নগরে সেই অধিবেশন হইবে। উক্ত সমিতিতে সমাগত বিদেশীয় ব্রাহ্মগণের অভ্যর্থনা ও সমিতির আবশ্যকীয় আয়োজন সম্পন্ন করিবার জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সভা একটী কমিটির উপর ভারার্পণ করিয়াছেন।

সমাজ মন্দিরের চূড়া—আমরা গত ৩য় ত্রৈমাসিক রিপোর্টে জানাইয়াছিলাম যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা সমাজ মন্দিরের চূড়ার প্ল্যান মনোনীত করিয়াছেন। এবং বিলডিং ফণ্ডের সম্পাদক মহাশয়ের উপর চূড়া নির্ম্মাণের ভারার্পণ করিয়াছেন। আমরা জানাইতেছি উক্ত চূড়া নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। আশা করা যায় আগামী মাঘোৎসবের মধ্যেই চূড়া নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইবে।

প্রচার—পণ্ডিত রাম কুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় গত শ্রাবণ মাস হইতে এক বৎসরের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। বাবু শশিভূষণ বসু মহাশয়ও এখন ছুটী লইয়া কলিকাতাতে অবস্থিতি করিতেছেন। অন্যান্য প্রচারকগণ নিম্নলিখিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী—গত অক্টোবর মাসের প্রথমেই মান্দ্রাজ অঞ্চলে গমন করেন। যাইবার সময় পথে কাশী, এলাহাবাদ, খাণ্ডোয়া প্রভৃতি স্থান হইয়া গমন করেন। মান্দ্রাজে গমনপূর্ব্বক ৪ঠা অক্টোবর হইতে ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মান্দ্রাজ সহরে থাকিয়া আলোচনা উপাসনা এবং উপদেশ দ্বারা তথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করেন এবং "ভারত কিরূপ ধর্ম্মাচার" "ভ্রাতৃভাব", "ধর্ম্মের জাতীয়তা ও সার্ব্বভৌমিকতা" প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তৎপর কোইম্বাটুর নগরে গমন করিয়া তথাকার সাম্বৎসরিক উৎসবে উপাসনা করেন এবং উপদেশ দেন। "নব জীবনের নব আকাঙ্ক্ষা" "বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার" এবং "প্রার্থনার আবশ্যকতা বিষয়ে" বক্তৃতা করেন। এবং আলোচনা, উপাসনা ও উপদেশাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্য করেন। এখান হইতে কালিকট নগরে গমন করেন। তথায় "শিক্ষিতদিগের কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। তথা হইতে ত্রিচিনোপলি গমন করেন। তথায় কোন ব্রাহ্মসমাজ নাই। কিন্তু তথাকার আর্য্যতত্ত্ব বিদ্যালয় নামক বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে একটী বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তথায় "বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মশিক্ষা বিষয়ে" বক্তৃতা করেন। এখানে "ভারতে ধর্ম্ম বিপ্লব ও তৎসম্বন্ধে শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দায়িত্ব" বিষয়ে আর একটী বক্তৃতা করেন এবং উপাসনা, আলোচনা ও উপদেশাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করেন। তথা হইতে মান্দ্রাজ সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং একটি আলোচনা সভায় ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বিশদরূপে ব্যাখ্যা করেন। তথা হইতে বেজওয়াদা নামক স্থানে গমন করেন এবং তথা হইতে কোকনদে গমন করিয়া সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় পীড়িত হইয়াছিলেন। ঈশ্বর কৃপায় তিনি সুস্থ হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়—কলিকাতায় থাকিয়া নিম্নলিখিতরূপ কার্য্য করিয়াছেন। ৯ই কার্ত্তিক ও ১১ই অগ্রহায়ণ পারিবারিক অনুষ্ঠানে উপাসনা, ১লা, ৫ই, ১০ই, ১২ই, ১৫ই, ১৯এ, ২৬এ ও ২৭এ অগ্রহায়ণ এবং ৩রা, ৪ঠা ৮ই, ও ১০ই পৌষ ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে এবং ছাত্রনিবাসে উপাসনা আলোচনাদি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। ১১ই পৌষ শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে উপাসনা করেন ও উপদেশ দেন। ১৩ই পৌষ শ্রীরামপুরে উক্ত উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন।

শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস—ঢাকায় থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজে, ছাত্রসমাজে এবং সঙ্গতাদিতে নিয়মিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন। এই সময় একবার নারায়ণগঞ্জে গিয়া উপাসনাদি করেন, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের শারদীয় উৎসবে উপাসনা, উপদেশ ও আলোচনাদি করেন, একদিন একটী বক্তৃতা করেন, বক্তৃতার বিষয় "এত গোল করে কা'রা" ইহার পর বিশেষ কার্য্যে মাণিকদহে শারদীয়া উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া গমন করেন। যাইবার পূর্ব্বে কুমারখালি ব্রাহ্মসমাজে উপাসনাদি করেন, ঝিকরগাছা-বটে পারিবারিক উপাসনা করেন, এবং কুষ্টিয়ায় পারিবারিক উপাসনাদি করেন, তৎপর মাণিকদহ যান। সেখানে উৎসবে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন, এখান হইতে পুনরায় ঢাকায় যাইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ব্রাহ্মসম্মিলনীতে উপাসনা ও আলোচনাদি করেন, ঢাকা হইতে বজ্রযোগিনী গ্রামে যান, সেখানকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে উপাসনা, উপদেশ ও আলোচনাদি করেন, একদিন একটী বক্তৃতা করেন, বক্তৃতার বিষয় "ধর্ম্মসাধন" এখান হইতে পুনরায় ঢাকায় গমন করেন, আবার বিক্রমপুরে যান, তৎপরে ঢাকায় যাইয়া বিশেষ কার্য্যে ধুবুড়ি গমন করেন, পথে নৌকাতে সাধারণকে লইয়া উপাসনাদি করেন, ঘুণিগ্রামে উপাসনাদি করেন, সিরাজগঞ্জে কয়েকদিন থাকিয়া উপাসনা, উপদেশ ও আলোচনাদি করেন, একদিন বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। কিন্তু অল্প লোক হওয়ায় সংক্ষেপে "কাহাদের সঙ্গে মিলিবে" এই বিষয়ে কিছু বলেন, এখান হইতে পিঙ্গনা যান, সেখানে উপাসনাদি করেন, পিঙ্গনা স্কুলের ছাত্রদিগের নিকট, "শিক্ষা" বিষয়ে একটী বক্তৃতা

করেন। পিঙ্না হইতে ধুবড়ি যান, এখানে কিছুদিন থাকিয়া উপাসনা ও আলোচনাদি করেন, একদিন একটী বক্তৃতা করেন, বিষয় "মানবের বিশেষত্ব কি," এবং একদিন একটী অনুষ্ঠানে উপাসনাদি করেন। এখান হইতে পুনরায় ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গমন করেন, ঢাকার উৎসবে পৌঁছিলেও অসুস্থতা জন্য উৎসবে কার্য্য করিতে পারেন নাই, তৎপর একটী অনুষ্ঠানে উপাসনাদি করেন, ভিন্ন ভিন্ন পরিবার এবং সমাজে এবং ছাত্র নিকেতনে উপাসনাদি করেন, একদিন ছাত্রসমাজে "স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেবের মহত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। এখান হইতে কলিকাতা রওনা হন। পথে নারায়ণগঞ্জে উপাসনাদি করেন, এখন কলিকাতায় থাকিয়া পরিবারে পরিবারে উপাসনাদি করিতেছেন।

এতদ্ভিন্ন বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী—খাসিয়া পাহাড়ের নানা স্থানে বিশে উৎসাহের সহিত প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি মৌসমাই নামক স্থানে একটী ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণের জন্য আয়োজন করিয়াছেন। তিনি কাছাড়, চেরাপুঞ্জি, শেলাপুঞ্জি, মৌরংথং শিলং মৌসমাই, প্রভৃতি স্থানে প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার যত্নে কয়েকজন খাসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। বাবু কালীপ্রসন্ন বসু—প্রধানতঃ ঢাকায় থাকিয়া কার্য্য করিয়াছেন। তথা হইতে সিরাজগঞ্জ, পিংনা, ধুবড়ি, প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া উপদেশ, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। বাবু চণ্ডীকিশোর কুশারী কুমিল্লা ও ঢাকায় নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন। বাবু মনোরঞ্জন গুহ, উমেশ চন্দ্র দত্ত, কৈলাস চন্দ্র সেন, কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কেদার নাথ রায় প্রভৃতি মহাশয়গণ নানা প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন।

মৃত্যু—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অকৃত্রিম বন্ধু এবং ব্রাহ্মসাধারণের শ্রদ্ধেয় বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয় গত ২৭এ কার্ত্তিক বুধবার পরলোকগত হইয়াছেন। যে দিনে তিনি পরলোক গত হন তাঁহার সম্মানার্থ সেই দিনকার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন, আমাদের কার্য্যালয় এবং ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয় বন্ধ রাখা হইয়াছিল। তৎপর দিন কার্য্যনির্ব্বাহক সভার এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশপূর্ব্বক নিম্নলিখিত রূপ প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হয়।

"বাবু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের বিয়োগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা অদ্যকার সভা একটি পবিত্র কর্ত্তব্য মনে করিতেছেন। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক ও কয়েক বৎসর ইহার সভাপতিরূপে বার্দ্ধক্যের অপারগতা সত্বেও যেরূপ উৎসাহ ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত ইহার সেবা করিয়াছেন তাহা দেখিয়া যুবকগণকেও লজ্জিত হইতে হয়। তাঁহার জীবন আড়ম্বর শূন্য এবং ধর্ম্ম ও স্বদেশীয়ের মঙ্গলের জন্য অক্লান্ত চেষ্টার আদর্শ স্বরূপ ছিল; ব্রাহ্মধর্ম্মের চিরাদৃত উপদেশ—ভগবানে প্রীতি ও কর্ত্তব্যপ্রিয়তা—তাঁহার জীবনে যেরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্ত তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে অতি বিরল।"

"ইহাও নির্দ্ধারিত হইল যে অদ্যকার সভা পরলোকগত ভক্তিভাজন মহাশয়ের শোক সন্তপ্ত পরিবারের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া উপরোক্ত প্রস্তাবের একখণ্ড তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করেন।"

ব্রাহ্ম-বালিকা-শিক্ষালয়—এই তিন মাসে ২০টী বালক ও ৪৩টী বালিকা মোট ৬৩টী শিক্ষার্থী এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ছাত্র ও ছাত্রীগণের ব্যবহার ও শিক্ষার উন্নতির অবস্থা অবগত হইবার জন্য এক খানা চরিত্র পুস্তক ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে দেওয়া হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা ইহাদের গৃহের এবং বিদ্যালয়ের অবস্থা অবগত হইবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখনও ভাড়াটিয়া গাড়ী দ্বারাই ছাত্র ও ছাত্রীগণকে স্কুলে আনা এবং বাটীতে পাঠান হয়। ইহাতে কার্য্যের কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে। কমিটি স্বকীয় গাড়ীর বন্দোবস্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। গত তিন মাসে ছাত্র বেতন ৩৩৭৸৶০, এক কালীন দান ও মাসিক চাঁদা দ্বারা ৯৫টাকা মোট ৪৩২৸৶০ টাকা আয় হইয়াছে। গত ত্রৈমাসিকের স্থিত ৩৭৭৸৶১২॥ সহিত মোট ৮১০৸৶১২॥ আয় হইয়াছিল। এই সময়ে ৫৩৭॥/১২॥ ব্যয় হইয়া ২৭৩।/০ হস্তে স্থিত আছে।

ব্রাহ্মছাত্রীনিবাস—আমরা গত ৩য় ত্রৈমাসিক কার্য্যবিবরণে জানাইয়াছিলাম যে কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ব্রাহ্ম বালিকাগণের শিক্ষার সুবিধার জন্য বিশেষতঃ মফস্বলের ব্রাহ্মগণের কন্যাও আত্মীয়াদিগের সুশিক্ষার জন্য কলিকাতাতে একটী ছাত্রীনিবাস স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রস্তাব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। নবেম্বর মাসে উক্ত ছাত্রীনিবাস খুলিবার কথা ছিল। কিন্তু ছাত্রীনিবাসের জন্য ভার প্রাপ্ত কমিটী অক্টোবর মাস হইতেই ছাত্রীনিবাসের কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি নয়টী বালিকা উক্ত ছাত্রীনিবাসে বাস করিতেছে। শীঘ্র তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা আছে। ছাত্রীদিগের আহারাদির ব্যয় স্বরূপ মাসে ৯৷৷০টাকা করিয়া গ্রহণ করা হইবে। স্কুলের বেতন, পুস্তক, বস্ত্র বিছানাদির ব্যয় স্বতন্ত্র লাগিবে। ছাত্রীনিবাসের কার্য্য চালনার জন্য একটী কমিটির উপর ভারার্পণ করা হইয়াছে। উক্ত কমিটি ছাত্রীনিবাস সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভায় অর্পণ করিয়াছেন। উক্ত নিয়ম সমূহ এখনও কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বিবেচনাধীন আছে। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় উক্ত ছাত্রীনিবাস কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা বিরাজমোহিনী ভট্টাচার্য্য মহাশয়া ও শ্রীযুক্তা সুশীলা মজুমদার মহাশয়া নিঃস্বার্থ ভাবে এই ছাত্রীনিবাসের তত্বাবধায়িকার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় ছাত্রীদিগকে লইয়া প্রতিদিন উপাসনা করিয়া থাকেন এবং উপদেশ দিয়া থাকেন, সম্প্রতি তিনি ছাত্রীদিগকে পাঠ বলিয়া দেওয়ার ভারও গ্রহণ করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ আছি।

অনেকে এই ছাত্রীনিবাসে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে আমরা এ কার্য্যে প্রবৃত্তই হইতে পারিতাম না। এই সাহায্যের জন্য আমরা তাঁহাদের নিকটও বিশেষ কৃতজ্ঞ আছি। মফস্বল হইতে অতি অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মের কন্যাই আমরা ছাত্রীনিবাসে পাইয়াছি। আমরা আশা করি মফঃস্বলের ব্রাহ্মবন্ধুগণ এই মহৎ কার্য্যের সাহায্য করিতে ত্রুটী করিবেন না। এই তিন মাসের আয় ব্যয়ের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জমা		খরচ	
ঋণ জমা	১০০৲	জিনিষ খরিদ—	
চাঁদা আদায় ৩ মাসের		থালা, বাটী, ঘটী,	
মোট	১৩৩৲	গ্লাস, তাম্বারডেগ	
ছাত্রীদিগের বেতন		ও তক্তপোষ	
৩ মাসের মোট	২৮৬৲	ইত্যাদি মোট	৭৮৸/১৫
এড্‌মিসন ফিঃ জমা	১৫৲	বিবিধ ব্যয়	১০৸৴৫
দান প্রাপ্তি	১৫৲	বাড়ী ভাড়া	১৫৯৸৶১৫
বৃত্তি হিঃ জমা	১১৸০	ছাত্রীদিগের স্কুলের	
		বেতন	২২৸০
	৫৬০৸০	ছাত্রীদিগের বৃত্তি	১২৸০
		চাকরের বেতন	৪৬৸০
		ধোপার বেতন	১৪/১৫
		খোরাকী, জলখাবার	
		৩ মাসের ব্যয়	১৪৬৸৶১০
			৪৯১৸০
		হস্তে স্থিত	৬৯৲
			৫৬০৸০

দাতব্য বিভাগ—বিগত ৩ মাসে ১২টী, পরিবারকে ৭০৲ টাকা এবং ৮টী ছাত্রকে ৩৭৸০ আনা দেওয়া হইয়াছে।

আয়		ব্যয়	
মাসিক দান আদায়	৪৲	মাসিক চাঁদা দান	৯০৸০
এককালীন দান প্রাপ্তি	৭৭৲	এককালীন দান	১৭।০
	৮১৲		১০৭৸০
পূর্ব্বকার স্থিত	১৩৮৶০	হস্তেস্থিত	১১১৷৶০
	২১৯৶০		২১৯৶০

সঙ্গত সভা—অক্টোবর মাসে ৪টী, নবেম্বর মাসে ৪টী ও ডিসেম্বর মাসে ৪টী অধিবেশন হয়। প্রত্যেক মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর সভাগণ উপস্থিত হইয়া উপাসনা ও তৎপরে আলোচনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য বিষয় ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা, যোগ, নির্ভর ও আমাদের অবস্থা। ১৬ই ডিসেম্বর পণ্ডিত রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় ভক্ত কবিরের গ্রন্থ হইতে পাঠ করিয়াছিলেন।

ছাত্র সমাজ—গত অক্টোবর, নবেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ছাত্রসমাজে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি হইয়াছে।

বক্তা	বিষয়
বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র	ধর্ম্ম কি?
„	Religion applied to life.
বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র	বাবু শিবচন্দ্র দেবের জীবনী।
	Mrs. Booth.
মিঃ কেইন (W. S. Caine)	মিতাচার
বাবু বিপিনচন্দ্র পাল	Indian Reform.
„	Ways and Means.

পুস্তকালয়—পুস্তকালয়ের জন্য একজন লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহার যত্নে পুস্তকালয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে। গ্রন্থ ও পত্রিকা সকল শৃঙ্খলার সহিত রাখা রাখা হইতেছে। অনেকেই বাড়ীতে গ্রন্থ লইয়া গিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। তবে পুস্তকালয়ে বসিয়া পাঠ করিবার দিকে লোকের বেশী আগ্রহ দেখা যায় না।

তত্ত্বকৌমুদী ও ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার—এই দুই পত্রিকাই নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। মেসেঞ্জারের ঋণভার ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতেছে। এ নিমিত্ত যে কমিটি আছে, তাঁহারা মেসেঞ্জারের নিয়মিত ব্যয় সঙ্কোচ করিয়াছেন। কিন্তু এখনও আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক। এজন্য কিছুতেই ইহার ঋণভার হ্রাস করিতে পারিতেছেন না। তত্ত্বকৌমুদীর আর্থিক অবস্থা মন্দ না হইলেও আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না।

পুস্তক প্রচার কমিটি—তত্ত্বকৌমুদী হইতে প্রার্থনা সূচক লেখা সংগ্রহ পূর্ব্বক একখানি পদ্য ও একখানি গদ্য পুস্তক মাঘোৎসবের পূর্ব্বে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ব্রাহ্মমিশন প্রেস—ইহার কার্য্য নিয়মিত ভাবে চলিতেছে। এই তিন মাসে ১০৯১৷৵৫ টাকার কাজ হইয়াছে এবং ৬৩০৸৶১০ টাকা আদায় হইয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১২৩৮৶১০ টাকা খরচ হইয়াছে।

উপাসকমণ্ডলী, ব্রহ্মবিদ্যালয়, রবিবাসরিক নৈতিক বিদ্যালয়ের কার্য্য নিয়মিতরূপে চলিতেছে। কিন্তু তাঁহাদের কার্য্যের কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

আয় ব্যয়ের হিসাব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আয়—		ব্যয়—	
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ফণ্ড	১৪১৸৶১৫	প্রচারব্যয়	৪৫৮৲১৫
		কর্ম্মচারীর বেতন	১৮৩৲
বার্ষিক চাঁদা ৬৮৷৴		ডাক মাশুল	৯৷৴১৫
মাসিক চাঁদা ৩৯৴১৫		প্রচারক গৃহ হিঃ	২৬৸/১০
এককালীন দান ২৭৲		দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দান	১৩৬৲
শুভ কর্ম্মোপলক্ষে প্রাপ্ত ৭৲			
		কমিশন দান	৪৸০
	১৪১৸৶১৫	বিবিধ হিঃ	৫৫।১০
			৮৭৩৷৶১০

জের	১৪১৷৵১৫	জের	৮৭৩৷৵১০
প্রচার ফণ্ড	৩৭৫৸/৫		
বার্ষিক চাঁদা ৯৩৷৹			৮৭৩৷৵১০
মাসিক চাঁদা ২৩০/৫		গচ্ছিত শোধ	৭৬৵০
এককালীন			
দান ৫২৷০			৯৪৯৷/১০
		স্থিত	২৬০৵০
	৩৭৫৸/৫		
পাথেয় হিঃ	৫৲	মোট	১২০৯৷৵১০
জন্মের রেজষ্টরী ফি	১৲		
প্রচারক গৃহ হিঃ (বাড়ীভাড়া)	১২০৷/		
সিটীকলেজ হইতে দরিদ্র ব্রাহ্ম ছাত্রদিগের স্কুলের বেতন দানের জন্য প্রাপ্ত	১৩৬৲		
কর্ম্মচারীর বেতন, তত্ত্বকৌমুদী ও পুস্তকের ফণ্ড হইতে প্রাপ্ত	৪৫৲		
	৮২৪৸/		
গচ্ছিত হিঃ	৭৲		
ফেরত জমা	১০০৲		
হাওলাত হিঃ	৯৮৷৵১০		
	১০৩০৶১০		
পূর্ব্বস্থিত	১৭৯৷৶		
মোট	১২০৯৷৵১০		

পুস্তক বিক্রয়ের হিসাব।

বাকী মূল্য আদায়	৩৮৷৹	অপরেরপুস্তকবিক্রয়ের মূল্য শোধ	৯৮৷/০
নগদ বিক্রয়	৮৪৷১৫	পুস্তকের ডাক মাশুল	১৸৶১
সমাজের ৬০৷/৫		ডাক মাশুল	৫১০
অপরের ২৩৸৶১০		কাগজ	৷৷/১০
	৮৪৷১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	২১৲
কমিশন	২২৷/১৫	কমিশন	৩৸/১০
পুস্তকের ডাকমাশুল	২৷/০	বিবিধ হিঃ	৷/১৫
	১৪৭৶১০		১২৬/১৫
গতত্রৈমাসিকের স্থিত	২৮৭১/	স্থিত	২৮৯২৷৵১৫
			৩০১৮৷৷১০
মোট	৩০১৮৷৷১০		

তত্ত্বকৌমুদী

মূল্য প্রাপ্ত	২১২৸১৫	ডাক মাশুল	৪৩৵১০
নগদ বিক্রয়	৷০	কমিশন	১১৵৫
		কাগজ	৩৭৷৷০
	২১৩৲১৫	কর্ম্মচারীর বেতন	২৪৲
গতত্রৈমাসিকের		মুদ্রাঙ্কণ	২৭৲
স্থিত	১৫২৩৶১০	বিবিধ হিঃ	৯৷৶১০
			১৫২৷৷৫
মোট	১৭৩৬৷৷৫	স্থিত	১৫৮৪৲
		মোট	১৭৩৬৷৷৫

ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার।

মূল্য প্রাপ্ত	১৯২৸৵০	ডাকমাশুল	৮১/১৫
গচ্ছিত	১০৲	বিবিধ	৫৸৶১০
বিজ্ঞাপন	৬৬৲	কাগজ	৪৯৷৷১০
নগদ বিক্রয়	৷৵০	কর্ম্মচারীর বেতন	২২৷৷০
বিবিধ	৪০৲	মুদ্রাঙ্কণ	৬০৲
		কমিশন	৪৸৵০
	৩০৯৷০	হাওলাত শোধ	২৫৲
পূর্ব্বস্থিত	২০৬৷/১০	হাওলাত দান	১১৲
		দপ্তরী	২৲
	৫১৫৷৷/১০		
			২৬১৸৶১৫
		স্থিত	২৫৩৷৷/১৫
			৫১৫৷৷/১০

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২১এ জানুয়ারি (৯ই মাঘ) বুধবার ৬½ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৩শ বার্ষিক অধিবেশন হইবে। সকলে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত হইয়া কার্য্য সম্পন্ন করবেন।

বিবেচ্য বিষয়।

১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১৩শ বার্ষিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। সভাপতির মন্তব্যসূচক বক্তৃতা।

৩। আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী নিয়োগ।

৪। আগামী বর্ষের অধ্যক্ষ সভাগঠন।

৫। সভ্যমনোনয়ন।

৬। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশোধিত নিয়মাবলীর বিচার।

৭। বিবিধ।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়
২৪এ ডিসেম্বর।
১৮৯০

শ্রীউমেশ চন্দ্র দত্ত
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

যে কোন ব্রাহ্মিকা মহিলা নিম্ন লিখিত বিষয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে চৌদ্দগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সেন মহাশয় ১০৲ দশ টাকার একটী পারিতোষিক প্রদান করিবেন।

বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে, শ্রীযুক্ত বাবু নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইষ্ট বেঙ্গল ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা, এই ঠিকানায় পত্র লিখিলে সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

বিষয়।

মধ্যবিত্ত লোকের উপযোগী বাড়ী প্রস্তুত (একটী নক্সা অঙ্কণ করিয়া plan ও elevation সহ); গৃহসামগ্রী ও তাহা সাজান; পরিবারস্থ লোকদিগের সহিত ব্যবহার; ব্রাহ্মিকাদিগের বেশভূষা; আয় ব্যয়।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৪শ ভাগ
২০শ সংখ্যা

১৬ই মাঘ, বুধবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

তোমার ভিখারী।

সংসারের পথে পথে বেড়ায় আকুল হয়ে,
ভিক্ষা চায় অশ্রুজলে ভেসে,
ব্যথা অপমান সয়ে, অপূর্ণ কামনা লয়ে
শেষে চলে তোমারি উদ্দেশে।

আগে যদি আসে দুখী, দীননাথ তব দ্বারে,
সঁপে দেয় তৃষিত হৃদয়;
এক মুষ্টি ভিক্ষা তরে তবে কি সে কেঁদে মরে
ভবে তার এ দুর্গতি হয়?

তোমার ভিখারী আসি রিক্ত হস্তে নাহি যায়
নাহি পায় দুঃখ অপমান,
দেখাও ঐশ্বর্য্য তব, আঁখি না ফিরিতে চায়
প্রেমদানে পূর্ণ কর প্রাণ।

ফেলে দাও দূর করে দরিদ্রের জীর্ণবাস
কেড়ে লও ভিক্ষা পাত্র তার
দাও তারে দ্বারে দ্বারে বিতরিতে অভিলাষ
লুঠি আমি তোমার ভাণ্ডার

তারে তুমি দাও সুখ, দাও শান্তি, মান জ্ঞান
প্রতিদিন নব নব আশ,
যত চায় তত পায়, বারেক জুড়ায়ে প্রাণ
ফিরে দাও দ্বিগুণ পিয়াস।

অনন্ত পিপাসা হ'তে তোমারে চিনিয়া লয়
হে নির্ঝর, অনন্ত, অক্ষয়,
চির দুর্ব্বলতা লয়ে নিত্য অগ্রসর হয়
তোমা পানে ওহে শক্তিময়।

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে করুণাময় পিতা! তোমার যাহা করিবার, তাহাতে কখনই ত্রুটী লক্ষিত হয় না। তুমি তোমার কর্ত্তব্য যথাসময়ে যথাযথ রূপেই সম্পন্ন করিয়া থাক। এই ত দেখিলাম আমাদিগকে উৎসবে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলে— এবং উৎসবে লইয়া যাইবার উদ্দেশ্যও সম্পূর্ণরূপে তুমি প্রতিপালন করিলে। তুমি ত কখনই নিরাশ কর না—নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দেওয়ার রীতি তোমার নাই। তুমি যেমন উৎসবে ডাকিয়াছিলে, তেমনি সকলকে মহোৎসবের মহা রত্ন সকল প্রদান করিয়াছ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এমনই অপদার্থ ও উদাসীন প্রকৃতির লোক যে, যাহা তুমি দেও তাহা রাখিতে জানি না। লব্ধ রত্ন নিজস্ব করিয়া রাখিতে হইলে, যাদৃশ পরিশ্রম করিতে হয় ও সতর্কতার সহিত থাকিতে হয়, আমরা তাহা পারি না। আমরা পাইয়া আনন্দে দিশাহারা হইয়া যাই, আর সেই দুর্লভ ধনের প্রতি তেমন যত্ন করিবার প্রয়াস থাকে না। সে দিকে আমরা দৃষ্টিহীন হইয়া অতি সহজেই আবার সেই সকল লব্ধ ধন হারাইয়া দীনতা প্রাপ্ত হই। পিতা এমন করিয়া আর আমাদিগকে উদাসীন দুষ্ট বালকের মত হইতে দিও না। তুমি আমাদিগকে লব্ধ বস্তু রক্ষা করিবার জন্য যত্নশীল কর। আবার যেন হারাইয়া ফেলিলাম বলিয়া হাহাকার ও অনুশোচনা করিতে না হয়। আমাদের স্মৃতি শক্তিকে বিশেষ জাগ্রত কর। আমরা ভুলিয়া গিয়াই সব ব্যর্থ করিয়া ফেলি। মহোৎসবের মহাব্যাপারে তুমি যাহা দেখাইয়াছ এবং যে সকল লোভনীয় অবস্থার সহিত পরিচিত করিয়াছ, তাহা যেন ভুলিয়া না যাই। দীনবন্ধু তুমি কৃপা কর। আমাদিগকে নবজীবনের আস্বাদ ভাল করিয়া আস্বাদন করিতে দেও। উৎসবের নবীন ভাব এরূপ ভাবে আমাদিগের প্রাণে বদ্ধমূল করিয়া দেও যে কিছুতেই এই প্রার্থনীয় ও চির কল্যাণকর অবস্থা হইতে আমরা যেন বিচ্যুত হইতে না পারি। প্রভু তোমারই জয় হউক। আমরা সর্ব্বপ্রযত্নে তোমার জয় স্থাপনের জন্যই যেন এবৎসর প্রয়াসী হই। এই আমাদের প্রার্থনা। তুমি এই দীনদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

একষষ্টিতম মাঘোৎসব।

আমরা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করিয়া থাকি যে যখনই নিজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করি ও আপনাদের শক্তির উপর নির্ভর করিতে যাই, তখনই আমাদের অসারতা,

দুর্ব্বলতা ও হীনতা দেখিয়া অতি সহজে নিরাশা আসিয়া প্রাণকে অধিকার করে। তখন কোন কার্য্যই যে সম্পন্ন করিতে পারিব, এমন ভরসা আর হয় না। যখনই আমরা কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে আপনাপন শক্তি সামর্থ্যের দিকে তাকাইয়াছি, তখনই আমাদের প্রাণে অবসন্নতা আসিয়া প্রাণকে নিরুদ্যম করিয়া ফেলিয়াছে। এই যে মহোৎসব হইয়া গেল, ইহার আয়োজন যখন হইতেছিল, তখন আমরা কিছুতেই ভরসা করিতে পারি নাই যে উৎসবে এমন মহাব্যাপার সম্পন্ন হইবে। নিজ নিজ প্রাণের অবস্থা দেখিয়া আমরা নিরাশ মনে সন্দিগ্ধ ভাবে কোন মতে উৎসবের আয়োজন করিতেছিলাম, কিন্তু কার্য্যে কি হইল? দেখিলাম আমাদের উপরে এমন আর একজন আছেন, যিনি আমাদিগের অপেক্ষাও আমাদিগের কল্যাণের জন্য ব্যস্ত এবং যিনি আমাদের কল্যাণসাধনে শুধু ব্যস্ত নহেন তৎসাধনের উপযুক্ত শক্তিতেও শক্তিমান্। তাঁহার ইচ্ছায় আমাদের অক্ষমতা, অপদার্থতা মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরে সরিয়া যায়। অশক্তের প্রাণে শক্তির সঞ্চার হয়! নিরাশের প্রাণে আশা আসে। শুষ্ক কঠোর প্রাণে রসের সঞ্চার হইয়া, ভক্তির মহা প্লাবনে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। এই একটী মহা আশ্চর্য্য জনক ব্যাপার আমরা সর্ব্বদাই দেখিতেছি যে যেখানে আমাদিগের দিকে চাহিয়া অন্ধকার দেখিতে হয়, সেখানেই তিনি আলো প্রকাশ করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া থাকেন। কি যাদু মন্ত্র তিনি জানেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা ত অবসন্নতার সহিত ভাবিতেছিলাম, তাই ত যেরূপ সাধারণের মধ্যে নিস্তেজ ও নির্জীব ভাব দেখিতেছি, এ ভাবে কি আর উৎসব হয়। যতই নিজ প্রাণের দিকে চাহিয়াছি ততই ইহাই মনে হইয়াছে, এবার বুঝি আর ভাল করিয়া উৎসব সম্ভোগ করা হইল না। কিন্তু আমরা ভাবি এক, তিনি ঘটান অন্যরূপ; তাই উৎসবে অতি মহা ব্যাপার সম্পন্ন হইতে দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়াছি। আর একটী বিষয় দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি, যে আমরা যে সকল বন্দোবস্ত করিয়া, বুদ্ধি খাটাইয়া, বেশ সকল দিক্ বজায় রাখিয়া কার্য্যের শৃঙ্খলা করিতে ইচ্ছা করি, তিনি তাহার সব উলট পালট করিয়া আমাদের বন্দোবস্ত সব উল্টাইয়া দিয়া নূতন প্রণালীতে নব ভাবে তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকেন। এবার বিশেষ ভাবে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যে আমরা যাহা স্থির করিয়াছি, লোকে দেখিয়াছে, কার্য্যত তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। এবার আমরা ভাল রূপেই বুঝিয়াছি যে আমাদের শক্তি সামর্থ্য কিছুই নয়, আমাদের বুদ্ধি বিবেচনাও কিছুই নয়। সকল বিষয়েই ব্রহ্ম শক্তিই শক্তিশালী। তাঁহার ইচ্ছাই বাস্তবিক কার্য্য করে। তিনিই বাস্তবিক আমাদের কল্যাণ অবগত আছেন এবং তিনিই তৎসাধনে সক্ষম।

বিশেষ ভাবে এই মহোৎসবের মহাব্যাপারে আমরা ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ও তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার ডাক শুনিয়া চলিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছি। উৎসবের প্রধান ও সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ভাব এই যে আমরা যেন নিজ বুদ্ধি বিবেচনা এবং সংসারের লাভ ক্ষতি গণনার বশীভূত হইয়া না চলি। কিন্তু যাহা হয় হউক, যাহা থাকে থাকুক, যাহা যায় যাউক, আমরা সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বমঙ্গলালয়ের আদেশ ও ডাক শুনিয়াই চলিব। তাহাতেই আমাদের কল্যাণ হইবে। সংসারের সেবা করিয়া দিনপাত করিবেন যদি এরূপ উদ্দেশ্য লইয়া কেহ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ মহাজীবন্ত ব্যাপারের মধ্যে না আসাই ভাল ছিল। এখানে আমাদের ইচ্ছা নয়, কিন্তু সর্ব্বোপরি মহান্ ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। যিনি মস্তক পাতিয়া সেই ইচ্ছাকে গ্রহণ করিবেন। তদনুসারে জীবন যাত্রানির্ব্বাহ করিবেন, তিনিই ধন্য হইবেন অন্যের পক্ষে শরীরটা এখানে থাকিতে পারে, কিন্তু প্রাণ এই মহাব্যাপারের কোন ফলই সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইবে না।

আমরা যেমন ভয়ে ভয়ে, সন্দিগ্ধ প্রাণে উৎসবে গমন করিয়াছিলাম—আমাদের চিরসহায় করুণাময় পিতা তেমনই আমাদের সকল ভয় নিঃশেষ করিয়া, প্রাণে নব আশা ও নব উদ্যম দিয়া বিদায় করিয়াছেন। আমাদের দিকে তাকাইয়া আমরা যেমনই ক্ষুণ্ণ হইতেছিলাম, তিনি তাহার পরিবর্ত্তে তেমনই আমাদিগকে প্রচুর দান করিয়া মনঃক্ষোভের হেতু সকল দূর করিয়া দিয়াছেন। এখন আমাদিগের এই শিক্ষাই পাওয়া উচিত, যেন আর মানুষের প্রতি আমাদের দৃষ্টি না থাকে; কাহারও উপর যেন ভরসা স্থাপন করিতে আমাদের মতি না যায়। আমাদের পরিত্রাণের জন্য এই নবীন আয়োজন যিনি করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেই উদ্দেশ্য কিছুতেই ব্যর্থ করিবেন না। তিনিই আমাদের ভার লইয়াছেন। আমরা যেন অবিশ্বাসী হইয়া সে ভার আর নিজেরা না লই বা অন্য কোন লোকে উপর না দেই। তাহা হইলেই দেখিতে পাইব, যথাসময়ে আমাদের জন্য যাহা আবশ্যক, তাহা আমরা প্রাপ্ত হইতেছি। কখনই তিনি বঞ্চিত করেন নাই এবং করিবেন না।

এ বৎসর আমরা বহু ব্যাকুল আত্মার সমাবেশ দেখিতে পাইয়াছি। অনেক দূর দেশ হইতেও ব্যাকুল প্রাণে ব্রাহ্মগণ এই উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাকুল পরিত্রাণার্থীগণের সম্মিলনে দীনবন্ধুর আবির্ভাব কি না হইয়া পারে? এতগুলি ব্যাকুল আত্মার প্রার্থনা কি কখনও ব্যর্থ হইতে পারে? তাই তিনি আপন প্রকাশ তাঁহার দীনদুঃখী সন্তানগণের প্রাণে দেখাইয়া সকলকে বিমোহিত করিয়াছেন। এই সকল আকুলপ্রাণদিগের সম্মিলনে উৎসবে যে সকল ব্যাপার ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ ভাব আমাদিগের অনুপস্থিত বন্ধুগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। ব্যাকুল প্রাণের ভক্তি সূত্র ধরিয়া ব্রহ্মপ্রেম যখন ধরাধামে অবতীর্ণ হয়, তাহাতে যে মহাভাব স্রোতে উপাসক বৃন্দ ভাসিতে থাকেন, তাহার বর্ণনা কে করিবে? ভাষার সে শক্তি নাই যে এই হৃদ্গত ভাবোচ্ছ্বাসের পরিচয় প্রদান করে; এজন্য আমাদের পক্ষে ক্ষোভ করা ভিন্ন অন্য কিছু করিবার আর উপায় নাই। আমরা উৎসবের যে বিবরণ প্রদান করিব তাহা বাস্তবিক ভাবের কিছুই প্রকাশক নয়। অতি সামান্য ভাবে যথা কথঞ্চিৎ রূপে আমাদিগের মফস্বলস্থ বন্ধুগণের অবগতির জন্য

নিম্নে এই একষষ্টিতম মাঘোৎসবের মহাব্যাপারের আভাস প্রদান করিতেছি।

এই মহোৎসবে নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ সমাগত হইয়াছিলেন। আমরা এমনই অশক্ত যে তাঁহাদিগের যে উপযুক্তরূপ তত্ত্বাবধান করিব, সেরূপ শক্তি সুবিধাও আমাদের নাই। বহু কষ্ট পাইয়াও তাঁহারা একমাত্র উৎসবের আনন্দ সম্ভোগের আশায় সমাগত হইয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সঙ্গলাভে বিশেষ উপকৃত হইয়াছি এবং আমাদের ত্রুটী স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। নিম্নলিখিত স্থান হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসবে সমাগত হইয়াছিল।

বোম্বে, এলাহাবাদ, ইন্দোর, লাহোর, দেরাধুন, শিলং, ঝাঁসি, পাবনা, দোগাছিয়া, তিল্লি [ঢাকা], শেলা [খাসিয়া পাহাড়], নলহাটী, বগুড়া, ঢাকা বাগআঁচড়া জগন্নাথপুর, নওয়াখালি, বরাহনগর, কটক, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুর, মাণিকদহ, সৈদপুর, গোবরডাঙ্গা, খুলনা, দাসপুর, ধুলিয়ান, বাঁকুড়া, কাঁথি, রসপুর, কোন্নগর, নওগাঁ, টাকী, বানীবন, সমসপুর, উলুবেড়ীয়া, শ্রীরামপুর, কুমারখালি, রামপুর বোয়ালিয়া, বজ্র যোগিনী, জামতাড়া, আড়ুদিয়া মহেশ্বরপাশা [খুলনা], জঙ্গীপাড়া কৃষ্ণনগর, মুর্সিদাবাদ, নাটোর, আলী, রংপুর, ফরিদপুর, দার্জিলিং, সুখচর, বর্দ্ধমান, রামপুরহাট, সোনপুর, হরিনাভি, কালীকচ্ছ, ফুলবাড়ী, এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান।

মাঘোৎসবের যে কার্য্য প্রণালী আমরা পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম, আবশ্যক হওয়ায় তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

১লা মাঘ সায়ংকালে মন্দিরে সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। উৎসবের এই সূত্রপাতেই আমরা আশার আলোক পাইয়াছিলাম।

২রা মাঘ হইতেই উৎসবের কার্য্যারম্ভ হয়। এই দিন ব্রাহ্মগণের গৃহে গৃহে অতি প্রত্যূষ হইতে উৎসবের আয়োজন হইতেছিল। প্রার্থনা-পূর্ণ অন্তরে ব্রাহ্মগণ এই উষার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ঘরে ঘরে ব্রহ্মনামের ধ্বনি হইতেছিল। সকলেই আপনাপন সুবিধানুযায়ী সময়ে ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন করিতেছিলেন। অনেকের গৃহে সায়ংকালেও উপাসনা ও প্রীতিভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। এইদিনটী ব্রাহ্মগণের পক্ষে বিশেষ আনন্দের দিন, কারণ এই দিনে তাঁহারা পরিবারস্থ বালক বালিকা হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলে সম্মিলিত হইয়া, তাঁহাদের সকল আশা ও আরামের হেতু স্বরূপ, ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণ কামনা লইয়া পরমেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকেন। অন্যান্য দিন মন্দিরে উৎসব হয়, হয়ত সকলে যাইতে পারেন না, কিন্তু এদিনে আর সেরূপ নয়। গৃহে সকলে মিলিয়া আপনাদের প্রিয়তম পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া থাকেন। এজন্য এদিনটী অতি মধুময় দিন। সকলেরই প্রাণে উৎসাহ, সকলেরই মুখে আনন্দ ও সজীবতার চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে।

উৎসবের উদ্বোধন।

৩রা মাঘ সায়ংকালে উৎসবের উদ্বোধন হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যথাসময়ে বেদী গ্রহণ করিয়া সকলকে এই মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য প্রাণ ভরিয়া উৎসবানন্দ সম্ভোগ করিবার জন্য আহ্বান ও উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তিনি উপাসনান্তে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার ভাব এইরূপ।

বাইবেলে কথিত হইয়াছে মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে অন্তরে ইহার আভাস পাইয়াছিলেন। ঐ দিন তিনি পিটার ও আর দুইজন প্রিয় শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া এক নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন। সেখানে তাহাদিগকে সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিতে বলিয়া তিনি অধিকতর নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন, যাইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শিষ্যগণ সকলেই নিদ্রিত; দেখিয়া দুঃখিতচিত্তে পিটারকে বলিলেন "পিটার, এ সময়ে তুমিও নিদ্রিত? একঘণ্টা কাল আমার সহিত জাগিয়া থাকিতে পারিলে না? জাগরণ কর, প্রার্থনা কর, দেখিও তোমাদের যেন পতন না হয়। আত্মা সমুৎসুক বটে, কিন্তু রক্ত মাংসের শরীর দুর্ব্বল।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয়বার আসিয়া তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন, আবারও ঐ উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। তৃতীয়বারও তাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিতে পাইলেন এবং দুঃখিতচিত্তে ঐরূপ উপদেশ দিলেন।

খ্রীষ্টের ন্যায় আজ ভারতের অবস্থা উপস্থিত। এখন ভারতের কালরাত্রি। চারিদিকে কত দুর্ঘটনা, চারিদিকে ঘোর অন্ধকার—ভারতবর্ষের মৃত্যু আসন্ন; এই সময়ে ভারতবর্ষ কি বলিতেছেন? 'প্রিয় ব্রাহ্মসমাজ এখন তুমিও কি নিদ্রিত?' ব্রাহ্মসমাজ ভারতের অতি প্রিয় সামগ্রী, অতি আশার ধন। এই দুঃখ দুর্দ্দিনের দিনে পরমেশ্বর ভারতের উদ্ধারের জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। যাঁহারা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আপনাদের ও জনসমাজের কল্যাণ সাধন করিয়া জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিবেন; তাঁহাদের উপর আশা না করিলে ভারত আর কাহার উপর আশা করিবে? যেদিন ব্রাহ্মসমাজের সূত্রপাত হয়, সে দিনের কথা সকলে স্মরণ করুন। তখন ভারতের অবস্থা কি ছিল! কুসংস্কার, পাপাচার ভারতবর্ষময় বিস্তৃত হইয়াছিল। চারিদিকে ঘোর বিশৃঙ্খলা। তখন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় অভ্যুদিত হইয়া ভারতবাসীদিগকে জাগ্রত হইবার জন্য উদ্বোধন করিয়াছিলেন। সত্য ধর্ম্মের কথা তখন কে জানিত? সেই মুনি-ঋষি-সেবিত পরমব্রহ্মতত্ত্ব কোন্ গুহাতে নিহিত ছিল, কে জানিত? মহাত্মা রামমোহন রায় ভারতের গৌরবস্থল ব্রহ্মজ্ঞান মহাযত্নে প্রচারের জন্য কায়মনপ্রাণে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উদ্বোধন ব্রতে ব্রতী হইয়া ভারতবাসীদিগের চক্ষুকে অন্তররাজ্যে প্রবিষ্ট করিবার জন্য কত উপদেশ দিয়াছেন। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত স্বীয় প্রখরলেখনী এবং ওজস্বিনী বক্তৃতা দ্বারা ভারতবাসীদিগকে জাগ্রত করিতে কত চেষ্টা করিয়াছেন। আর মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন আশ্চর্য্য বাগ্মিতা ও ধর্ম্মজ্ঞানের প্রভাবে ভারতের চতুর্দ্দিকে ব্রহ্মনাম প্রচার করিয়া সকলকে জাগ্রত করিবার জন্য কত পরিশ্রম করিয়াছেন। আরও কত সাধুব্রত প্রচারক, সুগায়ক, উপদেষ্টা ভারতবর্ষকে

জাগ্রত করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাহারই ফলে ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি, স্থিতি এবং উন্নতি। ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বাগ্রে জাগিয়াছেন—এই জন্য যে জ্ঞানলাভ করিয়া ব্রহ্মশক্তি লাভ করিয়া ভারতকে জাগাইবেন এবং ইঁহারই বলে ভারতের উদ্ধার সাধন করিবেন। এই জন্যই ব্রাহ্মসমাজের এত দিনের আয়োজন।

জগতের ইতিহাসে দেখা যায় প্রত্যেক যুগে ঈশ্বরের সত্য যখন জগতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তখন তাহা দ্বারা সমাজে ঘোর পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। বৌদ্ধ, মহম্মদীয়, শিখ, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্ম ইহার সাক্ষী। ঈশ্বরের সত্য এই সকল ধর্ম্মের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, এই সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা সত্যালোক লাভ করিয়া জীবন্তভাবে কাজ করিয়াছেন এবং তাহাতেই সত্যালোক প্রকাশিত হইয়া মানবসমাজের বহু পরিবর্ত্তন সংসাধন করিয়াছে। ঈশ্বরের সত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যে প্রকাশিত। ব্রাহ্মগণ আপনারা এই সত্য লাভ করিয়া জগৎকে জাগাইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জন্য অবতীর্ণ হন নাই, যে ব্রাহ্মগণ ক্ষুদ্র একটী সম্প্রদায় করিয়া নিজেরা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিবেন; কিছুকাল পরিশ্রম করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন; ৫০ অথবা ৬০ বৎসর পরে তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইবে। সত্য সত্যই ইহার লক্ষ্য আকাশ অপেক্ষা উচ্চ, সমুদ্র অপেক্ষা গভীর। সেই একমেবাদ্বিতীয়ং পরমেশ্বরের নাম সকল দেশে সকল জাতিতে প্রচারিত হইবে। তাঁহার পূজা গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাঁহার সত্য ধর্ম্মের প্রভাবে জনসমাজ নূতন ভাবে গঠিত হইবে, এই লক্ষ্য লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আজ প্রিয় ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ! আপনাদিগকে কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমার কথা কঠোর হইতে পারে, দোষ ক্ষমা করিবেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ইহা বলিতেছি তাহা স্মরণ করিয়া প্রণিধান পূর্ব্বক আমার কথা শুনিবেন।

প্রথম, ব্রাহ্মধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য কি সংসাধিত হইয়াছে? ব্রাহ্মগণ কি নিরাকার সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরকে উপাস্য বলিয়া ইহ পরকালের একমাত্র আশ্রয় বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিয়াছেন? পৌত্তলিকগণ যেমন উপাস্য দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার রূপে বিমুগ্ধ হন, ব্রাহ্মগণ কি নিরাকার দেবতার রূপ সন্দর্শন করিয়া সেইরূপ বিমুগ্ধ হইতে পারিয়াছেন? তাঁহাদের বিশ্বাস কি এরূপ হইয়াছে যে কোন দিন তাহা টলিবার নয়? সত্যকে প্রাণে দৃঢ়রূপে ধরিয়া তাঁহারা কি চিরকালের জন্য নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইতে পারিয়াছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন—ব্রাহ্মেরা তাঁহাদের দেবতার সাধনায় অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা কি শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন? যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়সংযম ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কি অধিকতররূপ প্রকাশিত হইয়াছে? তৃতীয়—ঈশ্বরের প্রেমে ব্রহ্মোপাসকগণ সকলে কি এক হইতে পারিয়াছেন? চতুর্থ—আমাদের সাধুকার্য্য, দয়ার কার্য্য, পরোপকার অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অপেক্ষা কি অধিক হইয়াছে? পরিমাণে না হউক অন্ততঃ গুণে কি অধিক হইয়াছে? পঞ্চম—আমরা আমাদের ধর্ম্মভাব দ্বারা আমাদের জীবন, গৃহ, সমাজকে কি পরিবর্ত্তিত আকারে গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছি? প্রাচীনকালে ধর্ম্মসাধকগণ, সংসারে ধর্ম্ম ম্লান হয় বলিয়া, বনে যাইতেন। কিন্তু আমরা কি ধর্ম্মভিত্তির উপর গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছি? ষষ্ঠ—আমাদের নারীসমাজ কি জ্ঞানে, প্রেমে, পুণ্যে, উন্নত হইয়া সমাজের কল্যাণ সাধনে প্রকৃত সহায় হইয়াছেন? সপ্তম—আমরা অসত্য, কুসংস্কার, নাস্তিকতা, পাপাচারের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছি, অক্লান্তভাবে কি তাহার জন্য যুঝিতে পারিতেছি? আমরা সত্যের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে কি সক্ষম হইয়াছি? অষ্টম—যে সত্যপ্রচারব্রত ব্রাহ্মসমাজ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা কি দিন দিন বিস্তৃত হইতেছে? পুণ্য পবিত্রতা দেশ হইতে দেশান্তরে—ক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইতেছে কি না। নবম—এই ব্রাহ্মসমাজ ঈশ্বরের হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া সমুদয় ভারতবাসীদিগকে এক করিবে, সেই জন্য ইহার আকর্ষণ দিন দিন বাড়িতেছে কি না? নানা স্থান হইতে নানাজাতীয় লোক ব্রাহ্মসমাজদ্বারা একীভূত হইতেছে কি না?

এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেককে সদুত্তর দানে প্রস্তুত হইতে হইবে। আমরা কি বলিব, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এক দিন ছিল যে দিন ব্রাহ্মগণ ঈশ্বরকে দেখিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন, না দেখিয়া উঠেন নাই; এখন আর সে দিন নাই? এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্মজীবন যোগ, ধ্যানে, তপস্যায় মগ্ন হইয়াছিল, এখন তাহা নাই। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে প্রেমের যোগে স্বর্গ দেখা গিয়াছিল—সকলে ব্রহ্মকৃপায় মগ্ন হইয়াছিলেন, হিংসা বিদ্বেষ ছিল না, এখন আর সে দিন নাই। এক সময় ছিল যখন ব্রাহ্মদিগকে দেশের লোকে সত্যবাদী, পরোপকারী বলিয়া বিশ্বাস করিত, ব্রাহ্মগণ অম্লানবদনে নিন্দা, উৎপীড়ন, অপমান সহ্য করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে অগ্রসর হইতেন, এখন আর সেদিন নাই। এক সময় ছিল যখন নারীসমাজ ব্রহ্মভক্তিতে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মপূজায় ব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মকে জীবনের অবলম্বন করিয়া জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এখন আর সেদিন নাই। এখন তাঁহারা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন আর উৎসাহ নাই, ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যভার লইবার আর অবসর নাই। এক সময়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে নাস্তিক পাষণ্ডদল, যথার্থই কম্পিত হইত, এখন সে দিন নাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণ দেশদেশান্তরে বহির্গত হইয়া চারিদিকে ঈশ্বরের নামের জয়ধ্বনি করিয়া ভ্রমণ করিয়াছেন, অনাহারে অনিদ্রায় অদম্য উৎসাহের সহিত তাঁহার নাম প্রচার করিয়াছেন, ভারতকে সত্যের আলোতে আলোকময় করিয়াছেন, এখন আর সে দিন নাই। এক সময়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোক ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, এক মহাজাতি স্থাপনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন এখন আর সেদিন নাই। সে কার্য্যের ভার অন্যের হাতে দিয়া ব্রাহ্মসমাজ এখন নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এরূপ হইলে ব্রাহ্মসমাজের সুলক্ষণ নহে। ব্রাহ্মগণ জাগ্রত হইয়াছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যপালনে উপযুক্তরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন, এখন আর এরূপ বলা যায় না।

খ্রীষ্ট সেই দিন যাহা বলিয়াছিলেন ভারত আজ ব্রাহ্মসমাজকে তাহাই বলিবে। শিষ্যগণের নিদ্রাই ঈশার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। ব্রাহ্মগণ যদি এরূপ নিদ্রিত হন, তবে তাহা ভারতের মৃত্যুর কারণ হইবে। ব্রাহ্মসমাজ এই ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া কোন কাজ করেন নাই, এরূপ বলিতেছি না। ব্রাহ্মসমাজ ভারতে এক নবজীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। ভারতের চারিদিকে নানা আকারে যে ধর্ম্মান্দোলন হইতেছে, ভাষার উন্নতির, স্ত্রীজাতির উন্নতির চেষ্টা হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজই ইহার পথ দেখাইয়াছেন। আজ ভারতের হিতসাধনে অনেকেই অনেক প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে অগ্রসর,ব্রাহ্মসমাজই তাহার পথপ্রদর্শক। ভারত উদ্ধারের ভার যত্নের উপর দিয়া ব্রাহ্মসমাজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাণে প্রবিষ্ট না হইলে ভারতের উদ্ধার হইবে না। ধর্ম্মই সকল কার্য্যের মূল। তাহার সহায়তা ভিন্ন আর সমস্ত অকিঞ্চিৎকর। রাজনৈতিক অথবা অন্যপ্রকার আন্দোলন দেখিতে শুনিতে ভাল, উহাতে কিছুকাল উৎসাহ এবং বলের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু ধর্ম্মের উপরে প্রাণ দণ্ডায়মান না হইলে, চিরকাল সাত্ত্বিক ভাবে মানুষ কাজ করিতে পারে না। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজ এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না যে ভারতের নানা জাতির সম্মিলন করা আমার কাজ নয়,যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে ব্যাপৃত, উহা তাঁহারা করুন। ব্রাহ্মসমাজ বলিতে পারেন না, যে সমাজের কুসংস্কার, পাপাচার, জঘন্য দেশাচার যাহা সমাজকে বিনাশের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহা সমাজ সংস্কারকের কাজ। ব্রাহ্মসমাজকে ভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে অন্য সকল প্রকার চেষ্টার সহায়তা করিতে হইবে, তবে তাহা যথার্থ ফল প্রসব করিবে। যখন ব্রাহ্মসমাজ ভালরূপে জাগ্রত হইয়াছিলেন, তখন কত উদ্যমে কত জীবন্ত ভাবে ইহা কাজ করিয়াছেন। কোন্‌দিকের উন্নতি ইহা দ্বারা হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ একদিকে ধর্ম্মার্থীগণের দৃষ্টি খুলিবার সহায়তা করিয়াছেন, জীবনের পবিত্রতা সম্পাদনের পথে পরিচালিত করিয়াছেন, অপর দিকে কত বাহ্য উন্নতি সংসাধিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মসমাজ জীবন পাইলে ভারতের সকল কল্যাণের পরম সহায় হইবেন। ব্রাহ্মসমাজ কখনও স্বীকার করিতে পারেন না,যাহা হইয়াছে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু হইবে না। ব্রাহ্মসমাজ অনেক করিয়াছেন। কিন্তু ইহা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। জীবন থাকিলেই উন্নতি ও বৃদ্ধির পরিচয় চাই। যেখানে উন্নতি বন্ধ সেখানেই মৃত্যুর পরিচয় পাই। ব্রাহ্মসমাজের উন্নতি না হইলে অধোগতি হইবে। ৩০ কি ২০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজ যাহা করিয়াছেন, এখন আমরা তাহা অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক করিব! তাহা না হইলে ইহার উন্নতি কি হইল? তাহা না দেখিয়া যদি তাহার অবনতি দেখি, তবে আর কিসে আশা অবলম্বন করিব? তাই বলিতেছি এখন আমাদিগকে ভাল করিয়া জাগিতে হইবে। আমাদিগের মধ্যে অনেক জড়তা, নিরুৎসাহ প্রবেশ করিয়াছে, তাই অনেক দুর্গতি হইয়াছে। যদি তাহা নিবারণ করিতে চাই, যদি এবার ব্রাহ্মসমাজকে ভাল করিয়া জাগ্রত করিতে চাই তবে আমাদিগকে জাগিতে হইবে। কিন্তু জাগিবার উপায় কি? ঈশা তাঁহার শিষ্যদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, আমাদিগকে তাহাই করিতে হইবে—"জাগরণ কর এবং প্রার্থনা কর।" ভারতের কাল রাত্রিতে আর নিদ্রিত থাকিলে চলিবে না। ভারতের মৃত্যুতে আমাদের মৃত্যু। সারা রাত জাগিতে হইবে। অনেক দিন জাগিতে হইবে। যিনি বলদাতা, উৎসাহদাতা, তিনি প্রার্থী সন্তানের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন। মাঘোৎসব আবার উপস্থিত, জাগিবার এমন সময় কোথায় পাইবে? বৎসর বৎসর এই স্বর্গদূত তাঁহার করুণার অনেক পরিচয় দিয়া যান। আমরা জাগি না বলিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি না। আমাদের উপর করুণার স্রোত অনেক প্রবাহিত হয়। আমরা তাহা ধরিতে পারি না। এবার যেন মাঘোৎসব বাহ্য ব্যাপারেই পর্য্যবসিত না হয়। আচার্য্যের উপদেশ, সংকীর্ত্তন, ইত্যাদিতেই যেন ইহা শেষ না হয়। এই উদ্বোধন যেন শুধু অদ্যকার জন্য না হয়। কিন্তু ইহা যেন সম্বৎসর উৎসবব্যাপী হয়। মাঘোৎসব আমাদিগের উদ্বোধনের উৎসব হইয়া যেন আমাদিগকে জাগাইয়া দেয়। তাঁহার কৃপায় যেন অন্তরের অবসাদ দূর হয়, অন্তরের গভীর স্থান জাগিয়া উঠে। মাঘোৎসবে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা অন্ততঃ একটী বৎসর যেন কর্ম্মব্রত উপযুক্ত রূপে পালন করিতে প্রস্তুত হই। ব্রহ্ম কৃপায় এই মাঘোৎসব আমাদিগকে ভালরূপে জাগাইয়া দিক।"

৪ঠা মাঘ।

অদ্যকার পূর্ব্বাকাশ নবীনালোকে আলোকিত হইবার পূর্ব্বেই মন্দিরে ব্রহ্মনামের ধ্বনি হইতেছিল। ক্রমে ক্রমে উপাসকগণ সমবেত হইলে, সংকীর্ত্তন ও সংগীতের সহিত উপাসনা আরম্ভ হইল। শ্রীযুক্ত বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয় এই বেলার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এইরূপ—

"আমি কি উপদেশ দিব! আমি উপদেশ দিবার উপযুক্ত নই। আমি কেবল আমার পাপজীবনের কথা আপনাদিগকে বলিব ও ভগবানের করুণার সাক্ষ্য দিব। আমার জীবনের কথা বলিতে গেলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়। বিস্তারিত বলিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিব না। আপনারা জগাই মাধাইর কথা শুনিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে তুলনা করিলেই আমার যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় এবং আমি কিরূপ পাপী আপনারা তাহাও বুঝিতে পারিবেন। আমি তাহাদের ন্যায় হীন ছিলাম। এখনও আছি—এখনও সাধু হই নাই। আমি সাধন ভজন জানি না। তবে সত্যানুরোধে বলিতে হইবে, আমার পাপের সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। আমার সাধন ভজনের বলে কমে নাই—ভগবানের কৃপাবলে কমিয়াছে! তাঁহার কৃপা ভিন্ন পাপীর আর উপায় নাই। আমাদের অপরাধের সীমা আছে। কিন্তু তাঁহার করুণা অনন্ত। তাঁহার দয়ার তুলনা হয় না। এমন অপরাধ কেহ করিতে পারে না, যাহা তাঁহার দয়ার গুণে বিনষ্ট না হয়। তাঁহার কৃপায় নিশ্চয় মানবের সকল অপরাধ দূর হইবে।

নিরাশার কোনও কারণ নাই। নিরাশ হইলে আমরা ভগবানের নিকট অপরাধী হইব। কেহ যেন পাপ দেখিয়া নিরাশ না হই। তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিব। তাঁহার কৃপায় আমাদের পাপ বিনষ্ট হইবে, আমরা যেন এই বিশ্বাস করি। কিন্তু আমরা যেন অহঙ্কারী না হই। তাঁহার দয়ায় পাপ বিনাশ হইবে এই বলিয়া যেন আমরা আরও পাপ না করি। তাঁহার করুণায় আমাদের পাপ মলিনতা বিনষ্ট হইবে, এক দিকে এই বিশ্বাস চাই, অপর দিকে আমরা যেন নিশ্চেষ্ট না হই। তাঁহার দয়ায় পাপ বিনষ্ট হইবে, তবে আর পাপ করিব না কেন, এইরূপ যেন মনে না করি। আমি যখন যে পাপ করিয়াছি, এক দিনের জন্যও বলিতে পারি না, তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কতবার অপরাধ করিয়াছি, কতবার তিনি আমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। পৃথিবীর মানুষ এমন ক্ষমা করিতে জানে না। তাঁহার নিকট কতবার ভয়ানক ভয়ানক অপরাধ করিয়াছি। কতবার তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। আমি তাঁহর এই দয়ার সাক্ষ্য না দিলে ঘোর অপরাধী হইব। আপনারা নিরাশ হইবেন না, তাঁর বড় দয়া তিনি মহাপাপীকেও পরিত্যাগ করেন না। সকলে তাঁর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া তাঁর দয়ার উপর পড়িয়া থাকুন—সকল পাপ মলিনতা দূর হইবে। আমি মহাপাপী আপনারা সকলে আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, আমি যাহাতে সকল প্রকার পাপ হইতে উদ্ধার হইতে পারি, সকলে তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন।"

অপরাহ্ণ ৬½ ঘটিকার সময় মন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই বেলা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার বিষয় "ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের ক্রিয়া" প্রথমতঃ সংগীত হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ হয়। কৃষ্ণ বাবুর উত্তেজক ভাষা ও ভাব-পূর্ণ বক্তৃতায় শ্রোতাগণ যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সার এই—

"যে বিধাতার কৃপায় উত্তপ্ত মরুভূমি সুশীতল জলে প্লাবিত হয়, মানবাত্মা মহত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হইলে সেই জগদ্গুরু পরমেশ্বরই আবার মানুষের প্রাণে ধর্ম্মভাব সঞ্চার করিয়া নবজীবন প্রদান করিয়া থাকেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে দীনহীন ভারত সন্তানদিগকে এক মহাজাতিতে পরিণত করিবার জন্য পরমেশ্বর ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় করিয়াছেন। আমরা ধর্ম্মহীন হইয়া মহাকষ্ট প্রাপ্ত হইতেছিলাম, ব্রাহ্মধর্ম্ম এই দুর্গতি হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। এ পতিত জাতির মধ্যে এজন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম অবতীর্ণ হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাবের সময় এদেশের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। ধর্ম্মের প্রাণ পলায়ন করিয়াছিল—ধর্ম্মের ছায়া তাহার স্থান অধিকার করিয়াছিল, বাহ্য ক্রিয়া কলাপে—কতকগুলি মন্ত্র উচ্চারণে পরিত্রাণ হইবে, ইহাই লোকে বিশ্বাস করিত, কিন্তু বাহ্য ক্রিয়াকলাপে শুষ্ক ধর্ম্মভাবে কোন্ পতিত জাতি কবে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়াছে? এই ভারতে ৫০ প্রকার ভাষা, কত বিভিন্ন জাতি, ইহাদিগকে এক করা কি মৃতধর্ম্মের কাজ? যে দেশে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ, বিসম্বাদ, হিংসা, বিদ্বেষ তাহাদিগকে এক করা কি সহজ কথা? যাহা প্রাণ স্পর্শ করে না, পাষাণ বিগলিত করিতে না পারে, তাহাদ্বারা পতিত জাতির উদ্ধার সম্ভব নয়, কিন্তু তাঁহারই পক্ষে ইহা সম্ভব, যিনি হিমালয়ের ন্যায় উন্নত পর্ব্বত শৃঙ্গকে চূর্ণ করিয়া বালুকাকণাতে পরিণত করিতেছেন, যিনি যুগযুগান্তর সঞ্চিত তুষারমালাকে জলে পরিণত করিতেছেন, এই বিশ্বসংসার যাঁহার আদেশে ভ্রাম্যমান, তিনিই মৃতকে সঞ্জীবিত করিতে পারেন। মানুষের অসাধ্য এই ব্যাপার সংসাধনের জন্য ভগবান্ ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রেরণ করিয়াছেন। মানুষের শক্তিতে ইহা অবতীর্ণ হয় নাই। এই পতিত জাতিকে উদ্ধারের জন্য ইহা অবতীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যেমন, এখানেও সেইরূপ, এক মহাব্যাপার সংসাধনের জন্য ভগবান্ সামান্য সামান্য লোকদিগকে ধরিয়াছিলেন। রামমোহন রায় কে? রাজা বলিয়া তাঁহার নাম দেশবিখ্যাত, কিন্তু তিনি ধন সম্পত্তির জন্য বিখ্যাত হইতে পারেন নাই। ভগবান্ রাজপুত্র দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করেন না, কিন্তু রাজপুত্র যখন রাজ্য ছাড়িয়া ফকির হয়, তখনই তাহাদ্বারা তাঁহার কাজ করাইয়া লন। বাহুবল, ধনবল বা জ্ঞানবলের উপর যাহারা নির্ভর করে, তাহাদের দ্বারা তাঁহার কাজ হয় না, কিন্তু দীনহীন ফকিরের দ্বারাই তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। যীশুখ্রীষ্ট সামান্য সূত্রধর তনয়, কিন্তু কয়েকজন ধীবর সন্তানের সহিত মিলিত হইয়া এই সূত্রধর তনয় কি আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়া গিয়াছেন! রামমোহন রায় রাজকার্য্যে লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইবেন, এরূপ মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। একেশ্বরবাদ প্রচারে, তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় হইল, ঋণজালে তিনি বিব্রত হইলেন। ভারতবর্ষ যখন অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন রামমোহন রায় "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত" বলিয়া সকলকে আহ্বান করিলেন। যাহারা ধর্ম্ম ভুলিয়া মোহনিদ্রায় অচেতন ছিল, তাহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল—তিনি কি বলেন, সকলে শুনিতে লাগিল। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই পতাকা রামমোহন রায় হাতে লইলেন। এক ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই, তাঁহার সমান আর কেহ নাই। একাকী তিনি মানবের উপাস্য ও পরিত্রাণ দাতা, এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন, অনেকে সংজ্ঞা লাভ করিল, অনেকে ধর্ম্ম-ধ্বংসের আশঙ্কা করিয়া বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। বন্ধু-বিচ্যুত হইয়া তিনি প্রতিদিন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন, সকল কষ্ট তাঁহাকে নিবেদন করিতেন। অজ্ঞ লোকেই মনে করে নিরাকার পরমেশ্বর কি আর প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন? কিন্তু তিনি তাহাদিগকে দেখাইয়া দেন যে তিনি ভিন্ন আর দয়া করিবার কেহ নাই। রামমোহন রায় মহা উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, কিন্তু তথাপি উৎসাহের বিরাম নাই। দেশের লোককে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন "ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে"। যে দেশের লোকে পরমেশ্বর জ্ঞানে কাষ্ঠ লোষ্ট্রের পূজা করিত সেই দেশে এক নিরাকার পরমেশ্বরের পূজা ঘোষণা করিলেন। তৎপর তিনি বিশেষ একটী কার্য্য সাধনোদ্দেশে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু

হইল—মানুষের শক্তি এখানে শেষ হইল। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজের ঘোর দুরবস্থা উপস্থিত হইল, এক রামচন্দ্র বেদান্তবাগীশ বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত ১০ বৎসর চলিয়া গেল। দেশের লোকে মনে করিল ব্রাহ্মসমাজ নিবিয়া গিয়াছে। যাহারা মহা ষড়যন্ত্র করিয়া রামমোহন রায়কে পরাজয় করিতে পারে নাই, তাঁহারা মনে করিল রামমোহন রায়ের মৃত্যুর সহিত ব্রাহ্মসমাজ উঠিয়া গেল। তখন ব্রাহ্মসমাজের এমনই দুরবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, যে বেদী হইতে রামচন্দ্রের অবতার বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইত। এরূপ দুর্গতির সময় ভগবান্ আর এক জনকে ধরিলেন। যিনি নানা রূপ সুখ সৌভাগ্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছিলেন, এমন এক জনকে ফকির করিবার জন্য ভগবান্ ধরিলেন। এবার যাঁহাকে ধরিলেন তিনি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। ভগবান্ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে যেরূপে ব্রাহ্মসমাজে আনিলেন তাহা তাঁহার করুণার আশ্চর্য্য ব্যাপার। এক দিন নিশীথকালে অগণ্য নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ দেখিয়া তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য ভাবের উদয় হইল। তিনি অন্তরে অনন্তের আবির্ভাব অনুভব করিলেন। অনন্তর অসীমভাব তাঁহার প্রাণে জাগিয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন এই অনন্ত নভোমণ্ডল কি পরিমিত পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে? পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস চলিয়া গেল। প্রাণে সন্দেহ আসিল। চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। তিনি অনন্তের ভাবে আকুল হইলেন। মানুষ যখন ব্যাকুল হয়, সন্দেহে কাতর হইয়া আপনাকে নিরাশ্রয় মনে করে, সেই শুভক্ষণে পরমেশ্বর মানবের প্রাণে প্রকাশিত হন। ইঁহার প্রাণ যখন আকুল হইতেছিল, তখন অনন্ত আকাশের যবনিকার অন্তরাল হইতে অনন্ত পরমেশ্বর প্রকাশিত হইলেন কিন্তু এভাব অধিক দিন রহিল না। তিনি সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত হইতে পারিলেন না। কিন্তু পরমেশ্বর সহজে ছাড়িলেন না। এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে দেবেন্দ্রনাথ শ্মশান ঘাটে গমন করিলেন। মহা উদাস ভাবে তাঁহার প্রাণ পূর্ণ হইল। বৈরাগ্য যখন তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তখন পরমেশ্বর তাঁহাকে দেখা দিলেন। দুই দিন পরমানন্দে কাটিয়া গেল। কিন্তু আবার এই আনন্দের ভাব চলিয়া গেল। মানুষকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য পরমেশ্বর তাঁহার প্রাণে প্রকাশিত হন কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না। হওয়া উচিত নয়। উপযুক্ত না হইয়াও যদি মানুষ পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইত, তবে তাঁহার মর্ম্ম কেহ বুঝিতে পারিত না। আবার ঘন বিষাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাণ অধিকার করিল। ব্যাকুলতার তীব্র আঘাতে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি অধীর হইয়া গৃহ-সামগ্রী সকল লোককে বিতরণ করিতে লাগিলেন। যে সকল বহুমূল্য বস্তু কত ভালবাসিতেন তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে লাগিলেন। কঠোর যাতনা তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। যখন ঐশ্বর্য্যের ভাব দূরে পলায়ন করিল তখন ভগবান্ তাহার প্রাণে প্রকাশিত হইলেন! ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য তিনি প্রাণ মন নিয়োগ করিলেন। তিনি যখন প্রথম ব্রাহ্মসমাজে আসিলেন তখন ইহার মৃতাবস্থা। যাহারা সমাজে উপস্থিত হইত তাহাদিগকে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিবার তিনি জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহাতেই প্রাণতৃপ্ত হইল না। প্রাণ ভরিয়া ভগবানের পূজার জন্য সিপাই বিদ্রোহের ঘোর কোলাহলের সময় হিমালয় কন্দরে যোগাসনে মহারাধনায় ব্যাপৃত হইলেন। কখন সারাদিন কখন সারারাত্রি শিলাতলে গভীর ধ্যানে কাটিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু একাকী পর্ব্বতগহ্বরে সুখভোগ করিলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। শতদ্রু নদীর উৎপত্তি স্থল দেখিয়া তাঁহার প্রাণে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের কথা জাগ্রত হইল। তিনি কলিকাতায় আসিয়া মহোৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বর এইরূপে দেবেন্দ্রনাথকে টানিয়া আনিয়া ব্রাহ্মসমাজে নূতন জীবনের স্রোত প্রবাহিত করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাজ দলবদ্ধ হইল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদিগকে ধ্যান ও উপাসনা শিক্ষা দিলেন। কিন্তু ইহাও সম্যক্ আয়োজন নয়। কেবল ধ্যান আরাধনাতে একটী ধর্ম্মসমাজ পুষ্ট হইতে পারে না। প্রার্থনা চাই, ভক্তি চাই, নতুবা একটী জাতির উদ্ধারের পথ প্রশস্ত হয় না। এবার পরমেশ্বর কেশবচন্দ্র সেনকে ধরিলেন। উপনিষদের একটী পাতা পড়িয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বুঝিলেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মই সার, সেইরূপ কেশবচন্দ্র সেন বাবু রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা পাঠে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইলেন। এত দিন একাকী তিনি নির্জ্জনে গৃহের কোণে প্রার্থনা করিতেন, এক্ষণে তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন,। আত্মীয় স্বজন বাধা দিতে লাগিলেন, তিনি নিরাশ্রয় অবস্থায় ঘরের বাহির হইলেন, কত কষ্ট যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন, তথাপি মহোৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের স্রোত একেবারে ফিরাইয়া দিলেন। ভারতবর্ষ এক পৌত্তলিকতার হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া অন্য পৌত্তলিকতার হাতে পতিত হইতেছিল। কেশবচন্দ্র সেন তাহা রুদ্ধ করিলেন। সত্য মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা প্রদান করে। গুরুর অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ রূপে পরমেশ্বরের অধীন হইবার অবস্থা তখনও ব্রাহ্মসমাজে আসেনাই, সুতরাং কেশবচন্দ্র আপনার সহযাত্রীদিগকে লইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথক্ হইলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। সামাজিক কুরীতি কুনীতি সকল দূরের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও অসম্পূর্ণতা রহিয়া গেল। যদিও কেশবচন্দ্রের যত্নে নরনারীর কল্যাণ হইতেছিল, তথাপি তাঁহারা কতকদূর অগ্রসর হইয়া থামিয়া পড়িলেন। তাঁহারা বলিলেন পুরুষগণ, অগ্রসর হও, নারীগণ যতদূর আসিয়াছ, থাম"। আরও অভাব ছিল। মানুষ কাহারও অধীন নয়, বিবেকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই—ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতার অবাধে পরিচালনের সুবিধা চাই, প্রজাতন্ত্র প্রণালী চাই। মানুষ কেবল তাঁহার অধীন হইয়া অগ্রসর হইবে; এই ভাবে বাধা পড়িল। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের পরিচর্য্যা করিতেছিলেন তাঁহারা পাছে পড়িলেন। ব্রাহ্মসমাজ অগ্রসর হইলেন। পরমেশ্বর এবার কাহাকে ধরিলেন? এমন কতকগুলি লোককে ডাকিলেন যাহাদের কোনও বিশেষ গুণ গরিমা নাই, যাহাদের কোনও

শক্তি নাই। ইহাতেই তাঁহার বিশেষ করুণা। একজনের অধীনে চলা সহজ কথা। কিন্তু পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইলে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রয়োজন। প্রত্যেক মানুষকে শক্তিশালী করিবার জন্য ভগবান্ ইচ্ছা করিয়াছেন। পুরুষ রমণী কেহ পশ্চাৎ থাকিতে পারিবে না। এখানে বালকের কাজ আছে, যুবকের ও কাজ আছে। এ সমাজে স্বয়ং পরমেশ্বর কাজ করিতেছেন সুতরাং এখানে পাপীর উদ্ধার হইতেছে। পাপীর নবজীবন লাভ ভগবানের করুণার জলন্ত নিদর্শন।"

৫ই মাঘ।

রাত্রির অবকাশ হইতে না হইতেই অদ্য আবার মন্দিরে ব্রহ্ম সংগীত ও সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। ক্রমে ক্রমে উপাসকগণ সমবেত হইলে উপাসনা হইল, বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় অদ্যকার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ দেন তাহার সারমর্ম্ম এই—

"উৎসবের প্রারম্ভে আচার্য্য অনেকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। আজ আবার তাহা প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছি। বাহিরের মত্ততায় মাতিতে পারি, কিন্তু একমাত্র তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলে হইবে না, জীবনের পরিবর্ত্তন চাই। ব্রাহ্মসমাজকে কি সকলে প্রাণের সহিত ভাল বাসি না, ইহাকে কি আমরা বিবাহ করি নাই? যাঁহারা এখানে ভগবানের নাম করিতেছেন, যাঁহারা শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহারা কি ব্রাহ্মসমাজকে ভাল বাসেন না? নতুবা এত নির্যাতন সহ্য করিয়া তাঁহারা কেন আসিয়াছেন? সত্যই সকলে ইহাকে ভালবাসেন। কিন্তু আপনারা জানেন, হিন্দুস্থানে একটী বিশেষ প্রথা আছে। সেটী 'দ্বিরাগমন'। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বামী গৃহে যাইবার সময় ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজনের জন্য ভয়ানক ক্রন্দন করে। সে যেন দুঃখের সাগরে পড়ে; কিছুতেই পিতৃগৃহ ছাড়িতে চায় না। তখনও সে সব বুঝে নাই। কিসে স্বামীগৃহ প্রিয় হইবে, তাহা তখন সে জানে না। কিন্তু স্বামীগৃহে যাইয়া সে ক্রমে ক্রমে বুঝে, স্বামীর ঘরই তাহার ঘর, স্বামীই তাহার জীবনের একমাত্র সঙ্গী। তখন কি আর পিতৃগৃহের খেলার সামগ্রী তাহার ভাল লাগে! যাহাতে স্বামী, পুত্র সুখে থাকে, স্বামীর গৃহের মঙ্গল হয়, সে তাহাই করে। তখন তাহাকে পিতৃগৃহে নিতে গেলে সে বলে "আমি কিরূপে যাইব, ইহাদিগকে দেখে কে! ইহাদের যে ক্লেশ হইবে।" সত্যবটে আমরা ব্রাহ্মসমাজকে বিবাহ করিয়াছি। কিন্তু ব্রাহ্মগণ, ইহা কি সত্য নয়, এখনও আমরা পিতৃগৃহেই বাস করিতেছি, স্বামী গৃহে যাই নাই! আমরা এখনও সংসাররূপ পিতৃগৃহেই রহিয়াছি, সেখানকার খেলা ধূলাই ভাল লাগে। তাহা না হইয়া যদি পরমেশ্বরের নিকট আসিতে পারিতাম, যদি ব্রাহ্মসমাজে দ্বিরাগমন হইত, তবে ব্রাহ্মসমাজকে কত ভাল বাসিতাম, সংসার ভুলিয়া যাইতাম। কেহ সংসারে ফিরাইয়া নিতে আসিলে বলিতাম "এ ঘরের সেবা করে কে? ওখানে আমার প্রাণ শান্ত হয় না। এখানেই আমার চিরসঙ্গী। চির সম্বল, ইহার সেবায় জীবন শেষ করিব।" এই যে দেখিতেছি কত জন কিছু দিন ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া পলাইয়া যায়; তাহাদের চরিত্র কি সতী নারীর মত? তাহারা যদি ইহাকে ভালবাসিত, তবে কি যাইত? দীক্ষিত হওয়া দূরে থাকুক, অনুষ্ঠান করা থাকুক, যে একদিন আসিয়া এখানে উপাসনা করিয়াছে, সেও কি আর যাইতে পারে? তাই আবার জিজ্ঞাসা করি, আপনারা যে উৎসব করিতেছেন, প্রভু পরমেশ্বরের সেবায় নিযুক্ত হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিতে চাহিয়াছেন, আপনাদের কি সংসার পিতৃগৃহ এখনও ভাল লাগে না। ব্রাহ্মসমাজ কি আপনাদের প্রাণের বস্তু হইয়াছে? তাহা না হইয়া থাকিলে, এখানে টিঁকিতে পারিবেন না। যতদিন ব্রাহ্মসমাজ আপনার গৃহ না হইবে, ততদিন এখানে টিঁকিতে পারিবেন না। লোকের নিন্দায় কিছু হইবে না; কে কি বলিল, না বলিল, তাহাতে কিছু হইবে না। সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীগৃহ পরিত্যাগ করে না, তেমনি আপনারা ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। ভাই বন্ধু সহ্য করিবে না, তবু ইহাতে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইবে। এইরূপ লোকদ্বারাই ইহার সেবা হইবে। যাহাদের মনের অভিমান চলিয়া যাইবে, তাহারাই ইহার যথার্থ দাস। আর সকল কথা ভুলিয়া যান। সকল প্রকার নির্যাতন সহ্য করুন। কাহাকেও যেন ক্লেশ না দেন। দিয়া থাকিলে এই পতিগৃহে আসিয়া ক্রন্দন করুন। আপনার ঘর মনে করিয়া মান অভিমান দূর করুন। আমরা যে তেমন করিয়া সেবা করিতে পারি নাই, তাহার জন্য ক্রন্দন করি। তিনি আপনাদিগকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করিবেন; আমাদের প্রাণ ধন্য হইবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি প্রেম হইতেছে কি না, এ কথা সকলে ভাবুন। সংসার ভাল লাগিতেছে কিনা, ইহা সকলে ভাবুন। ইহা চিন্তা করিয়া সকলে ভাই বন্ধুর সেবায় নিযুক্ত হউন, প্রাণ, মন ধন্য হইবে।"

অদ্যকার অপরাহ্ন বাহিরে প্রচারের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। ভবানীপুর সুবাস্বন ব্রাহ্মসমাজের সভ্যগণের বিশেষ আগ্রহে তথায় প্রচারার্থে গমন করা হয়। কলিকাতা হইতে রিজার্ভ ট্রামযোগে প্রচারার্থীগণ তথায় গমন করেন ৬০।৭০ জনে মিলিয়া ভবানীপুরে গমন পূর্ব্বক ট্রামগাড়ী পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সুবার্ব্বন ব্রাহ্মসমাজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কিছুকাল সংকীর্ত্তন করেন। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী, বক্তৃতা করেন। তৎপর ইন্দোর হইতে সমাগত মিঃ ভ্যানকাটরাম এবং মিঃ আত্মারাম হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করেন ও সংগীত করেন। তদনন্তর খাসিয়া পাহাড় হইতে সমাগত একজন খাসিয়া ভাষায় তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে আপনাদের মত ব্যক্ত করিলে, বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার বাঙ্গালানুবাদ করিয়া সকলের গোচর করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র পালবক্তৃতা করেন। কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ও মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এইরূপে তথাকার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সকলে কলিকাতায় প্রত্যাগত হন।

অদ্য সায়ংকালে হিন্দীতে বক্তৃতা হইবার কথা ছিল। কিন্তু যাহার উপর হিন্দীতে বক্তৃতা করিবার ভার ছিল তিনি অসুস্থ

হওয়ায় বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "সময় ও সংস্কার" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। নগেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা বিশেষ সময়োপযোগী এবং সুযুক্তি পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"এখনকার নব্যসম্প্রদায় এক নূতন পদার্থ। পৌরাণিক সংস্কার পদে পদে লোপ পাইতেছে। বিজ্ঞান সাধারণ সংস্কার বিনাশ করিতেছে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতা চিরাগত সংস্কার দূর করিতেছে। বিজ্ঞান, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে যেমন সামাজিক বিষয়েও সেইরূপ সংস্কার পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সমাজ কিরূপ হওয়া উচিত, সেই বিষয়েও শিক্ষিতগণের মধ্যে মতের পরিবর্ত্তন হইতেছে। পরিবর্ত্তন হইয়াছে, হইতেছে, হইবে। কেহ ইহাতে বাধা দিতে পারিবে না। কিন্তু একটী বিষয়ে দেখা যায়—যে পরিমাণে সত্য প্রকাশ হইয়াছে, চিরাগত কুসংস্কার বিনাশ পাইয়াছে, সেই পরিমাণে নূতন সংস্কার লোকে আপনার জীবনে পরিণত করে নাই? এ কথার ভাব এই—অনেক কুসংস্কার নব্যসম্প্রদায় হইতে চলিয়া গিয়াছে, নব্যসম্প্রদায় প্রাচীন সমাজে কি মন্দ ছিল বুঝিতে পারিয়াছেন, কোন্ কোন্ প্রকার সংশোধনের প্রয়োজন বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, তদনুসারে অতি অল্প লোকেই কাজ করিতেছেন। ইহার ফল এই হইয়াছে, ইহাঁদের বিশ্বাস একরূপ, কার্য্য অন্যরূপ। বোঝেন একরূপ জীবন অন্যরূপ, ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ ছিল না। প্রাচীন হিন্দু যাহা বুঝিতেন, তাহাই কাজে করিতেন। নব্যসম্প্রদায়ের বিশ্বাস একরূপ, কথা একরূপ, কাজ অন্যরূপ। বিশ্বাস, কথা এবং কাজ তিন ভিন্ন ভিন্ন রেখায় চলিতেছে। কেন এইরূপ হয়? কেন লোক বিশ্বাসানুযায়ী কাজ করিতে সাহস করে না? তাহার কারণ লোকের এই এক দুর্ব্বলতা, স্বীয় বিশ্বাসের জন্য কষ্ট স্বীকারে প্রস্তুত নয়। যে বিশ্বাস প্রকাশে কষ্ট নাই, তাহা বলিতে আপত্তি নাই। যে বিশ্বাস ব্যক্ত করিলে নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, তাহা মানুষ হৃদয়ে লুকাইয়া রাখে। নব্যসম্প্রদায়ের অনেকের ভিতরের কথা এই, "যদি দশ জনের নিকট নিন্দনীয় না হইতে হয়, শিষ্ট শান্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারা যায় তবে, বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতে পারি।" অথবা অন্য একটী কারণ আছে। বিশ্বাস অনুসারে কাজ করা বড় কঠিন। চিরাগত সংস্কারের বিরুদ্ধে কাজ করিলে কি হইবে? আমাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে, নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে। এই সব ভয়ে অনেকে বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য করিতে পারেন না। যদি পুষ্পশয্যায় শয়ন করিয়া বিশ্বাস রক্ষা করা যাইত, তবে তাঁহারা পারিতেন। যদি নূতন বিশ্বাসে নূতন জ্ঞানে বিচরণ করিতে হইলে চরণে একটী কণ্টকও বিদ্ধ না হইত, তবে তাঁহারা পারিতেন। কিন্তু তাঁহারা দেখিতেছেন এই নূতন বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতে হইলে আরাম ভোগ হয় না, সুতরাং তাঁহারা পারেন না। সহস্র প্রকার বাধা চূর্ণে বিদলিত করিয়া আপন বিশ্বাসকে জয়যুক্ত করিবার যে মহত্ব তাঁহাদের তাহার অভাব। অনেকেই এই ভিতরের দুর্ব্বলতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তাহা মানুষ সহজে পারে না। যেরূপ অবস্থায় আছে, যেরূপ করিতেছে, তাহাই ঠিক, ইহা যুক্তি দ্বারা প্রকাশ করিতেই মানুষ ব্যস্ত। আমি দুর্ব্বল, হীন, আমার বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিবার মহত্ব নাই, সত্য জীবনে পরিণত না করিয়া অপরাধী হইতেছি ইহা স্বীকার করিতে কষ্ট হয়। ইংরেজীতে একটী কথা আছে—The wish is father of the thought সুতরাং নব্যসম্প্রদায় বলেন আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসে নাই, অপেক্ষা কর, গোপনে কাজ কর, সমাজ যাহাতে সন্তুষ্ট থাকে তাহা কর, সময়ে সব হইবে। এই সময়ের দোহাই দিয়া অনেকে আপন কাজের সমর্থন করেন। তাঁহারা বলেন, সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছি, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় আসে নাই। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি। কিসে বুঝিতেছ, যে সময় আসে নাই? তাহারা হয়ত উত্তর করিবেন, "আমার বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করিলে দেশের লোক খড়্গহস্ত হয়। দশ বৎসরের মেয়ে বিবাহ না দিয়া যদি ষোল বৎসরে বিবাহ দিই, তবে সমাজ অত্যাচার করিবে। তাহা সহ্য করিতে পারি না। আর সহ্য করা কি উচিত? সমাজকে সঙ্গে নিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করি, দশ বৎসরের বিধবা কন্যার পতি কি সমাজ দিবে? হয়ত উত্তর পাইব—সমাজ যদি চালাইয়া নেয়, তবে তাহার বিবাহ দিতে পারি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কন্যাকে সুখী করা কি তোমার ধর্ম্ম নয়? তখন হয়ত উত্তর করিবে, দশজন লোকের মুখেই ধর্ম্ম। লোকাচারই ধর্ম্ম। ব্রাহ্মসমাজ চিরদিন এক কথা বলিতেছেন, "যাহা উচিত, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে পৃথিবী যদি উল্টিয়া যায়, যাক—সত্য জীবনে পরিণত করিতে হইবে; হিন্দুসমাজ, জগতের সমাজ যাহা বলে বলুক।" নব্যসম্প্রদায়ের লোক এ কথায় সায় দেন না। তাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মসমাজ rash, ধীরভাবে চলিতেছে না। তাহাদের সমর্থনের একটি বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে—তাহা Evoluton অর্থাৎ বিবর্ত্তনবাদ; তাহার ভাব এই, জগতের অল্পে অল্পে উন্নতি হইয়াছে। প্রথমে জগৎ বাষ্প ছিল, তারপর তরল, তারপর কোটি কোটি বৎসরে বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। জগতে সব ক্রমোন্নতিতে হয়। ব্যস্ত হও কেন, ক্রমে সব হইবে। এই যুক্তি সম্বন্ধে আমার বক্তব্য বলিতেছি। প্রথম কথা এই নূতন সত্য যখন কোন জাতির মধ্যে প্রকাশিত হয়, তখন কেন প্রকাশিত হয়? ইহার প্রকাশ কি অসাময়িক? বিজ্ঞান বলেন, জগতের সমস্ত কার্য্যই, নিয়মানুসারে হয়। কার্য্য কারণ শৃঙ্খলেই সমস্ত বদ্ধ। কিন্তু নূতন সত্য প্রকাশ কি miracle? অবশ্যই বলিতে হইবে ঐশী শক্তি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে মানবের মনে নূতন সত্য আনিয়া দেয়। নূতন সত্য যখন আসে তখন উপযুক্ত সময়েই আসে। Athens এ Socrates এর অভ্যুদয় অসময়ে হয় নাই। খ্রীষ্ট সেণ্টপল, লুথার অসময়ে অভ্যুদিত হন নাই। তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা জাগতিক নিয়মের অতীত ব্যাপার নহে। থিওডোর পার্কার, বুদ্ধ অসময়ে ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই। সময় না হইলে সত্য আসে কোথা হইতে? বিজ্ঞান সম্বন্ধেও

দেখা যায় সত্য অসময়ে প্রকাশ হয় না। Galileo যখন পৃথিবীর গতি আবিষ্কার করেন তখন সময় আসিয়া ছিল কি না। সময় না আসিলে তাহা তাহার মনে উঠিল কি রূপে? কিন্তু দেখিতে পাই Galileo এই বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের জন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। চিরকাল মহাপুরুষগণ এই দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছেন। ভগবান্ তাঁহাদিগকে নূতন সত্য দিয়াছেন, তাহা প্রচারের জন্য তাঁহারা নিন্দিত, ঘৃণিত, অনেক সময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কলম্বস যখন বলিলেন, সমুদ্রের অপর পারে দেশ আছে, তখন সকলে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। আমেরিকার আবিষ্কার কি উপযুক্ত সময়ে হয় নাই? আমি বলি যাহা কিছু সত্য প্রচার হইয়াছে, ঠিক্ সময়ে হইয়াছে। ইহা বিজ্ঞানসম্মত। এই সম্বন্ধে Herbert Spencer যাহা বলেন সকলে শুনুন্। তিনি বলেন "সত্য জগতের কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা অনুসারে ঠিক্ সময়ে প্রকাশিত হয়। সুতরাং যাহার কাছে প্রকাশিত হয়, তাঁহার উচিত তাহা নির্ভীকচিত্তে প্রকাশ করা।" তিনি বলেন Whoever hesitates to utter that......though not so, (First Principles, 3rd Edition. P. 123.) একজন অজ্ঞেয়বাদী কেমন বিশ্বাসের সহিত বলিতেছেন, যে সত্য পাইয়াছি তাহা প্রচারের authority পাইয়াছি।

অনেকে ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন, একটু চুপ করিয়া থাকা উচিত একেবারে হঠাৎ কাজ করা উচিত নয়। ইতিহাস কি হাত গুটাইয়া থাকিতে বলে, না সময়কে কেশে ধরিয়া আনিতে বলে? অনেক শিক্ষিত লোক বলেন ইউরোপের বিষয় ভাবিয়া দেখ। লুথার যে ধর্ম্মসংস্কারে সক্ষম হইলেন, তাহার কারণ এই যে লোকের মন প্রস্তুত ছিল। তাহা না হইলে এক শত লুথারও কিছু করিতে পারিত না। আমি বলি ঠিক্ কথা। ঈশ্বর উপযুক্ত সময়েই লুথারকে পাঠাইয়াছিলেন। লুথারের মনে যে সত্য প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা তিনি উপযুক্ত সময়েই দিয়াছিলেন। সুতরাং লুথার ঠিক্ সময়েই কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, লুথারের পূর্ব্বেও অনেক সংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই কেন? Reformers before the Reformation নামক পুস্তকে পড়িয়াছি, লুথারের পূর্ব্বে অনেকে লুথারের কার্য্য চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। এই জন্য শিক্ষিতগণ বলেন, তাড়াতাড়ি কাজ করা উচিত নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি লুথার কি সহজে সংস্কার সাধন করিতে পারিয়াছিলেন? তাঁহাকে কত কষ্ট কত নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই Protestant ধর্ম্ম কত মহাত্মার রক্ত পাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে! আর একটী কথা এই, লুথারের যে সময় আসিয়াছিল তাহার প্রমাণ?—তাঁহারা হয় তো বলিবেন তাঁহার কৃতকার্য্যতা। তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কৃতকার্য্য হয় নাই। জিজ্ঞাসা করি এখন যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা যে সময়ে কৃতকার্য্য হইবেন না কে বলিল? প্রথমে কিরূপে বুঝিবে সময় আসিয়াছে কি না? আর একটী প্রশ্ন। লুথারের পূর্ব্বে যে সকল ধর্ম্মসংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা কি সত্যই অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; আমি তাহা স্বীকার করি না। তাঁহারা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বৃথা হয় নাই। তাঁহারা লুথারের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। সত্যের জন্য যে রক্ত দেয় সত্যস্বরূপের রাজ্যে তাহার কাজ কখন বৃথা হয় না। John Stuart Mill—Liberty নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন, Luther এর পূর্ব্বে ২২বার Protestant ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা হইয়াছিল। Luther তাহার ফল ভোগ করেন। আমাদের দেশে কি দেখিতে পাই। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার ঠিক্ সময়ে হইয়াছিল কি না? সময় আসার অর্থ যদি এই হয়, যে বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতে গেলে সমস্ত অনুকূল হইবে, তবে এখনও সময় আসে নাই। Medical Collegeএ যাঁহারা প্রথম পড়িতে গিয়াছিলেন, Bethune Schoolএ যাঁহারা প্রথম মেয়ে দিয়াছিলেন—যখন সতীদাহ উঠাইয়া দেওয়া হয় তখন কি সময় আসিয়াছিল? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা কি ঠিক্ সময়ে হইয়াছিল? নব্য সম্প্রদায় হয়তো বলিবেন, না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি ক্রমে তাঁহাদের পথ পরিষ্কার হইতেছে কেন? আমি বলি সময় বলিয়া একটা কিছু নাই। সময় একটা জীব নয়, আপনি হাঁটিয়া আসে না। তাহাকে চুলে ধরিয়া আনিতে হয়। যদি বিলাত যাইবার সময় না আসিয়া থাকে, তবে শিল্পের উন্নতি, রাজনৈতিক উন্নতি, কিছুরই জন্য বিলাত যাইতে পারিবে না। অতএব রাজনৈতিক উন্নতির পথ বন্ধ কর। হিন্দুসমাজের আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিতেছি, বিলাতে যাইয়া একজন দেশের দুর্গতির কথা বলিতে লাগিলেন, শিক্ষিত লোকগণ খুব বাহবা দিলেন। কিন্তু তিনি ফিরিয়া আসিলে কেহ তাহার সহিত আদান প্রদান করিলেন না। এই অসার রক্ষণশীলতা দেশের উন্নতির কণ্টক। যতদিন নব্যসম্প্রদায় সাহস না করিবে, ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ না করিবে, ততদিন কিছুই হইবে না। এ দেশের ৫০।৬০ বৎসরের ইতিহাস পাঠে একটী কথা বুঝিতে পারি—এক সময়ে লোককে যে কাজ করিলে সমাজচ্যুত হইতে হইত, এখন আর সে কাজ করিলে সমাজচ্যুত হইতে হয় না। এমন এক সময় ছিল, যখন কেবল ব্রাহ্মসমাজে উপাসনায় যোগ দিলে সমাজচ্যুত হইতে হইত, এখন আর সে দিন নাই। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছি, এখন যে সব কাজের জন্য সমাজচ্যুত হইতে হইতেছে, এমন সময় আসিবে যখন আর এ সব কাজের জন্য কেহ সমাজচ্যুত হইবে না। থিওডোর পার্কার বলেন "উন্নতির পথ বড় বন্ধুর, মহাপুরুষগণ আপনাদের রক্ত দিয়া সে পথ পরিষ্কার করেন—আমাদের ন্যায় দুর্ব্বল প্রাণী সেই পথ দিয়া চলিয়া যায়।" সমগ্র জগতের উন্নতির ইতিহাস এই কথা বলে।

তবে কি কিছুরই জন্য অপেক্ষা করিবে না? কোন বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করিবে না? করিবে। সে কেমন বিষয়? মানুষের কর্ত্তব্য দুই প্রকার, ব্যক্তিগত ও জাতিগত। এক প্রকার কর্ত্তব্য, নিজের—সুতরাং জাতির। আর এক প্রকার কর্ত্তব্য, জাতির—সুতরাং প্রত্যেকের। অতএব যে সব কার্য্য জাতীয়—সুতরাং ব্যক্তিগত সে সকলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। ম্যাট্‌সিনি যদি ইটালী প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তরবারি লইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেন, তবে কি হইত? যতদিন না ইটালি

প্রস্তুত হইয়াছিল, ততদিন তাঁহাকে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল। অপর দিকে দেখ—হিন্দু সমাজভুক্ত একজন লোকের বালিকা বিধবা হইল। সে বিবাহ কাহাকে বলে জানিত না। উপযুক্ত বয়সে তাহার বিবাহের ইচ্ছা হইল। পিতা বিবাহ দিবেন কি না? সমাজ বলিবে সমস্ত পাপ গোপন করিও তথাপি বিবাহ দিও না। সে ব্যক্তি যদি বুঝিয়া থাকে বিবাহ দেওয়া উচিত, তবে সমাজকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বিবাহ দিবে। ইহা ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য। সমাজের জন্য নীতি, ঈশ্বর পরিত্যাগ করিব? সমাজ হইয়াছে কি জন্য? প্রত্যেকের ধর্ম্ম ও নীতি বৰ্দ্ধিত হইবে বলিয়া—প্রত্যেকের কর্ত্তব্যের জন্য। ধর্ম্ম আগে না সমাজ আগে। সমাজ যখন আমার কর্ত্তব্যের হানি করিবে, তখন তাহাকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিব। দেহ হইতে প্রাণ নিতে পার, আর কিছু পার না, তবে মানুষকে গ্রাহ্য করিব কেন? প্রত্যেকের রক্ত দিতে হইবে, নতুবা দেশ উদ্ধার হইবে না। অনেকে নিজে কিছুই করে না কেবল পরের সমালোচনা করে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ভগবান্ অমূল্য মানবজীবন দিয়াছেন কি কেবল পরের সমালোচনার জন্য। লোকের সমালোচনা কর, কিন্তু তুমি নিজে কি কর?

কাজ না করিবার আর একটা ওজর আছে। তাঁহারা বিজ্ঞতা ও বিনয় প্রকাশ করেন—"আমি অতি সামান্য লোক, আমি আর কি করিব?" ইহা মিথ্যা কথা। এমন মানুষ জগতে নাই যে কিছু কাজ করিতে পারে না। ঈশ্বর সকলকেই কাজ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। এ রাজ্যে ছোট বড় নাই। ভগবানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে যাহা করে তাহাই বড়।

এ দেশের প্রাচীন সম্প্রদায় প্রাচীন সংস্কার লইয়া রহিয়াছেন। চিরাগত প্রথা রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু হে নব্যযুবক, তোমরা নূতন আলোক পাইয়াছ, তোমরা ইহার জন্য দায়ী। ভগবান্ তোমাদিগকে কাজ করিতে আদেশ করিতেছেন। একদিকে ভগবানের নাম, অপর দিকে দেশের জন্য বিন্দু বিন্দু রক্তদান, এইরূপে সকলে কাজ কর। তিনি আশীর্ব্বাদ করিবেন, দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে!

৬ই মাঘ।

অদ্য আবার অতি প্রত্যুষ হইতেই মন্দিরে লোক সমাগম হইতে লাগিল। ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে মন্দিরের আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উপাসকগণ মন্দিরে সমাগত হইতে লাগিলেন। অদ্য রবিবার, কার্য্যালয় সমূহের বন্ধের দিন বলিয়া, অনেকের পক্ষে মন্দিরে উপস্থিত হইবার সুবিধা হইয়াছিল। সংগীত সংকীর্ত্তনের পর উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই বেলার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশের সার এইরূপ—

এমন এক দেশ আছে, সেখানে যে আসে সেই ছদ্মবেশ পরিধান করে। যে দেশের সকলেই ছদ্মবেশী। কাহার কি প্রকৃত মূর্ত্তি বুঝিবার উপায় নাই। সকলেই ছদ্মবেশে পরস্পরের সহিত আলাপ পরিচয় করে। ছদ্মবেশ রক্ষার জন্য যাহা কিছুর প্রয়োজন তাহার প্রসঙ্গ করে। সে দেশে সকলে পরস্পর মিথ্যা সম্পর্ক পাতায়—চিরকাল আপনার হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করে—কিন্তু সমস্তই মিথ্যা কথা। সেখানে সকলেই পরিশ্রম করিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করে—যাঁহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই সেও ধন উপার্জ্জন করে। সে দেশের রাজার এই নিয়ম, যখন কেহ চলিয়া যায়, তখন তাহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া রাখেন। এইরূপ দেশের কথা শুনিলে কি মনে হয়? সকলে হয়ত মনে করিবেন, এমন দেশও আবার আছে? যেখানে কেবলই মিথ্যার বাজার, যেখানে সকল শ্রমই পণ্ড হয়? কিন্তু একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবেন আমরা যে দেশে বাস করি, এই সেই দেশ। ভাই ভগ্নীগণ, দেখ দেখি সকলে, আমরা ছদ্মবেশ ধরিয়া এখানে আসিয়াছি কি না? আমি কি, আমরা কি? ইহা কি ঠিক জানা আছে? এই যে দেহ—চলৎশক্তিবিশিষ্ট, ইন্দ্রিয়-গোচর পদার্থ ইহাই কি আমি—একথাই সকলে মনে করে। কিসে এই দেহের রক্ষা হয় ভাল করিয়া সাজান যায়, কিসে ইহার সুখ হয়, সেই জন্যই সকলে ব্যস্ত। এই দেহ সম্পর্ক লইয়া পরস্পরের সম্পর্ক পাতাইয়া থাকি। এই সংসারে কত পরিশ্রম করিয়া, জ্ঞানশূন্য হইয়া কত জিনিস সংগ্রহ করি। মনে করি উহাদের প্রয়োজন আছে। বাড়ী চাই, ধন চাই, যাহাতে দশ জনের এক জন হইয়া থাকিতে পারি, তাহা করা চাই। যাহাতে এখানে চিরকাল সুখ সচ্ছন্দে থাকিতে পারি, তাহার আয়োজন করি। ছদ্মবেশ দেখিয়া লোকে বাহবা দেয়, চতুর বলে, কাজের লোক মনে করে। নিজে সেই কথায় ভুলিয়া নিজকে সেই রূপ মনে করি। তার পর এ দেশ ছাড়িয়া যাওয়ার দিন কোথায় কি থাকে? সে দিন দেখি, যে বেশ ধরিয়া আসিয়াছিলাম, এখানে তাহা রাখিয়া যাইতে হয়, যে সম্পর্ক লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা ছাড়িতে হয়। কত পরিশ্রম করিয়া, ন্যায় অন্যায় আচরণ করিয়া যে ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহার একটুকুও সঙ্গে লইবার অধিকার নাই! একাকী বিদায় লইয়া চলিয়া যাইতে হয়। বড় আত্মীয় যাঁরা—পিতা, মাতা, প্রাণের সন্তান, ভার্য্যা সে দিন কি ভাবেন? এখানে দেখিতে পাই, অল্পদিনের জন্য অল্প দূরে যাইবার সময় আত্মীয় স্বজন কত ভাবে—যাইবার জন্য কত আয়োজন করিয়া দেয়। ইহা কি চক্ষু লজ্জার জন্য? আবার দেখা হবে বলিয়া? আর এই যে লোকটী চিরদিনের জন্য চলিল কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা নাই, কি খাইবে, কি পরিবে কিসে সুখে থাকিবে, এখানকার আত্মীয় স্বজন কি তাহার কিছু ভাবে? যাইবার দিন হইলে পুত্র কন্যা প্রভৃতি উইল করিবার জন্য চারিদিকে ঘিরিয়া ধরে। তাহাদের কি উপায় করিলে তাহারা কি খাইবে, কি পরিবে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করে। এত দিন ত তাহাদের জন্য খাটিয়াছ, এক্ষণে তুমি কি খাইবে তাহা থাক্—এদের কি সংস্থান করিলে? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! নিত্য এই ঘটনা হইতেছে। কে ভাবে, কে দেখে যে গেল, সেই গেল। এই দশা আমাদের প্রত্যেকের হইবে। যাইবার দিন আসিতেছে, যাইতে হইবে—তখন আর কেহ খোঁজ খবর নিবে না। যাদের জন্য এত করি, তাহারা তখন কেবল আপনার দিকেই তাকাইবে, আমার দিকে নয়। আমি কে তবে? আমার কে, তবে? ইহা কি এখন ভাবিলে ভাল হয় না? ছদ্মবেশী হইয়া মিথ্যার দেশে রহিলাম, ছদ্মবেশীর সঙ্গে কাজ করিয়া গেলাম। এ দিন ফুরাইবে। জ্ঞানের চক্ষে বলিব কি, আমার এই শরীরটা একটা খোলস্। এর সঙ্গে যাঁদের সম্পর্ক তাহা বাহিরের, দুদিনের। এ শরীর আমি নই, এ শরীর সম্পর্কীয় যারা তারা আমার নয়। সকলকে দেখি, সকলের জন্য ভাবি, কিন্তু আমি কে? আমার কে? তাহা ভাবি না। হে মন! আত্মদৃষ্টি বিহীন হইয়া, মোহে মুগ্ধ হইয়া কত দিন থাকিবে। আমি শরীর ছাড়া জিনিস। এক দিন আসিবে যে দিন এই শরীরটা পড়িয়া থাকিবে, আমি আর এক স্থানে যাইব। আমার আমার যাহাদের বলিতেছি, কিছুই আমার হইবে না। কেন তবে ছদ্মবেশ, মিথ্যা কথা, প্রতা-

রণা—কেন এ সকল কুসংস্কারে জড়িত হইয়া আত্ম-প্রতারিত হইয়া থাকি; 'আপনার যদি কিছু থাকে তাহা হতে বঞ্চিত হইয়া থাকি? এ পৃথিবীর এমনই কু শিক্ষা, বাল্যকাল হইতে এই শিক্ষা পাই—এই শরীরই সর্ব্বস্ব, ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া চিরকাল আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এই সংস্কার শিক্ষা দেয়, বাহিরের যত কিছুকে 'আপনার বলিতে পারিব, ততই ধনী হইব। তাই পরিশ্রম করিয়া মরি। কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম হয়। এ কুশিক্ষা কি পরিত্যাগ করিতে পারিব না? এ ছদ্মবেশ কি ছাড়িতে পারিব না? এ মিথ্যা, প্রতারণার বাজার হইতে কি আত্মরক্ষা করিতে পারিব না? আমি এই শরীর মধ্যস্থ অমর আত্মা। আমার প্রয়োজন আহার নয়, বস্ত্র নয়, পৃথিবীর মায়ায় ভ্রমণ নয়। আমার প্রয়োজন এখানে বড় হইয়া থাকিবার জন্য নয়: এই আত্মার সম্বল যাহাতে লাভ হয় তাহাই আমার প্রয়োজন। আহার কিসের জন্য দরকার? জীবনধারণ করিয়া আত্মার সম্বল লাভ করিব বলিয়া। যে আহারে বল পাই, স্ফূর্ত্তি পাই; তাহাই আমার প্রয়োজন। আর যে আহারে জড়তা, আলস্য হয়, আপনার বস্তু ভুলিতে হয়, তাহা অনাবশ্যক। বস্ত্রের প্রয়োজন বস্ত্রের জন্য নয়। কিন্তু তদ্দ্বারা এই দেহ আচ্ছাদন করিয়া দেহ দ্বারা আত্মার সম্বল সঞ্চয় করে। অর্থের প্রয়োজন অর্থের জন্য নয়। কিন্তু ইহা দ্বারা যদি পরমার্থ লাভের সাহায্য হয় তবেই ইহা সার্থক হয়। মান, সম্ভ্রম, উচ্চপদ লাভ করিয়া আপনার জীবনের উদ্দেশ্য যদি ভাল করিয়া সম্পন্ন করিতে পারি তবেই উহা সার্থক হয়। কিন্তু কত কৃত্রিম প্রয়োজনের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার প্রয়োজন নাই, তাহার জন্য মানুষ ব্যস্ত। যাহাতে দিন চলে, এরূপ অন্ন বস্ত্রে হইবে না, কিন্তু এরূপ করিয়া অন্ন বস্ত্রের সংস্থান চাই, যাহাতে সহস্র বৎসর, লক্ষ বৎসর এ পৃথিবীতে থাকিতে পারা যায়। ধনভাণ্ডার অক্ষয় করিয়া রাখিতে হইবে, কৃপণের ধন, সঞ্চিত থাকে, ব্যয় হয় না। একটা বাড়ীতে চলে, কিন্তু দশটা বাড়ী চাই। এইরূপে প্রয়োজনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আসল প্রয়োজন ভুলিয়া মানুষ মিথ্যা প্রয়োজনে জীবন ব্যয় করে।' সমস্ত জীবন এমনই করিয়া বহিয়া যাইতেছে। বাল্যকালে মানুষ অজ্ঞান থাকে—বাল্যখেলাতেই জীবন অবসান হয়, বুঝিতে পারে না সে কে? যৌবনে প্রবৃত্তি গুলি জাগিয়া উঠে, কত সুখের কল্পনা করে, চারি দিকে স্বর্গের ছবি দেখে, সুখে মত্ত হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। তার পর বয়স যত পড়িতে থাকে, মানুষের কি চৈতন্য হয়? বৃদ্ধকালও সংসার জ্বালায় অতিবাহিত হয়। না মরিলে কি চৈতন্য হইবে না? সমস্ত জীবন কি অজ্ঞানতা, ভ্রম, মিথ্যার ব্যাপার হইবে? জাগ, জাগ, জাগ, সকলে। জাগাও একবার সকলকে। বাহিরের কুসংস্কার খণ্ডন সহজ; কিন্তু এই যে মহাকুসংস্কার, যাহাতে জীব সকল অচেতন, অভিভূত হইয়া আছে, ইহা দূর করিয়া মানুষকে বাঁচান বড় দুষ্কর, বড় দুঃসাধ্য। আপনাকে মানুষ বাঁচাইতে পারে না, অন্যকে কিরূপে বাঁচাইবে? আমি কে, আমার কে, ইহা কি অপ্রাসঙ্গিক কথা? মানুষ বলে ইহার দরকার নাই—যাহাদের পাইয়াছ তাহাদের জন্যই ভাব—আমি কে, আমার কে যখন চলিবার দিন হইবে, তখন জানিবে। এ কথায় কি মন প্রবোধ মানে? আমি কে' ইহা যদি না বুঝি, আমার প্রয়োজন কি তাহা যদি না বুঝিতে পারি, তাহার সংস্থান না করিতে পারি, তবে আমার আর সব করিয়া কি হইবে? আমি আর মিথ্যা লইয়া থাকিতে চাই না। সত্য চাই, সত্যে জীবন সমর্পণ করিতে পারিলে জীবন ধন্য হইবে। অসত্য লইয়া কি করিব? স্বপ্নের খেলা লইয়া কি করিব? (ক্রমশঃ)

ব্রাহ্মসমাজ।

লোকসংখ্যা গণনায় ব্রাহ্ম—আর কয়েক দিন পরেই গবর্ণমেণ্ট হইতে এদেশের লোকসংখ্যা গণনা করা হইবে। তাহাতে কে কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী তাহাও নিরূপিত হইবে। এই লোকসংখ্যা গণনার ফারমে ব্রাহ্মগণ যে আপনাদিগকে ব্রাহ্ম নামে পরিচিত করিবেন তাহাতে আমরা কোন সন্দেহ করি না। কিন্তু আমরা আমাদের কোন পত্রপ্রেরকের পত্রে অবগত হইলাম, আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় নাকি ব্রাহ্মগণকে "অপৌত্তলিক হিন্দু" নামে পরিচিত হইবার জন্য মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মসমাজ সকলে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। ব্রাহ্মগণকে ব্রাহ্ম নামে পরিচিত না দেখিয়া অপৌত্তলিক হিন্দু নামে পরিচিত দেখিবার জন্য এখনও যে কেহ কেহ ইচ্ছুক আছেন, ইহাতে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। ব্রাহ্মগণের নিকট ব্রাহ্ম নাম অপেক্ষা গৌরবকর নামে পরিচিত হইবার মত আর কোন নাম আছে বলিয়া আমরা জানি না। "অপৌত্তলিক হিন্দু" শব্দের কি বাস্তবিক কোন অর্থ আছে? অপৌত্তলিক হিন্দু নামে এদেশবাসী নাস্তিকও পরিচিত হইতে পারে? সুতরাং ব্রাহ্মগণ এমন অর্থ হীন একটা নামে আপনাদিগকে পরিচিত করিতে যে ইচ্ছুক হইবেন, তাহাতে আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে। ধর্ম্মবিশ্বাসে যাহাদিগের সঙ্গে একতা নাই, তাহাদের সহিত নামগত একতা রক্ষা করিবার আমরা কোনই প্রয়োজন দেখি না। ব্রাহ্মগণ ধর্ম্মবিশ্বাসে যেমন ভিন্ন, তেমনি ভিন্ন নামেই পরিচিত হইবেন ইহাই প্রার্থনীয়।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গত বার্ষিক সভার অধিবেশনে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী ও অধ্যক্ষ সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

কর্ম্মচারী।

শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতি।
,, ,, দুকড়ি ঘোষ, সম্পাদক।
,, ,, নীলরতন সরকার, সহকারী সম্পাদক।
,, ,, শশিভূষণ বসু, ঐ
,, ,, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, ধনাধ্যক্ষ।

অধ্যক্ষ সভার সভ্য।

কলিকাতা—বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, সীতানাথ দত্ত, কেদারনাথ রায়, আদিত্যকুমার চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী কাদম্বিনী গাঙ্গুলী, শ্রীমতী কামিনী সেন, বাবু উমাপদ রায়, ডাক্তার পি, সি, রায়, মোহিনীমোহন বসু, জে, এন্, মিত্র, বাবু মধুসূদন সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা বসু, বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, মথুরামোহন গাঙ্গুলী, সুন্দরীমোহন দাস, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শ্রীমতী হেমলতা ভট্টাচার্য্য, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী কুমুদিনী খাস্তগীর, বাবু পরেশনাথ সেন, শ্রীমতী রাধারাণী লাহিড়ী, বাবু বঙ্কবিহারী বসু, হরিমোহন ঘোষাল।

মফস্বল,—মিঃ লছমনপ্রসাদ [এলাহাবাদ] বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, কালীশঙ্কর সুকুল [নড়াইল] ডাক্তার ধর্ম্মদাস বসু [ময়মনসিংহ] বাবু মনোরঞ্জন গুহ [বরিশাল] হীরালাল হালদার [বরিশাল] মুন্সী জালালুদ্দিন [জলপাই গুড়ি] মিঃ ডি, এন্, মুখার্জি [পুরী] বাবু যদুনাথ চক্রবর্ত্তী, চণ্ডীচরণ সেন [মুন্সীগঞ্জ] নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, [ঢাকা] বিপিনবিহারী রায় [মাণিকদহ] ভুবনমোহন কর [দিনাজপুর] শ্রীমতী মনোরমা মজুমদার [ঢাকা] বাবু নীলমনি চক্রবর্ত্তী [খাসিয়া হীল] চণ্ডীকিশোর কুশারী [ঢাকা] নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় [ভাগলপুর] চন্দ্রকুমার ঘোষ [গয়া] রাধাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় [দার্জ্জিলিঙ্গ] শ্রীনাথ চন্দ [ময়মনসিং]।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
২১শ সংখ্যা।

১লা ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬১।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।৷৹
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵৹

একষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৬ই মাঘ রবিবার।

অদ্য অপরাহ্নে শ্রমজীবিগণের উৎসব হয়। বরাহনগরস্থ শ্রমজীবী সভার সভ্যগণ উৎসবে যোগ দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা শ্যামবাজারে সমাগত হইলে— সংগীত সংকীর্ত্তনও বক্তৃতা হয়। বাবু নীলমনি চক্রবর্ত্তী, বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল এবং মিঃ লছমন প্রসাদ বক্তৃতা করেন। তৎপর নগরসংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে উপাসনালয়ে উপস্থিত হইলে, উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে শ্রমজীবিগণের প্রীতিভোজন হয়। নগেন্দ্র বাবু উপাসনান্তে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সার এইরূপ ;—

"পরমেশ্বরকে কিরূপে পাওয়া যায়! মুমুক্ষু জীবের এই প্রশ্ন। ধনের সাহায্যে কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? না। তিনি যদি কেবল ধনগম্য হইতেন, তবে এই কোটি কোটি দুঃখীর দশা কি হইত? সংসারে ধনী কয় জন? দুঃখীগণ কি টাকা নাই বলিয়া তাঁহাকে পাইবে না? দয়াময়ের রাজ্যে এমন ব্যবস্থা কখনও হইতে পারে না। তিনি অমূল্য ধন, এ পৃথিবীর ধন দিয়া কি তাঁহাকে কেনা যায়? তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে কি অনেক শাস্ত্র পড়িতে হয়? অনেক বিদ্যা উপার্জ্জন না করিলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায় না? তবে তো বড় বড় অধ্যাপকগণই তাঁহাকে পাইবেন। আমাদের মত মূর্খদের তবে কি তাঁহাকে পাওয়া হইবে না? সংসারে বিদ্বান্ কয় জন? এই কোটি কোটি নরনারী কি তাঁহাকে পাইবে না? রাশি রাশি দর্শন বিজ্ঞান না পড়িলে কি তাঁহাকে পাওয়া যায় না? মূর্খদের কি গতি হবে না? এমন কখনও হইতে পারে না। তিনি কেবল ধনীর জন্য নন, তিনি কেবল জ্ঞানীর জন্য নন। তিনি ধনী, দরিদ্র—পণ্ডিত, মূর্খ—সকলের মা। মা যে হয় সে কি কেবল বড় মানুষ ছেলেকে কোলে লইতে চায়, গরীব ছেলেকে দূর হইতে বলে? যে এরূপ করে সে মা নয়, রাক্ষসী। মা কি কেবল জ্ঞানী ছেলেকে কোলে লইতে চান? আর মূর্খ ছেলেকে দূর করিয়া দেন? যিনি জগতের মা, অনন্ত মাতৃ ভাবে যিনি পূর্ণ, তিনি কি গরীব মূর্খ বলিয়া তাড়াইয়া দিতে পারেন? এই সংসারের মা যাহা পারেন না, তিনি কি তাহা পারেন? বিন্দুতে যাহা সম্ভব নয় তাহা কি সিন্ধুতে হয়? তিনি সকলের মা আমরা সকলে তাঁহাকে পাইব। জগতের যে সব সাধু চরিত্রে সেই বিশ্বমাতার প্রেম প্রকাশিত হয়, সে সব চরিত্র কেমন? ঐ দেখ মহর্ষি ঈশা। তিনি প্রভুর সঙ্গে এক ভাবাপন্ন হইয়া গেলেন। হইয়া কি করিলেন? দেশের ধনী মানী বড় লোক লইয়া ব্যস্ত থাকিলেন? না। যাহারা নিরক্ষর, অতি দুঃখী, মাছ ধরিয়া খাইত, সেই সব লোকের বন্ধু হইলেন। তাহাদিগকে পরমতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন। তাহাদের প্রাণে ভক্তিরস সঞ্চার করিতে লাগিলেন। বলিলেন পরমেশ্বর দুঃখীর ঈশ্বর, মূর্খের ঈশ্বর। বাইবেল পড়িয়া দেখ, তিনি কেমন দুঃখীর বন্ধু ছিলেন। কেবল ঈশা নহেন, জগতের সকল মহাত্মারই এই ভাব। বুদ্ধ নানক, চৈতন্য প্রভৃতি সকল মহাত্মাই দুঃখীর বন্ধু। কেন এমন হয়? ইয়োরোপ, আমেরিকা, সকল স্থানেই মহাত্মারা গরীবের বন্ধু—কেন এমন হয়? তাঁহাদের প্রাণে সেই প্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু পড়ে বলিয়া। যাঁহাকে তাঁহারা পূজা করেন, যাঁর প্রেমে তাঁহারা প্রেমিক, যাঁহার ভক্তিতে তাঁহারা ভক্ত, তিনি মূর্খ অজ্ঞানের বন্ধু। তাই জগতের মহাত্মারা মূর্খ দুঃখীদিগকে খুঁজিয়া বেড়ান। এখন যে পাপী অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়া শ্রান্ত অনুতপ্ত সে বলিবে, জগদীশ্বর দুঃখীর বন্ধু, শুনিলাম, তিনি কি আমার ন্যায় মহাপাতকীর বন্ধু হইবেন! নিশ্চয় ভাই—পাপীর বন্ধু আর কেহ নাই। ঐ যে সাধুদের কথা বলিতেছিলাম, প্রভুর মহত্ত্ব পাইয়া যাঁহারা মহৎ হন, তাঁহারা চিরকাল পাপীর বন্ধু। পাপীকে যে ভালবাসে না, তাহার আবার ধর্ম্ম কি? অধম বলিয়া যে তাড়ায় না তাহার আবার ধর্ম্ম কি? ঈশা কি করিতেন? বাইবেল পাঠে দেখা যায়, ঈশা সেই সময়ে ইহুদী দেশের মত দুষ্কর্ম্মী, দুঃখীর সহিতই বেড়াইতেন। এ প্রেমের তত্ত্ব কে বুঝিবে? তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার মহত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া, এক দিন তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিল, তোমাদের গুরু কেমন? কেবল পাপী

ও দুশ্চরিত্রাদিগের সহিত থাকেন। শিষ্যগণ কিছু বলিতে না পারিয়া ঈশাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি বলিলেন আমি সাধুদেগের জন্য আসি নাই, কিন্তু অনুতপ্ত পাপীদিগের জন্যই আসিয়াছি। বলিলেন—"যে সুস্থ তাহার আর ঔষধের প্রয়োজন কি? যে রোগী তাহারই ঔষধের প্রয়োজন। পাপীদিগকে অনুসন্ধান করাই তাঁহাদিগের নিয়ম। ইহা তাঁহাদিগের নিজের কাজ নয়; তাঁহাদিগের প্রাণের মধ্যে যিনি বাস করেন, যিনি ভক্ত হৃদয়বিহারী তিনিই মহাত্মাদিগকে দুঃখী দরিদ্র, পাপীদিগের নিকট লইয়া যান। মানুষ তাঁহার হাতের যন্ত্র। মহাত্মারা তাহা জানেন। চারিশত বৎসর হয় নাই, নবদ্বীপের নিত্যানন্দ কি করিয়াছিলেন? মহাপাপী জগাই, মাধাই এমন দুষ্কার্য্য ছিল না যাহা তাহারা করে নাই। নিত্যানন্দ তাঁহাদিগকে হরিনাম শুনাইতে গেলেন। তাহারা হরিনাম শুনিবে কেন? কিন্তু প্রেম নিবৃত্ত হইল না। নিত্যানন্দ জগাইমাধাইকে আলিঙ্গন করিলেন এ কি সামান্য প্রেম? যে প্রেমের সঙ্গে রক্ত-মাংসের যোগ এ কি সেই প্রেম? না—ইহা দেব দুর্ল্লভ স্বর্গের ধন। ভগবান্ এক বিন্দু প্রেম দিয়াছিলেন, তাহাতেই নিত্যানন্দ জগাই মাধাইকে আলিঙ্গন করিতে পারিয়াছিলেন। এ প্রেম সেই অনন্ত সিন্ধুর এক বিন্দু। পরমেশ্বর সকলের, ধনীর, গরীবের, জ্ঞানীর, পণ্ডিতের, সাধুর, মহাপাপীর। কেহই নিরাশ হইবে না। ধন মান নাই বলিয়া কেহই নিরাশ হইও না, বিদ্যা বুদ্ধি নাই বলিয়া নিরাশ হইও না। মহাপাতকী হও, ভয় নাই। তাঁহাকে সকলেই পাইবে। তবে আমাদিগকে কি করিতে হইবে? সকলে মিলিয়া কেবল তাঁহাকে ডাকিতে হইবে। মুখের ডাকা নয়, প্রাণের ডাক ডাকিতে হইবে। যিনি অন্তর্যামী, তিনি কি মুখের কথায় ভোলেন? প্রাণের ডাক ডাকিতে হইলে কি চাই? আপনার অবস্থা বুঝা চাই। যদি মনে করি আমি বেশ আছি, তার উপরে ধর্ম্ম হইলে ভাল হয়, তবে ভগবান্ আসিবেন না। সুখ স্বচ্ছন্দের উপর ধর্ম্ম চাহিলে হইবে না। তিনি সকলের খোঁজ করেন, কিন্তু তারই ঘরে আসিয়া আপনার হন, যে তাঁকে ছাড়া আর কিছুই চায় না। কাপড়, ঘড়ী, গাড়ী এ সকলে যাহার প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না, প্রাণ হুহু করিয়া উঠে; এ মাটীর পুতুল ভাঙ্গিবে, যাহার জন্য আসিলাম তাহার কিছুই হইল না। এমন করিয়া যাহার প্রাণ কাঁদে তাঁহার কাছে ভগবান্ যান; সেই যে প্রাণের কান্না তাহারই নাম প্রার্থনা। এস, এক প্রাণে আমরা তাঁহাকে ডাকিতে থাকি।"

৭ই মাঘ সোমবার

রজনী প্রভাত হইতে না হইতে মন্দিরে আবার সংগীত সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। উপাসকগণ সকলে সমবেত হইলে, যথা সময়ে উপাসনা হইল। বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয় এই উপাসনার আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই;—

"এক জন দয়ালু লোক কোন গরীব পল্লীর নিকট বাস করিতেছেন। ইহা শুনিয়া সকল দরিদ্র লোক তাঁহার কাছে আসিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন। তাহাদিগকে আদর করিতে লাগিলেন, তাহাদের অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। গরীব লোকেরা ইহাতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাহাদের ঘরে লইয়া যাইবার প্রার্থনা জানাইল। তাহারা বলিল "আমাদের ভগ্ন কুটীর, আমাদের পল্লী অত্যন্ত মলিন, তথাপি আপনি আসুন। সেই দয়ার্দ্র ব্যক্তি আর ইহা শুনিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি যখন তাহাদের পল্লীতে গেলেন, তখন আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল। কে কাহার ঘরে নিবে!" তাহাদের ঘরে যে কোন ভাল জিনিস ছিল তাহাই তাঁহাকে উপহার দিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, কেন ইহা দিতেছ, ইহা তোমাদের কাজে আসিতে পারে, ইহা দিও না। সকলে ইহা শুনিয়া কাঁদিতে লাগিল। এক জনের আর কিছু ছিল না, এক মুষ্টি সর্ষপ আনিয়া তাঁহার আঁচলে বাঁধিয়া দিতে গেল। দয়ালু ব্যক্তি বলিলেন "আমি ইহা লইয়া কি করিব? তোমার আর সম্বল নাই; ইহা লইয়া যাও।" ইহা শুনিয়া ঐ গরীব লোক কাঁদিয়া বলিল "আমি আর কি দিব আমার যে আর সম্বল নাই।" দয়ালু ব্যক্তি সর্ষপ মুষ্টি লইতে বাধ্য হইলেন।

আপনারা যে মহোৎসবে আসিয়াছেন ইহা এইরূপ। আমরা কতবার পিতার নিকট হইতে কত জিনিস লইয়াছি, কত আব্দার করিয়াছি, কত অন্নজল; ভোগবিলাসের সামগ্রী, কত আত্মীয় স্বজন চাহিয়াছি, তিনি কত কিছু দিতেছেন, এই সব পাইয়া আমাদের কি তাঁহাকে কিছু দিতে ইচ্ছা হয় না? যদি তাহা না হয়, তবে এখনও তাঁহার ভালবাসার মর্ম্ম আমরা বুঝি নাই। এত পাইয়াও যদি তাঁহাকে ঘরে বসাইতে ইচ্ছা না হয়, তবে সত্য সত্যই তাঁহার ভালবাসার মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই। তিনি যে আমাদিগকে অন্নজল দিয়া বাঁচাইতেছেন, কত সুখ-সেব্য বস্তু দিতেছেন, ধন জন, উৎকৃষ্ট সাধনপ্রণালী দিয়াছেন, এত পাইয়াও যদি তাঁহাকে আমাদের ভাঙ্গা কুটীরে বসাইতে ইচ্ছা না হয়, তবে এখনও আমরা তাঁহার প্রেমের মর্ম্ম বুঝি নাই। স্বার্থপর চতুর লোক যেমন কোনও রূপে নিজের মতলব সিদ্ধ করে, সেইরূপ আমরা তাঁহার দান সম্ভোগ করিতেছি। কিন্তু তাঁহার প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতেছি না! কিন্তু তিনি আমাদের চালাকীতে ভুলেন না। তিনি আমাদের চালাকী বুঝেন। তিনি কেবল প্রেমের খাতিরে দান করেন, যদি আমরা তাঁহার প্রেমের মর্ম্ম বুঝিয়া থাকি তবে আমরা চীৎকার করিয়া বলিব "এস প্রভু, আমার ভাঙ্গা প্রাণে বাস কর, আমি তোমার অভ্যর্থনা করি।" প্রথমে ঘরে প্রবেশ করিয়া এই কথাই বলিয়াছি "আমরা তোমার কোলে উঠিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে কোলে তুলিয়া লও!" তিনি সত্যই আসিয়াছেন নতুবা প্রাণ গলিবে কেন? তিনি আসিয়াছেন এখনও তোমাদের কি কিছু দিবার নাই? তোমরা কি কেবল নিবে? তোমাদের যাহা সামান্য আছে তাহাই দেও। শিশুদের খেলার ঘরে মা-বাপ প্রবেশ করিলে কি তাহারা সামান্য খেলার পুতুলই দেয় না? যুবক, তোমার কি কিছু দিবার নাই?

তোমার প্রাণের ভাব, বাসনা কামনা সব দেও। যদি কিছু মলিনতা তাহার মধ্যে থাকে, চলিয়া যাইবে। হে ধনি! তোমার কি কিছু দিবার নাই? সকলেরই কিছু কিছু দিবার আছে। ভক্ত বিশ্বাসীগণ তাঁহার জন্য প্রাণ দিয়াছেন। ধনীরা ধন দিয়া কৃতার্থ হইতেছেন, আমাদের কি কিছু দিবার নাই, আমাদের যদি এক মুষ্টি সর্ষপ থাকে, এক ফোঁটা চক্ষের জল থাকে, গিয়া বলি "এই লও আমাদের আর কিছু নাই।" পৃথিবীর দয়ালু যাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না, স্বর্গের দেবতা কি তাহা উপেক্ষা করিবেন? আমাদের কিছু দিতে হইবে, স্বার্থ পরের মত কেবল লইলে চলিবে না। কিন্তু ব্যবসায়ীর ন্যায় দিলে হইবে না। প্রেমের খাতিরে দিতে হইবে, এস সকলে তাঁহাকে কিছু দিয়া যাই। শুনিয়াছি যে প্রাণ দেয় সে প্রাণ পায়, যে বিষয় দেয় সে বিষয় পায়। এস আমরা যাহা ভাল বাসি তাহা দিয়া কৃতার্থ হই, ধন্য হই। সকলে নিবেন বলিয়া আসিয়াছেন কিন্তু কিছু দিতেও হইবে। যাহা ভালবাসি তাহা দিতে পারিলে, আমাদের প্রাণে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাঁহার সেবায় লোক আসিতেছে না কেন? কেবল আমাদের স্বার্থপর ইচ্ছা রহিয়াছে বলিয়া। দেও সকলে, টাকার অভাব, টাকা দেও; সেবার অভাব, সেবা কর; প্রচারকের অভাব, সকলে কাজ কর, দেও সকলে। তোমার প্রিয় ব্রাহ্মধর্ম্মের মুখ উজ্জ্বল হইবে, পরম জননী তোমাদের সমাজকে সুন্দররূপে চালাইবেন।"

অদ্য সায়ংকালে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের উৎসব হয়। সংগীত ও প্রার্থনা পূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের সম্পাদক বাবু সীতানাথ দত্ত মহাশয় গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করেন। তৎপর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্র ও ছাত্রীগণকে পারিতোষিক প্রদান করা হয়। পারিতোষিক বিতরণের পর শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজীতে "ধর্ম্ম বিশ্বাসের মূল ভিত্তি" বিষয়ে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাঙ্গালাতে সেই বক্তৃতা সমালোচনা পূর্ব্বক আর একটী বক্তৃতা করেন। এই দুই বক্তৃতার সার মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

৮ই মাঘ মঙ্গলবার।

অতি প্রত্যুষ হইতেই মন্দিরে সংকীর্ত্তন হইতেছিল। তৎপর যথাসময়ে অদ্যকার উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই—

"মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এক দিন বলিয়াছিলেন, মানুষকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ তিনটী বাঁধ বাঁধিয়াছেন। ঘৃণা, লজ্জা ও ভয়। প্রথমে ঘৃণা—স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের পাপের প্রতি ঘৃণা থাকে। পাপ করি না কেন? পাপ দেখিলে অন্তরে ঘৃণার উদ্রেক হয়। লোকে কি বলিবে, এজন্য নয়। লোকে প্রহার করিবে এজন্য নয়। কিন্তু পাপানুষ্ঠান করিলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। ইহা আত্মার প্রথম ও বিশুদ্ধ অবস্থা। এ অবস্থায় মানুষ পাপ বলিয়াই পাপকে ঘৃণা করে। লোক লজ্জা অথবা ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় না। যেমন আমরা মলিন পদার্থকে ঘৃণা করি,—কেন? দেখিলে কষ্ট হয়—স্মৃতিতে কষ্ট হয়। আমাদের শরীর মনের গঠনই এইরূপ যে মলিন পদার্থ দেখিলে কষ্ট না হইয়া যায় না। পুণ্য সম্বন্ধেও এইরূপ। সাধুগণ পাপ পরিহার করেন কেন? লোকের নিকট লজ্জা পাইতে হইবে, সেই জন্য নয়,—রাজদ্বারে দুষ্কার্য্যের জন্য দণ্ডিত হইবেন, সেই জন্যও নয়,—কিন্তু স্বাভাবিক ঘৃণার জন্য। সেইরূপ স্বাভাবিক আকর্ষণ তাঁহাকে পুণ্যের দিকে লইয়া যায়।

মন ক্রমে ক্রমে মলিন হইয়া আসিলে, পাপের প্রতি আর ঘৃণা থাকে না। পাপানুষ্ঠান করিতে পারি, করিলে সুখ পাই—তবে করিতে পারি না কেন? লোকলজ্জায়—লোকে কি বলিবে; নিজের আর কিছু আপত্তি নাই। এটী দ্বিতীয় বাঁধ। এটী চলিয়া গেলে, তৃতীয় বাঁধ—ভয়। পাপ করিতে আর কিছুই আপত্তি নাই, দশজনে নিন্দা করে—করুক, কিন্তু ভয়, যদি দশজনে ধরিয়া প্রহার করে? পাছে দণ্ড পাইতে হয়—প্রাণ যায়। ভয় অনেক সময় দুষ্কার্য্যকারীকে পাপ হইতে রক্ষা করে। কিন্তু এই তিনটী বাঁধই যদি ভাঙ্গিয়া যায়!—তখন—? তখন অবনতির পর অবনতি। মানুষের অবস্থা কি এমন হইতে পারে? সম্পূর্ণরূপে কখনও এরূপ হইতে পারে না। চিরকালের জন্য কেহ ভাসিয়া যায় না। ভগবানের দয়া সকলের জন্য, কিন্তু বিশেষভাবে পাপীর প্রতি তাঁহার অধিক দয়া। পরমেশ্বরের দয়া অনন্ত। পাপীর অপরাধ যতই কেন হউক না, পরিমিত। আমার অপরাধ তাঁহার দয়া অতিক্রম করিতে পারে না। চিরদিন তিনি মহাপাপীর উদ্ধার-কর্ত্তা, পতিত-পাবন। সেই জন্য কেহই আশাহীন হইবেন না।

পাপকে পাপ বলিয়া ঘৃণা করিয়া পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই প্রকৃত ধর্ম্ম। লজ্জা অথবা ভয়ে নিবৃত্তি প্রকৃত ধর্ম্ম নহে। ঘৃণার জন্য দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হওয়াই প্রকৃত পুণ্যের অবস্থা। পাপ সম্বন্ধে যাহা পুণ্যের সম্বন্ধেও তাহাই। দুই দিকেই নিষ্কাম হওয়া চাই। সুগন্ধি ভালবাস কেন? স্বভাবতঃ ভাল লাগে বলিয়া। গোলাপটী ভালবাস কেন? এখানে আর 'কেন' নাই—স্বভাবতই এরূপ হয়—ভাল না বাসিয়া থাকা যায় না। এখানে যুক্তি, তর্ক, ফলাফলের বিচার নাই। পুণ্যও এইরূপ, লোক ভয়ে পাপত্যাগ যেমন প্রকৃত ধর্ম্ম নয়, লোকের খাতিরে পুণ্য করাও তেমনি প্রকৃত ধর্ম্ম নয়। পাপ ও পুণ্য অন্তরের অবস্থা—বাহিরের ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে যেমন, পরলোক সম্বন্ধেও তেমন। প্রচলিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোক বলে মৃত্যুর পর পাপী নরকে যায়—সাধু স্বর্গে যান। মনে কর এক জন লোক লোকভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হয় না—কিন্তু নরকের ভয়ে অসহ্য যাতনা পাইতে হইবে বলিয়া—পাপ হইতে নিবৃত্ত থাকে। কিন্তু যদি কেহ তাহাকে বুঝাইয়া দেয় যে নরক নাই, পাপের জন্য পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে না—তাহা হইলে ত সে পাপ করিবে। যে কেবল নরকের ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত

হয়, সে যখন বুঝিবে যে এ কুসংস্কার মাত্র, তখনই সে পাপ করিবে। মানুষের ভয়ে বা নরকের ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া প্রকৃত ধর্ম্ম নয়। এক জন তস্কর যাতনার ভয়ে চৌর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলে, তাহাকে কেহ সাধু বলিবে না। যদি সেই চোরকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়, পৃথিবীতে কেহ কিছু না বলিলেও মৃত্যুর পর তজ্জন্য যাতনা পাইতে হইবে, ইহা শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেও সে প্রকৃত সাধু হইবে না। পার্থিব শাস্তি অথবা পারলৌকিক শাস্তির ভয়ে পাপ হইতে নিবৃত্ত হওয়া প্রকৃত ধর্ম্ম নয়।

পুণ্য সম্বন্ধেও তাই। পুরস্কারের লোভে সৎকার্য্য করিলে তাহাকে কে সাধু বলিবে? লোভের জন্য পুণ্যানুষ্ঠান করিলে প্রকৃত ধর্ম্ম হয় না। এক জনকে যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায় এখন সৎকার্য্য করিলে পরকালে পরম সুখে থাকিবে। সে সৎকার্য করিলে তাহার পুণ্য হইবে না—কারণ সে পারলৌকিক সুখের লোভে সৎকার্য করে। ভয়কে পৃথিবী হইতে পরলোকে টানিয়া লইলে সে ভয়ই থাকে, সেইরূপ লোভকে পৃথিবী হইতে পরলোকে টানিয়া লইলেও তাহা লোভই থাকে। ভয় ও লোভ অতি নীচ ভাব। পরলোকে টানিয়া নিলেও উহারা ভাল হয় না। যে সুখের জন্য ধর্ম্ম করে, সে ধর্ম্ম কি জানেনা, যে ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম করে, সেই ধর্ম্ম কি জানে। ধর্ম্মাপেক্ষা উচ্চ আর কি আছে? যদি কিছু থাকিত করিত। ইহা যে বুঝিয়াছে সেই প্রকৃত ধর্ম্ম করে। প্রকৃত ভক্তকে জিজ্ঞাসা কর তিনি ভগবানের নাম করেন কেন? স্বর্গের জন্য? তিনি বলিবেন—ছি, স্বর্গ চাই না—নাম বড় মিষ্ট না করিয়া থাকিতে পারি না। কোটী স্বর্গ তুচ্ছ, তাঁহার এক নামের কাছে। পবিত্রতা চাই কেন—পবিত্রতার জন্য। ভক্তি চাই কেন?—ভক্তির জন্য—স্বর্গের জন্য নয়। প্রেম চাই প্রেমের জন্য। সেবা—সেবার জন্য। পবিত্রতা, ভক্তি, প্রেম সেবা—এই ত ধর্ম্ম। যখন পাপের জন্য পাপত্যাগ ও ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান তখনই প্রকৃত ধর্ম্ম। সত্য, পবিত্রতা, প্রেমের নিকট কোটী স্বর্গ তুচ্ছ। স্বর্গ আর কোথায়? যদি প্রভুর নাম লইতে পারি সেই স্বর্গ। যদি চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহাই স্বর্গ। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী"। মুক্তি কি?—সংসারের শিকল কাটা। কিন্তু তাহাতে কি কিছু চাই? ভক্তি চাই। শ্রীমদ্ভাগবতে ঈশ্বরোক্তিরূপে লিখিত আছে "আমার কাছে যে যাহা চায় আমি তাহাকে তাহাই দিতে পারি; কিন্তু যে আমার কাছে আসিয়া কিছুই চায় না—আমি তাহাকে কি দিব? আপনাকে আপনি দান করি।" ভক্তি তত্ত্বের কি উচ্চ কথা!! ইহাই সত্য যে—ধর্ম্মের জন্য ধর্ম্ম, পাপেরজন্য পাপত্যাগ। ইহাকেই নিষ্কাম ধর্ম্ম বলে। নিষ্কাম ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। ভগবানের জন্য ভগবানকে চাওয়াই প্রকৃত ধর্ম্ম। উপনিষদে আছে—"ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু"। ধর্ম্মের মত মিষ্ট আর কিছুই নাই।"

অদ্য সায়ংকালে সঙ্গত সভার উৎসব হয়। প্রথমতঃ সংগীত ও উপাসনা হয়, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন উপাসনার পর তিনি এই ভাবে উপদেশ প্রদান করেন।

ঈশ্বর কিরূপ ধন? পরম ধন; ইহাঁকে লাভ করিতে পারিলে সকল সুখ লাভ হয়। পৃথিবীর সামান্য ধন উপার্জ্জন করিতে হইলে কত যত্ন পরিশ্রম চাই। আমরা দেখিতে পাই পৃথিবীর লোকে সামান্য ধন উপার্জ্জনের জন্য কত খাটিতেছে। কিন্তু পরমধন কিরূপে উপার্জ্জন করা যায়? তাঁহার জন্য কি কিছুমাত্র যত্ন ক্লেশ করিতে হইবে না? দেহ মন প্রাণ সমস্ত সমর্পণ করিয়া, ঈশ্বর ভক্ত তাঁহার সাধনে প্রবৃত্ত হন, ও বলেন "প্রাণ দিলেও কিছুই হইল না। এত বড় ধন, পরম ঐশ্বর্য্য, অনন্ত কালের ঐশ্বর্য্য যাহা, তাহার জন্য সামান্য এই প্রাণ যদি বিসর্জ্জন করি কিছুই ত হইল না। তবে আনন্দের সুখশয্যায় শয়ন করিয়া যাঁহারা মনে করেন এই পরম ধন পাওয়া যাইবে, তাঁহারা ভ্রান্ত। পরম ধনকে পাইতে হইলে কিছুই করিতে হইবে না, ইহা অতিমাত্র অলসের কথা। পরমেশ্বর কৃপা করিয়া এক এক সময় অতি মহা পাতকীর নিকটও প্রকাশ পান, সত্য; ইহা তাঁহার মহিমা। কিন্তু তাঁহার জন্য কাঙ্গাল, একান্ত অনুরাগীও লালায়িত না হইলে তাঁহাকে লাভ করা যায় না। তিনি মানুষকে ধন, মান, সুখ সব দেন। কিন্তু যতক্ষণ সে সেই পরমধনকে না বুঝে, তাঁহার প্রার্থী না হয়, ততক্ষণ আপনাকে দেন না। ঈশা, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মাগণের জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, তাঁহারা সুখশয্যায় দিনপাত করিয়া তাঁহাকে লাভ করেন নাই। কত তপস্যা ধ্যান ধারণা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া সেই পরমদেবতাকে সাধন করিয়াছিলেন, তবে তাঁহাকে, পাইয়াছিলেন। অশ্রুপাত করিয়া বীজ বপন করিয়াছিলেন, আনন্দে শস্য কর্ত্তন করিয়াছিলেন। সহজ বিশ্বাসে তাঁহাকে পাওয়া যায় সত্য। কিন্তু আমাদের মন কত বাঁকা। ইহাকে সহজ ভাবে আনয়নের জন্য সাধনের প্রয়োজন। মন প্রকৃতি, প্রভৃতি সহজ ভাব ধারণ করিলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে। এই সহজ ভাবই প্রকৃত ভক্তের ভাব। ভক্তির অবস্থা এই। এই অবস্থাতে উপনীত ভক্তের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল, "সকলের সার ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।" ভক্তি হইলে মুক্তি সহজেই হয়। যে সংসার মানুষকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, ভক্তির প্রভাবে মানুষ তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইতে পারে। ভক্তি উপস্থিত হইলে সব বন্ধন কাটিয়া যায়। ভগবানের সঙ্গে তখন প্রাণের যোগ স্থাপিত হয়। আমাদের মন প্রাণ যখন সহজভাবে তাঁহার উন্মুখী হয়, তখনই ভক্তির আরম্ভ। ইহার শেষ অবস্থা প্রেম। ভগবানকে লাভের জন্যই আমারা জন্ম লইয়াছি ও ধর্ম্মপথে আশ্রয় লইয়াছি। কিন্তু সাধনের অভাবে তাঁহাকে লাভ করিতে পারি না। সাধন মুখের কথা নয়, এই সাধনার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আছে। সাধনাতে যাঁহারা ব্রতী হইয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা, ইহার তিনটী অবস্থা বর্ণনা করেন। প্রথম, প্রবর্ত্তনের অবস্থা, দ্বিতীয় সাধনের অবস্থা, তৃতীয় সিদ্ধির অবস্থা। এই প্রত্যেক অবস্থার আবার প্রথম মধ্যম ও চরম অবস্থা আছে। ধর্ম্মের সাধনে যাহারা প্রবৃত্ত, তাঁহারা কি সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়াছেন? সব সময়ে নয়। প্রবৃত্তের প্রথম অবস্থায় অনেকে

থাকেন। তারপর প্রবৃত্তের সাধনাবস্থা। তারপর প্রবৃত্তের সিদ্ধাবস্থা। প্রবৃত্তের অবস্থা মঞ্জুর হইলে সাধনের অবস্থা আরম্ভ হয়। ইহারও তিন অবস্থা। সিদ্ধির ও এইরূপ সিদ্ধাসিদ্ধ ও চরম এই তিন অবস্থা। ঈশ্বরের অনন্ত ভাব অনন্ত সোপান শ্রেণীর ন্যায়। সাধন দ্বারা তাহার এক একটীতে আরোহণ করিতে হয়। প্রত্যেক সাধনের প্রথম অবস্থা সহজ ও সুখকর। মধ্যম অবস্থা কঠোর ও দুঃখ পূর্ণ। কিন্তু দেব-প্রসাদে ও আত্মচেষ্টা দ্বারা তাহাতে সিদ্ধ হওয়া যায়। সাধনের সিদ্ধ অবস্থা পরম সুখের অবস্থা। তাহাকে সহজ অবস্থা বলা যায়। নিশ্বাস প্রশ্বাস যেমন সহজ, তখন ধর্ম্মও তেমন সহজ হয়। ধর্ম্ম সাধনের পথে অনেকেই আহূত হন, কিন্তু অল্পই মনোনীত হন। সাধকগণ চিরকাল এই কথা বলিয়া গিয়াছেন, ধর্ম্মের পথে সঙ্গী অতি কম মিলে। মৃত্যুর পথ অতি প্রশস্ত, অনেক লোক তাহাতে বিচরণ করে। কিন্তু ধর্ম্ম সাধনের পথের দ্বার ও পথ অতি সংকীর্ণ। অল্প লোক তাহাতে যাইতে পারেন। প্রাচীন ঋষিগণও তাহাই বলেন,—ধর্ম্মপথ শাণিত ক্ষুর ধারের ন্যায় অতি দুর্গম। এজন্য ধর্ম্ম সাধনের পথে অনেক লোক অগ্রসর হইতে পারে না। এপথ খুব পরীক্ষাপূর্ণ। যাহারা Bunyan এর Pilgrim's Progress অথবা বিবেক চন্দ্রোদয় নাটক পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারেন, এ পথে কত বাধা, কত পরীক্ষা ধর্ম্মার্থীকে ধরিয়া থাকে। ঈশ্বরের এরূপ ব্যবস্থা। তিনি ধর্ম্মপথকে সহজ করেন নাই। এপথে হেলায় খেলায় যাওয়া যায় না। তিনি দেখিতে চান, ধর্ম্মের জন্য, কেবল তাঁহার জন্য কে ধর্ম্মপথে নিষ্কাম সাধনে প্রবৃত্ত হয়। এজন্য যাহারা ধর্ম্মপথে থাকে, তিনি তাহাদের মধ্যে ধনলোলুপদিগকে ধন দিয়া, মানলোলুপদিগকে মান দিয়া, ফিরাইয়া দেন। কিন্তু কিছুতেই যাহাদের প্রাণ তৃপ্ত হয় না, যাহারা সংসারের কোন সুখেই তুষ্ট হয় না, ভগবানের জন্য যথার্থ যাহারা লালায়িত, তাঁহার কৃপায় এ পরীক্ষাতে তাহারাই উত্তীর্ণ হয়। এই যে পথের কথা বলা হইল, যে পথে ভয়ঙ্কর সিংহ ব্যাঘ্র সকল বিচরণ করে, ঈশ্বরবিশ্বাসীদিগকে উহারা স্পর্শ করিতে পারে না। বিশ্বাসী হইয়া যাহারা ঠিক ভাবে চলে, অনায়াসে তাহারা চলিয়া যায়।

এই সাধনের সহায়তার জন্য কতকগুলি বিধি ও নিষেধ পালন করিতে হয়। যে সঙ্গত সভার সাম্বৎসরিক উৎসব হইতেছে, ইহার সভ্যগণ পাঁচটী বিধি অবলম্বন করিয়াছেন। ধর্ম্মসাধনায় এই গুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রথম—নিয়মিত রূপে ঈশ্বরের নিত্য উপাসনা, সত্যভাবে, সরলভাবে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রতিদিন তাঁহার উপাসনা করিতে হইবে। দ্বিতীয়—আত্মানুসন্ধান। আপনার আত্মার অবস্থা মানুষ সহজে দেখিতে পায় না। সংসারে যেমন, ধর্ম্মেও সেইরূপ, মানুষ সময় সময় অন্ধ হইয়া চলে। কঠোর আত্মানুসন্ধান না করিলে অবস্থা বুঝা যায় না। যথার্থ অভাবের জন্য প্রার্থনা করা যায় না। তৃতীয়—সাধুসঙ্গ। নিজের অবস্থা সকল সময়ে ধর্ম্মভাবে পূর্ণ থাকে না। জীবনে জোয়ার ভাটা খেলে। জোয়ারের অবস্থায় আনন্দে ধর্ম্মসাধন করিতে পারা যায়। কিন্তু ভাটার অবস্থায় নিরুৎসাহ নিরাশার সময় তেমন পারা যায় না। সাধুসঙ্গ এ রোগ নিবারণের মহৌষধ। সাধু সহবাসে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠে। ইহা দ্বারা অগ্নি চিরজ্বলন্ত করিয়া রাখা যায়। চতুর্থ—নামমন্ত্র, সর্ব্বদা স্মরণ করা। সেই প্রেমময় মঙ্গলময় বিধাতাকে কিসে স্মরণ করিতে পারি। পরীক্ষায় পড়িয়া ধর্ম্মবল অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ জন্য ভগবানের নাম করিতে হয়। নাম স্মরণে প্রেম ভক্তির সঞ্চার করে, মন সরল হয়। পঞ্চম—ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া সংসারের কার্য্য করা। আপনার কর্ত্তব্য তাঁর প্রীতির জন্য করা। এই সকল বিধি প্রতিপালন করিলে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারি। যেমন বিধি সেইরূপ নিষেধও মানিতে হয়। মাদক সেবন, ইন্দ্রিয় সেবন, বিলাসিতা, পরচর্চ্চা, মিথ্যা বা বৃথা বাক্যব্যয়, আলস্য, অনর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ, সাংসারিক কোন বস্তুর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি নিষিদ্ধ। দেহ মন যাহাতে সর্ব্বদা পরিশুদ্ধ থাকিতে পারে, চিন্তা ও কার্য্যের ভিতর যাহাতে পাপ না থাকিতে পারে, তার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। সাধন প্রবর্ত্তকগণ যথাসম্ভব অনুকূল অবস্থা গ্রহণ ও প্রতিকূল অবস্থা বর্জ্জন করিবেন। চারা গাছকে বড় করিতে হইলে কত যত্নের প্রয়োজন। বড় হইলে আর যত্নের প্রয়োজন হয় না। ধর্ম্ম জীবন সম্বন্ধেও সেইরূপ। ধর্ম্ম সাধনের প্রথম অবস্থায় চারা গাছের ন্যায় জীবনকে রক্ষা করিতে হইবে; অনুকূল অবস্থায় জীবনকে ফেলিতে হইবে। প্রতিকূল অবস্থা হইতে রক্ষা করিতে হইবে। অনেকে আপনার বল না বুঝিয়া আপনাকে পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া মারা যান। ঈশ্বর যখন সেইরূপ বল প্রদান করেন, তখন অনেক পরীক্ষা, প্রতিকূল অবস্থা প্রতিহত করা যায়, কিন্তু প্রথম অবস্থায় তাহা নয়। ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইলে এক দিকে মানুষের নিজের যত্ন, চেষ্টা, পরিশ্রম হইতে থাকে, তার সঙ্গে অন্য দিক হইতে ঈশ্বর কৃপা বর্ষিত হইতে থাকে। কৃষক পরিশ্রম করিয়া ভূমি কর্ষণ করে; কণ্টক সকল বাছির করে, বীজ বপন করে কিন্তু আকাশ হইতে বারিধারা পতিত হইয়া সেই বীজ অঙ্কুরিত করে। বায়ু, সূর্য্যালোক সহায় হইয়া সেই সকল বৃক্ষের উন্নতি সাধন করে। মানুষের পরিশ্রম সেইরূপ, ইহা উপলক্ষ মাত্র। ভগবানের কৃপা বর্ষিত হয় বলিয়াই ধর্ম্মের বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ধর্ম্মবৃক্ষে যেমন ফল হয় পৃথিবীর কোন গাছে এমন ফল ফলে না। সেই ফল ভোগ করিয়া আপনি সুখী হওয়া যায়, অপরকে সুখী করা যায়। এই সাধন পথে ঈশ্বরকে সহায় জানিয়া সাধক অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। নিরাশ হন না, শিথিল হন না। এমন অমূল্য ধনের জন্য যদি প্রাণ দিতে হয় তাতেই কি? সামান্য প্রাণ বিনিময়ে কেমন অমূল্য ধন পাইলাম। প্রাণ দিয়া তাঁহার জন্য যে লাগে, ঈশ্বর তাহার সকল অভাব পূর্ণ করেন। ঘোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্যে তাঁহার প্রেমক্রোড়ে তাঁহাকে ধারণ করিয়া রক্ষা করেন। বিশ্বাস অঙ্কুর তাঁহার কৃপায় বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তদ্গত প্রাণ যাঁরা তাঁরা কি সংসারের নিন্দার জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন? যাঁহারা প্রাণ দিয়া তাঁহার সাধনায় প্রবৃত্ত হন বাঞ্ছাকল্পতরু পরমেশ্বর তাঁহাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেন। "ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না, কর সাধন, হবে পূর্ণ কামনা।"

উপদেশের পর বাবু বাণীকান্ত রায় চৌধুরী সঙ্গতের গত বর্ষের কার্য্য বিবরণ পাঠ করিলে, বাবু কেদারনাথ রায় একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বাবু কেদার নাথ কুলভি, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—মিঃ ভিক্টারাও (ইন্দোর) বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস, রজনীকান্ত গুহ, কৈলাসচন্দ্র সেন ও কৃষ্ণকুমার মিত্র সঙ্গত সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রেরিত উপহার সঙ্গতের নিকট পঠিত হইলে, উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

সঙ্গতের গতবর্ষের কার্য্য বিবরণ।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রসাদে ও শুভ-ইচ্ছায় সঙ্গত সভা এক বৎসরকাল অতিক্রম করিয়া আবার নূতন বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহা আমাদের ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মোন্নতি বিষয়ের আলোচনার এক প্রকৃষ্ট স্থান। পরব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া আমরা যতই ইহার উন্নতি সাধনে যত্ন করিব, ততই আমাদের আত্মোন্নতির পথ খুলিয়া যাইবেক। ইহা হয়ত কেহই অস্বীকার করিবেন না। এ বৎসর সঙ্গত যেরূপ নিয়মিত রূপে চলিয়াছে, অনেককাল সেরূপ হয় নাই, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মই ইহাতে যোগদান করেন, অনেকেই, এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন! প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর উপাসনান্তে ইহার কার্য্য হইয়া থাকে। প্রতি মাসে এক এক সভ্যের গৃহে এক একটী অধিবেশন হয়। তদ্ভিন্ন প্রতিবারই এই উপাসনালয়ে সভার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এ বৎসর গড় উপস্থিত সংখ্যা ১০। ১২ জন। তদ্ভিন্ন কয়েকটী মহিলাও নিয়মিত রূপে সঙ্গতে উপস্থিত হইয়াছেন। ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সঙ্গতে নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যক বিষয় সকল আলোচিত হইয়াছে। যথা;—(১) জন্মগত পাপ যাহা খ্রীষ্টানেরা বলেন, তাহা ঠিক কি না; (২) অলসতা ও নিরাশা; (৩) শুষ্কতা ও সরসতা; (৪) ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি ও কিরূপে হয়; (৫) জীবনগত ও সমাজগত চরিত্র সাধন; (৬) বিশ্বাস কাহাকে বলে; (৭) সংক্রামক রোগস্থলে ব্রাহ্মদের কর্ত্তব্য; (৮) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দ্বারা কি কি উপকার লাভ হইয়াছে; (৯) সংসার মধ্যে সচেতন ভাব রক্ষা করা; (১০) পারিবারিক উপাসনা; (১১) ধর্ম্মসমাজে পরস্পরের মিলনের উপায়; (১২) পরস্পরের সহানুভূতি (To bear each other's burden;) (১৩) Take care of your heart for it is the fountain of Life (হৃদয়কে পবিত্র রাখিতে যত্নশীল হও কারণ ইহাই জীবনের উৎস; (১৪) ভক্তি; (১৫) উপাসনা; (১৬) ঈশ্বর-উপলব্ধি ও দর্শন; (১৭) ব্রাহ্ম সমাজের অবস্থা; (১৮) যোগ; (১৯) নির্ভর; এবং (২০) আমাদের অবস্থা। ইহার অনেক গুলি ২। ৩দিন পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাতে আমরা অনেকেই অনেক সময় উপকৃত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সকল বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায় নাই। লিখিত হইলে তাহা অবগত হইয়া অন্য সকলেই আনন্দ লাভ করিতে পারিতেন। কয়েকটী আলোচনার স্থূল স্থূল বিবরণ মাত্র পঠিত হইতেছে। যথা;—অলসতা ও নিরাশা, শরীরের পক্ষে অলসতা ও আত্মার পক্ষে নিরাশা একই প্রকার এবং উভয়ের দ্বারা মহা অনিষ্ট সংঘটন হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস, আশা ও প্রেম সংস্থাপন করিতে পারিলে দুইটীই চলিয়া যায়। ধর্ম্ম জীবন আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষা উপস্থিত হয়। তাহার কারণ তিনি দেখেন; আমরা তাঁহাকে যথার্থই চাই কি না, বৈষ্ণব ধর্ম্মে বলে "যে করে আমার আশ তার করি সর্ব্বনাশ, তাতেও যে না ছাড়ে আশ—তার হই দাসের দাস" বার বার পরীক্ষায় পড়িয়া অল্প বিশ্বাসী লোক ধর্ম্ম ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু বিশ্বাসী কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়েন না। তাঁহার প্রেম প্রলোভনে দুঃখ, ক্লেশ ও অত্যাচার সকলই সহ্য করেন। তথাপি নিরাশ হন না, এইরূপ লোকই ঈশ্বরকে লাভ করেন। অনন্যগতি হয়ে ঈশ্বরের মঙ্গলভাব ও করুণা স্মরণে রাখিয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে অলসতা ও নিরাশা চলিয়া যাইবে।

শুষ্কতা ও সরসতা;—শুষ্কতা দুই প্রকার। এক প্রকার শুষ্কতায় সাধুসঙ্গে বিরতি, সংসার আসক্তি এবং প্রেম ও বৈরাগ্যে বিরোধ ভাব আনিয়া দেয়। ইহা আত্মার বিষম রোগ, ইহাই আমাদিগকে ঈশ্বর হতে অনেক দূরে লইয়া ফেলে এবং সর্ব্বনাশ ঘটায়। অন্য প্রকার স্বাভাবিক, ইহা নদীর জোয়ার ভাটার ন্যায়, ইহাতে মানুষ মারা যায় না; ধর্ম্ম জীবনে এ অবস্থা হইলে অধিক পরিমাণে অভাব বোধ হয়, সংসারের কিছুতেই তাহা মোচন করিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে আমাদিগকে ঈশ্বরের শরণাগত করে, তাঁহাকে ডাকিবার ইচ্ছা বাড়াইয়া দেয়। যতই তাঁহার নাম সাধন করা যায়, ততই প্রেম ও ভক্তি বাড়ে এবং সেই প্রেমের স্রোতে হৃদয়ের শুষ্কতা চলিয়া যায় ও সরসতা উৎপন্ন হয়। শুষ্কতার অবস্থায় নিরাশা মহাপাপ। সাধুরা শুষ্কতায় নিরাশ হন না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহ ও ব্যাকুলতার সহিত সাধন ও ভজন করেন। চৈতন্যদেব শুষ্কতার সময় পাথরে মুখ ঘর্ষণ করিতেন এবং হৃদয়ে পুনরায় ভক্তির উদয় না হইলে ক্ষান্ত হইতেন না।

"ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কি ও কি প্রকারে হয়;"—মানবের আধ্যাত্মিক ভাবের বাহ্য বিকাশই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া উন্নত আধ্যাত্মিক আদর্শ সাধন করিতে পারিলেই প্রকৃত অনুষ্ঠান হয়।

"সংসারের মধ্যে সচেতন ভাব রক্ষা করা;"—আবরণ ও নিক্ষেপ, সংসারের এই দুই শক্তি আমাদিগকে অচেতন করিয়া রাখে। কিন্তু যদি ভগবানের নামের নেসা একবার জন্মে এবং কার্য্যের মধ্যে তাঁহাকে স্মরণ রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা সংসারে সচেতন ভাব রক্ষা করিতে পারি, আর তাঁহাকে ভুলে মোহে অচেতন থাকি না।

"ধর্ম্মসমাজে পরস্পরের মিলনের উপায়";—এখানে আমরা বিভিন্ন প্রকারের লোক সকল আসিয়াছি, আমাদের যাহা করা উচিত, তাহা করিতে পারিতেছি না,—ভজন সাধনে অলসতা ও বাহিরের দিকে দৃষ্টি বাড়িতেছে, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছি বলিয়া বোধ হইতেছে, প্রেম বাড়িতেছে না, এবং

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জন্মিতেছে না। সুতরাং চারি দিকে অমিল দৃষ্ট হইতেছে। আমাদিগকে এক সাধারণ ভিত্তিতে দাঁড়াইতে হইবে, তাহা উপাসনা ও ঈশ্বরের স্বরূপ সাধন, এই সকল যতই বাড়িবে প্রেমময়ের অতুল প্রেমের আদর্শে আমাদের প্রেম ততই বাড়িবে, তখন আমরা পরস্পরকে ভাল বাসিতে ও পরস্পরের ত্রুটী ক্ষমা করিতে পারিব, তাহা হইলে আর অমিল থাকিতে পারিবে না।

পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি; (So bear each others burden ;)—যাঁহারা আপনাদের ভার আপনারা বহন করিতে পারেন, তাহাদের প্রতি অন্যে সহানুভূতি না দেখাইলেও তত ক্ষতি হয় না, কিন্তু যাঁহারা তাহা পারেন না, তাঁহাদিগকে কনিষ্ঠ ভাইয়ের ন্যায় দেখিতে হইবে, তাঁহাদের দুঃখ বিপদে সহোদরের ন্যায় সেবা করিতে হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আমরা এবিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন, ভগবানের কৃপায় আমাদের প্রেম বাড়িলে এবং কয়েক জন সকলের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিতে পারিলে হয়ত আমাদের এ অভাবের কতক পরিমাণে মোচন হইতে পারে।

উপাসনা;—"ঈশ্বরকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ভিন্ন তাঁহার উপাসনা হয় না, অতএব সর্ব্বাগ্রে এই দুইটী এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান, পবিত্রতা ও প্রেমের সাধন দরকার। কৃতজ্ঞতা উপাসনার এক অঙ্গ। ভগবান্ নিয়ত আমাদিগকে কত দয়া করিতেছেন, আমরা যথোচিত কৃতজ্ঞ হইতে পারিতেছি না। পিতা পুত্রকে যতই দান করেন সে আরও অধিক পাইতে আশা করে। আমরা ঈশ্বরের নিকট যতই প্রার্থনা করি, ততই তিনি দান করেন এবং আমরা আরও অধিক কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হই, তাঁহার দয়া আমাদের প্রাণে জাগরিত হয়। দীন হীন অকিঞ্চন হইতে পারিলে তাঁহার দয়া নিশ্বাস প্রশ্বাসে স্মরণ হয়, প্রাণে সহজেই কৃতজ্ঞতা আইসে এবং হৃদয় ভরে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। ভগবানের কৃপাস্রোত নিয়ত প্রবাহিত হইতেছে, হৃদয়পাত্র কৃতজ্ঞতা পূর্ণ করিতে পারিলে, তাহা সেই প্রেমবারি ধারণের উপযুক্ত হয় এবং তাহা ধারণ করিয়া মানুষ তাঁহাকে প্রাণে সম্ভোগ করেন, তখনই তাঁহার উপাসনা সফল হয়।

ঈশ্বর উপলব্ধি ও দর্শন;—আমাদের সকল অবস্থাতেই তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিবার নাম ঈশ্বর উপলব্ধি ও দর্শন। ইহা আমাদের ক্ষমতাধীন না হইলেও জলন্ত বিশ্বাস ও আশার সহিত তাহাতে নির্ভর ও সাধন করিতে হইবে, তাহা হইলে চিত্তচাঞ্চল্য ঘুচিবে এবং মন তাহাতে নিবিষ্ট হইবে। নাম সাধনও তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার এক উপায়। তাহাতে অন্যান্য বাসনা চলে যায় এবং তাঁহার সত্তানুভব প্রাণে উজ্জ্বল হয়। তাঁহার দয়া হইলে শুভক্ষণে অতি সহজে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। আমাদের জীবনকে যদি তাঁহার উপযুক্ত করিতে পারি, হৃদয়ে যদি মলিনতা না থাকে এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানও সত্যের ভাব সাধন হয়, তবেই তাঁহার সত্তা নিয়ত উপলব্ধি করা যায়। তাঁহার জন্য আমাদের হৃদয় সিংহাসন খালি করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে কেবল তাঁহার চিন্তা ও মনন ভিন্ন অন্য কিছু স্থান না পায় এইরূপ করিতে হইবে, তাহা হইলে তিনি কৃপা করিয়া তথায় প্রকাশিত হন, এবং আমরা নিয়ত তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে দয়া করুন, আমাদের জীবন ঐ প্রকারে গঠিত হউক, আমরা জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্য সাধনে দিন দিন অধিক সমর্থ হইয়া নিয়ত তাঁহার সহবাসের উপযুক্ত হই, তাঁহার নিকট এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা, তিনি আমাদের প্রার্থনা পূর্ণ করুন, তিনিই ধন্য।

নিম্নলিখিত সার কথা সঙ্গতে পঠিত হইয়াছিল;—এত দিন পুণ্য দাও, পরিত্রাণ দেও, প্রেম দাও বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছি। প্রার্থনার ফলও অনেক সময়ে পাইয়াছি। এবং কৃতঘ্ন প্রাণে কৃতজ্ঞতার তরঙ্গ উঠিয়াছে! কিন্তু এখন তাঁহার কৃপায় পুণ্য পরিত্রাণও প্রেমের আধারকে প্রার্থনা করিতেছি। এত দিন দাতা অপেক্ষা দানের গৌরব করিতাম, এখন দেখিতেছি কোথায় দান আর কোথায় বা দাতা, যত বয়স বাড়িতেছে, ততই দান অপেক্ষা দাতার মূল্য বুঝিতেছি।

আগে কেবল বলিতাম দাও, কখনও বলিতাম না যে, যাহা দিয়াছ তাহা কাড়িয়া লও। এখন অনেক সময় বলিয়া ফেলি প্রভু আর দিও না, যাহা দিয়াছ, তাহার কোনটীরই উপযুক্ত নহি, এখন তোমার দান বন্ধ করিয়া দানের প্রতি লোভ হইতে রক্ষা কর। দানের প্রতি লোভ না দূর হইলে দাতার প্রতি সমুচিত সম্মান কিরূপে হইবে।

যত দিন সাধুসহবাস করি নাই, তত দিন মনে করিতাম অনেক সাধন ভজন হইয়াছে। যখন সাধুসহবাসে আসিলাম, তাঁহাদের অলৌকিক তপস্যা, অসাধারণ সংযম ও অপরিসীম করুণার কথা অবগত হইলাম, তখন মনে হইল পৃথিবী দ্বিধা হউক, আমার দৃপ্ত মস্তক তাহার কোলে লুক্কায়িত করি। সাধুসঙ্গে ঈশ্বরের কৃপায় জীবনে বিনয়ের দীপ্তি প্রকাশ পাইয়াছে। নিজের অসারত্ব ও অকিঞ্চনতা বুঝিয়া এখন সাধু মহাজনের শরণাপন্ন হইতে শিখিয়াছি, জীবনের খদ্যোতালোককে আগে সূর্য্য বলিয়া মনে হইয়াছিল, যখন সাধুজীবন সূর্য্য প্রকাশ পাইল, তখন নিজ জীবনের অন্ধকার হৃদয়ঙ্গম হইল। এখন বাসনা হইয়াছে, জীবিত ও মৃত মহাজনগণের চরণ রেণু হইয়া যেন প্রভুর ঘরে হীনতম ভৃত্যের পদের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারি।

শকুনীর আবাসস্থল—উচ্চ বৃক্ষশির। বিহার-ক্ষেত্র—নির্ম্মল বায়ুপূর্ণ বিশাল গগণ প্রাঙ্গন। কিন্তু কি বিড়ম্বনা, সে দেবলীলার স্থলেও তাহার আত্মার রুচির উপকরণ, নরক সদৃশ নিম্ন পৃথিবীর ঘৃণোৎপাদক পূতিগন্ধময়, বিগলিত শব

আবার দেখুন, চাতকের সুখের আগার—নিম্ন ভূমি। কিন্তু দৃষ্টি—সুদূর স্বর্গপানে এবং কামনার বস্তু—মেঘ বিনিঃসৃত,

নির্ম্মল বারিবিন্দু। সে উর্দ্ধমুখে চিরদিনই এই স্ফটিক জলকণার জন্যই লালায়িত।

এই উৎসব ক্ষেত্রে, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন নিম্ন সাংসারিক জীবন মধ্যেও, মলিন কামনা পরিহার পূর্ব্বক, আমার প্রাণের স্থির দৃষ্টি, অন্যের অজ্ঞাতসারে, তাঁহার কৃপাকণা-আশে অচলা থাকে!

নির্বিষ্টচিত্তে গঙ্গাতীরে উপবেশন করুন, কত অমূল্য সত্য প্রকাশিত দেখিবেন। ভাদ্র মাসে যখন ভাগীরথী কাণেকাণ পূরিয়া উঠে, এবং মলিন স্রোতধারা প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তীরস্থ কিছুই তখন সুন্দর ঋজুভাবে বিম্বিত হয় না। যাহা বাস্তবিকই সরল, তাহাকেও বক্র ও বিরূপ দেখায়।

কিন্তু অগ্রহায়ণ সমাগমে, যখন জলরাশি অপসৃত ও স্রোত-বেগ মন্দীভূত হয়, তখন আপনা হইতেই মলরাশি নিম্নগামী হইয়া, গঙ্গার বিশাল বক্ষকে স্ফটিক প্রান্তর করিয়া তুলে। এবং তখনই ধবল সৌধ শ্রেণী, ও ফুলফল শোভিত বিচিত্র তরুরাজি, এবং গ্রহতারকখচিত অনন্তাকাশ, তাহার বক্ষে ফুটিয়া উঠে।

অসমাহিতচিত্তে বাসনা-স্রোতের প্রাবল্য সত্বে, সকলি মলিন ও বিকৃত এবং বিশ্বজননীর ক্রোড় মধ্যেও আমরা চির অন্ধ। অতএব লালসার খর্ব্বতা ও চিত্তবেগ প্রশমন ব্যতীত হৃদয়ব্যাপী স্বপ্রকাশ-সমাগম অসাধ্য। সুতরাং ধর্ম্মের সমুদয় বাহাড়ম্বরই অসার ও পণ্ডশ্রম মাত্র।

৫

ভিক্ষুগণ কোন না কোন বুলি ধরিয়া ভিক্ষা করে। কেহ বলে **"মালীক সীতারাম"**; কেহ বা বলে, **"জয় রাধা-কৃষ্ণ"**। মুসলমান রাজত্ব কালে দিল্লীর কোন মুসাফেরের বুলি ছিল—**"খোদা দেনে কেয়া বড়া বাৎ।"** ভগবান্ যে, এ দীনকে দিবেন, তাতে আর বিচিত্র কি। এই বুলি ধরিয়া তাহার যে লাভ হইত, তাহাতে জীবন ধারণের অবশ্য প্রয়োজনের ব্যাঘাত হইত না।

অপর একের কৌশল কিন্তু ভিন্নরূপ। সে দেখিল, খোদার উপর মাদা দিয়া বড় জোর ভাত কাপড়েরই সংস্থান হইতে পারে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। সুতরাং ওবুলি না ধরিয়া, সে এই চিৎকার আরম্ভ করিল—**"বাদশা দেনে কেয়া বড়া বাৎ।"** অর্থাৎ বাদশা যে গরিবকে দান করিবেন, এতে আর আশ্চর্য্য কি! প্রথম ফকীরকেও সে এই বুলি ধরিতে পরামর্শ দিল। কিন্তু সে এ চতুরালিতে কর্ণপাত না করিয়া, নিজের বুলিই বলিতে থাকিল—**"খোদা দেনে কেয়া বড়া বাৎ।"**

প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য, তখনকার রাজারা ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেন। সামান্যরূপ পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক রজনী যোগে পথিমধ্যে বাদশাহ সেই প্রথম ফকীরের চিৎকার শুনিলেন,—**"খোদা দেনে কেয়া বড়া বাৎ!"** উজীর বলিলেন, ঐ ভিক্ষুক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, খোদাকে ডাকিতেছে। শুনিয়া বাদশাহ নিরবে চলিয়া গেলেন। অনতি-বিলম্বে অপর ব্যক্তির বুলি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল,—**"বাদশা দেনে কেয়া বড়া বাৎ।"** উজীর বলিলেন, এই ফকীর আপনার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। রাজাজ্ঞা হইল, ইহাকে লক্ষ মুদ্রা দান করিও। যেন অন্যথা না হয়।

দুর্ব্বল মানবের তোষামোদ কারীর প্রতি বাদশাহের পক্ষ-পাত দেখিয়া উজীর অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু প্রভুর আদেশ অলঙ্ঘনীয়। পরদিন প্রত্যূষে লক্ষ মুদ্রার পরিমাণ মণিমাণিক্য সুকৌশলে এক তরমুজ মধ্যে প্রবিষ্ট করিলেন এবং স্বয়ং ভেটবাহী হইয়া ফকীরের কুটিরদ্বারে উপনীত হইলেন। বলিলেন, সাহেব, এই বাদশাহের উপহার গ্রহণ করুন।

বাদশাহের প্রসাদস্বরূপ তুচ্ছ একটী তরমুজ আসিয়াছে দেখিয়া অবোধ ফকীর ছদ্মবেশী উজীরের অবমাননা পূর্ব্বক, সেই রত্নগর্ভ ফল পথপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। প্রথম হইতেই মন্ত্রীর এই ধারণা হইয়াছিল যে, এই ছলনাপূর্ণ সংসারেও অকপট ঈশ্বর পরায়ণেরই শেষ জয় লাভ হইয়া থাকে। তিনি কৌতূহল বশতঃ দূরে অবস্থান করিলেন। দেখিলেন, সেই প্রথম ফকীর নিজ বুলি বলিতে বলিতে, চলিয়া যাইতেছে। সংসার চতুর দ্বিতীয় ফকীর তরমুজটী প্রদান পূর্ব্বক, ব্যঙ্গস্বরে তাহাকে বলিল, এই নে, তোর খোদা তোকে এই ভিক্ষা দিয়াছে। এ বিদ্রূপের কারকোপ সে কিছুই বুঝিল না। কিন্তু কৃতজ্ঞ হৃদয়ে খোদাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। শেষ দেখিবার জন্য মন্ত্রী ও তাহার অনুসরণ করিলেন।

সে হৃষ্টচিত্তে যেমন তরমুজটী কাটিল, অমনি প্রচ্ছন্ন মণি-মাণিক্য বাহির হইয়া পড়িল। দেখিয়া সে ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইল। মন্ত্রী অগ্রসর হইয়া বলিলেন, ভয় করিও না, আমি উজীর, সত্যই বলিতেছি, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, স্বয়ং খোদা এই ধন দান করিয়াছেন, গ্রহণ কর। এবং ঐ বুলি, **"খোদা দেনে কেয়া বড়া বাৎ"** তোমার চিরসম্বল করিয়া রাখ।

বাদসাহ মন্ত্রী সহ ভ্রমণ করিতে করিতে সেই কথাই আবার শুনিলেন—**"বাদশাহ দেনে কেয়া বড়া বাৎ"** তখন সরোষবচনে মন্ত্রীকে বলিলেন, তুমি আমার হুকুম তামিল কর নাই? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, আমি সত্যই তাহা করিয়াছি। রাজা অধিকতর কুপিতভাবে বলিলেন, যদি প্রমাণ করিতে পার ভালই, নতুবা প্রাণদণ্ড হইবে। আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা রাজ সমক্ষে প্রকাশ পূর্ব্বক, মন্ত্রী ফকীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি বাদসাহের উপহার তোমাকে প্রদান করি নাই? ফকীর বিদ্রূপচ্ছলে উত্তর করিল, হাঁ করিয়াছ। কিন্তু সে অমূল্য ধন আমি অপর ফকীরকে দিয়াছি। তখন বাদশাহের ক্রোধ শান্ত হইল।

এই ধর্ম্মরাজ্যে, কাঙ্গাল ফকীর বই আমরা আর কিছুই নই। আমাদের একমাত্র সম্বল—**"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"** সেই সর্ব্বান্তর্যামী দীনদয়াল রাজরাজেশ্বর আশীর্ব্বাদ করুণ, যেন ধর্ম্মের নামে চতুরালি পূর্ব্বক, লোক রঞ্জন প্রভৃতি নীচ স্বার্থ-সাধনোদ্যমে বিরত থাকিয়া, দিন যামিনী কেবল তাঁহারই অপার করুণার জন্য চিৎকার করিতে পারি। কারণ সমস্ত ছল চাতুর্য্য জাল ছিন্ন করিয়া, অন্তে তাঁহারই কৃপা জয়লাভ করে।

দুগ্ধের প্রতি পরমাণুতেই নবনীত প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু বিনা ক্লেশে কে কোথায় তাহা লাভ করিতে সমর্থ হয়? দুগ্ধের উষ্ণতা হরণ পূর্ব্বক বারংবার মন্থন কর, তরল জলমাত্র নিম্নে রাখিয়া, সার পদার্থ ভাসিয়া উঠিবে।

এই পাপ শরীর পর্য্যন্ত ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ। অন্তরের গর্ব্বিতে উন্মত্ত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাক, কুত্রাপি তাঁহার ঘৃণাক্ষরও দেখিতে পাইবে না। বালকের জুজুব অমূলক কল্পনা ব্যতীত, কোন সন্ধানই মিলিবে না।

কিন্তু প্রাণের গর্ব্বি, এই অহংভাব দূর করিয়া কঠোর সাধন কর, অগ্নিশিখা যেমন জলন্ত কাঠের প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া দীপ্তি পায়, দেখিবে, সেই স্বপ্রকাশ পূর্ণব্রহ্ম তেমনি চির প্রকাশবান্! তখন চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হইয়া, এ সংসারকে জাগ্রত ব্রহ্মের বিশাল মন্দীর স্বরূপে দেখিতে পাইবে।

দুটীর কেবল প্রয়োজন। গরিমাশূন্য অকিঞ্চনভাব এবং গভীর অনুসন্ধান বা সরল প্রার্থনা।

৭

এ অসার জীবনে যদি কিছু সার থাকে, সে সার তিনি। এ কুৎসিত জীবনে যদি কিছু সৌন্দর্য্য থাকে, সে সৌন্দর্য্য তিনি, এ মৃত জীবনে যদি কিছু উৎসাহ থাকে, সে উৎসাহ তিনি, তিনি প্রাণ মন কায় তিনি বিনা আমি অবস্তু।

অষ্টাদশ বৎসর তাঁহাকে বাহিরে মনে করিয়া এস এস বলিয়া আহ্বান করিয়াছি, এখন তাঁহার কৃপায় দেখিতেছি, যে জন্মাবধি তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। তিনি দূরে আছেন কল্পনা করিয়া, এক দিন কত ক্লেশ পাইয়াছি, নিকটে যাইবার জন্য কত আয়োজন করিয়াছি, এখন তিনি বুঝিতে দিয়াছেন, যে প্রাণের সঙ্গে তিনি অহর্নিশি জড়িত হইয়া রহিয়াছেন।

বাহিরের উপাসনা বাহিরের প্রার্থনা ও বাহিরের ধর্ম্মের অসারত্ব এখন বুঝিয়াছি, এখন প্রাণে এই ইচ্ছা হইয়াছে, যে হৃদয়ের ভিতর গোপনে গোপনে প্রাণ বস্তুকে বক্ষে রাখি ও নিত্য ধনের সঙ্গে নিত্য যোগের মধুরতা সম্ভোগ করি।

৯ই মাঘ বুধবার।

অদ্য প্রাতঃকালে মন্দিরে ব্রাহ্মিকা সমাজের উৎসব হয়। এজন্য ব্রাহ্মগণ সিটিকালেজ গৃহে উপাসনার্থ সম্মিলিত হন। প্রথমতঃ সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইয়া পরে উপাসনা হয়। কটক হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও মহাশয় অদ্যকার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনাতে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন তাহার ভাব এই রূপ।

"পরম সুন্দর চিত্রকর আজ আমাদের সম্মুখে দুইটী ছবি ধরিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী গ্রহণীয় তাহা প্রাণের ভিতরে বিচার করিয়া লইতে হইবে। একটী জড়ের সন্তান, আর একটী ব্রহ্মের সন্তান। জড় সংসারের উপাসক জড়ের মায়ায়, আসক্তিতে একেবারে নিমগ্ন। একটী জড়-সর্ব্বস্ব-প্রাণ। আর একটী বাহিরের সমস্ত চাকচিক্য বিস্মৃত হইয়া আত্মার ভিতর কি দেখিয়া হাসিতেছেন। একটী বিষয়ের মায়া-জালে বদ্ধ হইয়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র যাহা তাহাতে আবদ্ধ। অন্যটী মুক্তাকাশে পাখীর মত বিচরণ করিতেছেন। কোন শৃঙ্খল তাঁহাকে বাঁধিতে পারিতেছে না। প্রভাতে ভরত পক্ষীর গান শুনিয়াছি, কিন্তু ভিতরের মানুষ ভিতরে কি অমৃত ধন পাইয়া যে গান করেন তাহার নিকট উহা কি? আমরা এই দুই ছবির কোন্‌টীকে আদর্শ করিয়া জীবন গঠন করিব? সংসারের বহির্বিষয়ে লিপ্ত, অন্তরের ভাবের প্রতি উদাসীন। সংসার বিষে জর্জ্জরিত, বিষয়াসক্ত, সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র প্রাণকে সেই দিকে যাইতে দিব? না সেই ব্রহ্মসন্তান, অমৃত-সন্তানের দিকে চাহিয়া প্রাণকে সেই রূপে গঠিত করিব? এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতায় পড়িয়া মানুষ বাহিরে আবদ্ধ। ভিতরের দিকে দৃষ্টি করে কয় জন? ভিতরের দিকে যত দিন দৃষ্টি না পড়িবে ততদিন মানুষের দেবত্ব স্ফূর্ত্তি পাইবে না। যত দিন বাহিরেই সমস্ত আশা প্রোথিত রাখি, তত দিন প্রাণ কি যে হলাহলময় হয় বলিতে পারি না। প্রাণের ভিতরে সমস্ত শক্তি শুকাইয়া যায়। পশু অপেক্ষা হীন হই! জড়ের মত নিশ্চল হই। অন্য দিকে গেলে দেখি সমস্ত সহজ হইয়া উঠে। প্রাণের ভিতরে উৎসব আরম্ভ হয়। বলি, এরূপ আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া সেই ক্ষুদ্র কারাগারে নিজকে কি নিক্ষেপ করিব? এই দুইখানি ছবি নিত্য আমাদের নিকট উপস্থিত হইতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন্ ছবি লইয়া উপস্থিত? যাহা নশ্বর, তাহা, না যাহা অমৃত ব্রহ্মসন্তানের ছবি? ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না যে আমরা ব্রহ্মসন্তান। ঐ যে ব্রহ্ম আমাদের প্রাণের ভিতর থাকিয়া ডাকিতেছেন। "যাই" বলিয়া আমাদের প্রত্যেকের প্রাণ তাহার জবাব দিতেছে। ব্রহ্মসন্তান আমরা, কত উচ্চ অধিকার আমাদের। আমরা কেন নরকের গভীর আবর্ত্তে ডুবিতে যাইব? ব্রাহ্মসমাজ এই সংবাদ প্রদান করিতেছেন, আমরা জড়ের সন্তান নহি, অমৃত পুরুষের সন্তান, তাঁহার বাণী আমাদিগকে সর্ব্বদা ডাকিতেছে, তাঁহার বাণী শুনিয়া প্রাণ পাগল হইয়া ব্রহ্মোৎসবে ছুটিতেছে। আমরা সকলে ব্রহ্মসন্তান, কিন্তু আমরা এই সত্য কতক্ষণ প্রাণে পুষিয়া রাখি? এক মুহূর্ত্ত যদি এই সত্য প্রাণে ধারণ করি, সহস্র মুহূর্ত্ত সংসার সেবক রূপে ক্ষেপণ করি। ভারতসন্তান জড়ের উপাসক, জানিত না কতউচ্চ অধিকার তাহার। ব্রহ্মতত্ত্ব এক্ষণে ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমায় এই ব্রহ্মসন্তান ভারতসন্তান ব্রহ্মসন্তান হইবে, এই মহা সংবাদ প্রচারের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয়। জাতিভেদ বর্ণভেদ-পূর্ণদেশে এই সত্যের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করিবে? সাম্যবাদ ইহার মন্ত্র। বন্ধুগণ, কত বড় সত্য আমাদিগের নিকট উপস্থিত, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি। ইহার মধ্যে পৃথিবীর সমস্ত আশা ভরসা নিহিত. তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি। এই পথে গেলে পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল হইবে, ভারতের দুঃখ দূর হইবে। আমি ব্রহ্মসন্তান ইহা যিনি প্রাণে বুঝিতে পারেন তিনি ধন্য। আমরা কি ইহা

বুঝিতে পারিয়াছি, বোধ হয় না। আমাদের ভেদাভেদ গেল না। বঙ্গবাসী ধন্য, এদেশে প্রথমে ব্রহ্মনাম উদ্বোধিত হইয়াছে, নর নারী নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মসন্তান হইবেন। বঙ্গবাসী ভাই, যে সত্য আপনি পাইয়াছেন, তাহা ভাল করিয়া প্রচার করেন না কেন? এখনও বুঝি আপনাদের প্রাণে ব্রহ্মসন্তানত্বের প্রতি আস্থা হয় নাই? এখনও প্রাণ বহির্ব্বিষয়ে আকৃষ্ট রহিয়াছে। কবে আমরা সেই মোহ হইতে পরিত্রাণ পাইব। ভারত ব্রহ্মপুত্র দেখিয়াছে। ব্রাহ্ম কন্যা দেখিবার আশা করিতেছে। কবে সে দিন হইবে; আমরা সে দিনের জন্য প্রার্থনা করি। নারী যখন আপনাকে ব্রহ্মসন্তান জানিয়া নূতন সত্য প্রচার করিবেন, তখন ব্রাহ্মধর্ম্ম জয়যুক্ত হইবে। বঙ্গদেশে নাকি রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মসন্তানের আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, আমরা দুর্ভাগ্য নহি, এদেশে কত ব্রহ্মসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য কত ব্রহ্মসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই সাধু সজ্জনদিগকে প্রাণে রাখিয়া তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া আমরা ব্রহ্মসন্তান তীর্থের দিকে গমন করি। আমরা সকলে ব্রহ্মসন্তান। কাল বলিয়া, মূর্খ বলিয়া, ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া কি কাহাকেও ঘৃণা করিতে পারি? আর নারী জগতের জননী, ব্রহ্মকন্যা, তাঁহাকে কি প্রাণ হইতে দূর করিতে পারি?

আমি আর কি বলিব? আমি দীন হীন, ব্রহ্মসন্তান দেখিবার আশা করিয়া আসিয়াছি। বঙ্গদেশের চরণে নমস্কার করি, এখানে ব্রহ্মসন্তানত্বের নিশান উড়িয়াছে। বঙ্গদেশের জননী, ভারতের জননী, ব্রহ্মাণ্ডের জননীর চরণে নমস্কার করি।"

অদ্য অপরাহ্নে মন্দিরে বালকবালিকা-সম্মিলন হয়। চারি শতাধিক বালকবালিকা উৎসবে সমবেত হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৩½ ঘটিকার সময় সংগীত ও প্রার্থনা হইয়া তাহাদের উৎসবের কার্য্যারম্ভ হয়। বালকবালিকাগণের সংগীত অতি সুন্দর এবং প্রীতিপ্রদ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি বালকবালিকাগণকে উপদেশ প্রদান করেন। তৎপর প্রীতি-ভোজন হইয়া তাহাদের উৎসবের কার্য্য শেষ হয়।

অদ্য সায়ংকালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ১২শ বার্ষিক অধিবেশন হয়। সংগীত ও প্রার্থনার পর কার্য্যারম্ভ হয়। এই অধিবেশনের বিশেষ বিবরণ পরে প্রকাশ করা যাইবে।

১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

এই দিনে আমাদিগের প্রিয় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য অদ্য প্রাতঃকালে উপাসক মণ্ডলী বিশেষ ভাবে মন্দির-প্রতিষ্ঠার উৎসব সম্পন্ন করেন। অতি প্রত্যুষেই উৎসবের কার্য্যারম্ভ হয়। প্রথমতঃ সংগীত, সংকীর্ত্তন হইয়া পরে উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ দেন তাহার সারমর্ম্ম এই—

"বার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের অবস্থা কি ছিল? একবার সকলে স্মরণ করুন, আমাদের প্রাণের প্রিয় দেবতার উপাসনার স্থান ছিল না। উপাসকগণ পূর্ব্ব উপাসনার স্থল হইতে তাড়িত হইয়া কেমন নিরাশ্রয় অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। এখানে ওখানে একত্র হইয়া কিরূপে তাঁহারা প্রসঙ্গ করিতেন? কি নিরাশ্রয় দরিদ্র অবস্থা তখন ছিল: ঈশ্বরোপাসকগণ সুদিন লাভের জন্য কত অশ্রুপাত করিয়াছেন। সেই অশ্রুপাতের ফল কি ফলে নাই? দীন হীন দুঃখহারী বিপদকাণ্ডারী কি মুখ তুলিয়া চাহেন নাই? নতুবা এই প্রসস্ত সুন্দর গৃহ কিরূপে হইল? মন্দির সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হইয়া মস্তক উন্নত করিয়া আজ ইহা কাহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে? দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু যে দয়া করিয়া আমাদের প্রাণের আশা পূর্ণ করিয়াছেন, আশাতীত দান আমাদের উপর বর্ষণ করিয়াছেন, অন্যে বলুক না বলুক উপাসকগণ তোমারা কি ইহার সাক্ষ্য দিবে না? এই ১২ বৎসরের মধ্যে কৃপাময় পরমেশ্বর কত কৃপা আমাদের উপর বিধান করিয়াছেন, আমরা কি তাহা গণনা করিতে পারি? না, তাহার করুণার পরিমাণ করিতে পারি? আমাদের সেই প্রথম পরীক্ষার সময় গিয়াছে, যখন আমরা নিতান্ত নিরাশ্রয় দীনহীন হইয়া গরীব লোকের ন্যায় বেড়াইয়াছি,—দীনবন্ধু সেই পরীক্ষার দিন তো বেশী দিন থাকিতে দেন নাই। ডাকিতে না ডাকিতে, বলিতে না বলিতে প্রাণের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া সব ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই ত এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি হইয়াছে, তাই ইহার সকল প্রকার গঠন প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে। তাই এতলোক আমাদের গৃহ পূর্ণ করিয়াছেন। তাই আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের কাজ সম্পাদনের জন্য অনেক উপায়, সুবিধা হইয়াছে। তাই আমাদের প্রতিকূল যে সকল অবস্থা ছিল কোথা হইতে আশ্চর্য্য কৌশলে সে সকল তিরোহিত হইয়াছে। অসাধ্য যে সাধন হয়,—অসম্ভব যে সম্ভব হয়,—মানুষের শক্তিতে নয়, কিন্তু সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের অঙ্গুলী সঙ্কেতে। সুস্পষ্ট রূপে আমাদের মধ্যে এই ১২ বৎসর কি তাহা দর্শন করি নাই? এই গৃহ তাঁর করুণার জাজল্যমান্ সাক্ষী। ইহার দিকে চাহিয়া কোন্ উপাসক অবিশ্বাসী হইয়া থাকিতে পারেন? এই গৃহের প্রত্যেক ইষ্টক খণ্ড, প্রত্যেক উপকরণ ঐ সুন্দর চূড়া আজ সেই করুণাময়ের করুণার সাক্ষ্য দান করিতেছে, তাঁর যশঃ ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু এই গৃহের উদ্দেশ্য কি পূর্ণ হইয়াছে? একটী সামান্য গৃহ হইলে আমাদের চলিতে পারিত। ঈশ্বর করুণা করিয়া এমন সুন্দর স্থানে এত বড় গৃহ কেন দিলেন? এত লোক চারিদিক হইতে ডাকিয়া কেন এখানে আনিলেন। এত সুবিধা, অনুকূল অবস্থা কেন দিলেন? তাঁহার স্বর্গের উপাসক পরিবার, প্রেম পরিবার এখানে বাস করিবে, তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিবে, তাঁহার সেই জীবন্ত সত্তা স্পর্শ করিয়া প্রাণ পাইয়া জীবন্ত ভাবে তাহার কাজ করিবে, এই জন্য। তাঁহার সেই ইচ্ছা কি পূর্ণ হইয়াছে? ঈশ্বরের দান অনেক সময় মানুষের নিকটে অযাচিত ভাবে—অনেক সময় ভক্তের প্রার্থনাতে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই দানের উপযুক্ত ব্যবহার না করিলে বড় অপরাধী হইতে হয়, তাঁহার সেই দানের সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। স্বর্গের দান যেমন

করিবার জন্য, অবহেলা করিবার জন্য নয়। যেখানে তাহা হইয়াছে, সেখানেই ঘোর দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বর যথার্থই ধন দিয়া মন বুঝেন। এই বাহিরের সংসারে দেখিতে পাই, পরমেশ্বরকে না ডাকিয়াও কতলোকে ধন ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিতেছে। কিন্তু সেই ধনদাতাকে কয়জন স্মরণ করে? সেই দাতার ইচ্ছার উপযুক্ত ব্যাবহার কয়জন করিয়া থাকে। তাঁহার ধন পাইয়া, সংসারের লোক গর্ব্বিত হয়, আত্মগরিমা প্রকাশের চেষ্টা করে। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই ধনের অপব্যবহার করিয়া তাঁহাকে ক্লেশ দেয়। কৃতঘ্নের কাজ করিয়া মহাপাপে মগ্ন হয়। ধর্ম্ম রাজ্যের মধ্যে কি এ দৃষ্টান্তের অভাব আছে? তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে বলিয়া ঈশ্বর স্বর্গের দান ধনরত্ন আমাদের হাতে আনিয়াছেন। কিন্তু অনেক সময় সেই ধন পাইয়া আমরা কি পৃথিবীর ধনীদের ন্যায় গর্ব্বিত হইয়া উঠি না? সেই ধনের দ্বারা কি আত্মগৌরব প্রকাশের প্রয়াসী হই না? সেই ধনের অপব্যবহার করিয়া ধনদাতার অভীষ্টের ব্যাঘাত করি না? ঘোর কৃতঘ্নের কাজ করিয়া মহাপাপে ডুবি না? যদি তাহা না হইত, তবে আমাদের এত দুর্দ্দশা রহিত না। এত অজস্র তাঁর দান, তথাপি আমাদের অবস্থা এত হীন, এত মলিন, এত নিরাশকর কেন? আমরা তাঁর দানের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানি না। আমরা তাঁহার নিকট এক ভাবে অতি কাতর, দীনহীন হইয়া অনেক অঙ্গীকার ও প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া তাঁহার নিকট চাই। কিন্তু যখন তিনি তাহা দেন, সে কথা ভুলিয়া যাই। আমাদের তখন অন্য ভাব হয়। অহঙ্কারী হইয়া পৃথিবীর লোকের মত ঈশ্বরের দানের অপব্যবহার করি। পরমেশ্বর ইহুদী গ্রন্থে Jealous God বলিয়া উক্ত হইয়াছিল। ভক্তের নিকট তাঁহার কামনা ভিন্ন অন্য কোন কামনা তিনি সহ্য করিতে পারেন না। তিনি তাহাতে অসহিষ্ণু। তিনি তো কোন দলের বা জাতির মুখ অপেক্ষা করেন না। যুগে যুগে ধর্ম্ম সমাজের ইতিহাসে আমরা ইহাই দেখিতে পাই, যথার্থ ঈশ্বরোক্তি এই—"যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ" ঈশ্বরের দান পাইয়া আমরা তাহার বড় প্রিয় হইয়াছি, চিরদিন তিনি আমাদিগকে আদর করিবেন, এইরূপ দান করিবেন, এই ভাবিয়া যদি নিশ্চিন্ত থাকি, নিশ্চয় আত্মপ্রতারিত হইব। যে ইহুদী জাতি ঈশ্বরের প্রিয়জাতি হইয়া অনেক দান পাইয়া আত্মগৌরবে স্ফীত হইয়াছিল, তাহাদের আজ কি দুর্দ্দশা? সকল ধর্ম্মসমাজের মধ্যে এইরূপ দেখিতে পাই, ঈশ্বরের দান লইয়া যাহারা আত্মগৌরবের চেষ্টা করে, তাহাদেরই দুর্দ্দশা হয়। আর যেখানে বিনীত, দরিদ্র, গরীব লোকেরা তাঁহার দিকে তাকায়, তাঁর স্বর্গের কৃপা সেখানে অবতীর্ণ হয়। তাই বলিতেছি ভাই ভগিনীগণ আমরা তাঁর বড় প্রিয় হইয়াছি সত্য, তিনি আমাদের প্রতি অনেক কৃপা দেখাইয়াছেন,—অনেক করুণার দান বর্ষণ করিয়াছেন সত্য,—কিন্তু ইহা লইয়া খেলা করিলে হইবে না। ইহার উপযুক্ত ব্যবহার করিতে হইবে। সেই যে নিরাশ্রয় ব্যাকুল অবস্থায় তাঁর নিকট কাঁদিয়া ছিলাম, সেই ভাব প্রাণে রক্ষা করিয়া আত্মগৌরবের ভাব হৃদয় হইতে দূর করিতে হইবে। তাঁহার মহিমা স্বীকার করিয়া চিরকাল গরীব হইয়া তাঁহার সেবা করিব। পৃথিবীর লোককে তিনি ধন দেন, তাঁহার দীন সন্তানদের প্রতি দয়া প্রকাশের জন্য। তাহাতে ধনাধিকারী এবং দীন দুঃখী উভয়েই কল্যাণ লাভ করে। ঈশ্বর যাহাদিগকে মহামূল্য দান করেন, তাহাদিগের প্রতিও এই আদেশ। নিজেরা ধনী হইয়া সুখী হইয়া গর্ব্বিত হইও না। কিন্তু দীন দুঃখীর সন্তান যে যেখানে আছে লইয়া আইস, তাহাদের দুঃখ দূর কর। এই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে না পারিলে তিনি আবার ধন হরণ করিবেন। আবার আমাদিগকে ঘোর দুর্দ্দশায় পড়িতে হইবে। তিনি কিরূপে দেন জানি না,—কিরূপে নেন তাহাও জানি না। তাঁহার সকল কার্য্য আশ্চর্য্য অভাবনীয়। আজ উপাসকগণ এই নিরাপদ গৃহ লাভ করিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ব্রতী হউন। এই গৃহ উপাসকপরিবারের জন্য। আজও সে পরিবার সংগঠন হয় নাই। কতকগুলি লোক এখানে আসেন, কিয়ৎক্ষণের জন্য যেন সম্পর্ক—পর পর ভাব। এরূপ ভাবে কি পরিবার হইতে পারে? পরিবারের মধ্যে পর ভাব নাই। পৃথিবীর পরিবারে পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী যেখানে বাস করেন, ঘরকে কেমন আপনার বলিয়া ভাবেন, পরস্পরকে কেমন আপনার বলিয়া ভাবেন। একজন অন্য এক জনের জন্য পরিশ্রম করিতে ক্ষান্ত হন না, আত্মসুখ বিসর্জ্জনে কুণ্ঠিত হন না, বরং অন্যকে সুখী করিয়া নিজে সুখী হন, অন্যের দুঃখে ম্রিয়মাণ থাকেন। সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী এইতো আত্মীয়ের লক্ষণ, আপনার পরিচয়। আমাদের এই উপাসকগণকে সেইরূপ পরিবার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া আপনার হইতে হইবে। এই জন্য কৃপাময় পরমেশ্বর এ মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া ডাকিয়াছেন। আমাদের সম্পর্ক কি ক্ষণকালের জন্য, শিথিল ভাবে বাহিরে চলিবার জন্য? পৃথিবীর পরিবারের সম্বন্ধ বরং আমৃত্যু। কিন্তু ঈশ্বরের উপাসক পরিবার অনন্তকালের জন্য। আমাদের সম্বন্ধ ঐহিক রক্ত মাংসের নয়। কিন্তু যে অমৃত পুরুষ আমাদের সকলের প্রাণ হইয়া আছেন, তাহার সঙ্গে যুক্ত হইয়া অনন্তকালের জন্য সংযুক্ত। অনন্ত পথের সহযাত্রী, অনন্ত সাধনে প্রবৃত্ত। এমন আপনার আর কে হইতে পারে? এমন চিরকালের জন্য সম্পর্ক আর কোথায় হইতে পারে? হায় হায়, আমরা পরস্পরকে চিনিলাম না। কিসের যোগ, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। উপাসক ভাই ভগিনী আপনার হয় না, একজনের সুখে আর একজন সুখী হয় না, একজনের দুঃখে আর একজন দুঃখিত হয় না, একজনের অশ্রুপাতে আর একজন অশ্রু ফেলে না। এই ভাবে কি পরিবার গঠন হইতে পারে? ঈশ্বরের পরিবার স্থাপন হইতে পারে? বড় সতর্ক হইবার প্রয়োজন,—তিনি যে পরিমাণে দান করিতেছেন,—অপরাধের ভার সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই জন্য বড় ভয় হয়। ধৈর্য্যশীল পরমেশ্বর প্রতীক্ষা করিয়া দেখেন. আরও দেন, কিন্তু অবশেষে যখন দেখেন মানুষ দানের অপব্যবহার করিল, তখন সেই স্বর্গের দানের পথ বন্ধ করেন। আবার মানুষের অহঙ্কার যখন চূর্ণ হয়, মস্তক ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হয়, চক্ষু অশ্রু বর্ষণ করে, তখন সেই পথ খুলিয়া দেন। আমাদের এই গৃহ লাভ করিয়া

বড় গুরুতর কর্ত্তব্যভার আমাদের উপর পড়িয়াছে। উপাসক পরিবার সংগঠন করিতে হইবে। ১২ বৎসর সময়ের মধ্যে ভাল করিয়া ইহার সূত্রপাত হইল না। ঈশ্বর কতদিন আর প্রতীক্ষা করিবেন, ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিবেন? এস ভাই ভগিনীগণ এস, তাঁর করুণার ভার অনুভব করি, আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের অপরাধের ভারও অনুভব করি। আর নিশ্চিন্ত থাকিয়া অপরাধের ভার বৃদ্ধি করিও না। আলস্য জড়তা ছাড়িয়া পশু প্রকৃতি পরিহার করিয়া ঘৃণা অশ্রদ্ধা পরিত্যাগ করিয়া এস, কাঁদিতে কাঁদিতে দীননাথের চরণে পতিত হই। এস আমাদের অপরাধ ভঞ্জন করি। সেই কৃপাময়ের জয় হউক্ বলিয়া তাঁহার চরণে ক্রন্দন করি। তাঁহার কৃপার সাহায্য আবার ভিক্ষা করি, তাঁহার কৃপা সম্ভোগ করিয়া তাঁহার দয়ার উপযুক্ত হই।"

ক্রমশঃ

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ

পিরোজপুর।

পরমমঙ্গলালয় পরমেশ্বরের কৃপায় নিম্নলিখিত প্রকারে পিরোজপুর ব্রাহ্মসমাজের একষষ্টিতম মাঘোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

৯ই মাঘ বুধবার—সায়ংকালে সমাজ-গৃহে উৎসবের উদ্বোধন হয়। বাবু মহিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন।

১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার—প্রত্যূষে ঊষা কীর্ত্তন হয়, পরে সমাজ-গৃহে উপাসনা হয়, বাবু রজনীনাথ সমদ্দার আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "উৎসবের সময়ে সতর্কতা" বিষয়ে উপদেশ দেন। সায়ংকালে মন্দিরে উপাসনা হয়, বাবু বামনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "আধ্যাত্মিক জীবনের জমা খরচ" বিষয়ে উপদেশ দেন।

১১ই মাঘ শুক্রবার—সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব হয়। প্রাতে উপাসনা হয়, মহিম বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "উপাসনাই আত্মার অন্ন পান" বিষয়ে উপদেশ দেন। পরে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যক্তিগত উপাসনা হয়, তৎপরে মধ্যাহ্নে উপাসনায় বামন বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন। পরে আলোচনা ও কীর্ত্তন হয়। সায়ংকালে উপাসনা হয়, রজনী বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম আশানুরূপ প্রচার হইতেছে না কেন?" এই বিষয় অবলম্বন করিয়া উপদেশ দেন এবং অবশেষে "আমি কি সরল ভাবে সত্য পথ অন্বেষণ করি?" "সত্য বুঝিতে পারিলে আমি কি তাহা পরম আদরে গ্রহণ ও নির্ভয়ে সর্ব্বত্র স্বীকার করি?" এবং "আমি কি সত্য পালনে সর্ব্ববিধ স্বার্থ ও সুবিধা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত?" এই তিনটী প্রশ্ন দ্বারা সকলকে নিয়ত আত্ম রক্ষা করিতে অনুরোধ করেন।

১২ই মাঘ শনিবার—ছাত্রসমাজের উৎসব। প্রাতে ঊষা কীর্ত্তন, পরে সমাজে উপাসনা হয়, বামন বাবু উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং "জীবন-জ্যামিতি" "সংসার সমুদ্র ও দিগ্দর্শন" "ঘড়ির চাবি ও উপাসনা" এবং "ক্ষুদ্র ছিদ্র ও নৌকা" এই চারিটী বিষয় অবলম্বনে ছাত্রদিগকে অতি সুন্দর চারিটী উপদেশ দেন। অপরাহ্নে বালেশ্বর নদীর তীরে প্রার্থনা ও প্রীতিভোজন হয়, পরে তথা হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে সায়ংকালে সকলে সমাজ-গৃহে প্রত্যাগত হন। রাত্রে সমাজ-গৃহে রজনী বাবু "ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ লক্ষ্য কি?" বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

১৩ই মাঘ রবিবার—প্রাতে সমাজে উপাসনা হয়, বামন বাবু উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন, এবং "সদুপদেশ জীবনে প্রতিপালন করা উচিত" এ বিষয়ে উপদেশ দেন। অপরাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন, রাত্রে সমাজে উপাসনা হয়, মহিম বাবু আচার্য্যের কার্য্য করেন এবং "একমাত্র ব্রাহ্মধর্ম্মই মানবজাতির অবলম্বনীয় ধর্ম্ম" বিষয়ে উপদেশ দেন। তৎপর প্রীতিভোজন হইয়া এই দিনেই উৎসব শেষ হয়।

উৎসবের কয়দিন সমাগত অন্ধ, আতুর ও খঞ্জ প্রভৃতি উপার্জ্জনাক্ষম ব্যক্তিদিগকে কিছু কিছু পয়সা বিতরণ করা হয়।

কাঁথি।

মাঘোৎসব উপলক্ষে কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্য কলিকাতা গমন করায় এবৎসর কাঁথি ব্রহ্ম মন্দিরে মাঘোৎসব উপলক্ষে কেবল ১০ই মাঘ রাত্রে, ১১ই মাঘ প্রাতে ও রাত্রে এবং ১২ই মাঘ প্রাতে পরব্রহ্মের উপাসনা হইয়াছিল। ১২ মাঘ অপরাহ্নে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ পাঠ, আলোচনা ও মন্দিরে কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

প্রেরিত পত্র

(পত্র প্রেরকের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকার সম্পাদক

মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু *—

মহাশয়!

গত ১৬ই মাঘের তত্ত্বকৌমুদীতে "ব্রাহ্মসমাজ" শীর্ষক স্তম্ভে "লোক সংখ্যা গণনায় ব্রাহ্ম" নামক প্রস্তাবে আপনাদের পত্রপ্রেরকের পত্রের উপর নির্ভর করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের অত্যন্ত ভ্রম হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ পাইতেছে। কারণ আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে মফস্বলে যে পত্র প্রেরিত হয়, তাহার মর্ম্ম এই যে আদি ব্রাহ্মসমাজের মতে (principle) যাঁহারা বিশ্বাস করেন, কেবল তাঁহাদিগকে—সকল ব্রাহ্মকে নহে—"অপৌত্তলিক হিন্দু নহে" কিন্তু "একেশ্বরবাদী হিন্দু" নামে পরিচিত হইবার জন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয় অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। ইহাতে আপনাদের পত্রপ্রেরক মহাশয় পত্রখানি না পাঠ করিয়াই হউক বা পত্রখানির মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই হউক দুইটী গুরুতর ভুল করিয়াছেন। ১ম মফস্বলের ব্রাহ্ম সাধারণকে নহে কেবল আদি ব্রাহ্ম সমাজের মতে যাঁহারা বিশ্বাস করেন কেবল তাঁহাদিগকে। ২য় "অপৌত্তলিক হিন্দু" নহে কিন্তু "একেশ্বরবাদী হিন্দু" বা "হিন্দু ব্রাহ্ম নামে। "অপৌত্তলিক হিন্দু' ও "একেশ্বরবাদী হিন্দু এই দুই কথার তফাৎ এই যে "অপৌত্তলিক হিন্দু বলিলে তাহার সহিত নাস্তিককেও বুঝাইতে পারে, আর "একেশ্বরবাদী হিন্দু বলিলে তাহার মধ্যে নাস্তিককে বুঝায় না। যাহাহউক পত্রপ্রেরক মহাশয়ের এই ভ্রম পূর্ণ সংবাদের উপর নির্ভর করিয়া আপনার পত্রিকাতে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা আমার বিবেচনায় উচিৎ বলিয়া বোধ হয় না। এক্ষণে আশা করি আমার এই পত্র খানি তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

নিবেদন

শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন

* কুঞ্জ বাবুর কথাদ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে ভুল আমাদিগের নয়। যদি কোন ভুল হইয়া থাকে তাহা আমাদের পত্র প্রেরকের হইয়াছে। কুঞ্জ বাবু যে কথার অনুবাদ একেশ্বরবাদী হিন্দু করিয়াছেন, পত্রপ্রেরক সেই কথার অনুবাদ করিতে "অপৌত্তলিক" হিন্দু করিয়াছেন। সুতরাং এ ভুলের জন্য আমাদিগকে দায়ী করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নয়। আমরা পত্রপ্রেরকের কথায় বিশ্বাস করিয়া যে কোন অপরাধ করিয়াছি তাহাও মনে হয় না। কারণ পত্রপ্রেরক যাহা লিখিয়াছিলেন অবিশ্বাস করিবার কোন হেতুই তাহাতে বিদ্যমান ছিল না। তঃ সঃ

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা।

১৩শ ভাগ।
২২শ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৴১০

একষষ্টিতম মাঘোৎসব।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১০ই মাঘ বৃহস্পতিবার।

অদ্য অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন হয়। বেলা ৪ ঘটিকার পর সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইবার সময় নির্দ্দিষ্ট ছিল। তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই মন্দিরে সংকীর্ত্তনের দল সমবেত হইতেছিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া পটলডাঙ্গা গোল দীঘির ধারে সমবেত হইলেন। তথায় বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বোম্বে হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত সদাশিব পাণ্ডুরাং কেলকার, শ্রীযুক্ত লছমন প্রসাদ, এবং খাসিয়াপাহাড় হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ, বাঙ্গালা, হিন্দী ও খাসিয়া ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তৎপর প্রার্থনান্তে গায়ক দল দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, সারকুলার রোড, মেছুয়াবাজার রোড, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইয়া মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক উপাসনা হইল।' কীর্ত্তনের দল সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যখন স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ভবনের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন কেশব বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু করুণাচন্দ্র সেন মহাশয় বিশেষ আগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন দলকে তাঁহাদের বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গনে লইয়া যান। এবং ফুল ও গোলাপজল দ্বারা কীর্ত্তন দলের প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করেন। তৎপরে কীর্ত্তনের এক দল শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভবনেও গমনপূর্ব্বক কীর্ত্তন করেন। কীর্ত্তনের দল মন্দিরে সমাগত হইলে কিছুকাল সংকীর্ত্তনের পর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উপাসনা করেন—উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ দেন তাহার সার মর্ম্ম এই—

"ব্রাহ্মধর্ম্ম এক মহাপরিবার স্থাপনের জন্য এদেশে আগমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল উচ্চবংশীয় পুরুষদিগের পরিত্রাণের জন্য নয়, কিন্তু ইহা সকলের পরিত্রাণের জন্য। কোন কোন ধর্ম্ম এক শ্রেণীর লোককে যে অধিকার দেয়, অপর শ্রেণীর লোককে সেই অধিকার দিতে প্রস্তুত নয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম এমন সংকীর্ণ নয়।—পরম দয়াল বিধাতা ব্রাহ্মধর্ম্ম এই জন্য দিয়াছেন যে ইহার ছায়ায় সকলেই সুশীতল হইবে! লোকে বলে যাহারা হিন্দুজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মেরা তাহাদিগকেই গ্রহণ করিতেছে। যে নিম্ন বংশে জন্মিয়াছে সে যেন আর মস্তক উত্তোলন করিতে না পারে। তার যেন আর উন্নতি না হয়। না—বিশ্বজননীর ধর্ম্ম এরূপ নয়। পৃথিবীর যত ঘৃণিত জাতি সকলকেই ব্রাহ্মধর্ম্ম বক্ষে ধারণ করিবে। এখানে সকলেই স্থান প্রাপ্ত হইবে। লোকে যাহা বলে বলুক। আমরা সকলে মিলিয়া এক প্রেম পরিবার হইব। এ কেমন পরিবার? পরিবার তো সকলেই দেখিয়াছি। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসেন, স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসেন, পুত্র কন্যাগণ পিতামাতাকে ভক্তি করে, পিতামাতা তাহাদিগকে স্নেহ করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যে পরিবার স্থাপনের জন্য আসিয়াছেন,তাহা কি এইরূপই হইবে? তাহাতে কি বিশ্বজননী স্বয়ং কর্ত্রী হইবেন না? মনুষ্য মাত্রে ভাই ভগিনীরূপে তাহাতে বাস করিবে, জাতের বিচার থাকিবে না। সন্তান পিতা মাতাকে যেমন ভালবাসে, আমরা সকলে পরমেশ্বরকে তেমন ভাল বাসিব। পরমেশ্বর এ সংসারে পিতারূপে বর্ত্তমান থাকিবেন, আমরা সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিব। আর যত লোক এই ব্রাহ্মধর্ম্মে আসিবেন, সকলকে ভাই ভগিনীর মত ভাল বাসিব। দুষ্ট ভাই কি হবে না? দুষ্ট ভগিনী কি হবে না? সংসারে কি এরূপ দৃষ্টান্ত নাই? যে ভাই কৃতঘ্ন, ভাইকে ভাল বাসে না, ভাইএর সর্ব্বনাশ করিতে চায়, দুষ্ট ভাই বলিয়া তাহাকে কি কেহ প্রেম দেয় না? তবে আমরা কেন এখানে প্রেম দিব না? পরিবার স্থাপন করিতেই হইবে, এখানে যদি কেহ দুষ্ট ভাই থাকে, বুকে শেল বিদ্ধ করে, সর্ব্বনাশ করে, সেও ত ভাই, এক মায়ের সন্তান, তবে তাহাকে ভালবাসিব না কেন? এই জাতি-বিদ্বেষ পূর্ণ দেশে যাহারা হীন জাতি বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাদের কত দুর্দ্দশা! কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর তাহাদিগকে অগ্রে বসাইবেন। যাহারা জাতির অভিমান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দিবেন। এক মহা পরিবার স্থাপনের জন্য পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা কি এই উদ্দেশ্য সম্যক্ বুঝিয়াছি? সকলে প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই প্রশ্ন করুন। যদি বুঝিয়াছি,

তবে ঐ যে অনাহারে, রোগে কত ভাই কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের খবর লই না কেন? ব্রাহ্মদের এই দুর্ণাম হইয়াছে, যে যাহারা এখানে আসে, আমরা তাহাদের খবর লই না। গুরুতর অপরাধ হইয়াছে, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। আর এরূপ করিব না, এই প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। নতুবা উৎসব দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিব না। যাহারা ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা জানিয়া শুনিয়া, প্রাণে পাপ পোষণ করিয়া উৎসব দ্বারে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যদি সহানুভূতির অভাব হইয়া থাকে, তবে ঈশ্বরের প্রেম পরিবার স্থাপনের মহাশত্রু আমরা। ওই যে ভাইটী দুরবস্থায় পড়িয়া পাপ করিয়াছে, আমরা যে তাহাকে ঘৃণা করি,—ঘৃণা করিবার কি অধিকার আছে? পরমেশ্বর আজ কৃপা করিয়া চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, তাই মনে হইতেছে,—"ঘৃণা করিবার কি অধিকার আছে?" যে ভূমিশয্যায় পড়িয়া আছে, তাহাকে কোথায় উঠাইব, না পদাঘাত করিতেছি! ইহাতে কি প্রেম পরিবার সংস্থাপন হইবে। আমরা তো তাহাই করিতেছি। যে একবার পতিত হইল,—শতজন তাহার বুকের উপর দণ্ডায়মান হই। আমরা পরস্পরকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেছি। এরূপে প্রেমপরিবার হইবে না। আমাদের অনেক অপরাধ হইয়াছে, এই জন্য প্রেমপরিবার হয় না। আজ দেখিয়াছি ঈশ্বরের কৃপায় কি হয়। আজ যে রাস্তা দিয়া আসিবার সময় যাঁহাদিগকে মনে করিয়াছিলাম, যে আমাদিগকে ঘৃণা করেন, তাঁহারা কি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদিগকে সমাদর করেন নাই? তাঁহারা আমাদিগকে ডাকিয়া লইয়াছিলেন। ঈশ্বরের কৃপায় এমনি হয়। কেবল আমরা বাধী হইয়া সুখের পরিবার স্থাপন করিতে দিই না। এ মহা পরিবার কিরূপ হইবে? ঈশ্বর উপাস্য দেবতা হইবেন। আর আমরা যত নরনারী ভ্রাতা ভগিনী সকলে মিলিয়া প্রাণের ভিতর তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিব। প্রতিদিন ভক্তিভরে তাঁহার পূজা করিব। ঘরে ঘরে আনন্দের রোল উঠিবে। মরণ থাকিবে না, শোক তাপ থাকিবে না। যেখানে বিশ্বজননীর জাগ্রত পূজা হয়, সেখানে কি আর মরণ থাকিতে পারে? আমরা জীবন্ত হইব। পুত্র কন্যাগণ কিরূপ হইবে? তাহারা যাহাতে ব্রহ্মের আস্বাদ পায়। পিতা মাতা জন্মের পূর্ব্ব হইতে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। স্তন্যপানের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ব্রহ্ম নাম পান করিবে। আর কি হইবে? আমরা কেউ রিপুর গোলামী করিব? না। রিপুর দ্বারাই তো বিবাদানল প্রজ্জ্বলিত হয়, অশান্তিতে সংসার ছারখার হয়। এখানে রিপুগণ কি হইবে? সাহায্যকারী হইবে। সোনার সংসারে যতলোক আসিয়াছে, কেহই বাদ যাইবে না; বালক, যুবক, বৃদ্ধ বুঝিবে—আমাদের জীবন প্রেমপরিবার স্থাপনের জন্য। এ কি আমোদ প্রমোদের জন্য, খেলার জন্য? না—এখানে আমরা প্রাণ দিতে আসিয়াছি। আমাদের মধ্যে যাহারা হিংসা বিদ্বেষ করি, পাপের গোলামী করি, আজ তাহাদের প্রায়শ্চিত্তের দিন। কারণ আমরা না মরিলে, তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণ হইবে না। এই জীবন দিলে যদি জীবন পাওয়া যায়, তবে কেন না দিব? আমরা দেখিয়াছি ধানের বীজ না মরিলে গাছ হয় না। আমাদের এই পাপ প্রাণ যতদিন না মরিবে, ততদিন কিছুই হবে না। এই প্রাণের মধ্যে কাম ক্রোধ প্রভৃতি কত রিপু আছে! যতদিন ইহারা না মরিবে, ততদিন কিছু হইবে না। আমরা গাইয়াছি ব্রহ্মের জয় হউক। কোথায় ব্রহ্মের জয় হইবে?—শূন্যে—? না আমাদের প্রাণে। কামের উপর—ক্রোধের উপর—ইচ্ছার উপর—আমার জীবনের উপর, ব্রহ্মের জয় হউক। আমার বাসনা ধ্বংস হউক। ভাই, ভগিনী মরিতে কি ভয় হয়? তবে জানিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছার মহাবিদ্রোহী আমরা। তিনি অনেক কৃপা করিয়াছেন। জাগ্রত জীবন্ত ঈশ্বর এই আমাদের প্রাণের ভিতর। আমাদের সকলের প্রাণে তিনি জয়যুক্ত হউন, তবে ব্রহ্মের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। এই মহাব্রত তবে গ্রহণ করিতে হইবে। সকলে এই প্রতিজ্ঞা করি, প্রাচীন অপবিত্র জীবন বিনাশ করিবই করিব। ঈশ্বরের মহাপরিবার স্থাপন করিতে হইবেই হইবে। আমরা সকলে চল ধরা দিই। প্রাণের অন্তরালে যত পাপ পোষণ করিয়াছি, সব ধ্বংস করি। তাহাতে জীবন ধ্বংস হয় হউক্, প্রাণ পবিত্র হইয়া যাক্। প্রাণে ব্রহ্মনামের জয় হউক। এইরূপে মহাপরিবারে প্রবেশ করি। ঈশ্বর স্বয়ং সেনাপতি হইয়া আমাদিগকে চালাইয়া নিবেন। গণ্ডীর ভিতর আর থাকিব না। এ পাপটী ছাড়িব ও পাপটী ছাড়িব না, এরূপ করিব না। ব্রাহ্মসমাজকে পবিত্র স্থান জানিয়া এখানকার প্রেম, পুণ্য, নিষ্ঠা, ভক্তি, দেখিয়া সমুদয় হৃদয় আকৃষ্ট হউক। মহারাজা পরমেশ্বরের বিরোধী হইয়া যেন আমরা না থাকি। মহোৎসবের প্রারম্ভে সকলেই প্রতিজ্ঞা করি, সকল পাপ ভস্ম করিব। তিনি কোটী হাতে প্রেমের অন্ন বিলান। কিন্তু আমাদের দশা কি সমাধিস্থানের মত হইবে? সমাধিস্থান যেমন উপরে মর্ম্মর প্রস্তর খচিত ভিতরে দুর্গন্ধ, আমাদের দশা কি তাই হইবে? দুর্গন্ধ শব হইয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিব? না—আমরা শব হইয়া থাকিব না। আমরা পবিত্র হইয়া যাইতে চাই। বাহিরে ঈশ্বরকৃপার হিল্লোল যেমন প্রবাহিত হইবে, অন্তরেও সেইরূপ হইবে। যাহাতে পরমেশ্বরের পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার চেষ্টা করিব। বিধাতা সকলকে আশীর্ব্বাদ করিবেন।"

১১ই মাঘ শুক্রবার।

এই দশদিন ব্যাপী উপাসনা প্রার্থনায় উৎসবক্ষেত্রে মঙ্গলময়ের অশেষ করুণার পরিচয় পাইয়া, উপাসকবৃন্দ ক্রমে মহোৎসবের প্রধানদিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই কয়দিন নানা স্থানে নানা ভাবে তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া উপাসকবৃন্দ যেন আরও অধিকতর ক্ষুধিত ও ব্যাকুলিত হইতেছিলেন। তাই দশই মাঘের রাত্রি শেষ হইবার পূর্ব্বেই মন্দির লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। রাত্রি ৪ ঘটিকার পরক্ষণ হইতেই মধুলুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় ব্রহ্ম-প্রেম-পিপাসু ব্যাকুল আত্মাগণ ক্রমে ক্রমে মন্দিরে মিলিত হইতে লাগিলেন। উৎসবের প্রারম্ভ হইতে এই কয়দিন যেন তাঁহার কৃপার মেঘ সকল একত্রিত হইতেছিল।

ক্রমে ঘনত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ব্যাকুলাত্মাগণের প্রার্থনার সূত্র ধরিয়া অদ্য একবারে প্রবল ধারায় সকলের প্রাণকে ভাসাইয়া লইতে আসিল। রাত্রির অন্ধকার শেষ হইতে না হইতেই সংগীত, সংকীর্ত্তন হইতেছিল। ক্রমে সূর্য্যালোক প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, মধুকরের ন্যায় লোলুপ উপাসকবৃন্দ ব্রহ্ম-প্রেম সুধাপানে বসিয়া গিয়াছেন। এইরূপে যথা সময়ে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক উপাসনার উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইলেন। উদ্বোধনের প্রথম হইতেই ব্যাকুল আত্মাগণের ভক্তি-উচ্ছ্বাসে মন্দির যেন কম্পিত হইতেছিল। ক্রমে সংগীত ও সংকীর্ত্তনের সহিত আরাধনা শেষ হইলে, আচার্য্য যে উপদেশ প্রদান করিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—

"ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে নানকের কয়েকটী সুমধুর সংগীত আছে। সেই সকল সংগীত অতি উচ্চভাবে পরিপূর্ণ। তাহাতে পাষাণ-প্রাণ দ্রব হয়। পঞ্জাবে গুরুদরবারে গম্ভীরাকৃতি প্রশস্ত ললাট বিশালবপুঃ বৃদ্ধ শিখ গায়কগণ বীণা, রবাব সহকারে বাবা নানকের সেই সকল সংগীত যখন গান করিতে থাকেন, তখন তাহা যিনি শুনিয়াছেন, তিনি উহার আস্বাদ কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন, নানকের একটী সংগীতের পদ এইরূপ—

"তুমেরে ওঠ বল, বুদ্ধি ধন তুম্‌হি
তুমেরে পরিবার।"

অর্থাৎ বাবা নানক ঈশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে প্রভুজী তুমি আমার ঢাল, তুমি আমার বল, বুদ্ধি ও পরিবার।" এই সমুদয় উচ্চ উচ্চ কথা আমরাও অনেক সময় ব্যবহার করি সন্দেহ নাই। কিন্তু বাবা নানকের মুখ হইতে যখন এই কথা উচ্চারিত হইয়াছিল, সেইদিনটী সকলে চিত্রিত করিয়া দেখুন। একজন সামান্য বণিক সন্তান ধন উপার্জ্জন করিতেছিল, লক্ষ লক্ষ লোক যেমন চলে, তেমনই চলিতেছিল। পরমেশ্বর কেমন করিয়া তাহার প্রাণে উদিত হইলেন। বিষয় ভাল লাগিল না; স্ত্রী পুত্র ভাল লাগিল না—নানক ফকির হইয়া বাহির হইলেন; একজন গায়ক সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লোকে হয়ত তাহাকে প্রশ্ন করিত "তুমি ত ধন উপার্জ্জন করিয়া বড় মানুষ হইতে পারিতে, তাহা না করিয়া বীণা, রবাব লইয়া বেড়াও কেন? পথে দস্যু আছে তোমাকে মারিয়া ফেলিবে, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া কেন একাকী বেড়াও? এই সকল কথা শুনিয়া তিনি নিশ্চয় এই সংগীত করিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন। "লোকে বলে আমি অসহায়। তুমি আমার বল; লোকে বলে আমি নির্ব্বোধ, তুমি আমার বুদ্ধি; লোকে বলে আমার আত্মরক্ষার উপায় নাই। তুমি আমার ঢাল।" কত উচ্চ প্রেমের অবস্থায় লোকে ইহা বলিতে সমর্থ হয়। নানক যে তাঁহাকে ঢাল বলিয়াছিলেন ইহা কেমন কথা। পরমেশ্বরকে পিতা, মাতা, বুদ্ধি, সহায়, সম্বল প্রভৃতি বলা যাইতে পারে। কিন্তু "তুমি আমার ঢাল" ইহা নূতন কথা। বাস্তবিক পরমেশ্বরকে সাধুরা ঢাল বলিয়া অনুভব করিয়াছিলেন। যুদ্ধে যাইতে হইলে দুইটী অস্ত্র চাই—ঢাল ও তরবারি। পৃথিবীর সাধুগণ কিসের দ্বারা আত্মরক্ষা করেন। যাঁহারা জগতের ভার লঘু করিবার জন্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোটি কোটি লোকের ক্রন্দন শুনিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন, স্ত্রী পুত্র রাখিয়া জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন—তাঁহারা কোন্ অস্ত্র লইয়া সংসার-যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন? আমরা জানি, তাঁহাদের সকলকে অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, ভয়ানক সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। আপাততঃ মনে হইতে পারে, ভগবানের এ কেমন বিধি? যাঁহারা সাধু, নিষ্কলঙ্ক তাঁহারা এত যন্ত্রণা ভোগ করেন। আর যাহারা তাঁহাকে ভাবে না, পাপের দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করে, সমাজপতি হয়। মহাত্মা ঈশা, সক্রেটীস্, প্রভৃতি ঈশ্বরের চরণে দেহ মন দিবার জন্য উৎসুক হইলেন,—যত দুঃখের বোঝা তাঁহাদের মাথায়। বাস্তবিক সাধুরা দুঃখের বোঝা বহিয়াছেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের কত লোক বড় ধনী হইয়াছিলেন। রামদুলাল, রামকমল কত ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। রামমোহন কি সুখে বাস করিতে পারিতেন না? কেন অপমান, নির্যাতন, কলঙ্কের ডালি মাথায় দিয়া বিধাতা তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন। যাহারা তাঁহাকে ডাকিল না তাহারা সুখে থাকিল, আর যাহারা তাঁহার জন্য প্রাণ দিল তাহাদের এত কষ্ট! ইহাতে কি পরমেশ্বরের অবিচার হইয়াছে?—না। সংসারে কি নিয়ম দেখিতে পাই? যেখানে ভালবাসা সেখানেই বোঝা, চাপ। যেখানে প্রেম ভালবাসা ও বিশ্বাস আছে, সেখানেই বোঝা চাপাইতে সাহস হয়। পরমেশ্বরকে যাহারা প্রাণ মন দিয়াছে তিনি তাহাদের উপরই কাজের ভার দেন। কারণ তাহা হইলে তাহাদের প্রেম ফুটিয়া বাহির হইবে। চারিদিক অনুকূল থাকিলে প্রেম ফুটিবে কেন। এই জন্য সাধুদিগকে ভয়ানক ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। কিন্তু যখন তাহারা সংসার সংগ্রামে, গিয়াছিলেন? তখন তাঁহারা কি প্রকার ঢাল, তরবারি সঙ্গে লইয়াছিলেন। জগতের লোক ইহাদিগকে পাগল বলিত। স্থূলদর্শী সংসারের লোক বুঝিতে পারিত না যে ইহারা যাহা প্রচার করিতেছেন তাহা জয় যুক্ত হইবে। ঈশার জীবনে দেখা যায় তাঁহাকে যখন ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ করিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়, তখন তাঁহার মাথায় king of the Jews লিখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। লোকে উপহাস করিয়া "মহারাজার জয়" বলিয়া প্রণাম করিয়াছিল। এ উপহাসের কারণ কি ছিল? লোকে মনে করিয়াছিল একটা সূত্রধর তনয় কতকগুলি জেলেমালা লইয়া আবার ইহুদীদের রাজা হইবে! তাহারা কি বুঝিতে পারিয়াছিল, যে যীশু কেবল ইহুদীদের নয়, কিন্তু, জগতের রাজা হইবেন?। লোকে তাঁহাকে বাতুল মনে করিয়াছিল, তাহা ত করিবেই। দশজনে যেমন ভাবে, যেমন করে, তেমন না করিলেই বাতুল হইতে হয়—লোকের বিদ্বেষ-ভাজন হইতে হয়। ব্রাহ্মেরা যে লোকের বিরাগভাজন হইতেছে, লেখক যে ইহাদিগের প্রতি এত তর্জ্জন গর্জ্জন করে তাহার কারণ কি? ইহারা কি লোকের সর্ব্বনাশ করে? ইহারা কি মহারাণীর বিদ্রোহী প্রজা, দেশের শত্রু? ইহারা কি পাপের উপদেশ দেয়? সোজা কথা এই, দশজনে যাহা বলে, দশজনে যাহা করে, ইহারা তাহা করে না। দশজনে

বলে, বিশ্বাস থাকুক্ না থাকুক্—পুতুল পূজা কর, ইহারা তাহা বলে না। দশজনে বলে, নারীদিগকে ঘৃণিত করিয়া রাখ—বালিকাদিগকে মারিয়া ফেল, ইহারা তাহা বলে না। এই জন্য এত নিন্দা, এত তাড়না। ইহাতে যে ব্রাহ্ম ভয় পায়, সে যেন "ব্রহ্মকৃপাহিকেবলং" এই কথা না বলে—"সত্যের জয়" না বলে, —ধিক্ সেই অবিশ্বাসী ব্রাহ্মকে। বিরাগ ভাজন ত হইতেই হইবে, —তাহা পরিত্যাগ করা যাইবে না। দশজনের মত করিতে পারিলে লোকের প্রিয় হইতে পারিতাম, কিন্তু লোকানুরাগ ত উদ্দেশ্য নয়। দশজনে যাহা করে তাহা করিতে পারি না বলিয়াই ত বিরাগভাজন হই। যদি বল দশজনে যাহা করে তাহা করিতে পার না কেন? ইহার উত্তর দিতে পারি না। সত্য বুঝিয়াছি, পরমেশ্বর এইরূপ চলিতে বাধ্য করিয়াছেন, বলিয়া চলিয়াছি। প্রহার করিলে কি হইবে? নির্যাতন করিলে কি হইবে? বৃথা—বৃথা। তবে ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনী, উৎসবের দিনে তোমাদিগের পিঠে আজ ঢাল বাঁধিতে হইবে। কিসের ঢাল? ব্রহ্মনামের ঢাল। তাহাতে লেখা থাকিবে,—

"যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্ শু'নে চলি তোমারি ডাক্" এ মন্ত্র কি লইয়াছ? না "আমার কেউ না যাক্, শুনে চলি ধরারই ডাক্" এই মন্ত্র লইয়াছ? ঈশ্বর মন্ত্র জপিতেছ না পাপের মন্ত্র জপিতেছ? ঈশ্বরের সেবায় প্রস্তুত, না, নিজের সেবায় প্রস্তুত? আমি জানি অনেক ব্রাহ্ম কোন্ মন্ত্র জপেন, "সব থাক্, শুনে চলি ধরার ডাক্।" আমার যেন কোন ক্ষতি না হয়, কেহ বিরক্ত না হয়। সহজে ধর্ম্ম করিয়া যাই। ইহা হবে না। হয় নাই, হইতে পারে না, হওয়া সম্ভব নয়। যদি ধর্ম্ম চাও, ঈশ্বর চাও, এ কথা বলিতেই হইবে—"যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্—শু'নে চলি তোমারি ডাক্। "এ কথার কি উপযুক্ত হইয়াছি? ব্রাহ্মসমাজ যে মলিন হইয়াছে তাহার কারণ আমি বুঝিতে পারিয়াছি—আজও আমরা বলিতে পারি নাই "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শু'নে চলি তোমারি ডাক্।" আজও এ মধুর ডাক শুনিলাম না। হে ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা, ঢাল বাঁধিবে কি? জগতে সংগ্রাম করিব না, ফাঁকি দিয়া, জাল টিকিট দিয়া ধর্ম্ম করিব—হবে না, তাহা হবে না। বুদ্ধ মহম্মদ, খ্রীষ্ট, সকলে বলিতেছেন, "হবে না হবে না।" মফস্বলে কত ব্রাহ্ম নির্যাতন ভোগ করেন, সময়ে সময়ে হয় ত মনে করেন সবই কি পরমেশ্বরকে দিব? তবে যে যায় সব যায়? এরূপ ভাবিলে চলিবে না। আজ প্রতিজ্ঞা করিতেই হইবে। ভাই বলিয়া, আজ পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, ব্রাহ্মসমাজের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিতেছি, আজ প্রতিজ্ঞা করিতেই হইবে। প্রাণ মন ঈশ্বরকে দিতেই হইবে। এস প্রতিজ্ঞা করি। ঢাল বাঁধিতেই হইবে। আমাদের মধ্যে কে ঢাল বাঁধিয়া দিবে? এ ঢাল মানুষ বাঁধিতে পারে না। শুনিয়াছি স্পার্টা দেশে বীরজননীগণ বীরপুত্রদের পৃষ্ঠ দেশে ঢাল বাঁধিয়া দিয়া বলিতেন, হয় জয়ী হইও, নতুবা মরিও।' আজ মার কাছে যাইয়া আমরা বলি "ঢাল বেঁধে দাও—যে যায় যাক্" লোকে বলিবে ইহারা বাতুল হইয়াছে, এত অল্প লোক কি করিবে, আমি বলি ঐ ব্রহ্ম কৃপার নিশান পবনহিল্লোলে উড়িতেছে। জগৎ জয় হইবেই হইবে। স্পার্টার জননী যেমন বলিতেন হয় জয়ী হইও না হয় মরিও, জগৎ জননী সেরূপ বলিবেন না, তাঁহার নিকট "হয়, নয়" নাই। তিনি বলিবেন—জয়। যত আঘাত করিবে অমনি ঢাল ফিরাইয়া ধরিব। যত গালি দিবে, নিন্দা করিবে ততই বলিব—"যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক্।" কি মধুর ডাক্, নিরাকারের ডাক্, তোমরা কি শুনিয়াছ? কি রকম ডাক? কোন্ কানে শুনা যায়? শুনিয়াছ কি? যদি না শুনিয়া থাক, অপেক্ষা কর। নিশ্চয় তিনি ডাকেন। কর্ত্তব্য যা বুঝিব, করিব। বাহিরের চক্ষু অন্ধ করিয়া, কর্ণ বধির করিয়া, তিনি যে কর্ত্তব্য দেখান তাহাতে ডুবিব। জগতের লোকে বলিবে—"এদের বাপ মা কে আছ, ধর না, এরা যে মরিল, পুড়িল।" বলিতে না বলিতে ব্রাহ্ম ব্রহ্মচরণে ডুবিল। ধন গেল মান গেল যশ গেল, নির্যাতন কষ্ট পেয়ে লোকগুলি গেল। ওগো যাই, আশীর্ব্বাদ কর, আশীর্ব্বাদ কর—ভাল ক'রে যাই। যাইতে পারি নাই বলিয়াই ত সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আমরা যাই; ঢাল বাঁধি পিঠে, যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্ শুনে চলি তোমারি ডাক্। কে আছিস্ অস্ত্র নিক্ষেপ কর্। ঐ যে ব্রহ্মনামের ঢাল পিঠে বেঁধেছি আমরা মরিব না। এমন যদি কিছু ভিতরে থাকে, যাহার জন্য ঢাল বাঁধা যায় না, তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। আজ ব্রহ্ম দুই দল করিয়াছেন। কে কোন্ দলে যাবে ঠিক্ কর। এস সকলে বলি আমরা এই দলে যাইব। দেখ জগতের দলে কত লোক—কত বি, এ, এম্, এ, রাজা, মহারাজা, ওগো ব্রাহ্ম, তোমরা ঐ দলে যাবে? এই গরীব, হতভাগাদের দলে যাবে না? ব্রাহ্ম, যাও, যাও; এখনও হয় নাই। এখনও চক্ষু খোলে নাই। যাও, স্ত্রী পুত্র লইয়া সুখে থাক। আর যে ব্রাহ্ম প্রস্তুত আছ, এস ব্রহ্মের ঢালের দলে। ব্রাহ্ম ভাই, ব্রাহ্মিকা ভগিনী, চল আজ জগজ্জননীর নিকট যাই। আজ যে যাবার দিন; আজও কি যাবে না? এমন উৎসবের দিন, ভক্তসঙ্গ ত আর পাবে না। এমন দিনেও কি একথা বল্‌বে না,—"যে যায় যাক্ যে থাকে থাক্, শুনে চলি তোমারি ডাক্?" তবে যে বঞ্চিত সকলে হয়। একবার বিশ্বাসী হও, ঈশ্বরের চরণে সকলে সাহস কর। মানুষের কথায় কি সাহস হইবে, স্বয়ং জগতের রাজা বলিতেছেন। তবু বলি ভয় পাইও না। অসহায় বলিয়া ভয় পাইও না। জলুক্ সোণার অক্ষরে, "যে যায় যাক্, যে থাকে থাক্ শুনে চলি তোমারি ডাক্।" তবে সকলে এই ঢাল পরি। এমন বলশালী কেহ হয় না। আজ কি মা ঢাল বাঁধ্‌বেন না? করুণার ঢাল বাঁধিয়া জগতে প্রেরণ করিবেন না? এস, বিশ্বাসের সহিত প্রার্থনা করি, অন্তরের সহিত প্রার্থনা করি। সকলে যোগ দাও, প্রার্থনা দ্বারা ভাইয়ের কাজ কর।"

উপদেশের পর সংগীত সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। তৎপর উপাসকগণ আহারাদির জন্য কিয়ৎকালের নিমিত্ত মন্দির পরিত্যাগ করিলেন। তখন অনেকে নির্জ্জন উপাসনায় নিমগ্ন হইলেন। কিছুকাল এ ভাবে গেলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ হইতে লাগিল।

এরূপে আবার বেলা ১ টার সময় মাধ্যাহ্নিক উপাসনা আরম্ভ হইল। বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। উপাসনান্তে তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সার এইরূপ—

"বিশ্বাসীরা ফলাফল চিন্তা না করিয়া, সত্যানুসরণ করেন। তাঁহারা এরূপ না করিলে জগতে সত্যের প্রতিষ্ঠা হওয়া সুকঠিন হইত। ঈশ্বরের সত্য কখনও মারা যায় না, কিন্তু নর-নারীর মধ্যে যে তাহা কার্য্যকরী হয় বিশ্বাসীরাই তাহার কারণ। এই ১১ই মাঘ এক জন বিশ্বাসীর কার্য্যের ফল। তিনি এই দিনে মহাসত্য জগতকে দিয়াছেন; এনিমিত্ত অদ্য পৃথিবীতে অতি আশ্চর্য্য ও পবিত্র দিন। এখানে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী যদি কেহ উপস্থিত থাকেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এমন দিন কি আর আছে, যে দিনে সকল ধর্ম্মের লোক একত্র হইয়া উৎসব করে? হিন্দুর পর্ব্বে মুসলমান যোগ দেন না, মুসলমানের পর্ব্বে হিন্দু যোগ দেন না, কিন্তু ১১ই মাঘের উৎসবে বিশেষ কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোকের যোগ দিতে নিষেধ নাই। এই দিনে আমরা পরিত্রাণের সংবাদ পাইয়াছি। আপনারা কি এমন দিন আর পাইবেন? আর সমুদয় উৎসবের দিন বন্ধ হইতে পারে, কিন্তু এই মহোৎসব বন্ধ হইবে না। অল্প লোকেই করুক, আর বহু লোকেই করুক চিরকাল এই উৎসব চলিবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম এক দিন জগৎব্যাপী হইবে, শত সহস্র নর-নারী পরমেশ্বরের উপাসনা করিবে। রাজা রামমোহন রায় যে সত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ফলাফল চিন্তা না করিয়া তিনি তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। অনেকে তাঁহার বিরোধী ছিল, কিন্তু এক্ষণে সেই বিরোধীদিগের সন্তান সন্ততি আমরা পরব্রহ্মের উপাসনা করিয়া কৃতার্থ হইতেছি। অবিশ্বাসীরা ফলাফল ভাবিয়া কিছুই করিতে পারে না। ছয় জনের স্থলে ছয় হাজার হইল—আমাদের প্রাণ কি এখনও বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না? আপনারা যে সত্য প্রাণে পাইয়াছেন, বিশ্বাসীর ন্যায় তাহা প্রাণে প্রতিষ্ঠা করুন এই আমার নিবেদন।"

মাধ্যাহ্নিক উপাসনা শেষ হইলে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইতে লাগিল। বোম্বাই হইতে আগত মিঃ সদাশিব পাণ্ডুরাং কেলকার তুকারামের জীবন ও উক্তি সম্বন্ধে হিন্দীতে ব্যাখ্যা করেন, তৎপর বাইবেল হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা হইল। এইরূপে বেলা পাঁচ ঘটিকার পর আবার সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এবং সন্ধ্যার পর সায়ংকালের উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বেলার উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য করেন, তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এইরূপ—

"যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সঙ্গে থাকিতে চায়। ব্রহ্মভক্ত যিনি; তিনি ব্রহ্ম সহবাস চান। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ব্রহ্মের আবার সহবাস কিরূপে হইতে পারে? তিনি নিরাকার; অসীম, অগম্য, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি—আমরা ক্ষুদ্র কীটানুকীট; তাঁহার সহবাস কিরূপে সম্ভব হয়?

প্রেম দেশকালের অতীত। আমার পাশে যিনি, প্রেম না থাকিলে তিনি লক্ষ যোজন দূরে। যিনি লক্ষ যোজন দূরে আছেন, প্রেম থাকিলে তিনি আর আমি এক স্থানে। প্রেম বিভিন্ন আত্মাকে এক করে; ছোট বড় সকলকে এক করে। তবে যিনি পরম প্রভু, ভক্তের হৃদয়ধন, তাঁহার সঙ্গে ভক্ত থাকিতে পারিবে না কেন? তিনি নিরাকার, তাহাতে কি হইল? সাকারের সহবাস তেমন হয় না, যেমন নিরাকারের সহবাস হয়। ঐ যে পাশে বন্ধু বসিয়া আছেন, তাঁহার ও আমার মধ্যে ব্যবধান কত? দুইটা শরীর কখনও এক হয় না। কিন্তু আত্মায় আত্মায় এক হয়। সেই আরাধ্য দেব কোথায়? স্বর্গ বলিয়া দূরস্থিত কোনও স্থানে? না। তিনি এই খানে, সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে। তিনি মনের ভিতরে, জ্ঞানের ভিতরে, আবার বাহিরে। সাকারোপাসকের ন্যায় আমরা কি অঙ্গুলী দিয়া দেখাইতে পারিব না, "এই আমার ঈশ্বর?" তিনি অন্তরে, বাহিরে। তবে আর সহবাস হইবে না কেন? সহবাস অর্থ কি? সঙ্গে থাকা। এই ত সঙ্গে আছি? আর ত কাহারও সঙ্গে এমন করিয়া থাকি না। বিশ্বাস নাই বলিয়া লোকে বলে, নিরাকারের সহবাস হয় না। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান সকলে বলে পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু একথাটা সকল সময় অন্তর হইতে বাহির হয় না। আমাদের জীবন বলিতেছে, আমরা যে পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলি তাহা প্রাণের কথা নয়, শুষ্ক জ্ঞানের কথা, তর্কের কথা। আকাশে সূর্য্যোদয় হইয়াছে, অথচ জগৎ অন্ধকার ময়, ইহা কি সম্ভব? পরমেশ্বর অন্তরে বাহিরে বিশ্বাস করি, অথচ আপনার দুঃখে মরিয়া যাইতেছি, কুচিন্তায় মলিন হইতেছি, ইহা কি সম্ভব? একজন মানুষ কাছে থাকিতে আমরা পাপ করিতে পারি না, আর সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর কাছে থাকিতে পাপ-চিন্তা করিতেছি, ইহা কি সম্ভব? যে পরিমাণে আমরা পাপী, সেই পরিমাণে আমরা অবিশ্বাসী। বিশ্বাস হইলে সহবাস প্রকৃত হইবে।

মানুষের মধ্যে দেখিতে পাই, যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার অনুকরণ করে। অনেক সময় দেখিয়াছি, ভালবাসা থাকিলে একজন অজ্ঞাতসারে আর একজনের মত হয়। যিনি ভালবাসেন, তিনি তাঁর অনুকরণ করেন। তিনি পবিত্র স্বরূপ —তাঁর ভক্ত দিন দিন পবিত্র হন। জ্ঞান স্বরূপ তিনি—ভক্ত দিন দিন জ্ঞানী হইতে থাকেন। তিনি পতিতপাবন—তাঁহার ভক্ত জগাই মাধাইর উদ্ধার করেন। এই উৎসবের দিনে, ভাই, ভগিনী, বল দেখি, আমরা কি তাঁহার অনুকরণ করিতেছি? আমরা কি জ্ঞানে, পুণ্যে উন্নত হইতেছি? দুঃখী পাপীর জন্য কাঁদিতেছি? তাহা হইলে ব্রাহ্মসমাজের আজ বড় সৌভাগ্যের দিন হইত। আমাদের বড় দুর্দ্দশা—প্রভুর মত হইয়াছি, একথা মুখে আনিতেও লজ্জা করে। প্রভুর কত দয়া, ক্ষমা—ভাবিলে অবাক্ হই। এই রসনা কতবার তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলিয়াছে। কই, রসনা ত আজও স্খলিত হয় নাই। চক্ষু কতবার কুদৃষ্টি করিয়াছে, আজও ত অন্ধ হই নাই। যে হস্ত তাঁহার বিরুদ্ধে—তাঁহার পুত্র, কন্যার বিরুদ্ধে উত্থিত তাহা ত আজও খসিয়া পড়ে নাই। তাঁহার ক্ষমা এইরূপ। আমাদিগকে একজন নিন্দা করুক দেখি। যে ভালবাসে তাহাকে আমরা ভালবাসি। যে আমাকে ভালবাসে না,

তাহাকে ভাল বাসিতে পারি না। একটা নিন্দা সহ্য হয় না। কোথায় প্রভুর অনুকরণ?

ভালবাসার আর এক লক্ষণ, যে যাহাকে ভালবাসে সে তাহার সম্পর্কিত জিনিস ভালবাসে। বন্ধুর বাড়ী, ঘর, সমস্ত ভাললাগে। সাধ্বী স্ত্রী বিদেশস্থ পতির পত্র পাইলে সেই কাগজখানাকেই কত যত্ন করেন? এই জন্য মহাত্মা সেন্টপল বলিয়াছেন, "যে বলে ঈশ্বরকে ভাল বাসি, অথচ মানুষকে ঘৃণা করে, সে মিথ্যাবাদী।" ঈশ্বর-প্রেম ও মানব-প্রেম একই কথা। তবে এই দুই দুইটী কথা কেন বলা হয়? আমরা বুঝি না বলিয়া। ঈশ্বর-প্রেমের মধ্যে মানুষের প্রতি প্রেম, দুঃখীর দুঃখ মোচন, পাপীর জন্য ক্রন্দন, সমস্তই রহিয়াছে। আমরা যে ভাইকে ক্ষমা করিতে পারি না, তাহার কারণ, পরমেশ্বরকে ভালবাসিতে পারি নাই। যীশু বলিয়াছেন, ভাইকে সপ্তগুণ সপ্ততিবার ক্ষমা করিতে হইবে—অর্থাৎ যতবার অপরাধ করিবে, ততবার ক্ষমা করিবে। ইহাই প্রকৃত প্রেম। আমাদের জীবনে উহা কোথায়? কেবল চ'ক্ষের জল ফেলিলেই প্রেম হয় না। দু ফোঁটা চ'ক্ষের জল ফেলিয়া কেহ মনে করিও না, প্রেমিক হইয়াছি। প্রেম অতি সুদুর্লভ ধন—অনেক তপস্যা, সাধনের ফল। চৈতন্য একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "চক্ষের জল আমার সর্ব্বনাশ করিয়া, ইষ্টদেবতার দর্শনের ব্যাঘাত করিতেছে।" ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, প্রেম কি, আর ভাবোচ্ছ্বাস কি।

প্রেমের আর এক লক্ষণ প্রিয় কার্য্যসাধন। ব্রাহ্মসমাজে ইহা পুরাতন কথা। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।" "প্রিয় কার্য্য সাধন" না বলিলেও চলিত, মানুষ বোঝে না, তাই পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। আমরা অনেক সময় নিজের প্রিয়কার্য্য করিয়া মনে করি, তাঁহার প্রিয়কার্য্য করিতেছি। প্রাণের মধ্যে যথার্থ প্রেম হইলেই তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা যায়, নতুবা ভাল কাজ করিলেই তাঁহার প্রিয়কার্য্য করা হয় না। প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থে ধর্ম্মকে, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহা জ্ঞান শাস্ত্রের কথা। ভক্তি শাস্ত্রে কর্ম্মের কথা নাই, সেবার কথা আছে। ভক্ত যখন তাঁহার কাজ করেন, তখন তাঁহার সেবা করেন। এই প্রিয় কার্য্যের একটা দিক্ আছে। মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে, তখন তাহার জন্য আত্মস্বার্থ বিসর্জ্জন দেয়; তাহার জন্য কষ্ট ভোগ করে। সেইরূপ তাঁহাকে যে ভালবাসে, তাঁহার জন্য কষ্ট ভোগ করিতে কি আর তাহার অনিচ্ছা হয়? প্রেম আসিলে আর "সহ্য" কথাটা থাকে না। প্রভুর জন্য যদি কষ্ট পাই, সে আবার কষ্ট কি, ভাগ্য। সহ্য করা কথাটা সংসারের, আর ভক্তের কথা "কষ্ট স্বীকার করিয়া ধন্য হইলাম"। জ্ঞান বলে "সহ্য করিতে হয়।" প্রেমবলে "আনন্দ।" আমরা সুখের সময় তাঁহাকে ডাকি, দুঃখের সময় নাস্তিক হই। অথবা সুখের সময় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকি, দুঃখের সময় ডাকি। এই দুইই মন্দ। আমরা সুখের সময়ও বলিব "ধন্য", দুঃখের সময়ও বলিব "ধন্য"—"এত ভালবাস যে আমাদিগকে কষ্ট দিলে।"

১২ই মাঘ শনিবার।

১১ই মাঘের সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব সম্ভোগ করিয়া উপাসকবৃন্দ যেন আরও অধিকতর ব্যাকুলতার সহিত অদ্যকার প্রাতঃকালের উপাসনায় উপস্থিত হইলেন। সংগীত সংকীর্ত্তন হইয়া উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। উপাসনার পর তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—

"আমরা এখন প্রভুর কাছে আছি বলিয়া বেশ আছি। আমরা যে দুঃখী তাহা কি আর মনে আছে? অন্ততঃ কতক্ষণের জন্য ভুলিয়া গিয়াছি। প্রাণে নবজীবন উঁকি মারিতেছে। মনে ইচ্ছা হচ্চে এবার থেকে প্রভুর চরণে এমন করিয়া দাসখত লিখিয়া দিব যে, আর যেন তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ না করি। মনে কত প্রতিজ্ঞা জাগিতেছে। পাপ, মাথা হেঁট ক'রে ব'সে আছে। ঠিক্ হ'য়েছে। প্রভুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। সাধু সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এ অবস্থা থাকে কতক্ষণ। প্রভু যে বিদ্যুতের মত দেখা দিয়া চলিয়া যান প্রাণে কি বাঁধিয়া রাখা যায় না? সর্ব্বদা মনে এই প্রশ্ন হয়। কিসে প্রাণে উৎসব রক্ষা হয়। উপাসনা, যোগ, ধর্ম্ম রক্ষা হয়। ধর্ম্ম আরম্ভ হওয়া এক কথা, রাখা আর এক কথা। অনন্তকে বাঁধা যায় কি না? অনন্ত—অসীমকে, বাঁধিতে হবে। কোথায়? এই—সীমাবদ্ধ আত্মার মধ্যে। খৃষ্ট বলিয়াছিলেন, পবিত্রাত্মা কিরূপ? বায়ুর মত। কোথা হইতে আসিল, কোথায় চলিয়া গেল, মিনতি করিলেও থাকে না। তাকে কত বলি থাক থাক; থাকে না। বায়ু কি বাঁধা যায়, আকাশবিহারী বিহঙ্গকে কি বাঁধা যায়? তা না হইলে আমার এক দিনের উৎসবে কি হইবে? আমি কেবল সম্ভোগের জন্য চাই না, রাখিবার জন্য চাই। আমি ভাল হইয়াছি, আবার যে মন্দ হইব না বিশ্বাস কি? বলি বামনের গল্প হইতে আমরা কি শিক্ষা করি? যিনি আমাদিগের প্রাণ ব্যাকুল করিয়া চলিয়া যান, তাঁহাকে এক পদে বাঁধা যায়। তাহা সর্ব্বস্ব সমর্পণ। যাঁর বিরহে সমস্ত বিশ্ব অরণ্য মনে হয়, সর্ব্বস্ব দিলে তিনি বশীভূত। সর্ব্বস্ব কি? আমার কি আছে? ধন, জন, গৃহ, শয্যা এ সমস্ত আমার নয়। সাধনা করিব কোথায়? ব্রহ্ম পরিবাররূপে প্রকাশ। এখানেই সাধন করিতে হইবে। পরিবার সমস্ত শিক্ষার ক্ষেত্র। যে শিক্ষা না হইলে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, সেই শিক্ষা এই পরিবাররূপ বিদ্যালয়ে শিখিতে হইবে। ইহা আমার নয় তবে তাঁহাকে কি দিব? আমার আছে পাপ; তাহাই তাঁহাকে দিতে হইবে। যতক্ষণ মনে করিব, তুমি ছাড়া আমার শক্তি আছে, কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, ততক্ষণ পাপ যাইবে না। তাঁহাকে পাওয়া হইবে না। অনেকবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এবার কি তাঁহাকে সর্ব্বস্ব দিতে পারিব? পোষাকী উপাসনা করিলে হইবে না; শোভা সম্ভোগের জন্য চাই না; বাঁচিবার জন্য চাই। কথা আছে যে তাঁহাকে সকল দেয় তিনি তাহাকে সকল দেন। যে সমস্ত ভার তাঁহার উপর দেয়, তিনি

তাহার সমস্ত ভার বহন করেন। ভাল জিনিস তো কিছুই নাই, মন্দ জিনিসগুলিও কি তাঁহাকে দিতে পারিব না? এস সকলে ভগবানের চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করি, আর আপনার হাতে আপনার ভার রাখিব না। চক্ষু কেবল তাঁহাকেই দেখিবে, দেহ তাঁহার হইবে, প্রাণে তিনি বিহার করিবেন।"

অদ্য ১ এক ঘটিকার সময় আবার আলোচনার জন্য সকলে সমবেত হইলেন। ব্রাহ্ম বালকবালিকাগণের শিক্ষাবিষয়েই এ বৎসর আলোচনা হইয়াছিল। আলোচনাকালে অর্থাভাবের কথা বিশেষভাবে অনুভূত হওয়ায় আলোচনা স্থানেই অর্থ সংগ্রহ হইতে থাকে। ব্রাহ্ম ছাত্রী নিবাসের জন্য ২৮৬ টাকার উপর দানাঙ্গীকার প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং আমাদের কোন বন্ধু তাঁহার গায়ের আলোয়ান খানা গাত্রোন্মোচন করিয়া দান করেন। আর একজন একটী অঙ্গুরীয় প্রদান করেন এবং নগদ ২০৻৫, প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আলোচনার পর সায়ংকালে ছাত্র সমাজের উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয় ইংরাজিতে একটী বক্তৃতা করেন, তাঁহার বক্তৃতার সার মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা যাইবে।

বক্তৃতান্তে বঙ্গমহিলা সমাজের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন বসুমহাশয়ের ভবনে একটী সায়ংসমিতি হয়। এই সমিতিতে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও সংগীতাদির সহিত নানা প্রসঙ্গে বিশেষ প্রীতিলাভ করা যায়।

১৩ই মাঘ রবিবার।

অদ্য উৎসবের শেষ দিন—উদ্যান-সম্মিলনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। প্রাতঃকালে সকলে রেলওয়ে যোগে বালিগঞ্জে শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমচাঁদ বড়াল মহাশয়ের বাগানে সমবেত হইলে, প্রথমতঃ সকলে মিলিয়া উপাসনা হইল। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহার সার মর্ম্ম এই—

"নগরের কোলাহল হইতে দূরে নির্জ্জন নিরুপদ্রব স্থানে আমাদের প্রাণের প্রিয়তম ব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীবনের সম্বল করিবার জন্য আমরা এখানে আসিয়াছি। এই যে বৎসর, বৎসর আমরা উৎসব করিয়া থাকি, উৎসবে স্বর্গের ধন কত লাভ করি, উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার কত মহিমা করুণা, ঐশ্বর্য্য, পুণ্যভাবের পরিচয় পাই, উৎসব ক্ষেত্রে যখন থাকি, বোধ হয় যেন স্বর্গ লোকে উপস্থিত হইয়াছি, দেবতা হইয়াছি। কিন্তু বল দেখি যখন এই উৎসবের শেষ হয়, আবার সংসারে প্রবেশ করি, তখন সব হারাই কেন? আবার আমরা যেই মানুষ সেই মানুষই হই, আবার যেন স্বর্গ হইতে নরকে পড়ি। কেন আমাদের এরূপ অবস্থা হয়? ইহার একটী প্রকৃত ব্যাখ্যা আছে, আত্মচিন্তা করিয়া সকলে কি তাহা অবধারণ করিতে পারিয়াছেন? সে রহস্য এই, আমাদের স্বভাব আমাদের প্রতিবাদী। উৎসবে যতক্ষণ থাকি আর এক অবস্থা হয়, কিন্তু আবার যখন সেই পৃথিবীতে যাই, স্ব-ভাব প্রাপ্ত হই। এত যে প্রেমিক হই আবার দেখি আমাদের হৃদয়ের যে অপ্রেমিক স্বভাব তাহাই আছে; এখানে এত বিশ্বাস, শক্তির পরিচয় পাই, মনে হয় ইহা দ্বারা বিশ্বসংসার জয় করিতে পারি, নিন্দা, তাড়না কিছুই গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আবার সংসারে যাইয়া দেখি সব শক্তি চলিয়া গিয়াছে। আবার যে জড় অলস তাই হইয়াছি। এ দুর্গতি হইতে কিসে আমরা পরিত্রাণ পাইব? উৎসবের ১০।১৫ দিন আনন্দ ভোগ করিয়া সম্বৎসর যদি দুঃখে কাটাইতে হয়, তবে এই সুখ ভোগে কি হইবে? আমাদের এই যে হীন নিকৃষ্ট পশু স্বভাব যাহাতে এই জীবনের এত দুর্গতি করে, এই স্বভাবকে পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিলে আর কিছুতেই আমাদের জীবনের পরিবর্ত্তন হইবে না। স্বভাবের পরিবর্ত্তন কিসে হয় বল দেখি ভাই ভগিনী? সাধারণ কথায় বলে "স্বভাব যায় ম'লে"। মরিলে ত যাবেই, কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ততদিন কি ইহার পরিবর্ত্তন হইবে না? মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্ম লাভের অপেক্ষা করিয়া কি থাকিব? "স্বভাব যায় ম'লে" ইহা সত্য। কিন্তু এই মরণ এই জীবনেই সম্ভব। অনেক সাধু মহাত্মা জীয়ন্তে মরা হইয়া, এই স্বভাবকে নষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। জীয়ন্তে মরা অর্থাৎ বাঁচা। সংসারে সব রহিয়াছে, প্রলোভনের বস্তু সকল যাহা আমাদিগকে এত আকর্ষণ করিয়া, পাপে নিয়া ফেলে, মৃত ব্যক্তির নিকট এ সকল কিছু নয়। তেমনি দেখি সাধু মহাত্মাগণ ধনজন সকলে পরিবেষ্টিত হইয়াও মরার মতন। এই সংসারের মলিন শোভা সৌন্দর্য্য তাঁহাদের চক্ষুকে আর মুগ্ধ করিতে পারে না। সংসারের অতীত স্থানে তাঁহারা বাস করেন। আমরা আর তাঁহারা এক স্থানেই থাকি, এক প্রকার অবস্থার ভিতর দিয়াই চলিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহাদের ভাবগতিক এক প্রকার আমাদের অন্য প্রকার। তাহার কারণ স্বভাব বিভিন্ন। কিসে এই স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়, সংসারাসক্তি নষ্ট হয়, পুরাতন মানুষের মৃত্যু নূতন মানুষের জন্ম হয়, একটা নেশাতে। নেশার স্বভাব সকলেই জানেন, নেশা স্বভাবের কেমন পরিবর্ত্তন করে। রাজার সন্তান যখন মাতাল হয়, তখন পথের ধারে নর্দ্দামায় পড়িয়া থাকে। কোথায় তার অট্টালিকা, ঐশ্বর্য্য কিছুই তার জ্ঞান থাকে না। এই নেশা করিয়া কত নীরব লোক বক্তা হয়, জড় প্রকৃতির লোক উৎসাহিত হয়, সামান্য পৃথিবীর মলিন অতি জঘন্য পাপের নেশার এমন শক্তি দেখিতে পাই। এই শক্তির কথাই বলিতেছিলাম। নেশার এই শক্তিতে সব পরিবর্ত্তিত হয়। আমাদের জন্য কি কোন নেশা নাই? আমরা যদি একটা নেশা না পাই, নেশাখোর না হইতে পারি, নিশ্চয় জানিও আমাদের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে না। এই উৎসবের, কয়েক দিন যে এমন হয়, কাজ কর্ম্মের আসক্তি, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলিয়া যাই,—কেন এমন হয়? একটু নেশা পাই বলিয়া। যখন ভক্তগণ একান্ত চিত্তে তাঁহার আরাধনা করেন, কি এক উচ্ছ্বাস সেখানে হয়। ঐ এক নেশা। স্বর্গের সুরা, সুধা যাহা সেই সুধার বর্ষণ হয় সেখানে। যার প্রাণে সেই সুধা একটু পড়ে সেই বিভোর হয়। সেই সুময়ের জন্য প্রাণে যে ভাবোচ্ছ্বাস হয়, উৎসবের সার তো সেইটুকু। সেই নেশাতেই আমাদের

আনন্দ আশ্বাস, ব্রহ্মোৎসব সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু ভাই, ভগিনী, এই নেশা ছুটিলে চলিবে না। এই যে ব্রহ্মনেশা ইহা প্রাণের ভিতর রক্ষা করিতে হইবে। তবে উৎসবে যে অবস্থা লাভ করিয়াছিলাম, সে অবস্থা লইয়া সংসারে বাস করিতে পারিব, কাজ করিতে পারিব, ব্রহ্মের জন্য যথার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে পারিব। ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস পান আমাদের প্রত্যেক দিনের জন্য, জীবনের নিত্য ধর্ম্ম। এই যদি না হয়, তাহা হইলে যে নেশা ছুটিয়া যাবেই। এ সংসার ঘোরতর পরীক্ষার স্থান যথার্থই এখানে পাপাসুরগণ প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কখন আমাদিগকে ব্রহ্মমন্দির হইতে ফিরাইয়া লইয়া যাইবে। তাহারা আমাদিগকে আক্রমণের জন্য লক্ষ্য করিয়া থাকে। প্রাণে যে নেশা পাইয়াছিলাম তাহা যদি না থাকে, দশগুণ বলে আক্রমণ করে। প্রতিহিংসার ভাব সকলেরই আছে। ঐ যে কামক্রোধ প্রভৃতি রিপুদিগকে ফাঁকি দিয়া আমরা ব্রহ্মোৎসবে মাতিয়াছিলাম, উহারা প্রতীক্ষা করিয়া আছে, সুবিধা পাইলেই আবার আমাদিগকে ধরিবে। কিন্তু যদি ভিতরের নেশা রক্ষা করিতে পারি, সাধ্য নাই তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। ব্রহ্মনেশাখোর হওয়া কেহ কি নিন্দার বিষয় মনে করেন? ব্রহ্মনেশাখোর হইয়া যদি সংসারে ত্যজ্য, নিন্দাভাজন হইতে হয়, তাহাতে কেহ কি ক্ষতি মনে করেন? এই তো আমাদের পরম সৌভাগ্য, এই তো আমাদের সাধনের বিষয়। ব্রহ্মনেশায় বিভোর হইতে হইবে। প্রাণের ভিতরে এই সুধার উৎস দেখিতে হইবে। সেখানে চল আমরা এই সুধা পান করি। এই স্বর্গের সুরাতে যেন আমরা প্রাণকে উত্তপ্ত নেশাপূর্ণ করিয়া রাখিতে পারি। এই নেশা রক্ষা করিবার অনেক উপায় সাধুগণ আপনাদের জীবনে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটী ঈশ্বরের নাম সদা সর্ব্বক্ষণ প্রাণে গাঁথিয়া রাখা। "দমে দমে লইও নাম, কামাই নাহি দিও।" প্রত্যেক নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে, প্রত্যেক পলকে এই ব্রহ্মনাম যদি বিশ্বাস, আদর, দরদের সহিত জপ করিতে পারি, এই নাম পরিত্রাণের মূলমন্ত্র ইহা জানিয়া যদি ইহাকে প্রাণের জিনিস করিতে পারি, তাহা হইলে ইহার ভিতরে কি আছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইব। এ নাম সামান্য নয়, ইহার মধ্যে তিনি স্বয়ং বিরাজমান। ঐ যে অনন্ত জ্ঞানের, প্রেমের, পুণ্যের সিন্ধু পরমেশ্বর সচ্চিদানন্দ সাগর এই নাম ধরিয়া তাঁহাকে পাই। এই নামের ভিতরে তিনি জীবন্ত রূপে বর্ত্তমান। এই নাম হেলায় খেলায় লইলে নামাপরাধ হয়। নামের নেশা কি কম নেশা? নিতাই গৌর এই নামের নেশায় সচ্চিদানন্দ সাগরে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। ইহা অতি সহজ সংকেত। জ্ঞানী মূর্খ ধনী দরিদ্র অক্লেশে অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু ভক্তি, বিশ্বাস শ্রদ্ধার সহিত নাম লইলে তবে ইহার ফল হয়, তবে ইহার শক্তি প্রাণে অনুভব করা যায়। এই ব্রহ্মনাম জপ করিয়া, তাঁহার পূজা করিয়া, ব্রহ্মনাম সম্ভোগ করিয়া, আমরা আপনি মাতিয়া জগৎ মাতাইতে পারি। আপনি না মাতিয়া কিরূপে জগৎ মাতাইব! আগে নিজকে মজিতে হইবে। এ নেশা প্রাণে রাখিয়া যাহাতে যাইব, তাহাতেই মত্তভাবে, অনুরাগভরে কাজ করিতে পারিব। জ্ঞানের পথে যাই, ভক্তির পথে যাই, সেবার পথে যাই, সব পবিত্র হইবে। আমরা নবজীবন পাব, পরিত্রাণ পাব। এই নেশা প্রাণে থাকিলে আমাদের কুপ্রবৃত্তি সকল দমন হইয়া ক্রমে নিস্তেজ হইবে। পুণ্যভাব সকল প্রস্ফুটিত হইবে। এই নেশা চাই, এই নেশা চাই। ভদ্রলোকের মত থাকিয়া ধর্ম্ম-ভাবে সংসারে কাজ করা বড় কঠিন। অনেক সময় লজ্জা ভয়, শঙ্কা হয়, লোকে কি বলিবে। প্রকৃতি জড় সড় হইয়া থাকে। এক মাত্র নেশাতে সকল চলিয়া যায়। এই নেশা প্রাণে হইলে ক্রমে দেখা যাইবে প্রকৃতির, স্বভাবের কেমন পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, প্রতিকূল অনুকূল হয়। ভাই ভগিনীগণ আজ আমাদের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের শেষ দিন—আজ আমাদের বিজয়ার দিন। হিন্দুসমাজে প্রথা আছে, অনেকে এই দিনে কিছু কিছু নেশা করে। আমাদের সে বিজয়াও নয়, সে নেশাও নয়। আমাদের দেবতাকে তো আমরা বিসর্জ্জন করি না। আরও ভাল করিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বলি "তুমি আরও ভাল করিয়া ঘরে থাক।" শেষ দিন আমরা এমন করিয়া নেশা লইব যে, সংসারে বিভীষিকা আমাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না। আমরা এই নেশা প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়া এই সুন্দর সত্য পুরুষের শক্তিতে জগৎ পরাজিত দেখিয়া ধন্য হইব।"

সম্মিলিত উপাসনার পর, অনেকে স্বতন্ত্রভাবে কিছুকাল ধ্যান ধারণায় অতিবাহিত করিলেন। তৎপর প্রীতি-ভোজন হইলে সকলে আবার কলিকাতায় প্রত্যাগত হইলেন এবং সায়ংকালে মন্দিরে আবার উপাসনা হইয়া মহোৎসব শেষ হইল। মঙ্গলময় পরমেশ্বর যেমন উৎসবে আমাদিগকে তাঁহার অজস্র করুণার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তেমনই আমাদিগকে সেই করুণার চিরঅধিকারী করিয়া সকলকে কৃতার্থ করুন, এই আমাদের প্রার্থনা। অদ্যকার সায়ংকালের উপাসনায় বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন তাঁহার উপদেশের সার মর্ম্ম এই—,

"আজ তোমাদের মহোৎসবের শেষ দিন। এখন তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের পিতা কি তোমাদিগকে এই মহোৎসবে আনিয়া কিছু দেন নাই? যিনি এত আয়োজন করিয়া স্বয়ং সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন, দূর দেশ হইতে তোমরা কত জন তাঁহার নিমন্ত্রণ পাইয়া আসিলে, তিনি কি সকলকে ডাকিয়া আনিয়া শুধু হাতে ফাঁকি দিয়া ফিরাইয়া দিলেন? না—তোমাদিগকে কিছু দিয়াছেন, নিশ্চয় তোমাদের দয়ালু পিতা তোমাদিগকে কিছু দিয়াছেন, তিনি যাহাকে যাহা দিয়াছেন, যে যাহা পাইয়াছ, তাহাকে মূলধন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হও, জাননা কি, ধনী পিতা আপনার সন্তানদিগকে কিছু কিছু মূলধন দিয়া কি বলেন, তোমাকে যে মূলধন দিলাম ইহা পাইয়া তোমরা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও, ইহা নাড়াচাড়া করিয়া তোমাদের ধন বাড়িয়া যাইবে, তোমরা খুব ধনী হইয়া সুখে থাকিতে পারিবে। পিতার এই আদেশ ও উপদেশ অনুসারে যে সন্তান মূলধন লইয়া ব্যবসা করে, নাড়াচাড়া করে—পরিণামে

সে ধনী হইয়া কেমন সুখে কালযাপন করে, আর যে সন্তান সে ধন লইয়া ব্যবসা করে না, নাড়াচাড়া করে না, অলস হইয়া বসিয়া থাকে এবং তাহাই ভোগ করিতে থাকে, সে যেমন অল্প কাল মধ্যেই মূলধন হারাইয়া ফেলে ও গরীব হইয়া পরে নানারূপে কত ক্লেশই পায়, সেইরূপ এই মহোৎসবের দানকে মূলধন করিয়া যে নাড়াচাড়া করিবে, যে সাধন করিবে, নিশ্চয় এই অল্পধন হইতে কালে সে খুব ধনী হইয়া সুখী হইতে পারিবে। আর যে শুধু ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ইহারই ভোগে আপনাকে নিযুক্ত করিবে, সে অল্পদিন মধ্যেই এই মূলধন খোয়াইয়া শেষে হা হতোস্মি করিবে। তাই আজ তোমাদিগকে বলিতেছি এই মহোৎসবে পিতা যাঁহাকে একটুকু বিশ্বাসের কণা দিয়াছেন তিনি তাহাকেই মূলধন করুন, যিনি একটুকু প্রেমের আলো পাইয়াছেন তাহাকেই মূলধন করুন। যিনি একটুকু সেবার ভাব পাইয়াছেন, তিনি তাহাকেই মূলধন করুন, এই-রূপে যিনি যাহা পাইয়াছেন তাহাকেই মূলধন করুন, আমি জানিনা কে কি পাইয়াছেন, তবে আমার বিশ্বাস সকলেই কিছু না কিছু পাইয়াছেন। যিনি যাহা পাইয়াছেন অল্প বলিয়া দুঃখিত হইবেন না বা উপেক্ষা করিবেন না। এই অল্প মূলধন হইতেই অধিক হইতে পারিবে, যদি তাহাকে লইয়া নাড়াচাড়া করেন, যদি তাহাকে লইয়া সাধন করেন। এখন এই একটী বৎসর সকলে এই দানকে মূলধন করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হউন। যিনি বিশ্বাসের কণা পাইয়াছেন, তিনি তাহাকে লইয়া এক বৎসর কাল সাধন করুন। বিশ্বাস সম্বন্ধে পুস্তকাদি পাঠ করুন, বিশ্বাসী-জীবন আলোচনা করুন, সেই ভাবের উপাসনা ও সেই ভাবের প্রার্থনা করুন। এইরূপে নিষ্ঠার সহিত সাধনে প্রবৃত্ত থাকুন। নিশ্চয় বলিতেছি আগামী বৎসর উৎসবের সময় আসিতে উৎসাহ বাড়িবে, প্রাণে বিশ্বাসের বাতি উজ্জ্বল হইবে; নিজে বিশ্বাসী হইতে পারিবেন এবং পরকে বিশ্বাসের পথে আনিতে পারিবেন। সমুদয় সাধুরা এই রূপেই বড় হইয়াছেন। পিতা হইতে যাহা তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেমন তাহাকে, যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছেন, তেমনই তাঁহারা তাহাকে নানারূপে বাড়াইয়া শেষে ধনী হইয়াছেন। আসুন তবে পিতার দত্ত ধনকে মূলধন করিয়া সকলে নিষ্ঠার সহিত একবৎসর কাল নাড়াচাড়া করি, সাধন করি। দাতার ইচ্ছা ইহা আমাদের দ্বারা রক্ষিত হউক, তিনি যেমন দিয়াছেন, যেমন অযাচিত করুণা-গুণে বিলাইয়াছেন, তেমনি তিনি ইহার রক্ষার জন্য এবং বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করিবেন, সেই দয়ালু পিতার উপর নির্ভর করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হই। পিতা তুমি আমাদের সহায় হও।"

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

কেরী

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কেরীর সৌভাগ্যক্রমে এই দোকানে কয়েকখানি গ্রন্থ ছিল; এই গ্রন্থগুলির মধ্যে নিউটেষ্টমেণ্ট (New Testament) বাইবেল পুস্তকের একখানি টীকা ছিল। কিন্তু এই টীকা গ্রন্থের অনেকস্থলে গ্রীকশব্দ থাকায় কেরী গ্রন্থ খানি স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলেন না। কেরীর মনে গ্রীক শিখিবার জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মিল। তিনি গ্রামস্থ টমাসজোন্স নামক জনৈক গ্রীক ভাষাবিৎ ব্যক্তির নিকট গ্রীক শিখিতে লাগিলেন এবং পিতার সাহায্যেও গ্রীক ভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন, কেরী শিক্ষানবিষ হইয়া প্রথমতঃ যে দোকানে প্রবেশ করিয়াছিলেন তথায় প্রবেশের এক বৎসর পরেই তাহার কর্ত্তা পরলোক গমন করেন। তখন কেরী মিষ্টার ওল্ড (Mr. Old) নামক আর এক ব্যক্তির দোকানে ঠিকা কর্ম্মকারকরূপে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

নিউ টেষ্টমেণ্ট বাইবেল গ্রন্থের সুবিখ্যাত টিকাকার রেভারেণ্ড টমাস স্কট ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য সময় সময় মিষ্টার ওল্ডের বাড়ীতে গমন করিতেন। কেরী তাঁহার নিকট ধর্ম্ম সম্বন্ধে কখনও কখনও দুই চারিটী প্রশ্ন করিতেন। কেরীর দুই চার কথায়ই তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও বিচার শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইত। ধর্ম্মযাজক কেরীর অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাইয়া, বলিয়াছিলেন যে, এই বালক সামান্য ব্যক্তি নন, ইনি ভবিষ্যতে একজন অসাধারণ লোক হইবেন। এই মন্তব্য প্রকাশ করিবার বহুকাল পরে যখন কেরী ভারতবর্ষে আপনার শক্তির পরিচয় দিতেছিলেন, তখন একদিন এই ধর্ম্মযাজক স্কট জনৈক বন্ধুর সহিত বণিক ওল্ডের (Mr. Old) বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময় সঙ্গীয় বন্ধুকে বলিয়াছিলেন, "ঐ দেখ মিষ্টার কেরীর কালেজ।"

বাস্তবিক এইরূপ সামান্য অবস্থা হইতে এমন অসাধারণ পণ্ডিত আর কখনও কেহ হইয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। কেরীর পিতা ও পিতামহ গ্রাম্য ধর্ম্মালয়ের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় কেরী বাল্যকাল হইতেই, ধর্ম্মশিক্ষার সুযোগ পাইয়াছিলেন। মিষ্টার ওল্ডের বাড়ীতে কর্ম্ম গ্রহণের অব্যবহিত পর হইতে তাঁহার ধর্ম্মলাভের আর একটী বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইল। মিষ্টার ওল্ডের বাড়ীতে আর এক ব্যক্তি কর্ম্ম করিতেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান ও সাধুচরিত্র লোক ছিলেন। তাঁহার সঙ্গ লাভ করিয়া দিন দিনই কেরীর ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে যদিও কেহ কখনও কেরীর চরিত্র সম্বন্ধে কোন দোষারোপ করিতে সাহসী হন নাই, তথাপি সাধু জন বাণিয়ানের (John Bunyan) ন্যায় কেরী আপনাকে ঘোর অপরাধী জ্ঞান করিয়া অনেক সময়ে অনুতাপ করিয়াছেন। মিষ্টার ওল্ডের বাড়ীতে কর্ম্ম গ্রহণের সময় হইতেই কেরীর হৃদয়ে বৈরাগ্যের অগ্নি প্রজ্বলিত হইল।

এবং তখন হইতেই মুক্তি প্রার্থী হইয়া তিনি দিবানিশি আপন পরিত্রাণের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি জীবনে জ্ঞাতসারে যাহা কিছু সামান্য অপরাধ করিয়াছেন, তজ্জন্য একদিকে যেমন প্রাণে ভয়ানক অনুতাপের আগুণ জ্বলিয়া উঠিল, অপর দিকে তেমনি অভয়পদ লাভের জন্য প্রাণে গভীর আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইল। তিনি এখন বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত বাইবেল পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় কেরী রবিবারে তিনবার করিয়া উপাসনালয়ে যোগ দিতেন এবং ডিসেন্টার সম্প্রদায়ের ধর্ম্মালয়ে প্রার্থনা সভায় যোগ দিতেন। এখানেই তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। কেরী নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, একদিনে তিনি জীবনের অন্ন লাভ করেন নাই, একদিনে তাঁহার হৃদয়ে সত্যের আলোক প্রতিভাত হয় নাই। অল্পে অল্পে সত্যের আলোকে তাঁহার জীবন-সমস্যা পূর্ণ হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকারও প্রাণের নিরাশা চলিয়া গেল। ঊনবিংশ বৎসর বয়ক্রমকালে তিনি বেদীতে বসিয়া প্রথম আচার্য্যের কাজ করেন। এই অপরিপক্ক বয়সে অনেক লোকেরই ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম বিশ্বাস স্থির হয় না; কিন্তু কেরী এই বয়সেই আপন শক্তি ও জীবনের পরিচয় দিয়া যশস্বী হইলেন। তিনি বাইবেলের কোন একটী কথা ধরিয়া সর্ব্বপ্রথম দিবসে ধর্ম্মালয়ে যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়।

তাঁহার ধর্ম্মভাব ও পারগতায় মুগ্ধ হইয়া নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে আচার্য্য নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনিও তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করেন। আপন শক্তিতে বিশ্বাস ছিল বলিয়াই যে তিনি উক্ত গ্রামের লোকের অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নয়। অস্বীকার করিলে পাছে তাহাদের মনে ক্লেশ হয়, এই চিন্তা করিয়াই তিনি আচার্য্যের পদ গ্রহণ করিলেন। এই স্থানে ও তাঁহার নিজ গ্রামে তিনি সাড়ে তিন বৎসরকাল ধর্ম্মপ্রচার করেন। ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিবার জন্য তিনি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন, এবং বিশেষ ভাবে লাটিন, গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় রচিত বাইবেলের ভক্তি ভাবোদ্দীপক অংশগুলি অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিকে ধর্ম্মপ্রচার, অপর দিকে মিষ্টার ওল্ডের দোকানে কর্ম্ম করা, এই ভাবে কেরীর জীবনের দুই এক বৎসর কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে মিষ্টার ওল্ড পরলোক গমন করিলেন। কেরী বিংশতি বৎসর বয়সে আপন প্রভু ওল্ডের ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া দোকানের কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। নিতান্ত অপরিণামদর্শীর ন্যায় এই বিবাহ করিয়া প্রায় ২৫ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। স্ত্রী তাঁহার মহত্ব ও সাধুতা বুঝিতে পারিতেন না, এবং কোনক্রমেই তাঁহার জীবনের সঙ্গিনী হইবার উপযুক্ত ছিলেন না। স্ত্রী তাঁহার অনুকূল ছিলেন না বটে, কিন্তু যেরূপ অসাধারণ ধৈর্য্য, ত্যাগস্বীকার ও ক্ষমার সহিত তিনি সর্ব্বদা স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মহত্ব ও সাধুতা বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

বিবাহের পর কেরী একটী ছোট পরিষ্কার কুটীর ভাড়া করিলেন। এই কুটীরের সংলগ্ন একটী ছোট বাগান ছিল। কেরী বিশেষ যত্নের সহিত এই বাগানের উন্নতির জন্য খাটিতে লাগিলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই কেরীর ব্যবসায় অপেক্ষা বাগানে অধিক লাভের আশা হইল। ব্যবসার অবস্থা দিন দিন মন্দ হইতে লাগিল এবং কিছুদিন পরে কেরী জ্বর রোগাক্রান্ত হইয়া ব্যবসায়ের জিনিস পত্র বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। প্রায় ১৮ মাস পর্য্যন্ত জ্বর রোগে শয্যাগত থাকিয়া, অবশেষে ভগবানের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিলেন। রোগের সময় মণ্ডলীর উপাসকগণ আপনাদের মধ্য হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন। যাহাতে তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের অন্ন বস্ত্রের ক্লেশ না হয়, তৎপক্ষে তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে কেরীর ও পরিবারবর্গের অন্নবস্ত্রের অভাব ও ক্লেশ যথেষ্ট রূপে দূর হয় নাই। তাঁহার নিজ গ্রামবাসী লোকদিগের ও তাঁহার জনৈক ভ্রাতার আনুকূল্যে তাঁহার সমস্ত অভাব একরূপ দূরীভূত হইয়াছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে তিনি মাউলটনে উপস্থিত হইয়া ডিসেন্টার সম্প্রদায়ের একটী স্কুলে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা কার্য্যে কেরীর দক্ষতা অল্পই ছিল। তিনি নিজ মুখে প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমাকে যখন স্কুল চালাইতে হইত, তখন ছেলেরাই আমাকে চালাইত। বালকদিগকে কিরূপে শাসন করিয়া আপন কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতে হয়, কেরী তাহা জানিতেন না। বালকেরা তাঁহার সঙ্গে স্বাধীনভাবে চলিত, কাজেই স্কুলের শৃঙ্খলা থাকিত না। কেরী এই স্কুলে নিযুক্ত হইবার কিছুকাল পরেই স্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক পুনরায় স্কুলে যোগ দিলেন এবং সেই হেতু কেরীর বেতন অনেক কমিয়া গেল, তদবধি তিনি ৬।৭ পেন্স করিয়া সপ্তাহে পাইতে লাগিলেন। মাউলটনের ধর্ম্মালয় হইতে বার্ষিক ১১ পাউণ্ডের অধিক পাইবার আশা ছিল না। তিনি লণ্ডনের আর একটী ফণ্ড হইতে ধর্ম্ম প্রচারের সাহায্যার্থ ৫ পাউণ্ড পাইতেন। কিন্তু এই যৎসামান্য আয়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। কাজেই তাঁহাকে পুনরায় পূর্ব্ব ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইল।

এই সময়ে কেরীকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত। মিষ্টার মরিশ (Morish) নামক তাঁহার জনৈক সঙ্গী বলিয়াছেন যে, "তখন পাদুকা পূর্ণ থলিয়া স্কন্ধে করিয়া কেরীকে প্রতি পক্ষে একবার করিয়া নরদাম্‌টনে যাইতে এবং চামড়া স্কন্ধে করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখা যাইত"। কিন্তু কেরী ব্যবসায়ে তত অনুরক্ত ছিলেন না। তিনি সর্ব্বদাই জুতার ব্যবসায়ে আপনাকে অতি অপটু জ্ঞান করিতেন। ইহার ত্রিশ বৎসর পরে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল লর্ড হেষ্টিংসের সহিত কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বড় লাটের বারাকপুরস্থ ভবনে এক দিন কেরী আহার করিতেছেন, এমন সময়ে এক জন রাজ কর্ম্মচারী বড়

লাটের জনৈক এডিকঙ্গের কাণে কাণে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ডাক্তার কেরী পূর্ব্বে পাদুকা নির্ম্মাতা ছিলেন না? কেরী ইহা শুনিতে পাইবেন রাজ কর্ম্মচারী এমন মনে করেন নাই। কিন্তু কেরীর কর্ণে সেই মুহূর্ত্তে এই কথাটী প্রবিষ্ট হইল এবং তিনি তখনই রাজ কর্ম্মচারীর দিকে অগ্রসর হইয়া উত্তর করিলেন, "না মহাশয় পাদুকা নির্ম্মাতা ছিলেন না, সামান্য জুতা সিলাই-ওয়ালা ছিলেন।" মাউলটনে অবস্থিতিকালে কেরী দারিদ্র্য দুঃখের মধ্যেও মানসিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন, এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করিয়া ধর্ম্ম শাস্ত্র পাঠের সুযোগ করিয়া লইতেন। দারিদ্র্যের মধ্যে অধ্যয়নই তাঁহার একমাত্র সুখের হেতু ছিল। এই সময়ে এক দিন তিনি ধর্ম্ম প্রচারকদিগের সভায় উপদেশ দিবার জন্য আহূত হন। এরূপ সম্মান লাভের আশা তিনি কখনও করেন নাই। এই সভায় ভাবী শ্রীরামপুর প্রচারের প্রধান সাহায্যকারী ব্যাপটিষ্ট সম্প্রদায়ের আচার্য্য রেভারেণ্ড এণ্ড ফুলার উপস্থিত ছিলেন। কেরী বেদী হইতে নামিবার পর, পাদ্রি ফুলার গভীর অনুরাগের সহিত তাঁহার কর মর্দ্দন করিলেন এবং তাঁহাদের উভয়ের মতের আশ্চর্য্য মিল আছে বলিয়া, বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পাদ্রি-ফুলার কেরীর সহিত বিশেষ ভাবে আলাপ পরিচয় করিবার আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং তদবধি তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুতার বীজ অঙ্কুরিত হইল। কুকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে কেরী পূর্ব্ব দেশীয় পৌত্তলিকদিগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবনতির বিষয়ে সর্ব্ব প্রথমে অবগত হন এবং তখন হইতেই এদেশে আসিয়া বাইবেলের সুসমাচার প্রচার করিবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগ্রত হইতে থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ তাঁহার হৃদয় মন অধিকার করিল এবং এই চিন্তাই তাঁহার ধ্যান ও যপমালা হইল। শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া আবার যখন শ্রমজীবী হইতে হইল, তখনও কিরূপে পূর্ব্ব দেশে আসিয়া বাইবেলের আলোক প্রকাশ করিবেন এই চিন্তাই কেরীর মনে সর্ব্বোপরি প্রধান ছিল। মিষ্টার ফুলার বলিয়াছেন যে, কেরীর ক্ষুদ্র বিপাণিতে প্রবেশ করিলেই প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন এক খানি প্রকাণ্ড মানচিত্র দৃষ্টিগোচর হইত। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের জন সংখ্যা ধর্ম্ম ও লোক চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই মানচিত্রের যথা স্থানে তিনি লিখিয়া রাখিতেন। পাদুকা নির্ম্মাণ করিবার সময় অথবা পাদুকা মেরামত করিতে করিতে কেরীর দৃষ্টি প্রায়ই এই মানচিত্রের দিকে পতিত হইত। কল্পনা পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়া কেরী পৃথিবীর নানা দেশে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভ্রমণ করিতেন এবং কোন্ দেশে কি প্রণালীতে প্রিয় খৃষ্ট ধর্ম্মের সুসমাচার প্রচার করিবেন সেই চিন্তায় ব্যাপৃত হইতেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

মাঘোৎসবের বিবরণ প্রকাশ করিবার জন্য আমরা ব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধীয় অনেক সুখ দুঃখের সংবাদ পাঠকগণকে প্রদান করিতে পারি নাই। সে সকল সংবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত বোধে, অনেক দিনের হইলেও এখন আমরা সংবাদগুলি নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা— গত ৭ই ফেব্রুয়ারি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার একটী বিশেষ অধিবেশনে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য পদে বরিত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বসু, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, দুর্গামোহন দাস, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মধুসূদন সেন, গুরুচরণ মহলানবিশ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কেদারনাথ রায়, নবদ্বীপচন্দ্র দাস, উমাপদ রায় এবং প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য। এতদ্ভিন্ন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নূতন নিয়ম অনুসারে বাবু শশীভূষণ বসু মহাশয় প্রচারকগণের প্রতিনিধিরূপে কার্য্য নির্ব্বাহকসভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। ৮ই ফেব্রুয়ারি রবিবার বিশেষ উপাসনার পর কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রথম অধিবেশন হয়। বর্ত্তমান সময়ে রবিবারে এই সভার অধিবেশন হইতেছে।

সমাজ-গৃহপ্রতিষ্ঠা— বিগত ২৬শে ডিসেম্বর খাসিয়াস্থ মোসমাই ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে শিলং, চেরাপুঞ্জী, মমলু, শেলা ও নংথমাই হইতে বন্ধুগণ আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। প্রথমে "গাওরে আনন্দে সবে জয় ব্রহ্ম জয়" এই সঙ্গীতটী গীত হয়। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় তৎসময়োপযোগী উপদেশ দেন এবং তৎপরে উপাসনার কার্য্য শেষ করিয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করেন। পরে শিলংস্থ বাবু রাধন সিং বেরি "এক ঈশ্বরই আমাদের লক্ষ্য" এই বিষয়ে উপদেশ দেন। শেলা হইতে আগত বাবু কৃষ্ণধন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে ঈশ্বর কৃপায় খাসিয়া পাহাড়ে কত আশ্চর্য্য ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কিছু বলেন। এবং পরিশেষে মোসমাইএর বাবু সিমিয়ন প্রার্থনা করেন। পূর্ব্ব দিনও বাবু সিমিয়নের বাড়ীতে উপাসনা ও উপদেশ হইয়াছিল। উভয় দিনই অনেক রমণী উপস্থিত ছিলেন।

সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। এজন্য কিছু টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে। ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য এবং গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করিবার জন্য আরও কিছু অর্থের প্রয়োজন হইবে। এমন কি বসিবার আসন পর্য্যন্ত এখনও হয় নাই। আশা করি ব্রাহ্মবন্ধুগণ যাঁহারা খাসিয়া পাহাড়ে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতির কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া অবিলম্বে কিছু অর্থ, সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন। কারণ সম্মুখে ভীষণ বর্ষাকাল আসিতেছে, তখন বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

শ্রাদ্ধ— বিগত ২১শে ডিসেম্বর রবিবার শিলংস্থ বাবু কৈলাসচন্দ্র সেন মহাশয়ের পরলোকগতা মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করেন। ঐ অনুষ্ঠানে অনেক হিন্দু, মুসলমান ও খাসিয়া ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। তৎপরে বাঙ্গালী এবং খাসিয়া ব্রাহ্মদিগের প্রীতিভোজন হয়।

আমরা দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে সাধাণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য বাবু দ্বিজদাস বিশ্বাস গত ১লা ফেব্রুয়ারী ইহলোক ত্যাগ

করিয়াছেন। ইনি গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ বিভাগে কার্য্য করিতেন। ইনি বড়ই বিনীত প্রকৃতির লোক ছিলেন। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য করেন।

বিবাহ—বিগত ১৫ই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বরিশালে রাজচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু হীরালাল হালদারের সহিত বরিশাল জেলা স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুবালার ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। প্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু মনোরঞ্জন গুহ মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বিগত ৩০শে জানুয়ারি শুক্রবার ঢাকা নগরে একটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম বাবু হরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত। ইনি ঢাকা নবাব স্কুলের ২য় শিক্ষক। পাত্রীর নাম শ্রীমতী সরোজিনী। ইনি দেরাডুন সার্ভে আফিসের কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু কালীমোহন ঘোষের ২য়া কন্যা। শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই বিবাহে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

নামকরণ—বিগত ৩১শে জানুয়ারি শনিবার শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকারের পুত্রের নামকরণ হইয়া গিয়াছে। পুত্রের নাম নির্ম্মল রতন রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু উমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় এই অনুষ্ঠানে আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

জাতকর্ম্ম—বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারি কাঁথিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র ঘোষের ২য়া কন্যার জাতকর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। তারক বাবু নিজেই উপাসনা করিয়াছিলেন।

বিগত ২৯শে জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বাবু কালীচন্দ্র ঘোষালের কন্যার জাতকর্ম্ম হইয়াগিয়াছে। বিক্রমপুরস্থ প্রচারক বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উপাসনা করেন।

আবেদন পত্র।

প্রায় দুই বৎসর হইল রংপুর ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এই কার্য্যের জন্য স্থানীয় চাঁদা এবং নানাস্থানে ভিক্ষা দ্বারা প্রায় ২০০০৲ দুই হাজার টাকা আদায় হইয়াছে। তদ্দ্বারা মন্দিরের ছাদ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ শেষ হইয়াছে, এখন চৌকাট কবাটের অভাবে মন্দিরে প্রবেশ করা যাইতেছে না এবং উপাসনাদি কার্য্য হইতে পারিতেছে না। মন্দিরের বারেন্দাটিও নির্ম্মিত হয় নাই। এই দুই কার্য্যের জন্য অনুমান ৭০০৲ কি ৮০০৲ টাকার প্রয়োজন, এখন সমুদয় ধর্ম্মোৎসাহী মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা আমাদের এই কার্য্যের সাহায্য করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করুন্। এই শুভ কার্য্যের সাহায্যার্থ অর্থ, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণদয়াল রায় এবং ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন বসু ও শ্রীযুক্ত বাবু নবদ্বীপচন্দ্র দাস মহাশয়দিগকে দিলেই যথাস্থানে পৌঁছিবে।

১২ই মার্চ্চ, ১৮৯১ বিনীত প্রার্থী
শ্রীবিশ্বেশ্বর সেন
রংপুর। সম্পাদক রংপুর ব্রাহ্মসমাজ।

সাহায্য প্রার্থনা।

একটী মন্দিরাভাবে ত্রিপুরানিবাসী দরিদ্র ব্রহ্মোপাসকগণ বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতেছিলেন, দয়াময় সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মের কৃপাবলে বহুদিনের অভাব দূর হইবে বলিয়া আশা হইতেছে। স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি শ্রীশ্রীযুত মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর অনুকম্পা পুরঃসর কুমিল্লা নগরীতে একটী উপাসনালয় নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড ভূমি নিষ্কর দান করিয়াছেন। দরিদ্র ব্রহ্মোপাসকগণ এই দানের জন্য মহারাজা বাহাদুরের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলু। বিগত ১লা জানুয়ারী ত্রিপুর রাজমন্ত্রী শ্রীযুক্ত রায় উমাকান্ত দাস বাহাদুর কর্ত্তৃক মন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে এবং মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে।

মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটী কমিটী সংগঠিত হইয়াছে—

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন বর্দ্ধন, কুমিল্লা সবজজ আদালতের ভূতপূর্ব্ব সেরেস্তাদার।
" " কৈলাসচন্দ্র দত্ত, এম্ এ, বি এল্ উকীল জজআদালত। } মেম্বর।
" " নন্দলাল দাস, কুমিল্লা কালেক্টরির মহাফেজ।
" " গুরুদয়াল সিংহ, সিংহ প্রেসের অধ্যক্ষ।
" " শরচ্চন্দ্র বসু, বি এ, বি এল, ত্রিপুর রাজের দেওয়ান। } মেম্বর ও সম্পাদক।
" " জয়শঙ্কর রায়, কুমিল্লা বালিকা বিদ্যালয়ের হেড্ পণ্ডিত। মেম্বর ও
" " রেবতী কুমার দাস, কুমিল্লা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ক্লার্ক। সহকারী সম্পাদক।
" " অক্ষয়কুমার সেন, কুমিল্লা পুলিশের ক্লার্ক

বলা বাহুল্য যে এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন এবং ইহা ধর্ম্মোৎসাহী সহৃদয় মহাত্মাগণের অনুগ্রহ ব্যতীত সংসাধিত হইবার নয়। অতএব ধর্ম্মোৎসাহী মহাশয়গণ দয়া করিয়া এই শুভ কার্য্যে কিছু২ দান করেন ইহাই বিনীত প্রার্থনা। কমিটীর যে কোন মেম্বরের নিকট টাকা পাঠাইলেই চলিবেক। ইতি

কুমিল্লা } বিনয়াবনত,
২৭শে ফাল্গুন ১২৯৭। } শ্রীশরচ্চন্দ্র বসু,
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে ব্রাহ্ম ছাত্রী নিবাসের (Boarding) কোন একটী ব্রাহ্ম বালিকাকে দিবার জন্য "সুজাতাবৃত্তি" নামে মাসিক ৫৷৷॰ সাড়ে পাঁচ টাকার একটী বৃত্তি ন্যস্ত হইয়াছে।

উক্ত সভার হস্তে "সৌদামিনী বৃত্তি" নামক বাৎসরিক ৪০৲ টাকার আর একটী বৃত্তি আছে। ইহা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় (School) অথবা ব্রাহ্মছাত্রী নিবাসের (Boarding) কোনও একটী বা ততোধিক বালিকাকে প্রদত্ত হইবে।

যাঁহারা এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০শে এপ্রেলের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়, } শ্রীচুকড়ি ঘোষ,
১৭ই মার্চ্চ, ১২৯১। } সম্পাদক
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। } সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১০ই এপ্রেল শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সিটি কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ১৮৯১ সনের প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে, সভ্যগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বিবিধ।

১৭ই মার্চ্চ, ১৮৯১ } শ্রীচুকড়ি ঘোষ,
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়, } সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সঃ
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক এই চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে এই চৈত্র প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১৩শ ভাগ।
২৩শ সংখ্যা।

১লা চৈত্র শনিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০
মফস্বলে ৩৲
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে রসস্বরূপ মঙ্গল-বিধাতা পরমেশ্বর! এ সংসারে শুষ্কভাবে জীবন যাপন করা অতি বিড়ম্বনার ও ক্লেশের কারণ। অন্তরে ভক্তির উচ্ছ্বাস নাই, তোমার চিত্তোন্মাদকারী নাম গ্রহণ করিয়াও প্রাণে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নাই, কোন রূপে মৃতবৎ জীবন যাপন করা অতি শোচনীয়। সৎকার্য্যে উৎসাহ নাই, যে সকল বিষয়ে প্রাণের সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া আবশ্যক তাহাতেও প্রাণের তেমন আগ্রহ বা উৎসাহ নাই, এমন দুর্গতির অবস্থায় দিন যাপন করাপেক্ষা মরিয়া যাওয়াতে আর দুঃখ কি? নিভ নিভ আলো—যে আলোতে গৃহের কার্য্য সমাধার পক্ষে বিশেষ সাহায্য হয় না—এমন আলো আর অন্ধকারে বিশেষ প্রভেদ কি? প্রভু যদি জীবন্ত ভাব পূর্ণ হইয়াই সংসারে থাকিতে না পারিলাম—যদি প্রাণ চির তেজস্বীতা ও সরসতার সহিত তোমার কার্য্যের উপযুক্তই না হইল, এমন প্রাণ লইয়া কি করিব। হে বিধাতা, তোমার কৃপা আমরা অনেক পাইয়াছি, কিন্তু তাহাতেও আমাদের জড়তা, শুষ্কতা ও নিস্তেজভাব অপগত হইতেছে না। আরও চাই—তোমার করুণার পরিচয় জীবনে আরও পাওয়া চাই। প্রেমময় ঈশ্বর! তোমার সংস্পর্শে প্রাণের সকল হীনতা মলিনতাই চলিয়া যায়; তোমার পূজা অর্চ্চনা যে করে তাহার ত নির্জীবভাবে জীবন যাপন করিবার কথা নয়, তবে কেন আমাদের নির্জ্জীবতা যায় না। প্রভু প্রাণে উন্মাদকারী ভক্তি ও অনুরাগ আনয়ন কর। সকল প্রকার জড়তা ও আলস্য ঘুচিয়া যাউক, জীবন্তভাবে তোমার নির্দ্দেশ পালনে আমরা নিযুক্ত হই। তুমি আমাদের প্রাণকে সতেজ ও সরস কর।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বাধ্যতা—মানুষ আমাদিগকে যে কোন উপায়েই হউক বাধ্য রাখিতে চায়, কিন্তু ঈশ্বর আমাদিগকে স্নায়ানুগতরূপে বাধ্য রাখিতে চাহেন। বাধ্যতা একটী ঈশ্বরদত্ত গুণ, অনুগত ব্যক্তির প্রতি সকলেই সন্তুষ্ট। অনুগতের হিতাকাঙ্ক্ষা খুব স্বাভাবিক, ইহা যেমন মানবেতে দেখা যায়, সেইরূপ ঈশ্বরেতেও দেখা যায়, যদিও ঈশ্বর আপনার বাধ্য নৌরিক সন্তানদিগকে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়া লইয়াছেন, যদিও সেই সব পরীক্ষাতে সন্তানকে অনেক ক্লেশ পাইতে দেখিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে যেমন সুখী করিয়াছেন, এমন আর কাহাকেও করেন নাই। ঈশা, বুদ্ধ, চৈতন্য সকলের জীবনই ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইঁহাদের বাধ্যতা অতি আশ্চর্য্যরূপ। ইঁহারা কখনই ক্লেশে পড়িয়া পিতার অবাধ্য হন নাই; প্রাণ দিয়াছেন তবুও অবাধ্য হন নাই। সত্যই যদি কেহ পিতার প্রিয় হইতে চাও তাঁহার বাধ্য হও। শুধু পিতার বাধ্য হইলেই হইবে, কেন না যে পিতার বাধ্য সে ভ্রাতা ভগ্নীরও বাধ্য। সে আপন দলেরও বাধ্য। কিন্তু হায় অবাধ্যতা রোগে আমরা মারা যাইতেছি। মুখে আমরা ঈশ্বরের বাধ্যতা স্বীকার করি, কিন্তু পরীক্ষার সময় তাহা অস্বীকার করি, কার্য্যেতে তাহা অস্বীকার করি। ভ্রাতা ভগ্নীদের প্রতি ব্যবহারে তাহা অস্বীকার করি। দশ জনে মিলিত হইয়া কাজ করিতে হইলে, পরস্পরের প্রতি বাধ্যতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সত্য বটে তাহাতে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থাকিবেক, কিন্তু তাহার মধ্যে অবাধ্যতার চিহ্ন কিছুই থাকিবেক না। ঈশ্বর আমাদিগকে এইরূপ বাধ্য দেখিতে চাহেন।

সহিষ্ণুতা—ধীরভাবে পড়িয়া থাকা শুধু মহত্ত্ব নয়, ইহা সিদ্ধি লাভের একটী পরম উপায়। তুমি এমন কোন ক্লেশই কর নাই, যাহাতে তোমার কার্য্যের ফল শীঘ্র না দেখিয়া অসহিষ্ণু হইতে পার। তোমার সকল পরিশ্রম, সকল যত্ন যদি একত্র কর এবং তুমি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছ, তাহার গুরুত্ব যদি ভাব, তবে তুমি দেখিতে পাইবে, তোমার অসহিষ্ণু হইবার কোনই কারণ নাই। তুমি তাহা দেখ না, তাই এত অসহিষ্ণু হও। তোমার পিতা দেখিতেছেন, তুমি যে কাযে হাত দিয়াছ তুমি তাহাতে কতটা প্রেম কর, যদি তোমার তাহার জন্য একটুকু সহিষ্ণুতাও না থাকে, তবে তোমার প্রতি তাঁহার কি বিশ্বাস? তুমি কি তোমার সন্তানকে সহিষ্ণুভাবে পড়িয়া থাকিতে বল না? ঈশ্বরও আমাদিগকে কোন আজ্ঞা করিয়া ইহাই বলেন, সহিষ্ণুভাবে এ কাযে লাগিয়া থাকিবে,

যেমন তুমি ঘোর ক্লেশের মধ্যেও অবাধ্য হইবে না, সেইরূপ ঘোর পরীক্ষার মধ্যেও, নিরাশার মধ্যেও অসহিষ্ণু হইয়া পড়িবে না। বুদ্ধের সহিষ্ণুতার কথা ভাব দেখি, যখন বহু সময়ের চেষ্টার পরও সহিষ্ণুতাকে ছাড়িলেন না, তখনই সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইলেন। আমরা অল্পেতেই অসহিষ্ণু হই, তাই কোন কাযেই সফলকাম হইতে পারি না। এইরূপ অসহিষ্ণুতা হইতে ক্রমে নিরাশা আসিয়া উপস্থিত হয়, শেষে আর ধীরভাবে কিছু লইয়া পড়িয়া থাকিতে পারি না। এই অবস্থা ঠিক বায়ু নিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় সর্ব্বদা চঞ্চল। সহিষ্ণুতাকে সাদরে প্রাণে স্থান দান কর ঈশ্বর তোমাকে তোমার বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিবেন। সহিষ্ণুতার সহিত সাধন কর, সিদ্ধি লাভ সহজ হইবে, ঈশ্বর সহিষ্ণুর আশাই সফল করেন।

আশা—বিষয় লালসাকে যেমন প্রাণে স্থান দিবে না, আবার ধর্ম্ম লালসাকে তেমনই আদর করিবে, যত্ন পূর্ব্বক প্রাণে রাখিবে। আশা না থাকিলে—ভবিষ্যতের আশা না থাকিলে মানুষ কি এই দুদিনের জন্য কখন এত ক্লেশ স্বীকার করিতে পারিত। কিন্তু যে প্রবল বিষয় আকাঙ্ক্ষাতে মানুষ ডুবিয়া রহিয়াছে, ইহাতে কখনই মঙ্গল হইবে না। অমর আত্মার শুধু ইহাই লক্ষ্য নয়, বিষয়ে সে সুখী নয়, তাহার যে প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণা আছে, তাহাই তাহার আরামের কারণ। তাহাতেই তাহার ভবিষ্যৎ কল্যাণ সাধিত হইবে; এ আশা যত বাড়িবে, তত সে একদিকে যেমন ঈশ্বর-প্রেমে আত্মার নিত্যতা অনুভব করিবে, অপর দিকে তেমনই বিষয়ের অনিত্যতা—শারীরিক সুখের অসারতা বুঝিতে পারিবে। ধর্ম্মলাভের আশাতেই মানুষ—পৃথিবীর সকল প্রকার স্বার্থ ছাড়িতে পারে, ধর্ম্মলাভের আশাতেই মানুষ সকলকে প্রেম করিতে পারে। ঈশ্বর লাভের আশাতেই ঈশ্বর লাভ হইয়া থাকে। যে আশা করিবে সে আশা সিদ্ধির উপায়ও পাইবে। কিন্তু সে আশা শুধু মনে মনে একটা কল্পনা জল্পনা নয়, মনের কল্পনা স্বপ্নলব্ধ রাজ্য ভোগের ন্যায়। আশার সঙ্গে ব্যাকুলতা, আশার সঙ্গে উপায় অনুসন্ধান, আশার সঙ্গে ঈশ্বরে নির্ভর স্বাভাবিক। এই আশাতেই মানুষ বাঁচিয়া থাকে এই আশাতেই মানুষ সকল ক্লেশ বহন করিতে পারে। এই আশাতেই ধর্ম্মলাভ হয়। ঈশ্বর লাভ হয়। ঈশ্বর আমাদিগকে এই আশাই দান করুন।

অত্যাচার ও প্রতিকার—জগতে কোন ধর্ম্মই নিরুপদ্রবে প্রচারিত হয় নাই। মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ত কথাই নাই। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সভ্যতার সময়ের চৈতন্যের ধর্ম্ম ও নানকের ধর্ম্ম প্রচারেও তত্তৎমতে বিশ্বাসীগণকে কতরূপে অত্যাচার প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। কত অকথ্য যন্ত্রণানলে তাঁহাদিগকে দগ্ধ হইতে হইয়াছে—কত লোকের প্রাণ গিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মই যে নিরুপদ্রবে প্রচারিত হইতেছে, এমনও নয়। তবে সে সকল অত্যাচার এতদিন সামান্য প্রকারে হইতেছিল। নিন্দা, অপবাদ ঘোষণা প্রভৃতি সামান্য ভাবেই বিরোধীগণের মনের অসন্তোষ জ্ঞাপিত হইতেছিল। কিন্তু এমন সময় আসিয়া উপস্থিত হইতেছে, যখন আর প্রতিপক্ষগণ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেছেন না। অত্যাচারের—প্রহারাদিরূপ ঘচরনীতি ইঁহারাও অবলম্বন করিতেছেন। ইহার মধ্যেই তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। এই কলিকাতা নগরীতেই ব্রাহ্মগণ স্থানে স্থানে প্রহার-প্রাপ্ত হইতেছেন। এ সকল যে এতদিন হয় নাই, ইহাই ব্রাহ্মগণের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয়। এরূপ অত্যাচার সম্ভোগ করিতে হইবে, ইহা একরূপ নিশ্চিতই আছে। যতদিন নিরাপদে কাটিয়া গিয়াছে, ততদিনের সেই সুবিধা ভোগের জন্য পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ। ব্রাহ্মগণ যখন প্রচলিত রীতি নীতি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে জীবন যাপন করিতেছেন এবং সমাজের কুসংস্কার সকল অপনোদনের সহায়তা করাকে জীবনের একটী সাধু লক্ষ্য করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আর অত্যাচার প্রাপ্ত হইতে অনিচ্ছুক হইলে চলিবে না। এরূপ অত্যাচার প্রাপ্ত হওয়া সৎসঙ্কল্পান্বিতের আনন্দেরই কারণ। প্রিয়তমের প্রিয় অনুষ্ঠানের সহায়তা করিয়া অত্যাচার প্রাপ্ত হইতে, অনুরাগী কখন কি বিমুখ হইয়াছে? ব্রাহ্মগণ যাহা সাধু ও কল্যাণকর জানিবেন, প্রিয়তম পরমেশ্বরের প্রিয় অনুষ্ঠান জ্ঞানে সর্ব্বদাই তাহাতে আপনাকে নিযুক্ত করিবেন, যে ব্যক্তি অত্যাচারের ভয়ে এমন শুভ সুবিধা পরিত্যাগ করে, তাহার পক্ষে ঈশ্বর বিশ্বাসী বা তাহার অনুরাগী বলিয়া পরিচিত হইবার কোন অধিকার নাই। সুতরাং ব্রাহ্মগণ সমাজ সুসংস্কৃত করিবার সহায়তা করিতে যাইয়া, যদি অত্যাচার প্রাপ্ত হন, তাহা যেন তাঁহাদের আনন্দেরই কারণ হয়। যেন তাহা অঙ্গের ভূষণ বলিয়া গণ্য হয়। বর্ত্তমান সময়ে দেশব্যাপী উত্তেজনার স্রোতে পড়িয়া প্রতিপক্ষগণ আপনাদের মনক্ষোভ নিবারণার্থ ব্রাহ্মগণের অনেক নিন্দা প্রচার করিতেছেন ও করিবেন, নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিবেন এ সকল, অপমান, লাঞ্ছনা, ব্রাহ্মগণ পাইয়াও যেন সহিষ্ণুতার সহিত সে সকল বহন করিতে প্রস্তুত থাকেন। অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার করা কখনও ধর্ম্মসঙ্গত নয়। চিরদিনই ধর্ম্মপথের যাত্রীগণ আপন প্রিয়তমের অনুরোধে সকল প্রকার নির্যাতন—অত্যাচার সহ্য করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং ব্রাহ্মগণ যেন কখনও অত্যাচারির প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত না হন। অত্যাচারকারী নামে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা, অত্যাচারগ্রস্ত বলিয়া পরিচিত হওয়াই প্রার্থনীয়। ইহাই আমাদের সান্ত্বনার কারণ হউক যে আমরা কাহার প্রতি অত্যাচার করি নাই, কিন্তু অত্যাচার প্রাপ্ত হইয়াছি। অপরাধ করি নাই, ইহাই সাধুজন সম্মত সান্ত্বনার প্রকৃষ্ট পথ। কাহারও ক্ষতি করিয়াছি এই চিন্তা অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি ইহা কি চিত্তের শান্তির পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নহে? সুতরাং অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার দিকে যেন আমাদের মনের গতি না হয়। কিন্তু একটি কথা বিবেচ্য এই যে;—যেমন আমরা নিজে অপরাধ করিব না, সে জন্য সর্ব্বদা সযত্ন থাকিব। তেমনি কাহারও অপরাধ করিবার পক্ষে সাহায্যকারী হওয়াও উচিত নয়। আমাদের এমন অসাবধানতা বা হঠকারীতা দেখান উচিত নয়, যাহাতে লোকে

অত্যাচার করিবার সুবিধা পায় বা উত্তেজিত ও কাণ্ডজ্ঞান নিবর্জ্জিত হইয়া কাহারও উপর অত্যাচার করিতে থাকে। আমরা উপযুক্ত রূপে আত্মরক্ষার সদুপায় সকল গ্রহণ করিব। এবং অন্যের অত্যাচারের প্রতিকারের বিধিসঙ্গত উপায় সকল গ্রহণ করিয়া, যাহাতে তাহারা অপরাধী হইবার সুবিধা না পায় এমন ভাবে কার্য্য করিব। সহিষ্ণুতা এবং সাবধানতা দুই আমাদের অবলম্বনীয় হইবে। বিপক্ষের উত্তেজনার কারণও হইব না, আবার তাহার অত্যাচারের পথকে সহজ ও উন্মুক্ত করিয়াও দিব না। এ ভাবে চলিলেই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি বলিয়া আমরা মনে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিব।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

নিরাশা।

সংসারে যেরূপ নিরাশা আছে, ধর্ম্মজীবনেও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে নিরাশার ভাব দেখা যায়। এক ব্যক্তি কোনও পুরাতন রোগে অনেক বৎসর ধরিয়া ভুগিতেছেন, নানা প্রকারে অনেক দিন ধরিয়া চিকিৎসাদিও করিতেছেন, অতিশয় তিক্ত বা কষায় কষ্টসেব্য কত প্রকার ঔষধ সেবন করিতেছেন, যে সকল খাদ্যদ্রব্যে রোগ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, তাহা হইতে দূরে থাকিয়া, সামান্য পথ্যের দ্বারা অতি কষ্টে জীবন ধারণ করিতেছেন এবং চিকিৎসকের উপদেশমত অত্যন্ত কঠোর নিয়মের অধীন হইয়া, অতিশয় সাবধানতার সহিত চলিতেছেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার রোগের কোনও রূপ উপশম হইতেছে না। এত ঔষধ সেবন করিয়াও তাহার বিশেষ কোনও ফল দেখিতেছেন না। এই ভাবে যদি অনেক দিন চলিয়া যায়, তবে তাঁহার মনে নিরাশার উদয় হয়। তিনি তখন মনে করেন যে আর ঔষধ সেবন করিয়া কি হইবে? পথ্য সম্বন্ধে এত কঠিন নিয়ম রক্ষা করিয়া আর কি হইবে? তিনি তখন আরোগ্য হইবার আশায় নিরাশ হইয়া ঔষধ ও পথ্য সম্বন্ধে সকল নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া হয়ত কুপথ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন রোগও ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া উঠে। এইরূপ ধর্ম্ম জগতেও দেখা যায় যে এক ব্যক্তি হয়ত অনেক বৎসর ধরিয়া ধর্ম্ম সাধন করিতেছেন, প্রত্যহ নিয়মিতরূপে উপাসনাদি করিতেছেন, সকল প্রকার নীতি অতি যত্নের সহিত পালন করিতেছেন এবং নানা প্রকার সাধু ও হিতকর কার্য্য সকল উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার বিশেষ উন্নতি হইতে দেখা যাইতেছে না, তাঁহার ভিতরে যে পুরাতন পাপ ব্যাধি লুকায়িত ছিল, তাহা দূর হইতেছে না, বাসনা প্রবৃত্তির বন্ধন ছিন্ন হইতেছে না, ধর্ম্ম জীবনের শুষ্কভাব ঘুচিতেছে না এবং গভীর আধ্যাত্মিক জীবন গঠিত হইতেছে না। চিরদিন সংগ্রাম করিতে করিতে জীবন ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। এইরূপে সময়ে সময়ে হয়ত তাঁহার মনে নিরাশা আসিয়া দেখা দিতেছে। তিনি হয়ত মনে করিতেছেন যে উপাসনা করিয়া কি হইল? কঠিন কঠোর নিয়ম ও নীতি সকল পালন করিয়া কি হইল? এত দিন ধরিয়া ত সব করিলাম, কিন্তু কই বিশেষ ত কোনও ফল হইল না। যদি পাপ না যায়, যদি প্রবৃত্তির বিনাশ না হয়, যদি শুষ্কতা দূর না হয়, তবে এ সব করিয়া কি করিব? এইরূপে ক্রমে তাঁহার উপাসনা প্রার্থনার উপকারিতাতে সংশয় জন্মিল। বুঝি ঈশ্বর তবে আমার প্রার্থনা শুনেন না, তিনি বুঝি তবে মঙ্গলময় নন, এই মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি হয়ত সাধন ভজন সকল ছাড়িলেন। জীবন আরও শুষ্ক ও মলিন হইয়া গেল। পরে তিনি পাপ পঙ্কে ডুবিলেন, ধর্ম্ম জগতে তাঁহার মৃত্যু হইল।

ধর্ম্ম জগতে এইরূপ ঘটনা অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে। প্রায় সকল সাধকই আপন আপন জীবনে এইরূপ নিরাশার ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ধর্ম্ম জীবনের প্রথমাংশে সকলকেই এই ভাবের ভিতরে কখন না কখন পড়িতে হয়। কিন্তু কেন এই ভাব জীবনে আসিয়া দেখা দেয়? বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে বিশ্বাসের অল্পতাই ইহার এক প্রধান কারণ। পরমেশ্বরের করুণা ও মঙ্গলভাবের উপরে যখন আমাদের বিশ্বাস কমিয়া যায়, তখনই এইরূপ নৈরাশ্য ভীষণ বেশে আসিয়া, আমাদের জীবনকে আকুল করে। প্রভু পরমেশ্বর আপনিই মঙ্গলময় বিধাতা হইয়া আমাদের জীবনকে নিয়মিত করিতেছেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে নিজেদের মঙ্গল কিসে হয়, তাহার অতি অল্পই বুঝিতে পারি, ভবিষ্যতের অন্ধকারের মধ্যে আমাদের জন্য কি অবস্থা রহিয়াছে আমাদের অন্ধ চক্ষু তাহার কিছুই দেখিতে পায় না। কিন্তু তিনি সর্ব্বদর্শী হইয়া আমাদের জীবনের সকলই পূর্ব্ব হইতে দেখিতেছেন এবং জানিতেছেন, কিসে আমাদের প্রকৃত মঙ্গল হয়। কিসে আমাদের আত্মার কল্যাণ হয় তাহা জানিয়া আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। যে ঘটনার ভিতরে আমাদিগকে ফেলিলে ভাল হয়, সেই ঘটনার ভিতরে আমাদিগকে ফেলিতেছেন, যে অবস্থার ভিতরে রাখিলে আমাদের মঙ্গল হয়, সেই অবস্থার ভিতরে স্থাপন করিতেছেন। এই সকল কথা আমরা যখন ভুলিয়া যাই, তখনই একটু শুষ্কভাব দেখিলে বা জীবনের পাপ ও দুর্ব্বলতা যাইতেছে না এই কথা স্মরণ করিলেই মনে নৈরাশ্যের উদয় হয়। কিন্তু অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া যদি তাঁহার করুণার বিষয় একবার ভাল করিয়া স্মরণ করি, কিরূপে কত ভয়ানক বিপদের মধ্যে তিনি আমাদিগকে করুণা করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, এবং নানা ভাবে আমাদের মঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাহা যদি উপলব্ধি করি, তবে আর নৈরাশ্য আমাদের নিকটেই আসিতে পারে না। বস্তুতঃ আমরা বড়ই অন্ধ ও অবিশ্বাসী, তাই তাঁহার করুণার বিষয় কিছুই বুঝিতে পারি না। তাঁহার করুণায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে। আজ যেখানে শুষ্ক কঙ্করময় মরুভূমি দেখিতেছি, তাঁহার কৃপায় কাল তথা হইতে সুনির্ম্মল স্রোতস্বতী উৎসারিত হইয়া, সেই স্থানকে প্লাবিত করিতে পারে; আজ যে আকাশ ঘোর তিমিরে আচ্ছন্ন দেখিতেছি, কাল তাঁহার কৃপায় তাহাতে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া দশদিক আলোকিত করিতে পারে; আজ যে বৃক্ষ শুষ্ক মৃতপ্রায় ফল

পত্রবিহীন দেখিতেছি, কাল তাঁহার কৃপায় তাহা সুন্দর পুষ্প পত্রে আবৃত ও ফল ভারে অবনত হইতে পারে;—আজ যে জীবনকে শুষ্ক ও মৃত ভাবে পূর্ণ, পাপভারে অবসন্ন এবং দুর্ব্বলতা ও মোহে অভিভূত দেখিয়া নিরাশ হইতেছি, কাল তাঁহারই কৃপায় হয়ত তাহা নূতন হইয়া যাইতে পারে। তাঁহার প্রেম ও করুণার উপরে বিশ্বাস থাকিলে নৈরাশ্য আসা কথনই সম্ভব নয়।

এক সময়ে জীবন অত্যন্ত শুষ্কতা ও নিরাশার মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিল, অবিশ্রাম পাপের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া প্রাণ একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে প্রভু পরমেশ্বরের কৃপায় এক আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিলাম। এক বন্ধুর গৃহে একটী সুন্দর শিশু ছিল, তাহার সুন্দর সরল মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার মধুর হাসি দেখিয়া, তাহার সুধামাখা আধ আধ স্বর শুনিয়া সকলেরই প্রাণে প্রতিদিন কত আনন্দ হইত। একদিন তাহার পীড়া হইল, সে আর তেমন করিয়া আনন্দের সহিত খেলা করে না, সে আর তেমন মধুর হাসি হাসিয়া আধ আধ স্বরে সকলের প্রাণ মুগ্ধ করে না। তাহার সুন্দর মুখখানি পীড়াতে মলিন হইয়া গেল। তখন দেখা গেল যে তাহার জননী সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার শয্যাতে বসিলেন, নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি নাই, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবানিশি পুত্রের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। যতদিন না সন্তান সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইল, যতদিন না তাহার মলিন মুখে আবার হাসি ফুটিল, আধ আধ কথা বাহির হইল, ততদিন তাঁহার আর বিশ্রাম নাই। এই সব দেখিয়া মনে হইল যে যাঁহার প্রেমের এক বিন্দু পাইয়া পৃথিবীর জননী আপনাকে ভুলিয়া সন্তানকে ভাল বাসিতে শিখিয়াছেন, মানবাত্মার জননী হইয়া তিনি ত তাহাকে চিরদিন আপন ক্রোড়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব যে সেই আত্মা যখন পাপব্যাধিতে আক্রান্ত হয় বা শুষ্কতা ও মলিনতাভারে অবসন্ন হয়, তখন সেই প্রেমের আধার পরমেশ্বর তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন? তাহা কখনই সম্ভব নয়। জননী অপেক্ষা আরও কোটী গুণ প্রেম ও স্নেহের সহিত আত্মার সেই প্রেমময়ী জননী রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া পাপব্যাধিগ্রস্ত আত্মার শুশ্রূষা করেন। তাঁহার সন্তান হইয়াও মানবাত্মার পবিত্র মুখ পাপের কালিমাতে মলিন হইয়া যাইবে ইহা তিনি দেখিতে পারেন না। যতদিন না সেই আত্মা পাপ-রোগমুক্ত হইয়া আপনার স্বাভাবিক পুণ্যের জ্যোতিতে উজ্জল হয়, পবিত্রতার সুন্দর হাসি যতদিন না তাহার মুখে পুনর্ব্বার বিকসিত হয়, ততদিন তিনি কখনই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। বস্তুত যখন আমরা নিজের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখন নিজেদের দুর্ব্বলতা, রাশি রাশি পাপ দেখিয়া প্রাণ বড়ই নিরাশার ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু আবার তাঁহার অপার প্রেম, অনন্ত করুণার কথা স্মরণ করিলে প্রাণে বল ও আশার সঞ্চার হয়। যখন সূক্ষ্ম ভাবে আত্মানুসন্ধান করি, আত্মার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, আপনাকে ভাল করিয়া চিনিয়া ফেলি, তখন বুঝিতে পারি যে আমি পাপের দাস, বাসনা প্রবৃত্তির পদানত, অহঙ্কার আত্মাভিমানের ক্রীড়াপুত্তলী, আমার ভিতরে অনন্ত নরক রহিয়াছে, তখন প্রাণে নিরাশা আসিবারই কথা। মনে হয় আমি যাহা, তাহা যদি লোকে জানিয়া ফেলে তবে হয়ত তাহারা আমাকে তাহাদের নিকটেও বসিতে দেন না। আমি যখন এত অসার অপদার্থ, আমি যখন নরকের আধার হইয়া রহিয়াছি, তখন পবিত্রতার আধার যিনি, পুণ্যের রাজা যিনি, সেই ন্যায়বান্ দেবতা কি আমাকে গ্রহণ করিবেন? তখন বস্তুতঃ নিরাশার অন্ধকার আসিয়া জীবনকে গ্রাস করে। কিন্তু তাঁহার অনন্ত প্রেমের কথা স্মরণে থাকিলে, বিশ্বাস করিতে পারি যে তাঁহার প্রেমে কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষ যাহাকে নরকের কীট বলিয়া ঘৃণা করে, তিনি প্রেমের গুণে তাহাকেও আপনার কোলে আশ্রয় দেন। একদিন দেখিলাম একটী শিশুর সর্ব্ব শরীর দুর্গন্ধময় ক্ষত দ্বারা পূর্ণ রহিয়াছে। তাহা হইতে সর্ব্বদা পুঁজ ও রক্ত নির্গত হইতেছে, এরূপ পূতিগন্ধ উদ্গীর্ণ হইতেছে, যে তাহার নিকটেও কেহ যাইতে পারে না, তাহার শরীর দেখিতে এরূপ ঘৃণাজনক হইয়াছে যে কেহ সে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারি জননী তবুও আদরে স্নেহের সহিত তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। দেখিয়া প্রাণ বিগলিত হইল। মনে হইল যে পৃথিবীর জননী যদি আপনার সন্তানকে এত ভালবাসিতে পারেন, তবে ইহা কখনই সম্ভব নয় যে মানবাত্মা যখন পাপের পূতিগন্ধময় ক্ষতে পূর্ণ হইবে, তখন তাহার জননী যিনি তিনি তাহাকে ত্যাগ করিবেন। বরং সকলে যখন ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করিবে, তখন তিনি অধিক স্নেহ ও আদরের সহিত তাহাকে আপন বক্ষে ধারণ করিবেন। অজস্রধারে তাঁহার প্রেম তিনি আমাদের উপরে বর্ষণ করিতে-ছেন। যখন আমরা পাপান্ধকারে ডুবিয়া যাই, তখনও তাঁহার প্রেম আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না, কিন্তু আমাদের অন্ধ চক্ষু তখন তাহা দেখিতে পায় না। পাপীর পাপ বস্তুতঃই তিনি দেখিতে পারেন না। তাঁহার সন্তান পাপে মৃতপ্রায় থাকিবে ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। পাপীকে তাঁহার মঙ্গলের পথে ফিরাইবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত রহিয়াছেন। ঈশা একদিন বলিয়াছিলেন "যে এক মেষপালকের ১০০ মেষের মধ্যে একটী পথ ভ্রান্ত হইয়া কোথায় হারাইয়া গেল। মেষপালক তখন অপর ৯৯ টীকে রাখিয়া সেই একটীর অনুসন্ধানে গেলেন এবং যতক্ষণ তাহাকে গৃহে আনিতে না পারিলেন, ততক্ষণ বিরত হইলেন না। সেইরূপ পরমেশ্বরের সকল সন্তানের মধ্যে যদি একটী তাঁহাকে ছাড়িয়া পাপের পথে যায়, তবে তিনি তাহাকে যতদিন না আপনার গৃহে ফিরিয়া আনিতে পারেন, ততদিন নিশ্চিন্ত হন না। এই কথা বস্তুতঃই সত্য। তাঁহার অনিমেষ প্রেমদৃষ্টি আমাদের প্রতি সর্ব্বদাই রহিয়াছে, পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আপনার প্রেম বাহুকে তিনি দিবানিশি প্রসারিত করিয়া রাখিয়াছেন; আমরা অবিশ্বাসী বলিয়া তাহা না দেখিয়া, নিজ নিজ জীবনে পাপের প্রভাব দেখিয়া নিরাশ হইয়া থাকি। যে ব্যক্তি চিরজীবন সুখাদ্য ভোজন করিয়া, সুখশয্যায় শয়ন করিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করে, বিদেশে প্রতিকূল অবস্থার ভিতরে পড়িয়া এক দিন ভাল না খাইতে পাইয়া, সে যদি প্রতিনিয়ত সেই কথা স্মরণ করিয়া

দুঃখ প্রকাশ করে, তবে সে যেমন অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়বিহীন, সেইরূপ আমরা চিরদিন পরমেশ্বরের অপার করুণা উপভোগ করিয়া এবং কত আনন্দ অনুভব করিয়াও যদি একদিন জীবনে শুষ্কভাব দেখিয়া অথবা পাপের প্রবলতা দেখিয়া একেবারে নিরাশ হই এবং তাঁহার প্রেমের কথা ভুলিয়া যাই, তবে আমরা বড়ই অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী।

বনফুল।

(২)

১। জ্ঞানে যেমন বিশেষ হইতে সাধারণে পঁহুছিতে হয়, প্রেমেও সেইরূপ। একটী বস্তুর প্রতি প্রেমের সঞ্চার হইলে, ক্রমে উহা যত্নের সহিত বর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হয়। বারি যেমন যত অল্প স্থান অধিকার করে, ততই গভীর হয়, প্রেমও সেইরূপ প্রথমে গভীর হওয়া প্রয়োজন বলিয়া অল্প স্থানে আবদ্ধ করিতে হয়। যদি প্রথম হইতেই বস্তু বিশেষে আবদ্ধ না হইয়া মানব প্রেমকে জগতে ছড়াইয়া পড়িতে দেখা যায়, তবে অধিকাংশ স্থলেই উহার গভীরতা অল্পই মনে করিতে হইবে।

২। অশনিপাতে গিরি-শৃঙ্গের বিচ্ছেদ হওয়াও সম্ভব, তথাচ এমন বিপৎপাত হওয়া অসম্ভব, যাহা প্রেম-মিলিত দুইটী আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে।

৩। "কুম্ভীর" পোকা আর্‌সালাকে ধরিলে যেমন তাহার আর নিস্তার নাই, তাহার পলায়নের পথ আর থাকে না, তাহার বর্ণ পর্য্যন্ত হন্তারকের বর্ণ সদৃশ হয়, সেইরূপ প্রেম যাহার আত্মাকে অধিকার করে, তাহার আর নিস্তার কোথায়? তাহার আত্মার স্বাভাবিক বর্ণ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া, প্রেমমাখা হইয়া উঠে।

৪। প্রেমিক সূর্য্যমুখী পুষ্পের ন্যায়। প্রিয়তম যে দিকে, প্রেমিকের প্রাণও সেই দিকে। তাঁহার শরীর, মন, হৃদয় ও আত্মার লক্ষ্য প্রিয়তমেরই দিকে। যতক্ষণ প্রেমসূর্য্য উদিত থাকেন, ততক্ষণই প্রেমিকের দিবস, ততক্ষণই তাঁহার সজীব ভাব। প্রিয়তমের আননের জ্যোতি অপসারিত হইলে, জগৎ প্রেমিকের পক্ষে অনন্ত অন্ধকারে পরিপূর্ণ; এই অবস্থাই তাঁহার পক্ষে প্রকৃত রজনী। সেই মুখের দিব্য কিরণ অস্তমিত হইলে, প্রেমিকের অন্তরের আনন্দ, উৎসাহ, প্রফুল্লতাও যেন অস্তমিত হয়, ভানু-বিরহ-সন্তপ্তা সূর্য্যমুখীর ন্যায় প্রেমিকের মুখারবিন্দ ম্লান ও অবনত হয়।

৫। ভূমি পবিত্র না হইলে প্রেমের "ফসল" জন্মে না।

৬। যে হৃদয়ে প্রেমধারা বর্ষিত হইতেছে, যে হৃদয়ে প্রেম-বসন্তের আগমনে শুষ্ক ভাব সমূহ মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতেছে এবং যে হৃদয় সেই সুবসন্তের পুষ্প-নিশ্বাসে আমোদিত হইতেছে, সে হৃদয়ের নিকট যাইলেই, যেন আমাদের হৃদয়ের উপর দিয়া ক্ষণকালের জন্য এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া যায় এবং আমাদের আত্মা নবস্নাত ধরণীর ন্যায় নির্ম্মল হরিৎ বেশ ও শিশিরসিক্ত অর্দ্ধ-বিকশিত কুসুমের ন্যায় প্রফুল্ল আকার ধারণ করে।

৭। প্রেম না জন্মিলে আত্মার বিকাশই হয় না। প্রেমের অঙ্কুর হইবামাত্র আত্মার যৌবন আরম্ভ হইল। নবীন প্রেমে মত্ততা আছে। প্রবীণ প্রেমিকের আত্মাতে কোন নিকৃষ্ট ধাতু নাই। উহা খাঁটি, নিখুত, মত্ততা-শূন্য।

৮। গ্রীষ্মপ্রধান-সংসার-দেশবাসী যখন প্রেমরূপ তুঙ্গ ধবলা গিরির অভিমুখে যাত্রা করেন, যখন তাঁহার আত্মা প্রেমের হিমালয় প্রদেশে উঠিতে থাকে, তখন অপূর্ব্ব স্নিগ্ধকর প্রেমবায়ুর স্পর্শে তাঁহার সংসার দগ্ধ আত্মা জুড়াইতে থাকে। প্রেমশৈলের চিরপূর্ণ উৎস হইতে যে শান্তিস্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই প্রকৃত শান্তি-সলিল।

৯। সেই আত্মা-ধীবরের প্রেমের "টোপ্" যিনি গলাধঃকরণ করিয়াছেন, যে আত্মা-মীন তাঁহার প্রেমজালে জড়িত হইয়াছে, তাঁহার আর নিস্তার নাই। আত্মা-মীন প্রাণ-ধীবরের প্রেম-কণ্টকে বিদ্ধ হইবামাত্র প্রেমিক ধীবর তদ্দণ্ডেই তাহাকে এই ভীষণ-তরঙ্গায়িত সংসার-সমুদ্র হইতে তীরে উত্তোলন করেন।

১০। প্রেমিকের প্রাণ বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ়, অথচ পুষ্পের ন্যায় কোমল।

১১। যাঁহার শোণিতে প্রেমধাতু মিশ্রিত হইয়াছে, তিনিই সুস্থ ও সুন্দর। প্রেম আত্মার অঙ্গরাগ। যেখানে প্রেম, সেই খানেই সৌন্দর্য্য। যেখানে সৌন্দর্য্য, সেইখানেই সকল সৌন্দর্য্যের প্রাণ স্বয়ং পরব্রহ্ম বর্ত্তমান। যেখানে প্রেমের অভাব, সেই খানেই মলিনতা। মলিনতাই পাপ—হরি "সুন্দরং" তথা হইতে বহুদূরে।

১২। "প্রেমতোঽব্রহ্মপদং গোষ্পদতুল্যং হি ভবেৎ" প্রেমের হস্তে স্বয়ং ব্রহ্ম করতলন্যস্ত আমলকবৎ। প্রেম ভিন্ন মুক্তি কোথায়?

১৩। প্রেম মানব জীবনের ন্যায় গম্ভীর এবং আত্মার ন্যায় গভীর। সত্য সত্যই প্রেম জলধির গর্ভে অগণ্য মণিমুক্তা পাওয়া যায়। "সাত রাজার ধন" যদি কোথাও পাওয়া যায়, তবে উহা "হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে।"

১৪। সঙ্গ হইতে যেমন মানব চরিত্রের ঘ্রাণ পাওয়া যায়, সেইরূপ প্রেমের বস্তু কি, জানিলেই আত্মার নাড়ীও বুঝা যায়।

১৫। নবীন প্রেমিকের প্রেম-গুঞ্জর বড় মধুর, কিন্তু প্রবীণ প্রেমিকের নীরব অবস্থা আরও গম্ভীর অথচ সুমধুর। প্রেম যতই ঘনীভূত হয়, প্রেমিকের কেশ যতই ধবলতা প্রাপ্ত হয়, আত্মা-ভৃঙ্গ প্রেম-পীযূষ পানে যতই উন্মত্ত হয়, ততই "গুন্ গুন্" শব্দ হ্রাস পাইতে থাকে, এবং অবশেষে তিনি নেশাতে বেহুঁশ হইয়া পড়িলে, তাঁহার আর সাড়াই পাওয়া যায় না।

১৬। আশা প্রীতির জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, "Hope, Love's elder sister."

১৭। ঈশ্বরপ্রেমিক কাহারও নহেন, আবার তিনি সকলেরই। প্রেম-বিস্ফারিত হৃদয়-সরোজ অনন্ত আকাশকে অন্তরে ধারণ করে।

১৮। অলিকুল যেমন মধুপূর্ণ চক্রের নিকট আপনাপনিই আইসে, সেইরূপ ধর্ম্মপিপাসু মানব স্বভাবতই প্রেমিকের নিকট গমন করে। যাঁহার নিকট যত প্রেমমধু থাকে, তাঁহার সমীপে তত মধুকর আকৃষ্ট হয়। মধুচক্রকে ভ্রমর ডাকিতে যাইতে হয় না।

১৯। প্রেম থাকিলে কোথাও না যাইয়া নীরবে ধর্ম্ম-প্রচার করা যায়।

২০। মুক্তি যখন মাতৃহস্তে রহিয়াছে, তখন তাহার জন্য প্রেমিকের ভাবনা কি? প্রেমিক ভয় ভাবনার অতীত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদারতা।

(প্রাপ্ত)

তুঁষের আশঙ্কায় অনেকে শস্যকে পরিত্যাগ করিতেছে এবং শস্যের লালসায় বহুতর লোক তুঁষ গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু ধীর প্রকৃতি চিন্তাশীল ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিরা তুঁষ মিশ্রিত শস্য হইতে তুঁষগুলি বাছিয়া ফেলিয়া শস্য সকল গ্রহণ করেন। একই বৃক্ষে যেমন সুকোমল গোলাপ এবং সুতীক্ষ্ণ কণ্টক থাকে, তেমনি সংসারের কার্য্য ঘটনা এবং আচার আচরণের মধ্যে সত্য ও অসত্য গলাগলি হইয়া রহিয়াছে। অনেক লোক পাছে অসত্যের কণ্টকে হস্ত ক্ষতবিক্ষত হয় এই আশঙ্কায় অপূর্ব্ব সত্য কুসুম পরিত্যাগ করিতেছেন। আবার অনেকে, সত্য গোলাপ লাভ করিতে যাইয়া অসত্য কণ্টকাঘাতে হস্ত রক্তাক্ত করিতেছেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ সাবধানিরা আপনাকে রক্ষা করিয়া কাঁটার মাঝখান হইতে গোলাপটী তুলিয়া লইতেছেন। নানা প্রকার অসত্য ও কুসংস্কারের মধ্য হইতে সত্য রত্নের উদ্ধার করিতেছেন, যিনি পিপাসু তাঁহার প্রাণ কোন সম্প্রদায়ের মতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। সত্যের জন্য তিনি লালায়িত এবং সত্যেতেই তিনি আবদ্ধ। সম্প্রদায় বিশেষের মত বলিয়া তিনি কোন মতকে শ্রদ্ধা করেন না, যাহা সত্য তাহা যে সম্প্রদায়েরই মত হউক না কেন তাহাই তাহার শ্রদ্ধেয় এবং গ্রাহ্য। অনেক সম্প্রদায়ী লোককে এমন সংকীর্ণচেতা দেখা যায় যে, পাছে তাহাদের মতের বিরোধী কোন বিষয় সত্য হইয়া যায়, এই ভয়ে সদা ব্যতিব্যস্ত। এরূপ লোকেরা ধর্ম্মের বাজারে বসিয়া সংসারের জিনিষপত্র ক্রয় বিক্রয় করিতেছেন। বস্তুতঃ সত্যেরদিক, ধর্ম্মেরদিক অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক জয় পরাজয়ের দিকই তাহাদের লক্ষ্য অধিক। পাছে আমাদের দলের পরাজয় হয় এই চিন্তাতেই তাহাদের সত্যানুরাগ বিশুষ্ক হইয়া যায়। আপনাদিগের সাম্প্রদায়িক কয়েকটী সংকীর্ণ মতের বাহিরে আর কোথাও কিছু আছে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার তাহাদের ইচ্ছাও হয় না, অবকাশও থাকে না। কিন্তু প্রকৃত সত্য-পিপাসু ব্যক্তির রীতি চরিত্র এরূপ নহে। তিনি পরিত্যক্ত বিষয়ের মধ্যে সত্য দেখিলে তাহা গ্রহণ করিতেও সঙ্কুচিত হন না, এবং গৃহীত মতামতের মধ্যে কোন অসত্য দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিতেও ইতস্ততঃ করেন না। সপক্ষ বিপক্ষের নিন্দা প্রশংসা কিম্বা স্বসম্প্রদায়ের জয় পরাজয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিয়া তিনি চলিতে পারেন না। অন্য সম্প্রদায় কর্ত্তৃক পরাজিত কি অপমানিত হইলে তিনি দুঃখিত হন না, কিন্তু তাঁহার দ্বারা যদি কোন সত্য পরিত্যক্ত কিম্বা কোন অসত্য গৃহীত হয়, তবে তিনি আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত মনে করেন। এইরূপ কতকগুলি উদার চরিত্র সত্যপিপাসু লোক লইয়াই ব্রাহ্মসমাজ গঠিত হইয়াছে। "সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং" ইহাই ব্রাহ্মধর্ম্মের বিজ মন্ত্র। কিন্তু এই মন্ত্রটী মুখে উচ্চারণ করা যত সহজ, জীবনে পালন করা তেমনি কঠিন। ব্রাহ্মমাত্রেই হৃদয়ে এই মন্ত্র লইয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, অনেকে জীবনে তাহা ধরিয়া রাখিতে পারিতেছেন না। বর্ষার জলে সমস্ত স্থল প্লাবিত হইলে ক্ষুদ্রকূপের মৎস্য যেমন কিছু কাল প্রাণ খুলিয়া অনন্ত জলরাশিতে সাঁতার দিয়া, জল হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী ক্ষুদ্রকূপে প্রবেশ করে, সেইরূপ অনেকে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সীমা লঙ্ঘন করিয়া কিছুকাল অনন্তউদারতার বক্ষে বিচরণ পূর্ব্বক আবার যেন নূতন সংকীর্ণতার বেড়ী পায় পরিতেছেন। পাছে লোকে আমাদিগকে ভুল করে, এই আশঙ্কায় অনেকে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত রীতিমত মিশিতে এবং ঐ সকল সম্প্রদায়ের প্রচলিত আচরণ সকলের মধ্য হইতে সত্য নিষ্কাষণ বা গ্রহণ করিতেও অতিশয় সঙ্কুচিত হইতেছেন, ইহা কল্যাণের কথা নহে। ঈশ্বর না করুন, যদি এইরূপ অনুদারতা দিনদিন বৃদ্ধিপায় তবে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অত্যন্ত অশান্তি ও কলহ উপস্থিত হইবে এবং বিনা কারণে উদার প্রকৃতি ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মসমাজ হইতে পৃথকরূপে গণ্য হইবেন, সুতরাং এই সময় উদারতা সম্বন্ধে আলোচনা অত্যন্ত সুসঙ্গত এবং সুসাময়িক।

অনুদারতা অনেক সময় কেবল যে ঘর লইয়াই সন্তুষ্ট থাকে, এমন নহে। পরকে দেখিতেও কষ্ট পায়। আপনার মত গুলি সত্য, কেবল একথা বলিয়া সে তৃপ্ত হইতে পারে না; তাহার বাহিরে যে আর কিছু সত্য আছে, তাহা স্বীকার করিতেও সে রাজি নহে। আমরা এরূপ রোগাক্রান্ত লোক ব্রাহ্মসমাজে ঢের দেখিতে পাই, যাহারা কেবল আপনার মতকে শ্রদ্ধা করিয়া কি মতবিরোধী বিষয়কে ঘৃণা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন না, নিজ মতের বাহিরে যাহা কিছু সমুদয়ই অশ্রদ্ধেয় মনে করেন। যাহা কিছু আমার মতের বাহিরে তাহাই আমার মতবিরোধী নহে এবং যাহা কিছু আমি বিশ্বাস করিতে পারি না তাহাই আমার ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ নহে, এই দুইটী কথা অনেক লোক একেবারেই ভুলিয়া যান। কাজেই নিজের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে যাহা কিছু সমস্তই তাঁহার ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন। ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক মত সকল ঠিক্ এক রূপ হইবে, আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের প্রকরণগুলি একই হইবে, সামাজিক কি পারিবারিক রীতি নীতিতে কোনই প্রার্থক্য থাকিবে না, অর্থাৎ এক ধর্ম্মাক্রান্ত সমুদয় লোকগুলি বিলাতী সাবানের ন্যায় সমস্ত একই ছাঁচে ঢালা হইবে, এরূপ প্রত্যাশা করা সুসঙ্গত নহে এবং এরূপ হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। সকলকে এইরূপে মিলাইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া এমনই ঘোরতর মতান্তর উপস্থিত হয় যে, সেই মতান্তরে মনান্তর ঘটিয়া, একই দলকে বহুধা বিচ্ছিন্নরূপে প্রতি-পাদন করে। এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মত এবং সেই মতের ব্যাপ্তি কতদূর তাহা সতর্কতার সহিত সর্ব্বদা মনে রাখা কর্ত্তব্য। আরও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সেই মতে বিশ্বাস করিলেই সেই ব্যক্তি ব্রাহ্ম, তাহার বাহিরে তাহার শত সহস্র স্বতন্ত্র মত ও বিশ্বাস থাকিলেও সে অব্রাহ্ম হইবে না। যেমন পরকাল না

মানিলে আমি অব্রাহ্ম, কেন না আত্মার অনন্ত উন্নতি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের একটী মূল মত। কিন্তু পরকালে সাতটী লোক আছে আত্মা সকল কর্ম্মানুসারে তাহাতে বাস করে এবং ইচ্ছা হইলে ইহলোকের মনুষ্যদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, নানা বিষয়ে তাহাদিগের সাহায্য করিতে পারে এবং ইহলোকের লোকেরাও অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হইলে, পরলোকগত আত্মাকে দেখিতে পায় ইত্যাদি বিশ্বাস করিলে আমি কিছু অব্রাহ্ম হইব না। আমি যদি পৃথিবীকে স্থিরা বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহাতে আমি অজ্ঞান হইতে পারি, কিন্তু কখনই অব্রাহ্ম নহি। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন মানব-জ্ঞানের অনন্ত উন্নতিতে বিশ্বাস করেন, তখন অজ্ঞানতা চিরকালই মানব জীবনের সঙ্গী থাকিবে, সুতরাং অজ্ঞানতা থাকিলেই অব্রাহ্ম হইবে, একথা বলিলে জগতে কাহাকেও ব্রাহ্ম বলা যায় না। কেবল দেখিতে হইবে আমার বিজ্ঞতা কি অজ্ঞতা ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল মতের বিরোধী কি না।

আর একটী কথা এই যে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং সমাজ এক কথা নহে। ব্রাহ্মসমাজে যে সমস্ত রীতি নীতি প্রচলিত আছে, তাহার সমগ্র পালন না করিলেই কেহ যে অব্রাহ্ম হইবে তাহা নহে। আমি বিশ্বাস করি ব্রাহ্মসমাজের মহিলারা অতি শিষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করেন, কিন্তু সেইরূপ না করিলেই কেহ অব্রাহ্ম হইবে না। কোন ব্যক্তি যদি বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী না হয়, এবং দেশকাল বিবেচনায় স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধী হয় সেজন্য তাহাকে অব্রাহ্ম বলা যাইবে না। একজন যদি চিত্ত সংযমের জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অবিরোধী কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে অপ্রচলিত নানাবিধ বাহ্য উপায় অবলম্বন করে,তাহাতেও সে অব্রাহ্ম হইবে না। আমি যদি খ্রীষ্টের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এবং তাঁহার অনুকরণে জীবন গঠনের জন্য বক্ষে ক্রূশ চিহ্ন ধারণ করি, কিম্বা শারীরিক উষ্ণতা দূর হইবে মনে করিয়া, চন্দন কিম্বা তুলসীর মালা পরি, মস্তক মুণ্ডন করি কি জটাধারণ করি, গৈরিক কিম্বা নীলবস্ত্র পরিধান করি। তাহাতে আমি অব্রাহ্ম হইব না। বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বলিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অবিরোধী যে সকল প্রণালী ও আচার ব্যবহার আছে সে সকল জীবনে পরীক্ষা করিতে যাইয়া," আমি কখনই অব্রাহ্ম হইব না বরং তাহা আমার ব্রাহ্মোচিত কার্য্যই হইবে। অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক বলিয়া অনেকে অনেক কথা উড়াইয়া দেন। কিন্তু জীবনের পরীক্ষায় এমন অনেক বিষয় প্রকাশিত হয়, যেখানে যুক্তি ও বিজ্ঞান নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দর্শন করেন (১) এই জন্য যে সকল মত বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে,তাহার বিষয় জীবনে পরীক্ষা করাই কর্ত্তব্য। কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাসের বিরোধী হইলে তাহা কদাচই করা যায় না। কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় যদি বলেন যে অমাবস্যার নিশিতে উপবাস করিয়া এক পায়ে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিলে চিত্ত সংযত হয়, আমি তাহা করিতে পারি, কিন্তু সেই রাত্রে ঈশ্বরোদ্দেশে একটী বলি প্রদান করিতে বলিলে সেরূপ করা অধর্ম্ম এবং অব্রাহ্মোচিত কার্য্য মনে করি। দুঃখের বিষয় এই যে অনেক ব্রাহ্ম উদারতা অবলম্বন করিতে যাইয়া, অব্রাহ্মোচিত কার্য্য করিতেছেন। আবার অনেকে কুসংস্কার তাড়াইতে যাইয়া ঘোরতর কুসংস্কারী হইয়া পড়িয়াছেন। আশ্চর্য্য এই যে অনেক ব্রাহ্ম রোগ নিবৃত্তির জন্য অনেক ঔষধ ধারণকেও একটা অব্রাহ্মোচিত কার্য্য মনে করেন। ভূতের রোজাকেও নাকি অনেক সময় ভূতে ধরে ইহাদের অবস্থাও তাই। যাহা হউক ব্রাহ্মগণ যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছেন তাহা সত্য এবং তাহার বাহিরেও অনেক সত্য আছে, এই জ্ঞান ব্রাহ্মদের উজ্জ্বলভাবে থাকা চাই। জীবনের কল্যাণকর সহস্র প্রকার বিভিন্ন প্রণালী আমরা অবলম্বন করিতে পারি। কেবল দৃষ্টি থাকিবে, শস্যের সঙ্গে তুঁষ গ্রহণ না করি, এবং তুঁষ দেখিয়া শস্য পরিত্যাগ না করি। যে অত্যুদার ভিত্তির উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট মতের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলে কখনই সুফল দাঁড়াইবে না। ব্রাহ্ম সত্য চায়, "সত্যং শান্তমনশ্বরং" এই স্বর্গীয় গাথা ব্রাহ্মের হৃদয়-রক্তে লেখা আছে। মৃত জীবনই গণ্ডীর মধ্যে থাকিবে। যদি সকলের জন্যই গণ্ডী কর, তবে জীবন্ত লোকেরা আজ হউক কালি হউক নিশ্চয় সে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া পলাইবে।

(১) বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহোদরা ভগিনী পূর্ণ বয়সে কোন প্রকার প্রক্রিয়া বা সাধন ভজন ভিন্ন ২।৩ বৎসর পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাসে সবল ও সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিয়া, পতি ও পরিজনবর্গের সহিত সমগ্র গৃহকার্য্য রীতিমত নির্ব্বাহ করিতেন। এক ফোঁটা জল পান করিলে, অমনি উদ্গার হইয়া পড়িয়া যাইত, শেষে কিছুই খাইতেন না। পরে একদিন বমি হইয়া ক্ষুধার উদয় হইল। এই মহিলা এখনও জীবিত আছেন এবং এই ঘটনা ঢাকা ও বরিশালের ব্রাহ্মগণ এবং বিক্রমপুরের অনেক লোকে জানেন। বিজ্ঞান যুক্তি এখানে অন্ধকার দেখিবেন। এরূপ অনেক ঘটনা আছে।

দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

(১)

এই প্রবন্ধে দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রভেদ সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইবে; কোন পক্ষই সমর্থিত হইবে না। কেবল প্রভেদ প্রদর্শনের জন্য যতটুকু যুক্তির প্রয়োজন তাহাই দেওয়া হইবে। প্রথমাংশে আমরা বিষয় ও বিষয়ী সম্বন্ধে বলিব, দ্বিতীয়াংশে জীব ও ব্রহ্মের বিষয় বলিব।

যে কোনও জ্ঞানেরবিষয়ই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যাক্ না কেন, প্রত্যেকের মধ্যেই বিষয়ী ও বিষয়,জ্ঞাতা ও জ্ঞাত এই চটী ভাব, চটী উপকরণ, দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় মাত্রেই দ্বৈতাদ্বৈতভাব সম্পন্ন। জ্ঞান ব্যাপারটাই দ্বৈতাদ্বৈতভাবসম্পন্ন। আমার হাতের কলমটীকে পরীক্ষা করিলে,দেখিতে পাই ইহার মধ্যে বিষয় বিষয়ী,জ্ঞাত ও জ্ঞাতার দ্বৈতাদ্বৈতভাব রহিয়াছে। প্রথমতঃ কলমের বর্ণের বিষয় ভাবা যাক্। এই বর্ণ আমার জ্ঞানের বিষয়, আমি বর্ণকে জানিতেছি, ও বর্ণের জ্ঞাতারূপে আমাকে জানিতেছি। বর্ণ আমার জ্ঞাত বিষয়রূপে প্রতিভাত হইতেছে, আমিও এস্থলে বর্ণের জ্ঞাতারূপেই প্রকাশ পাইতেছি। বর্ণের জ্ঞান রূপ ব্যাপারটীতে এইরূপ আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞান উভয় দিক্ অবিচ্ছেদ্যরূপে মিশ্রিত হইয়া রহি

য়াছে। একদিক্ ছাড়িয়া দিলে অপর দিকের জ্ঞান থাকে না। এইরূপে কলমটীর যে কোন গুণ ভাবিতে যাই, সমুদয়ের মধ্যেই এই দ্বৈতাদ্বৈতভাব দৃষ্ট হইবে। এইরূপে যে কোন বিষয় পরীক্ষা করা যাক, দেখা যাইবে যে সমুদায়ের জ্ঞানের মধ্যেই এই দ্বৈতাদ্বৈতভাব বর্ত্তমান। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় ছাড়িয়া কেবল স্মৃতি বা ভাবনাকে পরীক্ষা করিলেও দৃষ্ট হইবে, তাহার মধ্যেও এই দ্বৈতাদ্বৈতভাব বর্ত্তমান। স্মরণকারী কোন বিষয়ের স্মরণকারীরূপেই নিজকে জ্ঞাত হয়, এবং স্মৃতির বিষয় কোন স্মরণকারীর স্মৃতির বিষয়রূপেই প্রকাশিত হয়। কল্পনাকারী কোন বিষয়ের কল্পনাকারীরূপেই আপনাকে উপলব্ধি করে, এবং কল্পিত বিষয় কোন কল্পনাকারীর কল্পনাতেই প্রতিভাত হয়। জ্ঞানের এই দ্বৈতাদ্বৈতভাব অপরিহার্য্য। জ্ঞানে এক দিকে বিষয় বিষয়ী ও জ্ঞাত জ্ঞাতার প্রভেদ, আর একদিকে অবিচ্ছেদ্য যোগ। জ্ঞাতা নিজকে জ্ঞাত বস্তু হইতে প্রভেদ করে, জ্ঞাতবস্তুর সঙ্গে দ্বৈতভাব অনুভব করে বলিয়াই নিজকে জানে; আবার নিজ হইতে জ্ঞাতবস্তুকে প্রভেদ করে, জ্ঞাতবস্তু সমূহকে পরস্পর হইতে প্রভেদ করে, বলিয়াই বস্তুকে জানে। এই প্রভেদবোধ, এই দ্বৈতভাব, জ্ঞানের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। অপরদিকে আত্মজ্ঞান ছাড়া বিষয়জ্ঞান সম্ভব নহে। জ্ঞাতার জ্ঞাতবস্তুরূপেই বিষয় প্রকাশিত, বিষয়ের জ্ঞাতারূপেই বিষয়ী প্রকাশিত। একদিকে যেমন প্রভেদবোধ দরকার, অপর দিকে তেমনি একত্ববোধ দরকার। একদিকে যেমন দ্বৈতভাব অপরিহার্য্য; অপর দিকে তেমনি অদ্বৈতভাব ও অপরিহার্য্য। তাই বলা হইয়াছে, জ্ঞান ব্যাপারটাই দ্বৈতাদ্বৈতভাব-সম্পন্ন।

প্রায় কোন দার্শনিকই এই কথা অস্বীকার করেন না। জ্ঞান যে দ্বৈতাদ্বৈতভাব-সম্পন্ন ইহা প্রায় সর্ব্ববাদী-সম্মত। জ্ঞানতত্ত্বে প্রায় মতভেদ নাই; মতভেদ যত অস্তিত্বতত্ত্বে। এখন এই প্রভেদ দেখাইব। প্রথমতঃ দ্বৈতাদ্বৈতবাদীরা বলেন, জ্ঞানের বেলায় যাহা দেখি, অস্তিত্বের বেলায়ও তাহাই স্বীকার করি। জ্ঞানতত্ত্বই অস্তিত্বতত্ত্বের একমাত্র ভিত্তি। জ্ঞানে যেমন দেখি বিষয় ও বিষয়ী ভিন্ন, অথচ এক, দ্বৈতাদ্বৈতভাব-সম্পন্ন, অস্তিত্বে ও তেমনি। বিষয় ও বিষয়ী পরস্পরকে ছাড়িয়া যেমন প্রকাশিত হইতে পারে না, তেমনি থাকিতেও পারে না। জ্ঞান আর অস্তিত্ব একই। বিষয়ের থাকার অর্থ জানিত হওয়া; জানিত না হইয়া অর্থাৎ জ্ঞাতাকে অবলম্বন না করিয়া বিষয় থাকিতে পারে না। বিষয়ীর থাকার অর্থ জানা; না জানিয়া, আত্মজ্ঞান ও বিষয়জ্ঞানবিরহিত হইয়া বিষয়ী থাকিতে পারে না। বিষয় বিষয়ীর নিত্য সম্বন্ধ। দ্বৈতবাদী কি বলেন? দ্বৈতবাদী জ্ঞানের প্রভেদবোধের দিকেই বিশেষরূপে দৃষ্টি করেন, একত্ববোধের দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি নাই। তিনি দেখিয়াছেন জ্ঞানে বিষয় বিষয়ী ভিন্ন রূপে প্রকাশিত, সুতরাং তিনি মনে করেন যে অস্তিত্বেও বিষয় বিষয়ী ভিন্ন। বিষয়ীকে আমরা কেবল জ্ঞাতারূপেই জানি, বিষয়কে কেবল জ্ঞাতরূপেই জানি—জ্ঞান-বিরহিত অবস্থায় বিষয়ী কি, বিষয় কি, আমরা কিছুই জানি না,—কিছুই ভাবিতেও পারি না,—জ্ঞান বিরহিত অবস্থায় বিষয় বিষয়ী উভয়ই অভাবনীয়—এই কথা যে দ্বৈতবাদী বুঝিয়াছেন, তিনি বলেন আমরা ভাবিতে পারিনা ইহা আমাদের দুর্ব্বলতা, ভাবিতে না পারিলেও বিশ্বাস করিতে পারি এবং এই বিশ্বাস অপরিহার্য্য যে বিষয় বিষয়ী পরস্পর হইতে পৃথক পদার্থ। সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে দ্বৈতবাদিকে অজ্ঞেয়তাবাদী হইতে হয়, এই জন্যই উচ্চতর দ্বৈতবাদীরা অজ্ঞেয়তাবাদী। এখন অদ্বৈতবাদীরা কি বলেন দেখা যাক। দ্বৈতবাদী যেমন জ্ঞানের দ্বৈতভাবের দিকেই বিশেষরূপে দৃষ্টি করেন, অদ্বৈতবাদী তেমনি জ্ঞানের একত্বের দিকেই বিশেষরূপে দৃষ্টি করেন। অদ্বৈতবাদী বলেন প্রভেদ কেবল জ্ঞানকার্য্যে; কেবল জ্ঞানকার্য্যেই বিষয় বিষয়ী ভিন্ন, দ্বৈতভাবাপন্ন, কিন্তু বস্তু মূলে একই। একই বস্তু নিত্য দ্বৈতভাবাপন্ন হইয়া থাকে, এই কথা যদি অদ্বৈতবাদী স্বীকার করিতেন, তবে দ্বৈতাদ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। কিন্তু অদ্বৈতবাদী বলেন, দ্বৈতভাব সাময়িক, দ্বৈতভাব কেবল জ্ঞানেরই লক্ষণ, কিন্তু জ্ঞান অদ্বৈত বস্তুর নিত্য প্রকৃতি নহে, অদ্বৈত বস্তু জ্ঞান-বিরহিত হইয়াও থাকিতে পারে; অন্ততঃ আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, যে জ্ঞানে বিষয় বিষয়ীর দ্বৈতভাব বর্ত্তমান, সেই জ্ঞান-বিরহিত হইয়া থাকিতে পারে। অদ্বৈতবাদের সাধারণ ভূমি এই। এখন দ্বিবিধ অদ্বৈতবাদের বিশেষ বিশেষ মত কি দেখা যাক্। এক শ্রেণীর অদ্বৈতবাদী বলেন বিষয়ী বা আত্মাই মূল বস্তু। এই বস্তু মূলে সম্পূর্ণরূপে দ্বৈতভাব-বিবর্জ্জিত, প্রভেদবোধ-বর্জ্জিত। ইহা জ্ঞানী নহে, কেননা জ্ঞানী হইতে গেলেই দ্বৈতভাব-সমন্বিত হইতে হয়, প্রভেদবোধযুক্ত হইতে হয়। কিন্তু ইহা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ। এই অবস্থা যুক্তি তর্ক ও সাধারণ চিন্তা দ্বারা বুঝা যায় না। ইহা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে উপলব্ধ হয়; ইহাই পরব্রহ্মের ভাব। এই যে দ্বৈতভাব-রহিত অদ্বৈত বস্তু, তিনিই এক অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তি প্রভাবে প্রভেদবোধযুক্ত হইয়া, দ্বৈতভাবাপন্ন হইয়া জীব ও জীবজ্ঞানের বিষয়ীভূত জড়জগৎ রূপে প্রকাশিত হন। এই জীব ও জগৎ একান্তই মায়া-কল্পিত; ব্রহ্মের পক্ষে, প্রকৃতপক্ষে, ইহার অস্তিত্ব নাই। ইহাই মায়াবাদাশ্রিত অদ্বৈতবাদ। অপর শ্রেণীর অদ্বৈতবাদ জড়বাদাশ্রিত। এই মতাবলম্বীরা বলেন, বিষয় বা জড়ই মূল বস্তু। এই জড় মূলে দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত, জ্ঞান-বর্জ্জিত, কিন্তু ইহা শক্তিরূপী, ইহা নিজ শক্তিতে বিবিধ রূপ ধারণ করে। ইহার শেষ এবং উচ্চতম রূপ জ্ঞান। এই রূপ দ্বৈতভাবাপন্ন বটে, কিন্তু এই রূপ ইহার মূল রূপ নহে, ইহার সাময়িক অবস্থা মাত্র। মূল জড় শক্তি কেবল জীবের মধ্যেই জ্ঞান সম্পন্ন, অন্যত্র অজ্ঞেয় ও জ্ঞান-বর্জ্জিত।

শ্রীসীতানাথ দত্ত।

সত্যের তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক।

(প্রাপ্ত)

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান যেন স্পষ্ট, প্রকৃত এবং যুক্তি সম্বলিত হয়, তজ্জন্য সর্ব্বদা যত্ন করিও। ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক লোকের ব্যগ্রতা অন্ধ ব্যগ্রতা মাত্র। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহাদের

এক রতিও স্পষ্ট জ্ঞান নাই। যাহারা ইহাদের অপেক্ষা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অধিক জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছে, তাহারাও, প্রকৃত ধার্ম্মিকতা কাহাকে বলে, তাহা জানে না। তাহারা মনে করে, অন্তঃকরণের উদ্বেগ বা ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান পালনই ধার্ম্মিকতা। তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপর তোমার নিজের ধার্ম্মিকতা নির্ভর করিতেছে, ইহা জানা আবশ্যক। "সত্যের তত্ত্বজ্ঞান" হওয়াকেই শাস্ত্রে প্রকৃত পরামনন বলা হইয়াছে। যদি সত্য জ্ঞাত হইবার উপায় অবলম্বন না কর, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম ভাব শীঘ্র নষ্ট ও ব্যগ্রতা দূর হইবে। অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়া জ্ঞাত হইতে হইবে এবং ভাবিয়া কার্য্য করিতে হইবে। যদি শিক্ষা না কর, তাহা হইলে কখন প্রকৃত বিষয় বুঝিয়া ন্যায়ানুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। ধর্ম্ম পথে চলিতে আরম্ভ করিয়া অনেকে যে প্রত্যাবর্ত্তন করে বা অতি আস্তে আস্তে গমন করিয়া থাকে; ইহার প্রকৃত কারণ এই যে, ইহারা ঐশ্বরিক সত্য জ্ঞাত হইবার জন্য শিক্ষা করে না! (১) পরামনন করাই ধর্ম্ম। যে ঈশ্বরের প্রতিকূলাচারী হইয়াছে, তাহার স্বভাব ও ব্যবস্থা যদি জ্ঞাত না থাকে, এবং যে পাপ করিয়াছে, তদ্বিষয়ে যদি অজ্ঞ থাকে, তাহা হইলে কি প্রকারে পরামনন করিতে পারিবে? ধর্ম্মে বিশ্বাস করাই ধর্ম্ম। কাহাকে এবং কি বিশ্বাস করিতে হইবে তাহা না জানিলে, কিপ্রকারে প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে পারিবে? ঈশ্বরকে প্রেম করাই ধর্ম্ম। কিন্তু তুমি যাঁহাকে চিন না, তাহাকে কিপ্রকারে প্রেম করিবে? অতএব সময় ও সুযোগ করিয়া এই সকল বিষয় ধ্যান কর এবং বুঝিয়া কার্য্য কর। ধর্ম্মের নিয়মানুসারে চলিবার ও সর্ব্ব সময়ে সান্ত্বনা পাইবার জন্য ধর্ম্ম বিজ্ঞান শিক্ষা ও আলোচনা কর। জ্ঞান ব্যতীত আর কিছুতেই মনে বিশ্বাস বা কোন ভাব জন্মে না। ইহা তোমার বর্ত্তমান অবস্থায় জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য। মন সম্বন্ধে এই একটী নিয়ম দেখিতে পাই। মনে কর, তুমি যদি কোন ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিতে বা ভালবাসিতে চাও, তবে কি প্রকারে মনে বিশ্বাস বা ভালবাসা জন্মিবে? কোন ব্যক্তিকে কেবল দেখিয়াই কি বিশ্বাস করিতে বা ভালবাসিতে পার? কখনই না। কেন যে তাহাকে বিশ্বাস করিবে বা ভালবাসিবে, তাহার কতকগুলি কারণ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। বিশ্বাস করিবার বা ভালবাসিবার কারণ জ্ঞাত না হইলে কখনই বিশ্বাস বা ভালবাসা মনে উদিত হইতে পারে না। এই উপায় ছাড়িয়া আর যতই চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নহে। এই নিমিত্তই ঐশ্বরিক বিষয় সকলের জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া অতীব আবশ্যক। কি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহার জ্ঞান লাভ করাই বিশ্বাস বৃদ্ধির উপায়। যদি প্রেমেতে তুমি বদ্ধমূল হইতে চাও, তাহা হইলে যাহাকে প্রেম করিবে, তদ্বিষয়ক জ্ঞান তোমার বদ্ধমূল হওয়া আবশ্যক। প্রথমে জ্ঞান লাভ, তৎপরে অনুভব এবং সর্ব্বশেষে কার্য্য করাই প্রকৃতির নিয়ম। ঈশ্বরেরও নিয়ম তদ্রূপ। অতএব ধর্ম্ম আলোচনা করা কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে, কখনই জ্ঞানের বৃদ্ধি লাভ করিতে পারিবে না। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান ধর্ম্মের মূল। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বত্র বিদ্যমান এবং সকল হৃদয়ের অনুসন্ধানকারী। তাঁহার নৈতিক গুণ সম্বন্ধে উক্ত আছে, তিনি মঙ্গলময় এবং পবিত্র। তিনি এরূপ পবিত্র যে, আকাশও তাঁহার নিকট নির্ম্মল নহে। তাঁহাতে পাপের লেশমাত্র নাই বলিয়া, তাঁহার ন্যায়পরতা অত্যন্ত কঠিন। ঈশ্বর মিথ্যা কথা কহেন না। তিনি যে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই সফল করিবেন। হে মন, "ঈশ্বরের নৈতিক স্বভাব আলোচনা কর" পাপের প্রতি তাঁহার ঘৃণা অসীম। তিনি নিরন্তরই ইহার বিরুদ্ধ। তাঁহার পবিত্রতা অসীম, ন্যায়পরতা অপরিবর্ত্তনীয় এবং সত্য অলঙ্ঘনীয়। স্থির হইয়া এই সকল আলোচনা কর।

ঈশ্বর আমাদের মন দেখেন এবং তাহার অনুসন্ধান করেন। তজ্জন্যই তিনি অন্তঃকরণের সহিত ব্যবস্থা পালন ও তাহা হইতে সমস্ত কুভাব দূর করিতে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে ঈশ্বরের ব্যবস্থার যে অর্থ করিয়াছে, তদনুসারে চুরি, মিথ্যা কথা, হিংসা এবং ব্যভিচার, এই গুলিকে পাপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে। সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যেন আমরা কার্য্যে, কথায় এবং চিন্তায় নির্দ্দোষ থাকি এবং সম্পূর্ণরূপে ব্যবস্থা পালন করি, ইহাই ঈশ্বরের আজ্ঞা। ইহাতে কোনই ওজর আপত্তি খাটে না। ব্যবস্থার পবিত্রতা অতি গুরুতর বিষয়, পাপীর পক্ষে ইহা বড় ভয়ঙ্কর। কি উদ্দেশ্যে ব্যবস্থা দান করা হইয়াছে, তাহার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। পাপ কি, এবং পাপ করাতে আমরা যে শাস্তির যোগ্য, ইহা জ্ঞাত করাইবার জন্য ব্যবস্থা প্রদান করা হইয়াছে। ব্যবস্থার জ্ঞান না থাকিলে তুমি কিছুই জানিতে পারিতে না। "পাপই ব্যবস্থা খণ্ডন।" যদি ব্যবস্থা না জান, তাহা হইলে পাপ কাহাকে বলে, তাহা কিপ্রকারে জানিবে? এই ব্যবস্থার বিপরীত চিন্তা বা কার্য্য করা যদি পাপ হয়, তাহা হইলে, হে মন, তোমার কত মহাপাপ হইয়াছে, একবার ভাব দেখি? কেবল ইহাই নয়, ব্যবস্থার বিপরীতে যদি কার্য্য না কর, তাহা পালন করিতে যে ক্রটী হয়, তাহাও পাপ। শাস্ত্রে বলে, "তুমি সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত চিত্ত দ্বারা আপন ঈশ্বর প্রভুকে ভক্তি কর," এই প্রথম এবং মহৎ আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টী ইহার সদৃশ, যথা, "তুমি আপন প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য ভালবাস।" কি কঠিন আজ্ঞা! তুমি অতি বড় মহাপাপের অবস্থায় কালযাপন করিতেছ। তোমার জীবন পাপময় কারণ তুমি ঈশ্বরকে ভক্তি কর নাই। ঈশ্বরকে ভক্তি না করা যে পাপ এই একটী পাপেতেই সকল পাপ আছে। বাস্তবিকই ঈশ্বরকে ভক্তি না করা অপেক্ষা আর কি মহাপাপ আছে? জগতকে ভালবাসিতেছ জগতের সামান্য আমোদ প্রমোদ ভাল বাসিতেছ এবং পাপ পর্য্যন্ত ভাল বাসিতেছ, কিন্তু ঈশ্বরকে ভক্তি করিতেছ না ও ভালবাসিতেছ না?

পাপ যে কত বড় মন্দ, তাহা তোমার জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। মনুষ্য পাপকে অতি সামান্য বিষয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই পাপ অতীব ভয়ঙ্কর। ঈশ্বর এবং তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ব্যতিরেকে পাপের মন্দ স্বভাব আর কে বুঝিতে পারে? পাপ প্রযুক্তই জগতে অকালে মৃত্যু ও নানাবিধ দুঃখ প্রবেশ করি-

যাছে। এই যে জগতে পীড়া, নানাপ্রকার দুর্ঘটনা, কঠোর শ্রম, দুর্ভাবনা, মহামারী এবং দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি দেখিতে পাই? কেন এই মনোহর জগৎকে মনুষ্যদিগের সমাধিক্ষেত্র স্বরূপ দেখিতেছি? নরকাগ্নিই কেন প্রজ্বলিত হইতেছে? তাহা কি তুমি কখন বিবেচনা করিয়াছ? পাপই এই সমস্ত বিপদের মূল। এই মন্দ বস্তু তোমাতেও আছে, ইহা চিন্তা করিয়া কি তুমি কম্পিত হও না? কেহ কেহ তোমাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে, পাপ অতি সামান্য বিষয়; ঈশ্বর ইহা বড় ধরেন না। সুতরাং এবিষয়ে তোমার অধিক চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু পাপ সম্বন্ধে চিরাগত ধর্ম্মশাস্ত্র সকল কি বলেন, তাহা বিবেচনা কর। তাঁহার তত্ত্বাবধারণ করা নারকীদিগের যন্ত্রণা দৃষ্টি করিলেই, এসম্বন্ধে ঈশ্বরের ভাব কি, তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি বহু পাপে পাপী। যদি এই সমস্ত পাপের ক্ষমা না পাও, তাহা হইলে বিষম নরক যন্ত্রণানলে তোমাকে জ্বলিতে হইবে।

পাপীর অন্তঃকরণ অশুচির প্রস্রবণ স্বরূপ। ইহা হইতে কর্দ্দমময় জলস্রোত সদৃশ মন্দ ব্যবহার নির্গত হইয়া থাকে। অনেকে মন্দ কার্য্য করিয়াও মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দেয় "আমাদের অন্তঃকরণ ভাল।" ইহা বিষম ভ্রান্তি। সকলেরই, এমন কি ভয়ানক দুষ্টের ও বাহ্যব্যবহার অপেক্ষা অন্তঃকরণ বড়ই মন্দ। মনুষ্য কেন ঈশ্বরকে চিনে না। কেন তাঁহার উপাসনা করে না এবং কেনই বা তাঁহাকে ভক্তি করে না? তাহার কারণ এই, তাহাদের অন্তঃকরণ পাপ ভাল বাসে। কিন্তু মনুষ্যের শৈশবাবস্থায় এরূপ পাপের প্রতি আসক্তি ছিল না। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে তোমার স্বভাবের স্তরে স্তরে পাপ প্রবিষ্ট হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হওয়া অতীব প্রয়োজনীয়। এই জ্ঞান না থাকিলে, বাহ্য আচার ব্যবহার সংশোধন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া অন্তঃকরণের পবিত্রতা অবহেলা করিতে পার। অন্তঃকরণ নূতন না হইলে, সৎকার্য্য করিতে পারিবে না। সমস্ত পাপের ক্ষমা হওয়া যেমন আবশ্যক, অন্তঃকরণ হইতে পাপের দূরীকরণও তদ্রূপ আবশ্যক। যদি অন্তঃকরণ নূতন ও বিশুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তুমি কখন পরিত্রাণ পাইবে না।

ঈশ্বরের কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিষয়ে স্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে এখনই যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়টী না বুঝিলে, শান্তি জন্মিবে না এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমার সমস্ত ভাব জড়ীভূত হইয়া যাইবে। ঈশ্বর পবিত্র ও পাপ ঘৃণাকারী। তিনি এই বিশ্বমণ্ডলের ন্যায়পরায়ণ বিচারক। তাঁহার ব্যবস্থা যে অমান্য করে, সে দণ্ড পাইবার যোগ্য। মনে কর, পাপীর পরামনন ও নিজ আচার ব্যবহার পবিত্র করিবার শক্তি আছে; সেই পরামনন প্রযুক্তই ঈশ্বর তাহাকে পুনর্ব্বার আপন অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন। সকল পাপীর সঙ্গে তিনি এইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইহাতে কি তাঁহার সত্য রক্ষিত হইল? তিনি কি বলেন নাই যে, পাপ করিলেই সাজা পাইতে হইবে? তাঁহার পবিত্রতা, ন্যায়পরতা এবং পাপের প্রতি অসীম ঘৃণাই বা কোথা রহিল? এই ভাবে যদি ঈশ্বর পাপীকে গ্রহণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে পাপ করা নিতান্ত সামান্য বিষয় হইয়া উঠিবে; তাঁহার ব্যবস্থা ও নৈতিক শাসন এক কালে বিদূরিত হইবে। দোষী ব্যক্তি সামান্যরূপ অনুতাপ করিয়াই বিনা বিচারে মার্জ্জনা পাইলে, জাগতিক বা ঐশ্বরিক শাসন কি থাকিতে পারে? ইহা শুনিয়া তুমি হয়ত বলিবে, তবে আর কি করা যাইতে পারে? পাপের জন্য অনুতাপ ব্যতিরেকে পাপী আর কি করিতে পারে? কিন্তু ঈশ্বর কি কেবল সামান্য অনুতাপ দেখিতে বা গ্রাহ্য করিতে বাধ্য? পাপী পাপের জন্য খেদ প্রকাশ ব্যতীত পাপের সাজাও গ্রহণ করিতে পারে। অতএব কেবল খেদ প্রকাশ করিলেই, তাহার সমস্ত করা হইল না। হে মন, তুমি পরিত্রাণের নিমিত্ত ব্যগ্র হইয়াছ এবং পরিত্রাণের আবশ্যকতাও বুঝিয়াছ। নিজ বিবেক ও আন্তরিক ভাব পরীক্ষা করিয়া বল দেখি, তুমি পবিত্রতা এবং পাপের অনিষ্টকারিতা কি বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছ? কেবল মৌখিক অনুতাপ দেখাইলে কি শান্তি পাইবে ভাবিতেছ? না, তুমি পরীক্ষা দ্বারা জানিতে পারিয়াছ, কোন মতেই শান্তি পাইবে না। তুমি অনেক পাপ পরিত্যাগ করিয়াছ, যে সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা করিয়া আসিতেছিলে, তাহার অনেকগুলি এক্ষণে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছ, শাস্ত্র পাঠ, উপাসনা ও ক্রন্দন করিয়াছ এবং বিশেষ সতর্কভাবে কাল কাটাইতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শান্তিলাভ করিয়াছ কি? তুমি বলিতেছ, না, আমি শান্তি পাই নাই। কেন শান্তি পাও নাই? কারণ তুমি জান, ঈশ্বর পবিত্র বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ। যিনি বিশ্বস্ত, ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র তিনি কেমন করিয়া সামান্য অনুতাপ বা বাহ্য আচার ব্যবহার দেখিয়াই পাপ ক্ষমা করিবেন, তাহা বুঝিতেছ না। ইহা সত্য, চক্ষের জল বা সামান্য প্রার্থনার উপর নির্ভর করিয়া যদি পরিত্রাণের আশা কর, ধর্ম্ম তোমাকে ভয় প্রদর্শন করিবে, এবং ঈশ্বরের নিকট হইতে তোমাকে দূর করিয়া দিবে। ঈশ্বর যে পবিত্র ও ন্যায়পরায়ণ, তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম সাক্ষ্য স্বরূপ।

সমস্ত মানবজাতি যদি অনন্ত শক্তি প্রাপ্ত হইত, তাহা হইলেও কি ঈশ্বরের ন্যায়পরায়ণতাগুণ ইহার অপেক্ষা অধিক প্রকাশ হইতে পারিত? ধর্ম্মের দ্বারা ঈশ্বরের নিকট গমন করিতে ভয়ে কম্পিত হইও না। তাঁহার গৌরব ও তোমার আত্মার যেন পরিত্রাণ হয়, তজ্জন্য তিনি সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। ঈশ্বর করুণাসনে বসিয়া আছেন। তাঁহার দয়ার হস্ত পরিত্রাণের আশীর্ব্বাদ লইয়া প্রসারিত রহিয়াছে। পরিত্রাণের নিমিত্ত যাহারা ব্যগ্র হইয়া বেড়াইতেছে এবং যাহারা আপনাদিগের দোষ সবে মাত্র জানিয়া ভয় পাইয়াছে, তাহারা ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে না। পাপ প্রযুক্ত তাহাদিগকে দণ্ড পাইতে হইবে, এই ভয় হইতে উদ্ধার লাভ করিবার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকে। মনুষ্যকে পবিত্র করিয়াই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, সুতরাং তাহার সুখের অভাব ছিল না। সে যে কেবল পাপ বিরহিত স্বর্গীয় অবস্থায় আসিয়া ছিল, তাহা নহে, তাহার অন্তঃকরণও স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ ছিল। তাহার আত্মা এবং তাহার ইন্দ্রিয়গণ পবিত্র ছিল; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই, সে কুসংসর্গে পড়িয়া এই স্বর্গীয় অবস্থা হারায় সে ইহকাল সম্বন্ধীয় হইয়া উঠে। তাহার বুদ্ধি ভ্রংশ, অন্তঃকরণ

ও ইচ্ছা ভ্রষ্ট, এবং পাপী হইয়া উঠে। তাহার বিবেক দোষ ভারগ্রস্ত হয়। তৎপ্রযুক্ত যে পবিত্র ঈশ্বরের স্বর, পূর্ব্বে তাহার আত্মার আনন্দদায়ক ছিল, এক্ষণে তাহা ভয়ের কারণ হইয়া উঠিল। বাস্তবিকই সে ঈশ্বর হইতে ভীত হইল। তাহার আত্মা সাংসারিক চিন্তায় পূর্ণ হইল এবং তাহার রিপুগণ অযথা বিষয়ে বাসনা করিতে লাগিল।

যাহারা ব্যগ্রভাবে পরিত্রাণ অন্বেষণ করিতেছে, তাহাদের সকলেরই এই বিষয় উত্তমরূপে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। আমরা সকলেই নানা প্রকারে পাপিষ্ঠ, এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার নিমিত্ত ধর্ম্ম জ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি করা কি আবশ্যক নহে? যদি পবিত্র না হই, এবং আমাদের শারীরিক ভাব দূর না হয়, তাহা হইলে কি কখন উদ্ধার পাইতে পারিব? ধর্ম্ম ব্যতিরেকে কেহ মুক্তি পাইতে পারে না। ক্রমশঃ।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ।

বিগত ২১এ জানুয়ারী বুধবার অপরাহ্ণ ৬॥ ঘটিকার সময় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-উপাসনামন্দিরে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। বাবু দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত পোষকতা করেন যে সভাপতির অনুপস্থিতকালে বাবু রজনীনাথ রায় মহাশয় বর্ত্তমান অধিবেশনের জন্য সভাপতি মনোনীত হউন। তদনুসারে বাবু রজনীনাথ রায়, সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তৎপর ডাক্তার নীলরতন সরকার সমাজের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ এবং বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায় আয় ব্যয়ের হিসাব পাঠ করেন। কটকের বাবু মধুসূদন রাও প্রস্তাব করেন এবং রায় বাহাদুর আনন্দরাম বড়ুয়া পোষকতা করেন যে, সম্পাদক যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন ভাষা সম্বন্ধে তদনুরূপ পরিবর্ত্তনের সহিত এই কার্য্য বিবরণ, এবং এই আয় ব্যয়ের হিসাবও গৃহীত হউক। কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তনের কথা উল্লিখিত হইলে প্রস্তাব গৃহীত হইল।

ডাঃ মোহিনীমোহন বসু প্রস্তাব করেন এবং ডাঃ যোগেন্দ্রনাথ মিত্র পোষকতা করেন যে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য বাবু উমেশচন্দ্র দত্তকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মনোনীত করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল। বাবু বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন, এবং বাবু প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য পোষকতা করেন যে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ডাঃ দুকড়ি ঘোষকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মনোনীত করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেন এবং দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় পোষকতা করেন যে বর্ত্তমান বর্ষের জন্য ডাঃ নীলরতন সরকার এম, এ, এম, ডি, কে এবং বাবু শশিভূষণ বসু এম, এ, কে, সমাজের সহকারী সম্পাদক মনোনীত করা হউক। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে প্রস্তাব গৃহীত হইল। ময়মনসিংহের বাবু শরৎচন্দ্র রায় প্রস্তাব করেন এবং বাবু কুঞ্জবিহারী সেন পোষকতা করেন যে, বাবু আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়কে সমাজের ধনাধ্যক্ষ মনোনীত করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

তৎপর ভোট গণনাকারী কমিটীর সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার সভ্যপদপ্রার্থীগণের নাম এবং তাঁহাদের প্রত্যেকে যত ভোট পাইয়াছেন, তাহার তালিকা উপস্থিত করিলেন (তাঁহাদের ভিতর হইতে যাঁহারা কর্ম্মচারী মনোনীত হইয়াছেন, সভাপতি তাঁহাদের নাম বর্জ্জন করিলেন এবং কলিকাতার ৩০ জন এবং মফঃস্বলের ২০ জন, যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ভোট পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে অধ্যক্ষ সভার সভ্য বলিয়া, মনোনীত করিলেন।

কাঁথীর বাবু শশিভূষণ চক্রবর্ত্তী প্রস্তাব করেন এবং বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পোষকতা করেন যে প্রচার সম্বন্ধীয় কার্য্যের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকদিগের প্রতি এই সভা আন্তরিক ধন্যবাদ করেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

বসীরহাটের বাবু কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন এবং মানিকদহের বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার পোষকতা করেন যে সমাজের পূর্ব্ব বর্ষের কর্ম্মচারীগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল।

দীঘিয়াপাতিয়ার বাবু কালীনারায়ণ রায় প্রস্তাব করেন এবং বাঁকুড়ার বাবু কেদার নাথ কুলভী পোষকতা করেন যে গত বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও অধ্যক্ষ সভার সভ্যগণকে এবং অডিটারগণকে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল। বোয়ালিয়ার বাবু মথুরামোহন মৈত্র প্রস্তাব করেন ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার এবং তত্ত্বকৌমুদীর সম্পাদক এবং লেখকদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। প্রস্তাব গৃহীত হইল। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রস্তাব করেন এবং বাবু শ্রীশচন্দ্র দে পোষকতা করেন যে এই দেশ এবং অন্যান্য দেশের যে সকল সভা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মতের দ্বারা চালিত এবং আশার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া একেশ্বরবাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করা হউক প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীমতী স্বর্ণপ্রভা বসু প্রস্তাব করেন এবং বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ পোষকতা করেন যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য শ্রীমতী কলেটের অদম্য উৎসাহ এবং আকাঙ্ক্ষার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দেওয়া হউক। প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গৃহীত হইল।

তৎপর সভাপতি ঘোষণা করেন যে কার্য্য নির্ব্বাহক সভার সভ্য মনোনয়নের জন্য সিটি কলেজগৃহে আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার সন্ধ্যা ৫॥০ ঘটিকার সময় অধ্যক্ষ সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে।

স্থিরীকৃত হইল যে ২৬শে জানুয়ারী সোমবার ৫॥ ঘটিকার সময় সিটি কলেজগৃহে এই সভার স্থগিত অধিবেশন হইবে। সভাপতিকে ধন্যবাদ দিয়া অদ্যকার সভাভঙ্গ হইল।

২৬এ জানুয়ারি সিটি কলেজ ভবনে এই সভার স্থগিত অধিবেশন হয়। এই সভাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সংশোধিত নিয়মাবলী সম্বন্ধে আলচনা হয়, অনেক আলোচনার পর অতি সামান্যরূপ পরিবর্ত্তনের পর অধ্যক্ষ সভা কর্ত্তৃক উপস্থিত সংশোধিত নিয়ম সমূহ গৃহীত হয়। এই উভয় অধিবেশনেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য মনোনয়ন হইয়াছিল।

ব্রাহ্মসমাজ।

বিবাহ—বিগত ১৭ই ফাল্গুন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা-মন্দিরে সমারোহের সহিত একটী বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্র মহলানবিশ্। ইনি আমাদের শ্রদ্ধেয় বাবু গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। শ্রীমান্ প্রবোধচন্দ্রের বয়স ২২ বৎসর। কন্যার নাম শ্রীমতী নীরদ বাসিনী, বয়স ১৮ বৎসর। ইনি শ্রীযুক্ত ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনী। এই বিবাহে অনেক ইউরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। বিবাহ ১৮৭২ সনের ৩ আইনানুসারে রেজিষ্টারি করা হইয়াছে।

শ্রাদ্ধ—আমরা গভীর শোক সহকারে জানাইতেছি যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত কেদার নাথ রায় সি, এস মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী গত ৫ই ফাল্গুন রাত্রি ২½টার সময় পরিবারস্থ সকলকে শোক সন্তপ্ত করিয়া পরলোকগতা হইয়াছেন। অনেক দিন হইতে তিনি ক্ষয়কাশ রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। কিন্তু এই কঠিন রোগ যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহাকে প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা গিয়াছে। ইহ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তও তিনি ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে যাপন করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় ঈশ্বর যেমন তাঁহার দৈহিক ক্লেশ মোচন করিয়াছেন, তেমনি তাঁহাকে অনন্ত কুশলের রাজ্যে লইয়া নিরাপদে রক্ষা করুন এবং তাঁহার শোকাকুল স্বামী ও পুত্র কন্যাগণের প্রাণে শান্তি আনয়ন করুন এই প্রার্থনা।

গত ১৮ই ফাল্গুন রবিবার তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বাবু বিহারীলাল সেন মহাশয় উপাসনায় আচার্য্যের কার্য্য সম্পন্ন করেন। কেদার বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র তৎপরে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে পরলোকগতা মহিলার একটু সংক্ষিপ্ত জীবনী পঠিত হয়। তাহাতে তাঁহার অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা তাঁহার জীবনীর সার মর্ম্ম পরে প্রকাশ করিব। সমস্তাদন ভজন ও ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে পরলোকগতা মহিলার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিম্নলিখিতরূপ দান করিয়াছেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রচার ফণ্ড	৫৲
ঐ ঐ দাতব্য ফণ্ড	৫৲
নববিধান সমাজ	৫৲
ঐ দাতব্য বিভাগ	৲
ঐ ঢাকা	৫৲
পিঞ্জরাপোল	৫৲
বরাহনগর মহিলা বিদ্যালয়	৫৲

৫০৲ টাকার ফল ক্রয়করিয়া কুষ্ঠাশ্রম, কেম্বল হস্পিটাল এবং ভগিনী সম্প্রদায়ের অনাথ আশ্রমে বিতরিত হয়। কেদারবাবু কোনও উপযুক্ত ছাত্রীকে তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নামে "সৌদামিনী বৃত্তি" বলিয়া একটী বৃত্তি দিবার জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হস্তে ৫০০৲ টাকা অর্পণ করিয়াছেন।

বিগত ১৩ই ফাল্গুন মঙ্গল বার কাঁথি বঙ্গবিদ্যালয়ে শিক্ষক বাবু মধুসূদন জানার পরলোকগতা শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আদ্য শ্রাদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম মতে সম্পন্ন হইয়াছে। মধুবাবুর পত্নী এই উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচার ফণ্ডে ১৲ টাকা, স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে ॥৹ ও দরিদ্রদিগকে ॥৹ দান করিয়াছেন। বাবু তারকচন্দ্র ঘোষ উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন।

দান—সিংহলস্থ প্লিডার মিঃ কৈলাস্‌ম্ পিলে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ৮৲ টাকা এবং খাসিয়া সমাজ গৃহ নির্ম্মাণ ফণ্ডে ২৲ দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে এজন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

উৎসব—বিগত ২১এ এবং ২২এ ফেব্রুয়ারী মৌখারস্থ খাসিয়া ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ সাম্বৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শেলা হইতে কয়েক জন বন্ধু আসিয়া উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। কিরূপে খাসিয়া ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্ম সাধারণের উন্নতি হইতে পারে তদ্বিষয়ে আলোচনা হয়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে ব্রাহ্ম ছাত্রী নিবাসের (Boarding) কোন একটী ব্রাহ্ম বালিকাকে দিবার জন্য "সুজাতাবৃত্তি" নামে মাসিক ৫৸৹ পোনে ছয় টাকার একটী বৃত্তি ন্যস্ত হইয়াছে।

উক্ত সভার হস্তে "সৌদামিনী বৃত্তি" নামক বাৎসরিক ৪০৲ টাকার আর একটী বৃত্তি আছে। ইহা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় (School) অথবা ব্রাহ্মছাত্রী নিবাসের (Boarding) কোনও একটী বা ততোধিক বালিকাকে প্রদত্ত হইবে।

যাঁহারা এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০শে এপ্রেলের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়,
১৭ই মার্চ্চ, ১২৯১।
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীদুকড়ি ঘোষ,
সম্পাদক
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১০ই এপ্রেল শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় সিটি-কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ১৮৯১ সনের প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে, সভাগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য-বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বিবিধ।

১৭ই মার্চ্চ, ১৮৯১।
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কার্য্যালয়,
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীদুকড়ি ঘোষ,
সম্পাদক, সাঃ ব্রাঃ সঃ

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিসন্ প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ১৭ই চৈত্র মুদ্রিত ও ২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে ১৭ই চৈত্র প্রকাশিত।

ধর্ম্ম ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা

১৩শ ভাগ। ২৪শ সংখ্যা।

১৬ই চৈত্র রবিবার ১৮১২ শক, ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬২।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।।০
মফস্বলে ৩
প্রতি খণ্ডের মূল্য ৵০

দয়াময়ী।

যে দিকে এ জগতের নয়ন ফিরাই
দয়াময়ী নাম গান শুনিবারে পাই
অযুত তারকা শশী, শত কোটী দিবাকর
করে সদা ওই গান নাম দয়াময়ী।
উন্নত শিখর পরে, পাষাণ তুষার ছলে
কেঁদে কেঁদে গায় সদা নাম দয়াময়ী।
অনন্ত সাগর-মাঝে, বায়ু সাথে নেচে নেচে
গায় সদা বীচি মালা নাম দয়াময়ী।
কুসুমেরা বনে বনে, দয়াময়ী নাম গায়,
প্রভাতে বিহগ গায়, নাম দয়াময়ী।
এ জগত-মন্দিরের, প্রতি অণু, সমস্বরে
করে ওই মহা গান নাম দয়াময়ী।
প্রেমিক পাগল হয়ে, বিশ্বসনে একতানে
মত্ত হয়ে গায় সদা নাম দয়াময়ী।
সে গীত তরঙ্গ মাঝে, আকুল হৃদি ও মন
আপনা হারায়ে গায় নাম দয়াময়ী।
কর মা আশীষ এই, জগতের দ্বারে চির
গাহিতে পারি গো যেন নাম দয়াময়ী।

নিবেদন ও প্রার্থনা—হে সঙ্কটহরণ দীনদয়াল পিতা! সম্পদ বিপদ সকল অবস্থাতেই তুমি আমাদিগের একমাত্র সম্বল। সম্পদের হিল্লোলে যখন প্রাণ উৎফুল্ল থাকে, তখনও যেমন তুমি আমাদের উৎসাহের কারণ—পথ প্রদর্শক। বিপদের ঘন অন্ধকার যখন চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া আসে, তখনও তেমনি তুমিই আমাদিগের প্রতিপালক ও রক্ষক। তাই হে দীনবন্ধু তোমার দীনদুঃখী সন্তান আমরা—আমাদিগের অন্তর যেন নিরন্তর তোমাতে নির্ভরশীল থাকে, আমরা সকল সময় তোমাকে প্রাণে রাখিয়া, প্রাণের আশা ভরসা সম্পূর্ণরূপে তোমার উপর স্থাপন করিয়া, একমাত্র তোমার অভিপ্রায় ও ইঙ্গিত মত চলিতে পারি না। দুর্বুদ্ধি আমাদিগকে নানা প্রকারে বিপথগামী করিয়া থাকে। আত্মবল ও ভরসার উপর নির্ভর করিতে আমাদিগকে প্ররোচনা দেয়। তাই ত আমরা সময় সময় বিপদের অন্ধকার দেখিয়া দিশাহারা হইয়া যাই। পথ প্রদর্শক মহান্ প্রভু! তোমাকে যদি সঙ্কটের অবস্থায় দুর্দ্দিনেও ভাল করিয়া ডাকিতে না পারিলাম, তোমাকেই সার জানিয়া যদি তোমার পানে তাকাইয়া থাকিতে না পারিলাম, তবে আর কবে তোমাকে ভাল করিয়া ডাকিব, তোমার উপর নির্ভর করিব? বিপদভঞ্জন সুমতিদাতা! এস সকলের প্রাণের বর্ম্মস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে রক্ষা কর। তোমাকে ডাকিবার পক্ষে সুসময় যদি আসিয়াছে, তবে আমরা প্রাণ ভরিয়া তোমাকে ডাকিয়া লই। প্রাণের দুর্ব্বলতা অবিশ্বাস ও যাহা কিছু ক্রটী আছে, তোমাকে খুলিয়া দেখাই। তুমি সংশোধন করিয়া দেও। যেন আর দুর্ম্মতির বশীভূত হইয়া আত্মগৌরব স্থাপনের জন্য প্রয়াসী না হই। যেন আমরা সর্ব্বদা তোমারই বশীভূত থাকিয়া, তোমারই গৌরব অন্বেষণ করি এবং তোমার সত্যের মহিমা প্রচার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য

কাহার শক্তিতে সত্য প্রচার হয়?—যিনি সত্যের প্রস্রবণ—তিনিই সত্যের রক্ষক ও প্রকাশক। জগতে চিরদিনই দেখা গিয়াছে লোকবল, ধনবল লৌকিক বিদ্যা-বুদ্ধির বল কখনও সত্যের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া জয়ী হইতে পারে নাই। দেখা গিয়াছে, নূতন সত্য যখনই জগতে প্রচারিত হইয়াছে, দুই চারিজন নিরীহ শান্ত স্বভাবের লোক সেই সত্যকে প্রাণে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং যখনই তাঁহারা সেই সত্য প্রচারে বহির্গত হইয়াছেন, সেই সকল শান্ত ও দুর্ব্বল লোকদিগের ভিতর হইতে এমন তেজ ও প্রভাব প্রকাশিত হইয়াছে যে, লোকে তদ্দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া, তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে। দেশের ধনী ও বলবান্ যাহারা, তাহারা দুই চারিজনকে ধরিয়া, তাহাদিগের শরীর ধ্বংস করিয়া বা অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করিয়া, সেই সকল সত্য-সেবকগণকে, ইহলোক ছাড়া বা দেশছাড়া

করিয়া দিয়াছে। কতরূপেই তাহাদের পথের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছে। জগতের অল্পলোক মনে করিয়াছে, যে এবার এই উপদ্রব দেশ হইতে দূর হইয়া গেল। কিন্তু দেখা গিয়াছে, পরিণামে সেই দুই চারিটী দুর্ব্বল ও দুঃখী লোকই জয় লাভ করিয়াছে। তাহাদের প্রচারিত সত্যই শেষে জয়যুক্ত হইয়াছে। এই যে মানুষ দেশের অগণ্য লোকের প্রতিকূলে নিজ অন্তরে প্রকাশিত সত্যের প্রচারে সাহসী হয়। ইহারা কাহার বলে, কোন্ সাহসে ও ভরসায় দেশের সকল শক্তির প্রতিকূলে দাঁড়ায়? কোন্ বলে খ্রীষ্ট আপন দেশস্থ সমগ্র নরনারীর প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করিয়া সত্য প্রচারে সাহসী হইয়াছিলেন? কোন্ ভরসায় মহম্মদ দুরন্ত অসভ্য আরবদিগের ভীষণ প্রকৃতির কথা অবগত থকিয়াও নির্ভীক চিত্তে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়ত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন? কোন্ বলে বলী হইয়া লুথার প্রবল রাজ শক্তির প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? নানক, চৈতন্য প্রভৃতিই বা কাহার আদেশ ও অভিপ্রায়ে দেশের সমস্ত নরনারীর প্রতিকূলে সত্যের অনন্ত মহিমার কথা প্রচার করিতে উৎসাহী হইয়াছিলেন। লোকবল বা ধনবল কাহারও সঙ্গী ছিল না। পৃথিবীর কোন শক্তির দিকে তাকাইয়া তাঁহারা আপনাপন ব্রত পালনে প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু সকল শক্তির মূল শক্তির দিকেই তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল। সেই শক্তির প্রতিই তাঁহাদিগের ভরসা ছিল। এবং নিরন্তর সেই অভয় হস্তই তাঁহাদিগের পশ্চাতে থাকিয়া, তাঁহাদিগকে সত্য প্রচারে সমর্থ করিয়াছিল। শক্তি তাঁহারই, জয় তাঁহারই, সত্য-প্রসূ যেমন তিনি, তাহার রক্ষক বা প্রতিপালকও তেমনি তিনি।

ব্রাহ্মসমাজের প্রথম প্রচারক যিনি তিনিই কি আপন বলে এমন মহৎ কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন? রামমোহন রায় যখন দেশস্থ এবং বিদেশস্থ সমস্ত নরনারীর প্রতিকূলে সমর ঘোষণা করিয়াছিলেন, যখন সকলের সমক্ষে তাঁহার প্রাণে লব্ধ সত্য-ধর্ম্মের আলোক প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তিনি কি আপন শারীরিক বল বা ধনবলের প্রতি তাকাইয়া এমন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? না সেরূপ করিবার সম্ভাবনা ছিল? না শারীরিক বল অতি তুচ্ছ বল। সে বল তাঁহাকে সত্য প্রচারে উৎসাহিত করে নাই? সে বল তাঁহাকে রক্ষাও করে নাই। দশ জন লোক একত্রিত হইলেই তাঁহার শরীর অবশ করিয়া ফেলিতে পারিত। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের শক্তিও তাঁহার কিছুই করিতে পারে নাই। সেই অভয় হস্ত যাহার প্রতিযোগী নাই, সমকক্ষ নাই—সেই অভয় হস্তই তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিয়াছিল। তাই তিনি সত্য প্রচারে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই কলিকাতা নগরের অধিকাংশ ধনী ও বুদ্ধিমান্ লোক একত্রিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। সহস্র সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহাদের সভাধিবেশনের দিনে শকটশ্রেণী সভাভবনের সম্মুখস্থ পথের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সারি দিয়া দাঁড়াইত। কিন্তু এখন চাহিয়া দেখ তাহার কোন চিহ্নও বর্ত্তমান নাই। রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত যে ধর্ম্ম সভাকে তাঁহারা গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আর একটী সভাতে আবদ্ধ রহে নাই। দেশ দেশান্তরে তাহা বিস্তৃত হইয়াছে। কাহার হস্ত এখানে দেখিতে পাই? রামমোহন রায়ের বিলাত গমনের সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্রাহ্মসমাজ নিভু নিভু করিতেছিল, প্রতিপক্ষগণ ভাবিয়াছিলেন, আর কি এবার সব শেষ হইল। তাঁহারা নিশ্চিন্তমনে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে পারিবেন বলিয়া আশ্বস্ত হইতেছিলেন। কিন্তু বিধাতার শক্তির পরিচয় কি পাওয়া যায় নাই? সত্যপ্রসূ যিনি তিনি কি তাঁহার সত্য রক্ষা করেন নাই? তাঁহার কার্য্য তিনি করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। ব্রাহ্মগণ সত্যের অনুসরণ যদি তোমরা করিতে পার, তাহা হইলে তোমাদিগের মার নাই। হয় ত দুই চারিজনের মস্তক যাইতে পারে, দুই চারিজন অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে পারে। কিন্তু নিশ্চয় ইহাই সত্য, যে সত্যের জন্য মস্তক যাইবে, যে সত্যের জন্য অপমান সহ্য করিবে, দেখিতে পাইবে সেই সত্যেরই জয় হইয়াছে। দেখিয়া তখন পরলোক হইতেও পুলকিত হইতে থাকিবে। ধর্ম্মরাজ্যের চিরদিনের এমন সুস্পষ্ট প্রমাণ সকল থাকিতেও যাহারা শারীরিক বলের সহায়তায় অত্যাচার করিতে অগ্রসর হয়, তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা বৈ কি? তাহাদিগের দুর্ম্মতি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করা ভিন্ন অন্য উপায় আর নাই। যাহারা চিরদিন সত্যের জয়ের প্রণালীও ক্রম আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার সত্য প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া আর কোন্ বলের উপর নির্ভর করিবেন। সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিই উপযুক্ত শক্তি। তাহাই অবলম্বনীয়। এত দেখিয়াও যাহারা ভীরুতা প্রদর্শন করে, তাহারা যেন আর সত্যের নিশান ধরিবার সাধ না করে। তাঁহাদিগের বিশ্বাসী বলিয়া পরিচয় দিবার সাধ এই মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করা উচিত। অতএব ব্রাহ্মগণ সত্যেতে নির্ভরশীল হও, অত্যাচার উপদ্রব অঙ্গের ভূষণ স্বরূপ হইবে।

সম্পাদকীয় ও প্রাপ্ত প্রবন্ধ।

অশ্রু।

ALMIGHTY TEARS.

যে হাসে, সে কাঁদে। যে কাঁদে, সে হাসে। "Blessed are they that mourn," এই ঈশা-বাক্য সুন্দররূপে অর্দ্ধ অশ্রুতত্ত্ব বিবৃত করিতেছে।

নানা কারণে মানব রোদন করিয়া থাকে। কেহ বা ধন মানের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করে, কেহ বা দুঃখে, কেহ বা আনন্দে, কেহ বা বিরহে, আবার কেহ বা মিলনে অশ্রুকণা-রূপ ভাষার দ্বারা প্রাণের গভীর ভাব প্রকাশ করে। যেমন অতিশয় উত্তাপ ও অতিশয় শৈত্য দেহেতে সমান্ অনুভূতি উৎপন্ন করে, সেই রূপ গভীর দুঃখ ও গভীর আনন্দ দেহেতে অশ্রুবর্ষণরূপ একই প্রকার অবস্থা উৎপন্ন করে। ভক্ত যখন প্রেমেতে বিহ্বল হইয়া অবলা বালিকার ন্যায় অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করেন, তখন তাঁহাকে শিশিরসিক্ত অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত কুসুম-কলিকার ন্যায় মনোহর দেখায়; তাঁহার আশা-অঙ্ক সুবর্ণ-বুকের মুক্তা-

ফলের ন্যায় শোভা পায়। প্রেমিক যখন প্রিয়তমের বিরহে অধীর হইয়া নয়নাসারে ধরা সিক্ত করেন, তখন তাঁহার উজ্জ্বল বদন-মণ্ডল শুষ্ক না হইয়া অপূর্ব্ব বেশ ধারণ করে। এক দিকে দিবাকর কিরণধারা বর্ষণ করিতেছেন, অপর দিকে অন্তঃস্বরা ঘনরাশি বারি প্রসব করিতেছে, এই রূপ সময়ে আকাশ যেমন দিব্য মাধুরী ধারণ করে, তেমনি বিশ্বাস ও বিরহেতে প্রেমিকের বদন-মণ্ডল তখন দিব্য সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হয়।

হিন্দু কবি যেরূপ গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতীব মনোহর। বস্তুতঃ জাহ্নবী অশ্রুধারা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পাপীর বিষাদ-সঙ্গীতে যখন ব্রহ্ম দয়াতে গলিয়া যান, তখন তাঁহার করুণা-মন্দাকিনীর স্রোত মানব আত্মার ভিতর দিয়া বহিবামাত্র আমাদের আত্মার শত শত মৃত ভাবসমূহ সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, নব নব ভাব সমুদায় হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। যখন সেই মন্দাকিনী স্বর্গ হইতে, আধ্যাত্মিক জগৎ হইতে মর্ত্তধামে, বহির্জগতে প্রকাশিত হয়, তখন পাপীর অনুতাপাশ্রু-রূপ গঙ্গারূপে বহিতে থাকে। এই অনুতাপাশ্রুরূপ জাহ্নবীতে যিনি অবগাহন করিয়াছেন, যাঁহার আত্মা এই পবিত্র অনুতাপ-বারিতে ধৌত হইয়াছে, তিনিই শুচি হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই আত্মা গঙ্গাস্নান করিয়া বিগত-ক্লেদ হইয়া নির্ম্মল হইয়াছে। তাঁহারই গঙ্গাস্নান সার্থক। এই গঙ্গোদকেই ভগবানের পূজা করিতে হয়।

আমরা মোহান্ধকারের মধ্যে বিবেক-চপলার চমকে যদি সৌভাগ্যক্রমে দেখিতে পাই যে, আমরা স্বপ্নে ভাবিতেছিলাম যে আমরা সুখ শয্যায় শয়ান রহিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক আমরা গাঢ় তমোরাশির মধ্যে অকূল জলধির ভীষণ আবর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া রহিয়াছি। চতুর্দ্দিকে তরঙ্গবিক্ষোভ, প্রচণ্ড পবনহিল্লোল ও প্রলয় মেঘের ভ্রূকুটী।" পাপী যদি এইরূপ আপনার ভয়াবহ অবস্থা একবার বুঝিতে পারে, তবে কি সে অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে স্বপ্নের ক্রোড়ে মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকিতে পারে?

ধর্ম্মভ্রষ্ট সাধু যখন দেখেন যে কামাদি হিংস্রজন্তুসকুল এই সংসারারণ্যের মধ্যে তিনি একাকী, তিনি আর মঙ্গলময়ী প্রেম রূপিণী জননীর অঞ্চল ধারণ করিয়া নাই, তখন তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, তিনি মাতৃহারা শিশুর ন্যায় রোদন করিতে থাকেন।

কি ধনী, কি নির্ধন, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী, যখন তাঁহারা মোহতন্দ্রার অবসানে বুঝিতে পারেন যে "দিগন্ত প্রসার অনন্ত আঁধার, কোথাও কিছু যে নাই," যে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে আত্ম-রক্ষা করিতে অক্ষম, তখন তাঁহারা অবলম্বন পাইবার আশাতে অন্ধকারের মধ্যে ক্ষীণ বাহু দুইটী প্রসারণ করেন। যখন তাঁহারা বাক্‌শূন্য ও ভয়বিহ্বল হইয়া, অজ্ঞান অল্পমতি শিশুর ন্যায় অশ্রু বিমোচন করিতে থাকেন, তখন দেখেন যে, কে একজন অন্ধকারের মধ্যে তাঁহাদের হস্তধারণ করিয়াছে, অশ্রুধারা খরতর স্রোতে প্রবাহিত হইতেছে এবং প্রাণে নব বলের সঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই দেখেন যে "We know not any thing," আমরা কিছুই জানি না, আমরা নিতান্ত অজ্ঞান। তখন তাঁহারা বুঝেন যে "বালানাম্ রোদনম্ বলম্।"

আমরা দম্ভ করিয়া, অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া, আপনার বলে, বা জ্ঞানের বলে, বা ধন জনের সাহায্যে মৃত্যুকে পরাজয় করিতে প্রয়াস পাই। কিন্তু অবশেষে সংগ্রামে অভিভূত হইয়া রোদন করিতে থাকি।

যিনি পরম সৌভাগ্যশালী, তিনিই অশ্রুর মাহাত্ম্য বুঝেন। তিনি অন্য সকল উপায়ে জলাঞ্জলী দিয়া একমাত্র রোদনকেই সম্বল করেন। তিনি দেখেন যে অশ্রু বিনা "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

চৈতন্য, নানক, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতি উচ্চ সাধকগণ অশ্রুতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারা মহৎ হইতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ছাড়িয়া শিশু হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে জননীর অঞ্চল ধারণ করেন, তাঁহারাই নির্ভয়, ও নিরাপদ হইতে পারেন, তাঁহারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী হন, "of such is the Kingdom of heaven."

শিশুর অশ্রু, প্রৌঢ়ের অশ্রু, পাপীর অশ্রু, সাধুর অশ্রু, দয়ালুর অশ্রু, প্রেমিকের অশ্রু, সকল অশ্রুনদীরই গতি সেই শান্তিজলধীর দিকে। সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, যাহার সময়েই হউক না, হৃদয়াকাশ হইতে পাপ-মেঘ যতই অশ্রুধারা বর্ষণ করিবে, ততই আকাশ মুক্ত হইবে। গ্রীষ্মের পর বা বর্ষার সময় বারি বর্ষিত না হইলে, যেমন ধরা শীতল হয় না, পৃথিবী সুশ্যামল বেশ ধারণ করিয়া হাস্য করে না, সেইরূপ অবিরত ধারে অশ্রুপাত না হইলে প্রাণ শীতল হয় না, এবং আত্মা নির্ম্মল ও প্রফুল্ল হয় না। আত্ম-ভূমি অশ্রুসিক্ত না হইলে, তাহাতে ধর্ম্মের অঙ্কুর জন্মে না।

জীবনের সর্ব্ব সুখের পরিবর্ত্তে অবিরাম অশ্রুধারা যদি আমাদের ভাগ্যে ঘটে, তবে আমরা কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইব। অশ্রুই আমাদের শ্রেষ্ঠ বল। অশ্রুই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আমরা সংসারের সুখ, বল, ঐশ্বর্য্য, প্রতিষ্ঠা লইয়া কি করিব, যদি আমরা অশ্রু হইতে বঞ্চিত হই?

সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃপ্তি, দয়া প্রেম, শান্তি অশান্তি, বিরহ মিলন, এই সমুদায় হইতেই অশ্রুর উৎপত্তি। কিন্তু প্রেমাশ্রু যেমন সুন্দর ও সুখপ্রদ এমন আর কিছুই নহে। যে তাহা দেখে, সেও কৃতার্থ হয়। স্বর্গ আর কোথায় দেখিবে? যে নয়ন প্রেমাশ্রুতে প্লাবিত হইতেছে তাহাতেই স্বর্গ দেখ।

নয়ন দর্শন করিবার জন্য হইয়াছে। কিন্তু যে দর্শন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিল না, তাহার নয়নই বৃথা, দর্শনই বৃথা। দর্শন উপায়, অশ্রু উদ্দেশ্য। যে দেখিয়া অশ্রু ফেলিল, তাহারই নয়ন সার্থক। এস, আমরা অহঙ্কার পরিহার করিয়া, বুঝি, যে কবি সত্যই বলিয়াছেন যে, আমরা প্রত্যেকেই,—

"An infant crying in the night:
An infant crying for the light:
And with no language but a cry."

আমরা দেখিয়া শুনিয়া অশ্রুমোচন করিয়া নয়ন সার্থক করি, জীবন সার্থক করি, এবং হাসিয়া হাসিয়া মরিয়া যাই।

হে পতিতপাবন! আমরা নিতান্ত পাষণ্ড, কিছুতেই আমাদের অশ্রুপাত হয় না। আমারা অশ্রু-গঙ্গা হইতে বহুদূরে। তুমি আমাদিগকে কাঁদাও। তুমি আমাদিগকে অশ্রুধনে ধনী কর, অশ্রুবলে বলী কর। তুমি আমাদের অশ্রুসলিল-ধৌত হৃদয়ে দিবসযামী বিরাজ কর। শিশু যেমন সকল অভাব রোদনের দ্বারা প্রকাশ করে, তেমনি আমরা বাগাড়ম্বর ছাড়িয়া সদা তোমার নিকট কাঁদি। তুমি আমাদের মা। তুমি আমাদের ক্রন্দন বুঝ। তুমি সর্ব্বশক্তিমান্ হইয়াও অবোধ সন্তানের অশ্রুর নিকট চিরদিন পরাজিত।

উইলিয়ম কেরী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে কেরীর মনে ভারতবর্ষে আসিবার সংকল্পের উদয় হয়। বিংশতিবৎসর পরে এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়াই মহাত্মা উইলবারফোরস্ (Willburforce) পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় বলিয়াছিলেন, "হিন্দুস্থানবাসী লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে তাহাদের ভাষায় বাইবেলের সত্য শিক্ষা দিবেন, এক জন সামান্য জীর্ণ পাদুকা-সংস্কারকের মনে যে এই চিন্তার উদয় হইয়াছিল, এই উচ্চ আশা স্থান পাইয়াছিল, ইহা অপেক্ষা মহত্তর চিন্তা, উচ্চতর আশা মানব কল্পনায় আর কখনও স্থান পায় নাই।"

এই সময়ে নর্দ্দাম্পটন নগরে ধর্ম্মপ্রচারকগণের একটী সভা হয়। কুসংস্কারাপন্ন পৌত্তলিক জাতি সকলের মধ্যে ধর্ম্মের আলোক বিস্তার করা, খ্রীষ্টীয়ানগণের কর্ত্তব্য, এই বিষয় সভায় যাহাতে আলোচনা হয়, তজ্জন্য কেরী অনেক চেষ্টা করিলেন। প্রচারকগণ কেরীর প্রস্তাবিত বিষয়ের গুরুত্ব অনুভব করিতে পারিলেন না। মিষ্টার ফুলার প্রভৃতি যে সকল সুবিজ্ঞ প্রচারকগণ ভবিষ্যতে শ্রীরামপুর-প্রচার কার্য্যে কেরীর প্রধান সহায় হইয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সভায় কেরীর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। জনৈক প্রবীণ ধর্ম্মপ্রচারক কেরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যুবা পুরুষ, স্থির হইয়া বস, ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে, তিনি তোমার আমার সাহায্য ব্যতীতও পৌত্তলিক জাতি সকলকে সত্য ধর্ম্মে আনিতে পারিবেন।" প্রাচীন প্রচারকগণের মুখে এইরূপ নিরাশার কথা শুনিয়াও কেরী ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর বিশ্বাস ও নির্ভয়ের সহিত আপন সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লিষ্টার নগরে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কেরীর নিমন্ত্রণ আসিল, কেরী লিষ্টারবাসীগণের এই নিমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত নগরে বাস করিতে চলিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাবিংশতি বৎসরের অধিক ছিল না। লিষ্টার নগরে উপনীত হইয়া, তিনি দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইলেন। এই নগরবাসী কতিপয় সুবিজ্ঞ ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ জন্মে। এই সকল সাধু-স্বভাব পণ্ডিতের সংসর্গে থাকিয়া তিনি সাহিত্য বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু জ্ঞান লাভ করিবার বিশেষ সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং ইহাঁদের পুস্তকালয় হইতে আপন রুচি ও প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রন্থাদি চাহিয়া আনিয়া জ্ঞান তৃষ্ণা মিটাইতে পারিতেন। এই ভাবে কিয়ৎ দিন শান্তিতে কাটিয়া গেল। লিষ্টার নগরস্থ ধর্ম্মালয়ের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া, শীঘ্রই কেরীকে অন্য উপায়ে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিতে হইল। তিনি পুনরায় স্কুল খুলিয়া অর্থাগমের চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। তাঁহার জীবন সংগ্রাম, কঠিন হইয়া উঠিল, কিন্তু তাঁহার নির্ভরশীলতা কিছুতেই হ্রাস হইল না। মানুষ অশন বসনের জন্য সংসারে আসে নাই। আহার বিহার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইবার জন্য মানুষ মানবজীবনের উচ্চ অধিকার সকল লাভ করে নাই, মানবের ইহাপেক্ষা উচ্চতর কর্ত্তব্য আছে, মানবের ইহাপেক্ষা উচ্চতর সুখ ও সৌভাগ্য আছে, এই সকল কথা স্মরণ করিয়াই কেরী ঘোর পরীক্ষার সময়, সাংসারিক অসীম ক্লেশ ও অভাবের সময় স্থির ও অটল হইয়া দাঁড়াইতেন, তাঁহার সাংসারিক ক্লেশ কখনও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাঁহার জীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্য সকল কখনও কোন অবস্থায় অসম্পন্ন থাকে নাই। এই অবস্থায় তাঁহার সহিত মিষ্টার ফুলার ও মিষ্টার রবিন্সনের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মে। মিষ্টার রবিন্সনের সহিত কেরী প্রায়ই মিশিতেন এবং প্রাণ খুলিয়া অনেক গোপনীয় বিষয়ে আলাপ করিতেন। রবিন্সন্ চর্চ্চ অব ইংলণ্ড সম্প্রদায় ভুক্ত। কেরী ডিসেণ্টার দলের লোক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অকৃত্রিম প্রেম-স্রোত সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্র বাধা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল। এক দিন রবিন্সন কেরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাই চর্চ্চের ক্ষতি করিয়া ডিসেণ্টার দলের মত প্রচার করা কি আপনার আন্তরিক ইচ্ছা?" কেরী উত্তর করিলেন, "আপনি হাই চর্চ্চের লোক, আমি ডিসেণ্টার দলের লোক। আমরা পরস্পরের জ্ঞান বিশ্বাস অনুসারে আপন আপন কর্ত্তব্য পথে চলিব, জগতের হিত সাধন করিব, ধনী মানী অপেক্ষা রাজ পথ পরিষ্কারক দীন দুঃখীকে প্রেমালিঙ্গন করিব, সচ্চরিত্র কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের নিকট না যাইয়া, পাপাসক্ত নর নারীকে পরিত্রাণের অভয়বাণি শুনাইব। কিন্তু কিছুতেই যেন আমাদের সাম্প্রদায়িকতা, উদার মানব-প্রেম ও মানবের সেবা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত না করে।" কেরীর এই সময়কার ধর্ম্মোৎসাহ ও কর্ম্মিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করিয়া মিষ্টার ফুলার বলিয়াছেন, "যেরূপ উদ্যম, উৎসাহ, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিক অনুরাগের সহিত কেরী লিষ্টার ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিয়াছেন, তাহা এবং তাঁহার গভীর জ্ঞানার্জ্জন স্পৃহা দেখিয়া কেহই তাঁহাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারেন না।"

"বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহাকে যে সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে ও পরবর্ত্তী জীবনে উচ্চ বিষয় সকল আয়ত্ত করিতে গিয়া, তাঁহাকে যেরূপ ক্লেশ পাইতে হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া অনেক সময়েই তিনি আমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক শক্তির সহিত উদারতা, তেজস্বীতা, সরলতা

ও শ্রদ্ধাশীলতার এমন আশ্চর্য্য সমাবেশ ছিল যে যাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেন, তাঁহারাই যে কেবল তাঁহার সাধুতা ও মহত্বের পরিচয় পাইয়াছিলেন এমত নয়, লিষ্টার নগরবাসী ধনী মানী ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণ অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন।” স্বদেশে এই ভাবে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও কিরূপে ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন, কেরীর মন হইতে এক দিনের জন্যেও এই চিন্তা অন্তর্হিত হয় নাই। প্রাচীন এবং উচ্চপদস্থ লোকেরা কেরীর বাসনাকে অত্যন্ত কাল্পনিক মনে করিয়া, কেরীকে তাঁহার সংকল্প হইতে বিরত করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। প্রাচীন এবং পদস্থ ব্যক্তিগণের নিকট কোন আশা ও উৎসাহ না পাইয়া, কেরী যুবা পুরুষগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যে সকল যুবক আপনাদের ক্ষমতা ও চরিত্রবলে সাধারণের নিকট পরিচিত হইতেছিলেন, যাঁহাদের উৎসাহ তেজস্বীতা ও শক্তির পরিচয় পাইয়া লোকে তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক উচ্চ আশা করিতেছিল, সেই সকল উৎসাহী যুবকবৃন্দই কেরীর সাধু সংকল্পের সহায় হইলেন। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ক্লিপ্‌ষ্টোন নগরে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণের আর একটী সভা হয়। কেরীর ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার যুবা বন্ধুগণ এই সভায় যাহাতে তাঁহার প্রস্তাবটী গৃহীত হয়, তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান হইলেন, কিন্তু উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কে কে ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছেন, যখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল, তখন একে একে সকলেই পশ্চাৎপদ হইলেন, সমিতির বর্ত্তমান অবস্থানুসারে কেরীর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হওয়া অসম্ভব বলিয়া, সকলেই তাহা অগ্রাহ্য করিলেন। কিন্তু পাছে কেরীর প্রাণে ভয়ানক আঘাত লাগে, এই চিন্তা করিয়া অনেকেই তাঁহাকে তাঁহার রচিত “প্রচার সম্বন্ধীয় তত্ত্বানুসন্ধান নামক পুস্তিকা খানি মুদ্রিত করিতে পরামর্শ দিলেন। পর বৎসর (১৭৯২) নটিঙ্গহাম নগরে এই সমিতির আর একটী অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে কেরীকে বেদীর কার্য্য করিতে দেওয়া হয়। যদি উচ্চ জিনিষ লাভ করিবার আশা কর তবে তাহার জন্য চেষ্টা কর। এই বাক্যের উপরে ভিত্তি করিয়া কেরী এক সতেজ উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ প্রদান করেন। এই উপদেশের দ্বারাই ব্যাপটিষ্ট মিসনারী সোসাটি নামক সম্প্রদায়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই উপদেশে তাঁহার এইরূপ তেজস্বীতা বাগ্মীতা ও হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রকাশিত হইয়াছিল যে জনৈক সুবিজ্ঞ প্রাচীন ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহার সেই উপদেশ শুনিয়া বলিয়াছিলেন, যদি শ্রোতৃবর্গ উপদেশ শুনিয়া সমস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেন, তাহা হইলেও আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম না। উপদেশ শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইল বটে, কিন্তু যখন ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিবার প্রস্তাব উপস্থিত হইল, তখন সকলেই পূর্ব্বের ন্যায় ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কেরী মিষ্টার ফুলারের হাত ধরিয়া অতি দুঃখের সহিত বলিলেন, এবারেও কি কিছু করা হইবে না? কেরীর কথায় ফুলারের মনে একাগ্রতা জন্মিল। তাঁহার উদ্যোগে ১২ জন ধর্ম্মপ্রচারক মিলিত হইয়া এই বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা এবিষয় যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই নূতন নূতন বাধা বিঘ্নের কথা স্মরণ হইতে লাগিল। তাঁহাদের অর্থ নাই, ভারতবর্ষের ন্যায় সুদূর দেশে আসিয়া, কিরূপে ধর্ম্মপ্রচার-ক্ষেত্র স্থাপন করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা নাই। ইংলণ্ডে কোন প্রতিপত্তি নাই, এ অবস্থায় এতবড় গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা তাঁহারা কোন ক্রমে সঙ্গত বোধ করিলেন না। কিন্তু কেরীর অদম্য উৎসাহ, অটল প্রতিজ্ঞা ও ভগবানের উপর একান্ত নির্ভরের ভাব দেখিয়াই সকলে অগ্রসর হইলেন। মিষ্টার ফুলার প্রভৃতি ৫ জন সুবিজ্ঞ, উৎসাহী ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি সংগঠিত হইল। মিষ্টার ফুলার এই কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তেই চাঁদা তুলিবার উদ্যোগ হইল। অনেকে চাঁদার তালিকায় স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন এবং তখনই ১৩ পাউণ্ড, ২ শিলিঙ্গ, ৬ পেন্স আদায় হইল। কমিটির নির্দ্দেশ অনুসারে কেরী সর্ব্বত্রই যাইতে প্রস্তুত হইলেন। যে উৎসাহ, যে আশা ও যে নির্ভরের ভাব মানব হৃদয়ে জন্মিলে মানুষ পর্ব্বতসমান বিঘ্ন বিপত্তি অনায়াসে অতিক্রম করিয়া ছুটিয়া যায়, কেরীর মনে সেই শক্তি সেই উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই বারমিঙ্গহ্যাম নগর হইতে এই সদ্যজাত শিশুসমাজের পালনার্থ ৭০ পাউণ্ড প্রেরিত হইল। বারমিঙ্গহ্যাম নগরবাসীগণের এই সাধুদৃষ্টান্ত ক্রমশ অন্যান্য স্থানের লোকেরা অনুসরণ করিতে লাগিলেন এবং অচিরকাল মধ্যে কমিটীর হস্তে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইল। লণ্ডনের লোকেরা এই কমিটীর সহিত কোন সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন না। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, অজ্ঞাত পল্লীগ্রামস্থ কয়েকজন উৎসাহী লোক উৎসাহে মত্ত হইয়া নিতান্ত অপরিণামদর্শীর ন্যায় যে কার্য্যের আয়োজন করিতেছে তাহার স্থায়িত্ব কি? কিন্তু বিধাতার কাজ সামান্য লোকদ্বারা, অতি সামান্য আয়োজনে তিনি স্বয়ং চালাইয়া লন। লণ্ডন নগরের ধনী মানীগণ কেরী প্রভৃতির মহৎ উদ্দেশ্যের সহিত কোন সহানুভূতি রাখিলেন না। তাঁহাদেরই বা দোষ কি? পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ত এই নিয়ম লক্ষিত হয়। নগণ্য লোকের দ্বারা যখনই কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তখনই পৃথিবীর ধনী মানী বিজ্ঞ ও পদস্থ ব্যক্তিরা তাহার গুরুত্ব অস্বীকার করেন ও তাহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দীহান হইয়া থাকেন। কেরীর ন্যায় একজন সামান্য পাদুকাব্যবসায়ী ও আর কয়েকজন নগণ্য মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা খৃষ্টীয় জগতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইবে, ভারতবর্ষে যিশুর নাম প্রচারিত হইবে, লণ্ডনের বড়লোকেরা তখন একথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সুতরাং ইহাঁদের কার্য্যকে বালকের ক্রীড়ার ন্যায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া চলিলেন। কিন্তু কি দুর্লক্ষ্য সূত্রে বিধাতার ইচ্ছা জয়যুক্ত হয়, স্থূলদর্শী মানব কোন কালে তাহা অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। বিধাতা স্বয়ং যাহার হাত ধরিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত করেন, সে সংসারের লোকের চক্ষে নিতান্ত হীন ও দুর্ব্বল হইলেও বিপুল শক্তি ও অসীম মহত্বের অধিকারী হয়।

দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা কর্ত্তব্য।*

দার্শনিক জ্ঞানালোচনা নিরর্থক নহে। পরমেশ্বর মন বুদ্ধি দিয়াছেন, জ্ঞানলাভের জন্য। হৃদয় ভক্তি সাধনা করিবার জন্য। জ্ঞানরাজ্য ও ধর্ম্মজীবনের প্রভু একজন, সুতরাং উভয়ের বিরোধ অসম্ভব। ব্রাহ্মধর্ম্ম সামঞ্জস্য প্রচার করেন। যেখানে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না সেখানে প্রকৃত তত্ত্ব নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, তোমার প্রকৃতিতে যাহা কিছু আছে, সব মঙ্গলের জন্য। জ্ঞানময় পরমেশ্বর জ্ঞান দিয়াছেন, প্রেমময় পরমেশ্বর প্রেম দিয়াছেন, সুতরাং জ্ঞান প্রেমের সামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী। বিপরীত প্রকার মতের আলোচনা না করিলে প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায় না। এক প্রকার সংস্কার অনুসারে কাজ করিলে প্রকৃত তত্ত্ব জানা যায় না। সত্য কেমন?—একটা বলের মত গোলাকার—বলের সকল দিক দেখা যায় না, ঘুরাইয়া দেখিতে হয়। মানুষের মন অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র। আমি হয় ত সত্যের এক দিক দেখিয়াছি, তুমি অপরদিক দেখিয়াছ। অতএব পাঁচ জনের মত মিলাইয়া দেখিতে হয়। বিরুদ্ধবাদীর মতের সমালোচনা না করিলে আমার নিজের মতের ভিত্তি কত দৃঢ়, উহার মূল্য কত তাহা বুঝিতে পারিব না। আপনারা সকলে বহুরূপীর গল্প জানেন, উহা হইতে আমরা কি শিক্ষা করি? প্রকৃত বস্তু জানিতে হইলে এক বস্তু ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় কেমন হয়, জানিতে হয়। অন্ধের হাতী দেখার গল্প সকলেই জানেন। সত্য সম্বন্ধেও ঐরূপ হয়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম—ধর্ম্মের তিন অঙ্গ। এদের কি পরস্পরের সম্বন্ধ নাই? জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা—মনের তিন ভাগ। (ক্যাণ্ট)। একটী ছবি দেখিলাম। দেখা—জ্ঞান; পছন্দ করা—ভাব; কিনিবার ইচ্ছা—ইচ্ছা। জ্ঞান, ভক্তি, ধর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ। ভক্তি করিব কাহাকে? তাহাকে তো আগে জানা চাই। সে মন্দ কি ভাল, জানা চাই। নতুবা ভক্তি হইবে কিরূপে? অতএব জ্ঞান ভক্তির পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রথম জানিলাম, তিনি পরমপুরুষ পরাৎপর। তখন ভক্তির উদয় হইল। যাঁহাকে ভালবাসি, ভক্তি করি, তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিতে ইচ্ছা হয়। ভক্তি হইলেই আবার ইচ্ছা, কর্ম্ম আসিল। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এক সূত্রে গাঁথা, কার্য্য কারণ সম্বন্ধে গ্রথিত। যাহারা মনে করেন, দর্শন শাস্ত্রালোচনা করিলে নাস্তিক হইবেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। নাস্তিকের সঙ্গে পারিব না বলিয়া তর্ক না করা—ভীরুতা। নাস্তিকতা অখণ্ডনীয় মনে করি না। নাস্তিকতা যুক্তিবিরুদ্ধ, জ্ঞানবিরুদ্ধ, বিশ্বাসবিরুদ্ধ। নাস্তিকতা খণ্ডনীয়। সেই জন্য বুদ্ধিমান্ লোকের উচিত, দার্শনিক আলোচনা করিয়া বিশ্বাস দৃঢ় করা। হৃদয় যাহা বলে, জ্ঞান তাহাতে সায় দিলে বিশ্বাস কত দৃঢ় হয়! এই জন্য ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্মবিদ্যালয় বসন্তের টীকা—ভবিষ্যতে নাস্তিক না হয় এই জন্য আগেই তাহাদের মত জানাইয়া দেওয়া হয়।

শক্তি চক্ষে দেখা যায় না। ঘটনার পর ঘটনাই কেবল দেখা যায়। শক্তি দেখা যায় আপনার ভিতরে—বহির্জগতে নহে, অন্তর্জগতে। শক্তি জ্ঞানের গুণ। শক্তি অন্তর ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। অতএব শক্তি চৈতন্য। সুতরাং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানময়ী শক্তি প্রকাশ করিতেছে। বহির্জগতে জ্ঞান কি রূপ? বহির্জগত কি রূপ? রূপ রস ইত্যাদি বিশিষ্ট, রূপ রস ইত্যাদি আমাদের জ্ঞান ছাড়িয়া থাকিতে পারে কি না? গন্ধ প্রভৃতি অনুভূতি মাত্র। রূপ কি? ইহা আমাদের জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে কি না? ইহা বুঝাইবার জন্য অনেক যুক্তি আছে। জ্ঞান ছাড়া রূপের সত্ত্যা সম্ভব নয়। রূপের সংজ্ঞা কি? দর্শন জ্ঞানের বিষয়। এই সংজ্ঞা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে রূপ জ্ঞান ছাড়া থাকিতে পারে না। অতএব রূপ রস প্রভৃতি সকলের সঙ্গে জ্ঞানের সম্বন্ধ—অর্থাৎ এই জড় জগৎ বলিয়া স্বতন্ত্র বস্তু নাই। সত্তা অর্থ কি? নিরবলম্ব সত্তা। অন্য সমস্ত সত্তা যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত নদী ও নদীর তরঙ্গ। সকল ব্রহ্মাণ্ড নিরবলম্ব ব্রহ্মকে ধরিয়া রহিয়াছে—স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সময় কি? ঘটনা ছাড়া সময় পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে—কিসের পূর্ব্বে? একটী ঘটনার। সুতরাং সময়ও ঘটনার মধ্যেও সম্বন্ধ। অনন্ত কালের ভাব আমাদের মনে আছে। অনন্ত কালের অর্থ অনন্ত ঘটনা। অতএব অনন্তের জ্ঞান আমাদের মনে আছে।

দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা করা শিক্ষিত লোকের কর্ত্তব্য। মূর্খ লোকেরাও ধর্ম্মসাধনের বলে জ্ঞানে উন্নত হইতে পারেন। কেবল সাধন ভজনেও হয়, কিন্তু জ্ঞান চর্চ্চায় আরও সাহায্য হয়। শিক্ষিতগণ জ্ঞান চর্চ্চা করিলে ধর্ম্মে উন্নত হইতে পারিবেন। যাঁহারা বলেন জ্ঞান চাই না, তাঁহারা জ্ঞানের রস বোঝেন না। তুমি কি চাও? ব্রহ্মদর্শন চাও। দেখা জ্ঞানের বিষয়। নিরক্ষর লোক কেবল সাধনের বলে এক প্রকার জ্ঞান লাভ করিয়া ব্রহ্মদর্শন করে। জ্ঞান ছাড়া হয় না।

আর এক কথা। কেবল তর্ক করিয়া ঈশ্বরকে ভাল করিয়া জানা যায় না। হৃদয় ও জ্ঞানের সাহায্যে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা কর্ত্তব্য।

* বিগত মাঘোৎসবের সময় ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের উৎসবে সভাপতি রূপে শ্রীযুক্তনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই মর্ম্মে আপনার মন্তব্য জ্ঞাপক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

উদ্ধৃত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্বাহ্য।*

অদ্য সেই আনন্দের দিন উপস্থিত, যে দিনে মঙ্গলময় পরম পিতা পরম মাতা এবং পরম সুহৃদের আশীর্ব্বাদময় হস্ত আমাদের দেশের মস্তকের উপরে দেদীপ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কেমন আশ্চর্য্যরূপে মহাত্মা রামমোহন রায় চতুর্দ্দিকের জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের মূলগত অপৌত্তলিক ভাব সর্ব্বসমক্ষে অনাবৃত করিলেন; তাহার পরে কেমন আশ্চর্য্য রূপে

* গত মাঘোৎসবের সময় শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সুন্দর উপদেশটী প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের ক্ষেত্র-কর্ষণ এবং বীজ বপন আরব্ধ হইল; তাহার পরে কেমন আশ্চর্য্যরূপে সেই বীজ অঙ্কুরিত শাখান্বিত পল্লবিত হইল। এ সমস্ত অভাবনীয় অচিন্তনীয় অদ্ভূত ব্যাপার যদি একবার আদ্যোপান্ত স্থিরচিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যায়, তবে কাহারো নিকটে ইহা গোপন থাকিতে পারে না যে, করুণাময় বিশ্ববিধাতার প্রেমদৃষ্টি নিরন্তর আমাদের উপরে স্থিরভাবে নিপতিত রহিয়াছে।

বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল অব্দে—সমস্ত পৃথিবীর যখন চক্ষু ফুটিবার উপক্রম হইতেছে, সেই মোহ-রজনীর প্রাতরুন্মীলনের নবমুহূর্ত্তে—পৃথিবীস্থ কোন দেশই পূর্ব্ববৎ অজ্ঞান-অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিতে পারে না; একা কি কেবল আমাদের এই ভারতভূমি মোহ-অন্ধকারে আবৃত থাকিবে? ইহা হইতেই পারে না! ঈশ্বরের প্রেম-দৃষ্টির এক ইঙ্গিতে মহাত্মা রামমোহন রায় আবির্ভূত হইয়া, কুঠার হস্তে করিয়া চতুর্দ্দিকের জঙ্গল পরিষ্কার করিলেন; পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি ক্ষেত্রকর্ষণ করিলেন এবং সেই কষ্ট-কর্ষিত ক্ষেত্রে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া, তাহা হইতে ফল-পুষ্পচ্ছায়া-প্রদ কল্যাণ পাদপ অঙ্কুরিত এবং বর্দ্ধিত করিয়া তুলিলেন; তাহার পরে তাঁহার প্রবলপরাক্রম শিষ্য মহাত্মা কেশবচন্দ্র ব্রহ্মানন্দ দেশ বিদেশে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তারিত করিলেন; তাহার পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি উদ্যমশালী ভ্রাতৃগণ নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে তাহার নবীন দল-রাজি উদ্ভাবিত করিয়া তুলিলেন; এবং এক্ষণে তাহাকে পুষ্পিত ও ফলাবনত করিবার জন্য সকল দিক্ হইতে সকল ব্রাহ্ম ভ্রাতারা সমবেত হইয়া সাধ্যানুসারে তাহাতে প্রযত্ন-বারি সেচন করিতেছেন। ইহা অতীব সত্য যে, "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" শ্রেয়ের অনেক বিঘ্ন। কিন্তু ঈশ্বর উপরে আছেন—তিনি আমাদের সঙ্গে আছেন—তিনি আমাদের নিকট হইতে নিকটে আছেন—তিনি আমাদের অন্তর হইতে অন্তরে আছেন; তাঁহার অপ্রতিহত মঙ্গল আশীর্ব্বাদ আমাদের চতুর্দ্দিকে নিরন্তর অভয় ঘোষণা করিতেছে তাহা কি আমরা শুনিতেছি না! অতএব ভয় নাই! এই মহোৎসবের মধ্য হইতে দশ সহস্র হৃদয়ের প্রীতি ভক্তি কৃতজ্ঞতার উৎস তাঁহার প্রতি উৎসারিত হউক! সত্যের জয় ধ্বনি, শুভ কার্যের মঙ্গল ধ্বনি, আনন্দের গীতধ্বনি এক তানে গগনতল বিকম্পিত করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে অমৃত শান্তিবারি বর্ষণ করুক! আমাদের মধ্যে থাকিয়া যিনি আমাদের নেতা, আমাদিগের নিকট থাকিয়া যিনি আমাদের অভয়দাতা, আমাদের অন্তরে থাকিয়া যিনি আমাদের কাণ্ডারী, তিনিই আজ আমাদের এই উৎসবের অধিদেবতা—আজ আমাদের আনন্দের সীমা কি!

আজিকের এই শুভ দিনে আনন্দ কোলাহলে ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের শাখা-বিস্তার যতদূর হইবার তাহা হইয়াছে, এখন তাহার ফল ফলিবার সময় উপস্থিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলগ্রন্থে পরব্রহ্মের প্রতিপাদক প্রাচীন ঋষিবাক্য-সকল বেদবেদান্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া, লিপিবদ্ধ হইয়াছে; স্মৃতি-পুরাণ তন্ত্র হইতে সার সার ধর্ম্মোপদেশ সংকলিত হইয়া অধ্যায়-পরম্পরায় সন্নিবেশিত হইয়াছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যানে সেই সকল প্রাচীন ঋষিবাক্য আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী করিয়া হৃদয়স্পর্শী জীবন্ত অমৃত বাক্যে ব্যাখ্যাত হইয়াছে; ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠানপদ্ধতিতে অপৌত্তলিক ক্রিয়াকাণ্ডের শাস্ত্রানুমোদিত বৈধ প্রণালী নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এবং আমাদের দেশের প্রচলিত অনুষ্ঠানপদ্ধতির সহিত তাহার এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, পৌত্তলিকতা পরিবর্জ্জিত হইলেই দুয়ের মধ্যে তিল মাত্রও প্রভেদ থাকে না। এক কথায় আমাদের এই প্রিয়তম ভারত-ভূমিতে নির্ব্বাণদশা প্রাপ্ত ব্রহ্মাগ্নি উদ্দীপিত করিতে হইলে, তাহার জন্য যত কিছু আয়োজনের প্রয়োজন সমস্তই আমাদের চতুর্দ্দিকে সুসজ্জিত রহিয়াছে; আমাদের যখন যাহা চাই তাহা আমরা হাত বাড়াইলেই পাইতে পারি; এখন আমাদের আর ভাবনার বিষয় কিছুই নাই—কেবল যত্ন-পূর্ব্বক অনুষ্ঠানকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবারই অপেক্ষা। ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পথে নির্ভয়ে পদ নিক্ষেপ করা—ইহাই এখন আমাদের মুখ্য প্রয়োজন। ইহাতে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেই আমাদের মধ্য হইতে বিবাদ কলহ দূরীভূত হইয়া গিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের অমৃতময় ফল গৃহে গৃহে ফলিত হইয়া উঠিবে। এক্ষণে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণের কর্ত্তব্য এই যে, দলাদলিতে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া, তাঁহারা তাঁহাদের প্রকৃত অভীষ্ট-কার্য্যের সাধনে কায়মনোবাক্যে প্রবৃত্ত হ'ন। সে অভীষ্ট-কার্য্য এক কথায় জ্ঞাপন করিতে হইলে, তাহা আর কিছুই নয়—ব্রহ্মোপাসনা।

বিগত উৎসবে আমি এইখানে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ সর্ব্ব-সমক্ষে উন্মুক্ত করিয়াছিলাম। তাহার চুম্বক তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান, প্রেম এবং কর্ম্ম তিনকে একতানে মিলিত করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের আশ্রয়ে নির্ভর করিয়া যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সর্ব্বাঙ্গীন ব্রাহ্মধর্ম্ম। আজি আমি সেই উৎসব-ক্ষেত্রে—সেই সমস্ত আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব এবং স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের মধ্যে সেইরূপ নবোৎসাহে দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মের দুইটী চিরাভিলষিত ফল সর্ব্ব সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিব—মঙ্গলদাতা বিশ্ববিধাতা আমাদের সকলের অন্তঃকরণে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করুন্।

ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী ফল সেই অতীন্দ্রিয় নিভৃত স্থানে ফলিত হয়, যেখানে আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ; এবং আর-একটী ফল সেই প্রকাশ্য বহিঃপ্রাঙ্গণে ফলিত হয়, যেখানে আত্মার সহিত জগতের সম্বন্ধ। প্রথম ফলটী পরব্রহ্মে প্রীতি এবং দ্বিতীয় ফলটী তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন;—দুইই ব্রহ্মোপাসনা।

আদিম কালে ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি পরিমিত দেবতাগণকে মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার মানসে ঋষিরা হোম যাগ যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন। ক্রমে সেই সকল প্রভূত ক্রিয়াকর্ম্মের অসারতার প্রতি জ্ঞানবান্ ঋষিদিগের চক্ষু ফুটিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে তাঁহারা নানা পরিমিত দেবতার নানা শক্তির অভ্যন্তরে একেরই মহতী শক্তি অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঋক্‌বেদে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে, "একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ"

এক সৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে ব্রাহ্মণেরা অনেক প্রকারে বলিয়া থাকেন; তাঁহারা কখনো তাঁহাকে বলেন—অগ্নি, কখনো বলেন—যম, কখনো বলেন—মাতরিশ্বা। মনু তাঁহার গ্রন্থের উপসংহার-ভাগে ঐ কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন; যথা—"প্রশাসিতারং সর্ব্বেষাং পুরুষং পরং" "পরম পুরুষ সকলের শাসনকর্ত্তা" এই কথা বলিয়া তদুত্তরে তিনি বলিতেছেন "এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিং ইন্দ্রমেকে পরে প্রাণং অপরে ব্রহ্ম শাশ্বতং" ইঁহাকে কেহ বলেন অগ্নি, কেহ বলেন—মনু প্রজাপতি, কেহ বলেন—প্রাণ, কেহ বলেন—শাশ্বত ব্রহ্ম। কিয়ৎকাল পরে তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া, জ্ঞানোন্নত ঋষিরা ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে পরব্রহ্মের শাসনাধীন প্রাকৃতিক শক্তি রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলেন; যথা,—"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ" ইঁহার ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, ইঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, ইঁহার ভয়ে ইন্দ্র এবং বায়ু এবং মৃত্যু প্রধাবিত হইতেছে। তাহার পরে তাঁহারা সমস্ত জগতের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্যের অভ্যন্তরে একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া, গায়ত্রী ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন; তাহার পরে যে পরম-পুরুষ সূর্য্যের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান তিনিই আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান "স যশ্চায়ং পুরুষে যশ্চাসাবাদিত্যে স একঃ" সেই এই পরমাত্মা যিনি আত্মাতে, এবং ঐ যিনি সূর্য্যে, তিনি একই" পুনশ্চ "দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং" তিনি দূর হইতেও বহুদূরে এবং তিনি এইখানে অতি নিকটে, আর যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারা তাঁহাকে হৃদয়ের গূঢ় অভ্যন্তরে অবলোকন করেন। এইরূপে তাঁহারা অন্তরে বাহিরে একই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে লাগিলেন এবং "প্রেয়ঃপুত্রাৎ প্রেয়োবিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়মাত্মা" অন্তরতর এই যে পরমাত্মা ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় এবং আর আর সমস্ত বস্তু হইতে প্রিয়, এইরূপ তাঁহাকে প্রিয়তমরূপে উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তাঁহাদের মন্তব্য কথা ছিল এই যে, "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। এইরূপে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা জ্ঞানোন্নত ঋষিদিগের মন হইতে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইয়া একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের অনুসন্ধান তাহার স্থলাভিষিক্ত হইল। কিন্তু হইলে হয় কি—চিরাভ্যস্ত সংস্কার যাহা পুরুষানুক্রমে জন সমাজে প্রচলিত, তাহা ছাড়াইয়া ওঠা জন-সাধারণের পক্ষে অতীব সুদুষ্কর। ভারত-ভূমির জন-সাধারণ পূর্ব্ববৎ হোম যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানেই বৃথা আয়ুঃ ক্ষেপ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া জ্ঞানোন্নত ঋষিরা জন-সমাজের প্রতি বিরক্ত হইয়া অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে এবং ব্রহ্মধ্যানে জীবন সমর্পণ করিতে লাগিলেন। তখনকার জনসমাজে হোম যাগ যজ্ঞ বই আর কথা ছিল না—বিবাহাদি যে কোন মাঙ্গলিক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত, সকলেরই সঙ্গে ঐ সমস্ত বাহ্য আড়ম্বর ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত ছিল। জ্ঞানবান্ ঋষিরা দেখিলেন যে, সমাজে থাকিতে গেলে ঐ সকল মিথ্যা আড়ম্বর এবং মিথ্যা দেবার্চ্চনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া অতীব সুকঠিন; অথচ—তাঁহাদের অন্তঃকরণের নব-প্রস্ফুটিত জ্ঞানালোক একমাত্র অদ্বিতীয় পরম সত্য ব্যতিরেকে আর কিছুতেই তৃপ্তি মানিতে পারিল না; তাই তাঁহাদের অন্তঃকরণ বলিয়া উঠিল—চাহি না জন সমাজ—চাহি না জাতি কুল—চাহি না স্ত্রী পুত্র—চাহি না কিছুই—সংসারের সমস্ত বন্ধন ছেদন করিয়া অরণ্যে যাই; সেই খানে গিয়া নিরাপদে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান এবং ব্রহ্মানন্দ রসপান করিয়া আত্মার গভীর পিপাসা নিবৃত্তি করিব, এবং পরিণামে মিথ্যার বিস্তৃত কুহকজাল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সংসারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে উপনীত হইব! এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা জন-সমাজ জাতিকুল নাম ধাম সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া অভীষ্ট কার্য্যে তৎপর হইলেন; এবং এইরূপ তপঃসাধনের প্রভাবে তাঁহাদের অন্তঃকরণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ঐ সকল জ্ঞানতৃপ্ত ঋষিরা পুনঃ পুনঃ এইরূপ খেদোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম, এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুন্তে পুনরেবাপিয়ন্তি।" এই যে সকল যাগযজ্ঞরূপী ক্রিয়া কলাপ যাহাতে অষ্টাদশ প্রকার অকিঞ্চিৎকর কর্ম্ম অন্তর্ভূত, এই সমস্তকে যাঁহারা শ্রেয়-বোধে অভিনন্দন করেন, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তিরা জরা মৃত্যুর বশতাপন্ন হ'ন। ইহা সত্বেও লোকালয়ে হোম যাগ যজ্ঞাদি প্রভৃত ক্রিয়া-কাণ্ড যেমন চলিতেছিল, সেইরূপ চলিতে লাগিল—এবং অদ্যাপি তাহা জনসমাজে বিবাহাদি সকল শুভকার্য্যেরই সঙ্গের সঙ্গী। ব্রহ্মজ্ঞান লোকালয়ের বহির্ভাগে অরণ্যে নির্ব্বাসিত হইল। কিন্তু যাহাই হউক, অতি পুরাতন কাল হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আমাদের দেশের গিরিগুহা অরণ্যের গভীর প্রদেশে প্রাণপণ যত্নে পরিপালিত হইয়া আসিতেছে। সেই পুরাতন ঋষিতপস্বীদিগের জ্ঞান-গোচর সত্য সুন্দর মঙ্গল পুরুষ পরব্রহ্মের উপাসনা অরণ্য হইতে ফিরাইয়া আনিয়া নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে, প্রতিষ্ঠিত করিয়া—ভারত-ভূমির ভাগ্যে কখন যাহা ঘটে নাই, এইরূপ একটি মহত্তম কল্যাণ সাধন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদের দেশে আবির্ভূত হইয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের দুইটী চিরাভিলষিত ফল এবং তাহার প্রথমটী পরব্রহ্মের প্রতি প্রীতি। বর্ত্তমান জনসমাজে বিশুদ্ধ ঈশ্বর-প্রীতি ফলিত করিয়া তোলাই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম সংকল্প। সাধারণতঃ সকল দেশেরই শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানী ব্যক্তিরা এবং বিশেষতঃ আমাদের দেশের প্রাচীন আরণ্যক ঋষিরা এই কথাটী ভূয়োভূয় লোকের মনে নিবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য চেষ্টা পাইয়া আসিতেছেন যে, আত্মার অভ্যন্তরে পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি সমর্পণ করাই মনুষ্যের প্রধান পুরুষার্থ; আর তাঁহাদের এই কথাটী শুদ্ধ কেবল জন-শ্রুতি মাত্র নহে—কথার কথা মাত্র নহে। উহা যে কেমন সত্য—সকলেই তাহা পরীক্ষা-দ্বারা স্ব স্ব অন্তঃকরণে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উপলব্ধি করিতে পারেন। ঈশ্বরের মূর্ত্তি-কল্পনা কেবল

কল্পনা-মাত্র। কিন্তু জীবাত্মা এবং পরমাত্মা উভয়েই কল্পনার অতীত অথচ শুদ্ধ-চিত্ত সাধকের নির্ম্মল-জ্ঞানে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতীয়মান। বেদে আছে "জ্ঞান-প্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" জ্ঞানের প্রসন্নতায় যখন বুদ্ধি পরিশুদ্ধ হয় তখন সাধক ধ্যানযুক্ত হইয়া সেই নিরবয়ব পরব্রহ্মকে দর্শন করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাধক অন্তঃকরণকে নিষ্পাপ এবং পরিশুদ্ধ করিলেই পরমাত্মাকে ধ্রুব সত্যরূপে সাক্ষাৎ জ্ঞানে উপলব্ধি করিতে পারেন। জ্ঞানবান্ মনুষ্যকে এ কথা শিখাইয়া দিতে হয় না যে, তাঁহার অন্তরে জ্ঞান জাগিতেছে; অতএব আপন অন্তরস্থিত সাক্ষাৎ জ্ঞান মনুষ্যের প্রত্যয়-ভাজন না হইবার কোনো কারণ নাই। সেই সাক্ষাৎ জ্ঞানে আপনা-হইতেই প্রকাশ পায় যে, সকল কারণের অভ্যন্তরে একমাত্র মূল কারণ, সকল আধারের অভ্যন্তরে একমাত্র মূলধার, সকল আত্মার অভ্যন্তরে একমাত্র অদ্বিতীয় অন্তরাত্মা অবস্থিতি করিতেছেন। এই জন্য এ কথা বুঝিতে কাহারো ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হয় না যে, কোনো পরিমিত বস্তুই পরিমিত বস্তুর মূলকারণ হইতে পারে না—বীজ বৃক্ষের মূল কারণ হইতে পারে না; কোনো পরিমিত বস্তুই পরিমিত বস্তুর মূলধার হইতে পারে না—পৃথিবী বৃক্ষের মূলাধার হইতে পারে না; কোনো পরিমিত বস্তুতেই আত্মার তৃপ্তি হইতে পারে না; সসাগরা পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যেও নহে—ইন্দ্রের অমরাবতীতেও নহে; কেবল যিনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—যিনি আত্মার অন্তরাত্মা তাঁহাতেই আত্মার চিরস্থায়ী আনন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে এরূপ ঘনিষ্ট এবং নিগূঢ় প্রেম-সম্বন্ধ যে, যদি জিজ্ঞাসা কর "জীবাত্মা কাহাকে চা'?" তবে তাহার এক উত্তর এই যে, পরমাত্মাকে। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, পরমাত্মা কি উদ্দেশে জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তবে তাহার এক উত্তর এই যে, জীবাত্মার উন্নতির উদ্দেশে। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গাভীরা রোমন্থন করিয়াই সন্তুষ্ট; পক্ষীরা নীড় নির্ম্মাণ করিয়াই সন্তুষ্ট; মধুমক্ষিকা মধু চয়ন করিয়াই সন্তুষ্ট। কিন্তু মনুষ্যের আত্মা সেরূপ কিছুতেই সন্তুষ্ট হইতে পারে না; অতীব উপাদেয় সামগ্রী ভোজন করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না, বৃহদায়তন অট্টালিকায় বাস করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। প্রভূত ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়াও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। মনুষ্যের সম্মুখ দিয়া দৃশ্যের পর দৃশ্য স্রোতের ন্যায় চলিয়া যাইতেছে—যাহা যাইতেছে তাহা আর ফিরিতেছে না; তাহার মধ্যে এক বস্তুকে ছাড়িয়া আর এক বস্তুকে ধরা, দ্বিতীয় বস্তুকে ছাড়িয়া তৃতীয় বস্তুকে ধরা, এরূপ করিয়া রাশি রাশি পরিমিত বস্তুর মধ্যে যুগযুগান্তর কাল ঘুরিয়া বেড়াইলেও মনুষ্যের আত্মা শান্তি ও তৃপ্তির দিকে একপদও অগ্রসর হইতে পারে না। চলাচল সমস্তের মধ্যে ধ্রুব সত্য পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে চাওয়াই মনুষ্যের একমাত্র শান্তি-সোপান। পরমাত্মাকে চাওয়া সৃষ্টির আর কুত্রাপি সম্ভবে না—কেবল জীবাত্মাতেই সম্ভবে; এবং তাহারই জন্য জীবাত্মা সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত। আর এক দিকে দেখা যায় যে, জীবাত্মা যেমন পরমাত্মার জন্য ব্যাকুল, পরমাত্মা তেমনি জীবাত্মাকে প্রেমদান করিবার জন্য এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন;—শরীরের উপাদান স্বরূপে পঞ্চভূত সৃজন করিয়াছেন, প্রাণের উপজীবিকা-স্বরূপে প্রাণ-পূর্ণ উদ্ভিদ্ রাজ্য সৃজন করিয়াছেন, মনের প্রতিকৃতি-স্বরূপে পশু পক্ষী সৃজন করিয়াছেন; প্রথমের উপরে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, দ্বিতীয়ের উপরে তৃতীয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং সকলের উপরে চিরোন্নতি-শীল জীবাত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সৃষ্টির প্রকৃত অর্থ এবং তাৎপর্য্য অকথিত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ পরমাশ্চর্য্য যেখানে সোপানের ব্যবস্থা সেখানে উপবেশন-শালা আরো কি না জানি অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! জ্ঞানই জীবাত্মার উপবেশন-শালা এবং নিষ্কাম পবিত্র প্রেমই জীবাত্মার অন্তঃপুর-নিকেতন। সৃষ্টির মধ্যে জ্ঞানের ন্যায় উৎকৃষ্ট পবিত্র সামগ্রী আর নাই—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"

ইতি ভগবদ্গীতা।

এবং জ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরপ্রীতির ন্যায় উৎকৃষ্ট পবিত্র সামগ্রী আর নাই। জীবাত্মা উপরি-উক্ত ঐ সকল সোপান দিয়া জ্ঞান-মন্দিরে অধিরূঢ় হইয়া প্রেমের নিভৃত অন্তঃপুরে পরমাত্মার সহিত ভূমানন্দ উপভোগ করিবে এবং সেই আনন্দামৃতে পরিপুষ্ট হইয়া উন্নতি হইতে উন্নতিতে পদার্পণ করিবে—ইহাই সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য। জীবাত্মা যতক্ষণ না পরমাত্মাকে দেখিতে পায়, ততক্ষণই তাহার মোহ, ততক্ষণই তাহার শোক, পরমাত্মাকে দেখিতে পাইলে জীবাত্মার সকল মোহের তিরোধান হয়—সকল শোকের অবসান হয়। প্রাচীন ঋষিরা তাই বলিয়াছেন।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি। সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ।"

দুই সুন্দর পক্ষী একই বৃক্ষে এক সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, তাহার মধ্যে একটী স্বাদগ্রহণ পূর্ব্বক ফল ভোজন করিতেছেন—আর একটী নিরশন থাকিয়া কেবল মাত্র দর্শন করিতেছেন। জীবাত্মা শরীরে নিমগ্ন থাকিয়া দীনভাবে মুহ্যমান হইয়া নিরন্তর শোক করিতেছেন; যখন সর্ব্বসেব্য পরমাত্মাকে এবং তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি শোক হইতে মুক্ত হ'ন। পুরাতন আরণ্যক ঋষিদিগের প্রদর্শিত এইরূপ পরম পরিশুদ্ধ জ্ঞানের পথ পরিত্যাগ করিয়া আবার কি আমরা কল্পনার পথে ফিরিয়া যাইব? কল্পনার অলীক প্রলোভনে মুগ্ধ হইব? কল্পনার অকিঞ্চিৎকর বিভীষিকায় ভয়ে কম্পমান হইব? তাহা কখনই হইতে পারে না! ভারত-ভূমির নামে যাঁহাদের হৃদয় উথলিয়া উঠে এবং দুই চক্ষু দিয়া বাষ্পধারা বিগলিত হয়, তাঁহাদের জানা উচিত যে, বেদ-শাস্ত্র সমস্ত ভারত-ভূমির সর্ব্বত্র শিরোধার্য্য, অথচ তাহাতে শুধু যে কেবল ব্রহ্মোপাসনার বিধি আছে তাহা নহে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোনো কিছুর উপাসনার নিষেধ আছে; যথা—

"আত্মৈবেদং নিত্যোদোপাসনং স্যাৎ নান্যৎ কিঞ্চিৎ সমুপাসীত ধীরঃ"

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পরমাত্মারই উপাসনা করিবেক আর কোনো কিছুরই উপাসনা করিবেক না। ব্রহ্মোপাসনা শুধু যে কেবল বেদের বিধান এমন নহে—স্মৃতি পুরাণ তন্ত্র সমস্তই একবাক্যে তাহার পোষকতা করিতেছে। শ্রীমদ্ ভাগবত এরূপ রূঢ় বাক্যে পৌত্তলিকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়াছেন যে, তাহা শুনিলে অনেকে হয় তো ইষ্ট দেবতার নামোচ্চারণ করিয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিবেন, যথা,

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ। যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।"

কফ পিত্ত বায়ুময় শরীরে যে ব্যক্তির আত্মবোধ, স্ত্রী পুত্রাদিতে যে ব্যক্তির আপনত্ব বোধ, আর জ্ঞানিজন সমাগমে নহে কিন্তু জলে যাহার তীর্থবোধ সে ব্যক্তি গো-গর্দ্দভ। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে এবং তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের শিরোভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে যে,

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণঃ। যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন, তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইবেন এবং যে কোনো কর্ম্ম করেন, তাহা পরব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন। মনু কি বলিয়াছেন তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শাশ্বত পরমপুরুষ পরব্রহ্মই সাধকদিগের প্রকৃত উপাস্য দেবতা—ইন্দ্রাদি দেবতারা তাঁহারই বিভিন্ন-শক্তি-জ্ঞাপক নাম মাত্র। স্মৃতি-পুরাণ তন্ত্রোক্ত এ সমস্ত জ্ঞানের কথা বেদেরই প্রতিধ্বনি; বেদে কোথাও আছে "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" "পরমাত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবেক" কোথাও বা আছে "নেদং যদিদমুপাসতে" লোকের দেখাদেখি কোনো পরিমিত বস্তুর উপাসনা করিবেক না। এতকালের পরেও এখনো কি আমাদের দেশ ঐ সকল জ্যোতির্ম্ময় বেদবাক্যের প্রতি বধির হইয়া নিদ্রা যাইতে পারে? চতুর্দ্দিক হইতে আমাদের চক্ষে জ্ঞানালোক বর্ষিত হইতেছে আজিও কি আমাদের চক্ষু ফুটিবে না? সত্য কি এতই নিস্তেজ এবং নির্ব্বীর্য্য! মিথ্যা কি এতই প্রবল পরাক্রম বিশ্বাধিপতি? কখনই না! "সত্যমেব জয়তে নানৃতং"। এইরূপ আমরা দেখিতেছি যে, ব্রহ্মোপাসনাতে আমাদের জ্ঞান পরিতৃপ্ত হয়, প্রীতি ভক্তি চরিতার্থ হয়, আত্মার অভ্যন্তরে মুক্তির পথ উন্মুক্ত এবং প্রসারিত হইয়া যায়, আমাদের দেশের প্রাচীন আরণ্যক ঋষিদিগের তাহাই মুখ্য মন্তব্য এবং বর্ত্তমান জ্ঞানোজ্জ্বল শতাব্দীর তাহাই সর্ব্বপ্রকারে উপযোগী।

[illegible] এবং ব্রহ্মোপাসনা যখন এইরূপ পরমোৎকৃষ্ট মহত্তম কল্যাণের মূল, তখন তাহার সহিত গার্হস্থ্য এবং সামাজিক অনুষ্ঠান একতানে সম্মিলিত হইলে তাহা আরো কত না মঙ্গলের আকর হইয়া উঠে। মনু বলিয়াছেন যে,

"অজ্ঞেভ্যো গ্রন্থিনঃ শ্রেষ্ঠা গ্রন্থিভ্যো ধারিণো বরাঃ ধারিভ্যো জ্ঞানিনঃ শ্রেষ্ঠা জ্ঞানিভ্যো ব্যবসায়িনঃ।"

অজ্ঞলোক অপেক্ষা গ্রন্থাধ্যায়ী ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থাধ্যায়ী ব্যক্তি অপেক্ষা ধারণাশীল ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ, ধারণাশীল ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তিরা শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা (অর্থাৎ যাঁহারা জ্ঞান-অনুসারে কার্য্য করেন এরূপ ব্যক্তিরা) শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানে শুধু পারমার্থিক সত্য উপলব্ধি করিয়া ক্ষান্ত থাকা ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য নহে—জ্ঞানের সত্যকে সাংসারিক সমস্ত মঙ্গল কার্য্যে প্রয়োগ করা চাই। তবেই ধর্ম্ম অব্যাহতরূপে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, নচেৎ সত্য-হানি ধর্ম্মহানি এবং ব্রতভঙ্গ অনিবার্য্য। ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিতে হইলে, সত্যনিষ্ঠ সাধককে সত্যের অনুরোধে এবং ধর্ম্মের অনুরোধে প্রচলিত লোকাচারের কোনো না কোনো অংশ পরিত্যাগ করিতেই হয়; তাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। কিন্তু ব্রাহ্মেরা কি পরিত্যাগ করিয়াছেন? মূর্ত্ত-পদার্থের উপাসনা যাহা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদিতে ভূয়োভূয় নিন্দিত হইয়াছে, পরিত্যাগ করিবার মধ্যে তাহাই তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়াছেন—শাস্ত্র-বিগর্হিত জ্ঞান-বিগর্হিত পথই পরিত্যাগ করিয়াছেন!

তাঁহারা কি অবলম্বন করিয়াছেন? ব্রহ্মোপাসনা যাহা সকল শাস্ত্রে ভূয়োভূয় প্রশংসিত হইয়াছে, সেই সর্ব্ববাদি-সম্মত পথই অবলম্বন করিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি ইহার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

ব্রাহ্মধর্ম্মোক্ত ব্রহ্মোপাসনা-পদ্ধতি সমস্ত শাস্ত্রের মথিত সারাংশ; এই জন্য তাহার মধ্যে এমন একটীও কথা নাই যাহাতে সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্ম্ম সম্প্রদায় সমস্বরে যোগ দিতে না পারে। কি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" কি "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ" কি "নমস্তে সতে তে জগৎ-কারণায়" কি গায়ত্রীধ্যান কি "অসতো মা সদ্গময়" কি "একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ" সমস্তই আত্মার গভীরতম প্রদেশকে স্পর্শ করে এবং এইরূপ বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা আত্মার শান্তির পক্ষে যেমন উপযোগী—পাপতাপের যেমন মহৌষধ—আর আর কিছুই তেমন নহে।

একদিকে যেমন ব্রহ্মোপাসনা আর এক দিকে তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী সামাজিক অনুষ্ঠান; একটী ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তরঙ্গ আর একটী বহিরঙ্গ; দুইই জ্ঞানের অনুমোদিত, হৃদয়ের অনুমোদিত এবং শাস্ত্রের অনুমোদিত—এই কারণে দুইই বর্ত্তমান জন-সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপযোগী।

সামাজিক শুভকার্য্য যত প্রকার আছে তাহার মধ্যে বিবাহই সর্ব্বপ্রধান, এই জন্য বিবাহের অনুষ্ঠানপদ্ধতিকে পৌত্তলিকতা দোষ হইতে মুক্ত করা ব্রাহ্মধর্ম্মের একটী প্রাণগত সংকল্প। কাজেই ব্রাহ্মধর্ম্মানুযায়ী বিবাহের অনুষ্ঠানে হোম দ্বারা পরিমিত দেবতাগণের তুষ্টিসাধন কোনোক্রমেই শোভা পাইতে পারে না; তাই তাহার মধ্য হইতে কুশণ্ডিকা সমূলে পরিবর্জ্জিত হইয়াছে। কুশণ্ডিকা কেবল হোমের অগ্নি-সংস্কার, তা ভিন্ন তাঁহা স্বতঃ কিছুই নহে। যেখানে হোমের কোনো সংস্রব নাই সেখানে কুশণ্ডিকা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। যদি শাস্ত্র শিরোধার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোনো শাস্ত্র অনুসারেই হোম বিবাহের এরূপ কোনো অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে যে, তাহা না করিলেই নয়। [illegible] সূত্রের ১ম অধ্যায়ের ৪র্থ

কণ্ডিকার ৬ষ্ঠ সূত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে যে, "একে আচার্য্যাঃ কামপ্যাহুতিং নেচ্ছন্তি" একদল আচার্য্যেরা কোনো প্রকার হোমই অনুমোদন করেন না।* পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা হোম-যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতির মধ্যস্থলে অষ্টপ্রহর বাস করিতেন কাজেই তাহা যে কি পদার্থ তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতেন, কেননা তাঁহারা ভুক্তভোগী। এমত স্থলে—যাগ-যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে যেরূপ হৃদয়-ভেদী আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবাসীদিগের তাহা অতীব মনোযোগের সহিত শোনা উচিত। ঐ সকল বৃথা কার্য্যের প্রতি তাঁহারা যে কিরূপ আন্তরিক বিরক্ত ছিলেন, তাহার একটী নমুনা আমি ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি যথা,

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম, এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়া জরামৃত্যুন্তে পুনরেবাপিয়ন্তি।"

যে সকল মূঢ় ব্যক্তিরা অকিঞ্চিৎকর অষ্টাদশ কর্ম্ম সম্বলিত নশ্বর এবং অস্থায়ী যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকে শ্রেয় বোধে অভিনন্দন করেন, তাঁহারা জরামৃত্যুর বশতাপন্ন হ'ন। ব্রাহ্মেরা কুশণ্ডিকা এবং হোম পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রানুসারে যদি তাঁহাদিগকে দোষী হইতে হয়, তবে বিবাহের অনুষ্ঠানে "কেচিৎ আচার্য্যা" কোনো কোনো আচার্য্য যাঁহারা "কামপ্যাহুতিং নেচ্ছন্তি" কোনো প্রকার হোমই অনুমোদন করিতেন না" তাঁহারা আচার্য্য পদবী হইতে কেননা বহিষ্কৃত হইলেন ?• ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কুশণ্ডিকা এবং হোম বিবাহের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। শাস্ত্রের অভিপ্রায়ানুসারে সম্প্রদান এবং পাণিগ্রহণ এই দুইটীই বিবাহের মুখ্য অঙ্গ, এবং সপ্তপদী গমন পাণিগ্রহণের চরম পর্য্যাপ্তি-স্বরূপ। শুধু কেবল হিন্দুজাতির শাস্ত্র অনুসারে নহে, প্রত্যুত পৃথিবী শুদ্ধ সমস্ত আর্য্যজাতির শাস্ত্র অনুসারেই—কন্যার দান গ্রহণ এই দুইটী কার্য্য রীতিমত সমাধা হইলে বিবাহ-সিদ্ধির পক্ষে কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। শাস্ত্র-অনুসারে এবং প্রচলিত প্রথা-অনুসারে ব্রাহ্মণ-ভিন্ন অপরাপর জাতির মধ্যে হোমাদির তো কোনো প্রসঙ্গই উত্থাপিত হইতে পারে না; তা ভিন্ন ঘট-স্থাপন শিলাস্থাপনাদি পৌত্তলিক ব্যাপার যাহা বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহা কোনো স্মৃতি-শাস্ত্রেই লেখে না—তাহা নিতান্তই অধুনাতন কালের নূতন সৃষ্টি। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত মন্তব্য কথা এই যে, যে জাতির যেরূপ জাতীয় প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, যে কুলের যেরূপ কৌলিক প্রথা তাহা সেইরূপই থাকুক, তাহার প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই; কেবল সেই সকল প্রচলিত অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে পরিমিত দেবতাগণের উপাসনা সমূলে উঠিয়া গিয়া তাহার স্থলে বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা অধিরূঢ় হউক, তাহা হইলেই ব্রহ্মোপাসক ভক্তজনগণের বিশুদ্ধ ধর্ম্ম-ব্রত অব্যাহত থাকিবে। ব্রাহ্মদিগের বিবাহের অভ্যন্তরে এই যেমন দেখা গেল, তেমনি আর আর সমস্ত শুভানুষ্ঠানের অভ্যন্তরে পরিমিত দেবার্চ্চনার পরিবর্ত্তে এক মাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করাই ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান পদ্ধতির মুখ্য সংকল্প; যেহেতু ব্রাহ্মধর্ম্মে আছে যে, গৃহস্থ ব্যক্তি যে কোনো কর্ম্ম করিবেন [illegible] দিবেন।

ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারধর্ম্ম ধর্ম্মই নহে, তাহা ছদ্মবেশী স্বার্থপরতা। ঈশ্বর-ভ্রষ্ট বিষয়ী ব্যক্তিদিগের অন্তরাস্থিত রিপু সকলই তাঁহাদের অন্তরতম বন্ধু এবং তাঁহাদের বাহিঃস্থিত অন্ধশক্তিই তাঁহাদের জাগ্রত বিশ্ববিপত্তি; তাহা ব্যতীত তাঁহাদের কাহারো ঈশ্বর অর্থ, কাহারো ঈশ্বর মান মর্য্যাদা খ্যাতি প্রতিপত্তি, কাহারো ঈশ্বর আপনি এবং আপনার পরিবার। মঙ্গলময় করুণাময় সর্ব্বারাধ্য পরম-দেবতা এবং অন্তরতম প্রিয়তম পরমাত্মা হইতে বিমুখ হইয়া মায়াবী অন্ধশক্তি এবং স্বার্থ-রাক্ষসের অধীনে মনুষ্য-সমাজ কতদিন টেঁকিয়া থাকিতে পারে? তাই আমাদের দেশের এক্ষণে এইরূপ শোচনীয় অবস্থা। কিন্তু তেমনিই ঈশ্বরের অপরাজিত করুণা! আমাদের এই দীন হীন বঙ্গ-ভূমিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভিনব আবির্ভাব তাঁহার অপার করুণার একটী প্রত্যক্ষ নিদর্শন। সেই করুণাময় বিশ্ববিধাতার উপাসনা হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত, পশ্চিম-সাগর-কূল হইতে পূর্ব্ব সাগর-কূল পর্য্যন্ত, গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতভূমির সৌভাগ্য সূর্য্য প্রত্যায়ন করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম এই নিরাশ্রয় দারিদ্র-কুটীর বঙ্গভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; এমন ব্রাহ্মধর্ম্মকে—পরমপিতার এমন স্বর্গীয় করুণামৃত প্রসাদকে—আমাদের দেশের এমন হিতৈষী পরম বন্ধুকে—আর কি আমরা তিলমাত্রও নয়নের অন্তর করিতে পারি? আমাদের দেশের যখন অন্তরে অন্ধকার বাহিরে অন্ধকার, এই ঘোর দুঃসময়ে, পরমপিতা পরমাত্মার চরণচ্ছায়া ভিন্ন আর কোথায় গিয়া আমরা শান্তি পাইব? আজিকের এই শুভ অবসরে আইস আমরা সমস্ত দুঃখতাপ বিস্মৃত হইয়া, ক্ষণকালের জন্যও সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণের আশ্রয় গ্রহণ করি—তিনি আমাদিগকে সংসারারণ্যের সমস্ত বিঘ্ন-বিপত্তি হইতে পরিত্রাণ করিয়া যথাকালে তাঁহার অমৃত নিকেতনে উত্তীর্ণ করিয়া দিবেন—নিঃসংশয়! কেননা তাহারই জন্য তিনি এই বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন।

প্রদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ

বাঁকুড়া।

বাঁকুড়া ব্রাহ্মসমাজের দশম বার্ষিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রকারে সম্পন্ন হইয়াছে।

১০ই ফাল্গুন শনিবার হইতে প্রতিদিনই সন্ধ্যাকালে মন্দিরে উপাসনা এবং সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

১১ই ফাল্গুন রবিবার—প্রাতে, ছাত্রসমাজে বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় "রাজা রামমোহন রায়ের চরিত্র" বিষয়ে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময়—সংক্ষিপ্ত উপাসনা এবং সংকীর্ত্তন। তৎপরে নয়াচটিস্থ শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, মহাশয়ের বাটীতে সদালাপ—শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ কুলভি মহাশয় "মানব জীবনের উদ্দেশ্য" বিষয়ে কিছু বলেন। সায়াহ্নে সাপ্তাহিক উপাসনা শ্রীযুক্ত বাবু নীল-

মণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনা করেন। "বিপদ এবং উৎপীড়ন, ভগবানের প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং ভালবাসার পরীক্ষা" এই বিষয়ে তিনি উপদেশ দেন।

১৪ই ফাল্গুন বুধবার—সায়াহ্নে উৎসবের উদ্বোধন শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ কুলভি মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

১৫ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—আজ উৎসবের দিন। প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনা করেন। উপদেশের সময় তিনি বলেন "আমরা, একই সময়ে পাপের এবং ঈশ্বরের সেবা করিতে পারি না—একই সময়ে ঈশ্বর এবং সাংসারিক সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি না। ঈশ্বরের চক্ষে নবজীবন পাইতে হইলে আমাদিগকে সংসারের চক্ষে মরিতে হইবে। যখন আমরা তাঁহাকে পাইবার জন্য সংসারকে ছাড়িতে পারিব, তখনই অনন্ত শান্তি এবং আনন্দের অধিকারী হইব।" মধ্যাহ্নে—শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ মহাশয়ের বাগানের বৃক্ষতলে সঙ্গীত, উপাসনা ও "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" হইতে পাঠ হয়। অপরাহ্নে—"ধর্ম্মের প্রাণ" বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী। তিনি বলিয়াছিলেন "কার্য্য, নীতি অথবা শাস্ত্র জ্ঞান ধর্ম্মের মূল নহে। ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি ভালবাসাই সকল সৎকর্ম্ম, নীতি এবং জ্ঞানের মূল। আত্মা ভিন্ন শরীর যেরূপ কোনও কার্য্য করিতে পারে না, সেইরূপ ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস এবং তাঁহার প্রতি ভালবাসা ভিন্ন শুষ্ক কার্য্যের আড়ম্বরেও কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক ফল নাই। বিশ্বাস এবং ভালবাসাই ধর্ম্মের প্রাণ—আজ কালকার হিন্দুধর্ম্ম শুদ্ধ অন্তঃসার শূন্য কার্য্যতেই নিবদ্ধ। বিশ্বাস এবং ভালবাসাই যে সকল সৎকার্য্যের মূল হওয়া উচিত, ব্রাহ্মসমাজ ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইতেছেন।" সায়াহ্নে—শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ কুলভি মহাশয় উপাসনা করেন।

১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু বারাবশি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে—প্রায় ৩০০ শত দরিদ্র লোককে চাউল ও পয়সা বিতরণ করা হয়। সায়াহ্নে—শ্রীযুক্ত বাবু মৃগাঙ্কধর রায় চৌধুরী মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। "ঈশ্বরের দয়াই কার্য্যকরী" এই বিষয়ে তিনি উপদেশ দেন।

১৭ই ফাল্গুন শনিবার—প্রাতে ছাত্রসমাজের উৎসব। শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ সিংহ বি, এ, মহাশয় উপাসনা করেন। তৎপরে বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও হেমেন্দ্র বাবু উপদেশ দেন। অপরাহ্নে—সংক্ষিপ্ত উপাসনার পর মন্দিরের সম্মুখ হইতে নগর সংকীর্ত্তনকারীগণ বাহির হন। শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী ও বাবু মৃগাঙ্কধর রায়চৌধুরী বাহিরে বক্তৃতা করেন। সায়াহ্নে—মন্দিরে উপাসনা হয়, শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয় উপাসনা করেন। তিনি "প্রেম" এই বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।

১৮ই ফাল্গুন রবিবার—প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ কুলভি মহাশয় উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে—প্রীতিভোজন। অপরাহ্নে—ধর্ম্মালাপ। সায়াহ্নে—শ্রীযুক্ত বাবু নীলমণি চক্রবর্ত্তী [illegible] মহাশয় উপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি "নিরাশা" এই বিষয়ে উপদেশ দেন।

ব্রাহ্মসমাজ।

দীক্ষা—ঢাকা হইতে বাবু জ্যোতিরিন্দ্রপ্রসাদ মিত্র লিখিয়াছেন, বিগত ২০শে মার্চ্চ শুক্রবার পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে অক্ষয়কুমার গুহ, অশ্বিনীকুমার বসু এবং ঈশ্বরচন্দ্র নাগ নামক তিনটী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন। আবশ্যক বিবেচনায় জেলার সুযোগ্য মাজিষ্ট্রেট মহাশয় শান্তি রক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্মে এই নবপ্রবিষ্ট যুবকদিগকে নিরন্তর তাঁহার পথে রক্ষা করুন এই প্রার্থনা।

শ্রাদ্ধ— বিক্রমপুরের অন্তর্গত বালিগাঁ নিবাসী উপেন্দ্রনাথ দাসের মাতৃশ্রাদ্ধ অত্র কলিকাতায় সম্পন্ন হইয়াছে। বাবু শ্রীশচন্দ্র দে মহাশয় আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজে এই তাঁহার প্রথম অনুষ্ঠান। ঈশ্বর তাঁহাকে সাহায্য করুন। তিনি উক্ত শ্রাদ্ধোপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ॥০ আনা দান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার হস্তে ব্রাহ্ম ছাত্রী নিবাসের (Boarding) কোন একটী ব্রাহ্ম বালিকাকে দিবার জন্য "সুজাতাবৃত্তি" নামে মাসিক ৷৷৶০ পৌনে ছয় টাকার একটী বৃত্তি ন্যস্ত হইয়াছে।

উক্ত সভার হস্তে "সৌদামিনী বৃত্তি" নামক বাৎসরিক ৪০৲ টাকার আর একটী বৃত্তি আছে। ইহা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় (School) অথবা ব্রাহ্মছাত্রী নিবাসের (Boarding) কোনও একটী বা ততোধিক বালিকাকে প্রদত্ত হইবে।

যাঁহারা এই বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা আগামী ২০শে এপ্রেলের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের নিকট আবেদন করিবেন।

সাঃ ব্রাঃ সমাজ কার্য্যালয়,
১৭ই মার্চ্চ, ১২৯১।
২১১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

শ্রীহুকড়ি ঘোষ,
সম্পাদক
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।

আগামী ১০ই এপ্রেল শুক্রবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় সিটি-কলেজ ভবনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধ্যক্ষ সভার ১৮৯১ সনের প্রথম ত্রৈমাসিক অধিবেশন হইবে, সভাগণের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়।

বিবেচ্য বিষয়।

১। কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রথম ত্রৈমাসিক কার্য্য বিবরণ ও আয় ব্যয়ের হিসাব।

২। বিবিধ।

১৭ই মার্চ্চ, ১৮[illegible]
সাধারণ [illegible]

শ্রীহুকড়ি ঘোষ,
[illegible]ক, সাঃ ব্রাঃ সঃ।

২১১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র [illegible] [illegible] প্রকাশিত।